হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।

পঞ্চম খণ্ড।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৪

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৭২/৩এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০৪২

মুদ্রক
ট্রায়ো প্রসেস
পি ১২৮ সি. আই. টি. রোড
কলকাতা-৭০০০১৪

প্রকাশকের নিবেদন

নানা কারণে এই খণ্ড প্রকাশের জন্য সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে এই খণ্ডটি প্রকাশিত হল প্রধানত শ্রী সত্যজিৎ চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে।

আশা করি পাঠকবর্গ এই খণ্ডটিকেও সমানভাবে সমাদর করবেন।

সা-সা-চ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা।

স্মারকগ্রন্থ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ, সত্যজিৎ চৌধুরী-দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭৮ খৃ.।

হ-র-১ হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, কলকাতা ১৩৬৩ ব.।

হ-র-২ হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, কলকাতা ১৩৬৬ ব.।

হ-র-সং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, ১-৪, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

CHI *The Cultural Heritage of India*, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, 2nd edition, Calcutta.

G.O S *Gaekwad's Oriental Series*

HB-I *The History of Bengal*, Vol. I, ed. R. C. Majumdar, Dacca, 1963.

HIL *History of Indian Literature*, M. Winternitz, New Delhi, 1977.

HSL *A History of Sanskrit Literature*, S N. Dasgupta, Calcutta, 1962.

JASB *Journal of the Asiatic Society of Bengal*

JBORS *Journal of the Bihar and Orissa Research Society.*

Mitra-Cat *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal*, ed. Rajendralala Mitra

Shastri-Cat *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal*, ed. H. P Shastri.

পঞ্চম খণ্ড

বিষয় সূচি

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

অ ভি ভা ষ ণ

প রি শি ষ্ট

চিত্রসূচি

ভূমিকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ প্রকল্পের এই পঞ্চম ও শেষ খণ্ডে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) 'ভারত মহিলা' ও 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' বই দুখানি এবং ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা ও সংস্কৃত বাঙ্‌ময় বিষয়ে যাবতীয় প্রবন্ধ সংকলিত হল। পরিশিষ্টে রাখা হয়েছে 'স্যান্‌সক্রিট কালচার ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া' নিবন্ধ, ১৯২৮-এ লাহোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

২

১৯২৮-এ লাহোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ইণ্ডিয়ান ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে নিজের সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, ''I am a Sanskritist by heredity, training and profession, and I feel an instinctive love for everything connected with Sanskrit including Indology.'' (দ্র. এই বইয়ের পৃ. ৬৭৩)। সংস্কৃতবিদ্যায় বংশগত অধিকার নিয়ে শাস্ত্রীমশায়ের এই গৌরববোধের যথার্থতা মেনেও উল্লেখ করতে হয়, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো টোলে পড়া পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁর প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ (১৭০৭-১৮০৬) পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলা থেকে বাস তুলে এনে নৈহাটিতে বসতি করেন ১১৬৭ বঙ্গাব্দে (১৭৬০-৬১)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজে সমাজপতি হবার উদ্যোগে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমর্থন পাওয়ার পরিকল্পনায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এনে ব্রহ্মোত্তর জমি দান করে নিজের জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাণিক্য তর্কভূষণও এইভাবে নৈহাটিতে আসেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ভূসম্পত্তি দান করে টোল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দেন। হালিশহরের জমিদার সাবর্ণ সন্তোষ রায়চৌধুরীও তাঁকে

ভূমিদান করেন। মাণিক্য তর্কভূষণের প্রতিষ্ঠার আর-এক দিক ইংরেজ প্রশাসক ও বিদ্বজ্জনদের সংস্রব। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন ওয়ারেন হেস্টিংসের (রাজত্বকাল—১৭৭৪-৮৫) সঙ্গে মাণিক্য তর্কভূষণের পরিচয় ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বিচারপতি উইলিয়াম জোন্‌স (১৭৪৬-৯৪) তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, সুপ্রিম কোর্টের কাজে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যায় তিনি মাণিক্য তর্কভূষণের পরামর্শ নিতেন। বিনয়তোষ সামাজিক আচরণে মাণিক্য তর্কভূষণের উদারতার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। মাণিক্যর বাড়ির টোলের খ্যাতি ক্রমে ব্যাপ্ত হয়। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্র আসত, ফলে বাড়িতে তাঁকে দুটি টোল খুলতে হয়। মাণিক্যর ছেলে শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীনাথের ছেলে রামকমল ন্যায়রত্ন (১৮০১-৬১)। রামকমলের সময় পর্যন্ত মাণিক্য-প্রতিষ্ঠিত টোলের গৌরব অম্লান ছিল। হরপ্রসাদের বড়োদাদা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুকে (১৮৩৫-৬২) দেওয়া একটি প্রশংসা-লিপিতে রামমোহন রায়ের ছেলে রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭-৬২) লিখেছিলেন, ''আমার বিশ্বাস বর্তমানে এদেশের প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্বজ্জনদের অর্ধেকই তাঁর পূর্বপুরুষদের ছাত্র এবং তাঁর পিতা নিমন্ত্রণ না পেলে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমবেত পণ্ডিতসভাকে সম্পূর্ণ মনে করা হয় না।''[১]

নিতান্ত অল্পবয়সে শ্রীনাথের মৃত্যু হয় দস্যুদের হাতে, হরপ্রসাদের বাবা রামকমল তখন শিশু। তাঁকে মানুষ করেন জেঠামশায় সদাশিব তর্কপঞ্চানন। অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী রামকমল ক্রমে পূর্বভারতের পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্যের মর্যাদা পেলেন। তিনি বিয়ে করেন বাবার সহপাঠী রামমাণিক্য বিদ্যলংকারের মেয়ে চন্দ্রমণিকে। চন্দ্রমণি-রামকমলের সাতটি সন্তান; নন্দকুমার, দীনতারিণী, রঘুনাথ, যদুনাথ, হেমনাথ, হরপ্রসাদ, মেঘনাথ। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু তর্করত্নই এ বাড়ির টোলে পড়া শেষ পণ্ডিত। রঘুনাথ-হেমনাথ-মেঘনাথ— কেউই সংস্কৃত বিদ্যায় আকর্ষণ বোধ করেন নি, ইংরেজি ধরেছেন। রঘুনাথ কিছুদিন কবি মধুসূদন দত্তর কাছে 'লেখক'-এর কাজ করেন। নতুন ধরনের জীবিকার সন্ধানে রঘুনাথ-যদুনাথ-মেঘনাথ তিনজনই বাংলার বাইরে চলে যান।

বড়োভাই নন্দকুমার বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, মেধাবী পণ্ডিত নন্দকুমারকে ১৮৫৬-য় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে আনেন। তাঁর পরামর্শে নন্দকুমার ইংরেজি শেখেন, এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। বৈশেষিক দর্শন সম্পাদনায় নন্দকুমার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে সাহায্য করতেন। ১৮৬১-র গোড়ায় নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের কান্দিস্কুলের হেডপণ্ডিতের পদে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে বাবা রামকমলের মৃত্যুতে পরিবারটি বিপর্যয়ে পড়ল। মা এবং ভাইদের নন্দকুমার কান্দিতে নিয়ে এলেন। কান্দিতেই হরপ্রসাদের যথার্থ স্কুলশিক্ষার সূচনা। ১৯২৩-এ, সত্তর বৎসর বয়সে হরপ্রসাদ কান্দি গিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিরক্ষার সমারোহে যোগ দিতে। সেই সময়ে বাল্যস্মৃতি স্মরণে তিনি লিখেছেন,

"বাষট্টি বৎসর পূর্বে আমার দাদা ঁনন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু (১৮৩৫-৬২) কান্দির হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দির ইস্কুল অ্যাংলো সংস্কৃত

---

৪. Benoytosh bhattacharya, *Our Ancestry*, Borada 1943.

৫. সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ', কোলকাতা ১৯৭৮।

স্কুল ছিল। হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দির স্কুলেই হয়। আমরা প্রায় একবৎসর কান্দিতে ছিলাম। আমার তখন বয়স ৯ বৎসর ...।''

''ইস্কুলে আসিয়া অ্যাডমিশন রেজিস্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য, সেই নামেই আমার ভরতি হইতে হইয়াছিল। আমার ভাইয়েরাও সেই দিনে ভরতি হইয়াছিলেন।''

নাম শরৎনাথ থেকে হরপ্রসাদ হবার কারণ, মারাত্মক অসুস্থ হয়ে শিবের অর্থাৎ হরের প্রসাদে আরোগ্যের জন্যে নাম দেওয়া হয় হরপ্রসাদ।[২]

রামকমলের মতো প্রখ্যাত পণ্ডিতের ছেলেদের মধ্যে নন্দকুমার ভিন্ন আর কেউ টোলে গেলেন না, সকলেরই শিক্ষা শুরু হল ইংরেজ শাসন-প্রকল্পের অঙ্গ ইংরেজি ইস্কুলে।

ঘটনাটিতে একটি ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। রামকমলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির টোল উঠে যায়নি, অন্য পণ্ডিতরা চালাতেন। শাস্ত্রী পরিবারের প্রবীণদের স্মৃতিসূত্রে এই তথ্য জানা যায়। কিন্তু বাড়ির ছেলেরা সেই টোলের শিক্ষায় গেলেন না। ভাইদের নন্দকুমার নৈহাটির বাড়িতে রেখেই টোলে পড়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন নিশ্চয়। তিনি তা চাননি বলেই গোটা পরিবারকেই নিয়ে গেলেন কান্দিতে এবং ভাইদের ইস্কুলেই ভর্তি করলেন। হাওয়া যে ঘুরছিল নন্দকুমার নিশ্চয়ই তা অনুভব করেছিলেন এবং টোলের শিক্ষার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সংশয় থেকে এমন একটি সিদ্ধান্ত করলেন।

কান্দিতে পড়াশুনোর আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল নন্দকুমারের অকাল প্রয়াণে। ১৮৬২-র অক্টোবরে যক্ষা রোগে নন্দকুমারের মৃত্যুতে পরিবারটি চরম দুর্গতিতে পড়ল। সবাই নৈহাটিতে ফিরে এলেন। উপার্জন নেই, অভিভাবক নেই, এমন ছন্নছাড়া অবস্থায় হরপ্রসাদের লেখাপড়ার কী হচ্ছিল বিশেষ জানা যায় না। কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে, নৈহাটি ফিরে এসে বালকটি কিছুদিন কাঁটালপাড়ার কোনো টোলে যাতায়াত

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯০।

করতেন। কার টোল, কী পড়তেন সেখানে— সব অজ্ঞাত। এমন আতান্তরের দিনে পরিবারটির খানিকটা দেখাশুনো করতেন বিদ্যাসাগর। তিনিই হরপ্রসাদকে কোলকাতায় নিজের বাড়ির ছাত্রাবাসে নিয়ে আসেন। ১৮৬৬ সাল তখন, হরপ্রসাদকে সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। ছাত্রাবাসটি উঠে গেল। হরপ্রসাদ বৌবাজারে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন। ১৩/১৪ বছর বয়সের একটি ছেলে, ছাত্র পড়িয়ে নিজে রান্না করে খেয়ে কলেজ করছেন— এ গল্প তখনকার অনেক প্রসিদ্ধ মানুষেরই জীবনের কথা। এ যেন শক্তপোক্ত, স্থির-লক্ষ্য মানুষ হিশেবে নিজেকে গড়ে তোলার এক দুশ্চর সাধনা। ১৮৭৬-এ হরপ্রসাদ গ্রাজুয়েট হলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। এম.এ-র কোনো কোর্সও ছিল না। বি.এ. পাশ করার পরে কোনো বিষয়ে অনার্স নিয়ে একবছর পড়লেই এম.এ. ডিগ্রি দেওয়া হত। ১৮৭৭-এ হরপ্রসাদ সংস্কৃতে প্রথম হয়ে এম.এ. ও শাস্ত্রী উপাধি পেলেন। উল্লেখ করতে হবে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তখন সংস্কৃত ভিন্ন অন্য-সব বিষয় পড়তেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর সময়ের বি.এ. কোর্সের বিস্তৃত সিলেবাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ-চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় উদ্ধৃত আছে। (পৃ. [২৩-২৪])। পড়তে হত ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং গণিত। পাঠ্য থাকত বিভিন্ন বিষয়ের মূল বই। তখনকার মনস্বীদের বহুদর্শিতার বনেদ এইভাবে তৈরি হত। টোলের পণ্ডিত আর সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতে তাই বিস্তর ফারাক। মন-মানসিকতা, দৃষ্টি ভিন্ন হয়ে যাওয়া অনিবার্য ছিল এই শিক্ষায়। হরপ্রসাদ বংশগত পাণ্ডিত্যের গৌরব করলেও তাই বাপঠাকুর্দা থেকে তাঁর দৃষ্টিগত অবস্থান একবারেই ভিন্ন। তাঁর সংস্কৃত বাঙ্‌ময় চর্চার সমীক্ষায় এই সত্য মনে জাগিয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। মনে রাখতে হবে য়ুরোপীয় আলো হাওয়ার প্রভাবে আমাদের চৈতন্যে জেগে ওঠা নতুন আলো, নতুন নন্দনবোধ ও রুচি নিয়ে এক আত্মপ্রত্যয়ী মনস্বী প্রবেশ করছেন নিজস্ব রিক্‌থ, নিজস্ব ঐতিহ্যের বিশ্বে। মনীষার এই আধুনিক চারিত্রের জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

বিপুল রচনায় ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যার উন্মোচন আর পাঁচজন পণ্ডিতের কাজের সঙ্গে মেলে না, ভিন্ন তাৎপর্যের মর্যাদা পায়।

৩

আমাদের সংগ্রহে (বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রে) প্রাচ্যবিদ্যায় কৃতী য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রায় সত্তরখানি চিঠি আছে, ১৯০১ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে লেখা। লিখছেন সিসিল বেণ্ডল, য়ুলিসিস য়োলি, ভিলেম কালাণ্ড, লুই দ্য ভ্যালে পুসাঁ, ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ শ্চেরবাট্স্কোই, হারমান গেয়র্গ য়াকোবি, সিলভ্যাঁ লেভি, স্টেন কোনো, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, আর্থার অ্যান্টনি ম্যাকডোনেল, ফ্রেডরিক উইলিয়ম টমাস— এমন সব মনস্বী। সব চিঠিতেই মূল সুর— প্রার্থীর অনুনয়। সংস্কৃতবিদ্যায় নিজেদের চর্চার বিষয়ে এঁরা হরপ্রসাদের কাছে তথ্য চাইছেন, তথ্য যাচাই করে নিতে চাইছেন, কখনও-বা অনুমোদন চাইছেন। এই একটি মানুষের কাছে নিজের নিজের চর্চার এলাকায় দিক্‌পাল সব পণ্ডিতের এত অনুনয় কেন? একটিই কারণ, মূলত পুথিতে নিবদ্ধ ভারতবিদ্যার বিভিন্ন শাখার তথ্য-আকরের উপরে পরিপূর্ণ অধিকার পশ্চিম ভারতের রামগোপাল ভাণ্ডারকর ভিন্ন একমাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরই ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রর দেখানো পথ ধরে হরপ্রসাদ সারাজীবন সংস্কৃত পুথি নিয়ে কাজের ধারা চালিয়ে নিয়েছেন বিচিত্র পথে। তার সঙ্গে যোগ করেছেন বাংলা পুথি অনুসন্ধানের কাজ, অন্য প্রাদেশিক ভাষার লুপ্ত তথ্য উদ্ধারের কাজ, বিশেষ করে মৈথিলি এবং রাজস্থানের ভাট-চারণ-গন্ধালিদের পুথি নিয়ে কাজ। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত দশ হাজার সংস্কৃত পুথির ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ্ জ্ঞানচর্চায় এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। পাণ্ডিত্যের এই পর্যায়ের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, ইতিহাসের অনেক অন্ধকার পর্ব আলোকিত করে তুলেছেন নিজেরই আবিষ্কার করা প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশে। যেমন, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ কাব্য' বা বৌদ্ধ-ন্যায়ের ছয়টি পুথি।

পৃথিবীর যেখানেই ভারতবিদ্যাচর্চার আসন পাতা হোক, ব্যাপক মৌলিক উৎসবস্তুর অধিকারী এই মানুষটির সাহায্য ভিন্ন এগোনো সম্ভব ছিল না। তাই য়ুরোপের বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রের গবেষকদের এত অনুনয়।

পুথি নিয়ে কাজের একটা বড়ো দিক সাজানো-গোছানো, বিষয়ের বিবরণ নিখুঁতভাবে দেওয়া, কালনির্ণয়। এ কাজ হরপ্রসাদকে নিপুণভাবে করতেই হয়েছে, কিন্তু তাঁর অন্বেষণের দায় এই সীমাতেই থামে না। তিনি বুঝতে চান প্রাচীন বিদ্যার শিকড় এবং বিকাশের কার্যকারণ। বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সামাজিক প্রেক্ষাপট। বিদ্যার সমাজতত্ত্ব। এই আয়াসে তিনি যেন গুরু রাজেন্দ্রলাল মিত্রর শিক্ষাকে সৃজনশীলতার ভিন্ন স্তরে নিয়ে যান। তাঁর জিজ্ঞাসা, কেন একটা বিশেষ ধারার ব্যাকরণ দেশের একটা বিশেষ অঞ্চলে চর্চিত হয়েছে, সে চর্চার সামাজিক ও ধর্মবিশ্বাসগত সমর্থন কেনই-বা সেখানেই স্ফূর্ত হল। ক্যাটালগের ভূমিকায় এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও এইসব প্রশ্ন তোলেন, উত্তর খোঁজেন, ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সামাজিক-ইতিহাসের বোধে মার্জিত, আধুনিক মনের বিকিরণে উজ্জ্বল। হরপ্রসাদের সমস্ত কাজের মধ্যে থাকে ইতিহাসবোধের পোক্ত দাঁড়া। এশিয়াটিক সোসাইটির মতো আধুনিক বিদ্যাকেন্দ্রে সংস্কৃত চর্চার উদ্যমের পাশাপাশি অবশ্য টোলচতুষ্পাঠীর ঐতিহ্যবাহিত চর্চার ধারা তখনও— ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধেও বেশ প্রাণময় ছিল। ভাটপাড়া তখনও জাগ্রত, নবদ্বীপ ম্লান হয়ে এলেও ত্রিবেণী, হালিশহর তখনও বেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইংরেজ শাসনের একশো বছর পেরোনো সেই সময়েই বোঝা যাচ্ছিল টমাস ব্যাবিংটন মেকলের শিক্ষানীতির (১৮৩৫) ফলে টোলচতুষ্পাঠীতে অর্জিত বিদ্যার আর বৈষয়িক উপযোগিতা থাকছে না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের নির্ভর ছিল ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি। ১৮৩৩ নাগাদ আইন করে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করা হল। বাড়িতে ছাত্র রেখে টোল চালানোর সঙ্গতি গেল পণ্ডিতমশায়দের, ক্রমেই তাঁরা ছোটোখাটো জমিদার বা নতুন শহুরে ধনীদের পরিপোষণ-নির্ভর হয়ে পড়লেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেই এই দুর্দশার কথায় লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু-দিন পর্যন্ত

ভট্টাচার্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিকদিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদির [১৬৯৪-১৮০৭খৃ.] পর যে-সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন সকলেই জানেন যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট, তাহার পর আরো নিকৃষ্ট, তাহার পর আরো নিকৃষ্ট, শেষ এমনই দাঁড়াইল যে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের [১৮৬১ খৃ.] ভূমিকায় খ্যাতনামা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন [১৮০৬-৭২ খৃ.] মহাশয় বলিলেন, যে ভট্টাচার্যগণ চারি-পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় [১৮০৬-৮৫ খৃ.] বলেন যে আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্যদিগের ও সেইসঙ্গে সংস্কৃতচর্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।''[৩]

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতচর্চার পদ্ধতিগত রূপান্তর অনিবার্য ছিল। এই রূপান্তরিত চর্চার দুটি থাক। একদিকে যথাসম্ভব প্রাচীন জ্ঞানের আকর পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, শ্রেণীবদ্ধ বিষয়সূচি প্রণয়ন, ভালো সংস্কৃত না জানা জিজ্ঞাসুও যাতে সে বিদ্যার সঞ্চয় ব্যবহারের সুযোগ পায় সেজন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ প্রাসঙ্গিক তথ্য ও অনুবাদ সমন্বিত প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ। এ কাজে মূল গরজ ছিল সাহেবদের। উইলিয়াম জোন্স-এর পরম্পরায়। সোসাইটিতে একাজ সংগঠিত করেন মূলত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিলিওথেকা ইণ্ডিকা প্রকাশন প্রকল্পের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় ভারতবর্ষকে জানা বোঝার গরজ কত ব্যাপক। এই প্রকাশন প্রকল্পে সাহেবদের পাণ্ডিত্যের প্রচার সীমাহীন, কিন্তু, হরপ্রসাদ অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, কোনো বিদেশী ভারতবিদ্যাবিদ্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সাহায্য না নিয়ে কাজ করতে পারতেন না। সহকারী পণ্ডিতদের নাম কোথাও প্রায় উল্লেখ করাও হত না। একের পর এক রূবকারী (পাথরে লেখা), তামার পাতে লেখা আবিষ্কার হয়েছে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সেইসব মহামূল্য উপাদান পাঠোদ্ধারের কৃতিত্ব পান

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০০-৫০১।

সাহেবরা। হরপ্রসাদ খবর দিচ্ছেন,

''অনেকে মনে করেন, সাহেবেরা এ বিদ্যা (লিপির পাঠোদ্ধার) জানিতেন, আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়া লইতেন— দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মস্তিস্ক চালনা করাইয়া যে তাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। একটা কথা সম্প্রতি জানিয়াছি— অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইলসন সাহেব ও প্রিনসেপ সাহেবের শিলালেখগুলি প্রেমচাঁদ (চন্দ্র) তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন।''[৪]

এভাবে সংস্কৃতবিদ্যা ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে অনুকরণ করা হত বিলেতের আমদানি পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথডলজি। যে শিক্ষা কখনোই এই অগতির-গতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দেওয়া হত না। পণ্ডিত মশাইরা কিছু পয়সা পেতেন মাত্র। এ আক্ষেপও হরপ্রসাদের লেখাতেই পাই, বিশেষ করে লাহোর বক্তৃতাটিতে (পরিশিষ্ট দ্র.)।

হরপ্রসাদের আর-এক আক্ষেপ, ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই বলে যে-সাহেবরা বারবার তেরছা মন্তব্য করে গিয়েছেন, তাঁরা কখনো বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ইতিহাসের উপাদান উদ্ধারের কথা আদৌ ভাবেন নি। বলছেন,

''সংস্কৃত-সাহিত্যটা ভালো করিয়া সর্ব দিক থেকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা ভালো করিয়া পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে দুর্দশাটা হইয়াছে, সেটা হইত না।'' ১৯২৫-এ লেখা এই ''আমাদের ইতিহাস'' প্রবন্ধটিতে নিজেই যে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে মনে হবেই, সাহেবি সংস্কৃতচর্চার একটা বিকল্প পদ্ধতি-বিজ্ঞান তাঁর চেতনায় ছিল। দেখাচ্ছেন

---

৪. ''আমাদের ইতিহাস'', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৮-২৯। Horace Hayman Wilson (১৭৮৬-১৮৬০) এবং James Princep (১৭৯৯-১৮৪০)। প্রেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তর্কবাগীশ (১৮০৫-১৮৬৭), সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

অনেক শাস্ত্র আছে, যেমন, স্মৃতিশাস্ত্র, যা প্রমাণ ভিন্ন দাঁড়ায় না। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে কে কী লিখেছেন তার উল্লেখ করতে হয়, তাঁদের পরিচয় দিতে হয়। একে বলা হয় পূর্বপক্ষ করা। এই প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে পারম্পর্যের কাঠামো বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে স্থান কালের হিশাব পাওয়া যায় এবং সমাজ বিবর্তনের ধারাটাও ধরা যায়। বিষয়টিকে ভাষার দিক থেকে যাচাই করার পদ্ধতিও দেখান। যেমন, গৌতমের ধর্মশাস্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়— পাণিনি-সম্মত সংস্কৃতেও নয়। মাঝামাঝি একটা ভাষারীতিতে লেখা। তাহলে ভাষার দিক থেকেই গৌতম-ধর্মশাস্ত্রে প্রতিফলিত সামাজিক রীতিনীতি আচারবিচারের একটা কালপর্যায় চিহ্নিত করা যাচ্ছে। পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক ধরা হয়, গৌতম তার আগে। এমনি করে শাস্ত্রের বই, সাহিত্যের বই— এসবের ভিতরকার বিনুনি আলগা করে দেখার বিদ্যে কোনো কোনো প্রাচীন পণ্ডিতের কাজে দেখা যেত, যেটা দেশি পদ্ধতি, যা চাপা পড়ে গেল বিলিতি পদ্ধতির দাপটে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসব কথা ফিরে শুনলে আপসোস বেশ গাঢ়ই হয়। কারণ, অধুনা কোনো কোনো ঐতিহাসিক হারিয়ে যাওয়া, বিকশিত হতে না-পারা দেশি পড়াশুনোর পদ্ধতি-বিজ্ঞান খুঁজে বের করে কলোনির বিদ্যাচর্চার গ্লানি মোচন করতে মেধার শক্তি খাটাচ্ছেন। সংখ্যায় কম কিন্তু গুরুত্বে মর্যাদাপন্ন এই ঐতিহাসিকদের মাননা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রাপ্য।

৪

সংস্কৃত বাঙ্‌ময় ও ব্রাহ্মণ্য বিদ্যা নিয়ে হরপ্রসাদের রচনার জগতে প্রবেশের একটা তাৎপর্যময় নিশানা উপরের কথাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি নতুন টীকাটিপ্পনী রচনার দিকে গেলেন না। সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের বাঁধা রাস্তাটা পরিহার করলেন। কালিদাসে প্রবেশের জন্য মল্লিনাথের হাত ধরেই এগোতে হবে— এই পদ্ধতি তাঁর মন টানেনি। না টানারই কথা। নৈয়ায়িক টোলবাড়ির ছেলে হলেও তিনি তো

শেক্‌সপীয়র, মিলটন, বাইরন পড়া মানুষ, জন স্টুয়ার্ট মিল-এর রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট তাঁর সিলেবাসের পাঠ্য ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গেই পড়েছেন য়ুরোপীয় লজিক। ছাত্র বয়সেই সমাজবিদ্যার নানা শাখায় তাঁর শিক্ষার বনেদ রীতিমত পাকা হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতবিদ্যায় নিপুণ হরপ্রসাদ 'বঙ্গদর্শন'-এ অর্থনীতি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতেন। সংস্কৃতের পাশাপাশি য়ুরোপীয় বিদ্যায় মাজা মন কখনো টীকা প্রণেতাদের বশে যেতে পারে না। তার তো বশীভূত না হয়ে বিচারশীল হবারই কথা। বিচারশীল এবং রসজ্ঞ। এ ঠিক সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র-সম্মত রসবোধ নয়, ও বোধ নিয়ে 'গোল্ডেন ট্রেজারি'-তে (পাঠ্য ছিল) সংকলিত কবিতার মর্মে যাওয়া যায় না। এবং বলতে দ্বিধা করার কোনো কারণ নেই, একই রসবোধ নিয়ে তিনি যে কালিদাস-ভবভূতিও পড়েন তার প্রমাণ আমাদের এই সংগ্রহের প্রতিটি পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর সংস্কৃতসাহিত্য পাঠ বিশ্বসাহিত্যের পটে। প্রায়শ, ভিন্ন ভাষায় প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনাত্মক।

খুবই স্বাভাবিক, এই আধুনিক রুচির প্রাজ্ঞ মানুষটি ধর্মকর্মের ইতিহাস, শাস্ত্রীয় পুথিপত্র, বৈদিক-সাহিত্য, সংস্কৃত-সাহিত্য কোনো অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পড়বেন না, পড়বেন বিচারশীল ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে। নিজস্ব নন্দনবোধ নিয়ে। খুঁজবেন সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার, সমাজবন্ধনের বাস্তব। এ তাঁর ব্যক্তিগত পাঠ, অপর পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর বিচার, সিদ্ধান্ত আদৌ না মেলারই কথা। মিলতোও না। তাঁর সময়ে এবং পরেও বারবার হরপ্রসাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন, লাঞ্ছিতও হয়েছেন। এমন-কী তাঁর পরম আশ্রয়স্থল বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও প্রবল মতবিরোধ হয়েছে। ধমক খেয়েছেন কিন্তু নিজের কোট ছাড়েন নি। সে খুব আকর্ষণীয় বিবরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের লালনেই সাহিত্যের পথে প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও বঙ্কিমের হাত ছেড়ে সাহিত্যের বোধ ও বিচারে হয়ে উঠেছেন প্রাতিস্বিক।

৫

হিন্দুর আর্যত্ব বেদ নির্ভর। বেদ অপৌরুষেয়। আপৎকালে হিন্দু বেদ আঁকড়ে ধরে। হরপ্রসাদের যৌবনকালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৭-৮৩) এক প্রবল আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অভিঘাতে হিন্দুত্ব বিপর্যস্ত— এই বোধ নিয়ে দয়ানন্দ সংস্কার আন্দোলনে নামেন। ১৮৭৫-এ প্রতিষ্ঠা করেন আর্যসমাজ। শতসহস্র প্রতিমা পূজা আর নানান্ কুসংস্কারে বিকৃত হয়ে যাওয়া হিন্দুত্বকে তিনি বিশুদ্ধ বেদ সম্মত ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিলেন। তাঁর দশবিধ নীতির আধারশিলা ছিল ঈশ্বরকে সর্ববিধ জ্ঞানের উৎস এবং চার বেদকে সর্ববিধ জ্ঞানের আকর মানা।

ভারতের যাবতীয় দুর্দশা মোচনের জন্য বৈদিক-আর্য স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা আর্যসমাজ আন্দোলনের লক্ষ্য এবং বেদ অবশ্যই অপৌরুষেয়। দয়ানন্দ উত্তর ভারত জুড়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি ১৮৭৩-৭৪-এ কোলকাতায় আসেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কেশবচন্দ্র সেনরা তাঁর অভিমত অনুমোদন করেন নি। বেদ-বিহিত আর্যত্ব নিয়ে এই আন্দোলনের দিনে একেবারে বিস্ফোরক সমালোচনা-নিবন্ধ লিখলেন হরপ্রসাদ, ''বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা'' ('বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮৪ ব., ১৮৭৭খৃ.)। ''গোটাকত মোটা কথা'' বলবেন ভনিতা করে নিক্ষেপ করলেন মারাত্মক মোহমুদ্গর,

''বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তি সম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল, সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ— যে বেদ ব্যাখ্যা করিল, সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল সে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন, অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম, দিল্লিতে আমার শত্রুনিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়, লোকে মৃত্যুমুখ

হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোনো প্রমাণ দিতে হইলে 'বেদের বচন' বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার, বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। ...

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কী জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি যাহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন। পেলগ্রেভস্ গোল্ডেন ট্রেজারি অফ সংস এণ্ড লিরিকস (Palgrave's *The Golden Treasury of English Songs and Lyrical Poems*) হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই।'' (এই বইয়ের পৃ. ৫৭৭-৭৮)।

হিন্দু মৌলবাদী আন্দোলনে বেদের মহিমা প্রচারের সেই শোরগোলের মধ্যে এমন উক্তিতে প্রকাশ পায় অসীম সাহস, যার মূলে আছে বুদ্ধির মুক্তি, মনের আধুনিকতা। নিছক 'সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের থেকে তরুণ হরপ্রসাদ নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছেন। তিনি বেদ পড়তে চাইছেন সভ্যতার প্রত্যুষে প্রোক্ত মহৎ কাব্য হিশেবে। জাগতিক অভিজ্ঞতা মনে যে উপলব্ধি জাগিয়ে তুলেছে তারই ''সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান'' প্রকাশ বেদের সূক্তগুলি। ''সে ভাবপ্রকাশে চাতুরি নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই।'' কী করে এই মহৎ কাব্য ধর্মগ্রন্থ হয়ে উঠল তারও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চমৎকৃত হয়ে এই কবিরা ভাবতেন নিশ্চয় কোনো দৈবশক্তি তাঁদের দিয়ে এইরকম বাণী উচ্চারণ করিয়ে নিচ্ছে, এ নিজেদের রচনা নয়, কবিতাগুলি দেবতার নামে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রূপে ভিন্ন মর্যাদা পেল। কবিতা হয়ে উঠল মন্ত্র। ঋষি কবিরা রচয়িতা নয়, মন্ত্র দ্রষ্টা।

''ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই, উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়, এইরূপে কতকগুলি গান ধর্ম-পুস্তকরূপে পরিণত হইল।'' (এই বইয়ের পৃ. ৫৮১)।

হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য

করেছিলেন, ''ঋগ্‌বেদকে কি চক্ষে দেখিব? বহু পূর্বে, বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে (ইংরেজী ১৮৭৭ সালে) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' শীর্ষক এই প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মত প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় ৮৬ বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার এই প্রবন্ধের মূল্য বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক এমন কি আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের ও ভক্তিবাদের পুষ্পপত্রস্তূপের ভিতর হইতে মানব শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে যে সার্থক চেষ্টা করেন, ইহা তাঁহারই পর্য্যায়ের।''

প্রবন্ধটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে তার পরে বলছেন, ''মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঋগ্‌বেদকে কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক বলিয়া পল্‌গ্রেভ্‌স গোল্ডেন ট্রেজারি অফ সংস এণ্ড লিরিক্‌স্‌ ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উভয়ই এক পর্যায়ের পুস্তক; তবে ঋগ্‌বেদ হইতেছে হিমালয়, আর ঋগবেদের সমক্ষে 'গোল্ডেন ট্রেজারি' হইতেছে সামান্য একটি পাহাড় মাত্র। উভয় গ্রন্থের জাতি এক, আকার-প্রকার পৃথক।''[৫]

একটু ভিন্ন রকমের তথ্য এখানে দিয়ে রাখি। হরপ্রসাদের ভাইপো মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য (১৮৯৩-১৯৮১) যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তরা যাঁর ছাত্র, তিনি বলেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তর নামে প্রচলিত ঋগ্‌বেদের অনুবাদ মূলত ''জ্যাঠাবাবুর করা''। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ('ঋগ্বেদ সংহিতা'। ১৮৮৫) লিখেছিলেন,

''এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট

---

৫. 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' বঙ্গানুবাদ : রমেশচন্দ্র দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত, কোলকাতা ১৯৬৩, পৃ. ভূমিকা/৯, ১২।

সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সমূহে কৃতবিদ্য :- তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়া ও শাস্ত্রীয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎকার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।''[৬]

১৮৮২-তে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত কাজ 'দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অফ নেপাল' বইয়ের ১৬টি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা, ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ-সংস্কৃতর পাঠোদ্ধারের মতো দুরূহ কাজ করেছেন হরপ্রসাদ, আখ্যানগুলি লিখেছেন সরল ইংরেজিতে, আবার অন্যদিকে রমেশচন্দ্রের ঋগ্‌বেদের অনুবাদে নিবিষ্ট রয়েছেন, ১৮৮২-৮৫-তে হরপ্রসাদ মাত্রই ৩০-৩২ বৎসর বয়সের যুবা!

একদিকে বৈদিক সূক্তিগুলির সরল সবল কবিত্বে আদি সভ্যতার মানবিক উপলব্ধির তাৎপর্য উন্মোচন করছেন, অন্যদিকে ঋষি কবিদের ধ্যানধারণার শিকড় সন্ধানে বুঝতে চাইছেন বৈদিক সমাজের বাস্তব। সেই সামাজিক-ইতিহাসের সূত্র সন্ধানে, ভারতে আর্য বসতির পর্যায়গুলি ব্যাখ্যায় লেখেন, *Absorption of Vratyas* (ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুলেটিন -৬, ১৯২৬)[৭] এবং এই বইয়ে সংকলিত ''ব্রাত্য'' (১৩৩০ ব.) প্রবন্ধ।

৬

সংস্কৃত-সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য ও সারা ভারতে বিভিন্ন শাখার বিস্তার সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য শৃঙ্খলায় সাজানোর উদ্যম হরপ্রসাদের জীবনব্যাপ্ত

৬. আগের সূত্র, পৃ. ভূমিকা/৬০।

৭. Satyajit Chaudhury ed. *Lokayata and Vratya*, Naihati, 1982.

কাজের নজিরগুলিতে আমাদের সামনে রয়েছে। ডেসক্রিপটিভ্ ক্যাটালগের খণ্ডগুলি, আবিষ্কৃতগ্রন্থগুলির প্রামাণিক সংস্করণ দেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে মানতে হয় বয়স পঞ্চাশ না পেরোতে সংস্কৃত-বিদ্যার বিপুল সম্পদ সম্পর্কে তাঁর আয়ত্তগত জ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রস্তুতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনেকেই বলেছেন, এই ব্যাপক সন্ধান-সমীক্ষার মূলে উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত-সাহিত্যের একটি নতুন ইতিহাস রচনা। বিচ্ছিন্ন অনেক প্রবন্ধে, অভিভাষণে তেমন একটি ইতিহাস রচনার কাঠামো নিয়ে তাঁর ভাবনার পরিচয়ও খুব স্পষ্ট ধরা যায়। সংস্কৃত-সাহিত্যের কাল পারম্পর্য নিয়ে ভাবছেন, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করছেন, সাহিত্যের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই জিজ্ঞাসার দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় রচনা *Gazetteer Litereture in Sanskrit, Refutation of Max Mueller's Theory of Renaissance of Sanskrit Literature in 4th century A.D. after a lull of seven centuries from the time of the rise of Buddhism; Kalidasa - His Age; Kalidasa - chronology of his works and his learning.* কিংবা *Bird's Eye view of Samkhya Literature* পুস্তিকায় রচিত খসড়া। সঙ্গে পড়া যায় *Chronology of the Nyaya System, Chronology of the Sanskrit Literature*-এর মতো প্রবন্ধ। যদি হরপ্রসাদ সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস লিখতেন, সে ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কেমন হতো অনেকটা আঁচ করা যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ছয়টি বক্তৃতার সংকলন *Magadhan Literature* (১৯২০) বইটি থেকে। সুপরিকল্পিত এই ভাষণ ছয়টিতে আলোচনা করেন, কারা ছিল মগধের অধিবাসী, কীভাবে তক্ষশীলার গুরুত্ব ক্রমে কমে গিয়ে পাটলিপুত্র হয়ে উঠেছিল প্রধান নগরী, কেমনভাবে এই সংস্কৃতিকেন্দ্র মহিমা পেয়েছিল পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি, পতঞ্জলিদের বিদ্যাচর্চায়। কৌটিল্য ও বাৎস্যায়নের রচনা বিশ্লেষণ করে সমকালীন বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলটি উন্মোচন করছেন। এই সংহত কাজটিতে একটি স্থির

বিচারদৃষ্টির পরিচয় আছে। তাঁর মন অবান্তর আধ্যাত্মিকতায় উধাও হয় না। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে, মননচর্চার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দাঁড় করানো তাঁর আয়াস। এই দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য এবং তথ্যের বিন্যাসের তাৎপর্যে বইখানি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বরূপ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করলে সে ইতিহাস সমাজ-সংস্কৃতির বড়ো পটে বিন্যস্ত, তথ্য ও বিশ্লেষণের বুনোটে গভীর সাহিত্যবোধের আভায় অবশ্যই এক অনন্য সৃষ্টির মর্যাদা পেত। উইনটারনিজ বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-সুশীলকুমার দে-দের ইতিহাসে সামাজিক শিকড়টি পাই না। তথ্যের সমারোহ থাকে, থাকে না সমকালীন মননচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সাহিত্যের মূল্য বিচারের দৃষ্টি ও আধুনিক রুচি থেকে সাহিত্যমূল্য বিচারের সচেতনতা।

৭

সাহিত্যের ভুবনে তন্ময়তায় রুচির প্রশ্নটাই বড়ো। রুচির প্রকর্ষ আর তারই সঙ্গে সূক্ষ্ম বয়নের মতো মানবিক অভিজ্ঞতার শাখা প্রশাখা থেকে যাবতীয় আহরণ-সার বোনা হয়ে যায়। তাতেই সাহিত্য উপভোগের আধুনিক জমিনটি হয়ে ওঠে খাপি এবং আভাময়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ— এঁরা ঠিক প্রাচীন অলংকারিকদের রসবাদী ব্যাখ্যানের পথে সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ে প্রবেশ করেন নি। এঁদের উপভোগ, আস্বাদন কোনো বাঁধা ছকের মধ্যে ধরানো যায় না, পুরো খাপ খায় না। সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির উজ্জ্বল ব্যাখ্যায় এই আধুনিক মনস্বীদের পাঠ-পদ্ধতি প্রচলিত টীকা-টিপ্পনী অনুসরণের যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। স্মরণ করা উচিত আমাদের সাহিত্য-রুচির হাওয়া বদল হয়েছিল মধুসূদন থেকে। তিনি সাহিত্যতত্ত্বের কোনো প্রবন্ধ লেখেননি। কিন্তু তাঁর লেখা চিঠিপত্রে, বিশেষ করে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে সংস্কৃত-সাহিত্য এবং ইংরেজি

সমেত য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে বহু তুলনামূলক মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। এইসব মন্তব্য সাজিয়ে দেখলে উপলব্ধি হয়, সাহিত্য পাঠের আধুনিক রুচি আপন ভাষার সংকীর্ণ ঘের পেরিয়ে বিশ্বের পটে উত্তীর্ণ হতে উৎসুক। নিজস্ব ঐতিহ্যের শক্তি এবং দুর্বলতা যাচাই করে ঠিক নিরিখটি নির্ণয়ের জন্য তুলনামূলক বিচারে যেতেই হয়। সাহিত্যবিদ্যায় যাকে এখন কমপারেটিভ লিটারেচার বলা রীতি, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিদ্যার এই বিভাগকে বলেছিলেন বিশ্বসাহিত্য। ১৯০৭-এ লেখা ''বিশ্বসাহিত্য'' প্রবন্ধে ('সাহিত্য' বইয়ে সংকলিত) তাঁর সুস্পষ্ট নির্ণয় ছিল, গ্রাম্য সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত মনে বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে ''বিশ্বমানব''-কে, সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টাকে উপলব্ধি করার প্রস্তুতি ভিন্ন প্রকৃত সাহিত্যরুচির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

আধুনিক সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য মুক্ত মনের নতুন রুচিবোধ আশ্রিত সমালোচনা-সাহিত্যের প্রয়োজন নিয়ে ভাবনা চিন্তা ক্রমেই আমাদের নতুন যুগের সাহিত্যের জগতে জমাট হচ্ছিল। সংস্কৃতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, যিনি কালিদাসের রচনার খাঁটি ও প্রক্ষিপ্ত অংশ অভ্রান্তভাবে যাচাই করে দিয়েছিলেন, যে পাঠ বেঙ্গল রিসেন্‌শন নামে প্রামাণিক মানা হয়, তিনিও 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) বইয়ে সংস্কৃত কবিদের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আদিরস, করুণরস, শান্তরস বর্ণনায় তাঁরা যত নিপুণ, ''উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ়'' বর্ণনাতে ততটা নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রয়েছে) ইংরেজি সাহিত্যের সঞ্চয় বেশ বড়ো, বিশেষ করে তাঁর সমসাময়িক আধুনিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার বই বেশ চমকে দেয়। শেকস্‌পীয়র থেকে পরিগ্রহণ— অ্যাডাপ্‌টেশন 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯, 'কমেডি অফ এররস্' থেকে) গভীর চর্চারই নজির। এমনি করেই রুচির কালান্তর সূচিত হচ্ছিল তখন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে গোড়া থেকেই তুলনামূলক বিচারের রেওয়াজ তৈরি হয়ে উঠেছিল। ''সার্থক সাহিত্য সমালোচনায় স্বদেশিকতার স্থান নাই''— এই উক্তি

আদৌ অত্যুক্তি নয়।[৮]

আর এওতো ইতিহাসের সত্য, য়ুরোপের সুবাতাসেই বাংলায় এক নতুন সাহিত্যের জাগরণ হল। এই জাগরণের প্রধান সংগঠকের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশের বেশ আগে থেকে বঙ্কিম ইংরেজি প্রবন্ধে, বন্ধুজনদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে আভাস দিচ্ছিলেন, একটা বড়ো উদ্যোগে ঝাঁপ দেবেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল ''কৃতবিদ্যা'' অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা কেন তাঁদের অর্জিতবিদ্যার ও কল্পনাসন্ততি যাবতীয় বস্তু মাতৃভাষায় প্রকাশ করবেন না। বাংলাভাষাকে সর্ববিধ আধুনিক জ্ঞানের বিষয় ও উচ্চতম ধ্যান-কল্পনা প্রকাশের যোগ্য করে তোলার জন্য সংগঠিত উদ্যম তাঁর মনে হচ্ছিল অত্যন্ত জরুরি। এরই সঙ্গে তাঁর মনে হয়, কোনো সাহিত্যই সৃষ্টির পাশাপাশি সমালোচনার উঁচুমান ছাড়া পুষ্ট হতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যের নজির, সাহিত্যতত্ত্ব ও প্রয়োগ, দুইয়েরই নজির সামনেই ছিল। তাঁর স্পষ্ট উক্তি স্মরণীয়,

''We can hardly hope for a healthy and vigorous Bengali literature in the utter absence of anything like inteligent criticism.''[৯]

কোনো দায়সারা চুটকি মন্তব্যে বইয়ের সমালোচনা নয়, কী গুরুত্বে সাহিত্যের এই শাখাটির বিকাশ ঘটানো দরকার তার আদর্শ হিশাবে 'বঙ্গদর্শন'-এ দুটি লেখা স্মরণযোগ্য। ''উত্তরচরিত'' এবং ''শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা''। দীর্ঘ প্রবন্ধ ''উত্তরচরিত'', ভবভূতির কবিত্বের উৎকর্ষ ও দুর্বলতার পূর্ণাঙ্গ বিচারের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন,

'' ... অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচনা বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুন্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর

গ্রন্থসমালোচনা করা প্রথা, যে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচনা দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।''

নতুন করে প্রবন্ধটি পড়লে দুটি কথা বিশেষ করে মনে উঠবেই। ভবভূতির নাটকটি সমালোচনা করছেন একটি সুগঠিত সাহিত্যতত্ত্বের অবস্থান থেকে, প্রবন্ধের মধ্যেই সেই তত্ত্বগত অবস্থানটি অব্যর্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, ভবভূতির সৃজন-কল্পনার বৈশিষ্ট্য বিচার করছেন অপর শ্রেষ্ঠ রচনার প্রাসঙ্গিক তুলনামূলক বিচারের পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতেই এসেছে শেকস্‌পীয়র, বাল্মীকি, কালিদাসের প্রসঙ্গ। এসেছে দেশের এবং বিদেশের বড়ো পট।

''শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা'' প্রবন্ধটি তো সরাসরি তুলনামূলক সমালোচনার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই লেখা। অভিপ্রায়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নাট্যকল্পনার মিল এবং অমিল তুলনায় বিশদ করে তোলা। বেছে নিচ্ছেন দুই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কালিদাসের 'শকুন্তলা' আর শেকস্‌পীয়রের 'টেম্পেস্ট' ও 'ওথেলো'। তুলনা চরিত্র সৃষ্টির কৌশল ও নৈপুণ্য নিয়ে, তুলনা নাটকের গঠন নিয়ে এবং লক্ষ্য আবেদনের ভিন্নতা প্রতিপাদন। সব সাহিত্যের মধ্যেই যেমন ''দেশভেদে বা কালভেদে'' ''বাহ্যভেদ'' হয় তেমনি। ''মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে।'' এই 'বিশ্বত্ব'-র জন্যই বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে তুলনার প্রশ্ন ওঠে, তুলনায় সৃষ্টি-বিশেষের মর্ম বোধের মধ্যে যথার্থ ধরা দেয়। বঙ্কিম তুলনামূলক সাহিত্য বিচারে পারমিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। না হলে এমন অভিভূত করার মতো সিদ্ধান্তবাক্য কলমে আসিত না। ''শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব গঠন।'' চিত্র দ্বিমাত্রিক, চিত্র ইঙ্গিতময়; ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক, ''সম্পূর্ণ উন্মুক্ত''। তুলনায় বিচারকে মানবিক সৃজনের অপর শাখা, শিল্পকলার সমান্তরালে নিয়ে

গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় খুবই উঁচু পর্দায় সুর বেঁধেছিলেন। এই মাত্রা থেকে তরুণ হরপ্রসাদের সাহিত্যবোধের উন্মেষ-বিকাশ। 'বঙ্গদর্শন'-এর তরুণতম লেখক হিশেবে।

৮

নিছক পাণ্ডিত্যের পথ ছেড়ে হরপ্রসাদ সাহিত্যের স্বাশ্রয়ীমূল্য মেনে সংস্কৃত-সাহিত্য নিজের মতো করে পড়লেন— এর মূলে তাঁর দুজন শিক্ষকের প্রভাব ছিল। সংস্কৃত কলেজে হরপ্রসাদ বিখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের ছাত্র ছিলেন। পণ্ডিত মানুষ রামনারায়ণ, কিন্তু পুথি-নিবন্ধ-টীকা-টিপ্পনীর বাইরে তাঁর দৃষ্টি ও রুচি প্রসারিত ছিল— সমকালীন সামাজিক সমস্যা নিয়ে একের পর এক নাটক লেখায় তাঁর মনের প্রসার ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই 'নাটুকে রামনারায়ণ' তাঁর ছাত্রটির পাঠ-রুচিকে ভিন্ন পথে চালিয়ে দিয়েছিলেন। আর একজন ভিন্ন রুচির পণ্ডিত ভাটপাড়া নিবাসী জয়রাম ন্যায়ভূষণের কাছে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কাব্যে পাঠ নিতে যেতেন। (হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে ভুল করে এই পণ্ডিত মশায়ের নাম লিখেছেন শ্রীরাম শিরোমণি, রচনা সংগ্রহ-২, পৃ.১৯ ও ৩৬ দ্র.)। এঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রও 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা' পড়েছিলেন। হরপ্রসাদ পণ্ডিত ন্যায়ভূষণের অধ্যাপনা নিয়ে উচ্ছ্বাস করেই মন্তব্য করেছেন— কাব্য পড়াতে তিনি ব্যাকরণ বা ন্যায়ের ''কচকচি''-র মধ্যে যেতেন না, কাব্যসৌন্দর্য্য উন্মুক্ত করাতেই আনন্দ পেতেন। এইসব টুকরো খবর হরপ্রসাদের রুচি গঠনের তাৎপর্য বুঝতে কাজে আসে। (জয়রাম ন্যায়ভূষণ সম্পর্কে তথ্যের জন্য এই বইয়ের পৃ. ২৩১-এ প্রাসঙ্গিক তথ্য ৭ দ্র.)।

একেবারেই কাঁচা বয়সে হরপ্রসাদ একটা বড়ো মাপের কাজে হাত দিয়েছিলেন। মহারাজ হোলকার কেশবচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে সংস্কৃত কলেজ দেখতে এসে একটি পুরস্কার ঘোষণা করে যান। প্রাচীন সংস্কৃত-

সাহিত্যে প্রতিফলিত নারী চরিত্রের উচ্চ আদর্শ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে পুরস্কারটির জন্য। বি.এ. তৃতীয়বর্ষের ছাত্র হরপ্রসাদ লিখলেন দীর্ঘ নিবন্ধ ''ভারত মহিলা''। সংস্কৃত শাস্ত্র এবং কাব্যমন্থন করে লেখা এক বিশাল কাণ্ড। নিবন্ধটি পুরস্কার পেল। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই নিবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র আদর করে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপলেন। একুশ-বাইশ বছর বয়সে হরপ্রসাদ বঙ্কিমের হাতে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। তাঁর লেখাটির শেষের অংশ— যেখানে কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন ও বিশ্লেষণ আছে, সেই অংশ পড়ে বঙ্কিম বিস্মিত হন, সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনো করা কারো হাত থেকে অমন সহজ সরল লাবণ্যময় গদ্য অপ্রত্যাশিত। বঙ্কিমের মন্তব্যটি হরপ্রসাদ চিরদিন স্মরণে রেখেছিলেন, ''এসব কাঁচা সোনা''।

''ভারত মহিলা'' ১২৮২-র মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের পরে বই হয় ১২৮৭-তে। তিনটি সংস্করণ হয়েছিল। আমরা তৃতীয় সংস্করণের পাঠ নিয়েছি, পাঠান্তর দেখানো আছে। পত্রিকার পাঠ সংস্করণে সংস্করণে অনেক বদলেছে। এই পরিমার্জনা মিলিয়ে পড়লে ভাষা শিল্পী হরপ্রসাদের শৈলী-সচেতনতা ধরা যায়। সঙ্গে আরো ধরা যায় লেখাটির গোড়ার দিকের মতবাদের রক্ষণশীলতা শেষের দিকে কেমন একেবারেই কাটিয়ে উঠেছেন। প্রবীণ পরীক্ষকদের আকৃষ্ট করার জন্যেই প্রথম দিকটির ভাষা ও মতবাদে অমন গোঁড়ামি দেখিয়েছিলেন।

৯

'মেঘদূত ব্যাখ্যা' বইটি এবং সংস্কৃত বাঙ্‌ময় অংশে সংকলিত প্রবন্ধগুলির ভিতর জগতে যেতে যেতে কেবলই মনে হয়, ভারতবিদ্যা নিয়ে, সংস্কৃতবিদ্যা নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রাণান্ত মেহনেতের কি একটাই উদ্দেশ্য— কালিদাসের কল্পবিশ্বটিকে নিজের বোধের মধ্যে সমগ্রভাবে পাওয়া! যেন কালিদাসকে যথাযথ বুঝতে পারার ভিতর দিয়েই স্বদেশের রিক্‌থকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবেন। কাব্যের স্বদেশ শুধু নয়, সুপ্রাচীন এই সভ্যতার নৈতিক ভিত, ব্রহ্মাণ্ডবোধ, সমাজবাস্তবতা—

সমগ্র জীবন। সংস্কৃত-সাহিত্যে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো দিন কোথাও কোনো সংশয় ছিল না। কালিদাসচর্চাও চলে এসেছে আবহমান পরম্পরায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এই চর্চা কীভাবে চলে এসেছে। সেই ধারাবাহিক চর্চার একটা ধরন সহজেই অনুমান করা যায়, টীকাকারদের ব্যাখ্যা-সূত্রে কাব্যের তাৎপর্য বোঝা। কিন্তু এই চর্চা কী যথার্থ সকলকে কবিত্বের স্বাদ দিতে পারে? পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলের অধিগম্য ছিল? আধুনিক অর্থে কবিতার পাঠক বলতে যা আমরা বুঝি তেমনভাবে সংস্কৃতকাব্য, কালিদাস কি সকলের আস্বাদনের বস্তু ছিল! লোকসাহিত্যের সর্বত্রগামিতার সঙ্গে তুলনা না করেও মনে করা যায় অবশ্যই, যেভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক উপভোগ্যতা সম্ভব, সংস্কৃত কাব্য তেমনভাবে অবিশেষজ্ঞেরও উপভোগ্য ছিল না সম্ভবত। সংস্কৃত-সাহিত্যের পরম্পরা বিশেষজ্ঞ চর্চারই পরম্পরা। ব্যাকরণ-বিদ্যায়, অলংকার শাস্ত্রে খানিকটা পারদর্শিতা অর্জন ভিন্ন সংস্কৃত-সাহিত্যের মর্মবোধ অসাধ্য মনে করা হত।

আর-এক ভাবে সংস্কৃত-সাহিত্যের মহিমা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে সচেতনতা এসেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে য়ুরোপীয় গবেষক-মনীষীরা সংস্কৃতভাষায় আধৃত বিশাল সাহিত্যের জগৎটিতে প্রবেশ শুরু করেন। উইলিয়ম জোন্স, হোরেস হেম্যান উইলসনদের মতো জিজ্ঞাসু সংস্কৃতভাষা শিখে এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সহায়তা নিয়ে অনুবাদের মাধ্যমে য়ুরোপের সামনে এই ভারতীয় সৃষ্টির জগৎটি উন্মোচিত করলেন। এই উদ্যমের মূল প্রেরণা নিয়ে যে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরাই প্রশ্ন তোলেন তা নয়, 'মেঘদূত' অনুবাদ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিত্বের ব্রতে নিবিষ্ট কবিও বলেন,

"... সংস্কৃত ভাষার রচনাবলীর মধ্যে শ্বেতাঙ্গরা দেখেছেন— গ্রীক বা লাতিনের মতো কোনো সাহিত্য নয়, রসসৃষ্টি নয়— দেখেছেন ইতিহাস ইত্যাদির উপাদান, আর ভারতীয় মনের পরিচয় পেয়ে ভারতবাসীকে বশীভূত রাখার একটা সম্ভাব্য উপায়। ... ভারতীয় বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইংরেজ মাথা খাটান নি— হোক তা ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব,

স্থাপত্য, কৃষি বা ব্যাকরণ— যিনি মনে-মনে না জানতেন যে তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বলতে উনিশ শতকে যা বোঝাতো, সেই বিরাট দায়িত্বের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাও গ্রথিত ছিলো।

''ফলত পুরো ব্যাপারটা এক মৃদু, মোলায়েম ও পাণ্ডুবর্ণ বিবরণের আকার নেয় যা পাঠ করে কবির আনুমানিক কাল, কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য আমরা জানতে পারি, কিন্তু কাব্যটি কেমন, ভালো যদি হয় তো কোন ধরনের ভালো, বিদেশী কাব্যের এবং আধুনিক পাঠকের সঙ্গে সেটি কোন রকমের সম্পর্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— এইসব জরুরি বিষয় কিছুই জানতে পারি না। আমাদের প্রায় ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সংস্কৃত মৃত ভাষা হলেও তার সাহিত্য জীবন্ত, প্রায় বিশ্বাস করানো হয়েছে যে গ্রীক, চীন, লাটিন এবং সমস্ত দেশের আধুনিক সাহিত্যে যে-সহজ প্রাণস্পন্দন আমরা অনুভব করি, তা থেকে বঞ্চিত শুধু সংস্কৃত, পৃথিবীর মধ্যে শুধু সংস্কৃতই এক বিশাল ও শ্রদ্ধেয় শবে পরিণত হয়েছে, ব্যবচ্ছেদের প্রকরণ না-শিখে যার সন্মুখীন হওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে সংস্কৃত কবিতার যে বিচ্ছেদ ঘটেছে এই তার অন্যতম কারণ।''[১০]

এই অবলোকন অনেকটাই মান্য। তবুও আমরা মনে করতে পারি, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলায় তথ্য উদ্ধারের গরজে নয়, নতুন সাহিত্য-রুচির আগ্রহে, সাহিত্যের টানে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কীর্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার আকূতি জাগছিল। বেশ ধারাবাহিক অনুবাদের উদ্যোগও চলেছে, যার সবটাই তারাশঙ্কর তর্করত্নের (? -১৮৫৮) 'কাদম্বরী' অনুবাদটির মতো পুরো সংস্কৃত ছাঁদ বজায় রেখে বাংলা করা নয়। 'মেঘদূত' প্রসঙ্গে স্মরণ করতেই হবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ, একেবারেই বাংলা ভাষার মেজাজের মধ্যে কালিদাসকে আমন্ত্রণ করার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য। ১৭ বছর বয়সের তরুণ

১০. বুদ্ধদেব বসু, 'কালিদাসের মেঘদূত', কোলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৩-৪, ৬।

এই যে-চালে অনুবাদ করলেন,

শিখী যথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়,
তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রুনু রুনু বাজে তার বালা
স্মরিলে সেসব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলে ওঠে হৃদয়ের জ্বালা।

অনুবাদটি বই হয় ১৮৬০ সালে। মধুসূদন দত্ত এই কবিতা পড়ে বাংলায় ভালো কবিতা লেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। (এই বইয়ের ১২৫ পৃ. দ্র.)। বেশ মার্জিত সংযত আর-একটি বাংলা রূপান্তর ১৮৮২-তে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পদ্য অনুবাদ— 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যার সমালোচনা লেখেন হরপ্রসাদ (এই বইয়ে সংকলিত, ১৫৭-১৭৮ পৃ. দ্র.)। নিছক কবিতার আকর্ষণেই এমন অনুবাদের ধারা বয়ে এসেছে বলা যায়। ইতিহাস পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের আগ্রহে নয়।

আবার এও মান্য, একটি বড়ো মাপের সৃষ্টির পরিপূর্ণ আস্বাদনের জন্য সে রচনার সময়, ইতিহাসের সেই পর্বের পূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান, সৃষ্টিটির মহিমা, তাৎপর্য, নিহিত অন্তঃসার অবধারণের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। কালিদাসে প্রবেশের জন্য হরপ্রসাদের ব্যাপক প্রস্তুতির সঙ্গে তুলনীয় আর কারো উদ্যমের কথা জানা যায় না। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' বইয়ের বিজ্ঞাপনে লিখছেন এই মহাকবির রচনার সৌন্দর্য্য বোঝানোর জন্য,

''ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।''

কালিদাসের জগৎটি খুটিনাটি সমেত জানার আয়াস কেমন

হরপ্রসাদের একটি উল্লেখে বোঝা যাবে। 'ঋতুসংহার' কাব্যে শরতের বর্ণনায় আছে ''কঙ্কেলিপুষ্প-রুচিরা নবমালতী''। কঙ্কেলি-কে সবাই বলেন অশোকফুল। হরপ্রসাদের সন্দেহ শরতে তো অশোক ফোটার কথা নয়। মধ্যভারতে পায়ে হেঁটে শরতের ফুল খোঁজেন। চম্বল অঞ্চলে পেয়ে যান এই ফুলের গাছ, স্থানীয় নাম 'কঙ্কেড়', 'ল'-কে উচ্চারণ করে 'ড়'। বড়ো গাছ। শরতে সাদা গোল ফুল ফোটে অজস্র। মন ভরে গেল এই আবিষ্কারে। কালিদাস নির্ভুল নিসর্গ বর্ণনায়। কোথায় কুয়াশা ঢাকা পাহাড়, কোথায় কোন্ প্রবাহিণী— যেমন কালিদাস দেখিয়েছেন, শরীরের ক্লেশ উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে দুর্গম সব অঞ্চলে দেখে বেড়াচ্ছেন আর আশ্চর্য্য হচ্ছেন, এই কবি কেমন বাস্তব স্বদেশকে নিখুঁত ভাবে জানতেন! এমন কবিতা বোঝার গরজে এসব মেহনত, এমন করে কবিত্বের উৎসে যাওয়া— সবাই পারে না। হরপ্রসাদ পারেন। তাঁকে তো আমাদের ভিন্ন নজরে দেখতেই হবে, ভিন্ন মর্যাদা দিতেই হবে। আবার নিজের সমালোচনায়, বিশ্লেষণে বারবারই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, কালিদাস এই বিশ্বকে দর্পণে প্রতিফলিত করেন না, তিনি কখনো স্বভাববাদী নন, তিনি সমর্থ কল্পনায় এই বস্তুবিশ্বকে রূপান্তরিত করেন নিজের কাব্যবিশ্বে। অনুকরণ নয়, সৃজন করেন। কল্পনা সামর্থ্য ভিন্ন কবিতা হয় না— হরপ্রসাদের এই বোধটি প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় সমান উজ্জ্বল হয়ে ফোটে। কারণ, তাঁর আধুনিক মন শিল্প-সাহিত্যের স্বাশ্রয়ী মূল্যকে পরমতত্ত্ব মানে। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর জীবনে 'আনন্দমঠ'-'দেবীচৌধুরাণী'-'সীতারামে' যখন সাহিত্যকে দেশভক্তি আর হিন্দুধর্ম প্রচারের বাহন করলেন হরপ্রসাদ সাহস করে তাকে বলেন, ''চরম সৌন্দয্য, পরম সৌন্দর্য অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম, তাহাই পরম ধর্ম। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসকেই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। ... কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে overrule করিলেন''। (হ-র-সং-২, পৃ. ৩১)।

সাহিত্যতত্ত্বের টানাপোড়েন এবং নন্দনবোধের অবস্থানের কথা বারবারই মনে উঠবে হরপ্রসাদের বোধ-চৈতন্যের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে যে বাংলার নবীন সাহিত্য রুচি মূলত ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের প্রভাবে গঠিত হয়ে এসেছে বঙ্কিমপ্রসঙ্গে হরপ্রসাদই আমাদের এই প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেন। 'উত্তরচরিতের' সমালোচনায় বঙ্কিম সরাসরি বলেছিলেন, ''অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি নাই'' অলংকারশাস্ত্র একেবারে বিস্মৃত না হলে তাঁর সংস্কৃত-সাহিত্য সমালোচনা বোঝা যাবে না, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অবস্থান প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ ''বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'' (এই বইয়ের ২১৫-২৩২ পৃ.) প্রবন্ধে বলেন, ''অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু এদেশে চলিত কাব্যপরীক্ষা একেবারে ত্যাগ করিয়া ইউরোপের নতুন ধরনের পরীক্ষা আরম্ভ করেন।''

এই সূত্রেই হরপ্রসাদ সাহিত্যরুচি পরিবর্তন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন, ''নূতন ধরনের যে পরীক্ষা অষ্টাদশ শতকে জর্মানিতে আবির্ভূত হইয়া এখন সমস্ত ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের দেশেও আসিবার চেষ্টা করিতেছে ...''। বিচক্ষণ এই ইঙ্গিতে ধরিয়ে দিচ্ছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে কীভাবে ইউরোপের তখনকার আধুনিক সাহিত্যরুচি বাংলায় প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। অষ্টদশ শতাব্দীর জর্মান মনীষার উদ্যোগ-উদ্যম শিল্পসাহিত্যে ক্লাসিকাল-নিও-ক্লাসিকাল তত্ত্বের প্রভাব কাটিয়ে ব্যক্তিমানুষের উপলব্ধি কেন্দ্রিত রোমান্টিক-নন্দনতত্ত্ব-সাহিত্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হল। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ অনির্দেশ্যতার দিকে উন্মুখ, কারণ, তার চৈতন্যের শক্তি অভিজ্ঞতার অনুগামী নয়, অভিজ্ঞতা-পূর্ব, আ প্রাঅরাই (*a priori*)। ইমানুয়েল কান্ট থেকে চৈতন্যের বন্ধনমুক্তির এই তত্ত্ব বিকশিত হয়ে চলে হেগেল, শিলার, শ্লেগেলদের তাত্ত্বিক চিন্তাবাহিত হয়ে। ইতালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ছেয়ে যায় এই রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বে, সাহিত্যতত্ত্বে। বাংলায় এ প্রভাব এসেছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলারিজদের মাধ্যমে। কোলরিজ শেলিং থেকে জর্মান রোমান্টিকতার তত্ত্ব আত্মস্থ করে শুদ্ধ কল্পনা (*imagination*) ও

বিকল্পনার (*fancy*) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর কাব্যতত্ত্বে প্রতিভার আত্মাই হল সৃজন-কল্পনা। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র এই মানবিক সৃজন-কল্পনার মহিমা জানতেন।

একটি অজ্ঞাত তথ্য এখানে নিবেদন করি। বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র বই পত্র-পত্রিকা কাঁটালপাড়ার বাড়িতে আনাতেন কলকাতার বিখ্যাত থ্যাকার স্পিঙ্ক-এর দোকান থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কেনা বইয়ের রসিদ বঙ্কিম-ভবন আরকাইভে আছে। এই তালিকায় দেখা যায় হেগেল, শ্লেগেলের বইয়ের উল্লেখ। ছিন্নভিন্ন দশায় পড়ে থাকা কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে শ্লেগেলের 'লেকচারস অন শেক্সপীয়র' (খণ্ডিত), শিলারের নন্দনতত্ত্বের বই (খণ্ডিত)। পত্রিকার মধ্যে পাওয়া গেছে 'কন্‌টেমপোরারি রিভিয়্যু', 'ওয়েষ্টমিনিস্টার রিভিয়্যু'-র কিছু পৃষ্ঠা। সঞ্জীবচন্দ্র তো হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্‌সার পড়তেন সামারি করে। সুন্দর হাতের লেখায় সে সংক্ষিপ্তসারের নোটবই দেখে আশ্চর্য হতে হয়। য়ুরোপীয় তত্ত্বদর্শন নিয়ে অনুশীলনের ব্যপ্তি ও গভীরতার এই সাক্ষ্যগুলি গবেষকদের অগোচর রয়ে গেছে।

হরপ্রসাদ বঙ্কিমের মানসিকতার ঝোঁক নির্দেশ করতে গিয়ে নিজের অবস্থানটিও স্পষ্ট করেছেন। দেখাচ্ছেন বঙ্কিম যেভাবে ভারতীয় আলংকারিকদের উপেক্ষা করছেন তার একটা কারণ বঙ্কিমের সময়ে অলংকারশাস্ত্রের অধিকাংশ বই-ই ছাপা হয়নি, পুথিতে নিবদ্ধ ও দুস্প্রাপ্য ছিল। বলছেন, ''আমার এখন এই ধারণা হইয়াছে যে, নব্য আলংকারিকেরা পিঁজিয়া পিঁজিয়া যেখানে যে ছোটোবড়ো গুণটি, দোষটি, অলংকারটি ও রসটুকু থাকে, তাই দেখাইয়া দিতে খুব মজবুত।'' হরপ্রসাদ সম্ভবত কুন্তকের (আ. দশম শতকের মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতকের মধ্যভাগ, 'বক্রোক্তিজীবিত') মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনস্ক আলংকারিকের কথা ভেবে মন্তব্য করেছেন। তিনি নিজে ইউরোপীয় দৃষ্টির সঙ্গে আলংকারিকদের বিচারপদ্ধতি মিলিয়ে কাব্যবিচারের

পক্ষপাতী। 'যদি শুধু দেশী প্রথায় চল, কেবল ছোটো ছোটো জিনিস দেখিবে,— যদি শুধু ইউরোপীয় প্রথায় চল, কেবল বড়ো জিনিস দেখিবে, ছোটোর দিকে একেবারে দৃষ্টি থাকিবে না। সুতরাং দুয়ের একত্র মিলনই সকলের পক্ষে ভালো।'' হরপ্রসাদের সংস্কৃত-সাহিত্যপাঠে এই সমন্বিত দৃষ্টির প্রয়োগ কতটা সার্থক, লক্ষ করতে হবে। তাঁর পাঠ একান্ত ঘনিষ্ঠ পাঠ, একান্ত ব্যক্তিগত পাঠ। ঠিক এভাবে সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের মর্ম উন্মোচন আর-কারো লেখায় পাই না।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে হরপ্রসাদের অবলোকন জেনেও আর-একটি কথা বলতেই হয়। বঙ্কিমের সাহিত্য সমালোচনায় একটা দোটানা ছিল। একদিকে উপযোগিতাবাদী তত্ত্ব, অন্যদিকে রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের নিছক সৌন্দর্যস্পৃহা— দুই দিকে তাঁর টানের জন্যই সামাজিক উপযোগিতার, ধর্মতত্ত্বের দায় নিতে যান। এ নিয়ে 'আনন্দমঠ'-'দেবী চৌধুরাণী'-'সীতারাম' প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের সঙ্গে বঙ্কিমের মতান্তরের কথা আগেই বলেছি।

একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে শিল্প-সাহিত্যের কোনো বিচারে বিগত শতাব্দীর উত্তরার্ধ জুড়ে তোলপাড় করা তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ববিরোধের অভিজ্ঞতা মনে জাগা স্বাভাবিক। সমাজ বা শিল্পসাহিত্য সর্বত্রই 'আধিপত্যের' বিরুদ্ধে ব্যক্তির বুদ্ধিমুক্তি, রুচির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা নিয়ে বহুমুখী বিতর্কের সৃষ্টি আজকের পাঠকের মনে সজাগ থাকারই কথা। প্রথাগত পাঠের বাধ্যতা না মেনে কেউ যদি প্রসিদ্ধ কোনো 'টেক্‌স্ট' নতুন করে পাঠ করেন, নতুন 'স্বর' শোনা যদি যায়— আজ তাতে আপত্তি ওঠার কথা নয়।

হরপ্রসাদ অত সব না জেনেই নিজের বোধবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান নির্ভর করে ভেবেছিলেন, নিজের মতো করেই পড়া যাক কালিদাস-ভবভূতি। এই উন্মোচনে কাজে লেগে যাবে স্বদেশের নানা বিদ্যায় অর্জিত জ্ঞান, বিদেশী সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা, এমন-কী লোটাকম্বল নিয়ে কালিদাসের ভারতের পথে পথে ঘোরার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়। টেক্‌স্ট ভেঙে ভেঙে, তাঁর ভাষায় 'পিঁজিয়া পিঁজিয়া', কাব্যটির, নাটকটির ভিতর

জগৎ, গড়নের গ্রন্থিগুলি খুলেমেলে "সৌন্দর্যের স্বরূপটি" দেখালে নিছক সাহিত্য রুচির দিক থেকে সেকাল একালে একটা সেতু রচনা সম্ভব হতে পারে। এই অভিপ্রায়ে ১৯০২-০৩-এ 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' লিখে বড়ো আতান্তরে পড়েছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তদের মতো প্রভাবশালী মান্যজনেরা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ অশ্লীল বই লিখেছেন বলে এমন রব তুললেন যে চাকরি নিয়ে টানাটানি। সেসব তথ্য এই বইয়ের 'মেঘদূত ব্যাখ্যা'-য় পাওয়া যাবে। ক্ষোভে বাংলা লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ। আবার লিখতে তাঁকে রাজি করান চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২২ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ পর্যন্ত ২৭টি প্রবন্ধ লিখলেন— যা সংকলিত রইল এই বইয়ে "সংস্কৃত বাঙ্‌ময়" পর্যায়ে। সুখের বিষয়, এ পর্যায়ের লেখা নিয়ে রুচির প্রশ্নে ধিক্কার শোনা যায়নি। লেখার ধরন হরপ্রসাদ আদৌ বদলান নি। পাঠক রুচিও বদলায়। কিংবা বলা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের একজন প্রধান গদ্য-লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজস্ব পাঠক মণ্ডলী তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। শুধু 'নারায়ণ'-এ নয় এই সময়ে প্রায় সব সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা প্রকাশিত হত।

১০

একটি টেক্‌স্ট নিয়ে কত দিক থেকে কত ভাবে বিচার বিবেচনা করা যায়, কত সময় ধরে তার বিন্যাসের, গাঁথুনির গ্রন্থি সব খুলে খুলে 'বিনির্মাণে'-র পদ্ধতিতে সিদ্ধ প্রত্যয়ে পৌঁছনোর আয়াস করা যায়, তার এক চূড়ান্ত নজির হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'রঘুবংশ' পাঠ।

১২৯০-এর কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ হরপ্রসাদ 'রঘুবংশ' নিয়ে প্রথম লেখেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র আর সম্পাদক নন। কিন্তু তাঁরই পত্তন করা পত্রিকায় কী লেখা হচ্ছে-না-হচ্ছে নিশ্চয় খুঁটিয়ে দেখতেন। অস্বাক্ষরিত 'রঘুবংশ' প্রবন্ধ হরপ্রসাদের লেখা জানতে পেরে বঙ্কিম তাঁকে প্রচণ্ড তিরস্কার করে বলেন আর এমন লেখা লিখলে "তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে

হইবে।" "তুমি কি না বলো রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জানো কী?" (এই বইয়ে পৃ. ১৯৩-১৯৪, ৪১০ দ্র.) বঙ্কিমচন্দ্রের এত রাগের কারণ তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল,

"... কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—" ("বুড়ো বয়সের কথা", "কমলাকান্তের পত্র")।

হরপ্রসাদ 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস লিখে আগেও বঙ্কিমচন্দ্রের ধমক খেয়েছেন। যার ফলে উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শনে'-ই পড়ে ছিল, বই করেন তেত্রিশ বছর পরে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে, বঙ্কিমের প্রয়াণের অনেক পরে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস বিখ্যাত 'বেনের মেয়ে' ধারাবাহিক 'নারায়ণ' পত্রিকায় লেখেন ১৩২৫-২৬-এ। তখন তো শরৎচন্দ্রের যুগ। বঙ্কিমের অসন্তুষ্টিতে হরপ্রসাদের উপন্যাসিক প্রতিভা প্রতিহত হয়ে রইল। বাংলা কথা সাহিত্যের দিক থেকে ঘটনাটি শোচনীয়।[১১]

বঙ্কিমের রাগের মুখে হরপ্রসাদ চুপ করে গেলেন। তিনি বেঁচে থাকতে আর 'রঘুবংশ' নিয়ে লিখলেনও না, কিন্তু নিজের ধারণা পাকা করে তুলতে কতভাবে যে বোধবুদ্ধির শক্তি প্রয়োগ করেছেন এই বইয়েই সংকলিত "রঘুবংশের গাঁথুনি" (শ্রাবণ ১৩২৫) থেকে "রঘুবংশে প্রেম-বিরহ" (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)— নয়টি প্রবন্ধে তার নজির মিলবে। সাহিত্যের দীক্ষাগুরু, অভিভাবক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল শাসন-কর্তৃত্ব কেমন ছিল, আর আত্মপ্রত্যয়ী মেধাবী শিষ্য কী করে সে শাসন এড়াতেন— বাংলায় কালিদাসচর্চার কথা উঠলে এই টিপ্পনীটি মনে পড়বেই।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, সংস্কৃতবিদ্যার পণ্ডিতরাও অনেকে মনে করতেন 'রঘুবংশ' বিচ্ছিন্ন রচনার জোড়াতাড়া দেওয়া একটা জিনিস। সুপরিকল্পিত একটি সংহত রচনা নয় আদৌ। এমন-কী টোলের পণ্ডিতমশায়রাও

---

১১. সত্যজিৎ চৌধুরী, "প্রতিহত ঔপন্যাসিক প্রতিভা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী", 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ', কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৭১-৯০।

অনেকে এ কাব্যকে গুরুত্ব দিতেন না। উপেক্ষা করে বলতেন রঘুরপি কাব্যং ... তস্যাপি টীকা। বঙ্কিম জোর দিয়ে বললেন 'রঘু' একেবারেই কাঁচা হাতের লেখা এবং কালিদাসের কম বয়সের লেখা। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় অবশ্য 'রঘু' গোড়ার দিকের লেখা—বঙ্কিমের এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। উইন্‌টারনিৎস ধরেছেন 'রঘুবংশ' কুমারসম্ভবের পরে লেখা, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-সুশীলকুমার দে একই মত পোষণ করেন।

'রঘুবংশের' ''নির্মাণ কৌশল'' বা ''গাথুনি''টি নির্ণয় করার অধ্যাবসায়ে হরপ্রসাদ মূলত কালিদাসের কবিত্বশক্তির ক্রমিক উন্নততর বিকাশ, তাঁর প্রকাশশৈলীর অব্যর্থতা এবং সংযম লক্ষ করে এগিয়েছেন। সূর্যবংশের আখ্যান নিয়ে এত বিরাট একটি কাজে হাত দেওয়ায় সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকি ছিল বাল্মীকির পরবশ হয়ে যাওয়া। হরপ্রসাদ দেখিয়েছেন, বাল্মীকিকে কী কৌশলে পাশ কাটিয়ে কালিদাস এক মহৎ সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার এই রচনায় যা বিশদভাবে প্রতিপন্ন করলেন অনেক আগেই ১৯১৬-য় লেখা ''Chronology of his works and his learning'' প্রবন্ধে সে উপলব্ধি খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন,

"But The last and greatest work is the *Raghuvamsa* in which he describes the descend of the Godhead himself on earth. Here Kalidasa was strong enough to measure his Sword with the divine poet Valmiki. But he left him far behind. Valmiki's Rama, though divine, is a mere portrait without a background. Kalidasa gave him that background, but that is not all. Kalidasa's conception of God as the Creator and moral Governor of the world is much higher than that of Valmiki. God means to human imagination the absolute perfection of all the higher human faculties in a throughly cultured man and he makes his Rama the embodiment of all the perfections that human mind

could conceive. But in the background he keeps his ancestors and his successors who represent not all but one or two qualities in perfection. Dilip represents the perfection of obedience, Raghu of prowess, Aja of love, Dasaratha of kingly virtues and this ushers in Rama embodying the perfection of all the virtues represented in his ancestors.

This is the order in which Kalidasa's works were written, and this order showes the gradual development of his mind. From the fanciful appreciation of nature he rose by steps, well-marked and well-defined to the highest conception of Godhead and the highest conception of the relation in which man stands to his creator." (*JBORS*, 1916 part - II, p. - 4).

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে মহিমান্বিত মানবই ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হয়। তেমন পূর্ণ মানব রাম চরিত্রই 'রঘুবংশ' কাব্যের গ্রন্থন সূত্র, ''কোমল-মনোহর সুতায় গাঁথা।''

এই ''কোমলমনোহর সুতায় গাঁথার'' নির্ণয়টি ভিন্নভাবে সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদেরও মান্য হয়ে ওঠে। যেমন 'রঘুবংশে' একই মানবের নানা মাত্রা দেখেছেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,

"There is one pattern of life through most of these personalities. As we pass from one king to another, we feel as if the same character is being displayed from aspect to aspect, from one side to another. It appears that most of these characters could be combined and rolled up as if they delineated the same hero in different circumstances and perspectives." (*H.S.L.* p. 744).

দুঃখ রয়ে গেল, ''সূত্রটি ধরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না; দেখাইতে পারিলে তিনি

কি বলিতেন, তাহাও জানিবার কোন সুযোগ হইল না। (এই বইয়ের পৃ. ৪১৩ দ্র.)।

বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের সংস্কৃত বাঙ্ময় বিষয়ে লেখা পাশাপাশি রেখে পড়লে মনে হয়, বঙ্কিমের নয়, বিদ্যাসাগরের ইঙ্গিত অনুসরণ করে হরপ্রসাদ ওই ঐশ্বর্যময় সাহিত্যের বিশাল জগতে প্রবেশের পথ তৈরি করে নিয়েছেন।

১১

এ বইয়ে সংকলিত কালিদাসের দৃষ্টি ও সৃষ্টি উন্মোচনের বয়ানগুলি পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কালিদাসচর্চার কথা মনে জাগেই। 'নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদ ১৩২২-২৬ বঙ্গাব্দ, ১৯১৫-২০ খৃষ্টাব্দে মাসের পর মাস প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। তার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের ''মেঘদূত'', ''কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'', ''শকুন্তলা'', ''কাদম্বরীচিত্র'', ''কাব্যের উপেক্ষিতা'' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ছাটকাট করে 'গদ্যগ্রন্থাবলী'-র দ্বিতীয় সংকলন হিশেবে 'প্রাচীন সাহিত্য' নামে ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'বঙ্গদর্শন'-এর আমল থেকে রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের পাঠক ছিলেন। নানান্ সূত্রে আমরা জানি হরপ্রসাদও রবীন্দ্রনাথের রচনাধারার পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন— বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে রবীন্দ্র-নাথের অনেক বই সম্পর্কে মন্তব্য 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্যে সংকলন করে দেওয়া আছে। কালিদাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে হরপ্রসাদের অবলোকনের মিল-অমিল নিয়ে তো মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

আগে দেখেছি সমালোচনা পদ্ধতি নিয়ে হরপ্রসাদ কিছু কথা বলেছেন। য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে সাহিত্যের কোনো সৃষ্টিকে সমগ্রের তাৎপর্যে উপলব্ধি এবং ভারতের টীকাটিপ্পনী নির্ভর, অলংকারশাস্ত্র সম্মত পদ্ধতিতে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ— দুটি পৃথক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হরপ্রসাদ দুই পদ্ধতি মিলিয়ে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে নিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পড়তে চান?

'প্রাচীন সাহিত্য' বইয়ে সংকলিত ''শকুন্তলা'' প্রবন্ধের মূল পাঠের একটি পরিত্যক্ত অংশে তাঁর অভিপ্রেত পদ্ধতির কথা ছিল।

''সমালোচনা ব্যবসায়ের অনেক দোষ আছে। কবি যাহা সমগ্রভাবে দেখাইয়া থাকেন, সমালোচককে অনেক সময় তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইতে হয়। অথচ কাব্য সম্বন্ধে এই স্বতোবিরোধী কথাটি বলা যাইতে পারে যে, অংশের সমষ্টিই সমগ্র নহে। ভাল কাব্যে সমগ্রটি তাহার অংশ প্রত্যংশকে আচ্ছন্ন করিয়া— অন্তর্হিত করিয়া যেন একাকী বিরাজ করে। এই জন্য খণ্ড করিলে আসল জিনিসটিকে নষ্ট করা হয়। আমাদের সমালোচকেরা অনেক সময় নাটক নভেল হইতে তাহার নায়ক বা নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিয়া থাকেন। আসামীকে কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া যে বিচার, সে বিচার কাব্যের নহে। তাহা রাজার বিচার, শাস্ত্রের বিচার, জ্ঞানের বিচার বা ধর্ম্মনীতির বিচার হইতে পারে কিন্তু সাহিত্যের বিচার নহে। কাব্যের নায়িকা, কে লজ্জা বেশি করিয়াছে বা কম করিয়াছে, কে আত্মত্যাগ বেশি দেখাইয়াছে বা কম দেখাইয়াছে, কাহার মুখের কথাগুলি তুলিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের নীতিবোধ দুইখণ্ড সংকলিত হইতে পারে এবং কাহার কথায় কেবল একখণ্ডমাত্র হয়, এ সমস্ত আলোচনা অধিকাংশ স্থলেই অনর্থক। সমস্ত কাব্য তাহার দেশ-কাল-পাত্র লইয়া তাহার ব্যক্ত ও অনতিব্যক্ত ভাবে, ভঙ্গীতে ও ভাষায় যে কথা মুখ্যত ও গৌণত প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাকে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই তাহার যথার্থ রসগ্রহণ করা হয়। শ্রেষ্ঠকাব্য, বিশেষত নাটক, অন্তঃপুরবিশেষ,— সে আপনার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে বাহিরে আসিতে দেয় না।

''আমি ত শকুন্তলা সম্বন্ধে ইহাই বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকি। শকুন্তলার ছবিটি যে পটের উপর অঙ্কিত হইয়াছে, সে পট হইতে সেই চিত্রটিকে তুলিয়া লইবার চেষ্টামাত্র আমার মনে উদয় হয় না। ইহা আঠা দিয়া জোড়া নহে, ইহা বিচিত্র বর্ণের দ্বারা প্রতিফলিত। ইহাকে খুঁটিয়া তুলিলে ইহা কেবল রং, ইহাকে একত্রে দেখিলে ইহা ছবি।

''একত্রে যখন দেখি, তখন ইহার শান্তি, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা অনির্ব্বচনীয়ভাবে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে। তখন অন্য কোনো কাব্যের সহিত ইহার তুলনা করিবার প্রবৃত্তিই আমাদের মনে জন্মিতে পারে না। কিন্তু যখন একথা বলি যে, দেখা যাক শকুন্তলা ভাল কি মিরান্দা ভাল, তখন আমরা কাব্যের ধনকে কাব্যের অধিকার হইতে বাহির করিয়া আনি। কারণ, শকুন্তলা ত অভিজ্ঞানশকুন্তল— কাব্য নহে, সে ত কাব্যের উপাদানমাত্র। স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে তাহার ভালমন্দের আদর্শও স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যের ভিতরে তাহার যে শ্রেষ্ঠত্ব, কাব্যের বাহিরে তাহার সে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?'' ('বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩০৯, পৃ. ২৭৫-২৭৬)।

''কাব্যের উপেক্ষিতা'' ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের অন্য লেখা কয়েকটি যথার্থই সমগ্র পাঠের নজির। বিশেষ করে ''কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'' এবং ''শকুন্তলা'' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ এক মহৎ জীবনাদর্শের আশ্রয়তত্ত্ব হিশেবে তপোবনের ধারণা ''আবিষ্কার'' করেছেন। এ তো তাঁর নিজস্ব বর্তমানের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে এক দূরতর আদর্শলোকের সন্ধান। কালিদাসের সমকালীন ইতিহাসেও দ্বন্দ্ববিরোধের উত্তালতা ছিল মনে করে ''কাদম্বরী চিত্র'' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, ''বিক্রমাদিত্যের সময় শকহুণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন নায়ক ছিলেন।'' তাঁর আরো ধারণা, রাজশক্তি তখন বিলাসপরায়ণ, অদূরদর্শী হওয়ায় শাসন-সংহতি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কালিদাস তাঁর প্রধান রচনায় যে তপোবনের পরিপ্রেক্ষিত এনেছেন— সমকালের বাস্তবে তার অস্তিত্ব ছিল না। কালিদাসের পক্ষেও তপোবনের সংযমময় শুদ্ধাচারী জীবনাদর্শ সুদূরের বস্তু। সমকালের আশঙ্কা-ব্যাকুলতা-পীড়িত কবি বিকল্পের সন্ধানে তপোবনের ভাবাদর্শ উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। বৌদ্ধ-উত্তর ব্রাহ্মণ্য-বিধি নিয়ন্ত্রিত সমাজের ভাবাদর্শ কালিদাসের রচনায় মহিমান্বিত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখায় যেমন, তেমনই 'চৈতালি' কাব্যের

অনেক কবিতায় এই কথা বার বার বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কালিদাস পাঠে দুই মাত্রা। একদিকে তাঁর তীব্র পরিশুদ্ধ রোমান্টিক কল্পনায় ভরপুর কবিসত্ত্ব (পারসোনা) বারবার 'মেঘদূত'-কে আশ্রয় করে 'বিপুল সুদূরে' উধাও হয়ে যায়, অন্যদিকে সমকালীন অভিজ্ঞতার চাপে কালিদাসেই সন্ধান করেন এক শুদ্ধ সংযত জীবনাদর্শ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্যই এভাবে কালিদাস পড়েন না। তাঁর বিনির্মাণে কালিদাসের সৃজিত বিশ্বটি টেক্স্ট বা পাঠবস্তু ভেঙে ভেঙে অভ্যন্তর বাস্তবটিকে উন্মোচন করে দেখতে চান। বৌদ্ধ-উত্তর ব্রাহ্মণ্য ভারতের কথা হরপ্রসাদের বয়ানেও আসে, কিন্তু আসে কালিদাসের বিশ্বাসের জগৎটি স্পষ্ট করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্তমানের নিরাশ্রয়তা উত্তীর্ণ হওয়ার এক জীবনাদর্শ খুঁজছেন কালিদাসে, তাঁর কর্মপ্রেরণার দায়বোধ থেকে এক ভাবাদর্শ পাচ্ছেন কালিদাসে যা শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রয়োগ-পরীক্ষায়ও নিবিষ্ট হচ্ছেন। এ অন্য এক সমুন্নত উপলব্ধির স্তর যা অবশ্য হরপ্রসাদের পাঠের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তুলনীয় নয়, তবুও তুলনাটা মনে ওঠেই।

১২

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত ''কালিদাস ও শেক্ষপীয়র'' কালিদাস বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম লেখা। (বৈশাখ, ১২৮৫)। লেখাটি শুরু করেছেন এইভাবে, ''পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড়ো ভালোবাসেন। সেইজন্য আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়র এই দুইজন বড়ো কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি।'' কারা এই পাঠক? কোন্ পাঠক সমাজকে মনে রেখে হরপ্রসাদ সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের জগৎটি উন্মোচন করতে উদ্যোগ আয়োজন করেছেন জানতে আমাদের আগ্রহ হয়। এই পাঠকসমাজ টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসা বা পাঠশালায় পড়া পড়ুয়া নয়। বৃটিশ প্রশাসনের ছকের মধ্যে গড়ে ওঠা স্কুল-কলেজে শিক্ষা পাওয়া নব্য শিক্ষিত-সমাজ। এদের রুচির বনেদ তৈরি হয়, হরপ্রসাদের নিজের বয়ানে, ''... ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি

রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সন্মুখে বিস্তারিত হইল। চসার, স্পেনসার, শেক্স্পীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, শেলি, বায়রন, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, টেনিসন; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টী, বাল্মীকি, বেদব্যাস, বেদপুরাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি; এডিসন, গোল্ডস্মিথ, স্কট, লিটন, ডিকুয়েন্সি, থ্যাকারে; দণ্ডী, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্মা; হুতোম, দীনবন্ধু বঙ্কিম ...''— এই ত্রিধারায় পলিতে গঠিত হয় নতুন বাংলার সাহিত্যরুচি। (''বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'', হ-র-সং-২, পৃ. ৪৭৫)। ''এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ'' এবং ক্রমে ক্রমে গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়ায় যাদের সাহিত্যরুচি পেকে উঠত, তারাই হরপ্রসাদের অভিপ্রেত পাঠক।

হামেশাই বলা হয় হরপ্রসাদ কালিদাসে আবিষ্ট, কালিদাসের গোঁড়া। এই বইয়ে সংকলিত কালিদাস-সমালোচনা কালিদাসে তাঁর অসামান্য অভিনিবেশ প্রতিপন্ন করে অবশ্যই, কিন্তু কখনোই মোহগ্রস্ত মনে হয় না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের পাশে কালিদাসের জায়গা নিয়ে তাঁর সংশয় নেই, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির অমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও কালিদাসের সীমাবদ্ধতা নির্দেশে হরপ্রসাদ কুণ্ঠা বোধ করেন না। যে পাঠকসমাজের উদ্দেশ্যে তিনি সমালোচনার বয়ানগুলি ধরে দিচ্ছেন তাঁদের বহুদর্শিতায় তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং ফাঁকা কথায় তাঁদের মাতিয়ে দেওয়া আদৌ তাঁর অভিপ্রায় নয়। তাই সুস্থির বিচারদৃষ্টি সজাগ রেখে তিনি কালিদাস পাঠ করেন।

রূপান্তরিত সাহিত্যরুচির নিরিখে হরপ্রসাদ নাটকের আঙ্গিকে অকুণ্ঠভাবে কালিদাসের চেয়ে শেকস্পীয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। কালিদাসের কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্য রূপান্তরিত হয়ে 'মেঘদূত', 'রঘুবংশে' বিশ্বসাহিত্যের চিরসম্পদে পরিণত, সে-যেন-বা এক নতুন বিশ্বের সৃজন। তুলনায় হরপ্রসাদের মনে হয়, সাহিত্যের আরেক উপাদান যে মানব-চরিত্র, ''তার উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, আহম্মুখতা, চিন্তাপ্রিয়তা'' কালিদাস তেমন আয়ত্তে আনতে পারেন না। এই জগৎটি ''বর্ণনে তিনি শেক্ষপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ।'' হরপ্রসাদ এমনো ভাবেন, মানবপ্রকৃতির যে বহুমাত্রিক জটিলতা নিয়ে য়ুরোপীয়

সাহিত্যে অসাধারণ নাট্যরূপ সৃষ্টি হয়েছে, সংস্কৃত নাটকে তার তুল্য কাজ হয়নি। সংস্কৃত নাটক য়ুরোপীয় আদর্শে নাটকই নয়, দৃশ্যকাব্য মাত্র। আঙ্গিকে আলাদা, গোত্রেও আলাদা। কথাটা তাঁর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে। প্রকৃতিতে মানুষের কোমল বৃত্তিতে জড়িয়ে যে ''মোহিনীময় ভাব''— সেই মানব বৃত্তির কারুকৃতিতে কালিদাসের হাতের কাজ অতুলনীয়। এক ভালোবাসার বৃত্তিরই কত যে বৈচিত্র্য কালিদাসে। শুধু দুষ্মন্ত-শকুন্তলা নয়, অনসূয়া-শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা-শকুন্তলা, গোতমী-শকুন্তলা এমন-কী কণ্ব-শকুন্তলায়ও সেই হৃদয়বৃত্তির নানান সূক্ষ্ম মাত্রা। হৃদয়বৃত্তি মানেই শৃঙ্গার নয়, তার নানা করুণ-মধুর, চাতুর্যময় বা উদাসীন কত রূপ! হরপ্রসাদ দেখান, এমন মাধুর্যের মোহিনী শেকস্‌পীয়রেও আছে। কিন্তু কালিদাসে মানবিক বৃত্তির উদ্দমতা জটিল কুটিল বুনোট, সর্বনাশা প্রবৃত্তির ট্র্যাজিক মহিমা ফোটানো কালিদাসের সাধ্যে কুলোয় না। শেকস্‌পীয়রের জগতে মিরন্দা দেস্‌দিমোনা আছে, প্রস্পেরো আছে, এমন চরিত্র কালিদাসের হাতেও আসতে পারে। কিন্তু একটি ক্লিওপেট্রা বা লেডি ম্যাকবেথ কিংবা ওথেলো বা ম্যাকবেথ কালিদাসের সাধ্যে নেই। আমরা বুঝতে পারি য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক অসীম শক্তির দিক, যা মানুষের পাপবৃত্তি বা ভাবাবেগের আত্মধ্বংসী প্রবলতাকেও সাহিত্যের সৃজন-শৃঙ্খলার মধ্যে ট্র্যাজিক মহিমা দিয়েছে— এই ভয় বিস্ময়ে মেশা সৌন্দর্য আস্বাদনের ক্ষমতা সেকালের সাহিত্যরুচিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বাংলায় সে ট্র্যাজিক মহিমার সাহিত্যরূপের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। এই কারণেই হরপ্রসাদ তখনকার যুবসমাজের সাহিত্যরুচির মূল্যায়নে ''বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে উজ্জ্বল আসনে বসিয়েছিলেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনায় 'নাট্যকলা' কথাটা হরপ্রসাদও ব্যবহার করেন, কিন্তু খুব সচেতন ভাবেই সংস্কৃত নাটককে য়ুরোপীয় ড্রামাটিক আর্ট থেকে পৃথক ধরে নিয়ে কথা বলেন। 'দৃশ্যকাব্য' সংজ্ঞার্থটিই সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে ঠিক। তবু আখ্যানটিকে তো দৃশ্য করে তুলতে হয়, মঞ্চায়নের তো দায় থাকে। কাহিনী গড়ে তুলতে

হয় চরিত্রের টানাপোড়েনে। তাই অনেক-কটি প্রবন্ধে হরপ্রসাদ এই উপস্থাপনার কৃতকৌশল, চরিত্রায়ণের দক্ষতা ও দুর্বলতার কথা, তারই ভাষায় ''পিঁজে পিঁজে'' দেখিয়েছেন। এই পদ্ধতি ঠিক টীকাকারদের পদ্ধতি নয়। এখানেও হরপ্রসাদ তাঁর য়ুরোপীয় সাহিত্যের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন। একে বলতে হবে নতুন রুচির পাঠ, নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ।

নাটকের আখ্যানটির ভিতর-বাহিরের গাঁথুনি কীভাবে দৃশ্য হয়ে ওঠে মঞ্চে, কালিদাস কেমন করে চরিত্রের মুখে ছোটোছোটো সংলাপ বসিয়ে ''নাট্যক্রিয়া'' আর চরিত্ররূপ উন্মোচন করেন, দেখাবার জন্য হরপ্রসাদ প্রায়ই গুরুত্ব দিয়েছেন গৌণ সব চরিত্রের উপরে। যেমন শকুন্তলা নাটকের কণ্ব চরিত্রটির উপরে নানা দিক থেকে আলো ফেলছেন। মহাভারতের আখ্যানটুকু নাটকে আনতে কণ্বকে ফোটাতে গিয়ে পাঁচটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করতে হল, ''শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তাঁহার কঠোরতা ও সংযমের প্রতিমূর্তি, আর অনসূয়া, গোতমী ও প্রিয়ংবদা তাঁহার স্নেহের মায়ার প্রতিমূর্তি।'' (এই বইয়ের পৃ. ৩১৭ দ্র.)। কণ্বকে মঞ্চে আনার দরকারই হয় না, পাঁচটি চরিত্রই শকুন্তলাকে ঘিরে থাকে, ফুটিয়ে তোলে, আবার গল্পটুকুকেও বুনে তোলে। চরিত্রগুলি সব এক নয়, স্বভাবে আলাদা। অনসূয়া ''শান্ত, সরল, ধীর, বেশ বিজ্ঞ ... শকুন্তলা তন্ময়।'' আর প্রিয়ংবদা ''বড়ো চালাক, চতুর, চঞ্চল, বড়ো রহস্যপ্রিয়, সুবিধা পাইলে কাহাকেও ছাড়েন না।'' তবুও কখনো কখনো দুই সখী এক স্বরেই যেন কথা বলে, তাই,''কালিদাস অনেক জায়গায় স্টেজ ডিরেকশন্ দিয়েছেন। সখৌ একেবারে দ্বিবচনে। ঐক্যে এবং বৈচিত্র্যে কেমন চমৎকারিত্ব ফোটে এমনি করে দেখান হরপ্রসাদ। কণ্বের আরেক করুণামূর্তি তাহার ভগিনী গোতমী'' (পৃ. ৩২২, ৩২৮)। শার্ঙ্গরব আর শারদ্বত মানুষ দুটি কেমন? নামকরণেই দু-জনের স্বভাবের ধরতাই মেলে। শার্ঙ্গ হল মোষের শিঙে তৈরি ধনুক, টানা কঠিন, টং টং করে বাজে। ''আমাদের শার্ঙ্গরবের স্বর বা রবও তেমনই কর্কশ, তাহার বোল বেশ কাটা কাটা।'' শরৎ শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় করিয়া

শারদ্বত শব্দ হয়; শরৎকালের মতো গম্ভীর পরিষ্কার। ''তিনি গম্ভীর অথচ পরিষ্কার, কথা খুব কম কহেন। কিন্তু যা কহেন তা একেবারে কাটা-ছাঁটা। তাহার উপর আর কাহারো কথা চলে না।'' এই দুটি দুই স্বভাবের তাপসের চরিত্রের সূত্রেই দুষ্মন্তের রাজসভার দৃশ্যটির জমাট ব্যাখ্যা করেন হরপ্রসাদ।

এখানে উল্লেখ করতে হয় 'কণ্বের কঠোর মূর্তি' প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথকে একটু ঠেস দিয়ে বলেছেন, ''ইহাকে যদি উপেক্ষিতা বলা হয়, তাহা হইলে জগতের সকলেই উপেক্ষিতা নয় কি?'' (পৃ. ৩৩৯)।

কালিদাস-ভবভূতির কবিত্ব নিয়ে সংকলিত এই রচনাধারায় অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে ঘনিষ্ঠ পাঠের অজস্র খুঁটিনাটি ইঙ্গিতময় প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে, সংলাপ নিয়ে, ঘটনার বাঁক ফেরা নিয়ে, কোনো চরিত্রের, বিশেষ করে নজর এড়িয়ে যায় এমন গৌণ-সব চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে নিরন্তর মন্তব্য করে চলেছেন। এই পদ্ধতিতেই স্পষ্ট করে তুলেছেন রচনাটির শক্তি ও দুর্বলতা। এমন-কিছু ইঙ্গিতময় বোধদীপ্ত টিপ্পনী উল্লেখ করি এখানে।

'বিক্রমোর্ব্বশীয়'-কে হরপ্রসাদ খুব পাকা লেখা মনে করেন না। কিন্তু এমন রচনাতেও কত যে শিল্পিত উল্লেখ, মুগ্ধ হবার মতো কাজ!

''... এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে একটি ভূই-চাঁপা ফুল রাজার চোখে পড়িয়া গেল, তাহার বোধ হইল যেন, তাঁহার 'ভালোবাসার' চোখটি দেখিতে পাইলেন। রাগে যেন উর্বশীর চোখে জল আসিয়াছে, আর চোখের কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ভূই-চাঁপার পাপড়িগুলি একটু লালচে হয়, আর বর্ষায় তাহার ভিতরে জল থাকে। ভূই-চাঁপা দেখিয়া রাজা অধীর হইয়া উঠিলেন,—।'' (এই বইয়ের পৃ. ২৯৯ দ্র.)।

কালিদাস বা সংস্কৃত-সাহিত্যের বিষয় নিয়ে লিখতে গেলেই আমাদের লেখকদের, রবীন্দ্রনাথেরও, ভাষার শৈলী সাধারণ বাংলার স্তর থেকে উঁচুতে উঠে যায়। উঁচু সুরে বাঁধা হয়। ঝোঁক যায় অলংকরণের দিকে। এক হরপ্রসাদেই দেখি বিপরীত ঝোঁক। সম্ভ্রমের সুদূরতা থেকে চিরায়ত বা ক্লাসিককে তিনি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিকের স্তরে

নামিয়ে আনেন। যেমন, ''উর্বশীবিদায়'' প্রবন্ধের শুরুর অনুচ্ছেদে আমরা পড়ি,

''... ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভরা যমুনাও পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে এ দুইয়ের মিলন হইয়াছে, সেই একটি সাততলা প্রকাণ্ড সাদা মারবেলের রাজবাড়ি— এমন পালিশ করা যে দিন রাত যেন চক্-চক্ করিতেছে— ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেই সাততলা বাড়িটাই আজ আমাদের বর্ণনার বিষয়। আজ আকাশে মেঘ নাই, পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদ পূবদিক হইতে উঠিতেছে আর যেন নির্জলা দুধের মতো সাদা আলোয় পৃথিবীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভরা গঙ্গার সাদা জলের উপর দুধ ঢালা— যমুনার কালো জলের উপর দুধ ঢালা। যমুনার কালো রঙ ডুবাইয়া দিয়া যেন সাদা রঙের ঢেউ উঠিতেছে। মারবেলের বাড়ির উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে— যেন সব বাড়িটিকে দুধে নাওয়াইয়া রাখিয়াছে।'' (এই বইয়ের পৃ. ২৮৭ দ্র.)।

তত্ত্বকথা যখন বিশদ করেন, পুরাণ ভাঙেন, ভিতরের অর্থ যখন উন্মোচন করতে হয় তখনো ভাষার চালটি মৌখিকের ঘনিষ্ঠ পর্দাতেই রাখেন। ''পার্বতির প্রণয়''-এ লিখছেন,

''এই যে এত বড়ো হিমালয় ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে? এত বড়ো বরের এত বড়ো কনে না হলে তো সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে। মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দৌঃ আর পৃথিবী দুটিকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে একজোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কখনো কখনো দ্বিবচনে ''মেনে'' বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচনে মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর তাহার কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ দিয়েছেন ''আত্মানুরূপাং'' অর্থাৎ হিমালয় যেমন, মেনকাও তেমনি বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকার বিবাহ, এ যে-কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের

কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবেন।'' (এই বইয়ের পৃ. ২৭৮-৭৯ দ্র.)।

কালিদাস লেখেন, ''দ্যাবাপৃথিবী আর হিমালয়ের প্রথম সন্তান মৈনাক ভিন্ন আর-সব পর্বতের ডানা কাটা গিয়াছে।'' হরপ্রসাদের অব্যর্থ টিপ্পনী। ''পর্বতের ডানা কাটা কথাটি নিতান্ত গাঁজাখুরি নহে। যে-কেহ মুসুরির (মুসৌরি) বাজারে দাঁড়াইয়া একবার শিবালয় পর্বতের দিকে দেখিয়াছেন, তাহারই মনে হইয়াছে, যেন একসার ডানাকাটা পায়রা পড়িয়া আছে।'' (এই বইয়ের পৃ. ২৭৯ দ্র.)।

সুশীলকুমার দে এমন অব্যর্থ নিপুণ পাঠকে ''চমকদার সাংবাদিক-সুলভ'' বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন— এ বড়ো তাজ্জব! কেন হরপ্রসাদ এমন স্বরগ্রামে কথা বলতেন, পাঠকের কাছে ঘনিয়ে আসার এমন আকুলতা কেন— তা ভেবে দেখার দায় ছিল আমাদের— যা ভাষাশৈলীর বিচারবিবেচনায় উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় হরপ্রসাদ কালিদাসের পরেই রাখেন ভবভূতিকে। জীবনের শেষে আর-একবার ভবভূতি পাঠ করেন, সেই দীর্ঘ লেখাটি প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পরে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়। তাঁর কালিদাস পাঠের মতোই ভবভূতি পাঠও একই শৈলীর, ঘনিষ্ঠ পাঠ, ''পিঁজিয়া পিঁজিয়া'' উন্মোচন। ভবভূতি সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের গৌরব তাঁর কাম্য ছিল না। কবিত্বকে তিনি পাণ্ডিত্যের উপরে মনে করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'উত্তরচরিত' ধরে হরপ্রসাদ ভবভূতির প্রশস্তি করেছেন। এ প্রশস্তিতে প্রকাশ পেয়েছে কবির উদ্দেশে পরম ভক্তি। ভক্তির কারণ, বৌদ্ধ-উত্তর হিন্দুর সামাজিক-নৈতিক-পরমার্থিক জীবনাদর্শের যেটুকু উৎকর্ষের বস্তু, ভবভূতি সেই বস্তুকে তাঁর রচনায় উজ্জ্বল করে গিয়েছেন। রামচরিত্রই ভবভূতির ভাবাশ্রয়। বড়ো মাপের সাহিত্য সৃষ্টিতে, কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে, যে-কোনো আঙ্গিকেরই হোক, স্রষ্টা-সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টি, ব্রহ্মাণ্ডদৃষ্টি, সমকালদৃষ্টি থেকে জাত কোনো-না-কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে। এ ঠিক নীতি শিক্ষার কথা নয়। হরপ্রসাদ কালিদাস পাঠে যেমন ভবভূতি পাঠেও তেমনি জীবনবোধের সেই আধারশিলাটি

কোথাও কোথাও সন্ধান করেছেন। এই প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে অবশ্যই মনে আসে ''বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'' (এই বইয়ের পৃ. ২১৬-২৪ দ্র.) প্রবন্ধটি এবং অবশ্যই আর-একবার বঙ্কিমচন্দ্রের ''উত্তরচরিত''— অসামান্য প্রবন্ধটি পড়ে নিতে হয়। ''বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরচরিত''-এ হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরুচির সমুন্নত মহিমায় পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই রাম চরিত্র নিয়ে তাঁর উপলব্ধির সমালোচনা করেছিলেন। বেশ সাহস করেই বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও কোথাও কালিদাসের কাছে ভবভূতির ঋণ ঠিক ঠিক ধরতে পারেন নি। যেমন, ''এই চিত্রদর্শন ভবভূতি কোথায় পাইলেন?'' দেখিয়ে দিচ্ছেন, কালিদাসের 'রঘুবংশ' চতুর্দশ সর্গে পঁচিশ সংখ্যক কবিতায় ''নানাচিত্রশোভিত গৃহমধ্যে দণ্ডকারণ্যে'' যেসব দুঃখ পেয়েছিলেন তার চিত্ররূপ দেখে ''সুখ অনুভব করিতে লাগলেন।'' (পৃ. ২১৮)। কিংবা ''ছায়া সীতা''-র ইঙ্গিতটি ভবভূতি কোথায় পেয়েছিলেন? ''বেশি দূর যাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়া সীতার মূল পাওয়া যাইবে।'' শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুস্মন্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও শ্রোতাদের শকুন্তলার কথা জানাইয়াছেন। ... ভবভূতি দেখিলেন, বাঃ এতো বেশ সাজানোই আছে। আমি কেন তিরস্করণী আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। ... ভাস হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর-একটুকু রসান দিয়া একটি অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টটা তিনি ভাসের 'বাসবদত্তা' হইতে লইয়াছেন।'' (পৃ. ২২৩-২৪)। শকুন্তলার সানুমতী নাম্নী অপ্সরার ভূমিকা প্রসঙ্গে ভাসের 'অবিমারক' নাটকের প্রভাবের কথা হরপ্রসাদ ''শকুন্তলার মা'' (পৃ. ৩৪১-৪৭) প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। ছায়া সীতার কথা বঙ্কিমচন্দ্র এড়িয়ে গেছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ধরতে না পেরে বলেছিলেন ওটা ''হ্যাল্লিউসিনেশন'' (পৃ. ২২৩)।

এভাবে পড়াকে হরপ্রসাদ বলেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে ডুব দেওয়া।

তেমন করে পাঠের অভিনিবেশের ফলে, ''সমস্ত সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুঝিতে পারিব এবং বুঝিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইব।'' (পৃ. ২১৮)। শুধু তথ্য জানার জন্য নয়, সংস্কৃতভাষা আশ্রয় করে মহৎ প্রতিভার সৃজন-পরম্পরায় সাহিত্যিক নন্দনের উৎকর্ষ ধাপে ধাপে কেমনভাবে বিকশিত ও চূড়াস্পর্শী হয়েছিল, সেই আন্তর-ইতিহাস উপলব্ধির জন্যই ''নিপুণ হইয়া'' বৈদগ্ধ্যময় অনুশীলন প্রয়োজন মনে করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আধুনিক সাহিত্যরুচি নিয়ে সাহিত্য অনুশীলনের আধুনিক পদ্ধতিতেই নতুন করে সংস্কৃতের মতো একটি ঋদ্ধ ভাষায় আধারিত সাহিত্য পাঠের আহ্বান তাঁর এই রচনা সংগ্রহে রয়ে গেল।

১৩

সংকলনটির রচনা-সমগ্র দীর্ঘদিন ধরে পরিচর্যার পর্বে পর্বে মনে হয়েছে ঠিক কী অভিপ্রায়ে হরপ্রসাদ সেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত বারবার সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্মোচনে এতো সময় দিলেন। উল্লেখ করেছি, নিজেকে তিনি Sanskrit by heridity, training and profession... বলে গৌরব করতেন। বলতেন, সংস্কৃতের সঙ্গে যা-কিছু সম্পৃক্ত সব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভালোবাসার বস্তু। সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ''ইন্সটিংট'' ছাড়াও গভীরতর প্রেরণা এবং দায়বোধ তাঁর এই উদ্যমের মধ্যে কাজ করত অনুভব করা যায়।

টায়-টায় হিশেব করলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখক জীবন ১২৮৩ থেকে ('বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'ভারত মহিলা' প্রকাশ) ১৩৩৮, ১৮৭৬ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ৫৬ বৎসর। বঙ্কিমযুগ থেকে রবীন্দ্রযুগে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ বিকাশ, শাখাপ্রশাখায় বিস্তার— এই ইতিহাসে হরপ্রসাদ ওতপ্রোত ছিলেন, সমস্ত মর্যাদাময় পত্রপত্রিকার একজন সমাদৃত মান্য লেখক ছিলেন। তাঁর জীবন কথায়, বিদ্যাজগতে ব্যক্তিগত চর্চা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম এসব বিবরণে মানুষটির মন-মানসিকতার পরিচয় এখন এই রচনা-সংগ্রহের খণ্ডগুলির বয়ানে আমাদের কাছে অনেকটাই

স্পষ্ট। নিজেকে নিছক সংস্কৃতজীবী বলে গৌরব করলেও বাংলার আধুনিক ভাষা-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশে তাঁর দায়বোধ, সজাগ-সক্রিয়তা, খানিকটা অভিভাবকত্বের খবরাখবর এখন আমরা সাজানোই পাচ্ছি। তা থেকে তো মনে করা যায়-ই হরপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন, বাংলার আধুনিক সাহিত্যে য়ুরোপ-চর্চার সমারোহে যেন দেশীয় 'রিকথ্'-এর দিকটি চাপা পড়ে যাচ্ছে। পাণ্ডিত্যের কথা আসছে না এখানে। সংস্কৃত বিদ্যার কৃতিতে হরপ্রসাদের তুল্য বিদ্বান উত্তর-পূর্ব ভারতে কজনই বা উল্লেখযোগ্য! এখানে স্মরণীয়, সংস্কৃতে নিছক সাহিত্যিক সৃষ্টির সঙ্গে একালের মনের সেতু রচনার কথা। ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা নিয়ে, সংস্কৃত-বাঙ্‌ময় নিয়ে এত যে লিখলেন, তার মধ্যে কখনোই হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য অভিমানের প্রকাশ নেই। সমস্ত লেখাতেই প্রাচীন-ভারতীয়-বিদ্যার নানা শাখায় তাঁর অগাধ অধিকার দাঁড়ার মতো, কিন্তু সে সমস্ত 'বিদ্যে' ফলানোর জন্য লিখছেন না। এ কালের সংস্কৃতিবান্ আধুনিক বাঙালির মনে এই চেতনা সঞ্চার করতে চাইছেন, সংস্কৃত বাঙ্‌ময় সোনার ফ্রেমে বাঁধানো রত্নে সাজানো সম্ভ্রমময় কোনো প্রদর্শ-বস্তু নয়। দীর্ঘকাল ভারতীয় মনের সৃজন-এষণার পরম্পরা, সাহিত্য-নন্দনের উৎকর্ষ ধারণ করে আছে এই চিরায়ত সাহিত্য। হরপ্রসাদ একান্তভাবে একালের মনের সঙ্গে সেকালের মনের সেতু রচনা করে দিতে চেয়েছেন। এমন-কী বেদ-এরও অপৌরুষেয়ত্ব তিনি গ্রাহ্য মনে করেন না, পড়তে চান নিছক কবিতা হিশেবে, ''বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই।'' আদিতম কবিতা। মানবীয় কল্পনায় রূপান্তরিত জাগতিক অভিজ্ঞতা, বিস্ময়ে জেগে ওঠা গান। আরো পরে যখন সমাজ বাঁধা হয়েছে অনেক জটিল বিন্যাসে, চিন্তা-চেতনার নানান্ শাখা পূর্ণতা পেয়েছে, ভারতের মানস-সংস্কৃতি যৌবনের পর্ব পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের স্থিরতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে— সেই বিকাশ-পর্যায়গুলির প্রতিভা-দীপ্তিই তো ধারণ করে আছে সংস্কৃত-সাহিত্য। আধুনিক জাগরণের পূর্ণতার জন্য, নতুন বাংলার সাহিত্যের সম্পূর্ণতার জন্যই হরপ্রসাদ সেই চিরায়ত সাহিত্যের বন্ধ দরজা খুলে দিতে চান। সাহিত্যের স্বদেশের সঙ্গে যোগে

একালের সাহিত্য পরিপোষণ পাবে এই একান্ত আগ্রহে সংস্কৃত-সাহিত্যের জগৎটি এমন অন্তরঙ্গ পাঠে মেলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন বাংলার আর-কোনো লেখক সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ করে তোলার এমন আয়োজন করেননি। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' ভিন্ন সব লেখাই পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকায় আগ্রহী পাঠকদেরও আয়ত্তে ছিল না। এতদিনে যাবতীয় রচনা একত্র সংকলিত হল।

১৪

এই পঞ্চম খণ্ড প্রকাশে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' প্রকল্প সম্পূর্ণ হল। এ কাজ হাতে নেবার সময় থেকে মাথার উপরে অভিভাবক ছিলেন সুকুমার সেন। পঞ্চম খণ্ডটি নিয়ে কাজ শুরুর মুখেই অধ্যাপক সেনের প্রয়াণে দিশেহারা হয়ে পড়তে হল। হরপ্রসাদের ছাত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থর পরামর্শ নিতে হত অবিরত। তিনিও প্রয়াত হলেন। মানববিদ্যা চর্চায় নিশ্চিত-নির্ভর মানুষ প্রায় কেউ নেই আজ আমাদের মধ্যে। সম্পাদনার যে পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথডলজি, এই পাঁচ খণ্ডের সংগ্রহে অনুসরণ করা হয়েছে তাতে মানববিদ্যার নানা শাখার বিশেষজ্ঞ মানুষের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চলতে থাকা সম্পাদনার কাজে তেমন বহু বিশেষজ্ঞের সাগ্রহ সহায়তা পেয়েছি। সেসব স্মৃতি ব্যথিত কৃতজ্ঞতায় আনত করে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় হাতের কাজ সরিয়ে রেখে অনেক দুপুর কাটিয়েছেন আমাদের সংশয় মেটাতে। একেবারেই নিজের কাজ মনে করে অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস উৎসুক থাকতেন, কখনো কখনো রাত এগারোটায় ফোনে সদ্য মনে পড়া বা দেখা তথ্য জানিয়ে রাখতেন। জৈনবিদ্যার কোনো তথ্য-তত্ত্ব জানতে চাইলেই বিশদ উত্তর পাওয়া যেত গণেশ লালওয়ানীর কাছ থেকে। কতভাবে সাহায্য করেছেন সুখময় সপ্ততীর্থ, রাধারমণ মিত্র। পরম নির্ভর ছিলেন হরপ্রসাদের ভাইপো অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য। প্রকল্পটির শেষের দিকে এঁরা কেউ আর আমাদের মধ্যে ছিলেন না। একমাত্র অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত রয়েছেন। অনন্য-সহায়।

প্রতিশ্রুত দুটি কাজ করে ওঠা গেল না। আমরা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছিলাম, শেষ খণ্ডে হরপ্রসাদের লেখা চিঠিপত্র সংকলন করা হবে। আমাদের সংগ্রহে রয়েছে শতাধিক চিঠি যার অধিকাংশই ন'ছেলে, বরোদায় গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যকে লেখা। বিনয়তোষ বিশ্ববিখ্যাত গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। চিঠিতে হরপ্রসাদ এই কাজের নানা সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছেন, তথ্য জানাচ্ছেন। ভারতবিদ্যা চর্চার একটি পর্বের নেপথ্য উন্মোচিত হয় এই পত্রাবলিতে। বিচ্ছিন্নভাবে নির্বাচিত কয়েকটি চিঠি ছাপায় কোনো অর্থ দাঁড়াবে না, অথচ সব চিঠি এই বইয়ে ধরানো সম্ভব নয়। এইসব চিঠি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশ যুক্তিযুক্ত মনে হল। তাই এই সংকলনে প্রতিশ্রুত চিঠি প্রকাশের অংশটি বাদ দেওয়া হল।

দ্বিতীয় আর-একটি উদ্যোগ শেষ হল না সুকুমার সেন-এর প্রয়াণে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাশৈলীর একটি বিশিষ্টতা, গুরুচণ্ডালির তোয়াক্কা না করে একেবারেই হাটেবাজারে চালু শব্দ ব্যবহার— শিষ্ট অশিষ্ট নির্বিশেষে। আবার তৎসম তদ্ভব শব্দেরও নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার অনেক। ফারসি শব্দের ব্যবহারও অবিরল। ফলে গম্ভীর বিষয়ে লেখাও কখনো ''গ্রাম্ভারি'' হত না। খাঁটি বাংলার অমন জোরালো শৈলী আর কারো হাতে এল না। সুকুমার সেন মশায়ের সঙ্গে এ নিয়ে জল্পনা চলত। ঠিক করলেন হরপ্রসাদের শব্দ ব্যবহারের গ্লসরি— শব্দকোষ তৈরি করা হবে এবং নিজে তার ভূমিকা লিখবেন। রচনা-সংগ্রহের শেষ খণ্ডে থাকবে এই শব্দকোষ। তেমন তেমন প্রয়োগ পেলেই আমরা কার্ডে তুলে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিতাম। নিজে হাতে যেসব শব্দের তাৎপর্য পাশে লিখে রাখতেন। কয়েকটি নমুনা তুলে দিই এখানে,

অন্‌-পড়— অশিক্ষিত
অনুবন্ধী— অনুগত
অবহার—যুদ্ধ (বা ক্রীড়া)স্থগিত হওয়া
অর্থশরণতা— মানের প্রতি নজর, অর্থনিষ্ঠতা
অস্তেয়— চৌর্যহীনতা, চুরি না করা
অস্থিত—স্থিরতা, অর্থাৎ যোগাড় নাই
আইওত— অবিধবাত্ব
আগ্রয়ণ— নবান্ন

~ ~

আচমনীয়—টুকিটাকি জলখাবারের মতো
আচমন— কুলকুচা করা, আচমনের জলের মতো অল্প পরিমাণ
আড়া— চালের নীচের বাঁশ
আতাল পাতাল— আজে বাজে বস্তু
ইল্লৎ— ময়লা
এউজি— চাল ও দেওয়ালের ফাঁক,
স্কাইলাইট— skylight
এক্‌টিন— acting
এক্কাবাহাদুর— একমাত্র বাহাদুর
কটকেনা— স্পষ্ট ব্যবহার, খোলসা, কাজে গাঁইগুঁই নয়
কয়গদ— কাগজ
কর্ত্তপ— কেরামতি, কর্তব্য, task
কাচ— অভিনয়ে সাজ
কায়েমমোকাম— পাকা বসবাস
কিতাবতি— বইয়ের মতো (বাঁধানো)
কুহেরা— কোয়াশা
খাটলি— ডুলি
খুঁটের বিদায়— তালিকা অনুসারে দক্ষিণা দান
গট— কঠিন অনড় হইয়া
গড়ে— গড়া (যা গাথা নয়) মালা
গড়েরীয়া— গাড়ল
গাঁথাঘর— লাইব্রেরি
গুভাজু— যারা গুরু ভজনা করে
গোঁজমোহন— গম্ভীর ও চালিয়াত
চক্ষুবাসা— চোখের ভালোবাসা

দিনে দিনে এইরকম বেশ কিছু কার্ড জমে উঠল, কিন্তু ওঁর চিরদুর্বল দৃষ্টি একেবারেই লোপ পেল। বাংলা শব্দবিদ্যায় একটা বড়ো কাজ খণ্ডিত হয়ে গেল। বড়ো পরিতাপ আমাদের!

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যাবতীয় লেখাতেই সংস্কৃত-সাহিত্যের, পালির নানা উৎস থেকে অবিরল উদ্ধৃতি আছে। ঠিক কোন্ সংস্করণ থেকে বা কোন্ পুথি থেকে তুলছেন তার সূত্র নির্দেশ তাঁর অভ্যাসে ছিল না। অনেক সময়ই ডিকটেশান দিয়ে লেখাতেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর গণেশগিরি যাঁরা করেছেন, যেমন কালিপদ সেন, মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, নিত্যধন ভট্টাচায্য— তাঁরা বলতেন ডিকটেশান দেবার সময়ে বইপত্র বড়ো একটা দেখতেন না। ফলে সম্পাদনার পর্যায়ে উদ্ধৃতির উৎস খুঁজে বের করা এবং তার অনুবাদ দাঁড় করানো রীতিমতো দুষ্কর হয়ে ওঠে। সুকুমার সেন নিজে অনুবাদ করতেন, অনেক সময়ে তাঁর করা অনুবাদ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশায়কে দেখিয়ে নিতে বলতেন। বিশেষ করে তন্ত্রের এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতের উদ্ধৃতি—

অনেক সময়ে যার প্রকট অনুবাদ দাঁড়ায় অত্যন্ত অশিষ্ট। সুকুমার সেন অনুবাদ করতেন চলিত গদ্যে, তাঁর অনবদ্য নিজস্ব শৈলীতে। এই রচনা-সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যে দেওয়া অনুবাদগুলি পড়লে একটা আলাদা রস পাওয়া যায়। চতুর্থ খণ্ড থেকে আর সেই ধারাটা থাকেনি। পঞ্চম খণ্ডে সূত্র নির্দেশ ও অনুবাদের কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অনিল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের প্রবীণ গবেষক শ্রীকৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য। ভাটপাড়ার মানুষ কৃষ্ণজীবন পারিবারিক বিদ্যাবত্তার উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ এবং পরিশ্রমে অকুণ্ঠ। বিভিন্ন সংস্করণের বই মিলিয়ে যথাসম্ভব উদ্ধৃত পাঠের উৎস নির্দেশ করা, অনুবাদ দাঁড় করানো এবং টীকাটিপ্পনী তৈরি করায় সাহায্য করেছেন। অনুবাদ-শৈলীতে অনেক ঘষামাজা করে আমরা সুকুমার সেন-শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশায়ের মেজাজটা যতটা সম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেকি সহজ কাজ! মুদ্রণ পর্যায়ে বেশ কিছু লেখা সতর্কভাবে সংশোধন করে দিয়েছেন শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

এ কাজটি শুরু করা সম্ভব হয়েছিল প্রয়াত উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের আগ্রহে। তিনিই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে চারখণ্ডে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন পর্ষদের তখনকার মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন মিত্র। তাঁর জায়গায় আসেন অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা। তাঁর নিপুণ ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পটি মসৃণ গতি পায়। সেই ধারাটা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন অধ্যাপক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রয়াত বন্ধুবর প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের (১৯৮১) সময়েই বোঝা গিয়েছিল রচনার পরিমাণ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে চার খণ্ডে এ প্রকল্প শেষ করা যাবে না। আরো একটি খণ্ড প্রয়োজন হবে। মৃত্যুর

মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে অধ্যাপক ঘোষ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়ে যান। কর্কট রোগে পর্যুদস্ত কণ্ঠস্বরে তাঁর শেষ কথা মনে পড়ে, ''আমি তো আর বেশি দিন থাকবো না। দেখবেন, কাজটি যেন শেষ হয়।''

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের (১৯৮১) পরে নানা বিঘ্নে সম্পাদনার কাজে দেরি হতেই থাকে। ইতিমধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র সংস্থাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত এবং রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর পোষিত বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের (১৯৮১) সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেও মুদ্রণের কাজ চলেছে এবং পুরো বইটি কম্পোজ করা হবার পরেও বহুদিন পুস্তক পর্ষদের সিদ্ধান্তগত দ্বিধায় পড়ে থেকেছে।

শেষ অবধি বর্তমান উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত জহর সরকার-এর হস্তক্ষেপে সংকল্পিত কাজটি শেষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল। পঞ্চম খণ্ডটি পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছল। কাজের ভালোমন্দের বিচার চলতে থাকবে। কিন্তু পাঁচ খণ্ডে সংকলিত বাংলার এক প্রধান লেখকের এ বিপুল রচনা সম্ভার প্রকাশ এক লুপ্ত রত্নোদ্ধারের সংকল্প উদ্‌যাপন আমাদের পক্ষে। এক পুণ্যের ব্রত সমাপন। এ কাজে বিভিন্ন সময়ে তরুণ বিদ্যার্থী যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা সকলে এই পুণ্যের অংশভাগী।

ভারত মহিলা
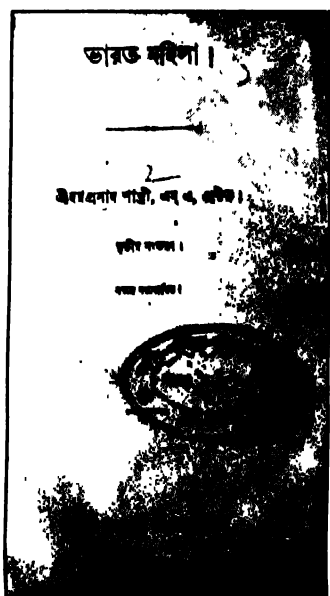
প্রথম অধ্যায়

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমত তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্যালোচনা করা আবশ্যক। যেহেতু কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক-না-কেন, যতই নূতন নূতন পদার্থ নির্মাণে সমর্থ হউক-না-কেন, উহা কবির সমকালীন সামাজিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়।

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমত বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই-সকল গ্রন্থের কোনো স্থানেই স্ত্রীলোকের

ভারত মহিলা।

সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণিত নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষত পুরাণের অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্ভূত। সুতরাং উহাকে কোনোরূপেই প্রকৃত সমাজচিত্র বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র, উপাসনাপ্রণালী ও অন্যান্য ধর্মসংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ। কেবল স্মৃতিসংহিতাসকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানে রক্ষা করিতে হইত।

প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন পুরুষের অধীন করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"[১] ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমতো বিশ্রাম সময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের রক্ষাকর্তার নির্দেশমতো কার্য করিতে হইবে।"[২] যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

"পিতা মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক কোনো মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।"[৩] বৃহস্পতি বলেন, "শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোনো প্রাচীন স্ত্রীলোক তরুণবয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিবে।"[৪] নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্মূল হইলে রাজা স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্মবিরুদ্ধপথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।"[৫] পৈঠীনসি বলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে সর্বদা সাবধানে রাখিবে।"[৬] এই-সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ঋষিরা পরম যত্নে ও সাবধানে স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীলোক অবরোধবর্তী ছিল না।

যদিও স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য ঋষিরা এত ব্যগ্র, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্তী থাকিতেন তাহারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চপাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যারা তো কখনোই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্যগ্রন্থসকলে যে "শুদ্ধান্ত," "অন্তঃপুর," "অবরোধ," ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০/৮০০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ করিতেন এবং নির্মল গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী ছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্বদাই ভালো ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে, সেখানে কখনোই ভদ্রস্থতা নাই।"[৭] স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্তী ছিল না তাহার আরো প্রমাণ এই যে অরুন্ধতী সর্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইতেন। আর "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই এক নিয়ম থাকায় প্রায় সকল ধর্মকর্মেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না, কোনো সমাজ বা উৎসবস্থলে উপস্থিত হইবে না। ক্রীড়া করিবে না, হাস্য করিবে

না, এবং শরীরসংস্কার করিবে না।"* অতএব স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী সর্বত্র গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"[৮]— যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কিরূপ? দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারী। কিন্তু আমরা দেখিতেছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন এবং এক স্থলে দেখা যায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুরূহ, কিন্তু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়াছিলেন। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকেও দেখা যায় যে, একজন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর-একখানি নাটকে [মালতীমাধব] কামন্দকী, ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কামন্দকী বৌদ্ধধর্মাবলম্বিনী কিন্তু তিনি যে সময়ে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং বোধ হইতেছে অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমানরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমাদিগের দেশে যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয়, তাহার কোনো কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্বতী বাল্যকালেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যাবিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়—

বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মীদেবীর প্রণীত মিতাক্ষরা-র টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী গণিতশাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।[৯] শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে

* ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥ (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১/৮৪)

মিশ্রপত্নী সারসবাণী তাঁহাদের বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন।[১০] কর্ণাটদেশীয় রাজার মহিষী কবিত্ববিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্রবধূও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সদুক্তিকর্ণামৃত[১১] গ্রন্থ ১২০৫ খৃ. অব্দে লিখিত হয়। উহাতে তৎকালপ্রসিদ্ধ কবিগণের ৫টি করিয়া কবিতা উদ্ধৃত আছে। এই কবিবৃন্দের মধ্যে ভাবদেবী, চণ্ডালবিদ্যা, সাটোপা, শিলা, ভট্টারিকা, বিদ্যা, বিজয়া, বিকটনিতম্বা ও ব্যাসপাদা এই কয়জনের নাম আছে। ইঁহারা তৎকালে কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

স্ত্রীলোকের বিবাহ।

পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, ইহাই সকল মুনির মত। কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোনো উদ্যোগ না করেন, তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামতো পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে (মনু)।[১২] উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, নচেৎ নরকে যাইতে হয়, এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষত বরের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও অপাত্রে কন্যাদান ঘটিয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন,

"নানাগুণবিশিষ্ট বেদবিৎ সমান বর্ণের পুরুষ বর হইবে। তাঁহাকে যত্নপূর্বক পরীক্ষা করিতে হইবে তিনি যেন যুবা ধীমান ও লোকের প্রিয় হন।"[১৩]

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা-র প্রসিদ্ধ টীকা 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থে এই বচনটির বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে, যথা, "যুবা", অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না। "ধীমান্" অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থগ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে। "জনপ্রিয়" অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বরপরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায়। যদি বর সর্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয়, তবেই তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মনু আরো বলিয়াছেন যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায়, তবে বরং কন্যা যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করিবে, তথাপি অনুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার।

"পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন, এবং তাহাদিগের বেশভূষা

করাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয়, সেইখানেই দেবতারা, সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীলোকেরা শোক করে, সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহারা সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতি ইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্যে ভূষণ, আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগকে 'পূজা' করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সে কুলে কল্যাণ হয়"[১৪] ইত্যাদি। মনুর এই-সকল বচন পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন, ও তাঁহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরো বলিয়াছেন, মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয়া, ভার্যা আপনার দেহ[১৫]; অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ কোনো রূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রাজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু[১৬] বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" আর-একজন বলিয়াছেন, কন্যা পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। স্ত্রীলোককে শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণ-এ লিখিত আছে ইতর প্রাণীদিগেরও স্ত্রীজাতি মনুষ্যের অবধ্য,* মনু বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে।[১৭] আপস্তম্ব বলিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে।

উপরিলিখিত প্রবন্ধ পাঠে বোধ হইবে যে, সভ্যজাতীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্বপিতামহগণও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানাস্থানে দেখা যায়, "স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ, উহার সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে; হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুরভাষিণী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না, অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না" ('ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'); এ-সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন, অন্যদিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্বকালের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন অথবা তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ

---

* "অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহু স্তির্যক্‌জাতিগতেষ্বপি।"
[গরুড়পুরাণ-এর বর্তমান কোনো সংস্করণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়নি]

হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাঁহারা সতী তাঁহাদের তো কথাই নাই, "যেখানে যেখানে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন, যে আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম" (কাশীখণ্ড),[১৮] কিন্তু সামান্যত পাপচারিণী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। "সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব তাহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদ্গণ সর্বপ্রকারে পবিত্র হইয়াছে।"[১৯]

স্ত্রীলোকের কর্তব্য কর্ম।

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্তব্য। স্বামী কানা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্মণ্য হউন, দুষ্ট হউন, তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু, পূজ্য ও ইষ্টদেবতা। তাঁহার চরণসেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরমগতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতামাতার সেবা, দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্বদা কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনোই কামনা করিবেন না। আপন ইচ্ছাতে কোনো কার্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত, ধর্ম উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদিকার্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। তাহার দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে, তাহাতেও তাঁহার নিজের কোনো অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য। সে-সকল গৃহধর্ম কী, 'বহ্নিপুরাণ'-এ তাহার এক বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—

"স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবে, তাহার পর স্বামী ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় অথবা জলের দ্বারা উঠান পরিষ্কার করিবে ও গৃহের কাজকর্ম শেষ করিবে। তাহার পর স্নান করিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতির পূজা করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবে। সমস্ত গৃহকার্য শেষ হইলে অতিথি ও স্বামীর ভোজনান্তে পরমসুখে নিজে ভোজন করিবে।"*

এই স্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্তব্য কর্মসকলের উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল, জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্তব্য

* [ব্যাসসংহিতা, ২য় অধ্যায় অনুরূপ বচন দেখা যায়]

কী কী জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁহারা ঐগুলি যদি সুন্দর রূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার উপর অমায়িকতা, সরলতা প্রভৃতি যে-সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায়, সেই-সকল গুণ থাকিলেই তাঁহাকে অতি উন্নতচরিত্রা বলিতে হইবে।

স্ত্রীর ধনাধিকার।

স্ত্রীলোকের ধনাধিকার বিষয়ে নিয়ম এই; স্ত্রীলোক নিজে উপার্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কন্যার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাঁহার আপনার। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই অর্থাৎ দান বিক্রয় ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগমাত্র। সে ভোগ আবার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য ও অন্যান্য সৎকার্যে নিয়োগ করিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে তবেই পাইবেন, বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধন উপার্জনে বঞ্চিত হইলেও তাঁহার ধনাধিকারে যথেষ্ট সুবিধা আছে। তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ধনাধিকারবিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণ যত সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এত অন্য কোনো দেশে আজিও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

বিধবার কর্ত্তব্য।

মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কার্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধনদান করিবে না। স্বামীর বংশ নির্মূল হইলে, পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে। কিন্তু 'মহাভারত'-এর মধ্যে সহমরণপ্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডুমহিষী মাদ্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্রবৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস এমন-কী মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমৃতাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন, "যে স্ত্রী সহমৃতা হয়, সে স্বামীর সহস্র পাপ সত্ত্বেও

স্বামীর সহিত সার্দ্ধত্রিকোটি বৎসর স্বর্গবাস করিবে।" পরাশর বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্বক সর্পকে গর্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আমোদ প্রমোদ করে।[২০] কিন্তু সহমরণ স্ত্রীলোকদিগের অবশ্যকর্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশাংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও এ কথার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রায় অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। উহা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে, সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল, সত্য বটে, দুষ্টলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জ্বলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিত, সত্য বটে, এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া ইংরাজরাজ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, কিন্তু এই প্রথা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পণ করিতেন। কাহারো কাহারো মতে কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন ব্যবস্থা আছে।

দুষ্টচরিত্রাদিগের দণ্ড।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্যঃ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্যে অবহেলা করিত বা মুক্তহস্তে ব্যয় করিত, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্হা। পরিত্যাগ বলিতে গেলে একেবারে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া বুঝাইত না। এই-সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্বে গর্বিতা হইয়া স্বামীকে অবহেলা করে, এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পরদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ।

মুনিরা যে-সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই-সকল নিয়ম সুন্দর রূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদিগের প্রথম বর্ণনীয়। যাঁহারা কোনোরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাঁহারা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনাবলি বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীস্বভাবের ইঁহারাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডুবধূ দ্রৌপদী, রামগেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে গণনীয়া। সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্ররক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রলোভনসামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্তব্য কর্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্বস্ব, তাঁহাদিগের দেবতা। পতির সেবাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্তব্য গৃহকার্য। গৃহস্থের যত কার্য আছে তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রীলোকের হস্তে। সন্তানপালনও স্ত্রীলোকের কর্তব্য কর্মের মধ্যে গণনীয়। মনু এক স্থলে বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক হইতে সন্তানের উৎপত্তি ও তাহার লালন পালন হয় অতএব স্ত্রীলোকই লোক যাত্রার প্রত্যক্ষ উপায়।"[২১]

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের আরো একটি কর্তব্যকর্ম হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্রপরিবারের মহিলারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলাশিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক-সকল সরল ছিল। বাবুগিরি ব্রাহ্মণদিগের তত মানোগত ছিল না। কালিদাসাদির

সময় যখন আর্যগণ পূর্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নৃত্যগীতাদি ভদ্রমহিলাদিগের নিত্যকর্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন, "তুমি আমার গৃহিণী ছিলে, সচিব ছিলে, সখী ছিলে, কথায় দোসর ছিলে এবং ললিতকলাবিধিতে প্রিয় শিষ্যা ছিলে, করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমায় হরণ করায় বলো আমার আর কী রাখিয়াছে।*

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত-সংহিতায় লিখিয়াছেন, "স্ত্রী ছায়ার ন্যায় সর্বদা পতির অনুগমন করিবে। মঙ্গলকার্যে সখীর ন্যায় যত্নবতী হইবে, আদিষ্টকার্যে দাসীর ন্যায় তৎপরা হইবে।"†

এই দুইটি বচনের মধ্যে প্রথমটিতে "প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এই বিশেষণটি অধিক আছে। ইহা দ্বারা বোধ হইল ঋষিগণ আপন স্ত্রী ও কন্যাদিগের নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে তত উৎসুক ছিলেন না।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল পতিসেবা, গৃহকার্য, এবং নৃত্যগীতাদিও, স্ত্রীলোকের কর্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপত এই স্থির হইল, কিন্তু বিশেষ পর্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশখানি সংহিতার মধ্যে ৮/৯ খানি অতি স্বল্পায়তন তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের কোনো উল্লেখ নাই। আর-কয়েকখানির মধ্যে, মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ, উহাতে স্ত্রীধর্ম তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে গৃহস্থধর্মের মধ্যে কয়েকটি মাত্র কবিতা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তারক্রমে স্ত্রীধর্ম কীর্তন করিয়াছেন। এই তিনখানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থঘটিত কোনোরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণুসূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুরূহ অপুত্রধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। স্ত্রীধর্মসম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা—

"স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত একব্রতচারিণী হইবেন।[২২]

বিষ্ণুসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দপণ্ডিত[২৩] লিখিয়াছেন স্বামী যে-সকল বিষয়ে সংকল্প করিবেন, স্ত্রীলোকেরও সেই সেই কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।

---

* গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতং।।
রঘুবংশ, অষ্টম সর্গ, ৬৭ শ্লোক।

† ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেসু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।।
ব্যাসসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭ শ্লোক।

শ্বশ্রূশ্বশুর এবং দেবতাদিগের সেবা।

টীকাকার লিখিয়াছেন পূর্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষসম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন। কারণ স্ত্রীলোক ইচ্ছামতো দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটির সহিত বিরোধ হয়, অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবতা "সৌভাগ্যদাত্রী গৌরীপ্রভৃতি"। সৌভাগ্যই স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যাদ্বারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা; বলে ক্ষত্রিয়ের; সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালোবাসা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালোবাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠা।

অতিথি সেবা।

মনু গৃহস্থের যে-সকল প্রধান কর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতিথিসেবা একটি। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ তো নিজে অতিথিসেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর সম্পূর্ণ ভার। গৃহিণী যদি সুন্দর রূপে অতিথিসেবা করিতে পারিলেন, সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্বকালে গৃহস্থ মহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। একদিন দুর্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়স পাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি কোনোরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্বাসা বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার।

কেশববৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শঙ্খ লিখিত একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলিত সংলিখিত [লিখিত] সংহিতার মধ্যে সে বচনটি পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই।

"প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্বে গাত্রোত্থান করিয়া শায়নসামগ্রীর যত্নপূর্বক রক্ষা। পাকক্রিয়া কৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া

আহার করানো'' ইত্যাদি। পূর্ব অধ্যায়ে বহ্নিপুরাণ-এর একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্মার্থও এইরূপ।

অমুক্তহস্ততা ও সুগুপ্তভাণ্ডতা।

পূর্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার অতি অল্প। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামিসঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয়ব্যয়ের তিনিই পর্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু স্বামীর অনভিমতে কোনোরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন। ''ব্যয়েচামুক্তহস্ততা'' ''ব্যয়বিবর্জিতা'' ''ব্যয়পরাঙ্মুখী'' সকল সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। যদি স্ত্রী অধিক ব্যয় করেন স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, আমি ব্যয়কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাঁহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন, গৃহস্থমাত্রেরই পক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যয়কুণ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মঙ্গলাচারতৎপরতা।

মাঙ্গল্য দ্রব্য হরিদ্রা কুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে, এবং বৃদ্ধাস্ত্রীলোকদিগের নিকট যে-সকল আচার শিক্ষা করিবে, তাহার পালনে সর্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচারগুলি শঙ্খ লিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা— না বলিয়া কাহরো বাটী যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, বণিক্, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্য ভিন্ন, পর পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। কাহাকেও নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখনো থাকিবে না ইত্যাদি।

স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রোষিতভর্তৃকা নারী শরীরসংস্কার, বিবাহ ও উৎসবদর্শন, হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন— যদি স্বামী কোনোরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন, তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্পকার্যদ্বারা জীবননির্বাহ করিবে। এই সুত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার শঙ্খ লিখিত একটি সুদীর্ঘবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে সেটির অনুবাদ করিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার বলিয়াছেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুরাদি-

গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। প্রোষিতভর্তৃকাদিগের কী কর্তব্যকর্ম তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎসর পর্যন্ত একবেণীধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণরসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রামগিরিতে মেঘকে বলিতেছেন—

"তুমি দেখিবে যে তিনি হয় দেবপূজায় ব্যস্ত আছেন, কিংবা বিরহে আমার শরীর কিরূপ কৃশ হইয়াছে মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাই চিত্রিত করিতেছেন, অথবা মধুরবচনা পিঞ্জরস্থিতা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সারিকে! তুমিতো তাঁহার বড়ো প্রিয় ছিলে, তাহার কথা কি তোমার মনে হয়?"*

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষপথে দেবারাধনশীলা দ্বারদেশদত্ত-পুষ্প-গণনা-তৎপরা, আধিক্ষামা সেই যক্ষপত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর কৃশ, তিনি বিস্তৃত শয্যার একপার্শ্বে শয়ানা আছেন; বোধ হইতেছে যেন পূর্বগগনপ্রান্তে কলামাত্রশেষ সুধাংশুমূর্তি অবস্থিত। উহাতে আকাশের শোভা বিশেষ হইতেছে না, কিন্তু দর্শকের অন্তঃকরণ শোকে আপ্লুত হইতেছে।

কোনো কর্মে স্ত্রীলোকের ইচ্ছামতো কার্য করিবার অধিকার নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোনো কর্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামতো চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা, ভর্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোনো কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবে, না-হয় সহগামিনী হইবে। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহার করিবে। পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে তাহাদিগের নরকদর্শন হইবে। বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীধর্মনির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক দেখা যায়। যথা—

"স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস-কথা কিছুই নাই। স্বামীর শুশ্রূষা করিলেই স্বর্গে তাহার প্রতিপত্তি হয়। যে রমণী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস

---

* "আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তি বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।।"

মেঘদূত, উত্তরমেঘ, ২৪ শ্লোক।

ব্রত আচরণ করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকে গমন করে। সাধ্বী রমণী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তির পর ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।"*

এই প্রস্তাবের মধ্যে দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর-সকল সংহিতারই সমালোচন করা হইল। দক্ষসংহিতা-য় স্ত্রীলোকের কর্তব্য-নির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাসসংহিতা-য় বিষ্ণুসংহিতা অপেক্ষা অনেক বিস্তারক্রমে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। পূর্ব প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও কোনো কথা উল্লেখ করি নাই। কাত্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে-সকল স্থান অন্য সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় যাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের কর্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা[২৪] একটি প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই স্ত্রীলোকে শ্রেষ্ঠতালাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষাদ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি প্রাতঃকালে দেখে, তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। দুর্ভাগার মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতা-র শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে লক্ষ্মী! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস করো। এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালোবাসো। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন,

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের পূজাপ্রিয়া, গৃহপরিমার্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্মকর্মে অভিনিবিষ্টহৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন

---

* নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্‌।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতংচরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

বিষ্ণুসংহিতা, স্ত্রীধর্মপ্রকরণ ২৫, অধ্যায়, ১৫-১৭ শ্লোক।

মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারও সেই রূপ।* অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে স্ত্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম।

পূর্ব প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের যে-সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংযমবতী, দয়ান্বিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্ত্রীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ অতি কঠোর নিয়মাবলি প্রচার করিয়াছেন।

ব্যাসলিখিত স্মৃতিসংহিতা-য় আর-একটি উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার সবিস্তার অনুবাদ এই—

“পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা অথবা বয়স, বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যাসম্প্রদান করিবেন। পূর্ব-পূর্বের অভাবে পর পর ব্যক্তিকে দান করিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে।[২৫] পূর্বকালে স্বয়ম্ভূ আপনার দেহকে দ্বিধাপাটিত করেন। অর্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই শ্রুতি আছে।[২৬]

যতদিন পর্যন্ত বিবাহ না করা যায়, ততদিন পুরুষকে অর্ধকলেবর বলিতে হইবে। বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত, গৃহনির্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকানির্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্বাণ হইতে দিবে না।[২৭] ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী ও পুরুষ সর্বদা একমন হইবে, এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গ সাধনের কোনো স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতিদেশ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহশুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জন ও

---

* নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু কলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু॥
বিষ্ণুসংহিতা, ষটপঞ্চাশতম অধ্যায়

লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নিপরিচর্যার কার্য করিবে ও গৃহসামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধান করিবে। এইরূপ পূর্বানুকৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা করিবে এবং গুরুজনপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার-সকল ধারণ করিবে। কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিত কার্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্টকার্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয়-ব্যয় চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহনীতি বিধান করিবে এবং উৎকৃষ্ট শয্যা আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহার নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।"[২৮]

এই পর্যন্ত স্ত্রীলোকের নিত্যকর্ম গেল। ইহাতে পূর্ব প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহার পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে যথা—

"স্ত্রীলোকের যেন কোনো বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে তাহার নিজের কোনো কামনা নাই। ইন্দ্রিয়সংযমে তিনি যেন সর্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি কখনোই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা, পরুষবাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কথা বলা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ। তিনি যেন কাহারো সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপবাক্য ব্যবহার না করেন, ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্মার্থবিরোধী কোনো কার্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ততা, নাস্তিতা, সাহস, চৌর্য ও দম্ভ পরিবর্জনীয়। এই-সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইলে ইহকালে যশ ও পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।"[২৯]

ব্যাসসংহিতা-র এই সুন্দর পরিষ্কার দীর্ঘ বর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতিসংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এরূপ সর্বগুণসম্পন্না রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারতবর্ষে, এমন-কী এখনো দেখা যায়। কতকগুলি অধুনাতন লোকের

সংস্কার আছে যে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এতকাল স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্তত ব্যাসসংহিতা-র বচন কয়েকটি পাঠ করা কর্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্মমাত্রের ভার ছিল না, তিনি আয় ব্যয়ের চিন্তা করিতেন, তাহার নাম দেওয়ানি। ব্যাসসংহিতা পাঠ করিয়া বরং মনে হয় যে, স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্যন্ত সকলেরই কার্য করিল, পুরুষের কার্য কী? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারো কতক প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি দুরূহ ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে সময়ে সময়ে চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্তব্য বা গুণনির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধান প্রধান গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং সংক্ষেপত উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটি উদাহরণ দিয়াছেন।

"পত্নী যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশানুগা হন, তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যদি বর্তমান সময়ে স্নেহবশত স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায়, তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।"[৩০]

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে, আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়না করার কথাও শঙ্খসংহিতা-য় আছে*— এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্তব্য।

"অনুকূলকারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা জিতেন্দ্রিয়া স্বামীভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।" "যাহার রমনী অনুকূলকারিণী তাহার এইখানেই স্বর্গ** এরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ। কিন্তু যদি একজন অনুরাগী ও আর জন অননুরাগী হয় তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য, সে সুখের পত্নীই মূল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্বদা খিন্না হয় এবং যদি উভয়ের মন এক

---

* "লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা॥" শঙ্খসংহিতা ১৬ শ্লোক, ৪র্থ অধ্যায়

না হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। .....জলৌকা কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু দুষ্টা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীর্য শোষণ, সুখ শোষণ করিতে থাকে। সে বাল্যকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধপতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমনা হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্যা। ইতরা জরা।"[৩১]

১ম ও ২য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ।

এতদূরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম সমালোচনা সমাপন হইল। এই সমুদয় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, এবং কী কী গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয়া হইতে পারিতেন, তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। যদিও পিতা যাহাকে ইচ্ছা কন্যাদান করিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অন্যকে দিলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্যকার্য মাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে, গৃহস্থের যে গুরুতর কার্য, সংসারিক আয়ব্যয় চিন্তা ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অনেক কম ছিল, তাঁহারা ইচ্ছামতো সমাজাদিস্থলে যাইতে পারিতেন।

তাঁহারা যদিও সর্বত্র দায়াধিকারিণী হইতে পারিতেন না, তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কৌশল বা বলপূর্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহা হইলে সুদ শুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেন । যদিও শাস্ত্রে কোনো স্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না, তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণ-এর অযোধ্যাকাণ্ড এক প্রকার বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য লিখিত বলিলেই হয়। কালিকাপুরাণ-এ চন্দ্রের রাজযক্ষ্মারোগোৎপত্তি বহুবিবাহ পাপের প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র, কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্য মাত্র ব্যবস্থা। পৌরাণিক ঋষিরা এবং সংহিতাসমূহের টীকাকার মহাশয়েরা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন

ঋষিরা ততদূর করেন নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতা-য় পাওয়া যায় না, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা-য় আছে। স্ত্রীলোকেরা যে লেখাপড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসদ্ব্যবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকে না। অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য, আর্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভমাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত্য ও জরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেবল পিতৃবংশ রক্ষার জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র।

বিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার ইহকালে দুরন্ত শাস্তিভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। স্ত্রীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য, অতিথিসৎকার, দেবপূজা ইত্যাদিতে তাঁহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে সুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলেও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে ভক্তিমতী পুত্রাদিতে স্নেহশালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধান ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্মবিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধ্বী স্ত্রী সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোনোরূপ সাহসকর্মে স্ত্রীলোক কখনো প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামিপুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখনো চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্যায়ের শব্দ। কুলটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে উহার সদর্থেরই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্যে অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষা ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহংকার, স্ত্রীলোকের সর্বপ্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের

ছন্দোনুবর্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড়ো ভালোবাসিতেন। ঋষিপত্নীরাও সর্বদা আপন শরীর, গৃহদ্বার ও তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষ্মী কখনোই আসেন না, এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলংকারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরো নিয়ম করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকে নিজে কোনোরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্মবিষয়ে স্বামীর ও স্ত্রীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়। যদি স্বামী শাক্ত হন, ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন তাহা হইলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহা এদেশীয় কাহারো অবিদিত নাই। এজন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন-কী বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমানব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্মবিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালোবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য তৎপরা পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য বশীভূত হইলেন তবে স্বর্গে ও মর্তে প্রভেদ কী? যদিও তাহারা স্ত্রীলোককে সৎস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন।

"সদ্ব্যবহারদ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে তবে তাহাদিগকে বলপূর্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে?"

"কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিতকর্মে তৎপরা হইবেন, দাসীর ন্যায় আজ্ঞাপালনে যত্নবতী হইবেন।"[৩২]

কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য, সেটি তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহবিরতাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমনী লক্ষ্মীর আবাসভূমি।

নারায়ণ বা ব্রহ্ম আপন আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি" এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন, স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাঁহারা কোনোরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তমরূপে আপনাদিগের কর্তব্যকর্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমত বর্ণনীয়। আর যাঁহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্তব্যকর্মে অণুমাত্র অনাস্থাপ্রদর্শন করেন নাই তাঁহারাই সর্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটি প্রধানত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতিমধ্যে ঋষিরা উদাহরণস্বরূপে একটিও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলি হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস;—পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরাণ অনেক পরের লেখা। পুরাণ রচনা সময়ে আর্যগণের সে তেজস্বিতা ও সেরূপ চরিত্রের ঔন্নত্য ছিল না। পুরাণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা তো দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন, কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর কঠোর নিয়মও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্যের টীকা করিতে গিয়া স্কন্দপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের

ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগ্ড়ম্ বাগ্ড়ম্ লিখিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক এস্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্রনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরন্ধ্রী অধিক। কয়েকটি পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-এর প্রকৃতি খণ্ডে কতকগুলি প্রধানা প্রকৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নারায়ণ বলিতেছেন—

> রোহিনী চন্দ্রপত্নী চ (১) সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী (২)। শতরূপা মনোর্ভার্য্যা (৩) শচী (৪) ইন্দ্রস্য চ গেহিনী।। তারা (৫) বৃহস্পতের্ভার্য্যা বশিষ্ঠ-স্যাপ্যরুন্ধতী (৬)। অহল্যা গোতমস্ত্রী (৭) চাপ্যঅনসূয়াত্রিকামিনী (৮)।। দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্য (৯) প্রসূতীর্দক্ষকামিনী (১০)।। পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা (১১) সাম্বিকাপ্রসূঃ।। লোপামুদ্রা (১২) তথাহূতিঃ (১৩) কুবেরস্য তু কামিনী (১৪)। বরুণানী (১৫) যমস্ত্রী চ (১৬) বলের্বিন্ধ্যাবলীতি চ (১৭)।। কুন্তী চ (১৮) দময়ন্তী চ (১৯) যশোদা (২০) দেবকী সতী (২১)।। গান্ধারী (২২) দ্রৌপদী (২৩) শৈব্যা (২৪) সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া (২৫)।। বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী (২৬) রাধামাতা কলাবতী (২৭) মন্দোদরী (২৮) কৌশল্যা চ (২৯) সুভদ্রা (৩০) কৈটভী তথা (৩১) রেবতী (৩২) সত্যভামা চ (৩৩) কালিন্দী (৩৪) লক্ষ্মণা তথা (৩৫) জাম্ববতী (৩৬) নাগ্নজিতী (৩৭) মিত্রবিন্দা তথাপরা (৩৮)।। লক্ষ্মী চ (৩৯) রুক্মিণী (৪০) সীতা (৪১) স্বয়ং লক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতা কলা যোজনগন্ধা চ (৪২) ব্যাসমাতা মহাসতী।। বাণপুত্রী তথোষা চ (৪৩) চিত্রলেখা চ তৎসখী (৪৪)।। প্রভাবতী (৪৫) ভানুমতী (৪৬) তথা মায়াবতী সতী (৪৭)। রেণুকা চ ভৃগোর্ম্মাতা (৪৮) হলিমাতা চ রোহিনী (৪৯)।।

উপরিউক্ত গণনায় সকল সাধ্বীদিগের নামোল্লেখ নাই, কারণ শ্রীবৎসপত্নী চিন্তা ও বালিরাজ মহিষী তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোনো ইতরবিশেষ নাই। এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইঁহাদের সকলের চরিত্র বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইহাদের কয়েকজনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারিজনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডস্থ লোপামুদ্রার চরিত্র কীর্তন পাঠ করা কর্তব্য। এজন্য আমরা এই বর্ণনাটি সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, "হে মুনে! তোমার তপোলক্ষ্মী আছে— তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী সুধর্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়াতুল্যা। ইহার কথা শুনিলে অন্যে পবিত্র হয়। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, সাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে এমন আর কাহারো নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদ্রাগত হইলে নিদ্রাগতা হয়েন এবং তোমার অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে তোমার আয়ু হ্রাস হয়, এই ভয়ে তিনি কখনো তোমার নাম গ্রহণ করেন না; পুরুষান্তরের নামও কখনো মুখে আনেন না। 'এই কর্ম কর' বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, 'স্বামিন্ ক্ষমা করো' বলিয়া, তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য ত্যাগ করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন, 'নাথ কী জন্য আহ্বান করিয়াছেন? আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন।' দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্বদা দ্বারে গমন করেন না, তুমি আজ্ঞা না করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি বলিবার অগ্রে পূজার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্নভাবে হৃষ্ট মনে যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন। তোমার উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। দেবতা অতিথি পরিবারবর্গ গো-সমূহ ও ভিক্ষুকগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন না। সর্বদা তৈজস পাত্র পরিষ্কার রাখেন। তিনি সকল কর্মে দক্ষা; সর্বদা হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়পরাঙ্মুখী। তোমাকে না বলিয়া ইনি কখনো উপবাসাদি ব্রতাচরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞাব্যতীত সমাজ ও উৎসবদর্শন ইনি দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। বিবাহদর্শনাদি এবং তীর্থযাত্রাদিতে তোমার অনুমতি বিনা প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন করিয়া থাকো, তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি তোমাকে

কিছু বলেন না। স্নান করিবার পর ভর্তৃবদন মাত্র দর্শন করেন আর কাহারো মুখ দেখেন না। যদি স্বামী নিকটে না থাকেন মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করেন। হরিদ্রাকুঙ্কুমসিন্দূরাদি মাঙ্গল্য আভরণ কখনো ত্যাগ করেন না, রজকী হৈতুকী আশ্রমত্যাগীর সহিত কখনো বন্ধুতা করেন না। যে স্বামীর দ্বেষ করে তাহার মুখদর্শন করেন না। কোনো স্থানে একাকিনী থাকেন না, উদূখল মূষল বর্ষণী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট স্ত্রীলোক একত্র হইবার সম্ভাবনা সে-সকল স্থলে কখনো উপবেশন করেন না। স্বামীর সহিত প্রগল্‌ভতা করেন না। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি তিনি সেই সেই দ্রব্যেই সর্বদা প্রেমবতী। তাঁহার ধারণা এই যে, স্বামীর বাক্য লঙ্ঘন না করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র যজ্ঞ, একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র দেবপূজা। স্বামী দুরবস্থ হউন, ব্যাধিত হউন, বৃদ্ধ হউন, সুস্থিত হউন, বা দুঃস্থিত হউন, তাঁহার বাক্য কখনো লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হইবে, বিষণ্ণ হইলে বিষণ্ণ হইবে। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপই হইবে। ঘৃত লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে নাই একথা বলিবে না; এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থস্থানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবে। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী, শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতে অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন, তিনি স্বামীর আয়ু হ্রাস করেন এবং মরিয়া নরকগমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুক্কুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শৃগালী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম যে স্বামীর চরণসেবা করিয়া আহার করিবে। কখনো উচ্চ আসনে বসিবে না, পরের বাটী যাইবে না, লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারো অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয়। দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ত্বরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন, তাম্বূল ব্যজন পাদসংবহনা ও চাটুবচনদ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে, সেই ত্রৈলোক্য জয় করে। পিতা অল্প পরিমাণে দেন, ভ্রাতাও অল্প পরিমাণে দেন, পুত্রও অল্প পরিমাণে দেন, স্বামী যাহা দেন, তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয়, স্বামীহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি।”

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর

~ ~

কামিনীগণের আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গতা, এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পগুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা। কিন্তু তিনিই আদর্শ। তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও বর্ণিত আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শব্দটি যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকজন ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ "যশস্বিনী" শব্দটি লোপামুদ্রার বিশেষণ।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গান্ধর্ববিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোনো সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়া সন্তান ক্রোড়ে করিয়া রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন; কিন্তু দুষ্টামি করিয়া কহিলেন, "তুই কুলটা আমি তোকে কখনো চিনি না"। শকুন্তলা তখন রাজাকে আনুপূর্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে! শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন, আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও রামায়ণে সাধ্বীগণের এরূপ অপূর্ব সাহস দেখা যায়, যে তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা সকলেই সাহসসহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং দুষ্টলোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দুষণাবহ নহে বরং ইহাকে একটি গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপস্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ওরূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পতিব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটি অধ্যায় আছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে।

সাবিত্রী। এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান রমণীর চরিত্রবর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। তিনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজ অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা দেখিয়া বলিলেন, সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স

হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন করো। তুমি যাহাকে আপন পতিত্বে বরণ করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এইরূপেই অনেক রমণী অভিলাষিত পতি লাভ করিয়াছে। সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশে পরিভ্রমণ করত রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে তপোবনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্যুমৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এবং তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন, তোমার কন্যা সত্যবান্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মনন করিয়াছে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে, তুমি সত্যবানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি অন্বেষণ করো। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী কহিলেন, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, আর অল্পায়ু হউন, গুণবান্‌ই হউন আর নিগুর্ণই হউন, আমি যাঁহাকে একবার বরণ করিয়াছি তিনি আমার ভর্তা; আমি অন্য লোককে বরণ করিব না। লোকে একবার বৈ ভাগ লইতে পারে না, কন্যা একবার বৈ দান করা যায় না, দিলাম একথা একবার বৈ বলা যায় না, এ সকল একবার বৈ দুই বার হয় না।*

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে কৃতনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধশ্বশুরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপরা হইলেন এবং নিরন্তর দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্বদা প্রার্থনা, হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃতা হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। প্রতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফলমূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পর্যটন করিলেন। সায়ংকালে সত্যবান ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায়

---

* দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥

মহাভারত, ২৯৫ অধ্যায় বনপর্ব, ২৭, ২৬ শ্লোক

আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এইস্থানে উপবেশন করিয়া ফল রক্ষা করো। আমি তোমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন যে সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন স্বামীর অঙ্গ ক্রমশ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূতদিগের কার্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, সাবিত্রি, তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে। তুমি আমার কর্তব্য কর্মে কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ করো। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মূল শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নির্ভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্তিণী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অনুবর্তন করিতেছ, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র। তখন সাবিত্রী কহিলেন, "স্বামীর সমীপে আমার শ্রম কোথায়? স্বামী যে স্থানে গমন করিবেন আমিও সেই খানে যাইব। হে সুরেশ, আপনি আমার স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইতেছেন, আমি তথায়ই গমন করিব।"*

কিয়দ্দূর গমন করিয়া যমরাজ বলিলেন তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কী প্রার্থনা করো। তিনি বলিলেন যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয়, করুন। যমরাজ "তথাস্তু" বলিলেন সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্তিণী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন। সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন, "তুমি বাটী ফিরিয়া যাও সেখানে তুমি রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ।" সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন, "স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায়? আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন,

---

* শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে
যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবম্।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে॥ মহাভারত, বনপর্ব, ২৯৭ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

আমার স্থির প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। স্বামী বিনা আমার সুখে কাজ নাই। স্বামী বিনা আমার সৌভাগ্যে কাজ নাই। স্বামী বিনা আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না। স্বামিহীন জীবন আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।"*

তখন যমরাজ জানিলেন সাবিত্রী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন তাঁহাক অর্পণ করিলেন। সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান্ জীবনপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন "উঃ অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।" এই বলিয়া সত্বরপদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া হর্ষদ্বিগুণিতবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীনকালের রমণীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা ছিলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার একজন সারথির সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন তিনি সর্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শিণী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্চর্য রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান্ তখন একজন অন্ধমুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণপোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে রমণীর মন আকর্ষণ করে।

একবার সত্যবান্কে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন, শুনিলেন না। বলিলেন এ-সকল কাজ একবার ছাড়া দুইবার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া অন্ধশ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা একদিনের জন্যও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু সর্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও ব্রতপালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর দিবস উপস্থিত

* ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং।
ন ভর্ত্তৃহীনাং ব্যবসামি জীবিতুম্॥ মহাভারত, বনপর্ব, ২৯৭ অধ্যায়, ৫৩ শ্লোক।

জানিয়া কাহারো কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা যাহা ঘটিল পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যমরাজ বর দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভবর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বামীবিয়োগে অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে প্রাকৃত রমণীরা কখনোই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতার সহিত কার্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্বস্ব, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্তব্য-কর্ম তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন; তাহা হইলে তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয়া হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল। এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী এক বৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করেন? কোন্ রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেই-বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাত সময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে দৃঢ়নিশ্চয়া হইতে পারেন? এবং কেই-বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্তব্য-কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন?

স্মৃতিসংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে, সাবিত্রীর তাহা সকলই ছিল। তাহার উপর তাঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাকে সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টস্বভাবা তাহাতে কোনোরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নত-চরিত্রা বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

শেষোক্ত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রৌপদী, দময়ন্তী ও সীতা সর্বপ্রধান। শ্রীবৎসমহিষী চিন্তা, ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী, প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তা। ইঁহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীপন স্বামীশুশ্রূষা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমন করিল। তিনি শোকজর্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন এবং পরিশেষে আশ্রমে থাকিয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করেন এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন, এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোনো গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপরি উক্ত দুইটি কার্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য ও বিশুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন। শ্রীবৎস রাজার মহিষী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর সদৃশ। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি প্রশংসনীয়া কামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করিলেন তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতিদুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুবালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা

রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞ হইল, ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্ঠিরের দোষে রাজ্য গেল, ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্যন্ত হারিলেন, সভার মধ্যে দুরাত্মারা তাঁহার যার পর নাই অবমাননা করিল। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জুনের আরোও ভার্যা ছিল, ভীমেরও ছিল, সকলেই আপন আপন বাটী রহিল, কেবল দ্রৌপদী স্বামীভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন; যুধিষ্ঠিরের সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন; অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন; সর্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জুনকে ইন্দ্রসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবসৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্বদা ধর্মকথা শ্রবণ করিতেন। একদিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্মপরায়ণ ও সর্বগুণসম্পন্না কামিনী আর আছে? যদিও দ্রৌপদী কোনোরূপে অসহ্য বনবাস যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, বিরাট রাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বভ্রূবাহনহস্তে অর্জুনের পরাভব হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া উঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া সর্বপ্রথমেই দেহত্যাগ করিলেন।

"দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। যদিও তাঁহার পঞ্চ স্বামী হইয়াছিল, তিনি সেই পঞ্চ স্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম পরায়ণা পতিব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই-সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে।"

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা— তিনি বিবাহের পর সর্বদা স্বামীশুশ্রূষায় ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সর্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কেকয়ীর গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন, তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক

হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন, রাম তাঁহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন, বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম কর্ম করিতে পারা যায় এবং তাহাদ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, আমায় না লইয়া বনে যাওয়া তোমার কোনো মতেই উচিত নহে। তোমার সহিত তপস্যাই করি, আর বনেই বাস করি, সেই আমার স্বর্গ। আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিব না। তুমি আমায় যে কুশ-কাশ-শরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও কণ্টকী বৃক্ষের ভয় দেখাইতেছ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সহিত গমন কালে তাহাদের স্পর্শ তুলা ও অজিনের ন্যায় কোমল হইবে।* এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তিনি উহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রূ শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগপূর্বক জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা। বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপর খানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন্! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌষের বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু তাঁহার সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমন সময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

---

* স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥
ন চ মে ভবিতা কশ্চিত্তত্র পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥
কুশ-কাশ-শরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০ সর্গ, ১০, ১১, ১২ শ্লোক।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরানীও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগালস্বরূপ, দাঁড়কাক স্বরূপ। আমি রামভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ ইহার জন্যে তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে; সীতা তাহাকে কেবল বলেন, রাম নামে পরম ধার্মিক পুরুষ, তিন লোকে বিখ্যাত, তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও নয়ন বিশাল, তিনিই আমার স্বামী ও আমার দেবতা।*

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল, তুমি যদি আর-এক মাসের মধ্যে [দুই মাসের] মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না করো তোমার মাংস ভোজন করিয়া মনস্কামন পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, আমার এ শরীর সংজ্ঞাশূন্য, তুমি ইচ্ছা হয় ইহাকে রক্ষা করো, ইচ্ছা হয় ইহাকে নাশ করো, আমি আমার শরীর ও জীবন কিছুই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না।**

হনুমান্ আসিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন; রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে ভয় দেখাইতেছে, কখনো বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপনগুণে সেই ভয়ানক রাক্ষসপুরীমধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নাম্নী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। হনুমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনুমান্‌কে আশীর্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল, রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

---

* রামোনাম স ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘ বাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম॥

** ইদং শরীরং নিঃসংঙ্গং রক্ষ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি রাক্ষস॥

[পাঠান্তর ** ইদং শরীরং নিঃসঙ্গং বান্ধ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাক্ষস॥]

রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৫৬ সর্গ, ২১ শ্লোক

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, সীতে! আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি, শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল। এই-সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকশিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশস্বরে কহিলেন, জানকি! আমার কর্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করো। সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাস্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, স্বামিন, তুমি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলে। আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কী অবস্থায় বাস করিয়াছি তোমার দূত হনুমান্ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে? তুমি যে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সেকথা একবার মনেও করিলে না। আমার স্বভাব ও ভক্তির কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলে?*

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্বসমক্ষে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশসময়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন

"যেহেতু আমার মন কখনো রাম হইতে অপনীত হয় নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু রামচন্দ্র আমায় শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানেন, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেগুহতু আমি কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রেরই সেবা করিয়াছি, অন্য কাহারো কথা কখনো মনে করি নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন।"**

---

* ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতং॥ রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬ সর্গ ১৬ শ্লোক।

** যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহং।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥ রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬ সর্গ, ২৫-২৭ শ্লোক।

অগ্নিপ্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা বহু-কাল রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ, তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি আশ্রমগমণব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারণ পরিত্যাগসংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন। পরে লক্ষণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বৎস, নিরন্তর নিতান্ত দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি পূর্বজন্মে যে কী পাপ করিয়াছিলাম, কোন্ পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না, নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।"

পুনশ্চ বলিলেন—

"লক্ষ্মণ, তুমি আর্য পুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সর্বদা আপন কর্মে অবহিত হইতে বলিও।"

এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথা সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন, এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনঃগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে— এবার শপথ। সীতা যখন সভা মধ্যে উপস্থিতা হইলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্বচনীয় প্রণয় পূর্ববৎই আছে; কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী পৃথিবী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার সকরুণ বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয়হৃদয়ে গভীর শোকসাগর উথলিয়া উঠে। তিনি বলিতে লাগিলেন, যেহেতু রাম ভিন্ন অন্য কাহারো কথা আমি কখনো মনেও করি নাই, অতএব হে দেবি পৃথিবি, তুমি আমায় অবকাশ প্রদান করো। যেহেতু চিরকাল কায়মনোবাক্যে রামেরই পূজা করিয়া আসিতেছি, অতএব হে দেবি পৃথিবি, তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু আমি সত্য বলিতেছি যে আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, অতএব হে দেবি, তুমি আমায় স্থান দেও।*

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতাল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সর্বপ্রধান। সীতা সর্বগুণ সম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর-কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল কোনো কালে কোনো নারী তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা ধরণীপতির মহিষী হইয়াও এক প্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমত স্বামীর সহিত বনে গেলেন, তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনোরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

---

* যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৯৭ সর্গ, ১৪-১৬ শ্লোক।

~ ~

তুলনা

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনেই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তি বলে উঁহাদের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষণের প্রতি তাঁহার স্নেহ সর্বদা সমান। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন, তথাপি তিনি উঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোনো স্থলেই সীতার কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উহাকে সুশীলা ও একান্ত সুধীর স্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোনো শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না; এবং এমন কষ্ট নাই যে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন কর্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্বপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তি সমূহের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

আমরা এপর্যন্ত যে-সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্য গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনোই বোধ হইবে না। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাগত অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্মের লোপ হইয়াছে, পৌরাণিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, আর্যগণ বিলাসী হইয়াছেন, কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীর্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রম পালন করেন না, তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় রমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন, কেবল দাসীমাত্র। রাজারা পূর্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামতো অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। দশকুমারচরিত পাঠ করিলে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের, বিশেষত আমাদের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

কবিগণ যে-সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, না-হয় মহাভারত বা **রামায়ণ** অথবা কোনো প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে-সকলগুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থাবিষয়ক অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক ও মালতীবাধব প্রধান। দশকুমারচরিত এবং কাদম্বরী-ও কোনো

শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যেগুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা এক প্রকৃতির নহে। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, একজন সেনাপতি তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালে লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিল। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজকর্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে-সকল শিক্ষা আবশ্যক, তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। কিছু দিন পরে গান্ধর্ববিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন-না তিনি সুন্দরী, নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন, সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন, মহারানীর বিরাগভাগিনী হইলেন, তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাদৃশ সমর্থ নহেন, তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র, বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায়, কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ; এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্তাদিগের লোপামুদ্রা, ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরন্ধ্রীদিগের লোপামুদ্রা, যুবতীদিগের সাবিত্রী এবং সর্বাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ, সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এস্থলে বর্ণিত হইল।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাব চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা, সাবিত্রী বা শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থানপ্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও একজন। মালতীমাধব-এর মধ্যে আর-একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইঁহার নাম কামন্দকী— ইঁহার সংসারকার্যচাতুর্য, বুদ্ধিকৌশল, শাস্ত্রজ্ঞান, কর্তব্যকর্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগ, মালতী ও মাধবের প্রতি অলৌকিক স্নেহ ছিল। ইঁহার সাহস পুরুষের ন্যায়, মনের বল পুরুষের ন্যায়। ইনি দুইজন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাঁহাদের সমতুল্যা। দুইজনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে

তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে বিরাগিণী, বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র-এর পণ্ডিত কৌষিকী এবং মালতীবাধব-এর কামন্দকী, কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কৌষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী তাঁহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায়, বিদ্যাবুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্বদা তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি যতদিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই রাজকন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কৌষিকী হিন্দু ও কামন্দকী তাহা হইতেও আবার কর্মকুশল। তিনি আপন কার্যে অনুমাত্র অনাস্থা করেন না, এবং প্রাণপণে কার্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কৌষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহসসহকারে কালকাপালিক অঘোরঘন্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কৌষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন; সমভিব্যহারিণী রাজকুমারীর কোনোরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ— সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই, বৌদ্ধের মঠে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়। হিন্দুর মঠে দুই-একটি ঈদৃশী সংসারবিরাগিনী রমণী দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল, পণ্ডিত কৌষিকীও বিরল।

শৈব্যা হরিশচন্দ্রের মহিষী— শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণীকুলের বিভূষণস্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্বস্ব গেল; তিনি দক্ষিণার জন্য আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, তখনো শৈব্যা তাঁহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, "আর্যপুত্র স্বার্থপর হইও না। আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করো। তোমার প্রণয় কেন বিরূপ হইতেছে?" এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন। হরিশচন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন, "আর্যগণ! আমায় ক্রয় করুণ। পরপুরুষ উপাসনা এবং পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন ভিন্ন আমি সর্বকর্মকারিণী।" যখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্পলোচনে বলিলেন, "কী সৌভাগ্য! আমি আর্যপুত্রকে অর্ধেক প্রতিজ্ঞাভার হইতে উদ্ধার করিলাম"। আর্যপুত্রের ঋণের অর্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জন্য যে দাসী

হইলেন সেটি তাঁহার মনেও হইল না। কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার একমাত্র সন্তানও কিছু দিন পরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, সে স্বর প্রস্তরও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্বতী— ইনিই পূর্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এ জন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন, দেবতা, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যা আবশ্যক ও পূজা আবশ্যক। পার্বতী প্রথমত পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই মহাদেবকে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করেন। পার্বতী বিদ্যাবতী, পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প, কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ নহে, উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে প্রণয় বাল্মীকির ন্যায় নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্বতীর প্রণয় বর্ণনা করিয়াছেন তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না এরূপ বলা অসঙ্গত। পার্বতী মহাদেবে প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্যা গ্রহণ করেন, পার্বতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যবিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল ; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখনি সে ভাব সংবরণ করিয়া কোপকটাক্ষে মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন, এবং স্ত্রীসন্নিকর্ষ পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপস্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিনশরীর ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যে-সকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম, পার্বতী সেই-সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ নিন্দা অসহ্য। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে! তখন কোপ, প্রণয়, বিস্ময় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদ্গত হইয়া তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মাইয়া দিল, তাহা কালিদাস ভিন্ন আর-কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে

পারেন কিনা সন্দেহ। তিনি পিতার নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সামাজিক অবস্থা জানেন; কিন্তু জানিয়াও ভাবিলেন বিশুদ্ধ প্রণয় প্রকাশে দোষ কী? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্মচতুরা, দেবারাধনায় তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে, মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধিপতি, যদি দেবতা তোমার কামনা হয়, বলো। পার্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্বতী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জবাব দিলেন। পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল তখন লীলাকমল পত্রের গণনায় তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকের সংসর্গ ভালোবাসেন না, গুরুজনের নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে-সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় সে-সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্বহেতুভূতা। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিয়াছেন, তাহা এখনো তীর্থ। তাঁহার নিকট সিতশ্মশ্রু ঋষিগণও ধর্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগের উদাহরণস্থল। তাঁহার চিরত্র প্রণিধানপূর্বক পাঠ করিলে বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিকতার লেশ মাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্মে ভক্তি, দেবতায় ভক্তি, মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা, বিশেষত তাঁহার সরলতা, পিতৃভক্তি, স্বামীভক্তি, সখীগণের প্রতি ব্যবহার, এবং আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্র বিষয়ে কবিরা যে কতদুর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন, পার্বতীচরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শন-কার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে-সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নহে। বাল্মীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার শৈশবের কোনো কথাই লিখেন নাই। কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাল্মীকির সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই তিনি অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। ঐ সর্গও নীরস, কিন্তু তাহার বিদ্যুত্ত্বরিতগতি বর্ণনায় একটি আশ্চর্য শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্দশে সীতাচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বনবাস-এর অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ংকর আদেশ সীতাকে অবগত করাইলেন, তখন সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থিরদুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,

"বৎস! তুমি সেই রাজাকে বলিও, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, তোমার সমক্ষে এই মুহূর্তেই জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি তাঁহাকে বলিও আমি প্রসবের পর সূর্যের দিকে নয়ন নিবিষ্ট করিয়া তপস্যা করিব, যেন অন্য জন্মেও রাম আমার পতি হন, কিন্তু যেন এরূপ বিচ্ছেদ কখনো না হয়।"*

তিনি আবার বলিলেন,

"তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে যদিও ভার্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমি যেন সামান্য প্রজা বলিয়া, গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানেই যাই তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।"

মহর্ষি বাল্মীকি যখন তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া রাখিলেন, তখন তিনি নিরন্তর অতিথিসেবা ও স্নানাদি ধর্মকার্য করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এত যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিলেন আজিও রাম তাঁহা ভিন্ন আর-কাহাকেও জানেন না এবং তিনি হিরন্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সেই নিদারুণ কষ্টের কতক শমতা হইল।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞসমাপনান্তে পৌরবর্গকে সমবেত করিয়া সীতার পরীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন,
"যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা কখনোই করি নাই, অতএব হে দেবি বিশ্বম্ভরে, আমায় অন্তর্ধান করিয়া লও।"**

ভগবতী বিশ্বম্ভরা সীতার কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে

---

* সাহংতপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।

রঘুবংশ, চতুর্দশ সর্গ, ৬৬ শ্লোক।

** বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবিমামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি।।

রঘুবংশ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ৮১ শ্লোক।

অন্তর্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস সীতা চরিত্রের দুই একটি অতি বিশুদ্ধ, নির্মল ও ভাবপূর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক। সেই সমুদায় হইতে স্ত্রীচরিত্র সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থবিস্তার হইয়া পড়ে, সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ, রত্নাবলী, বাসবদত্তা, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্বশ্বভূত অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটি রমণীর চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটি রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্বরাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবনপ্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। দেবতা ও ঋষিরা উভয়কেই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই অনেক কাল বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু, বনলতা, বনময়ূর, বনমৃগ উভয়েরই প্রিয় পাত্র; উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রগাঢ় প্রণয়বিশিষ্ট; বনবাসসখীদিগের সহিত উভয়েরই সমান সখ্যভাব। সীতা রাবণকর্তৃক পীড়িতা হইয়া এক্ষণে রাজধানীতে প্রত্যাগতা হইয়াছেন, রাজরানী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাঁহার সকলভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ সময়ে সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। শূর্পনখাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল, আর্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইল, তপোবন দেখিয়া পুনর্বার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি রামকে বলিলেন, "তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে।" রাম কহিলেন, "অয়ি মুগ্ধে! একথাও কি বলিতে হয়!" তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে চিত্রদর্শন জনিত নানা উদ্বেগ এখনো প্রশমিত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন, "আর্যপুত্র এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।" রামচন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলে নিদ্রাভঙ্গানন্তর উঠিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, রাগ করিব" তাহার পরই বলিলেন, "যদি তখন মনের সে বল থাকে।" লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্যপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষণ প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন, তখন সীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না

পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরথী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন ভাগীরথী ছল করিয়া তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আর্যপুত্রের সহিত নানা সুখভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে "সরসী আরসীতে" আর্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন, আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও কার্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়াছেন, সঙ্গে কেহই নাই। রামের গম্ভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সীতা চকিত ও উৎকুণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন সত্যই তাঁহার আর্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন, তখন সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন এবং একতান মনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য শোক করিতেছেন, তখন বলিলেন, "এ কথা এরূপ ঘটনার অসদৃশ"। তাহার পর বলিলেন, "আর্যপুত্র তুমি আজিও সেই-ই আছ।" রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "যা হবার হউক, আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব।" যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "সখি তুমি ভালোর জন্য বলিতেছ বটে, কিন্তু দেখিতেছ না কি উহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে। সখি তুমি বিরত হও।" তাঁহার পালিত করিশাবক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল, উহাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাঁহার হর্ষ হইল এমন নহে, তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথধ্বজ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ কাহার সাধ্য সে দিক হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর "অপূর্ব পুণ্য হেতু আর্যপুত্রের দর্শনলাভ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীচরণে নমো নমঃ" বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল তিনি বিশুদ্ধচরিত্রা। রামচন্দ্র পৌরজনপদবর্গের মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারো দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই।

তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্রে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে বোধ হয় বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতা ধর্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্ন কামিনী কোনোকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতিলাভ করিয়া তাঁহার মতো দুঃখভাগিনী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।"

শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁহাকে বন মধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গৃহকার্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তপোবন-তরুদিগের পরিপালন করিতে তিনি বড়ো ভালোবাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ গমন কালে বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহাকে ভালোবাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে, পুষ্পবৃক্ষের আলবাল পূরণ করিতেছে এবং তাঁহার ভাবিবিরহের আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অনুমাত্র চিন্তা নাই। তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাহারা দুর্বাসার শাপ মোচন করিল, তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল, এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক।" তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকে বলিতেন, এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরলহৃদয়া গৌতমীও তাঁহাকে বড়ো ভালোবাসিতেন। তিনি পিতৃসেবায় তৎপরা ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধীভাব এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত, ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, ততই আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ম্রিয়মাণা হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখীরা তাঁহার কথা রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈবদুর্বিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না; কণ্বমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং সত্বর তাঁহাকে দুইজন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালে আপন হরিণশিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশুভক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

বেদব্যাস সাধ্বী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভালোবাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে-সকল কথা কহিয়াছিলেন, কালিদাস ঠিক সেই-সকল কহাইবার জন্য তাঁহার সহিত দুই-জন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাজা দুর্বাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে-সকল অভিজ্ঞানের কথা কহিলেন তাঁহার ন্যায় সরল স্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কী হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃসংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাহার পর শার্ঙ্গরব তিরস্কার করিয়া উঠিলে ভীত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল, তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্যন্ত বাস করিলেন। তিনি পুরোহিত-গৃহ গমনকালে কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি তাঁহাকে লইয়া তিরোহিত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয় শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রেষিতভর্তৃকা বেশে ধর্মকর্ম করিয়া পতিব্রতা ধর্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালন পালন করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলা-বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে— শাপ মোচন হইয়াছে। তিনি উঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনো শকুন্তলা বলিলেন, "সে সময় আমার অদৃষ্ট আমার বিরোধী ছিল, নহিলে আর্যপুত্র এত সদয় হইয়াও এত বিকল হইয়াছিলেন কেন? যাহা হউক, আমার অদৃষ্ট পরিণামে সুখদ হইবে।" রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন, তখন ভীরুস্বভাবা শকুন্তলা কহিলেন, "আমি উহাকে বিশ্বাস করি না" এবং যখন শুনিলেন, শাপপ্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না, তাঁহার আনন্দ

উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে আর্যপুত্র অকারণে ত্যাগ করেন নাই।" আর্যপুত্রের নির্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্বতী, ভবভূতির সীতা, বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের চরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই-সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, সীতা পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী, পার্বতী, শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি যে-সকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলংকার, সেই-সকল গুণ ইঁহাদের সকলেরই অধিক পরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ে মহার্হরত্ন, ইঁহারা সেই প্রণয়ের আধারভূমি। স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের যে-সকল কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, কবিরা সে নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোকের যে-সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সেই-সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কোনো নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষা, বঞ্চন, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, ধূর্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন, "যাহা হউক, রাগ করিব", তাহার পরক্ষণেই বলিলেন, "যদি তখন মনের সে বল থাকে।" সাধ্বী রমণীর ঈর্ষা থাকে না। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারো অভিমান হয় নাই। উভয়ই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন, শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন এই ভয়ে ব্যাকুল হইলেন। দক্ষ বলিয়াছেন, সাধ্বী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোনো সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় ভার্যালাভ হয় না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম প্রকাশিত রচনা ভারতমহিলা বঙ্গদর্শন পত্রিকার ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্‌গুন-চৈত্র তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। হরপ্রসাদ তখন সদ্য বি.এ. পাশ করেছেন। এই রচনাটির একটু ইতিহাস আছে। তিনি নিজে লিখেছেন, "১৮৭৪ সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র 'On the highest ideal of woman's character as set forth in [by] ancient Sanskrit writers'—একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা করো'। কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশিই লাগিয়াছিল। ৭৬ সালের প্রথমে আমি বি. এ. পাশ করিলাম। উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভালো ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাংলার লেফটেনান্ট গর্বনর স্যার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই

পাইব। স্যার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন ও কতগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন। (“বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়, হ-র-সং-২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।) উদ্দীপিত তরুণ লেখক হরপ্রসাদ প্রবন্ধটি আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের চেষ্টায় সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের কাছে যান। যোগেন্দ্রনাথ বলেন, “তুমি বাপু যেসকল ‘ভিউ দিয়াছ আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।” (আগের সূত্র, পৃ. ১৬)। লেখাটি তাই প্রকাশের ব্যবস্থা হল না। পরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যাঁকে হরপ্রসাদ নিজের “বাল্যকালের বন্ধু, গুরু ও দেবতা” মনে করতেন, তাঁকে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বঙ্গদর্শনে লেখা প্রকাশের সুযোগ করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র লেখাটি যত্ন করে দেখেন এবং ‘সংস্কৃতওয়ালা’-দের রচনার শৈলী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে হরপ্রসাদ বলেন, “আমার রচনার প্রথম পাতেই ‘নদনদী পর্বত কন্দর’ আছে”, ... “প্রথম চারিটি পাত এবং সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই ঐরূপভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।” (আগের সূত্র, পৃ. ১৮)। প্রথম তিনটি মাত্র পরিচ্ছেদ সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে দিয়ে এলেন। এই অংশ ছাপা হলে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে গিয়ে আবার দেখা করেন। হরপ্রসাদ বলেন, “আমি আর-একদিন তাঁহার কাছে বাকি অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকিগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন।” (আগের সূত্র, পৃ. ১৯)। দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করলেন, “যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এ-সব কাঁচা সোনা।” (আগের সূত্র, পৃ. ১৯)।

হরপ্রসাদের রচনা এবং রচনাশৈলী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বোঝা যায়, কত বড়ো মর্যাদা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ হরপ্রসাদকে বঙ্গদর্শনে এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের লেখকমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।

২. বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের সূচি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম প্রবন্ধ "ভারত মহিলা" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

মাঘ,	প্রথম অধ্যায়
	দ্বিতীয় অধ্যায়
ফাল্গুন,	তৃতীয় অধ্যায়
চৈত্র,	চতুর্থ অধ্যায়
	পঞ্চম অধ্যায়
	ষষ্ঠ অধ্যায়

৩. পাঠ-বিন্যাস

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশের পরে ভারতমহিলা গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দ ১৮৮১ খৃস্টাব্দে, কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ছাপা এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণ হয় যথাক্রমে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৮২ খৃস্টাব্দ এবং ১৮৯১ খৃস্টাব্দে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে (বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার তারিখ) প্রকাশিত হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী-তে এবং ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত হরপ্রসাদ-রচনাবলী প্রথম সম্ভারে ভারতমহিলা ছাপা হয়। দুটি সংগ্রহেই তৃতীয় সংস্করণের পাঠ নেওয়া হয়েছিল।

প্রথম সংস্করণ আমরা পাইনি, কিন্তু আনুষঙ্গিক তথ্য থেকে বলা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ হুবহু প্রথম সংস্করণে নেওয়া হয়নি। পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। ফলে পত্রিকার ছয়টি অধ্যায় গ্রন্থে দাঁড়ায় পাঁচ অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে পরীক্ষকদের তুষ্ট করার জন্য 'নদ-নদী-পর্বত-কন্দর' সমাকীর্ণ ভাষা যে নিজের রুচির বিরুদ্ধেই ব্যবহার করেছিলেন— হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে একথা বলেন। রচনার ভাষা পরিমার্জনা হরপ্রসাদের স্বভাবগত ছিল। 'ভারতমহিলা'-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠেও অনেক পরিমার্জনার নজির আছে। পত্রিকার পাঠ এবং তৃতীয়

সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে দেখা গেছে, কোনো কোনো পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন করে লিখেছেন। শৈলীগত পরিমার্জনায় এবং কোথাও কোথাও বাক্যাংশ বর্জন করায় ভাষা সাবলীল হয়েছে সন্দেহ নেই।

বর্তমান সংকলনে তৃতীয় সংস্করণের পাঠই নেওয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এই পাঠ ষোলো বছর আগের ছাত্র বয়েসের রচনা থেকে অনেক আলাদা এবং এঁকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম প্রয়াস বলা যায় না।

পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের বর্জিত প্রথম অধ্যায়টি নিচে তুলে দেওয়া হ'ল।

৪. পাঠ–প্রসঙ্গ

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের বর্জিত প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পৃষ্ঠায় (৪৬৮) পাদটীকা ছিল, "এই প্রবন্ধ মহারাজ শ্রীযুক্ত হূলকার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রী হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

[প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। আর্য্য পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে উন্নতি লাভ করে। ভারতবর্ষীয়দিগের দর্শনশাস্ত্র ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইয়ুরোপীয়েরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার অনেক তত্ত্ব প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় গভীর চিন্তার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি]

আর্য্য পণ্ডিতেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। তাঁহাদিগের সাহিত্য, রত্নাকর বিশেষ। উহাতে যে রত্ন চাও

তাহাই মিলিবে। কি নৈসর্গিক সামগ্রী, নদ, নদী, পৰ্ব্বত, কন্দর, কি শিল্প সামগ্রী, প্রাসাদ, বাপী, উপবন, ক্রীড়াশৈল; কি আন্তরিক গভীরভাব, হৃদয়-বিদারক শোকপ্রবাহ, কি আনন্দনিস্যন্দিনী প্রণয় বর্ণনা, সকল বিষয়েই আৰ্য্যকবিগণ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

[কবিত্বশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব]

কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে তাঁহারা যদি কোন জঘন্য বা ভয়ানক বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি হয়। শ্মশান অতি ভয়ানক পদার্থ; কিন্তু ভবভূতি সেই শ্মশান বর্ণনা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, যাহা লোকে ভাল বাসে এমন কোন বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা যে আরো অধিক প্রীতি উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের একটি অমূল্য রত্ন। নারীগণ সেই প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারী চরিত্র বর্ণনা করিয়া মানবমণ্ডলীর আনন্দ সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন।

[আৰ্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্র]

আমাদিগের আৰ্য্যকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তি বলে যে নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিধিনির্ম্মিতরমণীগণাপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর রমণীয় পদার্থ। তাঁহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহার চরিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, কাহার ধৰ্ম্মপরায়ণতা দেখিলে আত্মার বৈশদ্য সম্পাদন হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিকল্পনা-সম্ভূত-রমণীগণের মধ্যে কোন্ গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে হইবে।

[কল্পনাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ]

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন তিনটি কারণ বশতঃ তাঁহাদের কল্পনা শক্তির সর্ব্বতোমুখী তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে না। ১ম। কবিরা সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন। ২য়। তাঁহারা যে দেশের জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন সেই দেশের লোকের যাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের সচেষ্ট থাকিতে হয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশক্তিকে সম্যক্ প্রকাশিত হইতে দেয় না। ৩য়। কবিদিগের নিজ স্বভাবও সময়ে সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই তিনটির মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব সময়ে২ প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেও পারে। মিল্টনের মহাকাব্য যে সময়ে লিখিত হয় সে সময়ে জাতীয় স্বভাব অতি জঘন্য ছিল। কিন্তু মিল্টন ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এসময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্তু জাতীয় স্বভাব ভাল হইলে অবশ্যই ইহার আদর হইবে।

[সর্ব্বোৎকৃষ্ট নারীচরিত্র বর্ণনা দুরূহ]

কবি কল্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনির্ম্মিত রমণীচরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্ব্বোক্ত তিনটি কারণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র Highest Ideal চিত্রিত করা তাঁহাদিগের পক্ষেও দুরূহ।

[সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, নির্ণয় করা যায়]

যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কারণত্রয়কে পরিহার করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তি বলে কোন অনন্য সাধারণ গুণসম্পন্না কামিনীর চরিত্র বর্ণনা করেন তবে সেই রমণীই নারীকুলের প্রধান রত্ন হইবে। তাহার চরিত্রই রমণীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal হইবে। তাহার সহিত তুলনায়, কবিকল্পিত রমণীগণ অনেকাংশে ন্যূন হইবে। কোন কবিই, এ পর্য্যন্ত তাদৃশ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সামাজিক বন্ধন

হইতে আপনাকে সম্যক্‌রূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যদিও এরূপ রমণী সৃষ্টি করা একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাদৃশ রমণীর কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়া উচিত কোন্ কোন্ বৃত্তি নিস্তেজ হওয়া উচিত তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায়।

[মনুষ্যের মনোবৃত্তি বিভাগ]

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনুষ্যের মানসিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ২য় স্নেহ প্রবৃত্তি ৩য় কর্ম্মনিষ্ঠতা। যে শক্তিদ্বারা গণিত ও পদার্থ বিদ্যার সমুন্নতি করা হয়, যে শক্তিদ্বারা আপন(২) কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহা দ্বারা রাজমন্ত্রীরা রাজকার্য্য পর্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যব্যূহ রচনা করেন, দার্শনিকেরা কূটার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা আমরা সামাজিক লোকের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলিতে পারি, যাহাদ্বারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, পুত্রদিগকে স্নেহ করিতে, দুরবস্থকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভাল বাসিতে শিখি তাহার নাম স্নেহ প্রবৃত্তি। স্নেহ প্রবৃত্তি সুখ ও দুঃখের কারণ। মনুষ্যের যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে, সে সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত। কর্ম্মক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির অপর নাম। শুদ্ধ মানসিক ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। যে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়, যাহা দ্বারা লোকে অপার সমুদ্র পার হইয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, জীবন সংকটাপন্ন করিয়া, ঈপ্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় সেই যথার্থ কর্ম্মক্ষমতা।

এই তিনটী প্রবৃত্তিই মনুষ্যস্বভাবের নিরন্তর সমভিব্যাহারী। অতি মুর্খ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হটেন্টট দিগেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। নরমাংসলোলুপ আণ্ডামান বাসীদিগেরও স্নেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রায় ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কাফ্রি দিগেরও কর্ম্মক্ষমতা আছে। তবে পরিমাণগত ইতর বিশেষ মাত্র। আমরা ঈশ্বর ভিন্ন আর কুত্রাপি এই বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ও প্রকর্ষ পর্যন্ত (perfection) কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ মনুষ্যকল্পনা করিতে পারি যাহার সকল কয়টীই সতেজ এবং একটী, মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

~ ~

[কাব্যলিখিত পুরুষ চরিত্রের প্রকর্ষপর্য্যন্ত]

যখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি তখন আমরা তাঁহাকে যতদূর পারি কর্ম্মক্ষম করি তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী করি। তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি যদি কর্ত্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য সেই তেজস্বিনী স্নেহ প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন তবেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলেন, দাতা কর্ণ পুত্রকেও বধ করিলেন; তিনজনেই স্নেহ প্রবৃত্তিকে কর্তব্য কর্ম্মের দ্বারে বলি দিলেন। এবং তিনজনই জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইলেন।

[তাদৃশ নারীচরিত্র]

কিন্তু যখন আমরা ঐরূপ নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে বসি তখন আমরা তাঁহাকে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত করি। পুরুষের যেমন, কর্ম্মক্ষমতা সর্বস্ব হইবে, নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি সেইরূপ। তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বতোভাবে সমুন্নতি লাভ করিবে। প্রণয় তাঁহার জীবন স্বরূপ হইবে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, অপত্য স্নেহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ঈশ্বর পরায়ণতা, প্রভৃতি যাবতীয় কোমল সুন্দর এবং মানস প্রফুল্লকারী বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা সম্ভবমত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হইবে; কর্ম্মক্ষমতা তাহা অপেক্ষা ন্যূন হইলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সমান স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সহিষ্ণুতা অপেক্ষা কর্ম্মক্ষমতা তাহাদের মতে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার জন্য, পরের উপকারের জন্য তাঁহাকে নানাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবশ্যই তাহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে।

[নারীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তি প্রধান হইবে বলিবার কারণ]

অনেকে বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল হইলেই যে নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট

হইবে এরূপ বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে আমরা দেখিতে পাই ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল; মনুষ্যদিগের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহপ্রবৃত্তি বলবতী এবং যে কোন কবিই নারীচরিত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি উহার স্নেহপ্রবৃত্তিকেই অধিকতর প্রকাশিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সন্তান লালনপালনের ভার সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের প্রতি অর্পিত হয় এই জন্য স্ত্রীলোকের অপত্য স্নেহ বলবান্ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল এজন্য স্ত্রীলোককে পুরুষের আশ্রয়ে বাস করিতে হয়। সুতরাং যে সকল মনোবৃত্তি থাকিলে সমাজে সদ্ভাবের সহিত চলা যায়; তাঁহার পক্ষে সেগুলির আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অতএব স্থির হইল যে দেশগত কালগত অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য পরিহার পূর্ব্বক নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্যন্ত বা Highest Ideal স্থির করিতে হইলে তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকে যতদূর পারা যায় তেজস্বিনী করা আবশ্যক। তাঁহার কর্ম্মণ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ থাকা উচিত। কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অনুরোধে তাঁহাকে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং যারপর নাই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

[প্রস্তাবের অবতারণা]

পৃথিবীর তাবদ্দেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাবের অনুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরচরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। আমাদিগের প্রাচীন কবিগণ পূর্ব্বোক্ত কারণত্রয়ের অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনীগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা নায়িকাকূলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। হিন্দুদিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্না পতিপরায়ণা কার্য্যকুশলা রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় পৃথিবীর আর কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

এইরূপ উপক্রমণিকার পর দেখা যাউক আর্য্যকবিগণ নারীচরিত্র বিষয়ে কতদূর কৃতাকার্য্য হইয়াছেন এবং কতদূর ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

৫. অনুষঙ্গ

বঙ্গদর্শন ও সাধারণী পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতমহিলা-র সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত হল।

[এক]

'ভারতমহিলা', শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. প্রণীত, ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শন' হইতে উদ্ধৃত। মূল্য ॥০ আনা।

১৮৭৫ [১৮৭৪] সালে মহারাজা হোলকার কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজ দর্শন করিতে যান ও তৎকালীন সংস্কৃত কালেজের ছাত্রবর্গের মধ্যে যে কেহ "ভারতবর্ষীয় প্রাচীন লেখকগণ স্ত্রীচরিত্রের কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন" এই বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, তাঁহাকে প্রাইজ দিবেন বলিয়া যান। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হন, পরীক্ষায় ভারতমহিলা উত্তীর্ণ হয়।

গ্রন্থখানি ঠিক স্কুলবয়ের প্রাইজ এসে নহে। ইহাতে প্রাচীন সংহিতাসমূহ হইতে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা, বিবাহপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী, ধনাধিকার প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে। সমাজের পরিবর্ত্তনসহকারে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাদির যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহাও নির্ণীত হইয়াছে।

তাহার পর স্মৃতিসমূহে, পুরাণসমূহে, কাব্যসমূহে, রামায়ণে ও মহাভারতে স্ত্রীচরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার যথেষ্ট চেষ্টাও আছে। গ্রন্থকার এই সকল গ্রন্থ হইতে বহুসংখ্যক নারীচরিত্র লইয়া তাহাদের সমালোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনে যাহা ভাল বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল, বঙ্গদর্শনে তাহার সমালোচনা ভাল দেখায় না বলিয়া আমরা সমালোচনা করিতে নিরস্ত হইলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকগণ, এমন

কি অনেক পুরুষেও, এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক আমোদ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বঙ্গদর্শন
চৈত্র, ১২৮৭

[দুই]

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। ভারতের আর্য্যজাতির সমগ্র স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, এবং কাব্য মন্থন করিয়া আর্য্যনারীর মনোমোহিনী প্রতিমা তিনি আমাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। আমরা বঙ্গ সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

পুস্তকের লেখা এমন পরিষ্কার যে ভাষার যে একখানা আবরণ আছে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। মনে হয়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত বুঝি একেবারেই সাক্ষাৎ হইতেছে। আর ভাবের বিষয় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে পূর্ব্বকালের ভারতমহিলার চরিত্রসম্বন্ধে এমন একটী কথা নাই, যে সে বিষয়টি বলিলে ভাল হইত, অথচ বলা হয নাই। আর গবেষণা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংস্কৃত, স্মৃতি. পুরাণ, ইতিহাস এবং কাব্য, সমস্তই সংকলিত আছে। গ্রন্থ হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র।

বিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না। ....প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাসভূমি।

আর্য্যনারীর ভূত ভবিষ্যৎ।

যখন আমরা কল্পনারাজ্য ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখনও আমরা এতদ্দেশীয় রমণীগণের সময়ে সময়ে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাই। ....যদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে অপর

অর্দ্ধেকের দ্বারা সমাজের সমস্ত হিত সাধন হইবে এরূপ কামনা কখনই করিতে পারা যায় না।

সাধারণী

আষাঢ়, ১২৮৮

---

১. পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।

মনুসংহিতা, ৯/৩।

২. অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।।

মনুসংহিতা, ৯/২।

৩. রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ।।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১/৮৫।

৪. বৃহস্পতিসংহিতার প্রচলিত সংস্করণে এরকম কোনো বচন দেখা যায় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটির (৮৫ শ্লোকের) ঠিক পরের শ্লোক আছে—

পিতৃমাতৃসুত ভ্রাতৃশ্বশ্রূশ্বশুরমাতুলৈঃ
হীনা ন স্যাদ্বিনা ভর্ত্তা গর্হণীয়া ভবেৎ।

৫. পক্ষদ্বয়াবসানে তু রাজা ভর্ত্তা স্মৃতঃ স্ত্রিয়াঃ।
স তস্যা ভরণং কুর্যাৎ নিগৃহ্নীয়াৎ পথশ্চ্যুতাম্।। ২৮
পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে।
তৎ সপিণ্ডেষু বাসৎসু পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ ।। ২৯

নারদস্মৃতি, ১৬ অধ্যায়, দায়বিভাগ, ত্রয়োদশ বিবাদ পদ,

৬. পৈঠীনসী ধর্মশাস্ত্র অথর্ব বেদের অন্তর্গত, এর উদ্ধৃতিমাত্র পাওয়া যায়।

৭. সন্তুষ্টো ভার্যায়া ভর্ত্তা ভ্রর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণ্যং তত্র বৈ ধ্রুবম্।।

মনুসংহিতা, ৩/৬০।

৮. কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।।

মহানির্বাণতন্ত্র, ৮/৪৭।

৯. বৈশেষিক-দর্শনে প্রসিদ্ধ টীকাকার উদয়নাচার্য দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর রচনা লক্ষণাবলী, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, আত্মবিবেক প্রসিদ্ধ।

উদয়নাচার্যের মেয়ে লীলাবতী। ভাস্করাচার্যের স্ত্রী। গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত। চারভাগে বিভক্ত ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি গণিতগ্রন্থের প্রথমভাগের নাম লীলাবতী। এইভাগের বীজগণিতের সূত্রগুলি লীলাবতীর নামে চলে। কেউ কেউ বলেন, ভাস্করাচার্যের তত্ত্বাবধানে তিনি 'লীলাবতী' রচনা করেন।

১০. আনন্দগিরি নবম, মতান্তরে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ। 'শঙ্কর বিজয়'-এর রচয়িতা। মণ্ডনমিশ্র শঙ্করের কাছে তর্কে পরাজিত হলে তাঁর স্ত্রী সারসবাণী (বিদ্যারণ্যের শঙ্করদিগ্‌বিজয় গ্রন্থে নাম আছে উড়সভারতী) শঙ্করের সঙ্গে কামশাস্ত্র নিয়ে বিচার প্রার্থী হন। (দ্র. "শংকরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী", *হ-র-সং-* ৩, পৃ. ২২-২৩)। মণ্ডনমিশ্র প্রথমে কর্মবাদী মীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন, পরে অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মসিদ্ধি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১১. ৫৮৫ জন কবির লেখা ২৩৭০টি শ্লোক-সংকলন সদুক্তিকর্ণামৃত। সংকলন করেছিলেন লক্ষ্মণসেনের মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস। সংকলিত হয়েছিল ২০ ফাল্গুন, ১১২৭ শকাব্দ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১২০৬ খৃস্টাব্দে।

১২. ঊর্ধ্বংতু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।।
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্‌যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।।

মনুসংহিতা, ৯/৯০-৯১।

১৩. দশ পুরুষবিখ্যাতাশ্রোত্রিয়ানাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ।।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা *ধীমান্* জনপ্রিয়ঃ।।
'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', ১/৫৪-৫৫।

১৪. পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।।
যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।।
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতি কামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎবেষু চ।।
সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যাস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।
মনুসংহিতা, ৩/৫৫-৬০।

১৫. পিতুর্ভাগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবদ্ বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যোঃ গরীয়সী।।
মনুসংহিতা, ২/১৩৩।

১৬. মনু বলেননি। এই শ্লোকটি আছে মহানির্বাণতন্ত্রে, ৮ম উল্লাস, ৪৭ শ্লোক।

১৭. পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ।।
মনুসংহিতা, ২/১২৯।

১৮. কাশীখণ্ড, ৪ পূর্বার্ধ/৬৩।

১৯. সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাংশ্চ শুভাং গিরম্
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ।।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১/৭১।

২০. মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।।
ব্যালগ্রাহী যথা বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে।।
পরাশরসংহিতা, ৪/২৭-২৯।

২১. উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্।।
মনুসংহিতা, ৯/২৭।

২২. অথ স্ত্রীণাং ধর্মাঃ ।১।
ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্ ।২।
শ্বশ্রূ-শ্বশুর-গুরু-দেবতাতিথিপূজনম্।৩।
সুসংস্কৃতোপস্করতা ।৪।
অমুক্তহস্ততা ।৫। সুগুপ্তভাণ্ডতা ।৬।
মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ ।৭। মঙ্গলাচারতৎপরতা ।৮।
ভর্ত্তরি প্রবাসিতেঽপ্রতিকর্মক্রিয়া ।৯।
পরগৃহেষ্বনভিগমনম্—ইত্যদয়ঃ ।১০।
বিষ্ণুসংহিতা, স্ত্রীধর্মপ্রকরণম্, ২৫/১-১০।

২৩. নন্দ পণ্ডিতের সময়কাল আ. ষোড়শ শতকের মধ্য বা শেষপাদ। তাঁর রচিত শ্রাদ্ধকল্পলতা, দত্তক মীমাংসা স্মৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুসূত্রের টীকাটিও প্রসিদ্ধ। দ্রঃ Dharmasastra of Mithila : G Ganguli · Govt. Sanskrit College Research series, Calcutta.

২৪. বেদ অধ্যয়নের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ থেকে বাড়ি ফিরে বিয়ে করে গৃহপতি হতেন। গৃহপতি বাড়িতে একটি আলাদা অগ্নিশালা তৈরি

করতেন। এর নাম অগ্ন্যাধান। এইভাবে অগ্নিরক্ষা করা ছিল অবশ্যপালনীয় নিত্যকর্ম। স্ত্রীরা এই অগ্নিরক্ষায় সাহায্য করতেন।

নিক্ষিপ্যাগ্নি স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।
প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব নচিরং ক্বচিৎ॥১
পত্ন্যা চাপ্যবিয়োগিন্যা শুশ্রুষ্যোঽগ্নির্বিনীতয়া॥৩।১

কাত্যায়নসংহিতা, ১৯শ খণ্ড, ১ ও ৩-১ শ্লোক।

২৫. ব্রহ্মোদ্বাহবিধানেন তদভাবে পরো বিধিঃ।
দাতব্যৈষা সদৃক্ষায় বয়োবিদ্যান্বয়াদিভিঃ।।
পিতৃ-তৎ পিতৃ-ভ্রাতৃষু পিতৃব্য-জ্ঞাতি-মাতৃষু।
পূর্বাভাবে পরো দদ্যাৎ সর্বাভাবে স্বয়ং ব্রজেৎ।।

ব্যাসসংহিতা, ২/৫-৬।

২৬. পাটিতোঽয়ং দ্বিধা পূর্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্ধেন চার্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ।।
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ।।

ব্যাসসংহিতা, ২/১৩-১৪।

২৭. কৃতদারোঽগ্নিপত্নীভ্যাং কৃতবেশ্মা গৃহং বসেৎ।
স্বকৃত্যং বিত্তমাসাদ্য বৈতানাগ্নিং ন হাপয়েৎ।। ১৬

আগের সূত্র, ১৬ শ্লোক।

২৮. সম্যগ্ধর্মার্থকামেষু দম্পতিভ্যামহর্নিশম্।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ ।। ১৮
ন পৃথগ্বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গবিধিসাধনম্।
ভাবতো হ্যতিদেশাদ্বা ইতিশাস্ত্রবিধিঃ পরঃ ।। ১৯
পত্যুঃ পূর্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্ ।। ২০
মার্জ্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গনম্
শোধয়েদগ্নিকার্য্যানি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা।।২১
....

~ ~

কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্বশুরূনভিবাদয়েৎ।
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ।।২৫
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারায়েৎ।
মনো-বাক্-কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।।২৬
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেসু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবৎে।।২৭
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদৈবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ।।২৮
....
পুনং সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্।।৩০
নাতিতৃপ্ত্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ।
আস্তীর্য্য সাধুশায়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্।।৩১
সুপ্তে পতৌ তদভ্যাসে স্বপেত্তদ্গতমানসা।।৩২/১

ব্যাসসংহিতা, ২/৩২।

২৯. অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া।। ৩২/২
নোচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিৎ বিবাদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।। ৩৩
ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্য্যা বঞ্চনঞ্চতিমানিতাম্ ।। ৩৪
পৈশুন্য-হিংসা-বিদ্বেষ-মহাঽহঙ্কার-ধূর্ত্ততাঃ
নাস্তিক্য-সাহস-স্তেয়-দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ।। ৩৫
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম।।৩৬।।

ব্যাসসংহিতা, ২/৩২-৩৬।

৩০. পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদিচ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্যা বশানুগা।।১

তয়া ধর্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
প্রাকাম্যে বর্তমানা তু স্নেহান্নতু নিবারিতা।। ২
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাদ্ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ। ৩/১

দক্ষসংহিতা, ৪, ১-৩।

৩১. অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা। ৩/২
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী। ৪
অনুকূলকলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ।৫
স্বর্গেঽপি দুর্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরম্।
রক্ত একো বিরক্তোঽন্যস্তস্মাৎ কষ্টতরং নু কিম্।।৬
গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্তিনী।।৭
দুঃখা হ্যন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
প্রতিকূলকলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ।।৮
যোষিৎ সর্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতী।।৯
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরা তু ধনং বিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম্।।১০
সশঙ্কা বালভাবে তু যৌবনে বিমুখী ভবেৎ।
ভৃত্যবন্মন্যতে পশ্চাদ্ বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্।।১১
অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।।১২
যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্যা হীতরা জরা।।১৩

দক্ষসংহিতা, ৪/৩-১৩।

৩২. মনো-বাক্-কর্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্তিনী।
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেসু ভার্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।।

ব্যাসসংহিতা, ২/২৬-২৭।

মেঘদূত ব্যাখ্যা

মেঘদূত ব্যাখ্যা।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র
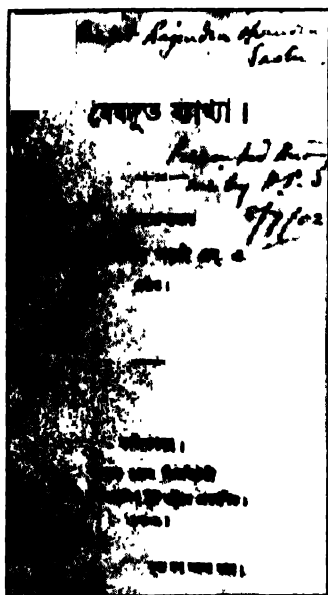
বিজ্ঞাপন

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যে অমর কবি। কল্পনার মহিমায় বলো, ভাষার ছটায় বলো, শিল্পের নৈপুণ্যে বলো, বাঁধুনির কারিগরিতে বলো ইঁহাদের তুলনা হয় না। ইঁহাদের রচনার মধ্যেও আবার পাঁচখানি বই সকলের চেয়ে ভালো, সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে মহিমাময়। হিমালয়ের যেমন পাঁচটি চূড়া, গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙঘা, ধবলাগিরি, মুক্তিনাথ ও গোসাইথান, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি রঘুবংশ, উত্তরচরিত, শকুন্তলা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভব অতি উচ্চ, অতি গম্ভীর, অতি শোভাময়, অতি পরিষ্কার ও অতি রমণীয়।

পাঁচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝাইবার জন্য। ভাব বুঝানো কোনো কোনো ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইলেও সৌন্দর্য বুঝানো কোনো ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ কাব্যগুলি সৌন্দর্যের খনি, ছোটো খাটো খনি নয়, একেবারে জোহানেস্‌বর্গ। এই সৌন্দর্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি অনেক দিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি;

মেঘদূত ব্যাখ্যা।

ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেইজন্যই সকলের ছোটো যে মেঘদূত তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য, উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একরূপ মীমাংসা করিয়া লইলাম। লেখা শেষ হইল। ছাপানোর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামতো লিখিলাম। লিখিয়া ছাত্রবর্গ ও মিত্রবর্গকে দেখাইলাম। তাঁহাদের সমালোচনা শুনিলাম। বদলাইয়া শোধরাইয়া লইলাম। কিন্তু এক কথায় বড়ো ঠেকিয়া গেলাম। সৌন্দর্যের মুখে রুচির উপর বড়ো একটা ঝোঁক থাকে না। রুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য বদলায় না। এখন যাহা কুরুচি, কালিদাসের সময়ে তাহা কুরুচি ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি, আমাকে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল। অনেক জিনিস এখনকার রুচিসঙ্গত হইবে না বেশ বোধ হইল। কিন্তু যখন ছাপাইব না, তখন তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য রহিল না।

যাঁহারা পড়িলেন, তাঁহারা ছাপাইতে অনুরোধ করিলেন, আমি গোলে পড়িয়া গেলাম। কোন্‌টি এখনকার রুচিসঙ্গত, কোন্‌টি নয়, একথা কে বলিয়া দিবে? শেষ দুই জন সুপণ্ডিত, সুরসিক, বিচক্ষণ লোকের হাতে রুচিপরীক্ষার ভার দিলাম। এক জন চব্বিশ পরগনার জজ শ্রীযুক্ত এফ. ই. পার্জিটর সাহেব[১] আর একজন শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[২] —দুজনেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মূলের সহিত ব্যাখ্যা মিলাইয়া আমায় সদুপদেশ দিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পার্জিটার সাহেব বিলাত যাইতেছিলেন। তিনি আমার প্রুফ লইয়াই জাহাজে আরোহণ করেন এবং জাহাজ হইতে আদ্যোপান্ত পড়িয়া উপদেশ প্রদান করেন। ইঁহাদের উপদেশমতো অনেক স্থান উঠাইয়া দিয়াছি ও অনেক স্থান বদলাইয়াছি। সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু সুরুচির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিয়াছি। সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়[৩] প্রথম হইতেই আমায় উৎসাহ দিয়াছেন এবং অনেকবার এ ব্যাখ্যা পড়িয়াছেন। কিন্তু যাঁহার উৎসাহে আমার এ ব্যাখ্যা লেখায় প্রবৃত্তি, যিনি নিরন্তর অকাতর আমায় সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাঁহার নামে এই ব্যাখ্যা উৎসর্গ করিলেও আমার তৃপ্তি হইত না, এবং যাঁহার ঋণ আমি কখনোই শোধ করিতে পারিব না, তিনি উৎসর্গ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, আপনার নাম প্রকাশ করিতেও দিলেন না; তাঁহাকে নির্বাক ধন্যবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম[৪]।

সংস্কৃত কাব্যের বাংলার ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলংকার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্যের ব্যাখ্য নূতন। সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন। এত নূতন করিতে গিয়া যদি ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন। প্রথম পথিকের ভুল ভ্রান্তি অনিবার্য। এ পথে আর যদি কেহ অগ্রসর হন এবং মনের মতন ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

পূর্বমেঘ

অদ্য মেঘদূত-এর ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম[৫]। পড়িয়া দেখিলাম, মনোমতো হইল না— ফিকে লাগিল। তখন পূর্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিক-বিবরণ-লেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন সেরূপ করিতে ভরসা হয় না। করিলে মনে হয়, কালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্বমেঘ মেঘদূত-এর অর্ধেক, তাই যদি ছাড়িয়াছিলাম, তবে ব্যাখ্যা করিয়াছি কী ছাই? উত্তরমেঘেও অনেকস্থান ভাসা ভাসা ছিল, অনেকস্থানের সৌন্দর্য-বোধই হয় নাই। তাই আবার একবার নূতন করিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কয়েকটি কথার মীমাংসা চাই। তাহার মধ্যে মেঘদূত-এর যে প্রচলিত সমালোচনা আছে, যে কালিদাস গ্রন্থ লিখিয়া একজন মালিনী, কি কুমারনীকে শুনাইতেন, তাহার সম্মতি পাইলে প্রচার করিতেন। সে পূর্বমেঘ শুনিয়া বলিয়াছিল উহা স্বর্গের সিঁড়ি অর্থাৎ উত্তরমেঘই সারবস্তু, পূর্বমেঘ কিছু নয়। এ কথাটা সত্য কী না? একেবারে কিছু নয় অর্থাৎ কেবল সিঁড়ির কাজ করে, এটা বড়ো অশ্রদ্ধেয় কথা। কিন্তু এই অশ্রদ্ধেয় কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আবহমান কাল লোকে পূর্বমেঘের প্রতি অনাদর করিয়া আসিতেছে। মনে করে ওটা একটা ভূগোলের ইন্ডেক্স, পড়িলে উত্তরমেঘ বোঝায় একটু সুবিধা হয়, তাহাই পড়িতে হয়। বাস্তবিকও লোকের অপরাধ নাই, দেশগুলা কোথায়,— জানা ছিল না। একটার পর আর-একটা ঠিক কিনা, জানা ছিল না। লোকে এক রকম ভাসা ভাসা পড়িত, বড়ো বিরক্ত লাগিত। মল্লিনাথের টীকাও এই রকম ভাসা ভাসা; আমিও বিশ বছর পূর্বে এইরূপ ভাসা ভাসা ভাবেই উহা রজনীবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।[৬] কিন্তু পূর্বমেঘ কালিদাসের কবিত্বের একটি ভাবময় লহর। উহাতে জড়প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে। মেঘ নিজে জড় হইয়াও চৈতন্যময়; মেঘ উপর হইতে যখন জড়প্রকৃতির যতদূর দেখিতেছে, তখন ততদূরই চৈতন্যময়

হইয়া যাইতেছে। জড়কে এত সুন্দরভাবে চৈতন্যময় করিতে আর-কোথাও দেখা যায় না। কালিদাস আর-কোথাও পারেন নাই। কুমারে রঘুতে বড়ো বড়ো বর্ণনায় জড়— জড়ই। কুমারের ষষ্ঠে হিমালয়কে জড় ও চৈতন্য দুই-ই বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই দুটি দুরূপ। পূর্বমেঘে যে জড়, সেই চৈতন্যময়, ভাবময়, প্রেমময়।

দ্বিতীয় কথা। মেঘদূতকে অলংকারশাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরেজেরা লিরিক বলেন। কোনটি সত্য? খণ্ডকাব্য,— অর্থ যতদূর বুঝা যায়,— টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়; টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূত-এর উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা নহে— পুরা, সর্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ এবং অপ্রমেয়। সুতরাং 'মেঘদূত' টুকরা কাব্য নহে। ছোটোকাব্য বলিতে চাও বলো। দৈর্ঘ্যে ছোটো কিন্তু ফলে ছোটো নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে তো ছোটো বুঝায় না। লিরিক বলিলে যাহা বুঝায় উত্তরমেঘে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু তথাপি উত্তরমেঘকে লিরিক বলা যায় না। কারণ উহা গানে লিখিত নহে। লিরিক গান না হলে হয় না, কাব্যের বাহ্য আকার লইয়াই লিরিক। তবে উৎকৃষ্ট লিরিকের যে ভাবতন্ময়তা আছে, উত্তরমেঘে সেইরূপ ভাবতন্ময়তা আছে বলিয়া উহাকে লিরিক বলিতে ইচ্ছা করো, বলিতে পারো। কিন্তু পূর্বমেঘের অবাধ কল্পনার রমণীয় সৃষ্টিকে লিরিক বলিবে কিরূপে, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তবে যদি কেহ বলে খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,— তখনকার প্রধান মিষ্টসামগ্রী। আমাদের রাতাবি মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজি আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার[৭] খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। ষষ্ঠে ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিষে খণ্ড-খাদ্য[৮] রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয় নিমাইচরিত, তেমনি সেকালে খণ্ড-কাব্য অর্থে মধুময় অমৃত-ময় কাব্য। টুকরা ফুকরা বলিলে জমে না।

তৃতীয়। মেঘদূত যে লিরিক নয়, উহা যে টুকরা বা ছোটো কাব্য নয় এ তো ঠিক। আমি বলি, উহার মতো একখানা মহা-মহা-কাব্য আর রচনা হয় নাই। মহাকাব্যে নূতন সৃষ্টি অনেক থাকে, কিন্তু সে কী সৃষ্টি? এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই মানুষ, এই মনুষ্য-চরিত্র, এই গাছ, এই পালা— এই সব— তবে সাজানো গোজানো নূতন করিয়া। না হয় একটা দুটা মানুষ নূতন করিয়া গড়া। কিন্তু মেঘদূতে সব নূতন সৃষ্টি,— পৃথিবী, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক, সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি। মেঘদূত এক অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি, সৃষ্টি-ছাড়া বলিতে চাও বলো। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি-ছাড়া বলিও। কবির সৃষ্টির কথা বলিও না। অলকা

এক নূতন সৃষ্টি। এত বড়ো ভারতবর্ষটা ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানিতেন, যবনদেশ জানিতেন, যে-সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গ পুষ্প কলিঙ্গে আনীত হইত, তাহাও জানিতেন; এ-সকল দেশে তাঁহার পছন্দ মতো জায়গা পাইলেন না। তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতমশৃঙ্গে— মনুষ্যের অগম্য— কেবল তাহার কল্পনামাত্রের গম্য— স্থানে অলকানগর বসাইলেন। তাঁহার নগরে পার্থিব নগরের নিয়মাবলী খাটিবে না। তাঁহার নগর তিনি যত ইচ্ছা সুখময়, আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর সেই নগরে যাহারা বাস করিবে, তাহারাও কল্পনারাজ্যের লোক, মানুষ তাহাদিগকে দেখে নাই, দেখিবেও না। তাহাদের সমাজনীতি, শাসনপ্রণালী, সব নূতন। সব কালিদাসের অবাধ কল্পনার অমৃতময় ফল। য়ুরোপ বহুকাল ধরিয়া সংসার কিসে সুখময় হয়, ভাবিয়াই অস্থির। প্লেটোর রিপব্লিক, মিল্টনের এরিওপ্যাগাইটিকা, সার টমাস মুরের ইউটোপিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষ কিসে সংসারটা সুখময় করিতে পারে, তাহার অনেক চেষ্টা চরিত্র আছে। কালিদাস মেঘদূতে চেষ্টা চরিত্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সেই আনন্দময়, সুখময়, প্রেমময় সংসার সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ তো নূতন সৃষ্টি— কবির সৃষ্টির এত প্রকাণ্ড খেলা— ইহাকে কি লিরিক বলিলে, না খণ্ডকাব্য বলিলে তৃপ্তি হয়। আমি একবার এডিসনের নকলে ইহাকে (merumsal) "মধুর কবল" বলিয়াছিলাম। ছি! কী ভুলই করিয়াছিলাম। মেঘদূত লইয়া যতই আন্দোলন করিতেছি, উহার অসীম সৃষ্টিনৈপুণ্য, উহার ভাবময়, চৈতন্যময়, উচ্ছ্বাসময়, আবেগময় কবিত্বলহরী যতই মনোমধ্যে গ্রথিত হইতেছে, ততই উহাতে কালিদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

যক্ষপত্নী। মেঘদূত-এর প্রধান আকর্ষণমন্ত্র যক্ষপত্নী। মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়। তন্বী— ক্ষীণাঙ্গী — যাঁহারা দোহারা দোহারা চান, তাঁহাদের পছন্দ হইবে না। শ্যামা— কালো নয় — তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা — কাঁচাসোনার মতো রঙ। শিখরিদশনা — মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন কোটিযুক্তদশনা অর্থাৎ ইঁদুরদাঁতি — টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়েরা অর্থ করিতেন, দাড়িম্ববীজের ন্যায় দশনযুক্ত — যাহার দাঁতগুলি দাড়িম দানার মতো। পক্কবিম্বধরোষ্ঠী— পাকা তেলাকুচার মতো দুটি ঠোঁট। মধ্যে ক্ষামা — কোমরটি সরু। সরু কোমর বড়ো সুন্দর বলিয়া আমাদের কবিদের ধারণা। তাই কেহ কেহ এত সরু করেন যে দেখাই যায় না, কখনো বলেন "পরমাণুমধ্যা," কখনো বলেন "সদসৎসংশয়গোচরোদরী"। কালিদাস এত উৎকট বর্ণনার বড়ো পক্ষপাতী নহেন।

"চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা"— হরিণের চোখ, মুখের তুলনায় খুব বড়ো, পটলচেরা, আর তার উপর ঢলঢল করিতেছে, মানুষের চোখের যে অংশ সাদা, হরিণের সেটুকু জলের মতো, কেমন ঢলঢল করে, তাহার উপর যখন আবার সেই হরিণ ভয় পায়, তখন সেই ঢলঢলে চোখ আরো ঢলঢলে হয়; যক্ষপত্নীর চোখদুটি তেমনি। "নিম্ননাভি"; তাহার নাভি গভীর। "শ্রোণিভারাৎ অলসগমনা"। উহার নিতম্ব বড়ো ভারি বলিয়া উহার গতি অতি মন্থর। চলিলেই বোধ হয়, হেলে দুলে, ঠমকে চমকে, পা ওঠে-কি-না-ওঠে, এমনি ভাবে ধীরে ধীরে যাইতেছে। তাহার উপর আবার "স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্"। স্তনভারে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাই বলে কুঁজো নয়। আর তিনি বড়ো একটা কথা কন না— যখন কথা কন দু-চারিটি। এ রমণীকে আপনারা আহামরিই বলুন; পাঁচপাঁচিই বলুন; বা চলনসই বলুন; কালিদাস ইহার এই পর্যন্তই বর্ণনা করিয়াছেন। কুবেরের রাজধানীতে, অত ধনের জায়গায়, এই যে নম্বর ওয়ান, তাহা বলিতে পারি না। কালিদাসও সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যক্ষ বেচারা উহাকে রমণীসৃষ্টির আদ্য বলিয়া মনে করিত। সে মনে করিত, বিধাতা রমণীসৃষ্টির সমস্ত উপকরণ একত্র করিয়া প্রথম যে মেয়েটি গড়িয়াছিলেন সেইটিই যেন এই— আমার বৌটি। সৌন্দর্যের কোথাও কিছু ত্রুটি ছিল না, কোথাও বিধাতাকে হাত টান করিতে হয় নাই। বরং সব জিনিস পুরাপুরা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা দেওয়া হইয়াছে। যক্ষ পত্নীকে আপনার দ্বিতীয় প্রাণ বলিয়া মনে করিত। সে ক্রমে উহাকে এতই ভালোবাসিতে লাগিল যে সে আর-সব কাজকর্ম ভুলিয়া গেল।

যক্ষ। যক্ষ বেচারা বেশ বড়ো মানুষ। তাহার টাকা কত জানেন, এক কোটি, দু কোটি নয়। কোটির পর অর্বুদ, অর্বুদের পর বৃন্দ, বৃন্দের পর খর্ব, খর্বের পর নিখর্ব, নিখর্বের পর শঙ্খ, শঙ্খের পর পদ্ম, তার ধন এক পদ্ম, আর এক শঙ্খ ১১০০০০০০০০০০০০। অলকায় চোর ডাকাতের ভয় নাকি একেবারেই নাই, তাই যক্ষের দ্বারে একটি পদ্ম ও একটি শঙ্খ আঁকা থাকে। তাহাতেই লোকে জানিতে পারে, ইহার কত টাকা। এখন যেমন লিমিটেড কোম্পানিরা তাঁহাদের মূলধন বিজ্ঞাপনে দিয়া থাকেন, সেকালেও যক্ষেরা এইরূপে তাহাদের রিজার্ভফণ্ডের বিজ্ঞাপন দিত। এদেশের মতো বিজ্ঞাপনপ্রথা চলিত হয় নাই; হইলে অনেক "অনুসন্ধানের" পর তথ্য বাহির করিতে হইত। শঙ্খ ও পদ্মের পাশে বড়ো বড়ো থলে আঁকিয়া সেকালে কেমন করিয়া টাকার পরিমাণ বলিয়া দিত, নূতন যাদুঘরে

কল্পবৃক্ষের চেহারা দেখিলেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। যক্ষ এত ধনের মানুষ। মানুষের পক্ষে এ ধন খুব ধন, কিন্তু কুবেরের রাজধানীতে — হাঁ মন্দ নয় — খুব যে প্রথম শ্রেণীর তা বোধ হয় না। কারণ কুবেরের সরকারে সে একটি চাকরি করিত, খুব বড়ো গোছের চাকরি বলিয়া বোধ হয় না; কেন-না কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সলস্‌বরি, চেম্বারলেন, হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোটো চাকরিও নহে, কারণ কুবেরের দৃষ্টি তাহার উপর ছিল; এবং কুবের কিছু রেগেই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটি বড়ো কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল; বয়স তো যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটিও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত বুঝি পদ্ম শঙ্খেরও উপর কোনো অমূল্য নিধি পাইয়াছে। একটু আসিতে দেরি হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয় তো কুবের টুকিয়াছিলেন; তারপর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতিকার আবশ্যক হইল। অপরাধ তো সাব্যস্তই আছে। কী শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোডে হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিয়া দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান একাদশীর পরদিন[৯] যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন, এ ছোঁড়া যে রকম পাগলা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে আর দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া, লঘু হইয়া, চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে, বা তাহার সঙ্গে দেখা শুনা করিবে, কুবের সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড়ো লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেনেদের সঙ্গে জুটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। কাশী, কেদারনাথ, প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্মকর্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসিয়া বলিয়া দিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রাম-গিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটি আশ্রমের কুটির ভাঙিলে তিনি আর-এক আশ্রমে কুটির নির্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন

সেইখানেই জলক্রীড়া করিতেন; সীতা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন — খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহবেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।

কাজেও তাই হইল। যক্ষ বেচারা যেখানে যায়, সেইখানেই দেখে রামসীতার আশ্রম— রামসীতার কুঞ্জ— রামসীতার লতামণ্ডপ। বড়ো বড়ো ছায়া-বৃক্ষের নিকট যায়, তাহারা রামসীতার বনবাসকালের বিবিধ বিশ্রম্ভের সাক্ষী। বড়ো বড়ো গাছ কত কাল বাঁচিয়া আছে ঠিক নাই; হয়তো রাম সীতা পুঁতিয়া ছিলেন, এখন প্রকাণ্ড মহীরুহ। জলে যায়, সেখানেও রামসীতার জলক্রীড়া মনে পড়ে। জলে যাইতে পারে না, স্থলে যাইতে পারে না, বনে যাইতে পারে না, গাছতলায় থাকিতে পারে না, এ অবস্থায় মানুষের কী দশা হয়? মানুষ পাগল হয়। যক্ষ অনেক কষ্টে আট মাস কাটাইল। তাঁহার শরীর কৃশ হইল, হাতে সোনার বালা ছিল খসিয়া পড়িল, তাহা সে টেরও পাইল না। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও বিকৃতি হইল। সে উত্তর দিক হইতে বাতাস আসিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিত, ভাবিত এই বাতাস যখন উত্তর দিক হইতে আসিতেছে, তখন এ নিশ্চয়ই প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। সে প্রস্তরখণ্ডে প্রিয়ার ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার চরণপতিত করিত। রাত্রে গাছতলায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে প্রিয়াকে পাইয়াছে বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিত। হাত পা ঠিক আলিঙ্গনের ভাবেই থাকিত। কিন্তু প্রিয়া কোথায়? এই ভাবেই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইত। দেখিত টপ্ টপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। বোধ হইত যেন বনদেবীরা তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। এ সকল পাগলামি ভিন্ন আর কী?

এইরূপে আট মাস কাটিয়া গেল। এতদিন তো কষ্টে কাটিয়াছে; আর কাটে না। তাহার উপর আবার মেঘ উঠিল। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখা দিল। ছোটো একখানি মেঘ পর্বতের নিতম্বে চড়িয়া আছে দেখা দিল। পর্বত খানিকটা সমতল হইয়া যেখানটায় নামিতে থাকে, তাহাকে সানু বলে; উহার আর এক নাম নিতম্ব। এই পর্বত-নিতম্ব ঢাকিয়া মেঘ রহিয়াছে, বাতাসে নড়িতেছে চড়িতেছে। বোধ হইতেছে যেন একটা তেল-কুচকুচে কালো হাতি পাহাড়ের গায়ে দাঁত মারিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া খেলা করিতেছে। আর পায় কে? যক্ষ একেবারে উন্মাদ; তখন আর চেতন অচেতন জ্ঞান রহিল না, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিল না। এই সময়ে কবি

যক্ষের হইয়া একটা কথা কহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— মেঘ দেখিলে সকলেরই মন হু-হু করে, যাহাদের সকল প্রিয় পদার্থ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহাদেরই মন কেমন কেমন করে; হৃদয় উদাস হয়, কী যেন কী নাই, কী যেন কী নাই, বলিয়া বোধ হয়। সেই প্রিয়বস্তু সব যদি আবার দূরে থাকে, তাহার আর কথা কী? সে তো উন্মাদ হইবারই কথা।

যক্ষের উন্মাদ একটু আলাদা রকমের। যক্ষ আবোল তাবোল বকে না। উহার উন্মাদে একটু শৃঙ্খলা আছে। সামাজিক বৈষয়িক সকল ব্যাপারের সামঞ্জস্য আছে। নাই কেবল একটি; প্রিয়ার কথা উঠিলে আর ঠিক থাকে না। প্রণয়ের কথা উঠিলে ঠিক থাকে না। সমস্ত জড় পদার্থ চৈতন্যময় হইয়া যায়। আপনিই হইয়া যায়; জড় বলিয়া জ্ঞানই থাকে না।

মেঘ দেখিয়াই মনে হইল শ্রাবণ আসিতেছে, প্রিয়া বাঁচে-কি-না-বাঁচে। পরের দেশে পড়িয়া পরের সুখের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া যদি আমার এই দশা হইল, তবে সেই বাড়ি, সেই ঘর, সেই বাগান, সেই বাগিচা, সব আছে, কেবল আমি নাই; আমার গৃহিণীর অবস্থা আরো শোচনীয়। তাই ভাবিয়া যক্ষ মনে মনে সংকল্প করিল, একটা সংবাদ পাঠানো যাক। মেঘ উত্তরদিকে যাইতেছে, এই-ই আমার সংবাদ লইয়া যাইবে। যেমন মনে এই কথা উদয় হইল, অমনি— পাগলের মন— সেই দিকেই ছুটিল। অমনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কুর্‌চি ফুল ফুটিয়াছে, বন আলো করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কুর্‌চি ফুল। কতকগুলা কুর্‌চি ফুল তুলিয়া মেঘকে উপহার দিল, এই লও মেঘ, আমার প্রীতি উপহার লও। দিয়াই মনে করিল আমার উপহার পাইয়া মেঘ বড়ো খুশি হইয়াছে। অমনি "আস্‌তে আজ্ঞা হোক" বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিল। ভাবিল, এই মেঘের কাছ থেকে কাজ আদায় করিতে হইবে। ইহার খোসামোদ করিতে হইবে। খোসামোদ যত রকম আছে, সকলের চেয়ে বংশের বর্ণনাই বড়ো খোসামোদ; আপনার টাকা আছে, কড়ি আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যশ আছে, আপনি দাতা, ভোক্তা, বক্তা, বিবেচক ইত্যাদি কথায় যত ফল হয়, তাহার চতুর্গুণ ফল হয়, আপনি বড়ো বংশে জন্মিয়াছেন, আপনার পূর্বপিতামহগণ কত বড়ো বড়ো কাজ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বলিলে। পাগল যক্ষের কিন্তু সে নাড়ীজ্ঞানটুকু টনটনে ছিল, সে মেঘকে দেখিয়াই বলিল আপনি বড়ো বংশে জন্মিয়াছেন, পুষ্কর আবর্তক প্রভৃতি বড়ো বড়ো মেঘ আপনার পূর্বপুরুষ, আপনার বংশ পৃথিবীর সর্বত্র বিখ্যাত। এত বড়ো বংশ কি আর হয়। তাহার উপর আপনি ইন্দ্রের একজন বড়ো অফিসার। আপনি

ইচ্ছা মতো দেহপরিবর্তন করিতে পারেন; কখনো বড়ো কখনো ছোটো হইতে পারেন। ইচ্ছামতো বিচিত্ররূপ ধারণ করিতে পারেন। তাই আমি বড়ো দুঃখী— প্রিয়া-বিরহী— আপনার শরণাগত হইলাম। বড়োলোকের কাছে যাজ্ঞা ব্যর্থ হইলেও তাহাতে দুঃখ নাই। ছোটোলোকের কাছে যাজ্ঞা সার্থক হইলেও মনটা ছোটো হইয়া যায়।

তোমার একটা বড়ো গুণ আছে। তুমি তাপিতদিগের তাপ নিবারণ কর। ভূলোক ভুবর্লোক বড়ো গরম হইয়া উঠিলে তুমি তাহাদের ঠাণ্ডা করিয়া দাও। আমি প্রিয়ার বিরহ-অগ্নিতে পুড়িতেছি। আমার প্রিয়াও প্রিয়বিরহ অগ্নিতে পুড়িতেছেন। অতএব তুমি আমাদের ঠাণ্ডা করো। তুমি আমার সংবাদ লইয়া প্রিয়ার কাছে যাও। কুবেরের শাপে আমাদের বিরহ— মিলনের উপায় নাই। তুমি না দয়া করিলে, খবরটা লওয়ারও উপায়ও নাই। তাই বলি, যাও। সে তোমার তীর্থ-স্থান, সেখানে বাহিরের বাগানে মহাদেব আছেন, তাঁহার কপালের চাঁদের আলোতে চুণকাম করা বাড়ি ঘর সব আরো চুনকামকরা হইয়াছে। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, —তুমি যখন যাইতে থাকিবে, তুমি যখন আকাশে উঠিবে, তখন যাহাদের স্বামী বিদেশে, তাহাদের মনে কত আশা, কত ভরসা, কত সান্ত্বনা আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে। তুমিই তাহাদের আশার মূল, ভরসার মূল; তাই তাহারা হা করিয়া তোমায় দেখিতে থাকিবে, পাছে ঝাপটার চুলগুলা চোখের উপর উড়িয়া পড়িয়া বিঘ্ন করে, তাই সেগুলাকে উঁচা করিয়া মাথার উপর ধরিয়া রাখিবে। আর তাদের চাঁদপানা মুখখানা পুরাপুরিই দেখা যাইবে। তাহারা ভাবিবে, আমার স্বামী এইবার বাড়ি আসিবে। আমার মতো পরাধীন-বৃত্তি না হইলে আর কেহ কি তুমি সাঁজোয়া পরিয়া উপরে উঠিলে আপনার প্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। যক্ষের যত কেন ঐশ্বর্য থাকুক না, যত মান, যত মহিমা, থাকুক না, পরের অধীন বলিয়া তাহার মনে বড়োই ধিক্কার হইয়াছিল। সে ভাবিল আমি যদি চাকরি না করিতাম, যদি দাসত্ব না করিতাম, আজ কি আমার এ দশা হয়?

পূর্বেই বলিয়াছি যক্ষের উন্মাদে বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে। তাহার এক উদাহরণ দেখুন— মেঘকে সে কৈলাস-যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। যাত্রিক লক্ষণগুলি যে ভালো— তাহা একবার দেখাইয়া দিতে হইবে; যক্ষ এখন সেই কাজেই ব্যস্ত হইল। সে দেখাইল পবন অনুকূল। আষাঢ় মাসে দক্ষিণ হইতে পবন উত্তরে যাইতেছে, সুতরাং পবন অনুকূল; বামভাগে চাতক উড়িতেছে। এও একটা সুলক্ষণ। বলাকা মালাবদ্ধ হইয়া পথে তোমার সেবা

করিবে। বকপংক্তিও সুলক্ষণ। চারিদিকে সুলক্ষণ। এমন মাহেন্দ্র যোগ আর হবে না। এইবার ওড়ো।

তবে একটি কথা আছে, মেঘ মনে করিতে পারে "তাকে কি দেখিতে পাব?" যক্ষ তাই বলিতেছে, পাবে বই কী? দেখিবে, সে কেবল দিন গুণিতেছে। তাহার স্বামীর সে একমাত্র পত্নী। যদি স্বামীর বহুপত্নী থাকে সে স্বামীর বিরহটা তত লাগে না, কিন্তু যদি স্বামীর আর না থাকে? পত্নীর তো আর নাই-ই, তবে সে পত্নীর আশা বড়ো আশা। সুতরাং সে মরিবে না। দেখিবে সে মরে নাই। তোমার যাত্রা বিফল হইবে না। তোমার সে ভ্রাতৃজায়া মরে নাই। সেকি মরিতে পারে? এখনো যে মিলনের আশা আছে। সেকি মরিতে পারে? বোঁটায় যেমন ফুলটি আটকাইয়া রাখে, সেইরূপ আশায় রমণী হৃদয় আটকাইয়া রাখে। বোঁটাটি শুকাইলে যেমন ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, আশা ফুরাইলে রমণীর প্রাণ কর্পূরের মতো উপিয়া যায়।

"পথ যে বড়ো দূর, বড়ো দুর্গম, একাকী এত পথ যাওয়া যায় কি গা?" একথা মনে ভাবিও না। তোমার গর্জনে কান জুড়াইয়া যায়, সেই গর্জনে মাটি ফুঁড়িয়া ভুঁইচাঁপার ফুল বাহির হয়; বড়ো সুলক্ষণ, পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। সুতরাং পৃথিবী তোমার অনুকূল। পথ দুর্গম হইবে না। আর তোমায় দেখিয়া মানস সরোবরে যাইবার জন্য হংসগুলা বড়োই উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহারা পথে মৃণালের টুকরা মুখে করিয়া কৈলাস পর্বত পর্যন্ত অর্থাৎ তুমি যত দূর যাইবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তোমার পয়সা খরচ করিয়া লোক লইতে হইবে না, তোমার সবদিকেই সুবিধা, আর দেরি নয়।

এখন চট্‌পট্ এই শৈলরাজকে আলিঙ্গন করিয়া উহার নিকট বিদায় গ্রহণ করো। এ তোমার পরম মিত্র, তোমায় অনেক দিনের পর দেখিলে উহার তাপ দূর হয়; তাই পর্বতগাত্র হইতে ভাব [ভাপ] ওঠে। আর তোমার শরীরস্পর্শে উহার স্নেহ প্রকাশ হয়, তাই পর্বতগাত্রে শিশিরের ন্যায় জলবিন্দু দেখা যায়। উহাকে আলিঙ্গন করিলে তোমার শরীর পবিত্র হইবে। কারণ তোমার বন্ধু বড়ো যে সে লোক নয়; উহার প্রতি নিতম্বে প্রতি মেখলায় জগৎপাবন রামচন্দ্রের জগৎপাবন পদচিহ্নসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এই পর্বতটি সরগুজা রাজ্যের মধ্যে।[১০] উহা একটি ক্ষুদ্র সমতল হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। উহার মাথায় শিখর আছে। শিখরে অনেকটা সমতল ভূমি। যেখান হইতে শিখরটি উঠিয়াছে, তাহার চারিদিকে পর্বতের নিতম্ব। ইহাতে উঠিবার জন্য তিন দিক হইতে পথ আছে। উত্তরের পথটি প্রশস্ত, পশ্চিমেরটি বড়োই খাড়াই।

পূর্বের দিকে আরো একটি আছে। সে নিম্নস্থিত ক্ষুদ্র সমতলে নানাস্থানে আশ্রম ছিল। প্রায় সকল আশ্রমেই রামচন্দ্র কখনো-না-কখনো কুটির নির্মাণ করিয়াছিলেন। যক্ষ বেচারা যে কোথায় থাকিত তাহার ঠিকানা নাই। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যেদিন সে প্রথম মেঘ দেখিয়া পাগলপারা হইয়া যায়, সেদিন বৈকাল বেলায় সে পাহাড়ের দক্ষিণে এবং একটু দক্ষিণপূর্বে—একটু দূরে উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। রেলগাড়ি চলিয়া গিয়াছে, আর ধূমাও দেখা যায় না। তবুও যেমন স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া আধ ঘন্টা ধরিয়া সেই দিকেই চাইয়া থাকে, সেইরূপ যক্ষ বেচারা অলকা দূরে হইলেও, দেখা যাবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, সর্বদাই উত্তরমুখে সেই দিকেই চাহিয়া থাকিত।

যক্ষ বলিতেছে। তাহার পর শোনো, রাস্তা বাৎলিয়া দিতেছি, শোনো। যে সে রাস্তায় তো তুমি যাইতে পারিবে না, যেখানে পাহাড়পর্বত বেশি, যেখানে উচ উচ পাহাড়, সেখানে তো তুমি ঠেকিয়া যাইবে। প্রশস্ত পথ না পাইলে তোমার বিশাল বপু তো চলিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি কোথাও খাড়াখাড়া যাইতে পারিবে না; তোমায় বাঁকিয়া চুরিয়া যাইতে হইবে। বিশেষ এখন তুমি জলভরা। শরতের মেঘের মতো খুব উচ্চে উঠিতে পারিবে না। তোমায় ২/৩ হাজার ফুটের মধ্যেই উড়িতে হইবে। সুতরাং অনেক ছোটো পাহাড়েও তোমার বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাই বলিতেছি, তোমার যাবার মতো রাস্তা তোমায় বাৎলাইয়া দিতেছি। তাহার পর তোমায় আমার সখীসংবাদ শুনাইয়া দিব; তোমার কান ভরিয়া যাইবে, কান জুড়াইয়া যাইবে। তুমি যখন বড়ো ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, পর্বতের মস্তকে বিশ্রাম করিয়া যাইও। যখন বড়ো কাহিল হইয়া পড়িবে, স্রোতের জল পান করিও। সে জল অতি লঘু, শীঘ্র হজম হইয়া যাইবে; সুতরাং শরীর ভার হইবে না। তুমি যখন সাঁ সাঁ করিয়া উত্তরমুখে চলিবে, তখন সরল-স্বভাব সিদ্ধ কন্যারা শিহরিয়া উঠিয়া আগ্রহের সহিত দেখিতে থাকিবে। কারণ, তাহাদের হঠাৎ মনে হইবে যেন বাতাস পর্বতশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, হিমালয়ের পাদদেশবর্তী বনরাজি ও বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণপাদস্থ বনরাজি সিদ্ধগণের নিবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। লোকের এখনো বিশ্বাস, অনেক সিদ্ধ পুরুষ এখনো এই-সকল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধনামক দেবযোনিতে পরিণত হইয়াছেন। তাই উঁহাদের অঙ্গনা আছে, পরিবার আছে ; নচেৎ তপঃসিদ্ধের পরিবার কিরূপে হইবে? এস্থানের বেতগাছ দেখিতে বড়ো সুন্দর। তুমি এখান হইতে উত্তরমুখে আকাশে উঠ গিয়া। দিঙ্নাগেরা তোমার গায়ে

শুঁড় বুলাইতে আসিলে, সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে। মল্লিনাথ এইখানে নিচুল ও দিঙ্‌নাগ নামে দুইজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিচুল কালিদাসের পক্ষপাতী এবং দিঙ্‌নাগ অতিবিরোধী। তাঁহার মতে উভয়েই কালিদাসের সমকালীন, তাই তিনি নিচুল বেতগাছকে নিচুল কবি, আর দিঙ্‌নাগকে দিঙ্‌নাগ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লোকে কালিদাসকে দিঙ্‌নাগ নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সমকালীন ও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসী দিঙ্‌নাগের বাড়ি কাঞ্চী, মেঘ উড়িতেছে রামগিরি হইতে। রামগিরি সরগুজার অন্তর্গত রামগড়, সুতরাং কাঞ্চীর দিঙ্‌নাগ মেঘের গায়ে শুঁড় বুলাইবে কিরূপে? কাঞ্চী রামগড় হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে। এ দিঙ্‌নাগসমূহের সঙ্গে সে দিঙ্‌নাগের কোনো সম্পর্ক আছে বোধ হয় না। আর যদিই হয়, এ দিঙ্‌নাগ ও বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ এক ব্যক্তি, ইহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। মনে করি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া প্রত্নতত্ত্বের কচ্‌কচি তুলিব না, কিন্তু ক্রনিক রোগ; না তুলিয়াও থাকিতে পারি না।[১১]

ঐ দেখ ঐ বল্মীকের অগ্রভাগ হইতে ইন্দ্রধনু উঠিতেছে। পর্বতে ইন্দ্রধনু অনেক নিচু পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় যেন একটা কোনো অল্প উচ্চ জায়গা— উঁইয়ের টিপি হইতে উঠিতেছে। বোধ হইতেছে যেন নানাবিধ মণিমাণিক্যের রশ্মি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধনুকের আকার হইয়াছে। ঐ ধনু যখন তোমার মাথায় লাগিবে, বোধ হইবে যেন চিকণ কালার চূড়ায় ময়ূরের পেখম নাচিতেছে।

এখানে একটু বিশেষ কথা আছে। বৈকালবেলা রামধনু উঠিলে পূর্বদিকে উঠিবে। উত্তরায়ণ — একটু দক্ষিণে হেলিয়া উঠিবে। মেঘ যখন মলয়-মারুত-তাড়িত হইয়া উত্তরে যাইতে থাকিবে তখন একবার-না-একবার ঐ বাঁকা ধনুর আগা তাহার মাথায় ঠেকিবে। তখন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামের মাথায় ময়ূরের পেখমের মতো নিশ্চয়ই দেখাইবে। কারণ সে পেখম সবাই জানে— তেড়া করিয়া বসানো ও বামে হেলা। উত্তরগামী মেঘের মাথায় রামধনু তেমনি তেড়া করিয়া বসানো। তফাত কেবল এটা ডাইনে হেলা।

সকলেই জানে বৃষ্টি নহিলে চাষ হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে নেওয়া প্রীতি আর চোখ জুড়ানো মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয় যেন

তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এইভাবে তুমি উঁচু চষা ভুঁয়ের উপর উঠিবে। নিচু জমির উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি। অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্যের আতপে বড়োই তাপিত হয়, তাই চাষ করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ শুকিতে শুকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিম দিকে যাও, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরি খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিমমুখে পাঠাইলেন। কারণ মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশ-এর ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি-সকল দেখানো হইবে না । তাই কবি কৌশল করিয়া উঁচু জমির উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিম দিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তেরছা হইল, কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড়ো সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরো তেরছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরির আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে উহা একটি ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র সমতলের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্বতে বাধিয়া যাইবেন; তাই কালিদাস বলিয়াছেন, উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হঠিয়া যাইবে, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবারও অভ্রভেদী পর্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তরদিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই এই মালভূমি উঠিতে গেলেই— মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই — প্রথমেই আম্রকূট পর্বত — এখনকার অমরকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্বতের একটি মাত্র উচ্চ শিখর। পর্বতটি অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে; ইহার এক দিক দিয়া নর্মদা, আর-এক দিক দিয়া মহানদী ও আর-এক দিক দিয়া শোণনদী প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থর করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে। সে তোমার কাছে বড়ো ঋণী, তাহার বন যখন দাবানলে পুড়িতে থাকে, তখন তুমিই ধারাবৃষ্টি করিয়া সে দাহ নিবারণ করিয়া থাক। তাই তোমার কথা মনে হইলে তাহার আনন্দ হয়। সে নিশ্চয় তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। এক

সময়ে তুমি তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ; এখন তুমি যদি পথক্লান্ত হইয়া তাহার নিকট আশ্রয় চাও — সে তো আর ছোটোলোক নয়— তাহার মস্তক উন্নত— সে এমন কাজ কখনো করিবে না যাহাতে উচ্চ মাথা হেঁট হয়। সে অবশ্যই তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। সেই মোচাগ্র-আকার উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়ার উপর তুমি বসিবে। তোমার আকার যেন একটি তেল কুচ্‌কুচে কালোখোঁপা। শিংদার ফিরিঙ্গি খোঁপা নয়, দিশি— সেকেলে — মাথার মাঝখানে থাকা— নিচে মোটা, উপরে সরু, ঘন, কৃষ্ণকালো খোঁপা। তোমার নীচে মোচাগ্র-আকার প্রকাণ্ড-বিস্তার পর্বত-শিখর, অনেক জমি ব্যাপিয়া আছে, আর রাশি রাশি বনের আম পাকিয়া পর্বতের বাহির দিকটা পাকা আমের রঙে রঙ করিয়া তুলিয়াছে। পাকা আমের রঙে আর রমণী শরীরের দুধে আলতা রঙে প্রভেদ আছে কি? কিছুই নাই। এখন ভাবো দেখি, দুধে আলতার রঙের সেই প্রকাণ্ড মোচাগ্র-আকার পাহাড়টির উপর, কালো মেঘ খোঁপার মতো হইয়া বসিলে, উপর হইতে দেবতারা যখন যুগলমিলনে মিলিত হইয়া দেখিবে; তখন উহা পৃথিবীর কিসের মতো দেখিবে।

সে পর্বত আগাগোড়া গাছপালায় ঢাকা— অনেক জায়গায় কুঞ্জবন আছে, আর সে নির্জন নিভৃত কুঞ্জগুলি বনবাসিনীদের আনন্দের স্থান। তুমি তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে, অনেক জল বর্ষণ করিয়া দিবে, একটু হালকি হইবে; শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কী উৎকট অবস্থা! বিন্ধ্যের পা-গুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ডেলায়, ডুমরিতে এবড়ো খেবড়ো। যেন কোনো গোদা মিঙ্গের পায়ে ধরিয়া নর্মদা আলুথালু ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্মদা, উপরে কূর্মপৃষ্ঠবৎ অবস্থিত বনরাজি বিরাজিত বিন্ধ্যপর্বত। মাঝে মাঝে সাদা ঝরণা। পর্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া নর্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে যেন একটা হাতির শিঙার হইয়াছে। বড়ো বড়ো সাদা সাদা লাল লাল কালো কালো ডোরা দেওয়া হাতির শিঙার যিনি দেখিয়াছেন তিনিই এ উপমার মর্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তুমি জল ঢালিয়া নর্মদার জল লইয়া প্রস্থান করিবে। এইখানে জাম গাছের নিবিড় বন। জলের বেগ জাম গাছের ঝাড়িতে ঝাড়িতে আটকাইতেছে। গাছে গাছে লাফাইয়া পড়িতেছে, আর মলা কাটিয়া হাল্‌কা হইতেছে। বিন্ধ্যপর্বত গজের আকর অর্থাৎ হাতিখেদার একটা প্রধান স্থান। পালে পালে হাতি পড়িয়া নর্মদার জলকে তাহাদের মদজলে সুরভি করিয়া তুলিয়াছে। তুমি ঐ জল পেট পুরিয়া লইও, তাহা

হইলে বায়ু তোমায় তুলার মতো উড়াইয়া দিতে পারিবে না। খালি হইলেই লঘু হয়, পুরা হইলেই ভারি হয়। তুমি জল পুরিয়া ভারি হইও। কথাগুলি সংস্কৃতে এমনি করিয়া সাজানো আছে যে উহার ভিতরে ভিতরে আর-একটা অর্থ রহিয়া গিয়াছে। যদি রোগীকে বমন করাইয়া তাহাকে লঘু তিক্ত কষায় জল খাওয়ানো যায় এবং ক্রমে তাহার বলাধান হয় তাহা হইলে বাতে তাহার কাঁপনি জন্মাইয়া দিতে পারে না।

তুমি যেখানে যেখানে যাইবে কদম্বফুল ফুটিবে। কদম্বগোলের গাত্রস্থিত অসংখ্য কুঁড়িগুলি ফাটিয়া কেশর বাহির হইতে থাকিবে, কতক বাহির হইয়াছে কতক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় উহার বিচিত্র বর্ণ বিকাশ হইবে। খানিকটা কাঁচা সুতরাং সবুজ, খানিকটা পাকা, সুতরাং পাঁশুটে, উভয়ের মিশ্রণে কী বিচিত্র শোভাই হইয়া উঠিবে। তুমি যেখানে যেখানে যাইবে দেখিবে জলাভূমে ভুঁইচাঁপার প্রথম কুঁড়িগুলি বাহির হইতেছে, আর তুমি যেখানে যেখানে যাইবে ভূমি হইতে বিচিত্র সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে। হরিণগুলি কদম্বফুল দেখিয়া, ভুঁইচাঁপার ফুল খাইয়া, ও সোঁদা গন্ধ শুঁকিয়া, মদভরে লম্ফঝম্ফ করিবে আর লোককে দেখাইয়া দিবে এই পথে তুমি বৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

হে সখে, তুমি আমার প্রিয়ার জন্য যাইতেছ। আমার প্রাণও আকুল হইয়াছে আর দেরি সয় না। তথাপি আমি দেখিতেছি যে প্রতিপর্বতেই তোমার বিলম্ব হইবে। কুরচি ফুল তোমার বড়ো প্রিয়। পর্বতগুলি টাটকা ফোটা কুরচির গন্ধে ভর ভর করিতেছে, তুমি নিশ্চয়ই একটু গড়িমসি করিবে; তাহার উপর আবার যখন ময়ূরেরা তাহাদের শ্বেতবর্ণ নয়নপ্রান্ত ঘুরাইয়া সজল নয়নে কেকা উচ্চারণ করিয়া তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে; প্রাণের বঁধু, এসো হে এসো হে বলিয়া তোমায় আগু বাড়াইয়া লইতে আসিবে; আহা যাহারা তোমার সাড়া পাইলে নাচিয়া উঠে তাহারা যখন প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে, তোমার সাধ্য কী যে তুমি চট্‌পট্ তাহাদের ছাড়িয়া যাও।

তুমি অধিষ্ঠান হইলে দশার্ণদেশ অর্থাৎ পূর্ব মালবের কী সুন্দর অবস্থা হইবে জান কি? উহার প্রান্তদেশে নিবিড় জাম গাছের বন। তোমার আগমনে জামের ফল সব একেবারে পাকিয়া উঠিবে, গাঢ় সবুজ জামের পাতা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জামের ছাল, তাহার উপর কুচকুচে কালো রাশি রাশি ফল, কালোয় সবুজে কালোয় কালোয় কালোতর কালোতম হইয়া উঠিবে। মালবদেশ ভারতের বাগান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, বেড়ায় কেবল কেয়াফুলের গাছ, তুমি গেলে কেয়াফুলের কুঁড়িগুলির ডগার

কাঁটা ছাড়িবে। পাপড়ি ছাড়িতে এখনো দেরি আছে, রাশি রাশি ফুল, কেবল সাদা, যেটুকু ফুটিয়াছে তাহাও সাদা; আবার সাদায় সাদায় সাদা হইয়া যাইবে। তুমি গেলে কাককুল বড়ো বড়ো গাছের আগায় বাসা করিতে থাকিবে, আর তাহাদের কলরবে গাছটা সুদ্ধ কলরবময় হইয়া উঠিবে। তুমি তথায় গেলে তোমার সঙ্গে যে হাঁসগুলা মানস সরোবরে যাইতেছিল তাহারা দশার্ণদেশে কয়েক দিন থাকিয়া যাইবে।

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উহার যশে ভুবন ভরিয়া আছে। তুমি বিলাসী; তুমি সেখানে গেলে তোমার বিলাস বাসনা সফল হইবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ তুমি তথায় বেত্রবতীর জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী; সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উহার জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোনো প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পান তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে। শুধু কি তাই কেবল, জল গভীর নদীগর্ভে পার্শ্বস্থ উপলে গভীর নাদে আছড়াইয়া পড়িতেছে, দূর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনী আবেগভরে না আ আ না আ আ এই অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া "আশা পুরে নাই আশা পুরে নাই" এই কথা বলিয়া দিতেছে। ভ্রূভঙ্গির সহিত গিরিনদীর তরঙ্গের তুলনা কী মধুর। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, প্রসারিত হয়, কাঁপে, তরঙ্গের আকারও কোথাও প্রশস্ত কোথাও কুঞ্চিত কোথাও বা নর্তিত হয়।

সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে শহরতলির পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্মপৃষ্ঠ ৩০০/৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। উহা বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক-একটা খালি ঘর নির্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কী হয়? —এমন কিছু নয়— একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা —এই কথা যে, নগরবাসীদের যৌবন দড়ি ছেঁড়ে — স্মৃতির লাগামে ধর্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা; নির্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে — সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য— (Contradiction in terms)। দূর মূর্খ দেখিতেছিস্ না — নাক কি নাই? ও কিসের গন্ধ? ও যে পরিমল, — চটকানো

ফুলের গন্ধ — ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে — বুঝিতেছিস না কে ঐ ফুল চটকাইল— কখন চটকাইল, কেমন করিয়া চটকাইল— যদি না বুঝিয়া থাকিস যা — তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।

নিচু পাহাড়ে একটু বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আবার চলিতে থাকিবে। ছোটো নদীটি, ধারে ধারে বড়ো বড়ো ফুল বাগান, কেবল জুঁই ফুলের গাছ; কত ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফোটাফুলে দু-এক আছড়া টাটকা জল দিবে। সেখানে তোমার অনেকের সঙ্গে আলাপ হইবে। তুমি যেমন লোক তেমনি লোকের সঙ্গে আলাপ হইবে। রসিকারা ফুল তুলিতেছেন— গাল বহিয়া ঘাম পড়িতেছে— আঁচল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। মুছিবার কিছুই নাই, তাই কান হতে যে পদ্মের কুণ্ডল ঝুলিতেছিল তাই দিয়া ঘাম মুছা হইতেছে, আর পদ্মটি মলিন হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তোমার দেহের নিচে যদি তাহারা একটু ছায়া পায়, আনন্দ-বিস্ফারিত-নেত্রে মুখ উঁচা করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমায় দেখিবে। সেই নিষ্কলঙ্ক মুখের সঙ্গে তোমার খানিক আলাপ হইবে।

তুমি উত্তর দিকে চলিয়াছ। উজ্জয়িনী বিদিশা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম। সুতরাং উজ্জয়িনী যাইতে হইলে তোমায় বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তথাপি আমার অনুরোধ — আমারই কাজে তুমি যাইতেছ— উজ্জয়িনী না দেখিয়া যাইও না। উহার অট্টালিকার ক্রোড়ে না বিশ্রাম করিয়া যাইও না। তুমি যখন উপর দিয়া যাইবে, অট্টালিকার উপরগুলি — ছাদগুলি — ক্রোড়গুলি তোমায় ডাকিবে। তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইও। উজ্জয়িনীর পুরবাসিনীগণের নয়ন বড়োই মনোহর। উহাদের অপাঙ্গ নিরন্তর চঞ্চল, চোখের কোলে নৃত্য যেন লেগেই আছে। সে নৃত্যের চাঞ্চল্যই বা কত? তার কাছে বিদ্যুতের খেলা কোথায় লাগে। তাদের সেই বিদ্যুদ্বিলাসী নয়নের সঙ্গে যদি খেলা খানিক না করিতে পারিলে, তবে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলে — আত্মবঞ্চনা করিলে— জন্মটা বিফলে গেল।

বিদিশা হইতে একটু পশ্চিমে নির্বিন্ধ্যা। কূর্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরমুখে চম্বলে পড়িতেছে। নদীর খোলা ঢালু জমির বশে যাইতেছে। দক্ষিণে উঁচা যত উত্তরে যাইতেছে ততই নিচু হইতেছে। নদীটি গিরিনদী, খাদটি বড়ো বড়ো পাথরে ভরা। স্রোতের জল যেন পাথরে পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে। যেখানে পাথর নাই জল গভীর স্থিরভাবে চলিতেছে তাহার মাঝে মাঝে ঘোল হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনী তোমায় নাভি দেখাইতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রে নাভি দেখানো নিষেধ। নির্বিন্ধ্যা বড়ো বেহায়া, তাই নাভি দেখাইতেছে; হোঁচট খাইয়া

পড়িতেছে; আর কী করিতেছে জানো? চন্দ্রহার ছড়াটা ঝম্‌ঝম্ করিয়া নাড়িতেছে। ও চন্দ্রহার পাইল কোথায়? কেন ঐ যে হাঁসগুলা সারি দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, তাহার সারিটি কেমন বাঁকিয়া চন্দ্রহারের মতো অর্ধবৃত্তাকার হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছ না? স্রোতের মুখে কি ও সার ঠিক থাকে। তাহার পর আবার স্রোতের যত ধাক্কা লাগিতেছে, ততই হাঁসগুলা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া খাদে শব্দ করিতেছে। চন্দ্রহারের শব্দটি কি ঐ রকম নয়! নির্বিন্ধ্যা যখন তোমার জন্য এত পাগলিনী তখন তোমার উহাকে বঞ্চিত করা কি উচিত! যদি বল নির্বিন্ধ্যা আমায় ডাকে কই— আমি বলি ঐ যে অত রঙ্গভঙ্গি— ওকি ডাক নয়?

স্ত্রীলোকে যাহাকে কামনা করে সংস্কৃতে তাহাকে সুভগ বলে অর্থাৎ ladies' man. হে মেঘ তুমি বড়ো সুভগ — সকল নদীই তোমায় কামনা করে। ঐ দেখ— সিন্ধু কূর্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঠিক সোজা খাড়া খাড়া উত্তরমুখে গিয়া চম্বলে পড়িতেছে। তোমার বিরহে বেচারা রোগা হইয়া গিয়াছে, একটি সরু জলধারামাত্র আছে। এপাশ হইতে দেখিতেছ না উহা ক্রমে আরো সরু, আরো সরু, আরো সরু হইয়া একটা চুলের বিননির মতো হইয়া শেষে মিলাইয়া গিয়াছে। বিরহে বেচারা পাঙাশ হইয়া গিয়াছে— তীরতরু সমূহের যত রাজ্যের শুকনা পাতা চড়ায় পড়িয়া আছে, বোধ হইতেছে নদীটাই বিরহে পাঙাশ হইয়া গিয়াছে — তোমারই সৌভাগ্য। যাহার বিরহে রমণী এত কাতরা তাহার চেয়ে সুভগ আর কে? দেখ সে কত পতিপ্রাণা; এখন সে বেচারার ক্ষীণতা যাহাতে ঘুচে; সেটা করিয়া দাও— সে তো তোমারই হাত।

সিন্ধুনদী পার হইয়াই অবন্তী। সেখানে সকলেই 'বৃহৎকথা' পড়িয়াছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বৃহৎকথার গল্প—উদয়নের গল্প লইয়া দিনযামিনী যাপন করে। অবন্তীর রাজধানী বিশালা বা উজ্জয়িনী। এত সম্পদ আর কোথাও নাই। পূর্বেই তোমায় বলা আছে, তুমি উজ্জয়িনী যাও। সে তো পার্থিব নগর নয়— সে যে স্বর্গের একটা খণ্ড — বড়ো শোভাময় খণ্ড — স্বর্গের খণ্ড পৃথিবীতে আসিল কিরূপে? যে- সকল স্বর্গবাসী লোক পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাঁহাদের যে পুণ্যটুকু এখনো ক্ষয় হয় নাই সেই পুণ্যটুকুর জোরে ঐ স্বর্গটুকু পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

সেখানে রমণীরা কেলিলীলায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শীতলস্পর্শ শিপ্রা নদীর বায়ু তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। শিপ্রাবায়ু ফুটন্ত পদ্ম হইতে সৌরভ গায়ে মাখিয়া সুরভি হইয়া উঠে, আর সারসেরা সরোবরে যে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে থাকে সে ধ্বনিকে অনেক দূরে লইয়া যায়; অনেক দীর্ঘ করিয়া দেয়। শিপ্রা-বাত

যে কার্য করে দেয়, তাহা আবার একজন মাত্র করিতে পারে সে কে? প্রিয়তম। তিনি কী করিয়া ক্লান্তিদূর করেন, প্রথম অঙ্গানুকূল কার্য করিয়া অর্থাৎ গা হাত পা টিপিয়া আর দলিত পুষ্পের পরিমল শুঁকাইয়া এবং অনেক মন জোগানো কথা কহিয়া অনেক মনরাখা কথা কহিয়া — সে কথাও এত লম্বা ও এত মিষ্ট যে কোথায় লাগে সারসের কূজন তাহার কাছে? তাহার এত খোসামোদের দরকার? এত ক্লান্তি তো তাঁহারই পূজায়, আবার খোসামোদ কেন? — ভবিষ্যতের আশার — সেও বেশি দূর ভবিষ্যৎ নয়!!!

উজ্জয়িনী গেলে তোমার অনেক উপকার। রমণীরা ধূপ জ্বালাইয়া চুলে বাস দিবে, আর সেই ধূপের ধুঁয়া জানলা দিয়া বাহির হইয়া তোমার গায়ে লাগিবে ও তোমার দেহ পুষ্ট করিয়া দিবে। নিজের দেহটা স্বচ্ছন্দ হবে, Waltair-এ যাইতে হইবে না। সেখানে বাড়ি বাড়ি তোমার অনেক বন্ধু আছে; তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তোমার সম্মানার্থ নৃত্য করিবে। যেমন বড়ো লোক আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ বাইনাচ হয়, তোমার জন্য সেইরূপ ময়ূরনাচ হইবে। দেখিবে উজ্জয়িনীর বড়ো বড়ো বাড়ির কত শোভা— ফুলের গন্ধে সব তর — আর সব বাড়িতেই সুন্দরীদের আলতাপরা পায়ের দাগ— বোধ হয় যেন লক্ষ্মী পূজার দিনে বাড়িময় লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পায়ের দাগ দেওয়া রহিয়াছে।

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে মহাকালের মন্দির। তুমি যখন সেখানে যাইবে, মহাদেবের প্রমথগণ একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। কারণ তাহারা তোমার কুচকুচে কালোরঙে মহাদেবের গলার শোভা দেখিতে পাইবে। তাই এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। মন্দির সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড ফুল বাগান। গন্ধবতীর বায়ু পদ্মের গন্ধ মাখিয়া, পদ্মের রজ সর্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া, আর যুবতীরা যে গন্ধতৈল মাখিয়া নাহিতেছেন তাহার গন্ধ অপহরণ করিয়া, বাগানের প্রত্যেক ফুলগাছ— প্রত্যেক লতা কাঁপাইতেছে।

হে জলধর, যদি অন্য সময়েও মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও; তাহা হইলেও সূর্যদেব যতক্ষণ না অস্তাচলে যান ততক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করা উচিত; কারণ আরতির সময় মেঘগর্জন হইলে তাহাতে আরতির ঢাকের কার্য করিবে। তোমার গর্জন করা সার্থক হইবে।

আরতির সময় বেশ্যারা চামর ঢুলায়। তালে তালে তাহাদের পা নড়ে, তাহাদের চন্দ্রহারে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ হয়। তাহাদের গহনার মণিমাণিক্যের শোভায় চামরের মণিবসানো ডাঁটা ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর—

স্ত্রীলোক তো — সুকুমার দেহ তো— খানিক চামর ঢুলাইলেই তাহাদের হাত ঝিমাইয়া আসে। যে হাতে রাত্রের নখের দাগ এখন একটু একটু চিড় চিড় করিতেছে, সেই হাত অবশ হইয়া আসে — সেই সময়ে সেই মাহেন্দ্রযোগে — তুমি যদি সেই চিড় চিড় করা দাগের উপর দু-ফোঁটা টাটকা জল ফেলিয়া দিতে পারো, তাহাদের শরীর জুড়াইয়া আসিবে। আর তাহারা, তুমি বড়ো রসিক বুঝিয়া আড়ে আড়ে আড়-নয়নে তোমার দিকে চাহিতে থাকিবে। কাজল পরা চোখের কোলে ঘোরাল কালো তারা দুইটি আসিয়া পড়িবে। প্রতি চাহনিতে বোধ হইবে একটি কালো ভোমরা বাহির হইয়া গেল; ক্রমে একটা দুইটা করিয়া এক সার ভোমরা সে চোখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই সন্ধ্যার সময় মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করেন, একটা টাট্‌কা মারা হাতির ছাল লইয়া তিনি নৃত্য করেন। রক্তাক্ত দিক্‌টা নিচের দিকে থাকে, আর শুকনা পিট্‌টা উপর দিকে থাকে। তিনি চার হাত — চার হাতই বলি কেন — হিন্দু ভাস্করেরা ইচ্ছানুসারে ঠাকুরদের হাত জোড়া জোড়া বাড়াইয়া দিতে পারিত— মেলা হাত তুলিয়া সেই চামড়াখান লুফেন আর লাফান। এ নৃত্য পার্বতীর চক্ষুঃশূল — হাজার হোক স্ত্রীলোক তো, অত রক্তারক্তি ব্যাপার তাঁহার বড়োই গরপছন্দ। তাই বলিতেছিলাম, তুমি যদি পার্বতীর প্রতি ভক্তি দেখাইতে চাও, তিনি স্নেহচক্ষে স্তিমিতনয়নে তোমায় দেখিবেন, ইহা যদি তুমি চাও, তবে গর্জন করিও না; ডাকডোক ছাড়িও না। নিচের দিকে টাটকা ফোটা জবাফুলের মতো সন্ধ্যাকালের লালরঙ মাখিয়া মন্দিরের সামনে থাকিও; মহাদেব হাতির চামর না লইয়া তোমায় লইয়াই নৃত্য করিবেন, পার্বতী তোমায় আশীর্বাদ করিবেন।

রাত্রি গভীর হইলে "শাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠিত" করে যখন মদনমনোমোহিনীরা নিজবাস পরিহার করত "প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা" হতে থাকবেন, যখন রাজপথ নিরেট অন্ধকারে আবৃত, এমনি নিরেট যে ছুঁচ ফুটানো যায়, তখন তুমি একটি কাজ করিও — তোমার সৌদামিনীকে একটু প্রকাশ করিও — তাহাকে চঞ্চলা চপলা হইতে বারণ করিও — সে যেন তোমার গায়ে কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখার ন্যায় খানিক নিশ্চল হইয়া থাকে। অভিসারিকারা যেন পথ দেখিয়া লইতে পারে। দেখিও — সে সময়ে জল ঢালিও না — সে সময়ে গুড়্ গুড়্ শব্দে ডাকিও না— তাহারা, তুমি ডাকিলে, — একে অবলা — তাহাতে আবার পাছে কেহ টের পায়, সেই ভয়ে সদাই চকিতা — ভয়ে একেবারে হতবুদ্ধি— দিশাহারা হইয়া যাইবে।

সৌদামিনী এরূপ দীর্ঘকাল প্রকাশ হওয়ায়, অনেকক্ষণ ঝিক্‌মিক্‌ করায়, ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। আহা সে তো তোমার চিরসঙ্গিনী রমণী, তাকে তো একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তাই বলি সে রাত্রিটা কোনো উঁচা বাড়ির চালে শুইয়া কাটাইয়া দিও। ওখানে কেহ তোমায় বিরক্ত করিবে না; করার মধ্যে পায়রাগুলা, তা তাহারাও ঘুমাইয়া আছে। তাহার পর সূর্য দেখা দিলে পুনরায় বাকি পথটুকু চলিয়া যাইবে। বন্ধুর কার্যভার গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোক তো কখনো চুপ করিয়া থাকে না।

দেখ, সূর্যদেব একটি বড়ো খারাপ কাজ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার প্রিয় রমণী নলিনীকে ফেলিয়া সারারাত কোথায় ছিলেন; — নলিনী বেচারা সারারাত কাঁদিয়া শিশিরের জলে ভরিয়া আছে। সকালবেলা অন্য লম্পট যেমন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুই হাতে অভাগিনী বিবাহিতা পত্নীদের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া থাকে, আদর করে, সূর্যদেবও তেমনি আপনার সহস্রকরে নলিনীর চোখের জল মুছাইতে আসিবেন। তিনি দেবতা, যেমন বুঝিবেন, তেমনি করিবেন, তুমি যেন মাঝে পড়িয়া তাহার কর রোধ করিও না। তাহা হইলে সূর্যের সঙ্গে তোমার মিছামিছি ঝগড়া বাড়িয়া যাইবে।

এইবার গম্ভীরা নদী — জল কী স্বচ্ছ — তরতর করিতেছে; তাই তলা দেখা যাইতেছে, যৌবনের প্রথম আরম্ভে ভাবুকের — কবির — প্রেমের প্রথম উদ্‌গমে প্রণয়িনী শকুন্তলার — হৃদয় এ জলের তুলনা পায় কি? তুমি তো সুভগ — অঙ্গনার কামনার বস্তু, তুমি ছায়ারূপে একেবারে গম্ভীরার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিবে। সে দেখিবামাত্র তোমায় তাহার নির্মল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। আর অতি চপল পুঁটিমাছগুলোকে উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া লাফাইতে দিয়া তোমার প্রতি চঞ্চল কটাক্ষে চাহিতে থাকিবে; এ কটাক্ষে কালো নাই; কুমুদ ফুলের মতো শাদা — সব শাদা; এ কটাক্ষের অর্থ জানো তো— দেখিও যেন এই সময় জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসিও না; দেখিও তাহার সে উজ্জ্বল চক্ষের সে শাদা চাহনি নিষ্ফল করিও না। হে সখে, তাহার খাদ অতি সরু; তাহার খোলা প্রশস্ত; খাদের জলের দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড বালির চড়া, আর পাড় খুব উঁচা; পাড় হইতে ঘোরালো নীলরঙের বেতগাছ ঝুলিয়া বালির চড়ায় পড়িয়াছে; একটু সম্মুখে উচ্চ হইতে চাহিয়া দেখিলে বোধ হইবে খোলার দুই পাড় ক্রমে সরু হইয়া শেষ মিলিয়া গিয়াছে; খাদের দুই পাড়ও অল্পের মধ্যেই ক্রমেই সরু হইয়া মিলিয়া গিয়াছে — এখন চড়াটার আকার কিরূপ হইয়াছে বুঝিয়াছ কি? আরো বলি, নদীটা কূর্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঢালু জমির উপর দিয়া নিচু মুখে চলিয়া যাইতেছে আর তুমি সেই

বিন্ধ্যের উপর হইতে দেখিতেছ, বুঝিয়াছ কি চড়ার চেহারাটা কী রকম হইয়াছে? তোমার নদী নায়িকা যেন তাহার পিছনের দিকে জলের নীলাম্বরি হাত দিয়া গুটাইয়া রাখিয়া তোমায় ডাকিতেছে; আমার অদৃষ্ট মন্দ — আবার দেরি হইবে। তুমি কি ও অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে? তুমি তো ঝুলিতে ঝুলিতে যাও— তুমি কি এ মাহেন্দ্রযোগ ছাড়িতে পারিবে— ও যে ব্যানত রতি; যত রতিবন্ধ আছে সবার উৎকৃষ্ট; রতিবন্ধের চরম আস্বাদ; যে একবার ইহার আস্বাদ পাইয়াছে সেকি কখনো ওরূপ বিবৃতজঘনা বিলাসবতী কামিনীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে? আমারই অদৃষ্ট মন্দ; — দেরি হইয়া উঠিবে দেখিতেছি। হা ভগবান!

দেবগিরি উজ্জয়িনী হইতে মান্দাশোর যাইবার পথে চম্বল নদের অবিদূরে একটি উঁচা পাহাড়। গম্ভীরার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তুমি যখন দেবগিরি যাইবে, তখন দারুণ গরম লু-এর বাতাসের বদলে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকিবে। প্রথম জলের আছড়া পাইয়া পৃথিবী হইতে যে সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে, বায়ু সে গন্ধ মাখিয়া মাতিয়া উঠিবে। হাতিগুলা গরমের চোটে অস্থির; তাহাদের নাকের ভিতর গরমে জ্বলিয়া যাইতেছে; সুঁড় তুলিয়া ঘড় ঘড় করিয়া সেই প্রথম ঠাণ্ডা বাতাস টানিতে থাকিবে, আর সেই ঠাণ্ডা বাতাসে সুদূর বিস্তীর্ণ যে যজ্ঞডুমুরের বন আছে, তাহার সব ফল পাকিয়া উঠিবে, ঠাণ্ডা মৃদু সুগন্ধে দেশ তর হইয়া যাইবে। মগজ ভরিয়া যাইবে।

দেবগিরি কার্তিকের চিরবাসস্থান। কার্তিক বড়ো কম দেবতা নন; সাক্ষাৎ মহাদেবের সন্তান। তুমি দেবগিরিতে গিয়া ফুলে ভরা মেঘ হইবে; ফুলগুলি মন্দাকিনীর জলে ভিজাইয়া লইবে আর শ্রাবণের ধারার ন্যায় সেই ফুলের ধারাবৃষ্টি করিয়া কার্তিককে স্নান করাইয়া দিবে।

কার্তিকের একটি ময়ূর আছে। তাহার মতো ভাগ্যবান আর কি কেহ জগতে আছে? তাহার যদি একটি পাখ্না খসিয়া পড়িল — সেই চাঁদওয়ালা চকচকে পাখনা যদি খসিয়া পড়িল পার্বতী অমনি— আহা কার্তিকের ময়ূরের পাখা — বলিয়া তাহা কুড়াইয়া পদ্মের সঙ্গে মিশাইয়া কানে তুলিয়া লইলেন। এত ভাগ্য এ ভূ-ভারতে আর কার আছে? শুধু কি তাই — মহাদেব সে ময়ূরটিকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহার কপালের চাঁদের শাদা আলোয় তাহার শাদা চোখের একটা আশ্চর্য শোভা হয়। এমন যে ময়ূর, কার্তিকের প্রিয়, শিবের প্রিয়, শিবার প্রিয়, তুমি তার — একটু নোটিশ নিও। তুমি গর্জন করিও, সে গর্জন গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সে ময়ূর তালে তালে নাচিতে থাকিবে।

কার্তিকের পূজা সারিয়া তুমি ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। সিদ্ধ সিদ্ধা যুগলমিলনে আকাশপথে বীণা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা — পাছে জল লাগিয়া তার বেসুরা মরিয়া যায়, তাই তোমার পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। তাহার পর তুমি চর্মণ্বতীর মান রাখিবার জন্য ঝুলিয়া ঝুলিয়া নামিবে। চর্মণ্বতী সামান্য নদী নহে। রন্তিদেব গোমেধযজ্ঞে এত গোবধ করিয়াছিলেন যে তাহাদের চামড়া হইতে ঝরিয়া পড়া রক্তে একটি নদী হয়; চর্মণ্বতী—সেই নদী।

চর্মণ্বতী প্রবাহ খুব বিস্তৃত; কিন্তু তথাপি উপর হইতে — দূর হইতে দেখিলে অতি ক্ষীণ দেখাইবে। দেখিবে কোথাও বড়ো বড়ো পাথরের পাশ দিয়া কড় কড় করিয়া জল যাইতেছে; কোথাও সড়াৎ করিয়া খানিকটা স্থির জল চলিয়া যাইতেছে। কোথাও একটু উপর হইতে পড়ায় ফেনময় হইয়া যাইতেছে। ফেন-রাশি উপর হইতে মুক্তার মতো দেখাইতেছে— নদীটি একটি মুক্তার হারের মতো দেখাইতেছে। তাহারই মাঝখানে তুমি যদি চিকণ কালার রঙ্ চুরি করিয়া জল খাইতে নামো, গগনচারী দেবগণ নিচের দিকে চাহিয়া দেখিবেন— যেন মুক্তার মালায় একখানা বড়োনীলমণি বসান রহিয়াছে।

চর্মণ্বতী পার হইয়া দশপুর, এখন উহার নাম মান্দাশোর। দশপুর হইতে দশোর হইয়াছে। মহকুমা দশোর ক্রমে "মন্দ" অর্থাৎ সংক্ষেপ হইয়া মান্দাশোরে দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সাভিলাষ দৃষ্টিতে তোমায় দেখিবে। তাহাদের ভ্রূলতা সদাই কাঁপিতেছে— সে ভ্রূভঙ্গিতে কত হাব ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহারা উপর দিকে চাহিলে প্রথম চোখের শাদা রঙ তাহার পর চোখের তারার কালো রঙ ছুটিতে থাকে; বোধ হয় যেন কতকগুলা কুঁদফুল উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে; ভোমরাগুলা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

তাহার পরে— অনেক পরে — ব্রহ্মাবর্ত; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্মিত দেশ। আদিম আর্যভূমি — চাতুর্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তিস্থান। তুমি তাহার উপর ছায়াপাত করিয়া গমন করিবে। ক্রমে কুরুক্ষেত্র, তথায় আজিও সেই ঘোরতর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিহ্ন-সকল বিদ্যমান আছে। এখানে, তুমি যেমন কমল-বনের উপর জলধারা বর্ষণ কর, গাণ্ডীবধারী অর্জুন তেমনি ক্ষত্রিয়গণের মুখোপরি শরবর্ষণ করিয়াছিলেন।

জান তো, বলরাম কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন না করিয়া সরস্বতীতীরে যোগসাধনে মগ্ন ছিলেন। তখন তিনি মদের পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন — যে পিয়ালায় রেবতীর চক্ষু প্রতিফলিত হইত — সে পিয়ালা ত্যাগ

করিয়াছিলেন। তখন কেবল সরস্বতীর জলই তাঁহার পিপাসা দূর করিত; তুমিও সেই সরস্বতীর জল পান করিবে, সে পবিত্র জলে তোমার ভিতরটা শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কেবল বর্ণটা মাত্র কালো থাকিবে।

সেখান হইতে কনখল যাইবে। কনখলে দক্ষযজ্ঞ হয়। সে যজ্ঞের কুণ্ড এখনো আছে। পাণ্ডারা পয়সা পাইলে এখনো তথায় হোম করিতে দেয়। কনখলের নিকটেই, ২/৩ মাইলের মধ্যেই গঙ্গা হিমালয় ছাড়িয়া সমতলে প্রবেশ করিতেছেন এবং সগরতনয়েরা স্বর্গে যাইবে বলিয়া সোপান পরম্পরার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হরিদ্বারের উচ্চতা সমুদ্রের জল হইতে ৫০০/৬০০ ফুট। সেখান হইতে যত উচ্চে যাইবে দেখিবে গঙ্গা ধাপে ধাপে উঠিয়াছেন; ক্রমে ২২০০০ ফুট পর্যন্ত গঙ্গা উঠিয়াছেন। এই ধাপে ধাপে সগরতনয়েরা স্বর্গে গিয়াছেন। যেমন ধাপে ধাপে গঙ্গার জল নামিয়াছে, অমনি ধাপে ধাপে ফেনা রাশীকৃত হইয়া আছে। তুমি যখন উপর হইতে দেখিবে, বোধ হইবে, দু'ধারে উচ্চ উচ্চ পাড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গার খোলা — তাহাতে দূরে দূরে রাশি রাশি ফেনা— যেন দুইটা ঠোঁটের মধ্যে কেবল হাসি; ২২০০০ ফুট হইতে ৫০০ ফুট পর্যন্ত নামা পাহাড়ে এই হাসি দেখিলে বোধ হইবে যেন মা গঙ্গা গাল কাত করিয়া বিদ্রূপের হাসি— সর্বনেশে হাসি হাসিতেছেন। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা উপরদিকে — যে দিকে বিষ্ণুর পাদ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে— কমণ্ডলু হইতে শিবের জটায়, এবং তথা হইতে হিমালয়ে পড়িতেছেন— তরঙ্গ হস্ত বিস্তার করিয়া গঙ্গা মহাদেবের মাথার কেশ ধরিয়াছেন। তরঙ্গ কপালে যে চাঁদের কলা আছে, তথায় আঘাত করিতেছে; দেখিল সতিনী গৌরী ঈর্ষা-কষায়িত লোচনে ভ্রূকুটি করিতেছেন, তাই গঙ্গা গাল কাত করিয়া হাসিতেছেন।

গঙ্গার জল শাদা নির্মল, ফটিকের মতো শাদা। তোমার সহিত সুরগজের বেশ তুলনা হইতে পারে; তুমি কালো। তুমি শুঁড়ের মতো ডগা বাড়াইয়া জল খাও, তুমি যেখানে গঙ্গার জল খাইবার জন্য নামিবে তথায় তোমার কালো ছায়া সেই শাদা জলে খেলিতে থাকিবে; বোধ হইবে প্রয়াগ ছাড়া আর একজায়গায় গঙ্গা যমুনার মিলন হইল।

ক্রমে উঠিয়া তুমি হিমাচলে যাইবে। ইনিই গঙ্গার পিতা; ইনি বরফে সর্বদা আবৃত। এই পর্বতে উঠিয়া তুমি যখন বরফের চূড়ায় বিশ্রাম করিবে; বোধ হইবে যেন মহাদেবের ষাঁড়ের সিংএ পাঁক — এঁটেলামাটি লাগিয়া আছে।

তুমি দেখিবে হয়তো সরল গাছের কাঁধে কাঁধে ঘেঁষ লাগিয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফুলকি উড়িয়া চমরি মৃগের লেজে পড়িতেছে আর তাহার লেজটি পুড়িয়া

যাইতেছে। যদি এরূপ দেখিতে পাও তবে সহস্র সহস্র বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া সে অগ্নি নির্বাণ করিও। বড়োলোকের সম্পদের ফল কেবল বিপন্নগণের বিপদ নিবারণ।

সেখানে আটপেয়ে মৃগ আছে। তাহারা যদি লাফাইয়া তোমায় ডিঙাইয়া যাইবার জন্য আসে; শিল, বৃষ্টি, ঝড়, অন্ধকার করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। বিফল কাজে চেষ্টা করিতে গেলে কাহার না অবমান হয়।

সেখানে দেখিবে পাথরের উপর স্পষ্ট মহাদেবের চরণচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সিদ্ধগণ সততই সেখানে পূজা দিতেছে। তুমি ভক্তি ভাবে ভোর হইয়া নিচে নামিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। শ্রদ্ধাপূর্বক ঐ পাদপদ্ম দর্শন করিলে ভক্তেরা দেহান্তের পর অবিনশ্বর গণপদ পাইবার অধিকারী হন।

সেখানে বড়ো বড়ো বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশে মাঝে মাঝে ছেঁদা আছে; সেই ছেঁদার মুখে বায়ু বহিতে থাকিলে পোঁ ওঁ ওঁ ওঁ করিয়া শব্দ হয়। সেখানে কিন্নরী অর্থাৎ বাংলায় যাহাদের কান বলে (যথা মধো কান)[১২] তাহাদের স্ত্রীলোকেরা একযোগে মহাদেবের মহিমা ঘোষণার্থ ত্রিপুরবিজয় গাহিতেছে। ইহার উপর যদি মেঘ ডাকিতে থাকে— সে ডাক যদি কন্দরায় কন্দরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া পাখোয়াজের কাজ করে, তাহা হইলে মহাদেবের গান সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া উঠে। একেবারে Concert হয়।

হিমালয়ে অনেক দেখাব জিনিস আছে। সে-সব একে একে দেখিয়া ক্রৌঞ্চ পাসে উপস্থিত হইবে। ১৬০০০ ফুটেরও উপর একটা পাস্ আছে, অতি উচ্চ দুইটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটা ঘুলঘুলি মতো আছে, তাই দিয়া তিব্বতে ও ভারতে যাতায়াত চলে। সেই গলির — ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। ঐ গলিই কি আগে ছিল? আগে উহা নিরেট পর্বত ছিল। পরশুরাম বাণ মারিয়া পাহাড় ফাঁড়িয়া ঐ গলিটুকু বাহির করিয়া দেন।

এতক্ষণ তোমার যাবার মতো প্রশস্ত অবাধ পথ পাইয়াছিলে, এখন আর তেমন পথ নাই। ঐ গলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। তুমি সহজে ডানা মেলা পাখির মতো যাইতে পারিবে না। তোমায় কাত হইয়া যাইতে হইবে— আরো কাত — আরো কাত — আরো কাত হইয়া যাইতে হইবে। নারায়ণ বলিচ্ছলনাকালে যেমন একটা পা উঁচা করিয়া — তের্‌চা করিয়া দিয়াছিলেন। তোমায় তেমনি ভাবে যাইতে হইবে। এই পাস্ পার হইয়াই দেখিবে কৈলাস। সব শাদা, স্বর্গের রমণীগণের আর এখানে আরসির দরকার হয় না। স্বচ্ছ বরফাবৃত কৈলাসই

তাহাদের দর্পণের কাজ করে। তাহার বড়ো বড়ো শিখর — সব বড়ো বড়ো বরফাবৃত — শাদার উপর শাদা — গাদা গাদা শাদা — যেন কুমুদ ফুলের রাশি চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেন মহাদেবের অট্টহাস, দিন্‌কের দিন জমা করিয়া বড়ো বড়ো গাদা দিয়া রাখিয়াছে।

কাজলের রঙে চোখ জুড়াইয়া যায়; কাজলের ডেলা যদি ভাঙিয়া ফেলা যায়, ভিতরের রঙ কতই নয়নরঞ্জন হয়, তোমার রঙ ঠিক কাজলের ডেলাভাঙা রঙ; আর কৈলাসের রঙ কেমন? এইমাত্র যে হাতির দাঁতটি চেরা হইল, তাহার ভিতরকার রঙের মতো চক্‌চকে, চোখ-জুড়ানো প্রাণ-জুড়ানো শাদা। এই কালো তুমি যখন এই শাদা চূড়ায় বসিবে তখন লোকে একদৃষ্টে দেখিবে যেন বলরামের বিরাট শাদা দেহে — কাঁধে নীলাম্বরী ফেলা আছে।

এখানে গিয়া যদি দেখ মহাদেব হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন; পাছে পার্বতী ভয় পান বলিয়া সাপের বালা ফেলিয়া দিয়াছেন, আর পার্বতী সে হাত ধরিয়া পদব্রজে ক্রীড়াশৈলে উঠিতেছেন; তবে এক কাজ করিবে। তোমার দেহমধ্যে যে জল আছে সে জলকে স্তম্ভন করিবে; পর্বত যে ভঙ্গিতে উঠিতেছে সেই ভঙ্গিতে আপনার দেহটি পর্বতের গায়ে বসাইবে। তুমি যেন একটা গদিপাতা সিঁড়ি হইবে; আর পার্বতীর উঠিতে কোনোই কষ্ট হইবে না।

বেদের মতে আর কালিদাসেরও মতে মেঘটা একটা জলভরা ভিস্তির মতো। তুমি হাতের কাছে আসিলে সুরযুবতীরা বালার হীরার খোঁচা মারিয়া তোমার গায়ে ছেঁদা করিয়া দিবে, তাহাতে তোমা হইতে সহস্র-ঝারার ন্যায় জল পড়িবে। তোমার সঙ্গে যাহারা এরূপ কু-ব্যবহার করিবে, তুমি জল ঢালিয়া তাহাদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় খুব গড় গড় গড় গড় গড়, করিয়া, গর্জিয়া উঠিবে। খেলা করিতে গিয়া তাহারা চাপল্য দেখাইয়াছে বৈ নয়; তাহারা ভয়ে জড়োসড়ো হইয়া উঠিবে।

তুমি মানস সরোবরের জল গ্রহণ করিবে। ঐ জলে সোনার শতসহস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে। তুমি ঐরাবতের মুখে লাগিবে। মুখে কাপড় দিলে যেমন আনন্দ হয় ঐরাবতের ক্ষণকাল তেমনি আনন্দ হইবে। যেমন বাতাসে কাপড় নড়ে তেমনি তুমি কল্পদ্রুমের পাতাগুলি নাড়িবে। এইরূপে নানা প্রকারে— হে জলদ, তুমি সেই পর্বতরাজকে উপভোগ করিবে।

সেই পর্বতের ক্রোড়ে নগরী। পর্বত যেমন উঁচানিচা হইয়াছে, সেই বশে পর্বতগাত্রে বাড়ি নির্মাণ করিয়া নগরী হইয়াছে, বোধ হইতেছে কোনো রসিকা

প্রণয়ী পর্বতের ক্রোড়ে এলোথেলো হইয়া শুইয়া আছে। পাশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। মেঘ দক্ষিণে একটু দূর হইতে — উচ্চ হইতে — দেখিতেছে যেন একখানা আঁচলা পড়িয়া আছে। বোধ হইবে এ আর কিছুই নহে — ঐ কামিনীর কাপড়খান; একটি কোণ মাত্র গায়ে ঠেকিয়া আছে। মেঘের সময়ে এই নগরের বড়ো বড়ো বাড়িতে (যাহার ছাত খোলার তৈয়ারি চালমাত্র) চালে মেঘ পড়িয়া আছে। খোলা বাহিয়া জলবিন্দু পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন কামিনীকুলের নিবিড় কৃষ্ণ ঝাপটার কেশে মুক্তার মালা ঝুলিতেছে। এই নগর দেখিয়া তুমি উহাকে যে অলকা বলিয়া চিনিতে পারিবে না— এমতো কথাই নহে।

এতদূরে পূর্বমেঘের ব্যাখ্যা শেষ হইল। পূর্বমেঘে সমস্ত জড় পদার্থই চৈতন্যময়। মেঘ চেতন, রামগিরি চেতন, আম্রকূট চেতন, নর্মদা চেতন, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধবতী সবই চেতন। নদীগুলি বিশেষ চৈতন্যময়, প্রেমময়, প্রেমোন্মাদময়। কালিদাস প্রতি কথায় তাহাদের চৈতন্য, বুদ্ধি ও হৃদয় দেখাইয়াছেন; তাহারা সকলেই মেঘের প্রেমে আকুল। প্রেমে আকুল হইলে মানুষে যাহা করিয়া থাকে — তাহারা সে সকলই করিতেছে; আমরা আর তাহাদিগকে জড় বলিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। এইরূপে কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া অলকা পর্যন্ত সমস্ত জড়জগৎকে চৈতন্যময় করিয়াছেন; যেন এই সমস্ত স্থানের নদনদী, পর্বত, কন্দর, ভূচর, খেচর, জলচর, এমন-কী পুঁটিমাছটি পর্যন্ত যক্ষের দুঃখে দুঃখী, — যক্ষের বিরহে কাতর। যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকায় যাইতেছে; সকলে মিলিয়া মেঘকে খুশি করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ শিখরে স্থান দিতেছে; কেহ অট্টালিকার অগ্রদেশে ধারণ করিতেছে; কেহ জল দিয়া উহার দেহে বল জন্মাইয়া দিতেছে। কেহ-বা জল বাহির করিয়া উহার গতিলাঘব সম্পাদন করিতেছে। সমস্ত জড়জগতে যেন কেমন একটা একপ্রাণতা জন্মিয়া গিয়াছে। মেঘটি যক্ষের প্রাণ — মেঘ যাইতেছে, আমরা যেন দেখিতেছি যক্ষের প্রাণই ছুটিতেছে; আর যাহা কিছু দেখিতেছে আপনার উপযোগী করিয়া — আপনার করিয়া লইতেছে; আপনার প্রাণের সহিত — প্রেমময় আবেশময় ভাবের সহিত মাখিয়া লইতেছে। তাই জড়ের এত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। রঘুবংশের ত্রয়োদশে সমস্ত জগৎ, সমুদ্র, নদী, পর্বত, কানন যেমন রামসীতার পুনর্মিলনে একটা আনন্দের, সুখের, স্বপ্নের ছায়ায় আনন্দময়, সুখময়, স্বপ্নময় হইয়া উঠিতেছে, মেঘদূতে তেমনি সমস্ত জগৎ যক্ষের বিরহে — যক্ষের ভোগলালসায় — যক্ষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাইতেছে। রঘুর ত্রয়োদশে রাম আনন্দে বিভোর হইয়া— শত্রুনাশ হইয়াছে —

সীতার উদ্ধার হইয়াছে, — জগৎ জুড়িয়া বীরকীর্তি ঘোষণা হইয়াছে, — বংশের কলঙ্ক ক্ষালন হইয়াছে — তাই — আনন্দে বিভোর হইয়া সীতাকে জগৎ দেখাইতেছেন; জগৎও যেন সেই মহা আনন্দে বিভোর। যক্ষ বেচারা পরম আনন্দে ছিল। মনের মতো মানুষ পাইয়াছিল, প্রেমে — সুখে — মোহে — আর মোহিনীতে মজিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উপর ঘোর দণ্ডাজ্ঞা। সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। উহারা দেবযোনি, মানুষ তো নয়, যে প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে; কুবেরকে শিক্ষা দিবে। সে জানিল এ শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে — এখন কেবল একটা সংবাদ দিয়া স্ত্রীটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহার আর ভাবনা নাই; কেবল স্ত্রীর ভাবনা, সেই ভাবনা সে জগৎময় ছড়াইয়াছে।

রঘুবংশে রাম ও সীতা সশরীরে যাইতেছেন, তাঁহারা নারায়ণ ও লক্ষ্মীর অবতার; জড়জগৎ তাঁহাদের অনেক নিচে। তাঁহারা উপর দিয়া যাইতেছেন, — কখনো মেঘের নিচে দিয়া কখনো মেঘের মধ্য দিয়া, কখনো মেঘের অনেক উপর দিয়া যাইতেছেন। দেবতাদেরও যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের যেরূপ সরঞ্জামে যাওয়া উচিত; রামসীতাও সেইরূপ সরঞ্জামে যাইতেছেন। জড়জগৎ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে — অনেক উপরে। তাঁহারা চৈতন্যেরও চৈতন্য। জড়জগৎ তাঁহাদের কাছে সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর — খেলার জিনিস। আর মেঘদূতে যক্ষ বেচারা আপনার দুঃখমাখা, বিরহমাখা, প্রাণটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার জড়দেহ কোথায় পড়িয়া আছে। যে ছুটিতেছে সে অধিক উঠিতে পারিতেছে না, কিন্তু অনেক নিচে নামিতেছে। নদীর খোলায় পড়িতেছে, খাদে পড়িতেছে, জড়জগতের সঙ্গে মিলিতেছে, মিশিতেছে, এক হইয়া যাইতেছে। দুঃখ দুর্ভরতা সত্ত্বেও — প্রাণের কান্না সত্ত্বেও — সে যেন জড়জগৎ উপভোগ করিয়া যাইতেছে। উপভোগ করিয়া যাইতেছেই বা বলি কেন? সে যেন সমস্ত জড়জগতের নিকট সমবেদনার মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। আর কবির কবি, কবিকুলের গুরু, তাহার উপর সেই সমবেদনা ঢালিয়া দিতেছেন; জগৎময় তাহার জন্য সমবেদনার উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন।

উত্তরমেঘ

দেখো মেঘ, অলকায় বড়ো বড়ো অট্টালিকা আছে; তাহারা অনেক বিষয়েই তোমারই সমান হইতে পারে। দেখো, তোমার বিদ্যুৎ আছে, তাহাদের আছে রমণী, বিদ্যুৎ-বরণী — চঞ্চল চরণে চলিয়া বেড়াইতেছে। যত বার চোখে পড়িতেছে চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে। তোমার রামধনু আছে, কত বিচিত্র রঙ — কেমন উজ্জ্বল, তাহাদের চিত্র আছে, কত বিচিত্র রঙ, — কেমন উজ্জ্বল। পাহাড়িরা ছবি বড়ো ভালোবাসে; সবারই ঘরে ছবি আছে। পেকিন টোকিও হইতে আরম্ভ করিয়া রোম পারিস প্রভৃতি সকল দেশের ছবিই ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে। নেপালে এক-একবার তসবির যাত্রা নামে উৎসব হয়; ঐ উৎসবের দিন, নানাদেশের ছবি, যাহার যাহা আছে আনিয়া কোনো একটা গলির দু-ধারে টাঙাইয়া দেয়; আর দর্শকেরা দেখিতে দেখিতে গলির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া যায়। অধ্যক্ষেরা মন্দ ছবি টাঙাইতে দেন না। তোমার গম্ভীর গর্জন আছে — সে গর্জনে কাহার-না কান জুড়াইয়া যায়? তাহাদের আছে পাখোয়াজের আওয়াজ। অনেক সময় পাখোয়াজের আওয়াজ আর দূরস্থ মেঘ গর্জনের ইতর-বিশেষ করা যায় না। তুমি মেঘ, তোমার ভিতরে জলভরা, আর তাহাদের মেজেগুলি চন্দ্রকান্ত মণিময়; মণি হইতে অনবরত জলক্ষরণ হইতেছে। তুমি উচ্চ, আর অট্টালিকার অগ্রভাগগুলি — চূড়া — শিখরগুলিও উচ্চ; তুমি তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া গেলে বোধ হয় তাহারা মেঘের তলদেশ লেহন করিতেছে।

শরতে পদ্ম ফুটে; অলকায় রমণীকুলের সবারই হস্তে পদ্ম আছে, তাহারা পদ্ম লইয়া খেলা করে। হেমন্তে কুন্দ ফুল ফুটে; তাহাদের নিবিড় কৃষ্ণ অলকের মাঝে মাঝে কুঁদফুলের ঝারি। শীতে লোদ ফুল ফুটে, লোদফুল বড়ো শাদা; তাহার পরাগ আরো শাদা, সেই পরাগ মাখিয়া উহাদের মুখের শাদা রঙ, আরো শাদা, চক্‌চকে শাদা করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তের একটা ভালো আসবাব কুরুবক — কেমন

শাদা ও গোল; খোপার দুপাশে দুটি কুরুবক যেন দুটি শাদা প্রজাপতি উড়িতেছে। গ্রীষ্মে শিরীষ ফুল ফোটে; কেমন মৃদুগন্ধ, কেমন দেখিতে ছোটো। চামরটির মতো; চামরের গোড়াটি একটু লালচে, সূতাগুলি শাদা, একটু হলুদের আভা আছে মাত্র, আর ডগাটিতে কেমন একটু মোলাএম সবুজের আভা। শিরীষ কানে পরা; গালের উপর ঝুলিতেছে, আর মৃদুগন্ধে নাক ভরিয়া যাইতেছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কদম ফুল খোঁপার দড়ি দিয়া সিঁতার উপর আটকাইয়া রাখিয়াছে। বধূরা নিত্যই ছয় ঋতুর ফুলে নিজ দেহ সুসজ্জিত করিতেছে।

অলকার বাড়ির ছাদগুলি শাদা — চক্‌চকে শাদা — মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো। সেই শাদা পাথরের ভিতরে আকাশের তারাগুলির ছায়া খেলিতেছে। বোধ হইতেছে, শাদা পাথর বাঁধানো ছাদে শাদা ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। সেই ছাদে বড়ো বড়ো যক্ষ মহাশয়েরা পরম রূপবতী রমণী লইয়া মধুপান করেন। এ যে-সে মদ নহে। কল্পবৃক্ষ হইতে ইহার উৎপত্তি। ইচ্ছামাত্র তাঁহারা পাইতেছেন। তাঁহারা মধু পান করিতেছেন, সঙ্গে বরনারী, আর সেই সময় মেঘমন্দ্রে পাখোয়াজ বাজিতেছে। জমাটের পর জমাট হইয়া যাইতেছে।

এখানকার কিশোরীদের রূপই বা কী? দেবতারাও সেই রূপের জন্য লালায়িত। এই যক্ষ রমণীরা মন্দাকিনীর বালির চড়ায় মণি ফেলিয়া দেন, আর তাহার উপর সোনার বালি ছড়াইয়া দিয়া উহাকে লুকাইয়া ফেলেন, তারপর "খুঁজি খুঁজি নারি" করিয়া খুঁজিতে থাকেন। বায়ুদেব মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হন — এবং উঁহাদের সেবা করেন। বড়ো ক্লান্ত হইলে উঁহারা তীরবর্তী মন্দার বৃক্ষের ছায়ায় ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করেন। এই খেলা খেলিতে উহাদের সময় কাটিয়া যায়।

যক্ষ রমণীদের ঠোঁট দুটি ঠিক দুটি তেলাকুচার মতো। বড়ো মনোলোভা। সে অধরে দৃষ্টি পড়িলেই, যক্ষ বাবুরা আস্তে আস্তে আসিয়া আদর করিয়া উহাদের গরদের শাড়ির গাঁইট ধরিয়া উপরে টানিয়া তুলেন, আর শাড়ি আলগা হইয়া যায়; অমনি তাঁহারা সেই গরদের কাপড় টানিতে থাকেন। তখন মন প্রেমে গরগর — হাতের আর বিশ্রাম থাকে না। রমণী স্বতঃই লজ্জাশীলা; ভয়ে — লজ্জায় — প্রদীপ নিবাইবার চেষ্টা করেন। সম্মুখে যে-কোনো গুড়া-জিনিস পান প্রদীপের দিকে ফেলিয়া দেন; কিন্তু সে প্রদীপ নিভিবে কেন? সে যে রত্নের প্রদীপ, তেল-বাতির প্রদীপ তো নয়। তাঁহাদের সব চেষ্টা বিফলা হয়, তাঁহারা শরমে মরিয়া যান; আর — তাঁহাদের কর্তাদের জয়-জয়কার!

সততগতি বায়ুর নাম। সেই বায়ু ঠেলিয়া ঠেলিয়া তোমার মতো মেঘকে ঐ-সকল অট্টালিকার উপরের তালায় লইয়া যায়। ঘরের ভিতর মেঘ ঢুকিলেই ছবিগুলির উপর বিন্দু বিন্দু জল দাঁড়ায়, সুতরাং উহাদের দোষ জন্মে। তখন তাহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়াই — ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলিতে ফেলিতে জানালা দিয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু গরাদেয় গরাদেয় ভাঙিয়া জর্জর হওয়ায় বোধ হয় যেন ধুঁয়ার আকার ধারণ করিয়াই যাইতেছে। সংস্কৃতে কথাগুলি এমনি করিয়া সাজানো আছে যে, তাহার ভিতর ভিতর আরো একটি মানে আছে, সে মানেটি এই— দেখো যাহাদের সদাসর্বদা বাড়ির ভিতর গতিবিধি আছে, তাহারাই সঙ্গে করিয়া পর-পুরুষকে — বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে পারে। লইয়া গেলেও নির্জন ও নিঃশঙ্ক বলিয়া উপরের তালায়ই লইয়া যায়। সেখানে সে যদি অন্তঃপুরে কোনো দোষ উৎপাদন করে, তখনই তাহার ভয় হয়; সে জানালা দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, প্রহারে জর্জরিত হয় আর প্রহারের চোটে ধুঁয়া বাহির হইতে থাকে।

এখানে বিলাসিনীদের অঙ্গ-গ্লানি কিসে যায় জানো? যখন দৃঢ় বন্ধনের পর — দৃঢ় আলিঙ্গনের পর — প্রিয়তমের হস্ত শিথিল হয়, আলিঙ্গনও ক্রমে ঢিলা হইয়া আসে; তখন রমণীকুলের দেহের ব্যথা কিসে নিবারণ হয় জানো? না জানো তো বলি, শোনো। ঘরে বা খাটে যে চাঁদোয়া খাটানো আছে, তাহার চারিদিকে ঝালর আছে; ঝালরের প্রতিসূত্রে চন্দ্রকান্ত মণি আছে। তুমি সরিয়া গেলে সেই মণিতে চাঁদের আলো লাগায় তাহা হতে জল পড়িতে থাকে। সেই জলে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ হয়। এখানে একটা কথা আছে, যক্ষ যক্ষী শুইয়া আছে কোথায়? —বাহিরে চাঁদোয়া খাটাইয়া, অথবা ঘরের ভিতরে খাটের মাথায় চাঁদোয়া খাটাইয়া? অত শীতের দেশে প্রথম কথাটা বড়ো খাটে না। তাহা হইলে খাটের ঝালরে চাঁদের আলো লাগে কী রূপে? কৈলাস বড়ো উচ্চ; চাঁদ তাহার নিচে ঘুরে; তাই তাহার ঊর্ধ্বগামী কিরণ গিয়া খাটের ঝালরে লাগে। কুমারে এইরূপে পদ্ম ফুটানোর কথা আছে। এ ব্যাখ্যাও মনোমত হইল না। কারণ নিশীথে — চাঁদের আলো নিচে হইতে উপরে উঠিতে পারে না। তবে এক কথা — মহাদেবের মাথায় যে চাঁদের কলা আছে, তাহা হইতে কিরণ আসিয়া ছাদের কাছে যে ঝালর আছে, তাহাতে লাগিতে পারে, কারণ মহাদেব বাহিরের বাগানে বাস করেন। এ কথাও ঠিক নহে, কারণ মহাদেবকে দিয়া এ রকম কর্মটা করানো ঠিক নহে। তবে উহার ব্যাখ্যা এই যে কৈলাসের চূড়া সূর্যকক্ষ চন্দ্রকক্ষেরও উপরে, সুতরাং উঁহারা যতই কেন-না উঠুন না, আলো নিচে হইতেই লাগিবে। সূর্যদেব সুমেরুর চারিধারে ঘোরেন।

কখনো তাহার উপরে উঠিতে পারেন না। চাঁদও এখানে সেই রূপ নিচে ঘোরেন, উপরে উঠিতে পারেন না।

এখানকার শৌখিন লোকের টাকার কমি নাই, তাহাদের বাড়ির ভিতর এত নিধি আছে যে, তাহার ক্ষয় নাই। প্রত্যহ ইহারা নানারকম গল্প গুজব করিতে করিতে কুবেরের শহরতলির বাগানে আমোদ আহ্লাদ করে। বাগানের নাম বৈভ্রাজ। এই বাগানে বড়ো বড়ো অপ্সরা তাহাদের সঙ্গে থাকে। আর কিন্নরীরা উচ্চৈঃস্বরে কুবেরের যশোগান করে। আহা, তাহাদের গলা কী মিঠা! সেখানে রসবতীরা আপন বাড়ি ত্যাগ করিয়া রাত্রে পরের বাড়ি পর-পুরুষের কাছে যান। মনে করেন কাজটা এমনি গোপনে গোপনে সারিলেন যে, কেউ তাহা টেরও পাইল না। কিন্তু সকালে সারা রাস্তায় তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যাবার সময় এক-একবার ভয়ে একেবারে নিঃশ্বাস পড়ে নাই, আবার এক-একবার হাঁপাইয়াছেন, বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। যখন ভয় হইয়াছে, বার বার এদিক ওদিক চাহিয়াছেন, ঝাপটা হইতে মন্দার ফুল খসিয়া পড়িয়াছে। চন্দন দিয়া অলকা-তিলকা কাটা ছিল, তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল ; তাহার অনেক খসিয়া পড়িয়া আছে। যে সোনার পদ্ম কানে কুণ্ডল ছিল, তাহাও ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে। বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিলে, স্তনটা আরো উঁচা হইয়া উঠিয়াছে; স্তনের উপর যে মুক্তার হার ছিল, তাহা টানে টানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে; মুক্তাগুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এততেও ভামিনীরা ভাবিয়াছেন আমাদের যাত্রাটা খুব গোপনেই সারা হইয়াছে।

মদন ঠাকুর মহাদেবের উপর জারি করিতে গিয়া একবার খুব ঠকিয়াছিলেন, সেইজন্যে মহাদেবের ত্রিসীমানার মধ্যে ভয়ে আর ধনুক ওঁছান না। মহাদেব অলকায় নিত্য বাস করেন — সুতরাং অলকায় মদনের সে ফুলধনু — সে গুন্-গুন্-করা-ভোমরার ছিলা পড়িয়াই থাকে। তবে সেখানে মদনের এত আধিপত্য কীরূপে হয়? অলকায় প্রেমের ঢেউ — রসের তরঙ্গ — ভাবের লহর— কিছুরই অভাব নাই। এসব কিসে হয়? কিসে হয় বলিব? চঞ্চল সুন্দরীদের ঠমক চমকওয়ালা হাবে ভাবে। তাঁহারা যখন ভুরু নাড়িয়া নয়নবাণ ঝাড়িতে থাকেন, তখন কোন্ সহৃদয় পুরুষ সে বাণে বিদ্ধ হইয়া পা-দুটি গোট করিয়া বাণে বিদ্ধ পক্ষীর মতো ভূতলে লুণ্ঠিত না হয়?

কুবেরের দেশ এমনি আশ্চর্য দেশ, কিছুরই জন্য খাটিতে হয় না। কল্পবৃক্ষ আছেন। যা চাও তাই দেন। কেবল চাওয়ার পরিশ্রম। চাহিবামাত্র বোম্বে শাড়ি, বারাণসী চেলি, পার্সি শাড়ি। চাহিবা মাত্র সাম্পেন, রোজালিন প্রভৃতি গোলাপী

নেশার মদ — যে মদে প্রাণটা খুলে, মনটা ছুটে, চক্ষুটা ঢল ঢল করিতে থাকে, অথচ নেশায় বুঁদ হয় না। চাহিবামাত্র নানাফুল— একেবারে পাতা দিয়া তোড়াবাঁধা। চাহিবা মাত্র সব রকম গহনা। চাহিবা মাত্র তরল আলতা, পায়ে দিলেই হয়, কচলাইবার দরকার নাই; পদ্ম ফুলের মতো পায়ে বুড়া আঙুল দিয়া লাগাইলেই হয়। চাহিবা মাত্র যাতে যাতে রমণীর মন খুলে, প্রাণ খুলে, দেহে শোভা হয়, সে সবই এক কল্পবৃক্ষই দিয়া থাকেন।

সেই অলকায় — হায়, আমি এখন কোথায়? আর সে সুখের অলকাই বা কোথায়? সেই সুখের অলকায় — কুবেরের রাজবাড়ির একটু উত্তরে — তোষাখানা, পিলাখানা, আস্তাবল, কম্পাউণ্ড ছাড়াইয়া আরো উত্তরে আমার বাড়ি — তুমি অনেক দূর হইতে সে বাড়ি দেখিতে পাইবে। তাহার গেটটি অতি উচ্চ। গেটের দুই থামের উপরে প্রকাণ্ড গোল খিলান। তাহাতে কত চিত্র বিচিত্র করা, যেন একটি রামধনু। সেই গেট দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে। যদিই না পার — দেখিবে দ্বারের পাশে একটি চারা মন্দারের গাছ। সেটি আমার গৃহিণীর পালক-পুত্র। তিনি নিজে জল দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। এখন তাহাতে থোলো থোলো ফুল ফুটিয়াছে। ফুলের ভরে গাছটি নুইয়া পড়িয়াছে। হাত বাড়াইলেই সে ফুল তোলা যায়। এই মন্দার গাছ দেখিলেই আমার বাড়ি তুমি চিনিতে পারিবে।

উহার মধ্যস্থলে একটি দিঘি। দিঘিতে সানবাঁধানো সিঁড়ি। কিসের সান জান? সবুজ মণি দিয়া সান বাঁধানো— বড়ো বড়ো সবুজ মণি। সবুজ মণির বড়ো বড়ো পাথর — তাই দিয়া ঘাট বাঁধানো। দিঘিতে রাশি রাশি সোনার পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। বৈদূর্য নামে নীল মণিতে পদ্মের নাল তৈয়ারি হইয়াছে। হাঁসগুলা এই দিঘিতে এত আনন্দে — এত উল্লাসে — এত প্রেমে ভোর হইয়া বাস করে যে, কাছেই মানস সরোবর — সেখানে যাইতেই চাহে না। সেই দিঘির পাড়ে একটি ছোটো পাহাড় — আহা! সে আমাদের ক্রীড়ার ভূমি — মোলায়েম নীল মণি দিয়া তাহার চূড়া তৈয়ারি হইয়াছে। আর সেই পাহাড়ের চারিদিক বেড়িয়া সোনার কদলীবন। মরিরে — দেখিলে চোখ সেইখানে পড়িয়াই থাকে। তাহার কথা মনে হইলে এই দুঃখের দিনে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সে পাহাড়টি আমার গৃহিণী বড়ো ভালোবাসেন। যখনই দেখি তোমার নীল দেহের পাশ দিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, আমার সেই নীল পাহাড়ের কথা মনে পড়ে — সেই সঙ্গে গৃহিণীর কথা মনে পড়ে — মনটা উদাস হইয়া যায়। উহারই কাছে কাছে একটি মাধবী-লতার কুঞ্জবন। একটি লতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক জমি ঘেরিয়া একাই

একটি কুঞ্জ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চারিদিকে আবার কুরুবকের বেড়া, আর তাহারই নিকটে একটি অশোক গাছ। শাদা ফুলের অশোক নয়— লাল ফুলের অশোক। থোকো থোকো ফুল উঁচা মুখ হইয়া ফুটিয়া আছে। পাতার গোড়ায়, ডালের গায়ে, গুঁড়ির উপর লাল থোকো ফুল উঁচাদিকে মুখ করিয়া ফুটিয়া আছে। তাহার উপর গরদের শাড়ির মতো পাতলা অথচ শাদা, চটাল অথচ ঈষৎ রক্তাভ নূতন পাতাগুলি আসিয়া পড়িয়া ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে। বাতাসে সেই নূতন পাতাগুলি নড়িতেছে আর ভিতর হইতে সেই ফুল এক-একবার দেখা যাইতেছে, আর এক-একবার লুকাইতেছে। বলো দেখি কেমন দেখাইতেছে? বুঝিয়াছ কি? কেন কবিরা রক্তাশোককে উদ্দীপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? এই রাঙা ফুলের থোলোগুলাকে ঐ ভাবে দেখিলে মনটা খারাপ হয় না কি? মাধবীলতাকুঞ্জের পাশে একটি রাঙা অশোক ফুলের গাছ, আর একটি বকুলের গাছ, চিরদিনই সবুজ— চিরদিনই দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।

যক্ষ বলিতেছেন— ইহার মধ্যে একটি চান যে, তোমার সখী আমার সঙ্গে গিয়া উহাকে বাঁ-পায়ের লাথি মারেন; আর একটি চান যে, তোমার সখী উহার গায়ে মদের কুলকুচা করিয়া দেন। সংস্কৃত কবিকুল মনে করেন — স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা বলেন — যে, যুবক-যুবতী একত্র গিয়া অশোক গাছের কাছে দাঁড়াইলে পর, যুবতী যদি বাঁ পায়ের লাথি মারে তাহা হইলেই তাহার ফুল হয়। আর মদের কুলকুচা না দিলে বকুল গাছের ফুল হয় না। এ কার্যকারণ ভাবটা ঠিক নয়; তবে কবিরা একথা বলেন কেন? সংস্কৃত কবিরা বড়ো দুষ্ট, বড়ো বাচাল, তাঁহারা অশোকপাতার লুকোচুরিটি বেশ তারাইয়া তারাইয়া বুঝিয়াছিলেন। এখন বলো দেখি, সন্ধ্যার সময় যদি কোনো যুবক-যুবতী অশোক গাছের কাছে যায়, আর যুবক যদি ডান হাতের আঙুল হেলাইয়া যুবতীকে ঐ লুকোচুরি ব্যাপারটা দেখাইয়া দেয়, যুবতী কী করেন? আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তিনি "পোড়ার মুখ আর কী, আর মরণ নাই" বলিয়া গাছটিকে একটি বাঁ-পায়ের লাথি মারিয়া ছুটিয়া পলায়ন করেন, সে রাত্রে অন্ততঃ যুবকের কাছে মুখ দেখাইতে পারেন না। কবিরা কার্যকে কারণ করিয়াছেন আর কারণকে কার্য করিয়াছেন মাত্র। কথাটা ঠিকই বলিয়াছেন। বকুলের গন্ধটাও মহুয়ার মদের গন্ধের মতো। বোতলে থাকা মদ নহে, পিয়ালায় থাকা মদ নহে, কুলকুচা করা মহুয়ার মদের মতো উহার গন্ধ। তাই দুষ্ট কবি একটা কার্যকারণ ভাব ঘটাইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গাছ দুইটির মধ্যে একটি সোনার খোঁটা পোঁতা। তাহার উপরে একখানি স্ফটিকের তক্তা। পাছে খোঁটাটি স্ফটিকের ভরে পড়িয়া যায়, তাই সে খোঁটার গোড়াটি বেশ করিয়া বাঁধানো। কী দিয়া বাঁধানো? মণি দিয়া বাঁধানো। মণির রঙ কেমন? বাঁশের কোঁড়ের মতো। খুব টাটকা কোঁড়ের রঙ ফিকে, সে রকম নয়। খুব উঠিয়া গেলে কোঁড়ের রঙ বড়ো ঘোরালো হয়, সে রকমও নয়। ইহার মাঝামাঝি অবস্থায় যখন মোলাএম সবুজ রঙের ছটায় বাঁশবনের কমনীয় কান্তি হয় সেই সময়ের কোঁড়ের মতো রঙ। সেই তক্তায়—

শিখী যথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উচা করি ঘাড়,
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া
রুনু রুনু বাজে তার বালা।
স্মরিলে সে সব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলে উঠে হৃদয়ের জ্বালা।।[১৩]

হে মেঘ, বেশ করিয়া মনে গাঁথিয়া লও — আমি যে-সকল লক্ষণের কথা বলিলাম — মনে গাঁথিয়া লও। এইসব লক্ষণ দেখিলেই তুমি আমার বাড়ি চিনিয়া লইতে পারিবে। আরো দেখিবে— আমার বাড়ির গেটের পাশে একটি শঙ্খ ও একটি পদ্ম আঁকা আছে। আমি এখন সে বাড়িতে নাই, তাহার কি আর সে শোভা আছে? সে কান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। সূর্য অস্তে গেলে কমলের কি আর কমলের মতো শোভা থাকে?

সে বাড়িতে যাবার সময় তুমি চট্ করিয়া ছোটো হইয়া যাইবে। যেন শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পার। ঠিক যেমন আজ তোমায় দেখিতেছি — তুমি রামগিরির নিতম্বে পড়িয়া আছ — ঠিক এমনটি হইবে। বরং ইহার চেয়েও ছোটোটি হইবে। আমার খেলাবার ছোটো পাহাড়টিতে বসিবে। তাহারও কেমন নিতম্ব আছে — তাহার উপর বসিবে। সেইখানেই বসিয়া একটু একটু বিদ্যুৎ ফুটাইয়া, একটু একটু আলো করিয়া বাড়ির ভিতরে দেখিতে থাকিবে, এমনি ভাবে দেখিবে যেন একসারি জোনাকি বসিয়া টিপ্ টিপ্ করিতেছে। এইরূপ ভাবে দেখিলে আমার পত্নীকে দেখিতে পাইবে। আমি দূর দেশে আসিয়া পড়িয়া আছি, আর সে বেচারা — আহা, আমরা দুটি চকাচকির মতো থাকিতাম — চকা হারাইয়া চকির মতো পড়িয়া আছে। তাহার মন বড়ো খারাপ হইয়া গিয়াছে। দুঃখ ঘনীভূত হইয়া তাহাকে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। শিশির পড়িতে আরম্ভ করিলে পদ্মের

ঝাড় যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তাহার সে পদ্ম সে গৌরব সে নীল পাতা সে শাদা মৃণাল কিছুই ঠিক থাকে না। আমার গৃহিণীও ঠিক তেমনি হইয়া গিয়াছেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। আহা, সে কান্নার বিরাম নাই — বিশ্রাম নাই — গরম নিশ্বাস অবিরাম পড়িতেছে, তাহার অধরোষ্ঠের সে টুকটুকে লাল রঙ আর নাই। ফ্যাকাসে — পাঙাশ হইয়া গিয়াছে। বাঁ-হাতে মুখখানি রাখিয়া ভাবিতেছেন। ঝাপটাগুলা লম্বা হইয়াছে— ঝুলিয়া পড়িয়াছে — ডান দিগের ঝাপটাগুলা মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে মুখ আর তেমন দেখাইতেছে না; তাহার সবটি দেখাই যাইতেছে না। তুমি পিছু লাগিলে চাঁদ বেচারার যেমন দুর্দশা হয়, সে মুখেরও আজি তেমনি দুর্দশা হইয়াছে।

তুমি সেই ছোটো পাহাড়টির উপর বসিয়া একটু একটু বিদ্যুৎ খুলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া যখন ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে দেখিতে থাকিবে, তখন সে তোমার চোখে পড়িবে। কী ভাবে পড়িবে বলিতে পারি না, হয়তো সে আমার কল্যাণে ঠাকুর দেবতার পূজা করিবে বলিয়া তাহারই সাজপাট করিতেছে। না হয়, এক জায়গায় নির্জনে বসিয়া একমনে— বিরহ ভুগিয়া আমি কেমন রোগা হইয়া গিয়াছি— তাই ভাবিয়া ভাবিয়া— সেই রকম আমার একখানি ছবি আঁকিতেছে। হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত আমার মূর্তি — কত রোগা হইয়াছে, একমনে ভাবিয়া — একমনে ধ্যান করিয়া — সে রোগা মূর্তিটি চোখের সামনে ধরিয়াছে — আর সেই মতো ছবি উঠাইতেছে। অথবা পিঁজরায় একটি সারি পাখি আছে — সে খাসা পড়ে — তাহার কাছে গিয়া — দুঃখের সময় অন্যের কাছে যাইতে ভালো লাগে না— মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে — সারি! তুই তো প্রেমরসের রসিক, তুই তো ভালোবাসা ভুলিবার পাত্র নহিস, সে তো তোকে এত ভালোবাসিত, তার কথা কি তোর মনে পড়ে? আহা, সেই নির্বান্ধব পুরী মধ্যে এ দুঃসময়ে যক্ষিণীর কথার দোসর কেহ নাই, তাই সে সারিকার সঙ্গে প্রাণপতির কথা কহিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে যাইতেছে। কালিদাস সমস্ত মেঘদূতে যক্ষ অথবা তাহার পত্নীর একটা সখাসখীর নামও করেন নাই— এত গভীর বিরহে সখাসখী ভালোই লাগে না — তাই বলেন নাই। এ সময়ে একা একা ধ্যানই ভালো, তাহাতে যেন একটা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি হয়, যেন দু-জায়গায় দুটি মন, দুটি হৃদয়, ফোকস্ করিয়া বসিয়া থাকে, আর খবরাখবর লইতে থাকে ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত করিতে থাকে। অথবা দেখিবে, সে একটি বীণা লইয়া আপনার কোলে রাখিয়াছে। বিরহিণী এক-বস্ত্রা — সে কাপড় — আটমাসে কালো হইয়া গিয়াছে — ময়লা

হইয়া গিয়াছে। সেই ময়লা কাপড়ের উপর বীণা রাখিয়া গলা ছাড়িয়া গান করিতে যাইতেছে। কিসের গান? কে সে গান বাঁধিয়া দিল? কীর্তনের সে পদ কোন্ মহাজন রচনা করিল? সে মহাজন আর কেহ নহে— সে নিজেই। সে গানে আর-কিছুই নাই — কেবল আমার নামে পূর্ণ। সে পদে কেবল বলে, "নাথ হায় হায়" আর "নাথ এসো এসো"। এই গানে এক পালা মস্ত কীর্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, গান যেমন ধরিল, সুর যেমন উঠিল, অমনি চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সে জল গড়াইয়া বীণার তারে লাগিল। তার খ্যাৎখেতে হইয়া গেল। কষ্টে সে জল মুছিয়া সে দোষ সারিয়া লইল। ফের গাইতে গেল কিন্তু সুর আর জমিল না; সে তার কাটিয়া গিয়াছে। সে মূর্চ্ছনা ভুলিয়া গিয়াছে। আবার চেষ্টা করিল — আবার তাই হইল। আবার তাই— আবার তাই— দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল — বীণা রাখিয়া দিল।

কিম্বা দেখিবে — সে কপাটের পাশ হইতে কতগুলা শুক্না ফুল টানিয়া লইয়াছে আর মাটিতে ফেলিয়া তাই গণিতেছে। এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ, কুড়ি, এক শো, দুশো, দুশো চল্লিশ। যেদিন প্রথম বিরহ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সে রোজ একটি করিয়া ফুল ঐ চৌকাটের পাশে ফেলিয়া রাখে —আর গণে, গণিয়া দেখে — বিরহের কত দিন হইল— আর কতদিন বা বাকি আছে। অথবা দেখিবে, সে মনে মনে ধ্যান করিতেছে — আমি তাহার কাছে গিয়া পঁহুছিয়াছি, আর সে এক মনে এক প্রাণে আমার সেবায় আত্মবিসর্জন করিতেছে, বলিতেছে, নিষ্ঠুর, আমায় ফেলিয়া এতদিন কোথায় ছিলে? বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমার কণ্ঠে লগ্ন হইতেছে। তুমি যে কী ভাবে তাহাকে দেখিবে তাহার ঠিক নাই, তবে যেমন বলিলাম ইহার কোনো-না-কোনো এক ভাবে দেখিবেই দেখিবে। কেন-না, প্রাণপতি কাছে না থাকিলে রমণীরা এই রকম কাজেই আপনাদের মন ঠাণ্ডা রাখে।

দেখ ভাই, দিনের বেলায় তবু তার কাজকর্ম আছে— কতকটা অন্যমনস্ক হইতে পারে; বিরহের যন্ত্রণা কতক — যৎসামান্য পরিমাণে ভুলিতে পারে। কিন্তু রাত্রে — আহা, তাহার যন্ত্রণার পার নাই — তাহার শোক-পারাবার উছলিয়া উঠে — মন কিছুতেই শান্ত হয় না। তাই বলি ভাই, তুমি সেই অট্টালিকার ঝরকায় বসিয়া — গভীর রাত্রে তাহাকে দেখিবে — তাহার সহিত দেখা করিবে — সে সাধ্বী — পতিপ্রাণা — সে মেঝেতে পড়িয়া আছে, আর ঠায় সারারাত্রি জাগিতেছে — একটিবারও চোখ পালটিতে পারিতেছে না। গভীর রাত্রে দেখা

করিতে বলিতেছি কেন জান? সে সময়টা নাকি বড়ো যন্ত্রণার সময়, সে সময়ে যদি তুমি তাহাকে আমার সংবাদ দাও — তাহার কতকটা সান্ত্বনা হইতে পারে, তাহার হৃদয়ের ভার কতক লাঘব হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম — জানালায় বসিয়া গভীর রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিও।

দেখিবে মনের কষ্টে সে রোগা, পাতলা, ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড কালো ময়লা আকাশে পুবের দিকে — যেখানে আকাশ পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে — সেইখানে এক কলা চাঁদ পড়িয়া থাকিলে কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন শেষ রাত্রে সে চাঁদ দেখিয়া সহৃদয় লোকের চোখে জল আসে, তেমনি সেই ময়লা বিছানার — বিরহে ভালো বিছানায় শুইতে নাই — বিছানা বদলাইতে নাই — একধারে পাশ ফিরিয়া ধনুর মতোন বাঁকিয়া পড়া সেই শীর্ণা রমণীকে দেখিয়া তুমি শোক সম্বরণ করিতে পারিবে না। হায়, সে তখন কী করিবে? দেখিবে, কেবল কাঁদিতেছে — চোখের জলে বালিস ভাসিয়া যাইতেছে — গরম জল পড়িয়া বালিস হইতে ভাব উঠিতেছে। রাত্রি আর পোহায় না — ক্রমেই যেন বাড়িয়া যাইতেছে। আর সে ভাবিতেছে, হায়! আমাদের একদিন ছিল, সারারাত্রেও কুলাইত না, কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া যাইত টেরও পাইতাম না। আর এখন কী বিপরীত হইয়াছে। এ জ্বালা কিসে জুড়াই।

চাঁদের আলো আমাদের পুরানো বন্ধু। কেমন ঠাণ্ডা ছিল, বোধ হইত দেহে যেন অমৃতধারা ঢালিয়া দিত। যাই — তাহার কাছে পড়ি গিয়া — সে হয়তো তেমনি করিয়া শরীর জুড়াইয়া দিতে পারিবে। এই ভাবিয়া — ঝরকা দিয়া যে চাঁদের আলো আসিতেছিল, তাহার উপর গিয়া পড়িল — তখনি ফিরিল — ফল উল্টা হইল। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, চোখের জলে চোখের পাতাগুলা পুরু হইয়া আসিল। বড়ো খেদে চক্ষু বুজিবার চেষ্টা করিল, সে চক্ষু বুজিলও না, খোলাও রহিল না, মাঝামাঝি — না-এদিক্ না-ওদিক্ হইয়া রহিল। সে চক্ষু স্থলপদ্মের মতো বিস্তৃত ও বিশাল। দিন হইয়াছে অথচ সূর্যদেব মেঘে ঢাকা। এ অবস্থায় স্থলপদ্ম যেমন ফুটিতেও পায় না, মুদিতেও পায় না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, আমার গৃহিণীর চক্ষুও চাঁদের আলোর কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই ভাব হইয়া রহিল।

গৃহিণী বিরহে তেল মাখিয়া স্নান করিতে পারেন না, রুক্ষ নাহিয়া তাঁহার ঝাপটার চুলগুলা শক্ত হইয়াছে — ফর্‌ফরে হইয়াছে— গালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গরম দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে — ঠোঁট দুটি আউসিয়া যাইতেছে —

সেই নিশ্বাসের বাতাসে ঝাপটার ফর্‌ফরে চুলগুলা চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর — স্বপ্নে আমার সঙ্গে দেখা হইতে পারে, এই ভরসায় নিদ্রার আরাধনা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কোথায় আসিবে? চক্ষু তো তাহার স্থান। জল আসিয়া চক্ষু ভরিয়া রহিয়াছে, বরং প্রবাহরূপে বহিয়া যাইতেছে। এ চক্ষে নিদ্রার জায়গা নাই। নিদ্রা আসিয়াও জায়গা পাইতেছে না।

বিরহের প্রথম দিন খোঁপা বাঁধা হইয়াছে। বিনা দড়িতে শুদ্ধ গিরা দিয়া আর বিননি করিয়া চুল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে— ভরসা, শাপের অন্তে — বছর পুরিয়া গেলে — আমি গিয়া সেই খোঁপা হাসিতে হাসিতে খুলিয়া দিব। কিন্তু এখন তাহার কী দশা হইয়াছে। তাহাতে জট পড়িয়াছে, শক্ত ঘুঁটের মতো হইয়াছে — খস্‌খসে — এবড়ো খেবড়ো হইয়াছে। চুল বাড়িয়া গিয়াছে — সেটা ঝুলিতেছে, ঘুরিয়া আসিয়া গালের উপর পড়িতেছে— তাহার স্পর্শ আর সেরূপ সুখকর নহে, এখন সেটা কাঁটার মতো ফুটিতেছে। সুতরাং গালের উপর হইতে সেটাকে সরাইতে হইতেছে। কী দিয়া সরাইবে? হাত দিয়া। সে হাতেও আবার বড়ো বড়ো নখ হইয়াছে। বিরহিনীকে কামাইতে নাই। রুক্ষ মাথা, চুলের গোড়াগুলা কুট্‌কুট্‌ করিতেছে, চুলের আগায় শক্ত খোঁপা নড়্‌ নড়্‌ করিতেছে, সেটি গালের উপর পড়িয়া ছুঁচের মতো বিঁধিতেছে — হাত দিয়া সরাইতে গেলে চুল নখে বাধিতেছে, তাহা গোড়া সুদ্ধ টান পড়িতেছে। কী যে একটা সর্বাঙ্গে চিড়বিড় চিড়বিড় করিয়া উঠিতেছে, তাহার আর বর্ণনা করা যায় না।

মেঘ, তোমার ভিতরটা জলে ভরা, বড়ো ভিজা। যাদেরই অন্তঃকরণ ভিজা তারাই বড়ো দয়ালু। তাই তুমিও বড়ো দয়ালু। তুমি যখন তাহাকে দেখিবে, তাহার একখানিও গহনা গায়ে নাই। সে ননীর পুতলি — এই শোকে, এই দুঃখে, সে আর তার দেহ-ভার বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কত দুঃখে কত কষ্টে সে শয্যার ক্রোড়ে দেহলতা ফেলিয়া রাখিয়াছে। হাতটি নাড়িতে যেন তার বড়ো কষ্ট। তাহাকে দেখিলে তোমার দয়ালু-হৃদয় গলিয়া যাইবে, আর তুমি চোখের জল ফেলিবে, নূতন জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়িতে থাকিবে।

আমি জানি, তোমার সখী আমার প্রতি বড়ো স্নেহবতী — প্রেমবতী — সেটি আমার দৃঢ় সংস্কার— সেই জন্যই প্রথমবারের বিরহে তাহার এইরূপ দুর্দশা হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। তুমি মনে করিও না, "গৃহিণী বড়ো ভালোবাসেন" বলিয়া আমার মনে মনে বড়ো গুমর আছে, তাই আমি তোমার সঙ্গে এত কথাবার্তা কহিতেছি, এত বকাবকি করিতেছি। তুমি মনে করিও না, আমি মনে মনে "মনকলা"

খাইয়া বসিয়া আছি, কাজে কিন্তু আর-একরূপ হইয়া গিয়াছে — অথবা আমি মিছে ফাজিলামি করিতেছি মাত্র। এ-সকল কথা তুমি মনে করিও না, কারণ আমি যাহা কিছু বলিয়াছি সমস্তই অল্পকাল পরেই তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন আপনার চক্ষে দেখিয়া আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে।

তুমি যখন তাহার নিকটে যাইবে, তাহার চোখের উপর-পাতা নাচিতে থাকিবে। চোখের উপর-পাতা নাচিলে মিলন হয়। তুমি মিলনের দূত — তাই তাহার চোখের উপর-পাতা নাচিবে। আহা, সে চোখের উপর-পাতা নাচিলে বড়োই সুন্দর দেখাইবে। সে চোখে কত কাল যে কাজল পড়ে নাই— তাহার ঠিক নাই। তাহার সে চক্‌চকে তেলাল ভাব আর নাই। চারিদিকে ঝাপটাগুলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ পাশের দিকে সেগুলার বড়ো প্রাদুর্ভাব। তাই আর আড়-নয়নে চাহনি নাই। স্ফূর্তি নাই বলিয়াও আড়-নয়নে চাহনি নাই। মধু পান কত দিন বন্ধ হইয়াছে। তাই মদ খাইলে ভ্রূর যে খেলা ছিল, যে বিচিত্র ভঙ্গি ছিল, যেরূপ সরস ভাবে নড়ন চড়ন ছিল — তাহার কিছুই নাই। সমস্ত চোখটা কেমন একটু স্থির — কেমন একটু গম্ভীর, কেমন একটু করুণ, কেমন একটু খস্‌খসে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আবার যখন উপর-পাতাটি নাচিতে থাকিবে, বোধ হইবে, যেন ভিতরে মাছ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর তাহার ঘেঁস লাগিয়া পুষ্করিণীর জলে, ভাসা পদ্মটি একটু একটু নড়িতেছে। শুধু যে চোখের উপর-পাতা নাচিবে এমন নহে, বাম উরুও নাচিবে। বাম উরু স্পন্দন হইলে প্রিয়সমাগম হয়। তুমি গেলে — আবার যে তিনি আসিবেন সে ভরসা হইবে, তাই উরু নাচিবে। কলার গাছ দেখিয়াছ? শুকনা বাসনা সব ফেলিয়া দিলে কাঁচা খোলায় ঘেরা কলার গাছ দেখিয়াছ কি? তবে তোমার, সে উরু কেমন— তাহার কতকটা ধারণা হইবে। সে উরুতে সুখের দিনে কতই নখের দাগ পড়িত — এখন আর একটিও নাই। মুক্তা জালে সে উরু বেড়িয়া থাকিত; এখন আর তাহা নাই। বিধি বাম, সব গহনার সঙ্গে সে মুক্তা জালও চলিয়া গিয়াছে। আহা, পরিশ্রমের পর সে উরু আমি কত দিন স্বহস্তে টিপিয়া দিয়াছি। এখন সেসব কথা মনে হইলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। তুমি গেলে আবার সে উরুতে স্পন্দন হইবে।

হে মেঘ, সে সময়ে সে যদি একটু ঘুমাইয়া থাকে, — সে যদি একটু সুখে নিদ্রা যায়, — প্রহরখানেক অপেক্ষা করিও, উহার পাশেই বসিয়া অপেক্ষা করিও। গড় গড় হড় হড় করিয়া ডাকিও না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও। ঘুমাইলেই সে স্বপ্ন দেখিবে। স্বপ্ন দেখিলেই আমায় দেখিবে। আমায় দেখিলেই গাঢ়

আলিঙ্গন করিবে। উহার ভুজলতা আমার কণ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ হইবে। এই ভাবে প্রহরখানেক থাকিতে দিও। তার পরে জাগাইও। যদি আগে জাগাও সব বৃথা হইয়া যাইবে।

তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া — ধাক্কাধুক্কি দিয়া উঠাইও না। আস্তে আস্তে বাতাস চালাইয়া দিও। তোমার জলকণায় সে বাতাস শীতল করিও। ঠাণ্ডা বাতাস — জলভরা বাতাস লাগলে যেমন মালতী ফুলের কুঁড়িগুলি আস্তে আস্তে খুলিতে থাকে, আমার গৃহিণীর চক্ষুও তেমনি খুলিবে। দেহে যেন প্রাণ আসিবে। সেই সময়ে তোমার বিদ্যুৎ যেন ঝল্‌সায় না। তুমি আস্তে আস্তে গর্জন করিয়া বলিতে থাকিবে। আর তুমি যে ঝরকায় বসিয়া থাকিবে, সে এক দৃষ্টে সেই ঝরকার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। তুমি অতি ধীর, বিচক্ষণ, তোমায় বলিয়া দিতে হইবে না। সে অতি অভিমানিনী —কোনো অনুচিত কথা যেন তাহাকে বলিও না।

কী বলিতে থাকিবে? প্রথমেই "অবিধবে" বলিয়া সম্বোধন করিবে। এইয়োস্ত্রী বলিলে সে বুঝিবে — তাহার কপাল এখনো ভাঙে নাই। তাহার পর বলিবে — "আমি তোমার স্বামীর প্রিয় মিত্র — আমি মেঘ — অর্থাৎ আমি নিজেও ঠাণ্ডালোক, তোমায় ঠাণ্ডা করিবার জন্য তোমার স্বামী আমায় তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।" তাহার পর বলিবে — "আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার স্বামীর মঙ্গল-সংবাদ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে; তাই লইয়াই আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি তোমার মতো বিরহিণীদের বড়ো বন্ধু। বিদেশস্থ নাগরকুল যখন বাড়ি আসিবার পথে ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন আমি গুড় গুড় স্বরে ডাকিতে থাকি, আর সে বেচারারা বিরহিণী গৃহিণীকুলের খোঁপা খুলিবার জন্য অর্থাৎ বিরহব্যথা দূর করিবার জন্য বড়োই আকুল হইয়া উঠে; আর তাহাদের পথে বিশ্রাম করা হয় না। তাহারা তাড়াতাড়ি তলপি তুলিয়া উধাও হইয়া বাড়ি মুখে ছুটে।

তোমায় আর বেশি বলিতে হইবে না। এই কয়টা কথা বলিলেই সে মুখ উঁচা করিয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। এক কালে গাছের উপর মর্কট বানরের মুখে রামের সংবাদ পাইয়া সীতা যেমন মুখ উঁচা করিয়াছিলেন, সেও সেইরূপ মুখ উঁচা করিবে। উৎকণ্ঠায় তাহার হৃদয় এত পূর্ণ হইবে যে — যেন সে হৃদয় ভাঙিয়া যায়। সে তোমায় দেখিবে — তোমার অভ্যর্থনা করিবে — আর তারপর তুমি যা-কিছু বলিবে — সমস্ত কান পাতিয়া শুনিবে। কেন-না — স্বামীর কোনো প্রিয় সুহৃদের কাছে যদি তাহার কুশল-সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে বড়োই আশ্বাস

হয়। স্বামী কাছে আসাও যা আর এরূপ সংবাদ পাওয়াও প্রায় তাহাই। — বাস্তবিকও অনেক দিনের উৎকণ্ঠার পর এমন একটা খবর পাইলে হৃদয়ের অনেক লাঘব হয়।

হে মেঘ, আমার কথামতো এবং তোমার আত্মীয় আত্মীয়ার উপকারার্থ তাহাকে এই কথা বলিবে। "তোমার সহচর এখন রামগিরির আশ্রমে রহিয়াছেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। তিনি নিজে বিরহে দারুণ কষ্ট পাইতেছেন। তাই হে অবলে — অর্থাৎ এত যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে কি না এই ভয়ে তোমার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। জীবন হইলে মরণের মতো সুলভ আর কিছুই নাই; সকলকেই মরিতে হইবে; কখন কে মরে ঠিকানা নাই। তাই সকলের আগে জিজ্ঞাসা করিতে হয় 'ভালো আছ তো?'

"আহা, সে কত দূরে পড়িয়া আছে। কত দূরে — ধারণাই হয় না। আসিবে যে— তাহারও জো নাই। বিধি বাম। আসার পথ একেবারে বন্ধ। সে দিন-রাত মনে মনে কতই আশা করিতেছে — কতই সংকল্প গড়িতেছে — ভাঙিতেছে — সে মনে মনে আপনার দেহ তোমার দেহে মিশাইয়া দিতেছে; তাহার নিজ দেহ ক্ষীণ, সে মনে মনে তোমার দেহও ক্ষীণ হইয়াছে স্থির করিয়া মানস-চক্ষের সামনে তোমার তেমনি একটি ক্ষীণ দেহ রাখিয়া তাহাতে মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার নিজের দেহ গাঢ় তপ্ত, সে মানসপটে তোমার একটি গাঢ় তপ্ত দেহ আঁকিয়া তাহাতে আপনার অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছে। তাহার চক্ষের জলই দিন রাত্রের সম্বল, সে মনে মনে তোমারও সেইরূপ একখানি ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছে। তাহার নিজের উৎকণ্ঠার পার নাই, সে ভাবিতেছে — তোমারও উৎকণ্ঠার বিরাম নাই — তাই মনে মনে তোমার উৎকণ্ঠায় আপনার উৎকণ্ঠা মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিতেছে। তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস ক্রমাগত পড়িতেছে। সে ভাবিতেছে, — হৃদয়ের আবেগে তোমারও বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাই সে মনে মনে তোমার বুকের উপর আপনি পড়িয়া তাহাতে লয় হইয়া যাইতেছে।

"যেকথা অনায়াসে চেঁচাইয়া বলা যায়, সে কথাও সখীদের সামনে তোমার কানে কানে বলিবার জন্য সে চঞ্চল হইত। কারণ তাহা হইলে কপোলে কপোল স্পর্শ হইবে। এই স্পর্শের লোভে লোক দেখিলেই তোমার সঙ্গে কানে কানে কথা কহিতে যাইত। যতই কাছে আসিতে পারে ততই আনন্দ, এতটুকু তফাতও তাহার সহিত না।

"কী বিধির বিড়ম্বনা, এখন সে, যতদূর পর্যন্ত কানে শোনা যায়— তাহার বাহিরে — যতদূর চোখে দেখা যায় — তাহারো বাহিরে — কতদূরে গিয়াছে — তাহার ঠিকানাই নাই। বড়ো উৎকণ্ঠা হইয়াছে তাই পদরচনা করিয়া এইসব কথা বলিয়া অতদূর পাঠাইয়াছে। কানে কানে প্রাণে প্রাণে বলিয়াও তৃপ্তি হইত না, আরো ভিতরে যাইতে — দুটিতে এক হইতে ইচ্ছা হইত, এখন তাহারই একটি দূর হইতে — আমি একজন অপরিচিত, আমার মুখে তোমায় খবর দিতেছে — এই সকল কথা বলিয়া দিয়াছে, মন দিয়া শোনো।

"যখনি দেখি প্রিয়ঙ্গুলতা দুলিতেছে, পাঁচ-ছ হাত উঁচা, না-বৃক্ষ, না-লতা, না-গুল্ম, এমন একটি তরু, ডালগুলি লতাইয়া ঘুরিয়া নীলবর্ণ পাতায় ডুবিয়া বায়ুভরে নড়িতেছে, হঠাৎ মনে হয় প্রিয়ার হাত পা দেখিতেছি। চঞ্চলসুন্দরীর অঙ্গলতা হাবভাব বিকাশ করিতেছে। যখনই দেখি, হরিণ তাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ছুটিতেছে — আর তার ঢলঢলে চোখ আরো ঢলঢলে হইতেছে, হঠাৎ মনে হয়— প্রিয়ার সেই চঞ্চল চক্ষু দেখিতেছি। চাঁদের দিকে হঠাৎ চক্ষু গেলে মনে হয় — সে আমার সেই মুখখানির ছায়ামাত্র — যখন দেখি, ময়ূরের পেখম গুটানো রহিয়াছে — আর ভারে ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় সে মাথায় চুলের রাশি দেখিতেছি, গিরি নদী বহিয়া যাইতেছে, ছোটো ছোটো ঢেউগুলি নানা ভঙ্গিতে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে, মনে হয় — সে মুখের ভুরু দুটি বার বার নানা ভঙ্গিতে নাচিতেছে। কিন্তু কোথাও সে মুখের—সে শরীরের—সে কমনীয় দেহের একটা আদরা মাত্রও দেখিতে পাই না। মনে হয় — তিনি রাগ করিয়া আছেন, আমায় দেখা দিবেন না, সে প্রেমময় ছবির একটা আবছায়াও আমায় দেখিতে দিবেন না।

"নাই-বা দিলেন, আমারো হাত আছে, আমিও তো দেবযোনি, চিত্রবিদ্যা আমার সিদ্ধবিদ্যা, কুবের সেটা তো কাড়িয়া লইতে পারেন নাই, আমি যাতে তাতে তাহার একটা ছবি আঁকিব। একটা গেরিমাটির ডেলা কুড়াইয়া লইলাম, একখানা বড়ো পাথরে তোমার একটা ছবি আঁকিলাম, মানময়ী ছবি আঁকিলাম, যেন তুমি রোষভরে চলিয়া যাইতেছ— সেই ভাবে ছবি আঁকিলাম; আর তোমার মান ভাঙিবার জন্য "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া তোমার পায়ে ধরিবার জন্য পড়িলাম, অমনি চোখে জল আসিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল, আর-কিছু দেখিতে পাইলাম না; সুখের আশা করিতেছিলাম — ভাঙিয়া গেল। বিধি বাম — এ ভাবেও যে ক্ষণিক মিলন হইবে, তাহার সেটাও সহ্য হইল না, নিষ্ঠুর খল বিধাতা আমায় পাগল করিয়া তুলিল।

" 'ছবিও' দেখিতে পাইলাম না। আবছায়াও দেখিতে পাইলাম না। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল, স্বপ্ন দেখিলাম, স্বপ্নে তোমায় পাইলাম, গলা জড়াইয়া ধরিলাম, গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। বাহু দুটি উঁচা করিয়া হাত দুটি বাধাইয়া তোমায় বাঁধিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছি, আমি তো স্বপ্নে বেশ আছি, কিন্তু বনদেবতারা— ক্ষেত্রপালেরা — শূন্যে আমার গাঢ় আলিঙ্গন দেখিয়া চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। টপ্ টপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। সে তো শিশির নয় — তাঁহাদের চক্ষের জল। সে জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে।

"এমনি ফাঁকায় ফাঁকায় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইতেছে। উত্তর দিক হইতে — বরফের পাহাড় হইতে — যখন বাতাস দক্ষিণমুখে আসিতে থাকে — দেবদারুর রেখাকার পাতাগুলি প্রথম অঙ্কুরের সময় জড়ানো ছিল, সেই বাতাসে তাহা একটি একটি করিয়া ছুটিতে থাকে। দেবদারুর আটা পড়ে, তাহার গন্ধ মাখিয়া সে বায়ু মাতোয়ারা হয়, আর মাতালের মতো বহিতে থাকে, আমি দৌড়িয়া গিয়া সেই বায়ু বুকে লাগাই। ভরসা — সে হয় তো তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। লোকে আপনার জনের কত কী তুলিয়া রাখে, বড়ো দুঃখের সময় এক একবার সেগুলি দেখে — আর সেই কথা মনে করে। কাপড় রাখে, বিছানা রাখে, জুতা রাখে, জামা রাখে, আংটি রাখে, চুল রাখে, কত কী রাখে। আমার প্রবাসে আপনার জনের কিছুই সঙ্গে নাই, তাই ভাবি— যদি গায়ের বাতাসটাও পাই — তাই ছুটাছুটি করিয়া বাতাস ধরিতে যাই, সে বাতাস বড়ো কন্‌কনে তবুও তাই ধরিতে যাই।

"তোমার বিরহে আমার বড়োই যন্ত্রণা হইয়াছে, সর্বশরীরে জ্বালা করিতেছে। আমার কেবল প্রার্থনা — রাত্রি কিসে ছোটো হয়, কিসে এক ক্ষণের মতো সারা রাতটা কাটিয়া যায়। কিন্তু তা তো হয় না, জ্বালায় ঘুম হয় না। তিন প্রহর বৈ রাত্রি নয়, কিন্তু এক এক প্রহর যেন এক এক যুগ হইয়া পড়িয়াছে। আমার কেবল প্রার্থনা — দিনের তাত্ একটু কম হয়, রৌদ্রটা একটু নরম হয়, গ্রীষ্ম বর্ষা, বসন্ত সবকালেই একটু একটু নরম হয়। কিন্তু একে দেহের জ্বালা, তাহাতে ভীষণ রৌদ্রের প্রখর তাপ, দিনের বেলায় আগুন ছুটিতে থাকে, আমার প্রার্থনা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। ক্রমে অসহায় — হতাশ — উদাস হইয়া পড়ি, কাহার আশ্রয় লইব, কোথায় যাইব, কী করিব কিছুই বুঝিতে পারি না — বুক দমিয়া যায়, মন ভাঙিয়া যায়, হাত পা আসে না। আবার মনে হয়, ম্লানময়ি মানিনী আমার, চঞ্চল চক্ষু

মিট্ মিট্ করিয়া আড়ে আড়ে আমার দুর্দশা দেখিতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন।

"আমি তো অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিয়া কোনোরূপে এতদিন বাঁচিয়া আছি— কোনোরূপে ধৈর্য ধারণ করিয়া আছি — মঙ্গলময়ি, তোমার মঙ্গলেই যখন আমার মঙ্গল, তুমি ভালোবাস বলিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তুমিও অত কাতর হইও না, বিরহসাগরে আপনাকে ভাসাইও না। পৃথিবীতে কাহার সুখ চিরদিন থাকে? কাহার সুখের স্রোত এক টানা বহিয়া যায়? কাহারই বা দুঃখ চিরস্থায়ী হয়? কাহারই বা সকল রাত্রে অমাবস্যা ঘোর করিয়া থাকে? মানুষের দশা চাকার মতো ঘুরে, চাকার যেখানটা এখন সকলের নিচে, এখনি আবার সেইখানটা সকলের উপরে উঠিবে, সেই রকম সুখ আর দুঃখ যেন একটা চাকার উল্টা দিকে বাঁধা আছে, কখনো সুখ উপরে উঠে দুঃখ নিচে যায়, কখনো-বা দুঃখ উপরে উঠে সুখ নিচে যায়।

"দেখ, নারায়ণ শয়ন হইতে উঠিলেই আমার শাপের শেষ হইবে। আর চারটি মাস আছে — চোখ বুজিয়া এই চারিটা মাস কাটাইয়া দাও। তার পর— শয়ন উঠিলে, উত্থান একাদশী শুক্লপক্ষ — শরতের শুক্লপক্ষ — কী চাঁদের আলো — মেঘের লেশমাত্র নাই — জ্যোৎস্নায় দিক ভরিয়া যাইবে, যেন পুরু জ্যোৎস্না চারি দিকে ছাইয়া ফেলিবে। সেই শরতের রাত্রে সেই গাঢ় জ্যোৎস্নায় — এক বৎসরের যত ক্ষোভ মিটাইয়া লইব। মনে মনে যত সংকল্প করিয়া রাখিয়াছি — সব সিদ্ধ করিয়া লইব। যত আশা করিয়া রাখিয়াছি — সব পুরাইব। রাশি রাশি আশা করিয়া রাখিয়াছি — সব মিটাইয়া লইব।"

মেঘ বলিতে পারে, "আচ্ছা আমি যে তোমার তরফ হতে তার কাছে যাব তার একটা নিদর্শন দাও, যে সে চিনিবে, নহিলে সে যদি আমায় আমলই না দেয়।" তাই যক্ষ বলিতেছে — "পাগলের এমন নাড়ীজ্ঞান — যে যাবার সময় একটা নিদর্শন দেওয়া দরকার।" নিদর্শন লইয়া কবি কিছু গোলে পড়িলেন। হনুমান রামের আঙটি লইয়া গিয়াছিলেন। মেঘ কী লইয়া যাইবে? যক্ষের আছেই বা কী? যক্ষ নাহয় একখানা পাথরের উপর দুচারটা অক্ষর লিখিয়া দিতে পারিত, মেঘ তো আর পাথরখানা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না! তাই কৌশলী কবি একটা নূতন পথ বাহির করিলেন। যক্ষ জানে আর তাহার স্ত্রী জানে এমন রাত্রের ঘটনা নিদর্শনের স্বরূপ তাহাকে বলিয়া দিলেন। বলিলেন — "শুন মেঘ, তাহাকে

এই গল্পটি করিও, তাহা হইলে সে তোমায় আমার দূত বলিয়া চিনিবে। বলিবে, "একদিন বিছানায় তুমি আমার গলাটি জড়াইয়া বেড়াবেড়ি করিয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলে, হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিলে। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মনে মনে হাসিয়া উত্তর দিলে 'ঠক্ জুয়াচোর! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি আর-এক জনের সঙ্গে বিহার করিতেছ।' মেঘ যখন এত খবর বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে এ নিদর্শনটা ঠিক বহিয়া লইয়া যাইবে। আর এ নিদর্শন পাইলে তাহারো নির্ঘাত বিশ্বাস হইবে।"

মেঘ যেন যক্ষপত্নীকে সম্বোধন করিয়া — যক্ষের কথা কোট করিয়া বলিতেছে, "আমি যে তোমায় নিদর্শন দিলাম তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে আমি ভালো আছি। হে অসিতনয়নে — কৃষ্ণ আঁখি, আমি জানি তোমার চক্ষু কালো বলিয়া তোমার মন কালো নয়। লোকে আমার নামে নানা কলঙ্ক রটনা করিবে, বলিবে — পয়সাওয়ালা লোক — বিদেশে পড়ে আছে — বছর ঘুরে আসে — সেকি অমনি আছে? এ কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তুমি আমায় অবিশ্বাস করিও না। বাজে লোকে বলে 'অদর্শনে বিষময় ফল ফলে,' 'প্রেমবন্ধন দৃঢ় করিতে চাও—সুতা খাটো করো'— ভাবে বিচ্ছেদ হইল শুধু দিন কত চোখের আড় হইলে — বিনা কারণে বা কোনো অব্যক্তকারণে হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হয়, ভালোবাসা উপিয়া যায়, আর স্নেহ শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস —গাঢ়প্রণয়স্থলে, বিরহে কেবল ভোগ বন্ধ হয় মাত্র, প্রেম জমা থাকে; জমিয়া জমিয়া জমিয়া ভাণ্ডার ভরিয়া যায়। সে প্রেম কিন্তু আর কাহারো জন্য নহে — সেই তাহারই জন্য — সেই চিরবাঞ্ছিতেরই জন্য। ভোগ না হওয়ায় প্রেম তো জমা থাকেই — আরো একটি উপকার হয়, রস পাক হইয়া জমাট হয়, স্বাদ বৃদ্ধি হয়। যাহারা উল্টা বোঝে বা উল্টা বলে, তাহারা প্রাকৃত-জন, তাদের কথায় কান দিও না।

"গৃহিণীর আমার এই প্রথম বিরহ — তাই তাঁর যন্ত্রণা বড়ো বেশি। তাই আগে গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দাও, তাহার পর সে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিও, সেখানে ষাঁড়ের প্রাদুর্ভাব বেশি, মহাদেবের একটা ষাঁড় তার শিখরগুলা উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। ষাঁড়ের দেশ না হলে — এমন প্রেমিক যুগলের বিচ্ছেদও ঘটায়? সেখানে বেশিক্ষণ থেকো না, চট ফিরে এসো। সে আমায় কী বলে — সেটা আমায় বলে যেও। তারও একটা নিদর্শন দিয়া যেও, তার মঙ্গল-সংবাদ দিয়া যেও, সকাল বেলা কুঁদ ফুলগুলি যেমন বোঁটা আল্‌গা হইয়া পড়পড় হইয়া থাকে,

আমার জীবনও প্রায় তেমনিই হইয়া আছে। একটা মঙ্গল-সংবাদ পেলে বোঁটার আবার জোর হয়।

"ওহে তেলকুচ্‌কুচে কালো মেঘ, বন্ধুর মতো আমার ছোটো উপকারটি করিবে বলিয়া স্বীকার করিলে কি? তুমি ধীর, তাই কথা কহিতেছ না, জবাব দিতেছ না, তাহাতে আমি অবশ্য মনে করিব না যে তুমি আমার কথা কানে তুলিলে না — কারণ চাতকেরা যখন জল চায়, তুমি কিছুমাত্র শব্দ কর না, অথচ তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, তাহাদের জল দাও। কেহ কিছু চাহিতে আসিলে ভদ্রলোকে তাহার সে কাজটি করিয়া দেয়— তাহার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেয় — সেই তাহার উত্তর। উত্তর দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি কিছুই নাই।

আমি তোমার কাছে বড়ো অন্যায় প্রার্থনাই করিলাম, জানা নাই, শুনা নাই, এরূপ প্রার্থনাটা উচিত হয় নাই, তবে যাই হোক ভাই, ভালোবাসার খাতিরেই হোক — অথবা 'আহা বেচারা বড়ো কষ্ট পাইতেছে' এই বলিয়া দয়া করিয়াই হোক, আমার এই উপকারটা করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা যায়, ভাই, সেই দেশে যাও। বর্ষায় তোমার শোভা বৃদ্ধি হোক। আশীর্বাদ করি — তোমার যেন বিদ্যুতের সঙ্গে এক ক্ষণের জন্যও — এ রকম — আমার মতন — বিচ্ছেদ না ঘটে।"

সম্পূর্ণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

আধুনিক বাঙালি মন সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় দুই ভাবে।

বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতির প্রভাবে ইংরেজির মাধ্যমে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রতিপত্তি বাড়ছিল কিন্তু প্রাচ্যকে জানার গরজে য়ুরোপীয় মনীষা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের জগৎটিকে বুঝতেও চাইছিলেন। ফলে জায়মান প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার এ আগ্রহের বিস্তার লক্ষ করা যায়। এই আগ্রহ দেশীয় মনীষীদের মধ্যেও ক্রমে তীব্র হয়। বাংলায় যে 'বুদ্ধিবিপ্লব' বা নবজাগরণ ঘটল, প্রাচীনের পুনরাবিষ্কার তার একটি মূল প্রবণতা হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের জিজ্ঞাসু পণ্ডিতজন প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-বিদ্যাচর্চার নতুন পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথডলজি গড়ে তোলেন। ভারতীয় আধুনিক পণ্ডিতরা অনেকে সেই পদ্ধতি-বিজ্ঞান আয়ত্ত এবং প্রয়োগ করে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণায় মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। বাঙালি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌দের মধ্যে এই ধারায় আর-একটি অগ্রগণ্য নাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সংস্কৃত-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার পরিচয় উদ্ধার করে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ-এ বিন্যস্ত করে গিয়েছেন। পুথি নিবদ্ধ বিরাট জ্ঞানের আকর তাঁরই শ্রমে এবং মেধায় আবিশ্ব প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌দের গোচরে এসেছে। এই হরপ্রসাদ, অতএব নিজের পরিচয়ে বলতেই পারেন, "I am a Sanskritist by heredity, training and profession, and I feel an instinctive love for everything connected with Sanskrit, including Indology." (*Sanskrit Culture in Modern India*, Presidential address Fifth Indian Oriental Conference, Lahore, 1928, pp 1 & 2)।

সংস্কৃতবিদ্যায় আধুনিক বাঙালির আকর্ষণের আর-এক দিক আছে। সংস্কৃতসাহিত্যের শিল্পরূপ এবং রসরূপ সম্পর্কে নতুন আকর্ষণ এবং আবিষ্টতা। তার মধ্যে মূল আকর্ষণ কালিদাস সম্পর্কে। নবীন দৃষ্টিতে কালিদাসের জগৎটি আবিষ্কার— সেও কিছুটা য়ুরোপীয় রসজ্ঞদের প্রেরণায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ১৮১৩ খৃস্টাব্দে হোরেস হেম্যান্ উইলসন 'মেঘদূত' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বিস্তারিত টীকা-টিপ্পনী সমন্বিত তাঁর ইংরেজি পদ্যে অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি য়ুরোপে পৌঁছয়। *THE / MEGHA DUTA / OR / CLOUD MESSENGER / A POEM / IN THE SANSCRIT LANGUAGE / BY / CALIDASA* গ্রন্থের ভূমিকায় উইলসন লেখেন, "To whatever name or period the *Cloud Messenger* may be assigned, it is the production of a poet· The circumstances of eastern society and climate, tend in a great measure to exclude sublimity, either moral or physical from their literary compositions, but the same circumstances are favourable to the less awful graces of poetry, to the elegantly minute observation of nature, and the tender expression of natural sensibility · The frowning rock, or foaming contact, the furious tyrant, or undaunted patriot are not to be traced in Sanscrit verse, but we shall frequently meet with the impressioned lover, or affectioned husband, with the unobtrusive blossoms of the flower, and the evanescent tints of the sky : in point of language Sanscrit writers are certainly unsurpassed and perhaps unequalled, and their style in general is as full as it is sweet, as majestic as it is harmonious; the exceeding copiousness of the language sometimes leads them into those tricks of composition, which formerly exercised the misdirected ingenuity of Europe, puns and quibbles and endless alliteration constitute the stanza; their attention also to minute objects sometimes terminates in quaintness, and affection, *but from the faults of either style, or fancy, the subject of our present enquairy is entirely*

exempt : there are also copiousness and consistency in it, which are not often parallaled in original writings: a quick succession of thought and description, which the title of the work does not lead us to expect, and a successful avoiding of inconsistency or absurdity, which so protracted an apostrophe as forms the theme of the poem might have induced as to apprehend; the style of the work is also exceedingly simple, while at the same time, it is exquisitely polished;..."।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উইলসনের বিচার গ্রাহ্য মনে হবে না, কিন্তু 'মেঘদূত' কাব্যটির শিল্পগত উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি মল্লিনাথ প্রভৃতি 'মেঘদূত'-এর টীকাকারদের দৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র, আধুনিক কাব্যরুচির অভিমুখ। আলংকারিক রস বিচারের দিকে না গিয়ে উইলসন তাঁর বিস্তারিত টিপ্পনীতে 'মেঘদূত'-এর পাঠ ধরে ধরে ভূগোল, আবহাওয়া, গাছপালা-পশুপাখি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ তথ্য সংকলন করেছিলেন — যার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই শাসিত দেশটিকে ভালো করে জানা-বোঝার দায়বোধ। য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতদের এই ঝোঁক আজ প্রতিপন্ন। তবুও উল্লেখ করা সঙ্গত, উইলসনের লেখায় 'মেঘদূত' কাব্যের নিছক কবিত্বগত উৎকর্ষ, রচনাশৈলীর শিল্পশ্রী সম্পর্কে দু-একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবলোকন এসেছে— যা সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে ভিন্ন স্বাদের সঞ্চার করে থাকতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে বাংলায় 'মেঘদূত' কাব্যের অনুবাদ হয়ে এসেছে। প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ১৮৫১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ-এর গদ্য অনুবাদের। এই অনুবাদ সম্পাদনা করেছিলেন আনন্দচন্দ্র শিরোমণি এবং টীকা তৈরি করেছিলেন কবিচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রথম সুখপাঠ্য, স্বচ্ছন্দ ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। এই অনুবাদ সম্পর্কে কবি মধুসূদন দত্তের মন্তব্য দ্বিজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, "একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালায় ভাল কবিতা বচিত হতে পারে না, 'মেঘদূত'

~ ~

পড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল।" (বিপিন বিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', কলকাতা ১৩৭৩, পৃ. ২৯৬)। দ্বিজেন্দ্রনাথ হুবহু মূল শ্লোক অনুসরণ করেন নি, কিন্তু কালিদাসের রচনার সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য বাংলা ভাষার মেজাজে রূপান্তর করেছিলেন। এর পরে 'মেঘদূত' বাংলায় অনুবাদের অব্যাহত ধারা দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে শেষ স্মরণীয় মূল্যবান্ কাজ বুদ্ধদেব বসুর 'কালিদাসের মেঘদূত' (১৯৫৭)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১২ খানি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, 'বঙ্গদর্শন'-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যার দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। (অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৯ ব., এই গ্রন্থে সংকলিত।) ২০ বছর পরে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় হরপ্রসাদের বিতর্ক জাগানো বই 'মেঘদূত ব্যাখ্যা'।

এই বই 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ নয়, সংস্কৃত ঐতিহ্যের টীকাও নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "মেঘদূত ব্যাখ্যায় তিনি নূতনভাবে সংস্কৃত সাহিত্যরস গ্রহণের রীতি বাঙ্গালার মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছেন; এবং এই হিসাবে তাঁহাকে টীকা রচনার নূতন পদ্ধতির স্রষ্টা বলিতে পারা যায়।" (হ-র-১, পৃ. ট)। 'হরপ্রসাদ রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' সংকলিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, "এই পুস্তকে শাস্ত্রী মহাশয় 'মেঘদূত' কাব্যের একটি অতি-মনোজ্ঞ বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাব্যখানিকে সমগ্র-ভাবে বুঝিবার পক্ষে, শাস্ত্রিমহাশয়-কৃত এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে একখানি মূল্যবান্ সহায়ক গ্রন্থ। ইহা একাধারে কাব্যের অর্থ-ব্যাখ্যা ও রস-বিচার। 'রসানাম্ আদি শ্রেষ্ঠঃ'— 'মেঘদূত' কাব্যের মধ্যে (যেমন অন্যান্য প্রাচীন কাব্যের মধ্যে) যে অপরিহার্য্য আদিরসের অবতারণা দেখা যায়, তাহারও সাহিত্যিক ব্যাখ্যা ও বিচার ইহা হইতে বাদ পড়ে নাই। এই কারণে, প্রথম যখন শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে সরকার-পক্ষের রুচিবাগীশ সমালোচকের স্থূল হস্তাবলেপ ঘটিয়াছিল, এবং ইহাকে অশ্লীল পর্য্যায়ে ফেলিয়া ইহার প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় স্বভাবতঃই ইহাতে একটু দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী'-র মধ্যে যে 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কতকাংশে খণ্ডিত। প্রস্তুত সংস্করণে পুস্তকখানি পূরাপূরি পুনর্মুদ্রিত হইল। শাস্ত্রিমহাশয়-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাতে অনেক মনের

খোরাক পাওয়া যায়। এবং সাধারণ্যে অজ্ঞাত সংস্কৃতসাহিত্য-বিষয়ক অনেক তথ্যও জানিতে পারা যায়।" (হ-র-২, পৃ. ৫০২)

'মেঘদূত' কাব্যের এই ব্যাখ্যা বা সমালোচনায় হরপ্রসাদ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তার কোনো নজির বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। এই পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব উদ্‌ভাবন। এ ভাবে একটি রচনার মূল বয়ান বা টেক্‌স্ট্-এর উপরতল ভেঙে ভেতরের পরতগুলি মেলে মেলে ধরার একটিই উদ্দেশ্য, "সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা"। কিন্তু 'সৌন্দর্য' হরপ্রসাদের উপলব্ধিতে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ধারণা মাত্র নয়। কাব্য-শরীরে সৌন্দর্যের যে উদ্ভাস তার পরিপ্রেক্ষিত আছে, প্রতিষ্ঠাভূমি আছে। কালিদাসের সৌন্দর্যের ভুবনে প্রবেশের জন্য তিনি তাই প্রত্নবিদ্যা সমেত যাবতীয় জ্ঞান এবং মেঘের যাত্রা পথের নিশানা ধরে পায়ে হেঁটে অঞ্চলগুলির দৃশ্যরূপ, জনপদের পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। একটি কাব্যের সঙ্গে নিজেকে পরিপূর্ণ সম্পৃক্ত করে নেবার জন্য এমন শারীরিক শ্রমের নজির আর জানা নেই। এই ব্যাখ্যা তাঁর তিরিশ বৎসর ব্যাপ্ত অধ্যবসায়ের ফল।

'মেঘদূত ব্যাখ্যা'-য় হরপ্রসাদ কালিদাসের রসরুচির বশ্যতা মেনেছিলেন। ফল দাঁড়ায় চরম তিক্ততায়। সমকালীন সাহিত্য জগতের বহু বিখ্যাত মানুষ রচনাটিকে অশ্লীল বলেন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। সরকার তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়ায় জীবিকা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা শুরু হয় এবং তিনি পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ বিষয়ে গণপতি সরকার লিখেছেন, "এই বই লইয়া তাঁহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা রাজসরকারে প্রচার করেন যে, সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপল্ অশ্লীল পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে সরকার বাহাদুর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের মত গ্রহণ করেন। তাঁহারা ইহা 'অশ্লীলতার অমার্জনীয় দোষে দুষ্ট' বলিয়া মত দিয়াছিলেন। তাহাতে হরপ্রসাদের কৈফিয়ৎ তলব হয়। অবশ্য তিনি যে কৈফিয়ৎ দেন তাহাতে সকল গোলযোগ কাটিয়া যায়।..... তখন হরপ্রসাদ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিন্তু পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যেরা ঐ পুস্তকের

শ্লীলতা ও অশ্লীলতা লইয়া তাঁহার বিপক্ষে যাওয়ায়, তিনি পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি কোন সভায় টাকীর মুন্সী জমীদার রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে পরিষদে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 'আমি খেউড় গাই আমি কি আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসার জুগ্যি'। যাহা হউক শেষে পরিষদের একনিষ্ঠ কল্যাণকামী সেবক স্বর্গত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর একান্ত অনুরোধে, তাঁহাকে পরিষদে ফিরিয়া আসিতে হয়।" (হরপ্রসাদ জীবনী, ১৩৪৩ ব., পৃ. ৩০-৩১)।

বিরক্ত হয়ে শাস্ত্রীমশায় বাংলায় লেখা ছেড়ে দেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দ থেকে দশ বছরেরও বেশি সময়ে তাঁর একটি মাত্র অসমাপ্ত লেখা পাওয়া যাচ্ছে রঙ্গমঞ্চ পত্রিকায়, "হিন্দুনাটকের উৎপত্তি"। অথচ ইংরেজিতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এই সময়ে। বাংলা লেখায় আবার তাঁকে প্রবৃত্ত করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৩২১ থেকে চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদ নিয়মিত লিখতেন— যার একটি বড়ো অংশ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষত কালিদাসের রচনার ব্যাখ্যা।

নরেন্দ্রনাথ লাহা 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "The exposition of Kálidása's 'Meghadut' made by Sastriji is noteworthy. He had been equipping for years through visits to the places mentioned in the poem for getting an insight into the inner meanings, if any, of the passages, and visualizing to himself those localities with all their natural beauty. As an example of the way in which he draws out the inner meaning, the following may be pointed out : The separation of the yakṣa from his wife caused him intense pain. He was banished by Kuver to Rámgiri, which cotained various spots with which the movements of Rama and Sita during their banishment were associated. Kálidása only hints at these associations. Sastriji points out the implication that the pangs of separation felt by the yakṣa were meant by

Kuvera to be further intensified by the sight of the spots, which reminded him, by way of contrast to his own misery, of the conjugal happiness enjoyed there by Rama and his consort.

"At places, the interpretations were too candid in their expressions of the amorous feeling running through the whole poem, to which exceptions were taken by some reviewers on the ground of refined taste. Sastriji revised the work but pointed out that tastes vary in the different epochs, and for that reason, what he had written might not be quite in consonance with present day conventions, but might not have been offensive to taste in Kalidasa's time" (*I.H.Q.*, H.P. Shastri Memorial Volume, March 1933 pp. 327-28)

১. অনুষঙ্গ

'বঙ্গ-ভাষার লেখক' বইতে 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' সম্পর্কে লেখা হয়েছে— "কালিদাস ব্যাখ্যা নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'মেঘদূত' লইয়া এই পুস্তক রচিত। ইহা 'মেঘদূত'-এর শ্লোকের ব্যাখ্যা নহে, — এ গ্রন্থে কালিদাসের প্রিয় ভক্ত, কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, তদীয় অনুপম কাব্য 'মেঘদূত'-এর কবিত্ব সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পড়িয়া দেখিয়াছি, — কালিদাসের কবিতার অনন্ত সৌন্দর্য তাঁহার প্রিয় ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসে মিশিয়া আর অনুপমও হইয়াছে। কালিদাস যেখানে যে প্রকার ভাব বিন্যাস করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় সমালোচনী পুস্তিকায়ও ঠিক সেইখানে সেই রূপ ভাবের অভিব্যক্তি করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। এই পুস্তক বঙ্গসাহিত্যের কোহিনুর। যত দিন যাইবে, কালিদাসের আদরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও তত আদর বৃদ্ধি হইবে।" (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী", হরিমোহন মুখোপাধ্যায় স° 'বঙ্গ-ভাষার লেখক', ১৩১১ ব., পৃ. ৮৭৫)

১. ফ্রেডরিক্ ইডেন পার্জিটার Frederick Eden Pargiter (১৮৫২ - ১৯২৭) আই. সি. এস. হয়ে ইংলন্ড থেকে ভারতে এসে বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে কাজ করেন, ১৯০৪ খৃস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। ভারতবিদ্যায় আগ্রহী পার্জিটার-এর কাজ — 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ (Bibliotheca Indica, 1905), *Dynasties of Kali Age*, Oxford, 1913; *Ancient Indian Historical Tradition*, London, 1922 পার্জিটার বিষয়ে হরপ্রসাদের প্রয়াণ-লেখ থেকে উদ্ধৃতি দ্র. হ-র-সং-৪ পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

২. দ্র. 'রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ', হ-র-সং-২, পৃ. ৭৯-৯৭

৩. জন্ম ভাটপাড়ায় ১৮৬৫ খৃ.। তারাচরণ তর্করত্নের ছেলে। বিখ্যাত পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের ভাইপো। প্রমথনাথ তর্কভূষণ নিজেও প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষা কাশী ও ভাটপাড়ায়। অধ্যাপনা করেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮৯৮-১৯২২) ও বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্বোধন, মাসিক বসুমতী ও বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বই : 'পূর্ব্বমীমাংসার্থ সংগ্রহ' টীকা (১৮৯৯খৃ.); 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা টীকা' (১৯১২ খৃ.); 'অদ্বৈতসিদ্ধি' : (১৯১৬ খৃ.); 'বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন'। মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ ১৯১১ খৃ.। মৃত্যু: ১৯৪১ খৃ.।

৪. শাস্ত্রীমশায়ের ভাইপো অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য আমাদের জানিয়েছিলেন এখানে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের (১৮৭৩-১৯৩৫) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত কালিদাস গ্রন্থাবলীর সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ একসময়ে হরপ্রসাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং বিদ্যাচর্চায় দু-জন দু-জনের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা মেয়ে কমলার আবার বিয়ে দেওয়া রাজেন্দ্রনাথ সমর্থন করায় এবং সমকালীন বিদ্যা-জগতে হরপ্রসাদের প্রতিপক্ষ

আশুতোষের দলে যোগ দেওয়ায় তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য, রাজেন্দ্রনাথ তাঁর কালিদাস ও ভবভূতি (১৩১৪ বঙ্গাব্দের কিছু আগে প্রকাশিত) বইয়ের ভূমিকায় হরপ্রসাদকে লক্ষ করে প্রায় একই ভাবে লিখেছিলেন, "কিন্তু যাঁহার মানসোদ্যানের কুসুম চয়ন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি, যাঁহার কাব্যালোচনা নৈপুণ্যে আমার ন্যায় নীরস পাষাণেরও চিত্তে কাব্যপ্রিয়তা জন্মিয়াছে, যাঁহার উপদেশ ব্যতীত কালিদাস ও ভবভূতি কদাচ লিখিতে পারিতাম না, যাঁহার ঋণ আমার জীবনে অপরিশোধ্য, বোধ হয় প্রবন্ধের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়াই তিনি ইহাতে তাঁহার নাম সংযোগ করিতে দিলেন না। তথাপি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।" দ্র. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ/জীবনালেখ্য, কলকাতা, ১৯৮০।

৫. দ্র. এই বইয়ের সংকলিত 'মেঘদূত' প্রবন্ধ।

৬. রজনীরঞ্জন সেন (১৮৬৭-১৯৩৫)। আইনজীবী। চট্টগ্রাম কলেজে আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি শাস্ত্রীমশায়ের 'বাল্মীকির জয়'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন *The Triumph of Valmiki* (1909) নামে।

৭. 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের লেখক শ্রীহর্ষ (১১শ শতাব্দী)। ইনি শংকর-বেদান্তের প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করে খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। দ্র. হ-র-সং-৩, পৃ. ২৭৪, সূত্র ২।

৮. প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রসিদ্ধ মনীষী ব্রহ্মগুপ্তর জন্ম আনুমানিক ৫৯৮ খৃস্টাব্দে। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত রচনা করেন। অপর রচনা করণগ্রন্থ বা তিথির ভাগ বিষয়ে রচনা খণ্ডখাদ্যক।

৯. কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী। এই দিন বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, তিনি শেষনাগের শয্যা থেকে ওঠেন, — প্রচলিত বিশ্বাস। উত্তর মেঘের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে আছে,

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ইত্যাদি।

"রয়েছে চার মাস, যাপন করো তুমি ধৈর্যে, নিমীলিত নয়নে,
বিষ্ণু উঠবেন শয্যা ছেড়ে তাঁর, আমার হবে শাপ মুক্তি;
তখন পরিণত শরৎ-জ্যোৎস্নায় মিলনপুলকিত রাত্রে
পূর্ণ হবে সব, বিরহসঞ্চিত যা-কিছু আমাদের অভিলাষ।"

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ, কালিদাসের মেঘদূত,
কলকাতা ১৯৫৭, পৃ. ১২৫.

১০. H P Shastri, "The identification of Ramgiri, the starting point of the cloud in the cloud-messenger of Kalidasa with Ramgarha hill in the Sirguja State," *Procedings of the Asiatics Society of Bengal,* 1902, pp. 90-91 দ্র.

১১. দ্রষ্টব্য : "অত্রেদমপ্যর্থান্তরং ধ্বনয়তি—রসিকো নিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ....।। দিঙ্নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য....।।" মল্লিনাথের জীবিতকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতক। আজ পর্য্যন্ত 'মেঘদূত'-এর যতগুলি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কাশ্মীরবাসী বল্লভদেব-কৃত 'পঞ্জিকা' টীকাই সর্ব্বপ্রাচীন। বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত E. Hultzsch-এর সম্পাদনায় ১৯১১ সালে 'মেঘদূত'-এর মূল সমেত এই টীকা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। বল্লভদেবের জীবিতকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতক। তিনি কিন্তু উক্ত শ্লোকের টীকায় 'নিচুল' ও 'দিঙ্নাগ' এই শব্দ দুইটির সাধারণ অর্থই করিয়াছেন। 'নিচুল' অর্থে কালিদাসের বন্ধু কবিবিশেষ ও 'দিঙ্নাগ' অর্থে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক—এইরূপ তিনি বুঝেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরে, এবং মল্লিনাথের পূর্ব্বে, দাক্ষিণাত্যবাসী দক্ষিণাবর্ত্তনাথ 'মেঘদূত'-এর যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে 'নিচুল' ও 'দিঙ্নাগ' এই শব্দ দুইটির ঐরূপ 'অর্থান্তর' দেওয়া হইয়াছে (দ্রষ্টব্য মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মেঘসন্দেশ', পৃঃ ১৩, ত্রিবান্দ্রম, ১৯১৯)। দক্ষিণাবর্ত্তনাথ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের

প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। মল্লিনাথ 'রঘুবংশ' কাব্যের টীকার মঙ্গলাচরণে দক্ষিণাবর্ত্তনাথের নাম করিয়াছেন ('তথাপি দক্ষিণাবর্ত্তনাথাদ্যৈঃ ক্ষুন্নবর্ত্মসু।...')। সুতরাং, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি 'মেঘদূত'-এর দক্ষিণাবর্ত্তনাথ-কৃত টীকার সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণাবর্ত্তনাথের টীকা হইতেই ঐরূপ 'অর্থান্তর' গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকের মতে, এই 'অর্থান্তর' টীকাকারের স্বকপোলকল্পিত। অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধে এই বিষয়টি আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন (দ্রষ্টব্য Kuppu-swami Shastri Commemoration Volume, pp 17-24)। শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার 'মেঘদূত' পুস্তকের প্রথম অংশের অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে এইরূপ 'অর্থান্তর' সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে।" *হ-র-২*, পৃ-৬৬।

১২. মধুসূদন কিন্নর (১২২০ - ৭৫ ব.) ঢপ গান রচনা করতেন এবং নিজের দল নিয়ে গান পরিবেশন করতেন। মধু কান নামেই খ্যাত ছিলেন। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও মার্জিত ভাষায় গান রচনায় অনায়াস দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত গান ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রসন্নকুমার দত্ত চারটি পালায় সাজিয়ে সংকলন করেন : অক্রূর সংবাদ, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর ও প্রভাস।

১৩. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) প্রথম বাংলা পদ্যে 'মেঘদূত' অনুবাদ করেন। তাঁর ১৭ বৎসর বয়সের এই নিপুণ অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। শাস্ত্রীমশায় এই অনুবাদের উত্তরমেঘ অংশ থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিয়েছেন। উদ্ধৃত পাঠের ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া হল।

২. পাঠ-প্রসঙ্গ

এর আগে 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' তিনবার প্রকাশিত হয়েছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশের পর দ্বিতীয়বার সংকলিত হয় বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী'-তে (আ. ১৯২২)। প্রথম প্রকাশের

পর বইটি সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। হয়তো সেই কারণে হরপ্রসাদ বসুমতী গ্রন্থাবলীতে প্রকাশের সময় সামান্য কিছু অংশ বর্জন করেন। তৃতীয়বার সংকলিত হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬০)। এই মুদ্রণে সম্পূর্ণ পাঠই রাখা হয়েছিল।

আমরা এই রচনা-সংগ্রহে মূল বইয়ের পাঠ অবিকল রেখেছি। বসুমতী গ্রন্থাবলীতে বর্জিত অংশগুলি নিচে নির্দেশ করা হল। নিচের উল্লেখগুলির শুরুতে ব্যবহৃত সংখ্যা দুটির প্রথমটিতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ছত্র-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

৯৭/৪-৭ .... তুমি তো ঝুলিতে ঝুলিতে যাও....বিলাসবতী কামিনীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে?

১০৫/২৩-২৬ ....করিয়া উহাদের গরদের শাড়ির....বিশ্রাম থাকে না।

১০৬/৭-১২ .... সে মানেটি এই....ধুঁয়া বাহির হইতে থাকে।

১০৭/৭-১৮ সেখানে রসবতীরা আপন বাড়ি....খুব গোপনেই সারা হইয়াছে।

সংস্কৃত বাঙ্ময়

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র

পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড়ো ভালোবাসেন। সেই জন্য অদ্য আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র এই দুইজন বড়ো বড়ো কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। ছোটো খাটো বটতলার ও গ্রবস্ট্রিটের বহু-সংখ্যক কবি থাকিতেও এত বড়ো দুইজন কবির উপর হস্তক্ষেপ করা কেন? একথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বলিব "মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার" এদের দুজনের একজনেরও ভালো করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে সেই সঙ্গে আমারও কিছু হইতে পারে এই এক ভরসা। আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র মধ্যে কে কেমন লিখিয়াছেন দেখাইতে চেষ্টা করিব। কোনো একটা বিষয় লইয়া দেখিব কে জিতিয়াছেন কে হারিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের দুজনের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো কাহার কবিত্বশক্তি অধিক, কাহার অল্প তাহা নির্ণয় করা বড়ো শক্ত; বিশেষত আমার মতো ক্ষুদ্রজীবী লোকের পক্ষে। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার নাই তাঁহারাই হঠাৎ বলিতে পারেন সেক্ষপীয়র — ছ্যা— কালিদাসের ছাঁইচ পর্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরি সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস্ বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সবগুলি ভালো করিয়া খুলিবে এই দুটি বুঝিতে তাঁহার মতো ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা-কিছু আছে সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব এ ভাব তাঁহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাবশোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।

সেক্ষপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল না। তাঁহার দুই চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সেগুলিকে ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিল না, যেহেতু অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পরের লেখা ছাই ভস্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিসি সাঙ্গ করেন সুতরাং পরের জিনিস কিরূপে আপন করিতে হয় সেটুকু তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোনো বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু সেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসে শ্মশান বর্ণনা পাই না, নরক বর্ণনা পাই না, ম্যাক্‌বেথ পাই না ইয়াগোও পাই না। কিন্তু সেক্ষপীয়রে অদ্ভুত পাপ সৃষ্টি কালিবান্‌কে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়ের প্রকাণ্ডতা দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণনে পাঠকের শরীর কণ্টকিত করিবেন তাহা না করিয়া হিমালয়ে অপ্সরাগণের মতিভ্রম দেখাইতে বসিলেন; সূর্যকিরণ বক্র করিয়া পুষ্করিণীর পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন; আরো কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে বিলাসকাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের এইরূপ উৎকট সৌন্দর্য-প্রিয়তা হেতুই তাঁহার পুস্তকাবলিতে এত রমণীয় বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এই জন্যই তিনি কটমট ছন্দঃ সূত্র লিখিতে গিয়াও সেগুলিকে ক্রিয়া বিশেষণ পদ প্রয়োগে ললিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই — অন্তর্জগৎ — মনুষ্যের মন; আর বাহ্যজগৎ। নির্মল আকাশ, সুদূরবিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় এই দুই-এর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর সবই তাঁহার একচেটে। মনুষ্যজাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ; রমণীহৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানাপ্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাইবে বুড়া বাপ কাঁদিতেছে, প্রিয়তমার অকালমৃত্যুতে পতি শোকে অভিভূত হইয়াছে, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নববিধবা মোহপরায়ণ হইয়া পড়িয়া আছে, প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে আর যাহাকে পাইতেছে প্রিয়ার সংবাদ

জিজ্ঞাসা করিতেছে; কোথাও লতা কোথাও ময়ূরকে প্রিয়া বোধে আলিঙ্গন করিতেছে— এসব মনুষ্যহৃদয়ের মোহিনীময় ভাব। এ ভাবের প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্তু যেখানে দশ-পনরোটি পরস্পর বিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়-ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবশবল হইবার কথা সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে সেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাশি রাশি পাপকার্যে রত হইতে বলিতেছে, আর-একদিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে ; একদিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনি সে ভাব গোপনের জন্য কার্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে; — এসব হৃদ্বৃত্তির জটিলতা, মনুষ্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্ষপীয়র ভিন্ন আর-কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই পারিবেনও না। সেক্ষপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মতো সরলা মুগ্ধহৃদয়া সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নি ঘরকন্নায় মজবুত, ভাঙে না, মোচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা পতিরতা যুবতী চাও পোর্সিয়া আছে; জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জরিতহৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও লেডি ম্যাক্‌বেথ আছে। দেখিবে এগুলি সব মানুষ, অমন যে পাষাণহৃদয়া ম্যাক্‌বেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মতো বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।

কালিদাস এরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ — তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু কন্যা প্রেরণের সময়, পিতার কান্না বড়োই সুন্দর। সেটি দেখানো হইল, অমনি কণ্বমুনি ডিস্‌মিস। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুন্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, এইজন্য

আগাগোড়া শকুন্তলা চরিত্র আমরা পড়িতে পাই। ওরূপ মুগ্ধ বালিকার প্রথম প্রণয় সুন্দর। সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও পিতা মাতা সমদুঃখসুখসখী চিরলালিত হরিণশিশু চিরবর্ধিত নবমালিকা লতা ত্যাগ করিয়া যাওয়া সুন্দর। রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন তাঁহাকে হাবা মেয়ের মতো লুকাইবার চেষ্টা সুন্দর। সে সময়ে একটু রাগ (এ রাগে বাহানা নাই) সুন্দর। এত অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কাশ্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া একেবারে পামর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর। কালিদাস বড়ো কবি, এত সৌন্দর্য কে দেখাইতে পারে। আবার একটি সুন্দর মনুষ্যের চিত্র দেখিবে? বিক্রমোর্বশী খোলো। রাজার স্বভাবটি কেমন সুন্দর। রাজা সূর্যদেবের অর্চনা করিয়া সূর্যলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ অপ্সরাদিগের আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। রাজা শুনিলেন দৈত্যকেশরী অপ্সরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কেশরীহস্ত হইতে উর্বশীর উদ্ধার করিলেন। বীরত্বে যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজার বীরত্বে উর্বশীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ সুন্দর নয়? সুন্দরী অপ্সরা বিদ্যাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্ফল হয় না। রাজারও মন কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীততৃষ্ণ হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাঁহাকে অপমানের শেষ করিলেও তিনি ধারিণীকে একটি উচ্চবাক্যও বলেন নাই। শেষ ধারিণী প্রিয়প্রসাধন ব্রত করিয়া চন্দ্র সূর্য দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিল যে, যে অদ্যাবধি আমার স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো দেখিব। কেমন এটি সুন্দর নয়?

উর্বশীর সহিত রাজার মিলনের কিছুদিন পরে হিমালয় পর্বতের রম্য স্থান সকলে বিহার করিবার জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে বসন্ত সময়ে পুষ্পবনমধ্যে নির্জন প্রদেশে নির্ঝরিণীতটে সান্ধ্যসমীরে শিলাপট্টে পরস্পরের সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করেন। একদিন উর্বশী কার্তিকের বাগানে উপস্থিত। কার্তিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেবকার্যের ব্যাঘাত ঘটে, এইজন্য শাপ ছিল স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে। উর্বশী লতা হইয়া রহিলেন, রাজা তাঁহার বিরহে উন্মত্ত। মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি দৈত্য আবার উহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন। মেঘ তাঁহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন রে পাপ দৈত্য আমারই সর্বনাশ করিয়াছিস, আবার আমারই উপর বাণ বর্ষণ। সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের

উপর ময়ূর গলা বাড়াইয়া কী দেখিতেছে, রাজা বলিলেন অনেক দূর দেখিতেছ আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? ময়ূর বলিল কক্ কক্। রাজার মহারাগ, আমি মহারাজ পুরূরবা আমায় চেন না? বল কি না "কঃ কঃ" বলিয়াই ঢিল, ময়ূরও উড়িয়া যায়। রাজা অনেক কষ্টের পর গৌরীপাদভ্রষ্ট অলক্তকমণিসংযোগে উর্বশীর উদ্ধারসাধন করিলেন। উর্বশী বলিলেন মহারাজ, আর না, আপনি রাজধানী চলুন। রাজা বলিলেন তুমি মেঘ হও, উর্বশী মেঘ হইলেন, রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া মুহূর্ত মধ্যে প্রয়াগে উপস্থিত। ইহা অপেক্ষা চিত্তবিনোদন আর কী আছে? যে কেহ কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া রাজার সহিত কার্তিকের প্রমোদকাননে ভ্রমণ করে নাই তাহার সংস্কৃত পড়াই অসিদ্ধ।

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরো কিছুক্ষণ কহিব। নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য কালিদাস দেখাইয়াছেন কিন্তু আরো অনেক বাকি আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না তাহার জন্য সেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাসগ্রথিত সৌন্দর্য সেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরূরবা কালিদাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের প্রস্পেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্পেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ ডিঙি মাত্রে চড়াইয়া অগাধসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার জন্য বারো বৎসর রাজ্য হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষমা করা সামান্য ঔদার্যের কথা নহে। প্রস্পেরোর গুণে সকলেই বাধ্য। কন্যা পিতার একান্ত বশম্বদ। নেপল্সের রাজা উহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ফর্দিনান্দ উহাকে দেবতা মনে করেন। প্রস্পেরো সংসারের কার্যে কেমন দক্ষ সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রস্পেরো মূর্তিমান শান্তি, পরোপকার ক্ষমা তাঁহার আভরণ। কলিবান্‌কে শত অপরাধসত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা দিলেন যেহেতু সে তাহাই চায়। এরিএলের সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্তোনিওর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনটা মাতাল তাঁহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারাও ক্ষমা পাইল। প্রস্পেরো ক্ষমা করিলেন কিন্তু সকলকেই এক-একবার জব্দ করিবার পর। প্রস্পেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য। আবার যখন ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয় সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস

এন্টনি হ্যামলেট এমনকী ম্যাক্‌বেথ এই বিবাদহেতু কোনো কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচলচিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য কালিদাসের কোথায়।

তাহার পর আর-এক কথা। শুদ্ধ সৌন্দর্য হইলেই কি কাব্যের চরম হইল? সৌন্দর্য ছাড়া আরো অনেক জিনিসে কাব্য হয়। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি; পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়, — প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর সুন্দর বস্তু দেখিলে। এই কথাটি যেমন বাহ্যজগতে খাটে তেমনি অন্তর্জগতে। অন্তর্জগতে যখন আমরা কাহাকেও লোকাতীত ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে জিনদেব ব্যাঘ্রী জন্য— স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়বিমিশ্রিত এক অপূর্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস এরূপ পুরুষপ্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে "মৃৎপাত্র শেষা মকরোৎ বিভূতিম্;" পার্বতী যখন মদন দহনের পর কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন তখন যেন এই রূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু এক পার্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর-কোথাও বিস্ময় উদয়করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। সেক্ষপীয়রের এরূপ বিস্ময় উৎপাদক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। এরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই। সর্বপ্রধান লেডি ম্যাক্‌বেথ, একবার অনুতাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা, একবার যখন নামিয়াছি দেখা যাক পাতাল কত দূর। একবার হৃদয়দৌর্বল্য প্রকাশ নাই, কেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! যখন সভামধ্যে ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্তি আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, যখন ম্যাক্‌বেথ ভয়ে অনুতাপে জড়ীভূত হইয়া অতি গোপনীয় কথা-সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন লেডি ম্যাক্‌বেথের কেমন ক্ষমতা! অন্য মেয়ে হইলে, "ওগো আমার কী হোলো" বলিয়া কাঁদিয়াই অস্থির হয়। লেডি ম্যাক্‌বেথ সভাশুদ্ধ লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে রাজার ঐরূপ মূর্চ্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া নিজে ম্যাকবেথের কাছে বসিয়া তাহার দুর্বল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এরূপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়?

কল্পনাজনিত আনন্দের আর-এক কারণ নূতনতা, অর্থাৎ আজগবি জিনিস বর্ণনা করা। আরব্য উপন্যাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। এরূপ নূতন জিনিস কালিদাস বা সেক্ষপীয়র কাহারই নাই। তবে সেক্ষপীয়রের স্পিরিট ওয়ারল্ড বা পরীস্থান; সেটি যেমন নূতন তেমনি সুন্দর। সবই মনুষ্যের মতো কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনোরূপ শোক দুঃখ নাই। শোক দুঃখ যে বৃত্তি দ্বারা অনুভব হয় সে বৃত্তিও তাহাদের নাই। অথচ মানুষের কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন কেমন হয়।

Ariel. Your charm so strongly works 'em
That if you now beheld them your affections
Would become tender.
Pros. Dost thou think so, spirit?
Ari. Mine would, sir, were I human.

যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত। ওবেরণের অধীন দেবযোনিগণ মনুষ্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, মানুষের কানে একপ্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটি ওর ঘাড়ে, ওর পিয়ারের লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে; পড়িলে নূতন জগৎ, নূতন আমোদ, নূতন পরিবর্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও যেন পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান। কালিদাসের চিত্রলেখা, সহজন্যা, মিশ্রকেশী, এমনকী উর্বশী সেক্ষপীয়রের পরীস্থানে স্থান পান না।

সেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলস্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নূতন নূতন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলস্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোলস ফলস্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোনো কর্মেরই নহে। জীবনশূন্য প্রভাবশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।

এতদূরে আমরা কালিদাস ও সেক্ষপীয়র তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ শেষ করিলাম। বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ, যে, সংক্ষেপ করিতে

গেলেই কষ্ট হয়। যে অংশ সমালোচিত হইল, ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি বর্ণনায় কাহার কত বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কল্পনাজনিত সুখ তিন কারণে জন্মে, প্রকাণ্ডতা — সৌন্দর্য ও নূতনতা। প্রকাণ্ডতা — বিস্ময়কর হৃদয় ভাবের ঔজ্জ্বল্য — বর্ণনায় সেক্ষপীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি নৈসর্গিক পদার্থ সৃষ্টিতে সেক্ষপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাঁহার বড়োই ওস্তাদি। সৌন্দর্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা সেখানে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য জন্মে যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়োই বাহাদুরি। কালিদাসের নাটক পড়িলে গেটোর [গ্যেটে] সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে "যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিব।"[১]

এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা দেখা গেল তাহাতে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু কালিদাসের আর এক মূর্তি আছে, সে মূর্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহও নাই। বাইরন জাঁক করিয়া বলিয়াছেন Description is my forte[২] কিন্তু সেই বাহ্য জগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, তিনি বাহ্যজগৎ বড়ো গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্বতোমুখী প্রভুতা। যখন স্বয়ম্বর স্থলে ইন্দুমতী উপস্থিত হন, তখন কালিদাস দুই চারি কথায় কেমন জমজমাট করিয়া দিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড উঠান, বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মতো বেদি, নানা কারুকার্য খচিত মহার্ঘ বস্ত্রাস্তরণোপপন্ন, তদুপরি পৃথিবীর রাজগণ বিচিত্র বেশভূষা করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন।

আসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু
প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ
পয়োমুচাং পংক্তিষু বিদ্যুতেব।। [রঘুবংশ, ৬/৫]

যখন মেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত মেঘ উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই নিবিড় নীলনীরদমালার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ যেমন গাঢ়োজ্জ্বলদীপ্তি বিকাশ করে, তেমনি রাজারা সব মঞ্চোপরি আসীন হইলে রাজসভার কেমন এক গভীরতা মিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল। সব জম জম করিতে লাগিল। এমন সময়ে বন্দিরা স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল— রাজাদের বংশাবলী বর্ণনা সমাপন হইল।

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ
সোমার্কবংশ্যে নরদেবলোকে।
প্রসারিতে [সঞ্চারিতে] চাগুরুসারযোনৌ
ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ।।
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং
কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তান্
তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে।।
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান-
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং
পতিম্বরাক্লৃপ্তবিবাহবেশা।।* [রঘুবংশ, ৬/৩-১০]

কালিদাস রাজসভার কবি, তিনি নিজেও হয় তো একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারি ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন সভাস্থ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য, তাঁহার নিকট আমরা রাজসভা, বিবাহসভা, দরবার প্রভৃতি বড়োমানুষি জিনিসের

---

* চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজগণের বংশাবলী পাঠ হইলে পর উৎকৃষ্ট অগুরু-চন্দনের ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইল। সে ধূম ক্রমশ অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল। মঙ্গলসূচক তূর্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল। তাহার সঙ্গে শঙ্খপ্রধ্মাত হইয়া শব্দ আবর্ত ঘন গাঢ় হইয়া দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল। নগরের প্রান্তবর্তী যে ময়ূরেরা ছিল তাহারা মেঘগম্ভীর তূর্য মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ংবরা রাজকন্যা বিবাহ বেশ ধারণ করতঃ মনুষ্যবাহ্য চতুষ্কোণ যান আরোহণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাইব, ইহা একপ্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বভাববর্ণনায়ও তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্যজগৎ বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্য মাত্র বর্ণন করিয়াছেন এমন নহে। হিমালয় বর্ণনস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য বর্ণনাই আমরা বড়ো ভালোবাসি এবং তাহাই অধিক।

কালিদাসের আরো একটি নিসর্গ বর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল। এটি কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে। রাবণবধ ও বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম সীতায় অনেক হাঙ্গামের পর পুনর্মিলন হইয়াছে। পুষ্পকরথ প্রস্তুত। সকলে আরোহণ করিল। পুষ্পক আকাশপথে উড্ডীন হইল। রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমেই সমুদ্র,

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিং।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন-
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্।।

তান্তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্যদিশোমহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়-
মীদৃক্তয়ারূপমীয়র্ত্তয়া বা।।† [রঘুবংশ, ১৩/২ এবং ১৩/৫]

সমুদ্রে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যসমূহ রহিয়াছে।

সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ
সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।

---

† বৈদেহি আমার সেতুতে বিভক্ত অনন্ত ফেনিল নীল সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। যেন শরৎকালের অগণ্য তারকা ঘটিত নির্মেঘ গগনতল হরিতালীতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ দেখ অনন্ত সমুদ্র দশদিক্ ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। প্রতিক্ষণেই উহার আকার পরিবর্তন হইতেছে। সমুদ্রের রূপ বিষ্ণুর ন্যায়, কিরূপ ও কত বড়ো কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না।

~ ~

অমী শিরোভিঃ তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ
ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্।।* [রঘুবংশ, ১৩/১০]

প্রকাণ্ড অজগরগণ সমুদ্রতীরে জলতরঙ্গের সাথে একাকার হইয়া শয়ন করিয়া আছে।

বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গাঃ
মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জথুনির্ব্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈঃ-
ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।† [রঘুবংশ, ১৩/১২]

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কূল দেখা গেল।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।‡ [রঘুবংশ, ১৩/১৫]

রথ রামের যেমন অভিলাষ তেমনি চলিতেছে। মুহূর্ত মাত্রে সমুদ্রতীবে উপস্থিত। রাম দেখাইলেন সীতে দেখ,

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-
পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ।

---

* তিমিমৎস্য সকল বিকট হা করিয়া নদীমুখের জল মুখে পুরিতেছে। শেষ মাথাব ছিদ্র দিয়া সে জল বাহির করিয়া দিয়া নদী হইতে আগত সমস্ত জীব-জন্তু ভক্ষণ করিতেছে।

† বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল সমুদ্রতীরবায়ু সেবন করিবার জন্য লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। সমুদ্রতরঙ্গের সহিত তাহাদের ভেদ নিরূপণ অতীব কষ্টকর। যদি সূর্যরশ্মি পড়িযা উহাদেব মাথার মণি দ্বিগুণ দীপ্তি না করিত কাহার সাধ্য চিনিয়া উঠে কোনটা সাপ আর কোনটা নয়।

‡ দূব হইতে সমুদ্রের বেলা দেখা যাইতেছে। বেলা কেমন? তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ। বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড লৌহচক্রের কানায় সরু কলঙ্কেব রেখা দেখা যাইতেছে।

প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমানবেগাৎ
কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্।।† [রঘুবংশ, ১৩/১৭]

আকাশ নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদ নৌকার ন্যায় রামের পুষ্পকরথ জনস্থান, মাল্যবান, পঞ্চবটী, পম্পা, শরভঙ্গাশ্রম প্রভৃতি পার হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সংগমস্থলে উপস্থিত। এখানে নির্মল শ্বেতকান্তি গঙ্গাপ্রবাহ কৃষ্ণকান্তি যমুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কী অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানা
মিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব।।
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তিভুর্বশ্চন্দনকল্পিতেব।।
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা।।
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ।।‡ [রঘুবংশ, ১৩/৫৪-৫৭]

---

† এই তো আমরা রথবেগ হেতু মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলাম। এই তীরভূমিতে অসংখ্য শুপারিবৃক্ষ ফলভরে অবনত এবং বালুকার উপরে শুক্তি বিভক্ত হওয়ায় চারিদিকে মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে।

‡ হে সর্বাঙ্গসুন্দরি। গঙ্গা যমুনা তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন শোভা হইয়াছে দেখো। কোথাও বোধ হয় মুক্তার হারের মাঝে মাঝে নীলমণি থাকিয়া আপনার প্রভা যেন মুক্তায়

এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত সুনিপুণ অনুকরণ, কল্পনার এমন স্নিগ্ধ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে? আমার ইচ্ছা ছিল আরো উৎকৃষ্ট বর্ণনা উদ্ধার করি, কিন্তু বঙ্গদর্শনের স্থান বড়ো অল্প; সবই যদি ভালো জিনিসে পুরাইয়া দিই তো আর সব ছাই ভস্ম কোথায় যাইবে?

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া আর-একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্র বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্যহৃদয়ের উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তা-প্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি সেক্ষপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ। তাঁহার কেবল একটি মনুষ্যচিত্র অনুকরণের অতীত। সেটি কুমারসম্ভব-এর পার্বতী। কেন? ভারত মহিলা প্রস্তাবে লিখিত আছে, পাঠক মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একবার খুলিয়া দেখিবেন আমাদের আর স্থান নাই। [এই গ্রন্থে ভারত মহিলা সংকলিত আছে]

সেক্ষপীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সংকটে পড়িয়াছেন, কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। প্রত্যুত তাঁহার মহাকাব্যই তাঁহার মহাকবি খ্যাতি লাভের মূল কারণ। এ-সকলের উপর তাঁহার মেঘদূত। সমস্ত সাহিত্য সংসারে মেঘদূত-এর মতো সারবান্ কাব্য অতি বিরল। আডিশন পোপের 'রেপ অব-দি-লক্‌-কে "*Merumsal* or the delicious little thing" বলিয়াছেন। তিনি যদি মেঘদূত দেখিতেন তবে *Merumsal* এ নাম রেপ অব-দি-লকের সুষ্প্রাপ্য হইত। মেঘদূত-এর সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতরের

লেপন করিয়া দিতেছে। আর-এক জায়গায় শাদা পদ্মের মালায় যেন মাঝে মাঝে নীলপদ্ম বসান রহিয়াছে। কোনোস্থানে যেন হংসশ্রেণী মানস সরোবরে যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে কাদম্ব হংসও দুই-পাঁচটা আছে। আবার কোথাও যেন পৃথিবী সার চন্দনের টিপ কাটিয়া মধ্যে মধ্যে কালাগুরু দিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বোধ হয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কেবল মাঝে মাঝে ছায়ায় অন্ধকার লুকাইয়া আছে। কোথাও যেন শরৎকালের নির্জন মেঘ, মধ্যে মধ্যে ফাক দিয়া নীল আকাশ উঁকি মারিতেছে। আবার একস্থান দেখিতে হঠাৎ বিভূতিভূষিত শিবঅঙ্গে কৃষ্ণসর্প বিহার করিতেছে বোধ হইবে।

তুলনায় গোলাবজলের মতো। একটি উৎকৃষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্ট ভাগ সংগ্রহ, আর একটি গন্ধ করা জল মাত্র।

এতক্ষণ আমরা কাব্যের বিষয় লইয়া কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের তুলনা করিতে ছিলাম। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে কালিদাসের বাহ্য জগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য সেক্ষপীয়রের অন্তর্জগতে তেমনি। অন্তর্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে বোধ হয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্বত্র সেক্ষপীয়র উপমা বিরহিত।

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে পারে। এ তর্কেও কাহার কী দাঁড়ায়, দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার, শ্রব্য দৃশ্য আর গীতিকাব্য। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে দুজনেই সমান। কেহই গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু সেক্ষপীয়র তাঁহার নাটকমধ্যে যে সমস্ত গান দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে। কালিদাসও কয়েকটি গান দিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গানগুলি বড়ো মিষ্ট। তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূত-কে দেশীয় আলংকারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য বলিয়া কাব্য ভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতিকাব্য কেন-না-হইবে?

সেক্ষপীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্যগুলি রঘু, কুমার, ঋতুসংহার সকলই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরের বস্তু।

দৃশ্যকাব্য নানারূপ। তন্মধ্যে নাটক প্রধান। সংস্কৃত অলংকারে নাটকের আকার লইয়াই বাঁধাবাঁধি — পাঁচ অঙ্ক নয় সাত অঙ্ক হইবে, রাজা নায়ক হইবে, মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যেটুকু নহিলে নয় সেটুকুর উপর তত নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তি পূর্বক হৃদয়ের ভাব প্রকাশ ও সেই ভাব দ্বারা পরহৃদয়ের ভাব আকর্ষণ এই দুইটি নাটকের সার। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য কোনো উন্নত নীতির শিক্ষা। আমাদের কবিদের এ-দুটিতে নজর বড়ো নাই।

এমনকী যে বীজ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া ৭ম অঙ্কে সেই বীজের অবতারণা করা হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলা-য় ১ম ২য় অঙ্ক না থাকিলে নাটকের কোনো হানিই ছিল না; নাটকের বীজ তৃতীয় অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কেও নাটকের কোনো উপকার নাই। নাটকের জন্য দরকার রাজার প্রণয়, প্রত্যাখ্যান, অভিজ্ঞান ও মিলন। কিন্তু কালিদাস তো নাটক লিখিতে যান নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাটামতে তাঁহার কাব্য গালারি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখানো। তাহা তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শকুন্তলার মতো বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি বড়ো সুন্দর? না? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক পুরিয়া গেল, সেটা আর দেখানো হয় না, ক্রমে একঘেয়ে রকম হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতি হাতি বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়া দিলেন। রাজার গল্প ভাঙিবার উপায় হইল, শকুন্তলারও আড়ে আড়ে দেখিবার সুবিধা হইল, সে হাতি কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্তু নাটকের কিছুই করিল না। সেক্ষপীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনা প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেন নাই। অনেক অবুঝ লোকে মনে করিত যে ম্যাক্‌বেথ-এ ঐ যে দরজায় ঘা মারা আছে ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, জানাইবার জন্য, সুতরাং উহাতে নাটকের কোনো উপকার নাই। কিন্তু ডি কুইনসি দেখাইয়া দিলেন যে ঐ দ্বারে আঘাতে অনেক উপকার হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দম্পতি হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া পাপচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছিল; তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, তাহারা আপন পার্থিব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। অন্য কবিরা বারবার বজ্রধ্বনি করিয়া যে গাম্ভীর্য উৎপাদনে অক্ষম, সেক্ষপীয়র সময় মতো বার-কত দরজায় ঘা মারিয়া তাহার দশগুণ করিলেন। যে বুঝিল তাহার পর্যন্ত হৃৎকম্প হইল।[৩]

এক্ষণে কালিদাস ও সেক্ষপীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ হইল। সেক্ষপীয়র Prince of the Dramatists একথা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু কালিদাস সকল প্রকার কাব্যই লিখিয়াছেন এবং বোধ হয় নাটক ভিন্ন সর্বত্র কৃতকার্য হইয়াছেন। মহাকাব্যে তিনি বাল্মীকির সমান নহেন সত্য,

কিন্তু তিনি ফেলা যান না। নাটকেও তিনি যে ভারতবর্ষের কোনো কবি অপেক্ষা হীন, এমত বলিতে পারি না। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনাময় কাব্য ঋতুসংহার লিখিয়াছেন একথা বলিলে "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি" এই যে অতি অন্যায় সমালোচনা প্রচলিত আছে, তাহারই সপক্ষতা করা হয়। সেক্ষপীয়রও যেমন জগতের কালিদাসও তেমনি জগতের। জগতের সর্বত্রই তাঁহার কবিতার সমান সমাদর। তবে তিনি ভারত ছাড়া কোনো কথা লিখেন নাই। ভারতের কথাই তাঁহার কাব্য।

আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন— বাল্মীকি উর্বশী হইতে পারেন, হোমার রম্ভা হইতে পারেন কিন্তু কালিদাস সপ্লোক দুর্লভা তিলোত্তমা। সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাহাতে আছে— কিন্তু অল্প পরিমাণে প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—

কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং
দধি শশর্করংপয়ঃ।
এনমাংসমবলাচ কোমলা সম্ভবন্তু 'মম'
জন্মজন্মনি।।*

[বানভট্ট, হর্ষচরিত, প্রারম্ভিক শ্লোক ১৬]

সেই সঙ্গে পাঠকমহাশয়দেরও যেন ফাঁক না যায়।

বঙ্গদর্শন
বৈশাখ, ১২৮৫

* কালিদাসের কবিতা, যৌবন বয়স, মহিষের দধি, দুধে চিনি, হরিণের মাংস, কোমলা অবলা এই কয়টি যেন আমার জন্ম জন্ম হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. Willium Jones উইলিয়ম জোনস ১৭৮৯ খৃস্টাব্দ শকুন্তলা-র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রথম ভারতীয় সাহিত্যের একটি দৃষ্টান্ত য়ুরোপের গোচরে এল। জোন্‌সের ইংরেজি অনুবাদ থেকে Georg Forster গেঅর্গ ফরস্টার জর্মান ভাষায় অনুবাদ করেন ১৭৯১ খৃস্টাব্দে। ফরস্টার ১৭মে ১৭৯১ তারিখে সদ্য প্রকাশিত জর্মান অনুবাদটি Johann Wolfgang Von Goethe য়োহান ভোলফ্‌গাঙ্গ গ্যেটে-কে উপহার দেন। এই অনুবাদে শকুন্তলা পড়ে অভিভূত Hermann Georg Jacobi হরমান গেঅর্গ য়াকোবিকে গ্যেটে জর্মান ভাষায় এই কবিতাটি লিখে পাঠান,

Wills du die Blüete des frühen, die
Früchte des späteren Jahres,
Willst du, was rezt und entzückt,
Willst du, was sättigt und nährt,
Willst du den himmel, die Erde, mit
einem Namen begreifen-
Nenn' ich, Sakuntala, dich, und
dann ist alles gesagt.

জুনিয়ার উইলিয়মস শ্লোকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন,

Wouldst thou the Young years'
Blossom and fruit of its decline

And all by which the soul is
Charmed, enraptured, feasted, fed?
itself in one sole name combine?
I name thee O Sakontala!

এই ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ রূপান্তর করেছিলেন,

নব বৎসরের কুঁড়ি তারি এক পাতে
বরষ শেষের পক্ক ফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে
প্রাণে এনে দেয় পুষ্টি বল,
আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই
বাঁধা যেথা আছে মহীতল,—
হেন যদি কিছু থাকে, তুমি তবে তাই,
ওহে অভিজ্ঞান শকুন্তল।

'প্রাচীন সাহিত্য' বইয়ের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, "য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটি মাত্র শ্লোকে শকুন্তলা-র সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ডখণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলা-কে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।" (প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদ। রচনাকাল - ১৩০৯)।

২. "I wont describe : description is my forte", Lord Byron, *DON JUAN*, Canto-V., Line 52

৩. এখানে হরপ্রসাদ শেক্‌সপীয়র-সমালোচনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। Thomas de Quency টমাস ডি কুয়েন্সি

"On the Knocking at the Gate in Macbeth" (*London Mazazine*, 1823; Oscar James Campbell ed *Shakespear Encyclopaedia*, London, Methuen 1966-এ পুনর্মুদ্রিত) প্রবন্ধে দরজায় করাঘাতের মতো আপাত তুচ্ছ ঘটনাটির গভীর নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন,

From my boyish days I had always felt a great perplexity on one point in *Macbeth*. It was this the knocking at the gate, which succeeds to the murder of Duncan, produced to my feelings an effect for which I never could account. The effect was, that it reflected back upon the murder a peculiar awfulness and a depth of solemnity; yet, however obstinately I endeavoured with my understanding to comprehend this, for many years I never could see why it should produce such an effect. . In the murdered person, all strife of thought, all flux and reflux of passion and of purpose are crushed by one overwhelming panic, the fear of instant death smites him 'with its petrific ince' But in the murderer, such a munderer as a poet will condescend to, there must be raging some great storm of passion, — jealousy, ambition, vengeance, hatred, — which will creat a hell within him; and into this hell we are to look

Now apply this to the case of Macbeth. Here, as I have said, the retiring of the human heart, and the entrance of the fiendish heart, was to be expressed and made sensible Another world has stepped in, and the murderers are taken out of the region of human things, human purposes, human desire. They are transfigured Lady Macbeth is 'unsexed'; Macbeth has forgot that he was born of woman; both are conformed to the image

of devils; and the world of devils is suddently revealed. But how shall this be conveyed and made palpable? In onder that a new world may step in, this world must for a time disappear. The murderers, and the murder, must be insulated, —cut off by an immeasurable gulf from the ordinary tide and succession of human affairs, —locked up and sequestered in some deep recess; we must be made sensible that the world of ondinary life is suddenly arrested, —laid asleep, —tranced, —racked into a dread armistice; time must be annihilated; relation to things without abolished; and all must pass self-withdrawn into a deep syncope and suspension of earthly passion. Hence it is, that when the deed is done, when the work of darkness is perfect, then the world of darkness passes away like a pageantry in the clouds : the knocking at the gate is heard; and it makes known audibly that the reaction has commenced; the human has made its reflux upon the fiendish; the pulses of life are beginning to beat again; and the re-establishment of the goings-on of the world in which we live, first makes us profoundly sensible of the awful parenthesis that had suspended them." (p. 490).

মেঘদূত

কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণবাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই কাহারো কোনো বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে।[১] কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, মেঘদূত-এর পরিচয় নিষ্প্রোয়জন; রাজকৃষ্ণবাবু গবর্নমেন্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতিবাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদকরণে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাংলায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণবাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্মগ্রাহী; আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফল লাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাংলায় মেঘদূত-এর আর দুই-একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবুর অনুবাদ যে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা আবশ্যক।

রাজকৃষ্ণবাবু কালিদাসের প্রত্যেক কবিতা ছয় ছত্রে অনুবাদ করিয়াছেন; এইরূপ ছয়ছত্ররূপ শিকল পরায় কোনো কোনো স্থলে অনুবাদ সমাপ্তির পর তাঁহাকে কিছু টানিয়া বুনিতে হইয়াছে। এবং কোনো কোনো স্থানে অল্পের মধ্যে অধিক ভাব প্রবিষ্ট করায় ভাষা একটু দুর্বোধ্যও হইয়াছে। উদাহরণ দ্বারা একথা সপ্রমাণ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই, পাঠকগণ পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় এ শিকল না পরিলেই ভালো হইত।

এই উপলক্ষে মেঘদূত-এর সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লোকে যাহাকে ভালোবাসে তাহার সম্বন্ধে কোনো একটা কথা পড়িলেই সেই কথা লইয়া আমোদ করিতে চায়। কালিদাস এই নূতন বেশে বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অবতীর্ণ

হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যদি তাহার মেঘদূত-এর বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি, বোধ হয় তাহাতে কেহ আমাদের দোষ ধরিবেন না।

কালিদাসের মেঘদূত ১১৫টি বৈ কবিতা নয়; কিন্তু মহাকবি এই ১১৫টি কবিতায় যেন একটি নূতন জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। সে জগতের নিকট রুসোর[২] *Ideal World* বোধ হয় পরাজিত হয়; যাঁহারা উপর উপর দেখেন তাঁহারা দেখিবেন যে, একজন যক্ষ স্বীয় প্রিয়ার অদর্শন দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে এবং মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া তৎসমীপে দৌত্যভারপ্রার্থনা জানাইতেছে; এবং তাহাকে কর্তব্য উপদেশচ্ছলে যক্ষ-পত্নীর বিরহ অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা প্রণিধানপূর্বক পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন যে যদিও সম্মুখে মেঘ ও যক্ষ বৈ আর-কিছুই নাই, কিন্তু তাহার পশ্চাতে, দূরে, যতই প্রণিধানপূর্বক দেখ, অতি পরিস্ফুটরূপে একটি নতুন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কবির কল্পনায় সমাজের মনুষ্যের, সমাজনিয়মের, মনুষ্যের সুখের যত দূর উৎকর্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে এই জগৎ সেই উৎকর্ষ সমূহের সমষ্টিমাত্র। তাঁহারা দেখিবেন হিমালয়ের ওদিকে তুষারধবল কৈলাসের উপরে ভারতভূমি হইতে দুর্ভেদ্য প্রাচীরমালার দ্বারা পৃথক্‌কৃত করিয়া মহাকবি একটি মহানগরী সৃষ্টি করিয়াছেন। জলভরিত মেঘে অনবরত গর্জন ও বিদ্যুৎ বিলসন হইলে উহার যেরূপ শোভা হয় সে নগরের শোভাও সেইরূপ। উহার বরাঙ্গনাগণ বিদ্যুৎবরণী স্থির সৌদামিনী তুল্য, উহার আলেখ্য সমূহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে শোভিত, উহার মৃদঙ্গের ধ্বনি মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, উহার মণিময় তলদেশ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়; উহাতে ছয় ঋতু নিরন্তর বিরাজমান; ছয় ঋতুরই ফুলকুল উহার বায়ুকে নিত্য আমোদিত করিতেছে; উহার পাদপসমূহ সকল সময়েই পুষ্পাভরণে ভূষিত থাকে; সকল সময়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকে, আর তাহার পার্শ্বে হংসসমূহ সকলকালে মেখলাকারে বিচরণ করে; সকল সময়ে ময়ূরসমূহ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তারকরতঃ জনগণের আনন্দ সমুৎপাদন করে। সর্বরাত্রেই সুধাংশুদেব স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিয়া উহার সুধাধবলিত হর্ম্যশ্রেণীকে শোভিত করেন।

তথায় আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনো কারণে লোকের নয়নাশ্রু পতিত হয় না।

প্রণয়.কলহ ভিন্ন অন্য প্রকার মনোবাদ কখনো উপস্থিত হয় না; আর যৌবন ভিন্ন অন্য বয়স কখনো দেখা যায় না; অর্থাৎ সে পুরীতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই, কলহ নাই, জরা নাই, মরণ নাই।

পৃথিবীতে যে-সকল দুঃখ অপরিহার্য সেখানে তাহার লেশমাত্র নাই; সেখানে দস্যু নাই, তস্কর নাই, দণ্ডবিধি নাই, ভয় নাই, শঙ্কা নাই, সেখানে সকলই সুখ; কেবল আনন্দ, কেবল উল্লাস, কেবল ভোগ, সে ভোগের বিরাম নাই, অন্ত নাই। যে এক মদনবাণের তাপ আছে তাহাও বিশেষ তীব্র হইবার যো নাই, কারণ মহাদেব কৈলাসে বাস করেন, মদন ভয়ে বড়ো একটা আধিক জারি করিতে পারেন না।

অন্য কবি হইলে এরূপ সমাজের লোকে কী করিয়া দিন যাপন করে তাহার ইতিহাস দিতে পারিতেন না; কিন্তু কালিদাসের সৃষ্টির ক্ষমতার নিকট বুঝি বিধাতার সৃষ্টিক্ষমতা পরাভূত হয়। মানবচরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই; তিনি দেখিয়াছেন যে এই সুখের সংসারে স্ত্রীপুরুষ যুবক যুবতী কেহই বসিয়া থাকে না, সকলে এই অপূর্ব সুখাস্বাদে নিরন্তর ব্যাপৃত। তথায় কন্যাকুল মন্দাকিনীর তীরস্থ বালুকাভূমির মধ্যে মণি লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই অন্বেষণ করতঃ ক্রীড়া করে, শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মন্দাকিনীর সমীরণ তাহাদিগকে ক্লান্ত হইতে দেয় না। যদি কখনো কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয়, নিকটেই কুসুমিত মন্দার বৃক্ষ, তাহারই তলায় গিয়া খেলিতে আরম্ভ করে, খেলা কখনো ছাড়ে না; তথাকার অধিবাসীগণ নিরন্তর রূপে স্থির সৌদামিনী সদৃশ রমনীগণের সমভিব্যাহারে বৈভ্রাজ নামে পুরীর বহিস্থিত উপবনে বসিয়া কিন্নরদিগের গান শ্রবণ করে। সে গান আর কিছুই নহে, কেবল কুবেরের যশঃ গানমাত্র।

এই সুখময় পুরীতে যে-সকল যক্ষ বাস করে তাহাদের মধ্যে একজন মেঘদূত-এর নায়ক। তিনি যে অলকাপুরীর একজন প্রধান ব্যক্তি, কালিদাস একথা কোথাও বলেন নাই; আমাদেরও বোধ হয়, তিনি একজন সাধারণ কর্মচারিমাত্র; কিন্তু তিনি শঙ্খ ও পদ্ম নামক দুইটি নিধির অধীশ্বর; তাহার তোরণের পার্শ্বে তাহাদের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। শঙ্খ ও পদ্ম নিধি কী? নিধি শব্দে সঞ্চিত ধন বুঝায়; আমাদের দেশে লক্ষপতি কোটিপতি বড়োই গৌরবের

কথা, কিন্তু এই সামান্য যক্ষ— লক্ষের উপর নিযুত, তাহার পর কোটি, তাহার পর অর্বুদ, তাহার পর বৃন্দ, তাহার পর খর্ব, তাহার পর নিখর্ব, তাহার পর শঙ্খ ও তাহার পর পদ্ম এত ধনের অধিকারী। তাঁহার এক পত্নী, সেই তাঁহার প্রাণ,—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।।

"কৃশাক্ষী, যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণী তুল্য ললিতলোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনত কলেবরা,
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে,
বিধাতার আদ্যসৃষ্টি যুবতী সমাজে।"

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ]

যক্ষ এই রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়াই তাঁহার জীবন— তাঁহার প্রাণ— তাঁহার সর্বস্ব হইয়াছিল; বাহ্য জগতের সত্তা তাঁহার নিকট বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছিল।

কুবের এই সুখভবনের অধিপতি। যক্ষকুল তাঁহার আজ্ঞাবহ; অন্যদেবগণ পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন, কুবেরের যান মনুষ্য; যাহার আজ্ঞায় এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমস্ত সমাজ চলিতেছে, নিজ পুরীমধ্যে তাঁহার কথা লঙ্ঘন করে এমন কেহই থাকিতে পারে না। আমাদের যক্ষ হয়তো দুই-একবার আপন পত্নী সহবাস আর অলকার সুখভোগে মগ্ন হইয়া তাঁহার কথার অন্যথা করিয়াছিলেন। এইজন্য কুবের তাঁহাকে হয়তো দুই একবার সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবেন। একবার আশ্বিন মাসে তিনি উহাকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার এই কর্ম সম্প্রতি তোমায় করিতে হইবে, দেখিও যেন ভুলিও না, আর যেন তোমায় সতর্ক করিয়া দিতে না হয়।"

আজ্ঞা পাইয়া যক্ষ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুইটি মন্দার বৃক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উভয়ে পুষ্পস্তবকভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহার বড়োই আনন্দ হইল; বৃক্ষ দুইটি তাঁহার প্রিয় পত্নীর পোষ্যপুত্র, তাহাদের এই অপূর্ব পুষ্পোদগম দেখিয়া মহা আনন্দভরে প্রিয়াকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। প্রিয়া দীর্ঘিকাতীরে ভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তথায় গেলেন; দেখিলেন, মরকত শিলানির্মিত সোপানাবলী পুষ্করিণীর গভীর জল পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে; বৈদূর্য্যমণিনির্মিত নালের উপর হেমপদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্করিণীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; হংসকুল তাহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; বর্ষাকালে মানস সরোবরে যে যাইতে হয় সে কথা তাহাদের মনেও নাই; দেখিলেন প্রিয়া তথায় নাই। নিকটেই ক্রীড়াশৈল ছিল; মনে করিলেন প্রিয়াকে তথায় পাইবেন; এই বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পুষ্করিণীর তীর হইতে সে শৈল গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; উহার শিখরসমূহ ইন্দ্রনীলমণিতে নির্মিত; উহার তলদেশ কনক-কদলীতে বেষ্টিত; উহার একাংশে মাধবীলতাকুঞ্জের (হয়তো এই মাধবীলতা কুঞ্জেই কল্য রজনীতে বিহার করিয়াছিলেন) কুরুবক নির্মিত বেড়ার পার্শ্বে একটি অশোক ও একটি বকুল বৃক্ষ; দুইটি বৃক্ষের ফুলে মদনের বাণ প্রস্তুত হয়; এই দুইটি বৃক্ষের মধ্যস্থলে একটি সোনার দাঁড় স্ফটিকের একখানি তক্তায় দুলিতেছে, এবং তাহার তলদেশ অঙ্কুরাবস্থবংশের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট মণির দ্বারা বাঁধান। সেই দাঁড়ে একটি ময়ূর বসিয়া আছে। যক্ষ তথায় গিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়া করতালি দিয়া তাহাকে নাচাইতেছেন; আর তাঁহার বালা রুন রুন করিয়া বাজিতেছে; শিখীটি সেই শব্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া নাচিতেছে। প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবেরের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন; তিনি সেদিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিলে হয়তো সুরুচিসম্পন্ন আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা কাগজ সম্পাদক মহাশয়েরা বলিবেন এ প্রবন্ধ-লেখকের রুচিপরিবর্তন আবশ্যক, তিনি একখানি বাংলা অনুবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক অশ্লীলতার অবতারণাকরতঃ আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য সাময়িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভালো হইত। সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে তাঁহারা যেন উত্তরমেঘের ৫, ৭ এই দুইটি কবিতা প্রণিধানপূর্বক পাঠ করেন।[৩]

পরদিন প্রভাত হইলে কুবের দেখিলেন, পুনরায় যক্ষ তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন, এবং প্রিয়ার প্রতি তাঁহার সর্বান্তরিক অনুরাগই এরূপ অমান্য করার কারণ ইহা জানিতে পারিয়া কুবের এক বৎসরের জন্য যক্ষকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন।

কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলা-য় যাহা দেখাইয়াছেন, মেঘদূতে তাহাই দেখাইলেন। দেখাইলেন, স্বর্গেই হউক বা পৃথিবীতেই হউক, সুখভবনেই হউক বা দুঃখভবনেই হউক— সমাজ যেখানেই হউক, উহার আজ্ঞা কঠোর, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিহার্য। যেমন শাস্তির আজ্ঞা হইল, অমনি সে যক্ষ অলকাপুরী হইতে রামগিরিতে আনীত হইল।

কুবের শাস্তি বিধান করিলেন; যক্ষকে অলকার কোনো কারাগারে বন্ধ করিলেন না কেন? তাহা হইলে তো যক্ষের জ্ঞানযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বোধ হয় অলকার ন্যায় সুখ-ভবনে কারাগার নাই, বোধ হয় দুঃখভোগ যাহার অদৃষ্টলিপি, অলকা তাহার বাসস্থান হইতে পারে না; তাই কুবের তাঁহাকে দুঃখময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিরহ ভিন্ন অন্য তাপ অলকাবাসীদের হইতে পারে না, এই জন্য কুবের সেই বিরহমাত্র শাস্তিরই বিধান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অলকায় বিরহ তাদৃশ দারুণ হইতে পারে না, কারণ মহাদেবের তথায় বাস, এইজন্য তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠান হইল।

পাঠাইয়া দিলেন তো রামগিরিতে কেন? আন্ডামানে দিলেই তো ঠিক হইত। কিন্তু না, — যক্ষের যাহাতে বিরহ যন্ত্রণা অতি তীব্র হয়, সেই জন্য— কালিদাস তাহাকে রামগিরিতে আনাইলেন। কালিদাস জানিতেন রামায়ণ দেবলোক ও দেবযোনিদিগের সুপরিচিত। রাম ও সীতা যেখানে পরস্পর সহবাসে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, যক্ষকে সেইখানে উপস্থিত করিলেন। সেখানকার প্রত্যেক তরু রামচন্দ্রের সুখের সাক্ষী; সেইখানে যক্ষ প্রিয়া-বিরহিত, স্বদেশ-নির্বাসিত। যক্ষরাজ রামায়ণের সেই-সকল কথা স্মরণ করিতেন। রামচন্দ্র নির্বাসিত হইয়া যে সুখভোগে অযোধ্যার কথা কথঞ্চিত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখও লেখেন নাই; তাই যক্ষ বলিয়াছেন যে বনদেবতারাও তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। বোধ হয় ভবভূতিও যক্ষের এই অবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম

করিয়াই উত্তররামচরিত-এ রামকে আবার পঞ্চবটীবনে আনিতে সাহস এবং তাঁহাকে সীতার ছায়া দেখাইয়া ও বনদেবতাদিগের দয়ার পাত্র করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছেন। যক্ষও দিবানিশি রাম সীতার এই ছায়া দেখিতেন এবং তাহাই দেখিয়া তিনি এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সে গিরির যেখানে যেখানে জল ছিল, অর্থাৎ নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, উৎস, প্রবাহ, নদী, ক্ষুদ্র নদী ছিল, জনক-তনয়া সর্বত্রই রামের সহিত স্নান করিয়াছিলেন। যক্ষ সর্বদাই সেই-সকল স্থানে রাম ও সীতার ছায়া দেখিতেন। কালিদাস এই-সকল কথা বলিবার জন্যই "জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু" অর্থাৎ "যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল" এই বিশেষণটি দিয়াছেন।

যক্ষ রামগিরিতে বসিয়া কী করিতেন? তিনি কখনো কখনো প্রিয়ার প্রতিমূর্তি প্রস্তরে লিখিয়া তাহার চরণস্থলে আপনাকে স্থাপন করিতেন। হরিণীর চঞ্চল নয়ন দেখিলে প্রিয়ার নয়ন তাঁহার মনে পড়িত, পূর্ণচন্দ্র দেখিলে প্রিয়ার মুখচ্ছবি তাঁহার প্রাণ আকুল করিত, ময়ূরের পুচ্ছ দেখিলে তিনি প্রিয়ার কেশপাশভ্রমে তাহার বেশ বিন্যাস করিতে অগ্রসর হইতেন; ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে তাঁহার বোধ হইত, নৃত্যকালে তাঁহার প্রিয়ার ভ্রূযুগল কম্পিত হইতেছে। কিন্তু তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াও কোথাও প্রিয়ার সম্পূর্ণ উপমা না পাইয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ভূমিতলে বসিয়া রোদন করিতেন। কখনো কখনো স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়ার সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময় জাগরিত হইয়া দেখিতেন, চারিদিকে টপ্ টপ্ করিয়া শিশিরবিন্দু পড়িতেছে। তখনই তাঁহার বোধ হইত বনদেবতারা আমার দুঃখ দেখিয়া কান্দিতেছেন, অমনি তিনি সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইতেন। উত্তরদিক হইতে বায়ু বহিতে লাগিল, তিনি সে বায়ু বক্ষে গ্রহণ করিতেন, ভাবিতেন যে ইহারা অবশ্যই আমার প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে।

এইরূপে অতি কষ্টে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই আট মাস্ কাটিয়া গেল। ভাবনায় তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গেল; তাঁহার ক্ষীণ হস্ত হইতে বলয় খসিয়া পড়িল। এমন সময়ে সর্বপ্রথম মেঘ দর্শন দিল; মেঘ দেখিলে প্রিয়সহবাসেও লোকের মন উৎকণ্ঠিত হয়; বোধ হয় যেন কিছু হারাইয়াছি, বোধ হয় যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না। কিন্তু যাহারা

প্রিয়বিরহী, বলো দেখি তাহাদের মন কত ব্যাকুল হয়; তাহারা ভাবে যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব না, তাহা না পাইলে আমাদের জীবনের প্রয়োজন নাই। যাহার জন্য জীবন, যাহাতে সুখ, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এ নিঃসার অপদার্থ ভারভূত দেহে প্রয়োজন কী? গরিব যক্ষ মেঘ দেখিয়া খেপিয়া উঠিল। মেঘ যে জড়পদার্থ, ধূমময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, একথা তাহার মনেও রহিল না; মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে। আহা! আমার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে কিনা, যদি থাকে, মেঘ দেখিলে সে আর প্রাণ রাখিতে পারিবে না; যে দূরে আসিয়াছি, সংবাদ দিবার, সংবাদ লইবার লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটি খবর পাঠাইতে পারি, হয়তো প্রিয়া বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। সে এই ভাবিয়া কতকগুলি কুর্চির ফুল তুলিয়া মেঘকে অর্ঘ্য দিল, দিয়া বলিল "মেঘ! তুমি বড়ো বংশে জন্মিয়াছ, তুমি সন্তপ্তদিগের দুঃখ বিমোচন করো, আমি অতি কাতর, তোমার শরণাগত, আমার দুঃখ দূর করো; তুমি ইন্দ্রের প্রধান অমাত্য, তোমার অগম্য স্থান নাই, আমার বিরহে প্রিয়ার প্রাণ মলিন কুসুমের ন্যায় অতি কষ্টে বৃন্তে লাগিয়া আছে। কখন খসিয়া পড়িবে জানি না; তুমি তাহাকে গিয়া আমার এই সংবাদটি দিবে। তাহা হইলে একটি স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা হয়; আমি আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম, তুমি ভায়ের কার্য করো; মনে করিও না যে আমার প্রিয়ার—আহা! —কিছু হইয়াছে, তাহার এখনও আশা আছে আমি ফিরিয়া যাইব; কিন্তু বোধ হয় সে ম্লানকুসুম আর বৃন্তে থাকে না; তুমি যাও, গিয়া তাহাকে আমার সংবাদ দিয়া জীবিত করো"। এই কথা বলিতে বলিতে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, যক্ষের চক্ষে মেঘের যা-কিছু জড়ত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হইল; তিনি মেঘকে শুভক্ষণ সুযাত্রা দেখাইয়া দিলেন; বলিলেন, "বলাকাকুল তোমার পথ দেখাইয়া যাইবে; বলিলেন পথিক-রমণীগণ তোমায় আশীর্বাদ করিবে; তুমি দ্রুত যাও।" যাহাতে মেঘের পথে কষ্ট না হয় তাহার জন্য যক্ষ এই সময় যে-সকল উপদেশ দিয়াছিল তাহা পাঠ করিলেই বোধ হইবে যে, সে মেঘকে বাস্তবিকই মানুষ বলিয়া ভাবিয়াছিল, এবং মেঘের জন্য বাস্তবিকই সহানুভূতি অনুভব করিয়াছিল।

এই সময়ে মেঘকে পথ বুঝাইয়া দিবার ছলে কালিদাস যে-সকল দেশ, নগর, নদী, পর্বত ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ লেখকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে-সকল দেশ কোথায়? এবং এখন খুঁজিয়া

সে-সকল পাওয়া যায় কি না প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার সন্ধান করুন। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে চাই যে হিন্দু কবিগণ জড়জগতকে দূর হইতে দেখিতেন; তাঁহারা দেখিতেন জড়জগৎ নিম্নে, অন্তর্জগৎ উপরে। সংস্কৃত কবিরা জড়জগতের সহিত মিশিয়া জড়জগতের বর্ণনা করিতে ভালোবাসিতেন না, তাঁহারা উপর হইতে জড়জগৎ দেখিতেন। কালিদাস বলো, ভবভূতি বলো, এই চক্ষেই জড়জগৎ দেখিয়াছেন, আর এই চক্ষে দেখিলেই জড়জগতে যথার্থ প্রকাণ্ডতা, যথার্থ সৌন্দর্য, যথার্থ মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারা যায়। কালিদাস এই চক্ষে জড়জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া অদ্য পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম।

গতবারের বঙ্গদর্শনে মেঘদূত-এর সমালোচনায় আমরা কলাদিাসের স্বভাব-বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ছাড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে।

হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর। জড়জগৎ প্রাণিজগতের তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মনুষ্যের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাঁহারা একথা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা যেখানে যেখানে দুঃখ ঘটাইয়াছেন, সেইখানে সেইখানেই আবার সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার সেই সংস্কারের বশেই তাঁহারা, মানুষ জড়জগতের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া জড়জগতের শোভা অনুভব করিতেছে, একথা লিখিতে সাহস করেন না। তাঁহারা দেখান, মানুষ উপরে, জড় জগৎ নিচে; মানুষ জড়জগৎ হইতে ভিন্ন, পৃথক এবং উহার দ্রষ্টা সাক্ষী মাত্র। এরূপ বর্ণনা রঘুবংশে ত্রয়োদশে, শকুন্তলায় সপ্তমে, ভবভূতির মহাবীরচরিতে[৪] শেষ অঙ্কে। সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। ভারবি অর্জুনকে জড়জগতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষে উর্ধ্বে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেইখান হইতেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর মনের গতিই এই। এখন কৃতবিদ্য বাঙালি কবিগণ মনুষ্যকে এইরূপে জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘদূত-এর স্বভাববর্ণনাও তাহাই। মেঘ উচ্চ হইতে পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, বন, উপনগর, নগরী কিরূপ দেখিবেন তাহাই লইয়া

কবি ব্যস্ত হইয়াছেন। ইংরাজি সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা কম। তাঁহাদের এক কথা আছে 'Bird's eye view', কিন্তু সে অতি সামান্য চিত্রমাত্র। একটি পর্বতেরই না হয় 'Bird's eye view' তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের কবিরা চিরকালই সমস্ত জগতের 'Bird's eye view' লইয়া থাকেন। তাঁহাদের নায়কেরা সমস্ত জগতের উপর চটিয়া মনুষ্য-সমাজে সুখ না পাইয়া জড়জগতের সহিত মিত্রতা করিতে আসেন না। যখন সুখে বা দুঃখে সমস্ত মন ডুবিয়া যায়, যখন কেবল মন একটি মাত্র বাসনায় মগ্ন হয়, সেই সময় আমাদের কবিরা হয় সুখের বৃদ্ধি বা দুঃখের সমতার জন্য জড়জগতকে আনয়ন করেন। Childe Harold যে চক্ষে জড়জগৎ দেখিয়াছেন, সে চক্ষে আমাদের কবিরা জড়জগৎ দেখেন না। যে মনের অবস্থায়, যেরূপ হৃদয়ের উন্মত্ততায় Skylark কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায়ই আমাদের কবিরা জড়জগতের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক বাধাইয়া দেন। তাহাতে স্বভাবের শোভা দ্বিগুণিত হয়, মনুষ্যের অন্তরের শোভাও বর্ধিত হয়।

কালিদাস এইরূপ উন্মত্ত অবস্থাতেই মেঘকে আনিয়া যক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। যক্ষের Spirit মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চলিল; সমস্ত স্বভাবে তাহার গাঢ় সহানুভূতি হইল; সম্মুখে দেখিতে যক্ষ মেঘকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু যক্ষও সেই পথে যাইতেছেন। মেঘ যেন যক্ষের আত্মা। সে যেন পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া মেঘ হইয়া যাইতেছে; যাইবার সময় মেঘদূত-খানি মনে মনে লিখিয়া যাইতেছে। সে যেন দেখিতেছে, দূরে নর্মদা উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রিয়া কত দূরে। রেবা দেখা যায়, কিন্তু যক্ষপ্রিয়া লোচনের অদৃশ্য। এইরূপে ক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তর কৈলাস পর্যন্ত সমস্ত দেশ দেখাইয়া কালিদাস মেঘকে অলকায় লইয়া গেলেন। অলকা সুখপুরী; সে পুরীর কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সেই পুরীর মধ্যে যক্ষের বাড়ি; আর সেই বাড়ির মধ্যে সেই "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা" রমণী। সে কী অবস্থায় আছে? যক্ষ বলিতেছেন, "মেঘ, তুমি দেখিবে প্রিয়া হয় আমার মঙ্গলের জন্য পূজা করিতেছে, না-হয় বিরহে আমি কত কৃশ হইয়াছি মনে মনে ভাবিয়া আঁকিতেছে; অথবা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'সারিকে তুই তো তাঁহার বড়ো প্রিয় ছিলি, তাঁর কথা কি তোর মনে হয়?' না-হয় মলিন বসনের উপর ক্রোড়ে বীণা ধরিয়া আমার কথার গান বাঁধিয়া গাইতেছে, আর নয়নজলে বীণার তার ভিজিয়া উঠিতেছে; আর অন্যমনে

সুর ভুলিয়া যাইতেছে; অথবা ফুল দিয়া বিরহের আর কয় মাস আছে তাহাই গুণিতেছে। আহা! সে যখন রুগ্নশরীরে সেই দুগ্ধ-ফেন-ধবল শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া থাকিবে, তোমার বোধ হইবে যেন পূর্ব আকাশে এককলা মাত্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।”

এইখানে যক্ষরাজ তাঁহার প্রিয়াকে যে নিজ বিরহের সংবাদ দিয়াছেন, তত কোমল, তত মধুর, তত গভীর ভাব, বোধ হয় আর-কখনো কোনো কবির হাত দিয়া বাহির হয় নাই। উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন, “We have few specimens either in classical or in modern poetry of a more genuine tenderness or delicate feeling.”[৫] ইহা পাশ্চাত্য কবির কল্পনার অতীত। যক্ষের সংবাদ এইরূপে আরম্ভ হইতেছে, যক্ষ বলিলেন, “তুমি যখন যাইবে, তখন যদি সে নিদ্রা গিয়া থাকে, তাহাকে জাগাইও না; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিও, নিদ্রা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন দেখিবে, তাহার সে সুখের ব্যাঘাত করিও না। তাহার পর জাগিয়া উঠিলে তাহাকে এই মাত্র বলিও যে, ‘আমি তোমার স্বামীর মিত্র মেঘ; তাঁহার সংবাদ লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিরহী প্রবাসীদিগের মন আমি প্রিয়ার জন্য উৎসুক করি, ও ত্বরায় তাহাদিগকে প্রিয়সন্নিধানে প্রেরণ করি।’ এই কথা বলিলেই সীতা যেমন একমনে হনুমানের কথা শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ সে তোমার কথা শুনিবে। তাহার পর বলিবে, ‘সে মরে নাই; সে তোমার কুশলসংবাদের জন্য লালায়িত হইয়াছে; তাহার অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে; সে কেবল মনে মনে তোমার ক্ষীণ অঙ্গ কল্পনা করিতেছে, আর মনে মনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। সাদৃশ্য দেখিলে মনের তৃপ্তি হয়। সে শ্যামামৃগে তোমার শরীরের সাদৃশ্য দেখে; চকিত হরিণী-নয়নে তোমার নয়নের সাদৃশ্য দেখে। কিন্তু হায়! তোমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কিছুতেই নাই। প্রতিকৃতি দেখিলে মনের কষ্ট নিবারণ হয়। সে ধাতুরাগে তোমার ছবি পাথরে আঁকিয়া যেমন তাহার পদতলে পড়িতে যায়, অমনি নয়নের জলে তাহার দৃষ্টি লোপ হয়। তাহার পর স্বপ্নে যদি কখনো তোমার সাক্ষাৎ লাভ হয়, সে তোমায় আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বপ্নে হস্ত প্রসারণ করে, আর তাই দেখিয়া বনদেবীগণের নয়ন দিয়া জলধারা নির্গত হয়। এইরূপে তোমার বিরহে সে এক প্রকার অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।’ মেঘ! তুমি তাহাকে বলিও যেন এই কয় মাস কোনো রূপে কাতর না হয়; তাহাকে ধৈর্য ধারণ করিতে বলিও, আশা এখনো যায় নাই, একবার মিলন হইলে মনের সুখে অলকার সুখ সম্ভোগ করিব।”

এইরূপে মেঘকে সমস্ত সংবাদ দিতে বলিয়া যক্ষের মনে হইল, মেঘকে যে দূত করিয়া পাঠাইব, কিন্তু তাহার অভিজ্ঞান কই? আমি যে উহাকে পাঠাইলাম, প্রিয়া তাহা কী প্রকারে জানিতে পারিবে? তখন যক্ষ কী বলিলেন? অঙ্গুরি খুলিয়া দিলেন, না আর কোনো চিহ্ন পাঠাইলেন? তাহা নহে। কালিদাস বুঝিয়াছিলেন মেঘদূতে এরূপ অভিজ্ঞান চলিবে না। রামায়ণে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু এ প্রেমোচ্ছ্বাসে অঙ্গুরিতে হইবে না। তিনি বলিলেন,

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী স্বস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি।।

"বলেছেন তব কান্ত একথা আবার ঃ—

পূর্বে একদিন তুমি ছিলে ঘুমাইয়া
মম কণ্ঠে দিয়া কর, সহসা চিৎকার
করিয়া কী জন্য কাঁদি উঠিলে জাগিয়া,
হাসি জিজ্ঞাসিলে বহু, কহিলে স্বপনে
দেখেছি বিহার তব ধূর্ত, অন্যসনে।"

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ]

অর্থাৎ, আমার এই দুঃখের আরম্ভ হইবার কিছু দিন পূর্বে তুমি একদিন আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলে, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলে। আমি কেন কাঁদিলে বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় বলিলে, "শঠ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি তুমি আর-এক রমণীর সহিত বিহার করিতেছ।" কী গাঢ় প্রণয়!! কী প্রগাঢ় বিশ্বাস!! আবার ইহাই যক্ষ অভিজ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া দিলেন। এত সুন্দর ও এত কোমলতার আকর যে মেঘদূত তাহাতেও আর দ্বিতীয় নাই— এই জায়গায় বুঝি কালিদাস বাল্মীকির উপর উঠিলেন। হনুমানের অঙ্গুরি অভিজ্ঞানে আর এ অভিজ্ঞানে যত প্রভেদ, বোধ হয় বাল্মীকি আর কালিদাসেও সেই প্রভেদ।

যেমন মধুর গ্রন্থ, মধুর ভাব, সমস্ত মধুময়, উপসংহারে মেঘের প্রতি যক্ষের আশীর্বাদও তেমনি মধুময়। যক্ষ মেঘকে আশীর্বাদ করিতেছেন,

মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।।

"আমি আশীর্বাদ করি যেন বিদ্যুতের সহিত তোমার এমন বিরহ না হয়।" বিরহসন্তপ্তের মুখে ইহা অপেক্ষা আর কী আশীর্বাদ হইতে পারে?

আমরা এতক্ষণ যে রূপে মেঘদূত-এর সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে উহার গল্পমাত্র সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের সমালোচনা মেঘদূত-এর সমালোচনা নহে। নাটক, নভেল ও মহাকাব্যের সমালোচনায় গল্পের সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক। মেঘদূত-এ সমালোচনায় উহার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি মেঘদূত-এর গল্প, ঘটনা, রচনা-প্রণালী কত সুন্দর তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এতক্ষণ লিখিতেছিলাম।

মেঘদূত গীতিকাব্য। যে অর্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতিকাব্য সে অর্থে মেঘদূত গীতিকাব্য নহে। গীতগোবিন্দ গানময়, মেঘদূত ছন্দোময়। যে ছন্দে মেঘদূত লিখিত হইয়াছে, তাহা গীত হইতে পারে সত্য, এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দ গীত হইলে সহৃদয়গণের হৃদয় উন্মত্ত করিতে পারে, তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাতে গান নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে গীতিকাব্য বলিবেন না। না বলুন, আমরা ইহাকেই গীতিকাব্য বলি। কাব্যর বাহ্য আকারের প্রতি আমাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই।

যে স্থলে কোনো একটি ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া, হৃদয়কে অধিকার করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া, আপ্লুত করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া অথবা উচ্ছলিত করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাব-প্রকাশক কাব্যের নাম গীতিকাব্য। যে গানময় কাব্যে এই ভাবের প্রকাশ নাই, আমরা তাহাকে গীতিকাব্য বলি না। যদি গদ্যেও এই প্রকার গভীর ভাব প্রকাশ থাকে, তাহাকেও আমরা গীতিকাব্য বলিতে সঙ্কুচিত হই না।

অন্যে যাহাই বলুক, মেঘদূত আমাদের মতে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। যক্ষের বিরহ প্রথম দিন হইতেই অতি তীব্র হইয়াছিল। রামগিরিতে আসিয়া রাম ও সীতার মিলন-সুখ-সাক্ষী বৃক্ষ, পর্বত ও প্রস্রবণাদি দর্শনে ক্রমেই তাহা তীব্রতর হইতেছিল। কিন্তু এত দিন তাহা মনেই ছিল, আজি আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে যক্ষের হৃদয় সে তীব্র যন্ত্রণায় ভাবপ্রবাহ আর ধারণ করিতে পারিল না। সে ভাব-

প্রবাহ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল। —গরিব যক্ষ পাগল হইল। মেঘকে সচেতন বোধে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আপনার দুঃখকাহিনী বলিয়া নিজের যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিল এবং পরিশেষে সে উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আপনার দূতপদে বরণ করিল। যক্ষের সেই প্রবল স্থায়ী বিরহভাবের সহিত অন্য অন্য সঞ্চারী ভাব মিশ্রিত হইয়া, জড়িত হইয়া, উহাকে যেরূপ পল্লবিত ও সুশোভিত করিয়াছে, তাহার সমালোচনা মেঘদূত-এর প্রকৃত সমালোচনা।

কালিদাস প্রথম চারটি কবিতায় যক্ষের পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, বিরহে তাহার শরীর কৃশ হইয়াছে, কনকবলয় খুলিয়া পড়িতেছে, সে মেঘ দেখিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ মেঘের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া উন্মনা হইয়া রহিল। আপনার অতীত ও বর্তমান অবস্থা মনে মনে তুলনা করিয়া কান্দিতে লাগিল। প্রথম শ্লোকেই বলিল, আমার প্রিয়া দূরে, তাই আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিল, তুমি সন্তপ্তদিগের শরণ, তাই তুমি আমার সংবাদ লইয়া আমার প্রিয়াকে দেও। এরূপ গভীর প্রণয় স্থলে যেরূপ ঘটা স্বাভাবিক, যক্ষেরও তাহাই ঘটিয়াছে। যক্ষ আপনার প্রিয়ার জন্য যত কাতর, নিজের জন্য তত নহে। সেই প্রিয়ার সন্তাপ নিবারণের জন্য মেঘকে দূত করিতে চায়। সমস্ত মেঘদূত-এ বরাবর প্রিয়ার জন্য এই কাতরতা পরিদৃষ্ট হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিরহিণীদিগের জন্যও তাহার কাতরতা দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজ বাক্যে তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছে, 'মেঘ! তুমি আকাশে উঠিলে পথিকদিগের বনিতাগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইবে।' আর-এক স্থানে মেঘকে বলিতেছে, 'যখন সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে অভিসারিকাগণ কান্তভবনে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে স্থিরসৌদামিনী বিস্তার করতঃ পথ দেখাইয়া দিও।' 'সূর্যদেব যখন সমস্ত রাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া বিরহিণী নলিনীর নয়নাশ্রু নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে উদিত হইবেন, তখন যেন তুমি তাহার কর রোধ করিও না।' 'যখন বিরহশীর্ণা কোনো নদী তোমাকে দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তখন প্রচুর জলদানে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া যাইও।' 'যখন মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে পর্বতে আরোহণ করিবেন, তখন তুমি সেই পর্বতে মিশিয়া তাঁহাদের কোমল সোপান হইও।' এই রূপে যক্ষের নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণয়সুখে তাহার সুখ এবং পরের দুঃখে তাহার গাঢ় দুঃখ প্রতিপদে প্রকাশ হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের, মনুষ্যের এবং

মনুষ্যহৃদয়ের সৌন্দর্যে তাহার প্রগাঢ় সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া 'মেঘদূত' কাব্যকে জগতে অতুল করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাবসৌন্দর্যে। রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্বত পর্যন্ত এই সুদূরবিস্তীর্ণ পথে যেখানে যে বস্তু সুন্দর, কালিদাস যক্ষমুখে সেই সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। পর্বতপাদমূলে নিরন্তর প্রবাহিনী নদী, সুপক্ক ভক্ষ্যফল ও প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত কাননমালা, কাননাবৃত পর্বতের অভ্রভেদী উচ্চতা, উজ্জয়িনী নগরে রমণীয় অট্টালিকাশ্রেণী, মহাকাল মন্দিরের সায়ংকালীন আরতি, ষড়াননমন্দিরে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরদিগের উল্বণ নৃত্যলীলা, ব্রহ্মাবর্ত জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ ক্ষত্রিয়যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, হরিদ্বারসমীপে হিমালয় পর্বত হইতে গঙ্গার অবতরণ, তদনন্তর তুষারধবল কৈলাস পর্বত, তন্মধ্যে নগর শিরোমণি-ভূত কুবের-রাজধানী অলকা, অলকায় কুবেরের অত্যাশ্চর্য সমাজশাসনপ্রণালী, যক্ষদিগের স্বর্গসুখ প্রভৃতি অভাবে, শিল্পে, পুরাণে, যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহা দেখিলে হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়, কালিদাস সে সমস্তই দেখাইলেন। ক্রমে ভৌতিক সৌন্দর্য পরিহার করিয়া তিনি মনুষ্য-সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া রমণী-সৌন্দর্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌন্দর্য স্বভাব-সৌন্দর্য হইতে উচ্চতর; উহাই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। যে অনুপম রূপবতীর রূপ পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি, কবি দেখাইলেন সেই রমণীকুলললামভূতা যক্ষপত্নী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, অনবরত অশ্রুপ্রবাহে তাহার নয়ন স্ফীত হইয়াছে। সেই মুখের উপরে তৈলশূন্য রুক্ষ অলকাবলী বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণ মেঘান্তরালে চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কবি তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি সেই পরমরূপবতী পরমগুণবতী পতিপ্রাণা রমণীর চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূতভৌতিক পরিহার করিয়া চিত্তচৈত্তিক জগতে অবগাহন করিলেন। পরমপবিত্র প্রণয়ীর বিরহে পতিপ্রাণা প্রণয়িনীর হৃদয়ের ভাবগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। তিনি দেখাইলেন, যক্ষপত্নী যখন স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতাদের পূজা করিতেছেন, সারিকার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'সখি তুমি তো তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলে, তাঁহার কথা কি তোমার মনে হয়?' কখনো-বা তাঁহার প্রাণনাথ বিরহে কিরূপ কৃশ হইয়াছেন, মনে মনে

তাহাই ধ্যান করিয়া চিত্রপটে তাহাই চিত্রিত করিতেছেন। কখনো বা স্বামীর নাম দিয়া বিরহ-গান রচনাকরতঃ বীণাযোগে তাহা গান করিতে যাইতেছেন। প্রতিবারই নয়নজলে বীণাতন্ত্রী ভিজিয়া যাইতেছে। আর তিনি গানের তানলয় ভুলিয়া যাইতেছেন। কখনো-বা দ্বারদেশে রক্ষিত পুষ্পগুলি গণিয়া দেখিতেছেন, বিরহের আর কতদিন-বা আছে। এই কোমলতার প্রতিকৃতি সমস্ত দিন বরং নানাবিধ মঙ্গলকার্যে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু রাত্রে একাকিনী সেই সুখভবনে, সেই সুখশয়নে তাঁহার আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না, ক্রমাগত পূর্বকথা মনে পড়ে, ক্রমেই হৃদয়ের সন্তাপ বর্ধিত হইতে থাকে। যেমন যক্ষপত্নী কোমলা, তাঁহার প্রণয়ী যক্ষও তেমন কোমলহৃদয়। তিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, 'ভাই রে! যদি সে তখন ঘুমাইয়া থাকে, তাহাকে জাগাস্ না, যদি কোনোরূপে একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্নে আমাকে পাইবে। তাহাকে জাগাইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ দিস্ না।'

যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের জন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্য নর্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে দৌত্যের প্রধান কথা এই— 'তুমি কেমন আছ?'

'তুমি কেমন আছ?' একথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটিতে অনেক পাঠক কোনো নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনো পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সে-ই জানে 'তুমি ভাল আছ?' এই কথার মর্ম কত গভীর। যক্ষ কত বার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই; কত বার ভাবিয়াছে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম 'বৃন্তচ্যুত' হইয়াছে। তাই সে আজি 'তুমি কেমন আছ?' জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

যক্ষের মনে তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে কোনোরূপ অবিশ্বাস নাই, বরং সম্পূর্ণ গাঢ়তর বিশ্বাস আছে। তাই সে বলিয়াছে—

> বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
> প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদ্ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ।।[৬]
>
> [মেঘদূত, উত্তরমেঘ/১০০]

কিন্তু এ অবিশ্বাসের কথা লইয়া মেঘদূত সমালোচনায় আন্দোলন করিবার

প্রয়োজন নাই। এই অকৃত্রিম বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ দৌত্যের দ্বিতীয় কথাটি বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সে কথাটির মর্ম এই— 'এই দারুণ সময়ে তোমারও অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, আমারও তাই। তোমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছে, আমারও সেরূপ হইয়াছে। তোমার যেরূপ দারুণ মনস্তাপ, আমারও তেমনি। যদিও বিধাতা আমাদিগকে দুরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি আমরা যেন সহানুভূতিবলে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।' যক্ষপত্নী যে বিরহে কষ্ট পাইতেছে, তাহার শরীর যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সে বিষয়ে যক্ষের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে যেন সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে।

দৌত্যের তৃতীয় প্রধান কথা এই— 'তুমি ধৈর্য ধারণ করিও। আমি তো নানা উপায়ে আমার চিত্ত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেছি, কোথাও তোমার অঙ্গশোভা দেখিতেছি, কোথাও তোমার নয়নমাধুরী দেখিতেছি, কিন্তু আমার সাধ মিটিতেছে না।'

'আমি কখনো কখনো উত্তর দিক্ হইতে যে বায়ু আসিতেছে, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি। ভাবিতেছি, 'এই বায়ু অবশ্যই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে'। পরক্ষণেই আবার আপনার মূর্খতার কথা ভাবিয়া একান্ত অসহায়, অশরণ ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি! কিন্তু, প্রিয়ে! তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিও।'

দৌত্যের চতুর্থ কথা— আশা। যে আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রণয়ীর হৃদয়কুসুম বৃন্তচ্যুত হইত, সেই আশা। সে আশা আর কিছু নয়, আর চারি মাস বিরহের অবশিষ্ট আছে; এই চারি মাসের শেষে শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে আবার তোমার সহিত মিলিব, আর মনের সাধে এক বৎসর মনে মনে যত সাধ পুরিয়া রাখিয়াছি মিটাইব। কে বলিয়াছে বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয়? আমি তো দেখিতেছি বিরহে ভোগ হয় না, মনের নানা সাধ জমিয়া জমিয়া রাশীকৃত হইয়া থাকে। এই আশ্বাসই দৌত্যের শেষ কথা।

আমরা এই যে নদ নদী, পর্বত কন্দর, বন উপবন, নগর নগরী প্রভৃতি সঙ্কুল পৃথিবী, কল্পনার পরাকাষ্ঠাসম্ভূত কৈলাস পর্বত শিখরোপরিস্থিতা অলকাপুরী, তন্মধ্যে যক্ষের প্রাসাদ, তন্মধ্যে কোমলতার প্রতিকৃতি যক্ষের পত্নী, বিরহে তাহার

ম্রিয়মাণ অবস্থা, এই যে নানা আশ্চর্য আশ্চর্য পদার্থ সন্দর্শন করিলাম, এই যে পৃথিবী হইতে স্বর্গ, স্বর্গ হইতে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম, ভৌতিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া মানস রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া লইলাম, এই সমস্তই এক সুরে বাঁধা। যক্ষের মনোভাব ইহার সকলেই মাখানো। সমস্তটুকু যেন যক্ষ গাইতেছে আর আমরা শুনিতেছি, শুনিতেছি আর তন্ময় হইয়া যাইতেছি। আমাদেরও যেন প্রাণ ফাটিয়া ঐ দুঃখলহরি বাহির হইতেছে। তাই আমরা প্রথমে বলিয়াছিলাম যে, 'মেঘদূত' গীতে রচিত না হইলেও ইহা সর্বোৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, ভুবনে অতুল।

বঙ্গদর্শন

অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন, ১২৮৯॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫ - ১৮৮৬) অনূদিত মেঘদূত-এর নামপত্র : *The Meghaduta* – Translated into Bengali Verse by Rajkrishna Mookerjee M A. & B.L. Calcutta, Printed by Behary Lall Benerjee at Messrs J. C. Chatterjea & Co.'s press, 44 Amherst Street, Published by the Sanskrit Press Depository, 148, Baranoshi Ghose's Street. Price 8 annas [1882]. বইয়ের ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছেন, "আমি যখন বাঙ্গালা পদ্যে মেঘদূত-এর অনুবাদ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অন্য কোন পদ্যানুবাদ আছে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ব মেঘের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পারিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন, আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম। অনুবাদ কালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।"

হরপ্রসাদ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, "আমার বাল্যকালের বন্ধু গুরু ও দেবতা" (হ-র-সং-৩,

পৃ. ৬৩৪)। রাজকৃষ্ণই তরুণ হরপ্রসাদকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত ও বঙ্গদর্শনে লেখার সুযোগ করে দেন। এঁরই লেখা 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) দেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে "প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস" রচনার পথ দেখায়। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র ছোটো এই বইটিকে "মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি" বলে অভ্যর্থনা করেছিলেন। দ্র. "রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী", হ-র-সং-২, পৃ. ৩ - ৯।

২. ফরাসি দার্শনিক Jean Jaeques Rousseau ঝাঁ ঝাক রুশো (১৭১২ - ৭৮) ফরাসি মানসে বিপ্লবী চেতনার বীজ বপন করেন। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নীতি প্রচার করেন। মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের উদ্‌গাতা রুশো সর্ববিধ বিরোধ সংঘাত মুক্ত বন্ধুতা এবং সাম্যময় এক আদর্শ বিশ্বের স্বপ্ন দেখতেন।

৩. নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ।।

নীবীবন্ধ-মোচনেতে শিথিল বসন
টানিলে চপল করে বল্লভ সকল
তথা অনুরাগভরে, বিম্বাধরাগণ
লাজভরে অতিশয় হইয়া বিকল,
তুঙ্গশিখ রত্নদীপ সম্মুখে পাইয়া
নিবাইতে যায় বৃথা চূর্ণ নিক্ষেপিয়া।।

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ]

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ।।

চন্দ্রাতপ-সূত্রে গাঁথা চন্দ্রকান্তমণি
তথা মেঘমুক্ত নিরমল চন্দ্রকরে
স্ফুট - জলকণাস্রাবী হইয়া অমনি
নিশীথে কান্তার রতিজাত গ্লানি হরে,
যখন কান্তের কোলে গাঢ় আলিঙ্গনে
ক্লান্ত হয় অতিশয় কুলাঙ্গনাগণে।।

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ]

৪. মহাবীরচরিতম্-এর শেষ বা সপ্তম অঙ্কের ঘটনা লঙ্কা বিজয়ের পর রামচন্দ্রের বিমানযোগে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক। বিমান থেকে রাম সীতা লক্ষ্মণ নিচের ভূপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছেন এবং তাঁদের সংলাপে ভূদৃশ্যের বর্ণনার সঙ্গে অপহৃতা সীতাকে সন্ধান করে ফেরার সময়ের দুঃখময় স্মৃতি বিজড়িত হয়ে যাচ্ছে।

৫. Horace Hayman Wilson হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬ - ১৮৬০) ১৮১৩ খৃস্টাব্দে মূল সংস্কৃত থেকে ইংরেজি পদ্যে মেঘদূত অনুবাদ করেন। নামপত্র The / Megha Duta, / or, / Cloud Messenger / A Poem,/ In the Sanskrit Language / By Calidasa, / Translated into English Verse, / with notes and illustrations, / by Horace Hayman Wilson, / Assistant Surgeon in the service of the Honourable East India Company, and Secretary / to the Asiatic Society. / Published under the Sanction / of the / College of Fort

William / Calcutta : / Printed by P. Pereira, at the Hindoostance Press. / 1813. উদ্ধৃতিটি এই বইয়ের ভূমিকা থেকে নেওয়া। এই বইয়ের ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠায় প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্র.।

৬. সৌভাগ্যের অভিমান আমাকে বাচাল করে দিচ্ছে না। হে ভাই, আমি যা বলছি তা অচিরে সবই তোমার প্রত্যক্ষ হবে।

রঘুবংশ

আমরা অদ্য কালিদাসের রঘুবংশ সমালোচনা করিব। অনেকে মনে করেন, রঘুবংশ-ই কালিদাসের কাব্যসমূহের মধ্যে অপকৃষ্ট। কেহ বলেন উহা কাব্যই নহে। কেহ বলেন, উহা পুরাণ; কেহ বলেন, উহা ইতিহাস। একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, রঘুবংশ কালিদাসের কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি; প্রথম দিলীপসুদক্ষিণা, তাহার পর রঘুদিগ্বিজয়, তাহার পর অজেন্দুমতী, তাহার পর দশরথের মৃগয়া, তৎপরে রামায়ণ, তৎপরে কুশোপাখ্যান, তাহার পর অতিথির রাজনীতি ও সর্বশেষে অগ্নিবর্ণের দুশ্চরিত্র— এই কয়েকখানি কাব্য কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন, শেষ কোনো অজ্ঞাত কারণবশত জুড়িয়া একখানি কাব্য আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ কোনো মতেই মত দিতে পারি না। আমাদের মতে রঘুবংশ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, ইহা কাব্যসংগ্রহ নহে, একখানি কাব্য। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ইহার উদ্দেশ্য আছে, একতা আছে, উপদেশ আছে, এবং গভীর অর্থ আছে। রঘুবংশের দৈর্ঘ্যই উহার নিন্দার কারণ। এই সুদীর্ঘ কাব্য অনেকে পড়িয়া উঠিতে পারেন না। দুই-চারি সর্গ পড়িয়াই শেষ করেন, ও একটা যা হয় সমালোচনা করিয়া বসেন। কালিদাসের রঘুবংশ যত অধিক দূর পড়িবে, ততই উহার সার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ সর্গ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার এরূপ দীর্ঘকাব্য যত অধিক পড়িবে ততই উহার নির্মাণকৌশল অবগত হইতে পারিবে। ফলত যখন প্রথম পড়িবে, তখন সব ছাড়া ছাড়া লাগিবে। দ্বিতীয় বারে কতক বোধ হইবে উহার একতা আছে। তৃতীয় বারে একতা ও গূঢ়ার্থ স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। রঘুবংশ সমালোচনা সম্বন্ধে এইরূপ নানা মুনির

নানা মত আছে বলিয়াই কালিদাসের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা রঘুবংশের সমালোচনা অধিক প্রয়োজনীয়।

আমাদের বিশ্বাস রঘুবংশই কালিদাসের শেষ লেখা, আমরা সর্বাগ্রে এই কথাটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। এই কথাটি বুঝিতে পারিলেই রঘুবংশের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমত রঘুবংশের রচনায় গাম্ভীর্য ও বৃদ্ধজনোচিত অলংকারসাহিত্য দৃষ্টিগোচর হয়। কুমারসম্ভব অলংকার ও ভাব (Sentiment) রাশি রাশি পরিলক্ষিত হয়। রঘুবংশের সর্বত্র কবিকল্পনার ধীরতা ও কুমারে প্রাখর্য দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, যখন বয়স অল্প থাকে, তখনই কল্পনার দৌড় অধিক হয়, বর্ণনার কড়াকড়ি অধিক হয়, ভাষার নানারূপতা হয়। তখন বহুদর্শিতা অল্প, হঠাৎ মনোহরণের চেষ্টা অধিক হয়, অলৌকিক বর্ণনার প্রয়াস অতিরিক্ত হয়। লোকের মনে উন্নত ভাব উদয় করিবার চেষ্টা, উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা, ও অদ্ভুত নূতন পদার্থ গঠনের চেষ্টায়ই কবি ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকেন। কুমারসম্ভবে এই সকলগুলিই লক্ষিত হয়। কল্পনার দৌড় হিমালয় বর্ণনা [১।১-১৭]। হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কবি স্বভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। পার্বতীর রূপ বর্ণনায়ও কবি স্বভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন [১।৩১-৪৮]। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, নিজের কল্পনায় সন্তুষ্ট না হইয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন,

সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাৎ
একস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব।।[১] [১।৪৯]

ইহার অর্থ এই যে, হায় আমি আর বর্ণনা করিতে পারিলাম না। বয়স হইলে কল্পনার এত তীব্রতা দেখা যায় না । যুবক কবির অতৃপ্ততা কুমারের প্রতি পত্রে অঙ্কিত। বর্ণনার বাড়াবাড়িও অল্প বয়সের গুণ। অজবিলাপ ও রতিবিলাপ তুলনা করো।[২] রতিবিলাপের বিষয় অল্প, ভাব অধিক; বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। কবি একবার রতিকে নিরস্ত করাইলেন, আবার বসন্তকে আনাইয়া খানিক কাঁদাইলেন! পার্বতীর বিবাহবর্ণনা দেখ [৭।৭৩-৮৫]। রঘুবংশ ও কুমারে অনেকগুলি শ্লোকই এক; কিন্তু কুমারে বিবাহবর্ণনা অনেক অধিক। রঘুতে কয়েকটি মাত্র শ্লোক [৭।২০-২৮]।,

কিন্তু যেমন রঘুবংশ-এর বিবাহটা বড়ো জাঁকাল ব্যাপার, কুমার-এর বিবাহটা যেন তেমন নয়। কুমার-এর বিবাহটা বেশি বড়ো বলিয়া যেন একটু বিরস বিরস। কুমার-এর ভাষাও নানা স্থলে নানারূপ। অনেক জায়গায় যেন শক্ত শক্ত। অনুষ্টুপ ছন্দের সর্গগুলিতে যেন কিছুই নাই। শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইব, চেষ্টাটাও যেন অধিক। কিন্তু রঘুতে সেরূপ নহে, ভাষা প্রায়ই সর্বত্র সমান সরল। তাহার উপর আবার বিষয়মাহাত্ম্যে কখনো উঠিতেছে, কখনো পড়িতেছে। কুমারে যেখানে সোজা সেখানে খুব সোজা, যেখানে কঠিন সেখানে অভিধান নহিলে চলে না। একেবারে হঠাৎ মনোহরণের চেষ্টাটাও কুমারে অধিক। একটা উদাহরণ দিব। কুমার-এর হিমালয় বর্ণনায় "স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"[৩] [১।১] এই কথার ভাবে আর রঘুতে সমুদ্র বর্ণনায় "বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা"[৪] [১৩। ৫] এই কথার ভাবে একবার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, কুমার-এর একটা অভূতপূর্ব পদার্থের উৎপ্রেক্ষা করিয়া ধাঁধা দিবার চেষ্টা, আর রঘুতে ধীরভাবে উপমাদ্বারা স্বরূপ বর্ণনা। অলৌকিক বর্ণনার প্রয়াসও অল্প বয়সের প্রয়াস। কুমারসম্ভবময় অলৌকিক বর্ণনা, মহাদেব কল্পনাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ, পার্বতী স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণী; তাহার পর ইন্দ্র অলৌকিক, মদন অলৌকিক, রতি অলৌকিক, সবই অলৌকিক। যখন বহুদর্শিতা অল্প, অথচ কল্পনা মহীয়সী, অলৌকিক বর্ণনাটা সেই সময়েরই বর্ণনা। রঘুতে অলৌকিকের এত বাড়াবাড়ি নাই, লোকে যাহা দেখে, লোকে যাহা শুনে, লোকে যাহা শিখে, তাহার উৎকৃষ্ট বস্তুই লইয়া রঘুবংশ। উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদানের চেষ্টা বাল্যবয়সের কবিদের এক রোগ। সেটা প্রথম পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। আলৌকিক প্রণয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভব-এর সৃষ্টি হইয়াছিল। পার্বতী সমস্ত ত্যাগ করিয়া পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধু সমস্ত আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া নিজের জীবন তৃণতুল্য তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর পদার্থ অনুশীলনে রত। তিনি প্রথমে পার্বতীকে লক্ষ্যের মধ্যেই গণ্য করিলেন না, তাহার পর তাঁহার প্রথম প্রণয়োদয় সময়েই প্রণয়ে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু পার্থিব, যাহা কিছু জঘন্য তৎসমুদয়ের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ মদন ভস্ম হইয়া গেল— কালিদাস দেখাইলেন যে-প্রণয়ে মদন ভস্ম হয় সেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা, তাহা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমহাদেব এই সার মর্ম বুঝিয়া তত্ত্বচিন্তা ত্যাগকরত পার্বতীর সেই অতুল প্রেমে মগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় লোকের এত

দুর দৌড় থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কালের লেখা। রঘুবংশ-এর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক সময়ের লেখা। ইহার সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বস্থানে এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জীবে, সহানুভূতি জাজ্বল্যমান। যে কয়েকটি রাজার বর্ণনা করা হইয়াছে, সকলেই অতি উদারচিত্ত। একজন লোককে সর্বগুণময় করিয়া বর্ণনা করিতে গেলে, হয় অত্যুক্তি হয়, না-হয়, একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়। কালিদাস একথা বুঝিয়া মনুষ্যশরীরে যত গুণ থাকা আবশ্যক রঘুবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সেই সমুদয় যথাযথরূপে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মবল, ক্ষত্রবল ও দৈববল এই তিনে রঘুবংশ-এর উৎপত্তি। বশিষ্ঠের মতে সুরভি কন্যার আরাধনায় মহারাজাধিরাজ দিলীপের রঘু নামে সন্তান হইল, নন্দিনীর বরে তিনি বংশপ্রবর্তক হইলেন; কারণ রাজা বর চাইলেন "বংশস্য কর্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে"[৫] [২।৬৪]। তিনি বাল্যকালে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার দশবিধ সংস্কারকার্য সমাধা করিলেন। তিনি কিশোর অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃকৃত অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন করাইলেন। রাজভার প্রাপ্ত হইয়াই সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিলেন। ভূমণ্ডল জয় করিয়া সমস্ত ধন বিতরণকরত বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। পরে মৃন্ময়পাত্র যখন সম্বল, তখন এক ব্রাহ্মণ চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিল, রাজা কুবেরের নিকট অর্থ আনিতে যাইতেছেন, কুবের স্বয়ং আনিয়া টাকা তাঁহার রাজকোষে রাখিয়া দিল। কালিদাস বলিলেন, এইরূপ লোকই বংশপ্রবর্তক হইতে পারেন। ইনি দয়াবীর, দানবীর, যুদ্ধবীর ও ধর্মবীর। কালিদাস ইহার হৃদয়ের ভাব-সকল দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইঁহার পুত্রবাৎসল্য, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রমণীপ্রণয় কালিদাস বর্ণনা করেন নাই। কালিদাস রঘুর পুত্র অজের জন্য সেগুলি সমস্ত তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। অজ সকল বিষয়েই ঠিক পিতার ন্যায় "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"[৬] [৫।৩৭]। অজ একেশ্বর সমবেত রাজন্যবর্গের পরাজয় সাধন করিলেন। সুতরাং তিনি বীর। তিনি সমস্ত রাজমণ্ডলীর মধ্যে রূপবান্। তাই ইন্দুমতী মালা দিলেন। তিনি অতি মায়াবী। পিতা যখন রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে চাহিলেন, অজ সেটি সহ্য করিতে পারিলেন না। "....শিরসা বেষ্টনশোভিনা সুতঃ / পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ"[৭] [৮।১২]। পিতাকে কাছে রাখিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। রঘুর বংশ লইয়া রঘুবংশ, তাই রঘুকে কালিদাস পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শেষেও রঘু অতি প্রাচীন বয়সে যোগসমাধিতে প্রাণত্যাগ

করিলেন। পিতৃবিয়োগদুঃখ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে রাজা অজ উদ্যান বিহারে গমন করিলেন; তথায় তাঁহার এক সাধের প্রণয়িনী ইন্দুমতী প্রাণপরিহার করিলেন। অজের কোমল হৃদয় আর সহিতে পারিল না। তিনি যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে পত্নীবিয়োগসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ কতক কতক বুঝিতে পারেন। আজিও ভট্টাচার্য মহাশয়েরা পত্নীবিয়োগের ভয়ে আজবিলাপ পাঠ করেন না। তাঁহার কোমল হৃদয় সেই দুঃখেই মিলাইয়া যাইত। কিন্তু পুত্র নাবালক, এখন আত্মহত্যা অন্যায়; অতএব পুত্রের সাবালকতা পর্যন্ত আট বৎসর জীবন ধারণ করিয়া মহারাজ অজ— মূর্তিমান্ প্রণয় তীর্থজলে শরীর ঢালিয়া দিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা দশরথ। কালিদাস দশরথের বনবিহার মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন দশরথ বড়ো মৃগয়াপ্রিয়; উন্মত্ত হইয়া অনবধানক্রমে একজন ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রাণ নাশ করেন। এই পবিত্র বংশে প্রথম দোষ প্রবেশ করিল। রাজ্য সুশাসিত; সমস্ত সচ্ছল; রাজা দশরথ আর কাজ না পাইয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ান। তিনিও পিতৃপিতামহবৎ অশেষগুণময়; কিন্তু মৃগয়াদোষ। মৃগয়ায় আসক্ত বলিয়া পবিত্র বংশে দোষ প্রবেশ করিল। প্রথম ঘুণ ধরিল।

এই সময়ে ভগবান নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি রঘুবংশেই জন্মগ্রহণ স্থির করিলেন। রাজাও অনেক দিন সন্তানসন্ততি না হওয়ায় নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেছিলেন। সুতরাং নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইলেন। রঘুবংশের রামচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। এই রঘুবংশের সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি। বাল্মীকির রাম (ideal) মনুষ্য; সদ্‌গুণময় মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ। কালিদাস বাল্মীকির রামটি চুরি করিয়া লইলেন; অর্থাৎ দেখাইলেন, রঘু, অজ ও দশরথের বংশে যিনি রাজা হইবেন তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। রামায়ণ-এর রাম আর রঘুবংশ-এর রাম কিছুতেই ইতরবিশেষ নাই। কেবল এই যে, রামায়ণ-এর রাম একখানি ছবিতে একটি প্রতিকৃতি; আর রঘুর রাম একখানি আলেখ্য, অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির মধ্যে সকলের চেয়ে ভালটি। সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে রামায়ণ অপেক্ষা রঘুবংশে সমধিক কারিগরি আছে। রামের মৃত্যুর পর রাজত্ব ভাগ হইয়া গেল। অযোধ্যা নগর আর রাজধানী রহিল না। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্যত্র রাজধানী করিলেন, অযোধ্যা ক্রমে ভগ্নাবশিষ্ট নগরীতে পরিণত হইতে লাগিল। মহারাজ কুশ অত সুন্দর নগরীর দুর্দশা দেখিতে না পারিয়া আপন রাজধানী অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিলেন। বংশক্রমাগত

গুণ অপেক্ষা তাঁহার সুন্দর পদার্থের প্রতি অনুরাগ অধিক। তিনি অযোধ্যার অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। কালিদাস তাঁহার রাজত্বের আর-একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, সে জলক্রীড়া। যখন রাজা নগর সাজাইতে আর জলক্রীড়ায় মত্ত হইলেন, তখন দশরথের সময় যে ঘুণ ধরিয়া আসিয়াছিল তাহাই বাড়িয়া উঠিল। শত্রুহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে মহারাজ কুশের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অতিথি পণ্ডিত ছিলেন; তিনি রাজ্যশাসনের পরম সুব্যবস্থা করিলেন অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে যাহা আছে তাহাই রাখিয়া যাওয়া শ্রেয়। রাজার মনে যখন এরূপ ভাবনা উদয় হয়, সে রাজ্যের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় না। অতিথির পর এক এক করিয়া অনেকগুলি রাজা হইলেন। কিন্তু কালিদাস তাঁহাদের আর বিশেষ বর্ণনা করিলেন না। ইহারা পৈতৃক নামে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। শেষে রাজা নাবালক হইলেন। নাবালক রাজা মন্ত্রিগণের নিকট বেশ শিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু অল্প দিনেই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ রাজা হইয়া অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হইলেন, এবং রাজযক্ষ্মারোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার গর্ভবতী ভার্য্যার গর্ভকে অভিষেক করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। রঘুবংশ শেষ হইল। কেহ বলেন, রঘুবংশ-এর আর তিন সর্গ আছে। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহাদের বোধ হয় কাব্যালোচনাশক্তি নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, অগ্নিবর্ণের পর আর রঘুবংশ বর্ণনার প্রয়োজনই নাই। তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

কালিদাস কুমার লিখিলেন, শকুন্তলা লিখিলেন, মেঘদূত লিখিলেন, আরো অনেক গ্রন্থ লিখিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ রহিল যে, কোথাও সমস্ত ভুবনের একটি একীকৃত বর্ণনা করিতে পারিলেন না। আর তাঁহার ক্ষোভ রহিল যে সকল কাব্যই সুখে শেষ করিতে হয়, না করিলে সামাজিকেরা ভালো বলে না। বিয়োগান্ত কাব্য হইতে পারে, এটা এদেশীয় সামাজিকদিগের বিশ্বাসই ছিল না। সুতরাং সংসারের যথার্থ চিত্র দেওয়া হয় না। সামাজিকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বিয়োগান্ত নাটক লেখা সুবিধা নয়। তাহাতেই একটি বংশের অদৃষ্ট সম্যকরূপে বর্ণনা করিয়া মনুষ্য-অদৃষ্টের যথার্থ চিত্র দেখাইলেন। আর-একখানি কাব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের অনুকরণ দেখাইলেন। এই জন্যই পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, রঘুবংশ কালিদাসের উৎকৃষ্ট কাব্য এবং নানা কারণে উহা তাঁহার শেষ লেখা ও অনেক বহুদর্শিতার ফল।

~~~~~~

২

কালিদাসের ঋতুসংহারে মঙ্গলাচরণ নাই, কুমারসম্ভবে মঙ্গলাচরণ নাই, মেঘদূত-এও মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু রঘুবংশে মঙ্গলাচরণ আছে। রঘুবংশ লিখিবার সময় কালিদাসের ধর্ম্মবুদ্ধি গভীর ও প্রবল হইয়াছিল। কোনো গ্রন্থে কালিদাস, আমি যে একান্ত অকিঞ্চন, এ ভাব প্রকাশ করেন নাই। কেবল শকুন্তলা ও রঘুবংশে করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলায় লিখিয়াছেন —

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।।[৮] [প্রস্তাবনা]

রঘুবংশে লিখিয়াছেন —

ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।।
অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।।[৯] [১।২-৪]

এই বিনয়পূর্ণ বাক্যদ্বয়ের মধ্যেও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রথম বাক্যটি যদিও বিনয়পূর্ণ, কিন্তু তথাপি আমি যে শিক্ষিত এই অভিমানটি সম্পূর্ণ আছে। ইহা বহুদর্শিতার অভাবের ফল। দ্বিতীয়টিতে এরূপ অভিমানের লেশমাত্রও নাই, তাহার প্রতি অক্ষরে বলিতেছে যে আমি নিতান্ত অকিঞ্চন। যেন লেখক স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব কবিরা তাঁহা অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় কিছুই নহেন। এত বিনয় এত অভিমানশূন্যতা যতদিন বয়স থাকে, ততদিন হয় না। কালিদাস এই কয়টি কবিতায় আপনার পূর্ব কবিদিগের যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

এই-সকল বিনয়বচনের পর কালিদাস নিজ মহাকাব্যের বিষয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশ লিখিবার সময় অন্যান্য কাব্য লেখা অপেক্ষা কিছু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যে অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবি কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী লিখিতে কিছুমাত্র ভীত, কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয়েন নাই, রঘুবংশ আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে নানাবিধ দ্বিধার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিষয়ের মাহাত্ম্য, নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও প্রকাণ্ডত্ব ভাবিয়া চমকিত হইয়াছিলেন;
~~~~~~

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই গ্রন্থ লিখিতে বসিলেই বাল্মীকি, বেদব্যাসের সহিত তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সে রঙ্গভূমে তাঁহার জয়লাভ একান্ত সন্দেহাস্পদ। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে, নায়ক নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা সহজ ও চিরপ্রচলিত। তিনি নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজে যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু এবার নূতন ব্যাপার। এ রচনায় নায়ক নায়িকা নাই, বিশ পঁচিশ পুরুষ ধরিয়া একটি বংশের বর্ণনা করিতে হইবে, অথচ সে বংশবর্ণনা পুরানো হইবে না, ইতিহাসও হইবে না, অথচ উৎকৃষ্ট কাব্য হওয়া চাই। কালিদাস মনে মনে বিলক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন সামাজিকেরা তাঁহার গ্রন্থের আদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, কারণ এ গ্রন্থখানি সামাজিকতা, অলংকারের নিয়ম, কবিদিগের চিরপ্রসিদ্ধি সমস্ত অতিক্রম করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বনপূরঃসর লিখিতে হইয়াছে। তাই তিনি সামাজিকদিগকে তোষামোদ করিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিয়াছেন—

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।।[১০] [১।১০]

আমরা এ কবিতার এরূপ অর্থ বুঝিয়াছি— "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার কাব্যখানি গ্রহণ করুন (অর্থাৎ নূতন রকমের কাব্য বলিয়া অবহেলা করিবেন না। যেহেতুক ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আপনারাই কেবল তাহা বুঝিতে পারিবেন। উহা যদি ভালো হয়, গ্রহণ করিবেন; মন্দ হয় পরিত্যাগ করিবেন।" এইরূপ সঙ্কুচিত হৃদয়ে, কুণ্ঠিত অন্তঃকরণে ও ভীত মনে, মহাকবি কালিদাস যে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে,

"..unattempted yet in prose or rhyme."

মিল্টন যদি (*Paradise Lost*) নামক মহাকাব্যের ভূমিকায় [Bk. 1, 16] উহাকে "unattempted yet in prose or rhyime" বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, তবে আমাদিগেরও কালিদাসের উক্ত মহাগ্রন্থকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিবার অধিকার আছে।

বাল্মীকি রামায়ণ মধ্যে আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা ও আদর্শ পরিবার দেখাইয়াছেন। কালিদাস আরো একটু ছাড়াইয়া উঠিলেন। কালিদাসের

~ ~

উদ্দেশ্য আদর্শ বংশ বর্ণনা। ঐ বংশের কোনো ব্যক্তিকে লও, তিনিই কোনো-না-কোনো বিষয়ের আদর্শ। রঘুরাজা দিগ্বিজয়ীর আদর্শ, অজরাজা সহৃদয়তার আদর্শ, রাজা দশরথ বাসনাসক্তির আদর্শ, কুশরাজা রুচিমত্তার আদর্শ, অতিথি নীতিপরায়ণতার আদর্শ; সর্বাপেক্ষা জঘন্য যে অগ্নিবর্ণ, সেও বিলাসিতার আদর্শ। কালিদাস এই আদর্শসমূহের ঠিক মধ্যস্থলে বাল্মীকির সেই আদর্শ মনুষ্যকে বসাইয়াছেন। বসাইয়া, রঘুবংশরূপ প্রকাণ্ড চিত্র হইতে প্রকাণ্ডতর চিত্র নির্মাণ করিয়াছেন ও তাহাতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা সুন্দর, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু প্রকাণ্ড পদার্থ আছে, তৎসমূহ সংযোগে পূর্বোক্ত আদর্শ চিত্রসমূহের একপ্রকার নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অনির্বচনীয়ত্ব সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠকগণ! তোমরা মনে করিও না, কালিদাসের চিত্রসমূহ আলেখ্যলিখিত চিত্রের ন্যায়। উহারা সচল, সজীব ও জীবনময়। কালিদাসের মনুষ্যগুলি অলৌকিক জীবনীশক্তিতে জীবনময়, দেবগণ স্বর্গীয় জীবনীশক্তিতে জীবনময়। কালিদাসের ভৌতিক পদার্থ বর্ণনায় ভৌতিক পদার্থগুলিকে জীবনীশক্তি দিয়া যেন জীবনময় করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এ জীবন বাইরনের জীবনের ন্যায় খরপ্রবাহিত নহে। উহা শান্তিময়, তেজোময় ও সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক। বাস্তবিকই কালিদাসের রঘুবংশ-এর ন্যায় জীবনময় গ্রন্থ সংসারে আছে কিনা সন্দেহ। বড়ো বড়ো কাব্য পড়িতে বসিলে অল্পক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, অত্যন্ত একঘেয়ে। মিলটন বলো, রামায়ণ বলো, মহাভারত বলো, সর্বগুণসম্পন্ন হইলেও ঐ এক দোষে সব মাটি করিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থে ঐ দোষের লেশমাত্রও নাই। যতই পড়িয়া যাইবে, ক্রমেই দেখিবে নূতন নূতন পদার্থ আসিতেছে, বর্ণনা কোথাও লম্বা নহে। যতটুকু বলিলে বর্ণিত বস্তু পাঠকগণের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, তাহার উপর রঘুবংশে কালিদাস একটি অক্ষর অধিক লিখেন নাই।

রঘুবংশ-এর প্রত্যেক রাজাই মনুর অনুমোদিত রাজগুণসমূহে বিভূষিত। তিনি গ্রন্থারম্ভে এই রাজগণের সাধারণ গুণগ্রাম এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্।।

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্।।
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্।।
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।।
রঘুণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন।......[১১][১।৫-৯]

এত গুণ তো সকলেরই ছিল। তাহার উপর আবার কালিদাস দেশগত, পাত্রগত, কালগত, অবস্থাগত ও কার্যগত বিশেষ বিবেচনা করিয়া নানাবিধ নূতন গুণের অবতারণা করিয়া এক-একটি রাজাকে এক-একটি দেবতুল্য করিয়াছেন।

দিলীপ

কালিদাসের প্রথম রাজা দিলীপ। ইনি রঘুবংশের রাজা নহেন, বংশপ্রবর্তয়িতা রঘুরাজার পিতা। কিন্তু কী আশ্চর্য! কালিদাস গ্রন্থারম্ভ করিলেন প্রৌঢ়বয়স্ক এক রাজা আর তাঁহার অতীতযৌবনা এক রমণী লইয়া। তাই না হয় হউক, ইঁহাদের মধ্যেও প্রাণের তরঙ্গ নাই। নাই থাকুক, না-হয় চন্দ্রালোকমধ্যে প্রমোদকাননেই গ্রন্থারম্ভ হউক, তাহাও নহে। গ্রন্থারম্ভ হইল কী লইয়া? না এক বুড়া এক বুড়ি ছেলে হয় না বলে বনের ভিতর দিয়া গুরুর বাড়ি চলিলেন। যদি কালিদাস অল্প বয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মতো "পক্কতাং গতঃ" লোক আর কখনো জন্মায় নাই ও জন্মাইবে না। যদিও কখনো যুবক কবি এইরূপ বুড়া বুড়ি লইয়া গ্রন্থারম্ভ করেন, তাঁহার সহিত বর্ণনীয় বুড়া বুড়ির কিছুমাত্র সহানুভূতি থাকে না, কিন্তু দিলীপ ও সুদক্ষিণার বর্ণনায় কালিদাসের হৃদয় যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। রাজার আকার এইরূপ—

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।।[১২] [১।১৩]

তিনি বড়ো রাশভারি লোক, অথচ তাঁহাকে ভালো না বাসিয়া কেহ থাকিতে পারে না।

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজাবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।।[১৩] [১।১৬]

এসব হৃদয়োচ্ছ্বাসের কথা নয় তো কী? কালিদাস নিজে বৃদ্ধ বয়সে নিজের মনের মতো একটি বৃদ্ধ রাজা গড়িয়া আপনার গ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবেশ করিয়াছেন। কালিদাস এই রাজার বিষয় যত বর্ণনা করিয়াছেন ও ইঁহার বর্ণনায় যত বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়াছেন, আপনার লিপি চাতুর্যের ও অলংকার প্রয়োগ-কুশলতার যত পরিচয় দিয়াছেন, এত বোধ হয় আর-কোথাও দেন নাই। অনেকে বলেন যে, রাজার চরিত্র বর্ণনা একটু লম্বা বিরক্তিকর হইয়াছে। আমারও প্রথম তাহাই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রণিধানপূর্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, কালিদাসের ভাষা অন্যত্র যেরূপ সরল, এখানে তত সরল নহে। উহা গূঢ় অলংকারমালায় পরিপূর্ণ। কালিদাসের কবিতা পড়িবামাত্রেই ভাব ও চিত্র যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। কিন্তু এখানে দেখিলাম, একটু প্রণিধান করা আবশ্যক। আরো বিস্মিত হইলাম কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, রঘুবংশ কালিদাসের বৃদ্ধাবস্থায় লেখা; যখন বুঝিতে পারিলাম, কালিদাস বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধ রাজার গুণ বর্ণনায় নিতান্ত ব্যস্ত; তখন বুঝিতে পারিলাম, কালিদাসের এই বর্ণনায় একটু গূঢ়ত্ব রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই ভাষা তত সরল নহে, একটু গম্ভীর। প্রণিধানপূর্বক পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, কালিদাস এই গাম্ভীর্যময় ভাষার অন্তরালে কী এক চমৎকার স্থবির নরপতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা ধার্মিক, যজ্ঞনিরত, নির্লোভি, প্রজাহিতৈষী, দেবব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দুরাজার যত গুণ থাকা আবশ্যক, তত গুণে ভূষিত। শূর, বীর, দয়ালু, সাহসী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ, বিদ্বান্—রাজা সকল গুণের আধার—

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ।।
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।।

....

স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ।।[১৪] [১।২১-২২, ২৫]

সুদক্ষিণা

কালিদাস সুদক্ষিণার বড়ো বর্ণনা করেন নাই, ভারতীয় অন্যান্য সাধ্বীদিগের ন্যায় সুদক্ষিণার স্বামী ভিন্ন অন্য জীবন ছিল না। তাই বহুদর্শী, বিচক্ষণ কবি সুদক্ষিণার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এমনকী, সমস্ত রঘুবংশে আমরা যে পরিমাণে রমণীবর্ণনা দেখিতে চাই, তাহার কিছুই পাই না। হিন্দু সংসারে রমণীজীবন বিবাহের দিন হইতেই স্বামীতে বিলীন,— উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তাই কালিদাস রমণীচরিত্র লইয়া রঘুবংশে তত বাড়াবাড়ি করেন নাই। প্রাচীন বয়সে রমণী লইয়া বাড়াবাড়িটা তত ভালো দেখায় না। রাজা-রানীর বর্ণনা হইলে পর, কালিদাস মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া রাজা ও রানীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক রথে আরোহণ করিয়াছেন; রথ মেঘের ধ্বনির ন্যায় গুড় গুড় গুড় ধ্বনিকরতঃ বনমধ্য দিয়া প্রস্থান করিতেছে। রাজা ও রানী তদুপরি আরোহণকরতঃ বনশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বনভূমি

কবিদিগের স্বভাববর্ণনায় একটু আশ্চর্য কৌশল আছে। স্বভাব আজিও যেমন, কালিও তেমনি। উহাকে যে চক্ষে যখন দেখিবে, তখন সেইরূপ দেখিতে পাইবে। যখন মন নিতান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, তখন স্বভাবের সকল বস্তুই খারাপ খারাপ বোধ হয়। আবার যখন বড়ো আমোদ, তখন সমস্ত স্বভাব যেন চারিপাশে হাসে। ঐ দেখ প্রৌঢ়বয়স্ক রাজারানী ভক্তিভাবে রীতিমতো সংযত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের চক্ষে সমস্ত স্বভাবই পবিত্র। কালিদাস তাঁহার পাঠকদিগকে একখানি বনভূমি দেখাইয়াছেন। তাহাতে রাজা ও রানীর পবিত্র ধর্মভাব মাখানো। রাজা বনের মধ্যে যা-কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে, সমস্তই আপনার প্রিয়তমাকে দেখাইতে দেখাইতে যাইতেছেন। রাজা ও রানীকে দেখিলে বোধ হয়, যেন চিত্রানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রমার যোগ হইয়াছে। রাজা এইরূপে গল্প করিতে করিতে আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কত পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন তাহা বুঝিতেও পারিলেন না।

আশ্রম

দূর হইতেই আহুতির গন্ধে রাজা বুঝিতে পারিলেন, আশ্রমের নিকটবর্তী হইতেছেন। ক্রমে আহুতির ধূম আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন তেজোময় ঋষিগণ চারিদিক হইতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইতেছেন। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। ঋষিদিগের শরীর হইতে অগ্নিময় প্রভা নির্গত হইতেছে। বোধ হইতেছে, তাঁহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কিনা, তাই অগ্নিদেব তাঁহাদিগকে আগু বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছেন, চারিদিকে হরিণ শিশুরা কুটিরদ্বারে মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঋষিপত্নীরা নীবার-ধান্যগুলি দিনের বেলায় রৌদ্রে শুকাইয়া উঠানে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়াছেন। রাজা প্রথমে রানীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন, পরে নিজে নামিলেন।

বশিষ্ঠ

রাজা যখন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন বশিষ্ঠ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া অরুন্ধতীর সহিত বসিয়া আছেন। রাজা উপস্থিত। ঋষি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি যাহার সমস্ত বিঘ্নবিনাশ করেন, তাহার আবার অকুশল কী প্রকারে হইতে পারে?" রাজার বাক্যপরম্পরার প্রতিপদে তাঁহার অতুল গুরুভক্তি ও ব্রাহ্মণানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে রাজা আপনার অপুত্রকতার উল্লেখ করিয়া নিতান্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন। এ দুঃখ তাঁহার নিজের জন্য নহে— হিন্দুরা নিজের জন্য দুঃখ করিতে কখনো শিখেন নাই। রাজার দুঃখ পূর্বপুরুষদিগের জলপিণ্ড-স্থানলোপ হইবে বলিয়া—

> নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ।
> ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎপরাঃ।।
> মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
> পয়ঃ পূর্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে।।[১৫] [১।৬৬-৬৭]

রাজার অটল বিশ্বাস, তাঁহার গুরুদেব নিশ্চয়ই তাঁহার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন। কারণ তিনি উপসংহারে বলিতেছেন—

ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ।।[১৬] [১।৭২]

বশিষ্ঠদেব এই কথা শুনিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে দেখিলেন, সুরভির কোপই রাজার অনপত্যতার কারণ। কিন্তু সুরভিকে এখন পাইবার যো নাই, অতএব সুরভির কন্যা বশিষ্ঠ-গৃহপালিতা নন্দিনীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুরভির কোপ ক্ষান্ত হইবে ও রাজার সন্তান উৎপন্ন হইবে। অতএব তিনি রাজাকে নন্দিনীর সেবা করিতে পরামর্শ দিলেন। বশিষ্ঠের কথা শেষ হইতে না হইতেই নন্দিনী সমস্ত দিন চরিয়া, হেলিয়া দুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, যখন নাম করিতে নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার কার্য উদ্ধার হইবে। আপনি কল্য হইতে উহার সেবায় নিযুক্ত হউন।" এইরূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ একটি কথায় একজন রাজরাজেশ্বরকে আপনার বাড়ির রাখাল করিয়া তুলিলেন। এবং রাজাও দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালি করিতে রাজি হইলেন।

কালিদাস দেখাইলেন, যে আমা হইতে উচ্চ, তাঁহার কথার বশ হওয়া একান্ত আবশ্যক, নহিলে সংসার চলে না। এইরূপে বশীভূত ভাবে চলিলে সর্বত্রই মঙ্গলের সম্ভাবনা।

বঙ্গদর্শন

কার্তিক ও পৌষ, ১২৯০

প্রাসঙ্গিক তথ্য

রঘুবংশ বিষয়ে হরপ্রসাদ দশটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যার প্রথম প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত এই রঘুবংশ। রঘুবংশ মহাকাব্যের আয়তন, কালিদাসের কোন্ বয়সে লেখা, এর কাব্যমূল্য এসব নিয়ে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বহুমুখী বিতর্ক আছে। রঘুবংশের গাঁথুনি (পৃ. ৪১০-১৬ দ্র.) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মত-সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন। হরপ্রসাদ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা, কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই মত অগ্রাহ্য করেন এবং হরপ্রসাদকে এ ধরনের সাহিত্যবিচার থেকে বিরত করেন। বঙ্গদর্শন-এর লেখকদের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের শাসন-কর্তৃত্বের এটি একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের শাসন মেনে নিলেও হরপ্রসাদ নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আটটি প্রবন্ধে নিজের অবস্থান বিশদ করেছেন।

রঘুবংশ-এর কাব্যমূল্য সম্পর্কে হরপ্রসাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন মনে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন,

"সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ তৎসর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।.....

"কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তিসম্পন্ন হইয়াও এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।। ১।।৩।।

যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলগ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্তিলাভে আভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

"কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্বোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্তর্বর্তী ছিলেন; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সেই সমুদায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। রঘুবংশে সূর্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণনা আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্যন্ত সাত সর্গে দশরথ ও রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।" ('সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কলকাতা ১৯৭২, পৃ. ১০৩-০৪)।

বর্তমানে প্রচলিত ১৯টি সর্গে সম্পূর্ণ রঘুবংশ কাব্যের অনেক সর্গ প্রক্ষিপ্ত এমন মত প্রচলিত আছে। অন্যপক্ষে অনেকে মনে করেন, অগ্নিবর্ণের আখ্যানে যেমন শোকাবহ বিয়োগান্ত পরিণামে শেষ হয়েছে— এভাবে কোনো কাব্য বা নাটক শেষ করা সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যসম্মত নয় (ভিন্‌ট্যরনিটস, Vol III, part-I, P 77) পুরাণে অগ্নিবর্ণের পরে আরও ২৭ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। কালিদাস কি এই ২৭জন রঘুবংশীয় রাজার চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন যা লুপ্ত হয়ে গেছে? (Dasgupta, পৃ. ১৩২, পাদটীকা)।

১. অনুবাদ : একাধারে সামগ্রিক সৌন্দর্য দেখার জন্য বিধাতা পদ্ম চাঁদ প্রভৃতি উপমাবস্তু ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে বিশেষ যত্ন করে পর্বতনন্দিনীকে সৃষ্টি করেছিলেন।

২. এই বইয়ের 'অজবিলাপ ও রতিবিলাপ' প্রবন্ধ দ্র.।

৩. অনুবাদ : পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে বিদ্যমান।

৪. অনুবাদ : নানা অবতারে অবতীর্ণ বিশ্বরূপ নারায়ণের বিরাট স্বরূপের ধারণা করা যেমন জীবের অসাধ্য........

৫. অনুবাদ : সুদক্ষিণার [গর্ভে] যেন কুলরক্ষক অনন্তকীর্তি সন্তান উৎপন্ন হয়।

৬. অনুবাদ : প্রদীপ থেকে (অন্য) দীপ জ্বালিয়ে নিলে যেমন [উভয়ে কোনো পার্থক্য থাকে না]।

৭. অনুবাদ : উষ্ণীষ মণ্ডিত শির (দিয়ে) পুত্র পিতার পায়ে প্রণিপাত করে বললেন, আমাকে পরিত্যাগ করে যাবেন না।

৮. অনুবাদ : বিদ্বজ্জন পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োগকৌশল নিপুণ হয়েছে মানা যায় না। শিক্ষিতব্যক্তিরাও নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারেন না।

৯. অনুবাদ : সূর্যপ্রভব বংশই বা কোথায় আর কোথায় বা আমার স্বল্প বিষয়া মতি (বুদ্ধি), মোহবশে আমি ভেলায় করে সাগর পাড়ি দিতে চাইছি।

(আমি) মূর্খ হয়েও কবিযশপ্রার্থী হয়েছি; সুতরাং বামন যেমন লোভের বশে দীর্ঘ আকৃতি মানুষের পক্ষে (সহজলভ্য) ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে (উপহসিত হয়) আমি (তেমনি) উপহাস্য হব।

অথবা, বজ্র (হীরে) দিয়ে ছিদ্র করা মণিতে যেমন সুতো পরানো সহজ তেমনি পূর্বসূরিদের (বাল্মীকি প্রমুখ কবি) তৈরি বাক্য (রূপ) দ্বার দিয়ে এই বংশে (রঘুবংশ-এর আখ্যানে) আমারও গতি হবে।

১০. অনুবাদ : ভালোমন্দের বিচারকর্তা সজ্জনব্যক্তিগণ (এ রঘুবংশ) অনুগ্রহ করে শুনুন। কেননা সোনা খাঁটি কিনা তা আগুনেই পরীক্ষিত হয়।

১১. অনুবাদ : (রঘুবংশীয়গণ) আজন্ম বিশুদ্ধ ছিলেন, কর্ম কখনো অফলবান্ রাখতেন না, আসমুদ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আকাশ তাঁদের রথের পথ ছিল, তাঁরা যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি দিতেন, প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করতেন, অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড দিতেন, যথাকালে তাঁরা প্রবোধিত হতেন।

দানের জন্য সঞ্চয় করতেন, সত্যের অনুরোধেই মিথ্যা বলার ভয়ে মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্য রাজ্য জয় করতেন, পুত্রার্থে দার গ্রহণ করতেন,

শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয় ভোগ, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি গ্রহণ, অন্তে যোগাবস্থায় দেহত্যাগ করতেন।

(আমার) বাগ্‌বৈভব অল্প হলেও আমি রঘুবংশজাতদের গরিমা বর্ণনা করতে চলেছি ....।

১২. অনুবাদ : তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল, বৃষস্কন্ধের মতো স্কন্ধ, হাতদুটি আজানুলম্বিত শালবৃক্ষের মতো উন্নত শরীর — তিনি ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী কাজ করার উপযুক্ত দেহ ধারণ করেছেন।

১৩. অনুবাদ : ভীমকান্ত রাজগুণে (দিলীপ) আশ্রিতদের (পক্ষে) অধৃষ্য অথচ অভিগম্য ছিলেন, যেমন সমুদ্র (হিংস্র জলজন্তুর জন্য অধৃষ্য অথচ রত্নরাশির জন্য অভিগম্য। (তাৎপর্য : রাজা দিলীপ একাধারে ভয়াল এবং সুকোমল রাজগুণে ভূষিত ছিলেন — যে কারণে তাঁর আশ্রিতজনেরা তাঁকে ভয় পেত কিন্তু নির্ভয় সমাদর পেত।)

১৪. অনুবাদ : তিনি অত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষা করতেন, অনাতুর হয়ে ধর্মাচরণ করতেন, অগৃধ্নু হয়ে অর্থ সঞ্চয় করতেন, অনাসক্ত ভাবে (বিষয়) সুখ ভোগ করতেন। তিনি (লোকহিত কামনায়) দণ্ডযোগ্যদের দণ্ড দিতেন।

তিনি জ্ঞানী হয়েও মৌন, শক্তি থাকতেও সহিষ্ণু, দাতা হয়েও আত্মগৌরবহীন ছিলেন। এই পরস্পরবিরোধী গুণাবলী সহোদরের মতো (তার মধ্যে) সহাবস্থান করছে।

(প্রজা) হিতার্থে তিনি দণ্ডযোগ্যকে দণ্ড দিতেন, সন্তানের জন্য দার গ্রহণ করেছিলেন; তাই এই মনীষীর অর্থ ও বিষয়সম্ভোগ ধর্মানুগত ছিল।

১৫. অনুবাদ : আমার মৃত্যুর পর (বংশধর না থাকায়) পিণ্ড পাবেন না ভেবে পিতৃপুরুষেরা শ্রাদ্ধের কিছু অংশ (ভবিষযতের জন্য) সংগ্রহ করে রাখছেন।

আমার পরে তর্পণ-জল দুর্লভ হবে ভেবে পূর্বপুরুষেরা (তাঁদের) দুঃখের নিঃশ্বাসে কবোষ্ণ হয়ে ওঠা (আমার) তর্পণের জল পান করেন।

১৬. অনুবাদ : ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের (পক্ষে) দুর্লভ সিদ্ধিও আপনার আয়ত্তে।

ধোয়ী কবির পবনদূত

জয়দেব বাংলার সুপরিচিত কবি। যাঁহারা কিছুমাত্র সংস্কৃত পড়িয়াছেন, জয়দেবের নাম তাঁহাদের কাছে সুপরিচিত। গীতগোবিন্দের পদাবলী কোমল ও কমনীয়। গীতগোবিন্দের তৃতীয় শ্লোকটি অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। কবিতা যথা,

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি।।"[১]

এই কবিতাটিতে জয়দেব ও তাঁহার সমকালবর্তী চারিজন কবির নাম আছে। জয়দেবের পরিচয় অনাবশ্যক, তাঁহার গীতগোবিন্দে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার নিবাস বীরভূম, অজয়নদতীরে কেন্দুলিগ্রামে। তথায় তাঁহার স্মরণার্থ এখনো প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে। কথিত আছে, তিনি ভরসা করিয়া যেকথা কয়টি লিখিতে পারেন নাই, স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ আসিয়া সেই কথা কয়টি লিখিয়া তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতি পূর্ণ করিয়া যান। জয়দেব লিখিয়াছিলেন,—

"স্মরগরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং"

তাহার পর কী লিখিব বলিয়া আর লিখিতে পারেন নাই। নারায়ণ লিখিয়া গেলেন,—

"দেহি পদপল্লবমুদারং।"

বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস জয়দেবের গীতাবলীর প্রেমোচ্ছ্বাসে ভগবানেরও ভাবোচ্ছ্বাস হয়। কিন্তু অপর চারিজন কবি কে? শুনা যায়, ইঁহারা সকলেই

লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন, সকলেই এককালে কবিতার মাধুর্যে বঙ্গদেশ মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায়? জয়দেবের ঐ কবিতাটি না থাকিলে তাঁহাদের নাম পর্যন্ত লোপ হইত।

বহুকাল ধরিয়া এই চারিজনের বিষয় কিছু অবগত হইবার জন্য বড়োই ব্যস্ত ছিলাম। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটি কাব্যসংগ্রহ নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতী ছিল। আর্য্যাসপ্তশতীতে সেনবংশের উল্লেখ আছে যথা,—

"সকলকলাঃ কলয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলক-ভূপতিরেকো রাকাপ্রদোষশ্চ।।"

অর্থাৎ — একমাত্র সেনবংশীয় ভূপতি এবং পূর্ণিমাতিথির সন্ধ্যাকাল প্রবন্ধ এবং চন্দ্রের সকল কলা প্রকাশ করিতে সমর্থ।

এই কাব্যখানিতে সাতশত আর্য্যা-শ্লোক আছে — ৫৪টি শ্লোক মুখবন্ধে এবং ৬টি উপসংহারে, অবশিষ্টগুলি অ-কারাদি ক্রমে লিখিত; যথা,— অ-কারে ৭৩, আ-কারে ৩৩, ই-কারে ৭, ঈ-কারে ৩, উ-কারে ২২, ঊ-কারে ১, ঋ-কারে ২, এ-কারে ৮, ক-কারে ৪৩, খ-কারে ১, গ-কারে ২৪, ঘ-কারে ৩, চ-কারে ১২, ছ-কারে ২, জ-কারে ১১, ঝ-কারে ১, ঢ-কারে ১, ত-কারে ২৮, দ-কারে ২৮, ধ-কারে ৪, ন-কারে ৩৮, প-কারে ৫৭, ব-কারে ৬, ভ-কারে ১৬, মকারে ৩৫, য-কারে ২৮, র-কারে ১৪, ল-কারে ৯, ব-কারে ৫২, শ-কারে ২৪, ষ-কারে ১, স-কারে ৯৮, হ-কারে ৮ ও ক্ষ-কারে ৩। অর্থাৎ মুখবন্ধ এবং উপসংহার বাদ দিলে ৬৯৬টি আর্য্যা কবিতা এই প্রবন্ধে লিখিত আছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই শৃঙ্গাররসপূর্ণ, তাই জয়দেব গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পরিচয়স্থলে "শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন" বলিয়া গিয়াছেন— অর্থাৎ তিনি শৃঙ্গার রসের অনেক ভালো কথা বলিয়া গিয়াছেন। আচার্য সপ্তশতী ভিন্ন আর কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু অনুমানে বোধ হয় আর করেন নাই, করিলে উপসংহারে একথা বলিতেন না—

"উদয়নবলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্যসোদরাভ্যাং মে।
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্ম্মলীকৃত্য।।"

অর্থাৎ — যেমন সূর্য ও চন্দ্র আকাশকে পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন, তেমনি আমার শিষ্য— উদয়ন আর সোদর বলভদ্র সংশোধন করিয়া আমার এই সপ্তশতী প্রকাশ করিলেন।

লক্ষ্মণসেনের সামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২৪৮ খৃস্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত[২] নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তৎকালবিখ্যাত কবিগণের প্রত্যেকের পাঁচ-পাঁচটি করিয়া কবিতা আছে, উহাতে গোবর্দ্ধনেরও পাঁচটি কবিতা আছে।

শরণ কবির কোনো গ্রন্থাদি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহারও প্রণীত পাঁচটি কবিতা আছে, সুতরাং শ্রীধরদাসের সময় তাঁহার কবিতা যে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতির নাম নাই, বোধ হয় উমাপতি কোনো কাব্য লিখেন নাই, কিন্তু সেনবংশীয় বিজয়সেনের প্রশস্তি তাঁহার লিখিত। দেওপাড়া হইতে একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহাতেই ওই প্রশস্তি খোদিত আছে এবং তাহাতেই উমাপতির নাম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আর জয়দেব উমাপতির যে গুণ বর্ণন করিয়াছেন (বাচঃ পল্লবয়তি) তাহাও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাকি ধোয়ী কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার পাঁচটি কবিতা আছে।

কয়েক বৎসর সন্ধানের পর বিষ্ণুপুরস্থ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুরাম তর্করত্নের নিকট ধোয়ী কবির একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থখানির নাম পবনদূত।

কালিদাস যেমন মেঘকে বিরহী যক্ষের দূত করিয়াছেন, সেইরূপ ধোয়ী কবি মলয়পবনকে বিরহিণী কুবলয়বতীর দূত করিয়া চন্দনাদ্রি (মলয়পর্বত) হইতে লক্ষ্মণসেনের নিকট নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেন নাকি একবার দিগ্বিজয় করিতে গিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে মলয়গিরিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুবলয়বতী তাঁহাকে দেখিয়াই কুসুম-শরের কিংকরী হইয়াছিলেন,—

> ''তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
> মন্যে জৈত্রং [মৃদু] কুসুমশরতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।

দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ীবভূব।।"

অর্থাৎ— সেই পর্বতে কুবলয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যা ছিলেন, মদনের [মৃদু] কুসুমশর অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর রাজা লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয়ক্রমে দক্ষিণদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সেই বালা মন্মথের কিংকরী হইয়াছিলেন।

বসন্তের সমাগমে তাঁহার মনের অবস্থা বিকৃত হইয়া আসিলে তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাঁহার নিকট দূতপ্রেরণার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, দেখিলেন মলয়পবন উত্তরাভিমুখে যাইতেছে। তিনি এই মলয় মারুতকেই কান্তের নিকটে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। মেঘদূতে যেমন প্রথম রাস্তার বর্ণনা তাহার পর মনের ভাব প্রকাশ, ইহাতেও তাই। যাঁহারা কালিদাসের মনোমোহিনী বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ধোয়ী কবির বর্ণনায় সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না, কিন্তু বাঙালি হইবেন, কারণ কবি বাঙালি, কবির নায়ক বাঙালি। যে সময়ের বাংলা দেশের কোনো বিবরণই পাওয়া যায় না, সেই সময়ে বাংলা দেশের অনেক কথা একজন বাঙালির মুখে শুনিতে কোন্ বাঙালির না হয়? তাহাতে আবার কবি লক্ষ্মণসেনকে গন্ধর্বকন্যার প্রণয়পাত্র করিয়া বাঙালির মান আরো বাড়াইয়াছেন।

কুবলয়বতী আপনার সখীদিগের নিকটেও আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু মলয়পবনকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মলয় পবনের স্তুতি করিতে লাগিলেন, বলিলেন, —

"ত্বত্তঃ প্রাণাঃ সকলজগতাং দক্ষিণস্ত্বং প্রকৃত্যা
জঙ্ঘালং ত্বাং পবন মনসোঽনন্তরং ব্যাহরন্তি।
তস্মাদেবং ত্বয়ি খলু ময়া সংপ্রণীতোঽর্থিভাবঃ
প্রায়ো ভিক্ষা ভবতি বিফলা নৈব যুষ্মদ্‌বিধেষু।।"৪।।

অর্থাৎ— তোমা হইতে সকল জগতের লোক প্রাণ পায়, তুমি স্বাভাবিক দক্ষিণ — সরল, দ্রুতগতি পদার্থসমূহের মধ্যে মনের পরই তোমার নাম, এই জন্যই আমি তোমার নিকট অর্থিভাবে উপস্থিত হইয়াছি। প্রায় তোমাদের মতো লোকের নিকট ভিক্ষা করিলে তাহা বিফল হয় না।

আর বিরহবিধুরগণের উদ্ধার তোমার বংশে পূর্বে আরো হইয়াছে। তোমারই পুত্র না বিরহবিধুর রামচন্দ্রের জন্য সমুদ্রও লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন,—

"বীক্ষ্যাবস্থাং বিরহবিধুরাং রামচন্দ্রস্য হেতো—
র্যাতিঃ পারং পবন সরিতাং পত্যুরপ্যাঞ্জনেয়ঃ।
তত্তাতস্যাপ্রতিহতগতের্যাস্যতস্তে মদর্থং
গৌড়ীক্ষৌণী কতি নু মলয়ক্ষ্মাধরাদ্‌যোজনানি।।"৫।।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের বিরহবিধুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জন্য অঞ্জনানন্দন হনুমান্ সমুদ্রও পার হইয়া গিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার পিতা, তোমার গতি অপ্রতিহত, তুমি যদি আমার জন্য যাইতে স্বীকার করো, তবে এ মলয়পর্বত হইতে গৌড়রাজ্য তোমার পক্ষে কয় যোজন?

সেখানে যাইলে — সে দেশে বুলিয়া বেড়াইলে তোমারও তৃপ্তি আছে।

"তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ
সান্দ্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণো গৌড়দেশঃ।"৬।

(গগন যদি অট্টালিকা হয়) তাহা হইলে সমতল গৌড়দেশ তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। সে উঠান বাগানে বাগানে ভরিয়া রহিয়াছে, এখন ফুল ফুটিবার সময় তুমি সেইখানে বুলিয়া বেড়াইবে। তুমি প্রস্থান করো, চন্দনের গন্ধ লইয়া যাও, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিলে বসন্তে মদমত্ত অহিকুল তোমায় পান করিয়া ফেলিবে। অতএব যত শীঘ্র পারো যাও। এখান হইতে দুই ক্রোশ গেলেই তুমি ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে, —

"শ্রীখণ্ডাদ্রেঃ পরিসরমতিক্রম্য গব্যূতিমাত্রং
গন্তব্যস্তে কিমপি জগতীমণ্ডনং পাণ্ড্যদেশঃ।
তত্রাখ্যাতং পুরমুরগমিত্যাখ্যয়া তাম্রপর্ণ্যা—
স্তীরে মুগ্ধক্রমুকতরুভির্বদ্ধরেখৈর্ভজেথাঃ।।"৮।।

এই শ্রীখণ্ডপর্বতের পাদদেশ পরিত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ গেলেই জগতের অলংকার পাণ্ড্যদেশ। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে উহার রাজধানী, নাম উরগপুরী। উহা অতি প্রসিদ্ধ। উহার চারিদিকে সারিবন্দী সুপারি গাছ।

তাহার নিকটে শ্রীরামচন্দ্রের সেতু।

"ক্রীড়াশৈলং ভুজগনগরী যোষিতাং কৌতুকঞ্চেৎ
সেতুং যায়া জলধিকারিণঃ শৃঙ্খলাদামদীর্ঘম্।
ভাতি স্নেহাদবনিতনয়া জীবনাশ্বাসহেতো-
র্লঙ্কাদ্বীপং প্রহিত ইব যো বাহুরেকঃ পৃথিব্যাঃ।।"৯।।

উরগনগরবিলাসিনী বারাঙ্গনাদিগের ক্রীড়াশৈল দেখিবার জন্য যদি তোমার কৌতুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সেতু দেখিতে যাইও। সমুদ্র উন্মাদ হস্তীর ন্যায় সদাই চঞ্চল ও সদাই উদ্দাম সেতুটি দেখিলে বোধ হয় যেন এই উদ্দাম হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য দীর্ঘ শৃঙ্খলা বিস্তার করা হইয়াছে। উহা দেখিলে আরো বোধ হয় সীতাকন্যা কি না! তাই তাঁহার ঘোর দুঃখের সময় অপত্যস্নেহে পীড়িতা পৃথ্বীদেবী তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য যেন একটি হাত লঙ্কাদ্বীপে পাঠাইয়াছেন।

সেখানে রামেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করিলে অনেক পুণ্যলাভ হইবে। সেখান হইতে কাঞ্চী।

"লীলাগৌরৈরমরনগরস্যাপি গর্ব্বং হরন্তীং
গচ্ছেঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ।
নক্তং যত্র প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং
কুর্ব্বন্ পাণিপ্রণিহতধনুর্জায়তে পঞ্চবাণঃ।।"১২।।

সেখান হইতে দক্ষিণদিকের ভূষণসদৃশ কাঞ্চীনামক পুরীতে গমন করিও; উহা সুধাধবলিত প্রাসাদসমূহে অমরাবতীরও গর্ব খর্ব করিয়াছে। সেখানে পঞ্চবাণ ধনু হাতে করিয়া প্রহরীর ন্যায় সকল রাত্রি জাগিয়া থাকেন।

সেখানে তোমায় পাইলে চোলকামিনীরা সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, তুমিও তাহাদের চন্দনচর্চিত গণ্ডস্থলে পিছলাইয়া পড়িবে — সহজে উঠিতে পারিবে না। কাঞ্চী ছাড়িয়া তুমি কাবেরী নদী ধরিয়া চলিয়া যাইবে,—

"হিত্বা কাঞ্চীমবিনয়বতীভুক্তরোধোনিকুঞ্জাং
তাং কাবেরীমনুসর খগশ্রেণিবাচালকূলাম্।
কান্তাশ্লেষাদপি খলু সুখস্পর্শমিন্দুত্বিষোঽপি
স্বচ্ছং ভিক্ষাপ্রবণমনসোঽপ্যম্বু যস্যা লঘীয়ঃ"।।১৫।।

~ ~

কাঞ্চী ত্যাগ করিয়া কাবেরী ধরিয়া চলিয়া যাইবে; উহার দুই কূল পক্ষিগণের কলরবে কলকলায়িত। দুই তীরেই নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে চোলরমণীগণের অবিনয় চিহ্ন প্রকাশিত আছে। উহার জল কান্তার আলিঙ্গন হইতেও সুখস্পর্শ, চন্দ্রকিরণ হইতেও স্বচ্ছ ও ভিক্ষুকের মন হইতেও লঘু। সেখান হইতে মাল্যবান্ পর্বত—

"স্নিগ্ধশ্যামং তরুভিরুপলৈঃ পর্ব্বতং মাল্যবন্তং
পশ্যেরুত্তম্ভিতমিব পুরঃ কেশপাশং পৃথিব্যাঃ।
তত্রাদ্যাপি প্রতিসরজলৈর্জ্জর্জরাঃ প্রস্থভাগাঃ
সীতাভর্ত্তুঃ পৃথুতরশুচঃ সূচয়ন্ত্যশ্রুপাতান্"।।১৮।।

সেখান হইতে গাছ ও পাথরে ঢাকা মাল্যবান্ পর্বত দেখিবে, উহার সুন্দর রঙ্ দেখিলে তোমার চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে, বোধ হইবে, যেন পৃথিবী আপন কেশকলাপ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। উহার চারি পাশ দিয়া ঝরণা ঝরিতেছে, বোধ হইতেছে, যেন রামের দুঃখ দেখিয়া আজিও এ পর্বত কাঁদিতেছে।

মাল্যবান্ অতিক্রম করিয়া পঞ্চাপ্সর সরোবর। এই সরোবরের চারিদিক সরলতরুতে আবৃত। এইখানেই পাঁচটি অপ্সরা প্রস্তরমূর্তি হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এখনো রাত্রিতে সেখানে অপ্সরারা আসিয়া গান করে এবং হরিণগণ মুগ্ধ হয়।

সেখান হইতে তুমি নানাপল্লি দেখিতে দেখিতে উত্তরমুখে যাইবে। পল্লির চারিদিকে বাগানে বাগানে অশোক ও সুপারিগাছ এবং পথিকেরা সরলা পল্লিবাসিনীদিগের প্রেমলোভে ঘুরিয়া বেড়ায়। তথা হইতে—

"অন্ধ্রান্ হিত্বা জলনিবিড়বধূ [জনপদবধূ] গাঢ়গোদাবরীকান্
কালিঙ্গস্যানুসর নগরীং নাম তাং রাজধানীং"।২১।

সেখান হইতে অন্ধ্রদেশ — যথায় বহুসংখ্যক রমণী গোদাবরীর জলে অবগাহন করিতেছে। সেই অন্ধ্রদেশ ছাড়িয়া কলিঙ্গনগর নামে কলিঙ্গরাজের রাজধানীতে যাইবে।

উহার নিকটেই সমুদ্রতীরে সুপারিমালা ফলভার অবনত হইয়া রহিয়াছে এবং সিদ্ধাঙ্গনারা গান করিয়া পথিকগণের কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।

সেখান হইতে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে গমন করিবে, দেখিবে লতার কিশলয়গুলিও যেন মদভরে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখিবে মদমত্ত হস্তীর বিকট চিৎকারে শবররমণীগণ হঠাৎ মান ত্যাগ করিয়া স্বামীর ক্রোড়দেশে লুকাইতেছে। সেখানে কলনাদিনী রেবানদী প্রবাহিত, উভয় তীরে বেণুবন, বেণুবনের বর্ণ শুকপক্ষীর বর্ণকেও লজ্জিত করিয়া দেয়। যুবকযুবতীর এমন ক্রীড়াস্থল বুঝি ভুবনে আর নাই।

সেখান হইতে যযাতিনগর বা যাজপুর—

"লীলাং নেতুং নয়নপদবীং কেরলীনাং রতেশ্চেৎ
গচ্ছেঃ খ্যাতাং জগতি নগরীমাখ্যয়া তাং যযাতেঃ।
গাঢ়াশ্লিষ্টক্রমুকতরবঃ প্রাঙ্গণেনাগ্রবল্ল্যো
বালাং যত্র প্রিয়তমপরীরম্ভমধ্যাপয়ন্তি"।।২৬।।

যদি কেরলরমণীগণের ক্রীড়া দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সেখান হইতে যযাতির প্রসিদ্ধ নগর যাজপুরে যাইবে। এই নগরে উঠানে উঠানে লতাগুলি সুপারিগাছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বালিকাদিগকে আলিঙ্গনবিদ্যা শিক্ষা দিতেছে। তথা হইতে সুহ্মদেশ, —

"গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
২ধ্যাসত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি [যাস্যাত্যুচ্চৈস্তয়ি] রসময়ো বিস্ময়ঃ সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র ভাতি।।২৭।।
তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মাদ্ [সুহ্মে] বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ"।।২৮।।

সেখান হইতে সুহ্মদেশ, উহার পরিসর ভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত। সুধাধবলিত প্রাসাদরাজি উহার কর্ণভূষণ স্বরূপ। সেই রসময়দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে। সেখানে নবশশিকলার ন্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণাঙ্গণাগণের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে। সেখানে সেনবংশীয় নরপতির ইষ্টদেবতা

মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত। তিনি সুহ্মদেশেই থাকেন। সেখানকার বাররামাগণের হস্তে সকল সময়ই লীলাকমল বিরাজ করে; তাহাদের দেখিলেই নারায়ণের লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হয়।

শ্রীখণ্ডপর্বত হইতে সুহ্মদেশ পর্যন্ত ধোয়ী কবি যে-সকল স্থানের উল্লেখ করিলেন এই-সকল স্থান কোথায় জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিণদিগবর্তী পর্বতের নামই শ্রীখণ্ডপর্বত বা চন্দনাদ্রি। উহা পাণ্ড্যদেশেরও বাহিরে, কারণ শ্রীখণ্ডাদ্রির পরিসর অতিক্রম করিয়া দুইক্রোশ গিয়া তবে পাণ্ড্যদেশ। পাণ্ড্যদেশের রাজধানীর নাম উরগপুর। কালিদাসও উরগপুর পাণ্ড্যদেশের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রঘুবংশ-এর ষষ্ঠ সর্গে "অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং দৌবারিকী দেবসুরূপমেত্য" বলিয়া "পাণ্ড্যোঽয়মংশার্পিতলম্বহারঃ" বলিয়াছেন। [রঘু, ৬/৫৮, ৬০] টীকাকারেরা উরগপুরকে নাগপুর বলিয়াছেন। এ নাগপুর যদি নাগপত্তন হয়, তবে তাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বরের অনেক উত্তরে এবং সেতুবন্ধের নিকটে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে উরগপুর বলিয়া বোধ হয় কোনো পুরী ছিল। সুএল সাহেব প্লিনি প্রোক্ত 'উরইউর' অর্থাৎ উরগপুরকে চোলদেশের রাজধানী বলিয়াছেন, সুতরাং উরগপুর লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।[৩] আমাদের পুথিখানির পার্শ্বেও উরগপুরের টিপ্পনীতে নাগপুর লেখা আছে। রামেশ্বর শিব এখনো সেতুবন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু বহুকাল হইতেই পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মদুরা তাম্রপর্ণীনদীর উপরে স্থাপিত। মদুরারই আর-এক নাম উরগপুর হইলে সকল গোলই মিটিয়া যায়।

পাণ্ড্যদেশের রাজধানী হইতে পবনদেব একবারে চোলদেশে উপস্থিত হইবেন। লক্ষ্মণসেনের সময়ে কাঞ্চী চোলদেশের রাজধানী ছিল। খৃস্টের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে উহা অশ্বত্থামাবংশসম্ভূত পল্লবদিগের রাজধানী ছিল। পল্লবগণ প্রথমে অতি পরাক্রান্ত, পরে হীনবল হইয়াও দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কাঞ্চীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর উহা সূর্যবংশীয় চোড়রাজগণের রাজধানী হয়। একজন চোড়রাজ দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া বাংলা ও মগধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাজেন্দ্রচোড়।[৪]

দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজগণের অমিতপরাক্রমে চোড়গণ হীনবীর্য হইলেও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে চোড়গণ কাঞ্চীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কাঞ্চীনগর অতিক্রম করিয়া ধোয়ী কবি পবনকে কাবেরীর অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বোধ হয় সংস্কার ছিল কাবেরী কাঞ্চীনগরের উত্তরে। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়, কাবেরী কাঞ্চী হইতে অনেক দক্ষিণে।

কাবেরী হইতে মাল্যবান্। মাল্যবান্ পর্বত মহিসুরের পশ্চিমাংশে পম্পাসরোবরের নিকটে; সুতরাং এখানেও কিছু গোল। তাহার পর পঞ্চাপ্সরতীর্থ। কোলার সাহেব Archaeological surveyর ১৩শ ভাগে বলেন, উহা সারগুজার নিকট। তাহা হইলে ছোটো নাগপুরের নিকট। ধোয়ী কবি কিন্তু উহাকে গোদাবরীর দক্ষিণে রাখিয়াছেন। গোদাবরীর উভয় প্রান্তে অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রদেশের পর কলিঙ্গদেশ ও কলিঙ্গপত্তম। কেরল দেশ হইতে কোঙ্গু বা গঙ্গ বংশীয় একজন রাজা খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে কলিঙ্গ দেশে রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাজরাজদেব রাজেন্দ্রচোড়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, এই বিবাহের সন্তান চোড়গঙ্গদেব উড়িষ্যা বিজয় করেন (১১১৮ খৃ.)।[৫] সুতরাং লক্ষ্মণসেনের সময় ধোয়ী কবি পবনদেবকে উড়িষ্যার রাজধানীতে কেরলীগণের বিলাস দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কলিঙ্গ হইতে উড়িষ্যা আসিবার পূর্বে কবিরাজ মহাশয় পবনরাজকে একবার কিছু পশ্চিমে লইয়া গিয়া বিন্ধ্যপর্বত ও রেবানদী দেখাইয়া আনিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে সুহ্মদেশ বেশি দূর নহে। সুহ্মদেশের রাজধানী তাম্রলিপ্তী। দশকুমারচরিতে আছে— "অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী।"[৬] কবিরাজ মহাশয় পুথি দেখিয়াই পুথি লিখিয়াছেন, দেশ ভ্রমণ করেন নাই— নহিলে এতগুলি ভূল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই বার গৌড়দেশের বর্ণনা পড়িল। সেখানে দেখিবে, মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাবলীতে কৈলাসপর্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্ধগৌরীশ্বরমূর্তি বিরাজিত। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্পদূর, কিন্তু ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাঁধ বল্লাল নরপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছে। গঙ্গায় স্নান করিতে আসিবার সময় বাঁধে উঠিলে দুইরূপেই স্বর্গনরকের নিকটবর্তী হওয়া যায়। সেখানে তুমি গঙ্গার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। সুপরিপুষ্ট হংসকুল তাঁহার অলংকার, তিনি তরঙ্গ হস্তে ফেনময় দর্পণ ধারণ করিয়াছেন। সেখানে গঙ্গা উত্তালতরঙ্গমালা-সমাকুল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ যমুনায় জলক্রীড়া করিতে আসিলে তাঁহাদিগের স্তনস্থিত মৃগমদ তরঙ্গে ধৌত হইয়া যমুনার জল আরক্ত করিয়া দিত।

যমুনা ভাগীরথী হইতে বহির্গত হইয়া দেশান্তরে ধাবিত হয়েন। তুমি সেই গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থলে গমন করিবে; দেখিবে, কৃষ্ণসলিলা যমুনা আঁকিয়া বাঁকিয়া কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় সাদা খোলস ছাড়িয়া গমন করিতেছে, দেখিয়া যেন ভীত হইও না।

সেখান হইতে আরো উত্তরে গিয়া বিজয়পুর নামে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে উপস্থিত হইবে ও প্রকাণ্ড ছাউনি দেখিবে। সেখানকার রমণীরা দেখিতে অতি সুন্দরী, তাহাদের স্বভাব অতি মধুর। সেখানে অট্টালিকার উপর চিলেঘর, সে ঘরে দেয়ালে খোদা অনেক পুতুল। সেখানে গৃহপ্রাঙ্গণে সুপারি গাছ, কিন্তু এ গাছে জলসেচন করিতে হয় না, রাত্রিকালে চন্দ্রকান্তমণির জলস্রাবেই তাহাদের সেচনক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে। সে বড়ো পবিত্রদেশ, গঙ্গার অবস্থানে উহার প্রকৃতি নির্মল হইয়াছে, তাহাতে আবার লক্ষ্মণসেন রাজা, ইহলোক বা পরলোক কোনো লোকেই তাহাদের ভয় নাই। সেখানে নিম্নলিখিত বস্তু-সকল যুবকদিগের আনন্দ প্রদান করে। যথা,— কুঙ্কুমনির্মিত অঙ্গরাগ, দোলা, সুন্দরীসমূহ, ক্রীড়াবাপী (জল অল্প), মালতীমালা, রাত্রি এবং জ্যোৎস্না। অভিসারিকারা রজনীতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেও তাহাদের চরণস্থিত আল্‌তার দাগ সকালবেলা দেখা যায় না; কারণ সকালবেলা সূর্যের কিরণ রক্তাশোকেরন্যায় লাল হয়, তাই লালে লাল মিশাইয়া যায়।

এখানে রত্নাকরের বড়োই বিপদ, কারণ এখানকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সর্বস্ব হরণ করে। প্রথম হরণ করেন মুক্তা, তাহার পর মরকত, তাহার পর মহানীল, পরে শঙ্খ (ইহাতে বলয় রচনা বড়োই সুন্দর হয়)।

তুমি মদনের গুরু, তুমি সেখানে বসিলে রমণীরা বাগানে নাগরদোলা খাটাইয়া ক্রীড়া করিবেন। বোধ হয়, যেন স্বর্গসুন্দরীদিগকে জয় করিবার জন্য মদন বঙ্গদেশে একদল সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহারা নাগরদোলায় চড়িয়া কেমন করিয়া আকাশে যাইতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতেছে।

সেখানে রমণীরা কেতকীপত্রে কর্ণভূষণ নির্মাণ করেন, কর্ণ হইতে সেটি খসিয়া পড়িলে বোধ হয় যেন মুখচন্দ্রের একটি অংশ খসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে

লক্ষ্মণসেনের সাতমহল বাড়ি, উহার মস্তকে মেঘ বিশ্রাম করে, তাহাতে বিদ্যুৎ ঝলসিলে বোধ হয় যেন পতাকা উড়িতেছে।

সেই ভবনে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, বোধ হয় উহা যেন ইন্দ্রনীলমণিতে নির্মিত, উহাতে অনেক রাজহংস কেলি করে। সেখানে লক্ষ্মণসেনের নূতন রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ মনসিজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন—

"দেবং সাক্ষান্মনসিজমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেথাস্ত্বং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ।
যস্য স্নিগ্ধস্ফুরদসিলতাস্ফারগত্যা জলানাং
লব্ধঃ সংখ্যে রিপুকুলবধূলোচনৈ সংবিভাগঃ"।।৫৫।।[৭]

সেই সময় যদি রাজা নির্জনে মন্ত্রণাকার্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে, হে পবন! আমার সন্দেশ তাহাকে দিও না। মন কার্যে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে প্রেমের কথা স্থান পায় না। বেশ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহাকে আমার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবে। এই বলিয়া কুবলবতী আপনার অবস্থা জানাইতেছেন। সে অনেকগুলি কবিতা নমুনার দুই একটি দিতেছি—

"ধত্তে দ্বেষং শশিনি কুরুতে ন গ্রহং কেশহস্তে
দূরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়া চন্দনস্য।
বক্তুং দেব ত্বয়ি পরমসৌ স্বামবস্থাং কথঞ্চিদ্
গাঢ়োদ্বেগা নয়তি কবিতাচিন্তয়া বাসরাণি।।৭৩

লীনোদ্যানে বিতরতি ভৃশং যত্নসংরুদ্ধবাষ্পা
সান্দ্রে চন্দ্রার্চ্চিষি নিবিশতে চন্দনাভ্যক্তগাত্রী।
ক্রীড়াবাপীমরুদভিমুখং ধাবতি ব্যাকুলাসৌ
কিং বা নার্য্যো রমণবিরহে সাহসং নাচরন্তি।।৮৯

সন্দেশোঽয়ং মনসি নিহিতঃ কচ্চিদায়ুষ্মতা মে
কিং বা ভূয়স্ত্বয়ি বিরচিতৈরঙ্গভিক্ষাপ্রকারৈঃ।

পারার্থ্যৈকপ্রবণমনসস্তদ্‌বিধা বাষ্পমিশ্রান্
আপন্নানাং ন খলু বহুশঃ কাকুবাদান্ সহন্তে।।"১০০।।[৮]

এই পর্যন্ত কাব্যশেষ — ইহার পর কবির প্রশস্তি। তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়া কবিরাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়েন্দ্রের নিকট অনেক হস্তী সুবর্ণ চামর ইত্যাদি পাইয়াছিলেন। তিনি বড়ো সুখী ছিলেন, সকল কবির সহিত তাঁহার ভাব ছিল, তাঁহার কবিতা বিদর্ভী-রীতি[১০] অনুসারে লিখিত, তাঁহার গঙ্গাতীরে বাস, ধন সম্পদ যথেষ্ট, স্নেহভাজন লোকেরও অভাব ছিল না। তাঁহার প্রার্থনা যে, তিনি এইরূপে জন্মজন্মান্তর কাটাইতে পারেন, নারায়ণে যেন তাঁহার ভক্তি থাকে। গঙ্গাতীরে যেন বাস করিতে পান, ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
তৃতীয় সংখ্যা, ১৩০৫।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. "বাক্য পল্লবিত করেন উমাপতিধর। সন্দর্ভের শুদ্ধি জানেন জয়দেব! শরণ, দুরূহপদ দ্রুত রচনায় শ্লাঘনীয়। প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই কবিরাজ ধোয়ী বিশ্রুত শ্রুতিধর।" উমাপতিধর, জয়দেব, গৌবর্দ্ধন আচার্য, শরণ এবং ধোয়ী (বা ধোয়ীক)— পাঁচজন কবি লক্ষ্মণসেনদেবের সভাসদ্-মন্ত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের বাবা বল্লালসেনেরও মন্ত্রী ছিলেন। রাজশাহি জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ-এ) দেওপাড়া গ্রামের শিব মন্দিরের গায়ে খোদাই প্রশস্তি এঁর লেখা। ইনি অকারণ বাগ্‌বিস্তার করতেন— জয়দেব এই কটাক্ষ করেছেন।

শরণ-এর লেখা কোনো কাব্য পাওয়া যায় নি, সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলনে তাঁর লেখা ২০টি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

তেজস্বী ব্রাহ্মণ আচার্য গোবর্দ্ধন লক্ষ্মণসেনের সভায় সবচেয়ে সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য আর্য্যা ছন্দে রচিত বিচ্ছিন্ন শ্লোক সংকলন আর্য্যাসপ্তশতী হাল-এর প্রাকৃত কাব্য গাথাসপ্তশতী অনুসরণে লেখা। আর্য্যাসপ্তশতী-তে গ্রথিত শ্লোকের সংখ্যা অবশ্য সাতশোর বেশি। বোম্বাই [বর্তমানে মুম্বাই] সংস্করণে আছে ৭৫৬টি।

জাতিতে তন্তুবায় (জালাল-উদ্‌দিন রচিত সেকশুভোদয়া-১৬শ অধ্যায়) ধোয়ীকবির বহু রচনার মধ্যে প্রসিদ্ধ পবনদূত কালিদাসের

মেঘদূত অনুসরণে লেখা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত ১০৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ দূতকাব্যের ধারায় একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। পবনদূত-এর উপসংহারে উল্লেখ আছে মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন তাঁকে কবিক্ষ্মাপতি (কবি-রাজ) উপাধি এবং সোনার আভরণে সাজানো হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত দুটি চামর দিয়েছিলেন।

অবশ্যই এই কবি-সভাসদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন জয়দেব, যাঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার কেঁদুলিতে আজও পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে কবিকে স্মরণ করে বিরাট মেলা বসে। এখানে সমবেত হন সব শাখার বাউল। বাউলরা জয়দেবকে পরমগুরু মানেন। অজয়নদের কদমখণ্ডির ঘাটে স্নান করে 'বেদনাশা' বটগাছ তলায় বসে জয়দেবের উদ্দেশে গান গাওয়া বাউলদের সাধনার জীবনের অন্যতম পবিত্র কৃত্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতবর্ষে সমাদৃত। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করে এই কাব্য পবিত্র গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। অন্য দিকে মণিপুর থেকে দক্ষিণ ভারত অবধি প্রায় সব ধ্রুপদী নৃত্যের সঙ্গে গীতগোবিন্দ গাওয়া হয়ে আসছে।

২. বিভিন্ন কবির রচনা থেকে নির্বাচিত কবিতার সংকলন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা। এই সংকলনকে বলা হয় কোশকাব্য। প্রসিদ্ধ কোশকাব্যগুলির অন্যতম শ্রীধরদাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত। নামান্তর সূক্তিকর্ণামৃত। শ্লোকগুলি দেবপ্রবাহ, শৃঙ্গারপ্রবাহ, চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চাবচপ্রবাহ — এই পাঁচটি প্রবাহে এবং প্রত্যেক প্রবাহ কয়েকটি করে বীচি-তে বিন্যস্ত। এক-একটি বীচির শ্লোক সংখ্যা পাঁচ। গৃহীত শ্লোকের রচয়িতার সংখ্যা ৫৮৫। অজ্ঞাত রচয়িতাদের 'কস্যচিৎ' বলে উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেনের সভার জয়দেব প্রভৃতি পাঁচজন কবি ভিন্ন জলচন্দ্র, বিদ্যাগদাধর, চন্দ্রচন্দ্র এবং রাজা লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন এবং মহিলা কবি ভাবদেবী, বিদ্যা, বিকটধনিতম্বা প্রভৃতির শ্লোক সংকলিত হয়েছে।

~ ~

সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলনের তারিখ ১২৪৮ খৃস্টাব্দ নয়, ২০ ফাল্গুন ১১২৭ শকাব্দ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১২০৬ খৃস্টাব্দ। (দ্র. *H-B-I.* P.362)।

৩. কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে ত্রিচিনপল্লির কাছে অবস্থিত। উরইউর এবং উরগুর একই জায়গা। হুল্চ মনে করেন, নেগাপত্তমই উরগপুর। রঘুবংশে (সর্গ-৪, শ্লোক ৫৯-৬০) উরগপুরের উল্লেখ আছে।

৪. চীন দেশের পরিব্রাজক হিউএন-ৎসাঙ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাঞ্চী বা কাঞ্চিপুরম্‌কে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী দেখেছিলেন। তারও আগে দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে কাঞ্চীর উল্লেখ করে গেছেন।

চোল রাজবংশের আদি পুরুষ বিষয়ালয় (নবম শতাব্দী)। তাঁর ছেলে আদিত্য (৮৭১ - ৯০৭ খৃ.) ৮৯৩ খৃস্টাব্দে চোল বা চোড় সাম্রাজ্য পত্তন করেন। চোল শক্তির গৌরবের সময় প্রথম রাজরাজ (৯৮৫ - ১০১৬ খৃ.) ও তাঁর ছেলে রাজেন্দ্রর (১০১২ - ৪৪ খৃ.) শাসনকাল। রাজেন্দ্রচোল দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। পুব দিকে দক্ষিণবঙ্গ অবধি তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল।

৫. অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ, ১১১২ খৃস্টাব্দের কিছু আগে পুরী-বহক অঞ্চল অধিকার করেন। বংশগত শৈবধর্ম ছেড়ে তিনি বৈষ্ণব হন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করে দেন।

৬. শ্রীদণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিত-এর ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস মিত্রগুপ্তচরিত-এর শুরু এবং শেষে দুবার সুহ্ম দেশের দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নগরের উল্লেখ আছে।

৭. অনুবাদ : রাজ্যে অভিষেক-প্রাপ্ত দেব (লক্ষ্মণসেন) সাক্ষাৎ মনসিজ-এর মতো। ব্যথিত সময়ে চামরধারিণীদের সঙ্গে তুমি তাঁর সেবা কোরো। সময়ে তাঁর ঝকঝকে অসিলতা প্রবল বেগে ঝলকিত হয়ে ওঠে। ফলে শত্রুকুলের বধূরা যেন চোখে চোখে সব জল ভাগ করে নিল।

৮. অনুবাদ : চাঁদের প্রতি তার বিদ্বেষ। হাতে কেশ ধারণ করায় কোনো আগ্রহ দেখায় না। হার দূরে নিক্ষেপ করে। চন্দনের নিন্দায় আনন্দ পায়। হে রাজন্! নিজ অবস্থা আপনাকে বলতে উদ্বেগ বোধ করে। কবিতা চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করেন। (৭৩)

সযত্নে (উদ্‌গত) বাষ্প রোধ করে লীলা-উদ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেহে চন্দন লেপন করে চাঁদের আলোয় বসে থাকে। ব্যাকুল হয়ে বাতাসের অভিমুখে ক্রীড়া সরোবরের দিকে ছুটে যায়। বিরহে রমণীরা কোন্ সাহসিক কাজই না করে থাকে! (৮৯)

আমার এই বার্তা আশা করি মনে আছে। হে পবন এ প্রার্থনা আমি তো বারবার জানিয়েছি। কিংবা তোমাদের মতো পরার্থপ্রবণ মন যাদের তারা মরণাপন্নের সিক্ত সকরুণ অনুরোধ বারবার শুনতে চায় না। (১০০)

৯. ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের বিকাশ ধারায় অলংকারবাদ-এর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় রীতিবাদ। ভামহ (সপ্তম শতাব্দীর উত্তরার্ধ) কাব্যালংকার গ্রন্থে অলংকারকেই কাব্যের আত্মা প্রতিপন্ন করেছিলেন। দণ্ডী (সপ্তম শতাব্দীর উত্তরার্ধ) কাব্যাদর্শ গ্রন্থে বলেন অলংকার কাব্যশোভার হেতু হলেও 'গুণ' কাব্যের অন্তরতর উপাদান। তিনি দশটি গুণ নির্দেশ করেন : শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা,

~ ~

ওজঃ, কান্তি, সমাধি। কাব্য প্রাণবন্ত হয় এই দশটি গুণের সমন্বয়ে। এই গুণই কাব্যের আত্মা। এর পরে আচার্য বামন (৭৫০-৮০০ খৃ.র মধ্যে বর্তমান ছিলেন) তাঁর কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থে দণ্ডীর গুণ-তত্ত্ব মেনে নিয়েই রীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বলেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। রীতি বলতে বামন বিশিষ্ট পদ রচনা বুঝিয়েছেন। এমন ভাবে শব্দ ও অর্থের সমাবেশ করতে হবে যাতে শ্লেষ, প্রসাদ ইত্যাদি গুণগুলি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কাব্যের আত্মা-স্বরূপ এই রীতির তিনি তিনটি ভেদ মেনেছেন : বৈদর্ভী, গৌড়ীয়:, পাঞ্চালী। এই তিন রচনা রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈদর্ভী রীতি। বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। বৈদর্ভী রীতিতে দশটি গুণ যথাযথ প্রতিফলিত হয়। ধোয়ী তাঁর পবনদূত কাব্যে বৈদর্ভী রীতি অনুসরণ করেছেন।

দ্র. ed *Pavanaduta,*

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'পবনদূত', সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা ১৯২৬

বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত

১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২/৭৩ খৃ. অব্দে বঙ্গদর্শন সর্বপ্রথম বাহির হয়। সে আজি বিয়াল্লিশ বৎসর হইল। তখন ইংরাজিওয়ালাদের ভিতর সংস্কৃত জানা লোক অতি অল্প ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমত সংস্কৃত লইতেই চাহেন নাই। পরে কাউএল সাহেবের চেষ্টায় পরীক্ষায় সংস্কৃত লওয়া হইয়াছিল।[১] সংস্কৃত পরীক্ষা ৫/৭ বৎসর মাত্র হইবার পর বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। তখন অতি অল্প লোকই উত্তরচরিত পড়িয়াছিল।[২] কারণ এদেশের টোলে উত্তরচরিত-এর চলন ছিল না। ও বইখানি উইলসন সাহেব [Horace Hayman Wilson] বোম্বাই হইতে আনিয়াছিলেন। সংস্কৃত উত্তরচরিত যে অধিক লোকে পড়ে নাই ইহা বঙ্কিমবাবু পাকত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন,

"উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত, কেননা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের [প্রথম প্রকাশ ১৮৬০] প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন।"

এতপূর্বে এরূপ একখানি অপ্রচলিত নাটকের দোষগুণ বিচার করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট সহৃদয়তা ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন। সহৃদয়তা, — কেন-না, নাটকখানি খুব ভালো, যাহার হৃদয় আছে সেই, এ নাটকের মর্ম বুঝিতে পারে, অন্যে পারে না, পণ্ডিত মহাশয়েরা পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহারা ভবভূতিকে মাঘ,[৩] ভারবি[৪] ও শ্রীহর্ষের[৫] নিচে স্থান দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর হৃদয় ছিল, তিনি এ নাটকখানির মর্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহা স্বদেশবাসিগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহসও প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ, তখন ইউরোপীয়

ধরনে কাব্যপরীক্ষা এদেশে আরম্ভ হয় নাই। এদেশের পণ্ডিতেরা সাহিত্যদর্পণ কাব্যপ্রকাশ[৬] প্রভৃতি অলংকার গ্রন্থের মতানুসারে কাব্যপরীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমবাবু সেমত একেবারে ত্যাগ করিয়া নূতন, ইউরোপেও নূতন, ধরনে উত্তরচরিত সমালোচনা করিতে বসিলেন।

সংস্কৃত উত্তরচরিত বঙ্কিমবাবুর যে ভালো করিয়া পড়া ছিল, বোধ হয় না। তিনি ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি[৭] [জয়রাম ন্যায়ভূষণ] মহাশয়ের নিকট যে-সকল কাব্য পড়িয়াছিলেন উত্তরচরিত তাহার ভিতর ছিল না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, নৃসিংহবাবুর বাংলা ও টনি সাহেবের ইংরাজি তর্জমা বাহির হওয়াতেই তিনি উত্তরচরিত-এর দোষগুণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, উত্তরচরিত-এর মতো কাব্য বুঝিয়া লইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় নাই। তথাপি তিনি বলিয়াছেন "আমরা যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প।"

উত্তরচরিত পরীক্ষা করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু আলংকারিকগণকে অত্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উঁহারা যেভাবে কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান, সেভাবে কাব্য নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন,

"পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি, অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কিনা, ইহা রূপক— কি উপরূপক, নাটক কি প্রকরণ, ব্যায়োগ কি ত্রোটক, ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য কি, —এ সকল তত্ত্বের সমালোচনে আমরা প্রবৃত্ত নহি, ...। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ, যে অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি একবারে বিস্মৃত হউন। নচেৎ নাটকের রস গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি— এই কবির সৃষ্টির মধ্যে কি ভালো লাগে, কি ভালো লাগে না; পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদের অনুবর্ত্তী হউন।"

অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু এদেশে চলিত কাব্যপরীক্ষা একেবারে ত্যাগ করিয়া ইউরোপের নূতন ধরনের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার

জয়-জয়কার হইল। বাস্তবিকও একটা পুরানো পচা, একঘেয়ে সরুকাটা উপায় ত্যাগ না করিলে তখন কাব্যের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিবার উপায়ই ছিল না, এবং এইরূপে ত্যাগ করিতে বলায় বঙ্কিমবাবু যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং দেশের যথেষ্ট উপকারও করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তিনি বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু এই বিয়াল্লিশ বৎসরে সংস্কৃত অলংকারের অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে বঙ্কিমবাবু আধুনিক আলংকাররিককে যত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তত নিন্দার পাত্র নহে। বিশেষত প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যশাস্ত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমার এখন এই ধারণা হইয়াছে যে, নব্য আলংকারিকেরা পিঁজিয়া পিঁজিয়া যেখানে যে ছোটো বড়ো গুণটি, দোষটি, অলংকারটি ও রসটুকু থাকে, তাই দেখাইয়া দিতে খুব মজবুত। প্রাচীনেরা ইহা অপেক্ষা আরো বেশি কিছু পারিতেন। তাঁহারা গল্পটি কিরূপে সাজাইতে হয়, সে সম্বন্ধেও পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। রস ও ভাব কীরূপে ধীরে ধীরে ফুটাইতে হয়, তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। মোটামুটি বলিতে গেলে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পিঁজিতে পটু, "অ্যানালাইজ" করিতে খুব পটু। নূতন ধরনের যে পরীক্ষা অষ্টাদশ শতকে জর্মানিতে আবির্ভূত হইয়া এখন সমস্ত ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের দেশেও আসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত। ছোটোখাটো দোষ গুণ অলংকার রস তাঁহারা একেবারেই দেখিতে চাহেন না। তাঁহারা সমস্ত বইটা বেশ করিয়া হজম করিয়া তাহা হইতে রস আকর্ষণ করিতে চাহেন। ইহাকে আমরা সমগ্রভাব বা "সিন্‌থেসিস্‌" বলিতে চাহি। এই দুই প্রকারের পরীক্ষায় না পাকিলে কাব্যের রসাস্বাদে অধিকারই হইতে পারে না, এই আমার বিশ্বাস। যদি শুধু দেশি প্রথায় চল, কেবল ছোটো ছোটো জিনিস দেখিবে,— যদি শুধু ইউরোপীয় প্রথায় চল, কেবল বড়ো জিনিস দেখিবে, ছোটোর দিকে একেবারে দৃষ্টি থাকিবে না। সুতরাং এই দুইয়ের একত্র মিলনই সকলের চেয়ে ভালো। কিন্তু যখন একটার দিকে অধিক ঝোঁক দিয়া আর-একটাকে একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া হয়, তখন সেই লোপকরা জিনিসটার উপর ঝোঁক দিয়া যেটা চলিতেছে, তাহাকে লোপ করিবার চেষ্টা হয়। বঙ্কিমবাবুও ঠিক তাই করিয়াছিলেন, তিনি প্রাচীন পথ লোপ করিয়া নূতন পথ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সেটা দরকারই হইয়াছিল, নইলে অলংকারে ও

দর্শনে কিছু তফাত থাকিত না এবং সে অলংকারের হাতে পড়িয়া কাব্য একেবারে অতল জলে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে যে, আমরা দুই পথই দেখিব, ছোটো জিনিসও দেখিব, বড়ো জিনিসও দেখিব। শব্দের পর শব্দ দিয়া যে গুণ হয় বা অলংকার হয়, তাহাও দেখিব এবং ঘটনার পর ঘটনা পড়িয়া গল্পটি কী প্রকার মনোহর হইয়া উঠে তাহাও দেখিব। তবে তো পুরা কাব্যখানার রস আস্বাদন করিতে পারিব। এ দুয়ের কোনোটিই ছাড়িবার জো নাই।

উত্তরচরিত-এর প্রথম অঙ্কে "চিত্রদর্শন।" বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,

"ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে, যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব ঘটনা সকল বর্ণনা করেন। রামসীতার অলৌকিক অসীম ও প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।"

আমরা বলি যদি চিত্রদর্শনটি প্রথম অঙ্কে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে বাধ্য হইতাম, যে উত্তরচরিত, মহাবীর-চরিত-এর শেষ অংশ মাত্র। মহাবীরচরিত-এ ভবভূতি বাল্মীকির গল্পটা অনেক জায়গায় ত্যাগ করিয়া নিজের মনগড়া করিয়া লইয়াছিলেন, সেই মনগড়া গল্পের উপর মহাবীরচরিত হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু উত্তরচরিত হইতে পারে না। তাই কবি বীরচরিতের গল্পটিকে পরিহার করিয়া আবার পুরানো পথ অনেকটা ধরিলেন। যেন ভবভূতি মহাবীরচরিত-এ বাল্মীকির পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছিলেন, চিত্রদর্শনে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং বাল্মীকির সঙ্গে কতকটা মিট্‌মাট করিয়া লইলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন এটা উদ্দেশ্যই নয়। আমরা তো দেখিতেছি এ একটা প্রধান উদ্দেশ্য। এই চিত্রদর্শন ভবভূতি কোথায় পাইলেন? সেটাও তো একটি দেখিবার কথা। সেটা দেখিতে পাইলে আমরা যে কেবলমাত্র উত্তরচরিত ভালো করিয়া বুঝিতে পারিব তাহা নহে; সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুঝিতে পারিব এবং বুঝিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইব। ভবভূতি এটি কালিদাসের গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন। ভবভূতি সংস্কৃতের শেষ কবি— ভাবের শেষ কবি—রসের শেষ কবি—প্রতিভার শেষ কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু ভালো আছে, তিনি সব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাতে আরো রসান দিয়াছেন। 'রঘুবংশ'-এর চতুর্দশ সর্গের পঁচিশ কবিতায় আছে যে, রাম ও সীতা সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিয়া নানাচিত্রশোভিত গৃহমধ্যে দণ্ডকারণ্যে যে-সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়া সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

সুতরাং সেই যে চিত্রগুলি সেগুলি দণ্ডকারণ্যেরই চিত্র। সে চিত্রগুলি দেখিলেই পূর্বের কথাগুলি মনে পড়িত এবং রাম ও সীতার তাহাতে আনন্দ হইত। তাই এখানে ভবভূতি সাহস করিয়া এই চিত্রগুলি আনিয়াছেন। ইহাতে শুধু দণ্ডকারণ্যের বৃত্তান্ত নহে রামচরিত-এর প্রথম হইতে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পর্যন্ত সমস্ত ছবিই ছিল। ভবভূতি এই চিত্রদর্শন এত বাড়াইয়া তুলিলেন কেন? কালিদাসের ন্যায় শুধু দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার লইয়া থাকিলেই তো হইত। একটু বিশেষ কারণ আছে। রাম ও সীতার মনে আবার সেই বিরহ-ভাবটা জাগাইয়া দেওয়ার দরকার হইয়াছিল। তাই কবি বর্ষাকালে মাল্যবান্ পর্বতে রামের কান্নার ছবি দেখাইয়া "চিত্রদর্শন" এক প্রকার সাঙ্গ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ বলিলেন,

"সোঽয়ং শৈলঃ ককুভসুরভির্মাল্যবান্ নাম যস্মিন্
নীলঃ স্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতনস্তোয়বাহঃ।।"[৮]
[উত্তরচরিত, লক্ষ্মণের উক্তি, প্রথম অঙ্ক]

অমনি রাম বলিয়া উঠিলেন,

"বৎসৈতস্মাৎ-বিরম বিরমাতঃপরং ন ক্ষমোঽস্মি
প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ।।"[৯] [উত্তরচরিত, ১/৩৩]

চিত্র দেখিয়া রামেরই মনে হইতে লাগিল সীতার সহিত বিচ্ছেদ হইবে, তখন সে চিত্র দেখিয়া সীতার মনে কী ভাব হইল, অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। রামসীতার মনে এইরূপ একটা বিরহের ত্রাস উৎপাদন করা "চিত্রদর্শন" প্রস্তাবের একটা উদ্দেশ্য নয় কি? এ প্রস্তাবের একটা উদ্দেশ্য বঙ্কিমবাবু ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রাম সীতার অলৌকিক অসীম প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কথাটা ঠিক, কিন্তু যে তিনটি বিশেষণ দিয়াছেন, তাহাতে কবির কথাটি ফোটে নাই। "চিত্রদর্শনে" ও সীতার নিদ্রায় কবি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাম ও সীতা গোড়ায় দুই থাকিলেও ক্রমে ক্রমে ক্রমে,— ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক হইয়া গিয়াছিলেন, রামের হাতে মাথা রাখিয়া সীতার নিদ্রা আর কিছু নহে, রামের সত্তায় সীতার সত্তা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাওয়া। যতক্ষণ চিত্র দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ উহাদের শরীর ও মন ক্রমে কাছে কাছে আসিতেছিল। নিদ্রাবেশে আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে আসিল; সীতা যখন ঘুমাইয়া পড়িলেন তখন রাম বলিলেন,

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো—
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যস্তু [পরমসহ্যস্তুঃ] বিরহঃ।।"[১০]

[উত্তরচরিত, ১/৩৮]

তখন সীতার স্পন্দ নাই। ইহারই একটু পরে সীতা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "হা আর্যপুত্র! তুমি কোথায়?" রাম সীতার ঘুম যাহাতে না ভাঙে তাহা করিলেন, বলিলেন চিত্রদর্শনের জন্য ইঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইজন্য ইনি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহার পরই সীতার মুখের দিকে চাহিয়া রাম বলিলেন,

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেমসুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

[উত্তরচরিত, ১/৩৯]

এরূপ সুমানুষের প্রেম অতিকষ্টেই পাওয়া যায়। এরূপ বোধ হয় একবারই হইয়াছিল। ইহা সুখে এবং দুঃখে অদ্বৈত। সকল অবস্থাতেই অনুকূল। এই প্রেমেই হৃদয়ের বিশ্রাম হয়। বৃদ্ধ হইলে ইহার রস শুষ্ক হয় না বরং যত কাল যাইতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে যে আবরণ থাকে তাহা দূর হইয়া যায় এবং সে প্রেমে স্নেহের সার হইয়া উঠে।

সীতার সত্তা তো নাই-ই, সে তো রামে ডুবিয়াই গিয়াছে। তাহার উপর রাম বলিতেছেন "অদ্বৈতং" "একং" অর্থাৎ সীতা ও আমি একমেবাদ্বিতীয়ং। "চিত্রদর্শন" প্রস্তাবের এই যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য বঙ্কিমবাবু তাহা ধরিয়াছিলেন, কিন্তু বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। আমি ফুটাইবার কতকটা চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফুটাইতে গেলে প্রবন্ধ তিনগুণ হইয়া পড়িবে, তাই এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এত কৌশলে ভবভূতি রাম ও সীতার প্রেমে সম্পূর্ণ অদ্বৈত ভাবটি দেখাইলেন, এর উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, জগৎকে দেখানো যে, সীতার বনবাসে রাম যথার্থই আত্মবলি দিয়াছেন। যখন সীতা ও রামে কোনো প্রভেদ নাই, তখন সীতার বিসর্জনের অর্থ রামেরও

আত্মবিসর্জন। বঙ্কিমবাবু ভবভূতির উপর বড়ো চটিয়াছেন, কারণ, তিনি রামকে কাঁদাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "এত বালিকার মতো কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কোনো অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা,— শব্দের বড়ো ঘটা কিন্তু অন্তঃশূন্য—" "এইরূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহাকবির অযোগ্য, কেবল আধুনিক বিদ্যালঙ্কারদিগের যোগ্য।" বঙ্কিমবাবু যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার যেরূপ প্রতিভা ছিল, তাহাতে তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সাহস করিয়া সেইকথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই-সকল উক্তি, তাঁহার সাহস ও প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। যে রামচন্দ্র এইমাত্র আপনাকে সীতার সহিত এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র সীতার বনবাসে নিজের যে সব নাশ হইল তাহাও বুঝিয়াছেন। সীতাকে, দুর্মুখের মুখে নিন্দা শুনিবামাত্র, ত্যাগ করিতে তিনি স্থির সংকল্প: এই যে ঝট্‌পট্ একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা কি অসামান্য বীরের কর্ম নহে? তিনি মন্ত্রসভা আহ্বান করিলেন না, মন্ত্রণা করিয়া সময়ক্ষেপ করিলেন না, একেবারে দুর্মুখকে দিয়া লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, সীতাকে বিসর্জন দাও। বঙ্কিমবাবু এদিক হইতে একেবারে দেখেন নাই, তিনি কান্নাই দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই কান্নার ভিতর যে অমানুষ তেজ— অমানুষ বীরত্ব রহিয়াছে তাহা তিনি লক্ষ করেন নাই। তিনি ভবভূতিকে পরীক্ষা করিতে গিয়া ভবভূতির অলৌকিক ক্ষমতার কথাটা ধরিতেই পারেন নাই। রামায়ণে রামচন্দ্র সভায় সীতার অপবাদের কথা ভাবিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। হইলে তখনি তাঁহাকে লোকে কাপুরুষ বলিত। সেখান হইতে উঠিয়া ভাইদের ডাকাইলেন, মন্ত্রণা করিলেন, বলিলেন, — "সীতাকে বিসর্জন দিয়া আইস" কিন্তু সীতার সহিত দেখা করিলেন না। সুতরাং তিনি ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন, চোখের জল সামলাইতে পারিলেন, মনের আগুন মনেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু ভবভূতির ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। চিত্রদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া রাম ভাবিয়াছেন সীতার কথা; সীতা ভাবিয়াছেন রামের কথা; ক্রমে সীতার সত্তা রামে ডুবিয়া গেল, রাম সীতাময় ও সীতা রামময় হইয়া উঠিলে ক্রমে দুইয়ে এক হইয়া গেলেন। তখনই দুর্মুখ তাঁহাকে সীতার অপবাদের কথা বলিল। রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং পরে উঠিয়া কাঁদিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রাম কাপুরুষ, কিন্তু সীতা বিসর্জন মীমাংসায় উপনীত হইতে তো তাঁহার এক মিনিটও দেরি হইল না। লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিতেও

তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি আত্মবলি দিলেন, তাহার উপর দুফোঁটা চোখের জল পড়িল বলিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ বলিব? বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, আর যে বলিতে হয় বলুক আমি তো পারিব না। আমি তো দেখি এ রাম রামায়ণ-এর রামের অপেক্ষা, প্রেমেও বড়ো, বিরহেও বড়ো, বীরত্বেও বড়ো। তবে মানুষ তো? রক্ত মাংসের শরীর তো? এ অবস্থায় নির্জনে বিশেষ সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ কিছুতেই পরিহার করা যায় না।

উত্তরচরিত-এর তৃতীয় অঙ্ক সব অঙ্কের চেয়ে ভালো। উহাতে রামকে পঞ্চবটী আনা হইয়াছে, যে পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র সীতার সহিত বনবাসে থাকিয়া দশ বৎসরকাল নির্মল দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, বিধির বিপাকে আজ আবার রামচন্দ্র সেই পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইতেছেন। এখন সীতা নাই, সীতাকে রাম ইচ্ছাপূর্বক বনবাস দিয়াছেন, সুতরাং তাহার কোনো খোঁজও লইতে পারেন নাই। অথচ পঞ্চবটীর সর্বত্রই সীতার স্মৃতি জাগরূক। এরূপ অবস্থায় রামকে কীরূপে সান্ত্বনা করা যায়। যদি কোনো বিশেষরূপে সান্ত্বনার উপায় না করা যায়, তাহা হইলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন, বা তাঁহার জীবননাশের সম্ভাবনা। পঞ্চবটীতে গোদাবরীর নিকট মুরলানদী গিয়া তাই বলিলেন,— রামচন্দ্র যখনই মূর্ছিত হইবেন, তুমি ঠাণ্ডা হাওয়া করিয়া তাঁহার মূর্ছা দূর করিও। গোদাবরী বলিলেন,— রামকে সান্ত্বনা করিবার একটি ভালো উপায় উপস্থিত হইয়াছে, ভগবতী ভাগীরথীর কথায় সীতা নিজেই ফুল তুলিতে পঞ্চবটী আসিয়াছেন, আজ তাঁহার ছেলেদের জন্মতিথি পূজা। সীতার সঙ্গে তমসানদী আছেন। ভগবতী ভাগীরথী তাঁহাদের দুজনকেই অদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা সকলকেই দেখিতে পাইবেন, অথচ তাঁহাদের কেহই দেখিতে পাইবেন না। বলিতে বলিতে গোদাবরীর হ্রদ হইতে সীতা উঠিতে লাগিলেন, এমন সময় নেপথ্যে শব্দ হইল "প্রমাদঃ প্রমাদঃ।" কে একজন বলিয়া গেল, সীতা যে হাতির ছানাটিকে নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিলেন, আর-একটা দুষ্ট হাতি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, কে এখন ইহাকে রক্ষা করিবে? শুনিয়াই সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্যপুত্র আমার বালককে রক্ষা করো।" এ যে পঞ্চবটী, পঞ্চবটীতে তাঁহার যেমন অভ্যাস ছিল, তেমনি বলিয়া ফেলিলেন; তাহার পরই যখন সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল তখন তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহার যাহাতে চেতনা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে রামের রথ আসিয়া পৌঁছিল। রাম বলিলেন, "বিমানরাজ অত্রৈব

স্থীয়তাম্"। সে স্বর সীতার কানে ঢুকিবামাত্র তাঁহার মুর্ছাভঙ্গ হইল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া তমসা তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কী একটা স্বর শুনিয়া তুমি এমন বিহ্বল হইয়া গেলে?" সীতা বলিলেন, "না তমসা, এ স্বর আমার চিরপরিচিত। ইহা আমার আর্যপুত্রের স্বর, ইহাতে আমার কান ভরিয়া গিয়াছে।" ক্রমে বনদেবতা বাসন্তী আসিয়া রামের কাছে জুটিলেন। সীতার কাছে তো তমসা আছেনই। সীতা শোকে অভিভূত হইলে তমসা তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন; কেন-না তিনি নদী, তিনি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা করাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু ওদিকে রামচন্দ্র বেশি শোকে অভিভূত হইলে বনদেবতা বাসন্তী তাঁহাকে পুরানো কথা স্মরণ করাইয়া আরো উত্তেজিত করিয়া তুলেন, কারণ তিনি বনদেবতা তাঁর সহৃদয়তা বড়ো কম। তাঁহাকে একটু নিষ্ঠুর বলিলেও বলা যায়, যেহেতু তিনি বনের দেবতা। রাম মূর্ছিত হইলে তমসার পরামর্শে সীতা আসিয়া রামকে স্পর্শ করেন, তাহাতে রামের মূর্ছা ভাঙিয়া যায়। তিনি সীতার হাত ধরিবার চেষ্টা করেন, একবার ধরিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু তিনি সে হাত রাখিতে পারেন নাই। এই যে সীতা,— অদৃশ্য সীতা — ছায়া সীতা— ভবভূতি ইহা কোথায় পাইলেন? বঙ্কিমবাবু ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাটি বলেন নাই বরং বলিয়াছেন জিনিসটা একটু লম্বা হইয়াছে। যতটুকু হইলে মানাইত তাহা অপেক্ষা বেশি হইয়াছে। ভূদেববাবু বলিয়াছেন[১১] যে, ও ছায়া-সীতা রামের কল্পনা মাত্র। "হ্যাল্লিউসিনেশন" মাত্র। কেন-না রাম যখনই থামেন তখনই সীতা কথা কন, অর্থাৎ রাম সুখে থাকিলে তাঁহার হৃদয় হইতে ঐ-সকল কথা বাহির হয়। এই "হ্যাল্লিউসিনেশন" বুঝাইবার জন্য ভূদেববাবু তেষট্টি পাতা লিখিয়াছেন, অনেক গুণপনা দেখাইয়াছেন, অনেক গভীর কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু জিনিসটি খোলে নাই। তাঁহার তেষট্টি পাতা পড়িয়াও কাহারো বিশ্বাস হয় নাই যে এটি সত্য সত্যই রামের বিপ্রলম্ভ বা "হ্যাল্লিউসিনেশন"। বঙ্কিমবাবু বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন না। ভূদেববাবুর কথায় প্রতীতি হইল না। তবে এ ছায়া-সীতা কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া বুঝিব? এক উপায়— সেই উপায় সংস্কৃত সাহিত্য-সাগরে ডুব দাও। দেখ ভবভূতি কোথা হইতে এ ছায়া-সীতা আনিয়াছেন, এবার বেশি-দূর যাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়া-সীতার মূল পাওয়া যাইবে। কৌশলী কালিদাস শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুষ্মন্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও তাহার মুখে

শ্রোতাদের শকুন্তলার অবস্থা জানাইয়াছেন। সে অপ্সরা বারংবার বলিয়াছে যে শকুন্তলা যদি দুষ্মন্তের এইরূপ অবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রাজা যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখ করিতেন না। ভবভূতি দেখিলেন, বাঃ এত বেশ সাজানোই আছে! আমি কেন তিরস্করণী-আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। বাস্তবিকও ভবভূতি তাহাই করিয়াছেন। ভাস[১২] হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর-একটুকু রসান দিয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টাটা তিনি ভাসের বাসবদত্তা হইতে লইয়াছেন। এ সৃষ্টিতে মুগ্ধ না হইয়াছেন এমন লোকই নাই। তথাপি বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, ভবভূতির সৃষ্টি ক্ষমতা তত উচ্চদরের নহে। একবিষয়ে বঙ্কিমবাবু ভবভূতিকে খুব উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে আমরা তাঁহার কথাই উদ্ধার করিতেছি,

"রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন রস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনীমুখে স্নেহ উচ্ছলিতে থাকে— শোক দহিতে থাকে— দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙিতেছে, মর্ম ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে, দেখিতে পাই, সীতা কখনও বিস্ময়স্তিমিতা, কখনও আনন্দোত্থিতা, কখনও প্রেমাভিভূতা, কখনও অভিমানকুণ্ঠিতা, কখনও আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা, কখনও অনুতাপবিবশা, কখনও মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন।"

নারায়ণ
বৈশাখ, ১৩২২ ।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল Edward Byles Cowell (১৮২৬ - ১৯০৩) পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশোনার কাজ ছেড়ে সংস্কৃতবিদ্যাচর্চায় নিবিষ্ট হন। অক্সফোর্ডে সাহিত্য ও মানববিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স স্নাতক (১৮৫৪) কাউয়েল ১৮৫৬-য় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৮৫৮-য় সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করলে তাঁর জায়গায় প্রথমে অফিসার-ইন-চার্জ ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কাউয়েল। তাঁকে প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হত। ১৮৫৮-৫৯-এর রিপোর্টে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন্ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, কলেজটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়নি। কাউয়েল এই ত্রুটি সংশোধনে উদ্যোগী হন এবং তাঁর চেষ্টায় ১৮৬০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে সংস্কৃত কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিধির অঙ্গীভূত হয়।

২. কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ভবভূতি খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বর্তমান ছিলেন। তিনি সম্ভবত কনৌজের রাজা যশোবর্মনের সভাকবির মর্যাদা পান। বিদর্ভের (মহারাষ্ট্র) এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম, পিতামহ ভট্ট গোপাল, পিতা নীলকণ্ঠ, মায়ের নাম জাতুকর্ণী। ভবভূতি বেদ উপনিষৎ এবং সাংখ্যা-যোগ-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে

পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর সব নাটক উজ্জয়িনীর দেবতা কালপ্রিয়নামের উৎসবে অভিনয় করা হত। রচনা 'মহাবীরচরিত' (বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডের ঘটনা নিয়ে লেখা), 'উত্তররামচরিত' (সাত অঙ্কে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিবরণ), 'মালতীমাধব' (মিলনান্ত প্রেমের নাটক)। নাটকের প্রয়োগকৌশলে তাঁর পারদর্শিতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার শিল্পগত সৌকর্য ভবভূতির রচনায় কোথাও কোথাও উৎকর্ষের পূর্ণতায় পৌঁছয়। মানবিক ও প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার মহনীয়তা, বিশালতার প্রকাশ তাঁর রচনায় অসামান্য। করুণ রসের রূপায়ণে তিনি নিপুণ কিন্তু হাস্যরস তাঁর হাতে তেমন জমে না।

হোরেস হেম্যান উইলসন Horace Hayman Wilson, *Selct Specimens of the theatre of the Hindus,* IIvols, London 1871 (প্রথম খণ্ডে 'উত্তররামচরিত'-এর অনুবাদ আছে।)

চার্লস হেনরি টনি Charles Henry Tawney, *UTTARA-RAMA-CHARITA,* Calcutta, 1871

বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ প্রবন্ধ "উত্তরচরিত" বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ - আশ্বিন, ৫ সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) বইয়ে সংকলন করেন। আবার 'বিবিধ সমালোচন' ও প্রবন্ধ-পুস্তক-এর (১৮৭৯) প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে সংকলিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগে (১৮৮৭) প্রথম প্রবন্ধ রূপে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম. এ., বি. এল অনূদিত উত্তরচরিত-এর সমালোচনা।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত বয়ানের প্রথম চারটি অনুচ্ছেদ বইয়ে সংকলনের সময়ে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বর্জিত অংশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য আছে। সংস্কৃতকাব্যরুচিতে বিদ্যাসাগরের অনুগামী হরপ্রসাদ এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবভূতি-পাঠ সম্পর্কে বিচারে উদ্‌যোগী হয়ে থাকবেন। বর্জিত অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল :

"ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যে রূপ অনুরাগ, উত্তচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত বোধ হয় না।' আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্য রসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মাধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন?

"বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা ঝিল বিল হ্রদের যেরূপ প্রাধান্য ভবভূতি অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেইরূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণ মধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস, কালদেরণ এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী বটে।

"সেক্ষপীয়র পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় কবি হইলেও ইউরোপে তাঁহার সমুচিত মর্যাদা অল্পকাল হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত, কেহই তাঁহার প্রণীত আশ্চর্য্য নাটক সকলের মর্ম্ম বুঝিতেন না। ড্রাইডেন, পোপ, জন্সন, প্রভৃতি সকলে স্বয়ং কবি, এবং সকলেই সযত্নে সেক্ষপীয়রের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রশাংসাও করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহার মর্ম্মগ্রহণ

করিতে পারেন নাই। বল্টের নিজে অতি প্রধান কবি— তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও সেক্ষপীয়রের কিছুই মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং তিনি অনেক নিন্দা এবং উপহাস করিয়াছিলেন। এই ইংলণ্ডীয় কবির যথার্থ মর্য্যাদা প্রথমে ইংলণ্ডে হয় নাই— শ্লেগেল এবং অন্যান্য জর্ম্মণগণ আধুনিক সেক্ষপীয়র-পূজার সৃষ্টিকর্ত্তা।

"যদি সেক্ষপীয়রের এইরূপ হইল, তবে ভবভূতিরও যে এতকাল সমুচিত মর্য্যাদা হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আমরাও যে ভবভূতির সমুচিত প্রশাংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প। কিন্তু এই সময়ে নৃসিংহবাবু কর্ত্তৃক ইহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ, এবং টনি সাহেব কর্ত্তৃক একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রচার হইয়াছে, এই উপলক্ষে আমরা উত্তরচরিত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯)

ভবভূতির মূল্যায়ন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষ একটু বিস্ময়ের। কারণ, বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশের (১৮৭২) অনেক আগে সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৭ দ্বিতীয় সংস্করণ) বইয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন,

"..... ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশাংসা এই যে, অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু

ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথপোকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

....

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক, এই নাটক করুণরসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুব, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা আদিরসবিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরসবিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপতি করিতে হয়।" (পৃ. ৪৮-৫০)

প্রসঙ্গত স্মরণীয় ১৮৭০-এ উত্তরচরিতম্ নামে বিদ্যাসাগর নিজের সংস্কৃত টীকা সমন্বিত একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

১৮৭২ সালে এফ. এ. পরীক্ষার পাঠ্য বই হিশেবে আবার বিদ্যাসাগর উত্তরচরিতম্-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন With Notes and Explanations for the use of Candidates... ।" এই সংস্করণের ভূমিকায় প্রসঙ্গত লেখেন, "ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে।

"উত্তরচরিত করুণরসাশ্রিত নাটক। এই নাটক কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থগাম্ভীর্যেপরিপূর্ণ। রচনা মধুর ও প্রগাঢ়। করুণরস বিষয়ে ভবভূতের উত্তরচরিত সংস্কৃতভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য।"

৩. শিশুপালবধ কাব্যের কবি মাঘ খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে বর্তমান ছিলেন মনে করা হয়। আলংকারিক রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা (নবম শতক) গ্রন্থে, আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক (নবম শতক) গ্রন্থে এবং বামন কাব্যালঙ্কার (অষ্টম শতক) গ্রন্থে মাঘের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাই মাঘের কাব্যের রচনাকাল অষ্টম শতকের পরে হতে পারে না। ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্য অনুসরণ করে মাঘ 'শিশুপালবধ' রচনা করেছিলেন। মাঘ খুব বড়ো মাপের কবি নন, তবে অলংকার প্রয়োগ ও ভাষার ব্যবহার শৈলীর কারুদক্ষতার জন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে মর্যাদার আসন পেয়ে আসছেন।

৪. কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের রচয়িতা ভারবির নাম পাওয়া যায় মহীশূর রাজ্যের বিজাপুর জেলার আইহোলি নামে প্রাচীন গ্রাম মেগুটি মন্দিরের শিলালিপিতে। এই শিলালিপি দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে খোদাই, তারিখ ৬৩৪ খৃ.। বিখ্যাত কবি রূপে ভারবির নামের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এর অনেক আগেই তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ১৮ সর্গে সম্পূর্ণ কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের বিষয় কিরাত-ছদ্মবেশী শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ। কাহিনী নিয়েছেন মহাভারত-এর বনপর্ব থেকে। ভারবি অত্যন্ত সচেতন ভাষা-শিল্পী। রচনার অর্থগৌরবের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

৫. নৈষধীয়চরিত মহাকাব্যের কবি শ্রীহর্ষ শ্রীহীর পণ্ডিত ও মামল্লদেবীর ছেলে বলে কাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। শ্রীহর্ষের জীবনকাল নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো মতে নবম-দশম শতাব্দী, কোনো মতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ রচনা খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-র বিষয় বেদান্ত। আরো কয়েকটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, শ্রীবিজয়-প্রশস্তি, গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি, স্থৈর্যবিচারণ, ছন্দঃপ্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি। এই বইয়ে 'ভবভূতি' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য — ৬ দ্র.।

৬. সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : ১. বিশ্বনাথ রচিত 'সাহিত্যদর্পণ', দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত; ২. মম্মট রচিত 'কাব্যপ্রকাশ', রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

৭. শ্রীরাম শিরোমণি নামটি অনবধানতা বশত লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাটপাড়ার জয়রাম ন্যায়ভূষণ-এর কাছে পাঠ নিতে যেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি মহসীন কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ কোর্স শেষ করে আইন পড়বার জন্য ১৮৫৬-য় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন; সেখান থেকে বি.এ. পরীক্ষা দেন। হুগলি মহসীন কলেজে পড়ার সময়ে ও বি.এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ে ছুটির দিনে সংস্কৃত কাব্যের পাঠ নেবার জন্য জয়রাম ন্যায়ভূষণের কাছে যেতেন। জয়রাম ভাটপাড়ার 'টোলের বাড়ির' ঠাকুর হরিরাম তর্কবাগীশের পৌত্র, বামদেব বাচস্পতির পুত্র। মূলত ন্যায়ের অধ্যাপক হলেও সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ ও অলংকারে জয়রামের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাটপাড়ার টোলে উচ্চতর ব্যাকরণ চর্চার প্রবর্তক জয়রামের পাণিনি-ব্যাকরণের এবং মেঘদূত ও নৈষধের টীকা টিপ্পনি সমকালীন চতুষ্পাঠিতে ব্যবহৃত হত। জ্যোতিষবিদ্যায়ও তাঁর অধিকার ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে আনুমানিক পঁচাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। জয়রামের বাস ছিল এখনকার ভাটপাড়ার সংলগ্ন রেলের কাঠপুলের পশ্চিমে। সে পথটির নাম এখন জয়রাম ন্যায়ভূষণ লেন। জয়রাম অপুত্রক ছিলেন। তাঁর ছোটোভাই রঘুমণি বিদ্যাভূষণের পুত্র মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁর বৈঠকখানায় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক শোনাতে আসতেন। জয়রামের পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক ধারাবাহিক হয়ে ওঠে। (দ্র. পঞ্চানন তর্করত্ন, "পূজ্যপাদ জয়রাম ন্যায়ভূষণ", মাসিক বসুমতী, ...)

৮. অনুবাদ : এই সেই অর্জুনপুষ্পসুরভিত মাল্যবান্ পর্বত যার শিখরে প্রথম উদিত নয়ন-স্নিগ্ধকর নীলমেঘ আশ্রয় করে।

৯. অনুবাদ : বৎস, এবার থামো থামো। আমি আর এ প্রসঙ্গ সইতে পারছি না। সীতার বিরহবেদনা আবার আমাকে আচ্ছন্ন করছে।

১০. অনুবাদ : সে (সীতা) আমার গৃহের লক্ষ্মীশ্রী। আমার নয়নের অমৃতবর্তিকা, তার ওই স্পর্শ আমার দেহ চন্দন-সুধারসে অভিষিক্ত করে, তার বাহুর আলিঙ্গন আমার কণ্ঠে শিশিরকোমল মুক্তার মালাধারণের মতো সুখকর। তার কী-ই বা আমার প্রিয় নয়—শুধু তার বিরহই অসহ্য।

১১. "উত্তরচরিত বৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে তাহা বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমরা পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কটি মাত্র সমালোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।" ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম ভাগ (উত্তরচরিত, রত্নাবলী এবং মৃচ্ছকটিক-এর সমালোচনা), হুগলি ১৩০২, পৃ. ১-২।

১২. এই বইয়ে শকুন্তলার মা প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য-১ দ্র.

কালিদাসের মেয়ে দেখানো

কালিদাসের নাটকে মেয়ে দেখানোর একটা বেশ কায়দা আছে,— কাব্যেও তাঁর মেয়ে দেখানোর একটা কায়দা আছে। লোকে বলে, কালিদাস একজন মহামূর্খ ছিলেন; পণ্ডিত স্ত্রীর কাছে গালি খাইয়া মনের দুঃখে তিনি বিবাগী হইয়া যান, শেষে কোনো সিদ্ধপুরুষের পরামর্শে সরস্বতীর আরাধনা করিতে থাকেন। সরস্বতী তাঁহাকে বর দেন "তুমি বড়ো কবি হইবে"। বর দিবামাত্র কালিদাসের কবিতা ফুটিয়া উঠিল,— তিনি প্রথমেই সরস্বতীর বন্দনা আরম্ভ করিলেন। যেমন অন্য লোকে স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা করে, সেইরূপে তিনিও মাথা হইতে পা পর্যন্ত সরস্বতীর রূপবর্ণনা করিলেন। সরস্বতী কিন্তু তাহাতে একটু রাগত হইলেন,— এবং "তুই একটা সামান্য বেশ্যার মতো আমার রূপ বর্ণনা করিলি, তুই দেবতার রূপ বর্ণনা করিতে জানিস্ না,— তুই কেবল আদি রসের কবি হইবি" বলিয়াই তিনি অন্তর্ধান হইলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই কালিদাস কুমারসম্ভবে যখন পার্বতীর রূপবর্ণনা করেন, তখন মাথা হইতে পা পর্যন্ত বর্ণনা না করিয়া পা হইতে মাথা পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মেয়েকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার সর্বাঙ্গের রূপ বর্ণনা কালিদাসের এই প্রথম ও এই শেষ। তাহাতেই লোকে বলে কালিদাস সরস্বতীর কাছে যে পাপ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। যদি বলো, মেঘদূত-এও তিনি যক্ষপত্নীর সর্বাঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সে বর্ণনায় ও কুমারসম্ভব-এর বর্ণনায় একটু বিশেষ আছে। কালিদাস কুমারসম্ভব-এ উনিশটি কবিতায় পার্বতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনায় তাঁহার একটি মাত্র শ্লোক খরচ হইয়াছে এবং তাহাতে উনিশটি মাত্র কথা আছে। আবার রঘুবংশ-এ ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে তিনি ইন্দুমতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন,

একটিও কবিতা খরচ করেন নাই, দাঁড়াইয়া সর্বাঙ্গ বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু সুনন্দা যখন ইন্দুমতীকে এক রাজার কাছ হইতে অন্য রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে, তখন এক-একটি করিয়া উনিশটি মাত্র বিশেষণ দিয়াছেন; তাহাতেই একটি জমকালো রূপবর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

নাটকের রূপবর্ণনা কিন্তু আর-এক রকম। প্রতি নাটকেই প্রথমেই তিনি মেয়ে দেখাইয়াছেন। মেয়েটিকে তিনটি ভঙ্গিতে দাঁড় করাইয়া অন্য ব্যক্তির মুখে তাঁহার সর্বাঙ্গের বর্ণনা করাইয়াছেন। কোনো নাটকেই তিনের উপর চার অবস্থা দেখানো নাই। বাস্তবিকও দেখাইতে গেলে একটু যেন লম্বা হইয়া পড়ে, একটু একঘেয়ে হয়। তাই কালিদাস তিনেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এক-একবার তিন-তিন অবস্থা দেখাইয়া জগতের সম্মুখে এক-একটি অপরূপ রূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রবন্ধে এই তিনটি ভঙ্গিরই ব্যাপার দেখাইব।

কালিদাসের নাটক তিনখানি, তিনখানিই যে কালিদাসের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের কিনা সে বিষয় অনেকে সন্দেহ করিত। আমার সে সন্দেহ একেবারে নাই, তাই আমি তিনখানিই কালিদাসের বলিতেছি। মালকাগ্নিমিত্র-র পাত্রগুলি সবই পৃথিবীর। মালবিকা নিজে বিদর্ভরাজার কন্যা। মালবরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া স্থির ছিল, তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল মালবিকা।

বিক্রমোর্বশীর পাত্রগণ প্রায়ই স্বর্গের। উর্বশী নিজে অপ্সরা— তাহার সহচরীরা অপ্সরা। ভরতমুনি স্বর্গের নাট্যকার। উর্বশী তাঁহার নাটকে অভিনয় করেন। অভিজ্ঞনশকুন্তলায় স্বর্গ ও মর্তের বেশ সমাবেশ আছে। শকুন্তলা ঋষির ঔরসে অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছেন। তিনি যেখানে থাকেন সেটা হিমালয়ের পাদদেশে, পৃথিবীতে স্বর্গের দুয়ারে। রাজা ত্যাগ করিলে তিনি যেখানে গেলেন সেটি স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে। পাত্রগুলি কতক স্বর্গের, কতক মর্তের, কতক মাঝখানের। কালিদাস যেন প্রথমেই পৃথিবীর জিনিস লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি একেবারে স্বর্গে গিয়া উঠিলেন। স্বর্গ বড়ো উঁচু জিনিস,— স্বর্গের নাটক লিখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তাই যেন তিনি স্বর্গ মর্ত দুই মিশাইয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তলা রচনা করেন।

আমি এই তিনখানি নাটকের মেয়ে-দেখানোর কৌশল এই ক্রমেই দেখাইব— প্রথমে দেখাইব মালবিকাগ্নিমিত্রের, পরে বিক্রমোর্বশীর, তারপরে অভিজ্ঞান-শকুন্তলার।

মালবিকাগ্নিমিত্রে অগ্নিমিত্র রাজার রাজধানী বিদিশানগরে রাজার যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ঘর, সেইখানে মেয়ে দেখানো হয়। রঙ্গমঞ্চ বাঁধা প্রেক্ষকদের জন্য গ্যালারি করা। উপস্থিত আছেন রাজা, তাঁহার বিদূষক ও রানী। আর-একজন আছেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত চৌষট্টি কলায় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ পরিব্রাজিকা। অসময়ে রানীর নিযুক্ত নৃত্যাচার্য গণদাস তাঁহার শিষ্যা মালবিকাকে লইয়া প্রেক্ষাগৃহে আসিলেন। গণদাস তাঁহার শিষ্যাকে রাজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "ভয় করিও না— প্রকৃতিস্থ হও।" এই অবস্থায় রাজা তাহার রূপ দেখিয়া লইলেন। মালবিকার রূপ দেখাই রাজার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পূর্বে উহার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ছবির রূপ প্রকৃত রূপের সহিত মিলিবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। সম্মুখে মালবিকাকে দেখিয়া সে সন্দেহ তো তাঁহার দূর হইলই, বরঞ্চ তিনি ভাবিলেন ছবিওয়ালা ঠিক আঁকিতে পারে নাই। তিনি তাহার চোখ দেখিলেন, মুখ দেখিলেন, হাত দুটি দেখিলেন, বক্ষঃস্থল দেখিলেন, পার্শ্ব দেখিলেন— ভাবিলেন নর্তকী হইবার জন্যই বুঝি বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর গণদাস কেমন নৃত্য শিখাইয়াছে তাহার পরীক্ষার জন্য শর্মিষ্ঠার প্রণীত চতুষ্পদিকা গান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছলিক নামে নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন। শর্মিষ্ঠা নাচিতে নাচিতে এই গান করিয়াই যযাতির প্রতি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মালবিকাও নাচিতে নাচিতে সেই গান করিলেন। যেখানে যেমন রস তাহার নাচও সেই রসই প্রকাশ করিতে লাগিল। কালিদাস একবার দাঁড় করাইয়া মেয়ে দেখাইছেন, এবারে নাচে ও গানে মেয়ে দেখাইলেন। কিন্তু কালিদাসের আর-এক রকমে মেয়ে দেখাইতে হইবে। বিদূষকেরও আর-এক রকমে মেয়ে দেখাইতে হইবে। নাচিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া মালবিকা যাইবার উপক্রম করিলেন। বিদূষক বলিয়া উঠিল, একটু থাকো, তুমি একটা কাজ ভুলিয়া গিয়াছ। গণদাস ভাবিল বুঝি সত্যই কিছু ভুল হইয়াছে। তিনি বলিলেন,— মালবিকা তোমার দোষ হইয়াছে, তাহা স্খলন করিয়া যাও। রানী চটিয়া উঠিলেন। রানীতে আর গণদাসে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল।

পরিব্রাজিকা মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। ইত্যবসরে রাজা সে দাঁড়ানো-রূপ আবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইলেন। কিন্তু দাঁড়ানো-রূপ তো একবার দেখানো হইয়াছে— তাহা দেখাইলে তো কালিদাসের তৃপ্তি হইবে না— বিদুষকেরও তৃপ্তি হইবে না। শেষ সকলে বিদূষককে বলিলেন— মালবিকা কী ভুলিয়াছে? বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, "প্রথম শিক্ষা দেখাইতে আসিলে, আগে যে ব্রাহ্মণের পূজা করিতে হয়— সেটা যে তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।" সকলে হাসিয়া উঠিল— মালবিকাও হাসিল— রাজার হাসি দেখা বাকি ছিল— তিনি বলিলেন, ইহার হাসি দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। ইহার হাসিমুখে কচি দাঁতগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে পদ্মটি ফোট ফোট হইয়াছে— কেশরগুলি কেবল একটু একটু দেখা যাইতেছে। বিদূষক আবার দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না— এবার গণদাস মালবিকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজারও কার্য শেষ হইল— কালিদাসেরও মেয়ে দেখানো শেষ হইল— আমাদেরও কনে দেখা শেষ হইল।

বিক্রমোর্বশীতে উর্বশী অনেকগুলি অপ্সরার সঙ্গে মহাদেবের পূজা করিয়া কুবেরের বাড়ি হইতে ফিরিয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন। পথে কেশী নামে দানব বেগে আসিয়া উর্বশী ও চিত্রলেখাকে রথে চড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। অপর অপ্সরারা চিৎকার করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা পুরূরবা সূর্যোপস্থান করিয়া মর্তে ফিরিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি থাকিতে কে আর্তনাদ করে?" অপ্সরারা চিৎকার করিয়া বলিল,— "ওগো! কেশীদানব উর্বশীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। দেবতাদের প্রতি যদি তোমার ভক্তি থাকে, আমাদের সখীকে বাঁচাও।" রাজা কেশীকে দূর করিয়া উর্বশী ও চিত্রলেখাকে আপনার রথে লইয়া অপ্সরাদের নিকট আসিলেন— উর্বশীর রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম প্রবেশ। উর্বশী তখনো চোখ চাহিতে পারিতেছেন না— তাঁহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রলেখা ডান হাত দিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া রহিয়াছে— রাজা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন— "আর ভয়ের কোনো কারণ নাই— তুমি চক্ষু মেলো।" চিত্রলেখা বলিতেছেন, "কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসেই বোধ হইতেছে ইনি বাঁচিয়া আছেন এখনো আমাদের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না।" রাজা দেখিলেন, উহার হৃদয়ের কম্প কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। ঐ দেখো মন্দার কুসুমমালা কেবল

উঠিতেছে আর পড়িতেছে। স্তনদ্বয়ের মধ্যে আঁচলটি একবার উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ক্রমে উর্বশীর চৈতন্য হইল। রাজা দেখিলেন চাঁদ উঠিলে যেমন অন্ধকার হ্রাস হয়— ধূম গত হইলে যেমন অগ্নির শিখা বাহির হয়— পাড় ভাঙিয়া পড়িলে গঙ্গার জল প্রথমে ঘোলা হইয়া উঠে ও পরে ক্রমশ পরিষ্কার হয়— ইঁহার মোহ তেমনি অপগত হইতেছে— ইহার প্রাণ আবার ফিরিয়া আসিতেছে। উর্বশী মনে করিয়াছিলেন ইন্দ্রই বুঝি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু যখন শুনিলেন পুরূরবা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তিনি চক্ষু মেলিয়া রাজাকে একবার দেখিলেন। দেখিয়াই মনে মনে বলিলেন, কেশী তো তবে আমার বেশ উপকারই করিয়াছে। এইভাবে উর্বশী, রাজা ও সখী পরস্পর কথাবার্তা কহিতে কহিতে ও পরস্পর নানারূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অন্য অপ্সরারা যেখানে ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উর্বশীকে রথ হইতে নামানোর চেষ্টা করা হইল। তিনি রথ হইতে নামিতে গিয়া ভয়ে পড়িয়া যাইতে যাইতে রাজাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রাজা মনে মনে বলিলেন, আমি যে দেশে ফিরিয়া আসিলাম তাহা সফল হইয়াছে। যেহেতু ইঁহার অঙ্গে আমার রোমাঞ্চিত অঙ্গ স্পর্শ করিল। কালিদাস মূর্ছা অবস্থায় উর্বশীকে একবার দেখাইলেন— মূর্ছাভঙ্গের অবস্থায় একবার তাঁহাকে দেখাইলেন— রথ হইতে নামিবার সময় একবার তাঁহাকে দেখাইলেন— তাঁহার মেয়ে দেখানো শেষ হইল— অমনি ইন্দ্রের দূত আসিয়া অপ্সরাদের স্বর্গে লইয়া গেলেন— রাজাকেও যাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন ইন্দ্রের সহিত দেখা করিবার এ সময় নয়। নাটকের অঙ্ক শেষ হইয়া গেল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-তে রাজা দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন — তিনটি মেয়ে ছোটো ছোটো ঘটে জল লইয়া ফুলগাছে দিতেছে, কিন্তু এ তিনটির কোনটি যে শকুন্তলা তাহা তিনি চেনেন না। সেইটি চিনিয়া লওয়া তাঁহার প্রথম দরকার। কালিদাসও তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন। একজন বলিলেন, সখীরা এদিকে এসো। আর-একজন বলিলেন, শকুন্তলে, তোমার চেয়েও দেখিতেছি তোমার বাবা এ গাছগুলিকে ভালোবাসেন। তোমার শরীর নবমালিকার মতো কোমল— তোমাকে দিয়াও তিনি এই-সকল গাছে জল দেওয়াইতেছেন! তখন প্রথম মেয়েটি বলিল, বাবার কথায়ই কি আমি জল দিতেছি, ইহারা কি আমার সহোদর নহে? ইহাদের

প্রতি কি আমাদের স্নেহ নাই? এই বলিয়া সে গাছে জল দিতে লাগিল। তখন রাজা চিনিলেন— এইটিই কণ্বের মেয়ে,— শকুন্তলা। তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ মেয়েকে আশ্রমধর্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্বমুনি ভালো করেন নাই। তিনি কি নীলপদ্মের পাপ্‌ড়ির ধার দিয়া শাঁইগাছ কাটিতে চান?" এই বলিয়া তিনি গাছের আড়ালে গিয়া তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলেন। জল দেওয়ার অবস্থায় শকুন্তলাকে কালিদাস একবার দেখাইলেন। শকুন্তলা ঋষিকন্যা— ঋষির আশ্রমে লালিতা, সুতরাং তিনি পরেন বল্কল। গাছের ছাল পিটিয়া পিটিয়া খুব নরম এক রকম কাপড়ের মতো হইত— বেশ পুরু হইত, কিন্তু গাছের ছাল তো? আমাদের ধুতি অপেক্ষা অনেক শক্ত। আর দশহাত বাকল তো আর পাওয়া যাইত না? কোমরে বড়ো জোর দেড় ফের কি দুই ফের হইত। আর একখানা বাকল একটা কাঁধের উপর দিয়া বুকটা ঢাকিয়া রাখিত। এইরূপ দুখানা বাকল পরিয়া শকুন্তলা নুইয়া নুইয়া গাছে জল দিতেছিলেন— বাঁকল আঁটা ছিল তাহার বড়ো কষ্ট হইতেছিল— তাই তিনি একজন সখীকে বলিলেন, আমার বাকলখানা একটু শিথিল করিয়া দাও। সে শিথিল করিয়া দিল— শকুন্তলা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন— আর এক ভঙ্গিতে কালিদাস রাজাকে শকুন্তলার রূপ দেখাইলেন। রাজাও বলিয়া উঠিলেন—

"সরসিজমণুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং" ইত্যাদি—
[যেমন শৈবাল যুক্ত পদ্মও সুদৃশ্য হয়]

একবার নোয়াইয়া শকুন্তলাকে দেখানো হইয়াছিল। এবার ঠিক সোজা করিয়া তাঁহাকে দেখানো হইল। কিন্তু আর-এক ভঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তাই কালিদাস তাঁহাকে এক আমগাছের তলায় দাঁড় করাইলেন— সে আমগাছে একটি নবমালিকা উঠিয়াছে। নবমালিকার ফুল ফুটিয়াছিল— তাহাতে ভ্রমর বসিয়াছিল। গাছে জল দেওয়ায় গাছ নড়িয়া উঠিল— সেও উড়িয়া গেল। উড়িয়া শকুন্তলার মুখের উপর বসিতে গেল। পাছে কামড়ায় বলিয়া শকুন্তলা বড়ো ভয় পাইলেন। তিনি যেদিকে যান, ভ্রমরও সেদিকে যায়। কখনো কানের গোড়ায় যায়, কখনো চোখের উপর বসিতে যায়— তাড়াইয়া দিলে আবার ঘুরিয়া আসে— শকুন্তলা অন্যত্র চলিয়া গেলে, সেও সঙ্গে সঙ্গে যায়। তখন শকুন্তলা বসিয়া

ভাবিলেন, কে আমায় এই দুর্বিনীত মধুকরের হাত হইতে রক্ষা করে— কালিদাস দু-প্রকারে রূপ দেখাইয়াছেন; ভ্রমর বাধায় তিন রকমে দেখানো হইল— আর তাঁহার রূপ দেখাইবার ইচ্ছা নাই। সখীরা বলিল,— আমরা কী করিয়া তোমায় রক্ষা করিব; তপোবনের রক্ষাকর্তা রাজা, — তুমি দুষ্যন্তকে ডাকো। এই কথা বলিতে বলিতেই দুষ্যন্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপ-দেখানো পর্ব শেষ হইয়া গেল।

তিন নাটকেই রূপ দেখানো পর্বই একরকম। মেয়েটিকে তিন অবস্থায় ফেলিয়া দেখানো। তবে মালবিকা রাজার মেয়ে— শিক্ষিতা, কলাপটু, এখন তিনি দাসী হইয়াছেন— আত্মগোপন করিয়া চলেন— তাঁহাকে দেখিতে রাজার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, তিনিও শিক্ষিতা যুবতীর ন্যায় দেখা দিয়া গেলেন। একবার দাঁড়াইলেন, একবার নাচিলেন, একবার হাসিলেন— তাঁহার অবস্থা যেরূপ, বেশিক্ষণ রাজদরবারে থাকা তাঁহার অভিপ্রেত নহে— তিনি সরিয়া পড়িলেন। বেশ চতুরার মতো আপনার মনের ভাব রাজাকে বুঝাইয়া গেলেন— আপনিও রাজার মনের ভাব বুঝিয়া গেলেন। এক রাজা ও বিদূষক ভিন্ন কেহই সেকথা বুঝিল না।

উর্বশী অপ্সরা, থাকেন স্বর্গে। স্বর্গে সবই সুখ, বিশেষ তিনি নারায়ণের উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন— তিনি অপ্সরাগণের মধ্যে সকলের অপেক্ষা শিক্ষিতা। ভরতমুনি সকল নাটকেই তাঁহাকে নায়িকা সাজাইতেন। কিন্তু দেবতাদের এক ভয়,— দানবের। উর্বশীকে দানবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তিনি ভয়ে বিহ্বল— জ্ঞানশূন্য। সেই অবস্থায় কালিদাস তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে আনিলেন— তাঁহার চৈতন্য হইল— সে অবস্থাও দেখাইলেন। তাহার পর রথ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজাকে ধরিলেন। তিন অবস্থা দেখানো হইল।

শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা, একজন ঋষি তাঁহার পিতা। আর-একজন ঋষি তাঁহাকে পালন করেন। তিনি সংসারের কোনো ধারই ধারেন না। গাছে জল দেন— বাবার পূজার আয়োজন করিয়া দেন— তপোবনের কার্য করেন। তিনি মালবিকার ন্যায় চতুরাও নহেন, উর্বশীর ন্যায় পাকাও নন— তাই

কালিদাস মুগ্ধভাবেই তিন অবস্থায় তাঁহার রূপ দেখাইলেন; — একবার দেহ বেঁকাইয়া, একবার দাঁড় করাইয়া, আর-একবার ভ্রমরের ভয়ে চকিত করিয়া। রূপ দেখানো হইলে রাজার সহিত তাঁহার চাক্ষুষ হইল। যদি পূর্বে চাক্ষুষ হইত, তাহা হইলে কালিদাসের আর রূপ দেখানো হইত না। শকুন্তলা নিশ্চয়ই একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু মালবিকা ও উর্বশীর বেলায় রূপ দেখানোর সময়েই চাক্ষুষ হইয়াছিল, কারণ কালিদাস জানিতেন ইহারা রাজা দেখিয়া জড়সড় হইয়া যাইবে না।

নারায়ণ

ভাদ্র, ১৩২২ ।।

সীতার স্বপ্ন

উত্তরচরিত-এর প্রথম অঙ্কটিকেই একখানি পুরা নাটক বলিলে হয়। কারণ ভবভূতি মহাবীরচরিতে রামায়ণ-এর যে কয় কাণ্ড লইয়াছেন এক চিত্রদর্শনে প্রায় সেগুলি সব লওয়া হইয়াছে তবে এই চিত্রদর্শনের দরকার কী— একথার জবাব দিবার জন্য আমরা এপ্রবন্ধ লিখিতেছি না। চিত্রদর্শনের পর সীতার নিদ্রা— সীতার স্বপ্ন, রামের সীতাপরিত্যাগ, সীতার নিদ্রাভঙ্গ এইসব লইয়া প্রথম অঙ্ক। প্রথম অঙ্কেরও সবকথা আমরা বলিব না। কবি কেমন কৌশলে সীতাকে ঘুম পাড়াইয়াছেন ও কেমন সময়ে কী অবস্থায় তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন শুদ্ধ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

চিত্র খুব লম্বা। বিশ্বামিত্রের নিকট রামের অস্ত্রলাভ হইতে আরম্ভ হইয়া সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত। চিত্র সব দেখানো হয় নাই। সব দেখাইবার ভবভূতির ইচ্ছাও ছিল না। যাহাতে রামের চরিত্র ফুটে, যাহাতে সীতার চরিত্র ফুটে, যাহাতে রামসীতার অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রেম ফুটে, ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া সেইগুলিই দেখাইয়াছেন। তাহারও মাঝে মাঝে রামচন্দ্র ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, পরশুরামের ব্যাপারটা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কৈকেয়ীর কীর্তি একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং খুব সংক্ষেপই করা হইয়াছে। চিত্রটা বোধ হয় একালকার ম্যাপের মতো গুটানো ছিল। লক্ষ্মণ একটু একটু খুলিতেছিলেন, ও দেখা হইলেই অমনি গুটাইতেছিলেন। রাম যেখানটা দেখাইতে বারণ করিলেন সেখানটা লক্ষ্মণ না দেখাইয়াই গুটাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে পঞ্চবটী আসিল; সূর্পণখা আসিল; অমনি সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্যপুত্র, এই তোমার আমায় শেষ দেখা।" রাম বলিলেন, "ভয় কী! এ তো ছবি বৈ কিছু নয়।" সীতা বলিলেন, "যাহাই হউক, দুর্জনের ছবি দেখিলেও কষ্ট হয়।"

সীতাহরণের পর রামের যে দুঃখ, কান্না, হা-হুতাশ, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখানো হইল। রাম আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। সীতা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ অন্য রস আনিবার চেষ্টা করিলেন— জটায়ুর বৃত্তান্ত আনিলেন, হনুমানের চিত্র দেখাইলেন— রামের দুঃখ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সীতা একে পূর্ণগর্ভা, নড়িতে চড়িতে, ভাবিতে চিন্তিতে, সকল অবস্থাতেই তিনি ক্লান্তি বোধ করেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে, অনেক পুরানো কথা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই। শেষ রাম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন,

"বৎসৈতস্মাৎ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি
"প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ।"

[বৎস! এর পরে বিরত হও, বিরত হও। এর পরে
আর সহ্য করতে পারছি না। পুনরায় আমার যেন
সেই সীতা বিরহ ফিরে এল।]

লক্ষ্মণ দাদা ও বড়বৌ-এর এইরূপ ভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ছবি গুটাইয়া বলিলেন, "এর পর আরো ছিল; এর পর আরো ছিল। বানর ও রাক্ষসদের অদ্ভুত যুদ্ধ ইত্যাদি অনেক ছিল। তা, আর্যা বড়ো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন— আপনারা বিশ্রাম করুন।"

লক্ষণ চলিয়া গেলে রাম সীতাকে বলিলেন, "চলো আমরা জানালার ধারে একটু বসি।" সীতা অমনি বলিলেন, "বড়ো ক্লান্ত হইয়াছি— ঘুমে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে।" রাম বলিলেন, "আমারই গায়ের উপর গা দিয়া শয়ন করো, তোমার হাত আমার গলায় জড়াইয়া দাও। আমার মৃত শরীরে জীবন আসুক।" এই বলিয়া তিনি সীতার হাত দুখানি আপনার গলায় জড়াইয়া লইলেন। সীতা যতই নিদ্রায় কাতর হইতে লাগিলেন, তাঁহার হাত ক্রমেই রামের শরীরে বসিতে লাগিল এবং সীতার করস্পর্শে রাম আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি বললেন, "একী! সুখ বা দুঃখ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, আমি জাগিয়া আছি না ঘুমাইয়া আছি; বিষে আমায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে, না নেশায় আমায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে? তোমার অঙ্গ যতই আমার অঙ্গে গাঢ় হইয়া বসিতেছে ততই আমার

ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আমার মনের ভাব আর-এক রকম হইয়া গিয়াছে— আমার চেতনা লোপ হইতেছে, ভ্রম উপস্থিত হইতেছে।"

সীতার ঘুমের ঘোরে অধিক কথা কহিবার ইচ্ছা নাই— তাই তিনি গোটাকতক কথা কহিলেন,—

"থিরপ্পসাদা তুম্হে, ইদোদাণিং কিমবরং"

একটি কথার বাংলা করা বড়োই কঠিন। ইহার সব ভাবগুলি ফুটাইয়া বাংলা করিতে গেলে লম্বা হইয়া পড়ে। ঘুমের ঘোরে তত কথা কেহ কয় না, তাই মোটামুটি বাংলা করিতেছি "তুমি বড়ো ভালোবাস— তা ছাড়া আর কী?" তখন সীতার চোখ দুটি ঘুমে গোল হইয়া আসিতেছে তাই রাম বলিলেন, "হে সরোরুহাক্ষি! জাগিয়া থাকিলে যে চোখ পদ্মের পাপড়ির ন্যায় বা চেরা পটলের মতো হয়— ঘুম আসে আসে এমন সময়ে সেইটি গুটাইয়া একটু গোল হইয়া আসে।" তাই রাম এখানে "সরোরুহাক্ষি" বলিয়া সীতাকে সম্বোধন করিয়াছেন। সম্বোধন করিয়া রাম বলিলেন, "জীবনের ফুল যখন মলিন হইয়া আসে, তোমার এই মধুর কথা শুনিলে তাহাকে আবার ফুটাইয়া দেয়— আত্মা, শরীর ও মন সকলের তৃপ্তি করিয়া দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে মুগ্ধ ও শিথিল করিয়া দেয়, কানে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দেয় এবং মনের বল আনিয়া দেয়।"

সীতার ঘুমের ঘোর ক্রমে অধিক হইয়াছে— তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না,— বলিলেন, "পিঅংবদ! এহি সংবিসম্হ"— [প্রিয়ংবদে! এস, সমুপবেশন করি.....] 'আমি শোব' বলিয়া চারিদিকে কী খুঁজিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন, "কী খুঁজিতেছ?— বালিশ!— এই তো আমার হাত আছে, শোও। যেদিন বিবাহ হইয়াছে সেইদিন হইতে ঘরে বলো, বনে বলো, বাল্যে বলো, যৌবনে বলো, এইখানেই তুমি শয়ন করিয়াছ— এই তোমার বালিশ আর কেহ কখনো এ বালিশে শোয় নাই।" ঘুমে সীতার কথা আরো জড়াইয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন— "*একথা ঠিক, একথা ঠিক*"— তখনই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাম বলিলেন, "সীতা সত্যসত্যই আমার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল?" তিনি স্নেহের চক্ষে সীতাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী, চক্ষে অমৃতের বাতি, ইঁহার স্পর্শ যেন আমার শরীরের ঘন চন্দন। এই যে

আমার গলায় ইঁহার হাত রহিয়াছে, ইহা মুক্তার মালা, সরস, শীতল, এবং সুখস্পর্শ। ইঁহার কোন জিনিসটি আমার প্রিয় নহে? কেবল একমাত্র আমার পক্ষে অসহ্য— ইঁহার বিরহ।

রামের মুখে এই "বিরহ" শব্দটি বাহির হইবার পরক্ষণে দ্বারী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেব উপস্থিত।" "বিরহ" শব্দটি উচ্চারণ হইবার পরই "উপস্থিত" শব্দটি শুনিয়া রামের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে! কে উপস্থিত?" দ্বারী বলিল, "দুর্মুখ— আপনার খানসামা"। রাম মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দুর্মুখ আমার ভিতর বাড়ির চাকর, আমি তাহাকে চর করিয়া পাঠাইয়াছি। নগরেরর লোক ও দেশের লোক আমার সম্বন্ধে কে কী বলে সে আমায় তাহাই জানাইয়া যাইবে।" বলিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

দুর্মুখ আসিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিল আমি কেমন করিয়া রামের কাছে সীতার সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত অপবাদের কথা বলিব। অথবা আমি বড়ো হতভাগা! আমার চাকরিই এই।

দুর্মুখ এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় সীতা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হা আর্যপুত্র! তুমি কোথায়?" রাম বলিলেন, "ছবি দেখিতে দেখিতেই বিরহের একটা উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তিনি সেই বিরহই স্বপ্নে দেখিতেছেন।" বলিয়া সীতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সুমানুষের এমন প্রেম অতি কষ্টেই পাওয়া যায়। ইহা এক, এক ছাড়া দুই নহে; ইহা সুখে ও দুঃখে একরূপ; সকল অবস্থাতেই অনুকূল কখনো প্রতিকূল হয় না— ইহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম হয়; বৃদ্ধবয়সেও ইহার আনন্দ হ্রাস হয় না বরং যত কাল যাইতে থাকে, উভয়ের মধ্যে যে আবরণ ছিল তাহা সরিতে থাকে, তখন ঘন ও নিবিড় স্নেহে গিয়া দাঁড়ায়।"

গর্ভাবস্থায় বিশেষ পূর্ণগর্ভ অবস্থায় স্ত্রীলোকের মনে কোনোরূপ ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ না হয়— এটি সকলেই দেখিয়া থাকেন। লোকের মনের ধারণা ওরূপ অবস্থায় ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ হইলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে, সেইজন্য জনক বাড়ি যাইবেন শুনিয়া পাছে সীতার মনে উৎকণ্ঠা হয় তাই রামচন্দ্র ধর্মাসন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত হইবার পরই সীতার

মনে স্ফূর্তি হইবে বলিয়া ভবভূতি অষ্টাবক্রকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অষ্টাবক্র আসিয়া উঁহাকে তাঁহার গুরু গুরু-পত্নী শাশুড়ি ও ননদ সকলে ভালো আছেন একথা বলিলেন। সীতা ব্যস্ত হইয়া প্রত্যেকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা আমাদের মনে করেন কি?" অষ্টাবক্র বলিলেন, "শুধু কি মনে করেন—সর্বদাই কামনা করেন তোমার যাহাতে একটি বীরপুত্র হয়।" অষ্টাবক্র বেশ চতুর লোক— সীতার যাহাতে স্ফূর্তি হয় এমন কথাই কহিয়া গেলেন। তিনি যাইতে-না-যাইতেই ভবভূতি লক্ষ্মণকে ছবি লইয়া উপস্থিত করিলেন। রামের তাহাতে বড়োই আনন্দ—আপনাদের পুরাণ বৃত্তান্তের ছবি দেখিলে, বাপ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সীতা আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না— বলিলেন, "দেবীর উৎকণ্ঠা হইলে কেমন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে হয়, ভাই লক্ষ্মণ, তুমিই তাহা জানো।" প্রথমেই ব্রহ্মাস্ত্রের ছবি। রাম বলিলেন, এসব অস্ত্র এখন তোমার ছেলেদেরই হইবে। সীতা মা হইতে যাইতেছেন, ছেলেদের ভালো হইবে শুনিলে কোন্ মায়ের না আনন্দ হয়? সীতারও তাহাই হইল। তাহার পর বিবাহের ছবি। বিবাহের দিনের কথা মানুষের যত মনে থাকে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কথাই তাহার তত মনে থাকে না। মনে থাকে কেন?— সেদিন বড়ো আনন্দের দিন,— সেকথা যতবার স্মরণ হয় ততবারই আনন্দ হয়। সীতারও তাহাই হইল। সীতার বিবাহের সময় একটা ভয়ের কারণ হইয়াছিল— পরশুরামের আসা। রাম সে ছবি দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারিলেন। সীতার মনে পাছে ভয় হয়, সেটা তিনি বন্ধ করিলেন আর আপনারও যেটা গরিমার কথা সেটা লইয়াও আলোচনা করিতে দিলেন না। এইরূপে চলিতে লাগিল। পাছে কৈকেয়ীর দুর্ব্যবহার মনে পড়িলে সীতার দুঃখ হয়,— সে ছবিও রাম দেখিতে দিলেন না— আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষ লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাম করিলেন। দুঃখেও যেমন লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে— আনন্দেও সেইরূপ লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে— বিশেষ সীতার মতো অবস্থায়। সূর্পণখা দেখাইবার আগেই যদি সীতা ক্লান্তিবোধ করিতেন, বোধ হয় এতটা ঘটিত না— বিরহ বিরহ বলিয়া মনে একটা ত্রাস জন্মিত না। কিন্তু নিষ্ঠুর কবি সেকথা শুনিবেন কেন? তিনি তাঁহার কলাকৌশল দেখাইতেই ব্যস্ত। ঐ সময়ে সূর্পণখাকে না আনিলে যে ভবভূতির নাটক লেখা হয় না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের মুখে সূর্পনখার নামটি করাইলেন— ছবিও দেখাইলেন। এতক্ষণে বাপের জন্য সীতার যে উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা তো দূর

হইয়াছিল; নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া কেহ ছিল না— তিনজনে আনন্দে ভোর হইয়া যাইতেছিলেন। তখন যে সূর্পণখার নাম উপস্থিত করিলেই সীতার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইবে লক্ষ্মণের তাহা মনেই ছিল না। তিনি পঞ্চবটীর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্পণখার নাম করিলেন ও তাহার ছবি দেখাইলেন— হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। সীতার বিরহে রামের যে কী অবস্থা হইয়াছিল সীতা তো তাহা দেখেন নাই— সেগুলি দেখাইয়া সীতাকে খুশি করিতে গেলেন; আবার বিপরীত ফল ফলিল— রাম সেসব কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। রামের দুঃখে সীতারও দুঃখ বাড়িয়া উঠিল। রসান্তর উপস্থিত করিয়া রামকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহাতেও তত কৃতকার্য হইলেন না। শেষ ছবি গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

রাম পুরুষ মানুষ, বিশেষ তিনি একটা প্রকাণ্ড পুরুষ, তিনি সহজেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। সীতা কিন্তু পরিশ্রমে, ভাবনায় ও উৎকণ্ঠায় ঘুমে ঢলিয়া পড়িলেন। রাম আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে কত মিষ্ট কথাই কহিতে লাগিলেন। রাম একটি একটি কবিতা বলিতে লাগিলেন। সীতা ছয়টি কথায় প্রথম কবিতাটির উত্তর দিলেন, দ্বিতীয়টির তিনটি কথায়। রাম যখন তৃতীয়টি বলিলেন, তখনো সীতা দুইটি ছোটো ছোটো কথায় জবাব দিলেন, কিন্তু সে দুটি দুবাব করিয়া বলিলেন। নিদ্রার আগে লোকে এইরূপ এক-কথা দুই-বারই বলে— তাহার পরই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুর্মুখ প্রবেশ করিয়া যখন সীতার সর্বনাশের কথা ভাবিতেছিল, তখনই সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য পুত্র তুমি কোথায়?" সূর্পণখার নাম শুনিয়া অবধি সীতার মনে যে বিরহের উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা নিদ্রায়ও যায় নাই। তাই এই স্বপ্ন। এই স্বপ্নই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া। কিন্তু আমরা সীতার নিদ্রার ও স্বপ্নের কথাই কহিতেছি— ভবিষ্যৎ বিপদের কথা এখন তুলিব না।

নারায়ণ

আশ্বিন, ১৩২২।।

কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা

কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত-বর্ণনা করিয়াছেন। ১ম, ঋতুসংহার-এর ষষ্ঠ সর্গে। ২য়, মালবিকাগ্নিমিত্রে ৩য় অঙ্কে। ৩য়, কুমারসম্ভব-এর তৃতীয় সর্গে, সেটি অকাল বসন্ত। ৪র্থ, রঘুবংশের নবম সর্গে। বর্ণনা ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনা ক্রমেই ছোটো হইয়া আসিয়াছে, ক্রমেই বাজে জিনিস ছাঁটা পড়িয়াছে। জিনিসগুলি ক্রমেই বেশি করিয়া ফুটিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা আরো দেখিবেন ভাষা ক্রমে মধুর হইতে মধুরতর ও মধুরতম হইয়া গিয়াছে। ছন্দে সুরও মধুরতর মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে।

ঋতুসংহার-এর ষষ্ঠ সর্গে কালিদাস আটাশটি কবিতায় বসন্ত-বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। তিনি বসন্তকে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফুটে-উঠা আমের মুকুল তাহার বাণ, ভ্রমরের সার তাহার ধনুকের ছিলা। কামীগণ তাহার শত্রু, তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। বসন্তকালের সবই মনোহর। গাছে ফুল ফুটিয়াছে; জলে পদ্ম ফুটিয়াছে। বাতাসে গন্ধ ভরিয়াছে; যুবক যুবতীর মন উদাস হইয়াছে। যুবতীরা কুসুমফুলের রঙে ছোপাইয়া রেশমের কাপড় পরিয়াছে, এবং কুঙ্কুমে ছোপাইয়া রেশমের কাপড়ের ওড়না করিয়াছে। তাঁহাদের কানে গোছা গোছা সোঁদালের ফুল, অলকে অশোকফুল, এবং সর্বাঙ্গে নবমল্লিকাফুলের অলংকার। শীতকাল চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা মুক্তার হারে চন্দন লাগাইয়া গলায় পরিতেছেন। খুব পালিস-করা বালা ও বাজু পরিতেছেন এবং কোমরে চন্দ্রহারও পরিতেছেন। এতদিন তাঁহাদের মুখে যে অলকা-তিলকা কাটা থাকিত, তাহা একবার কাটিলে অনেকদিন চলিত, কিন্তু এখন আর সেটি হইবার জো নাই, বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়া সেগুলিকে উঠাইয়া

দিতেছে। অনঙ্গের আবির্ভাবে যুবতীগণের চক্ষু চঞ্চল হইতেছে, কপোল পাণ্ডুবর্ণ হইতেছে, শরীরবন্ধ শিথিল হইতেছে এবং বার বার মুখে হাই উঠিতেছে। তাহারা প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম, চন্দন ও মৃগনাভি মিলাইয়া অঙ্গরাগ করিতেছেন। মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরিতেছেন ও অগুরুধূপের ধোঁয়া দিয়া তাহাকে সুবাসিত করিতেছেন।

বসন্তে আমের মুকুল খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া কোকিল কোকিলার মুখচুম্বন করিতেছে, ভ্রমরও পদ্মের মধু খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গান করিয়া ভ্রমরীর মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমের মুকুলগুলি ফুটিয়াছে, তাহার নিচে কচি কচি রাঙা দু-একটি পাতা রহিয়াছে, বাতাসের ভরে গাছটি কাঁপিতেছে দেখিয়া মানুষের মন আকুল হইয়া উঠিতেছে। অশোকগাছের গোড়া হইতে রাঙা ফুল ফুটিয়াছে, তাহার উপর অশোকের কচি কচি চাটাল চাটাল গরদ কাপড়ের মতো পাতাগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া কোন্ যুবক বা যুবতীর মন স্থির থাকিতে পারে? আমের মুকুলে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার উপর, চারিদিক হইতে ভ্রমরেরা মত্ত হইয়া তাহার উপর পড়িতেছে, আর কচি পাতাগুলি অল্প বাতাসে তাহাদের উপর ঝুলিয়া পড়িতেছে। অতিমুক্তলতা দেখিয়া রসিকের মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, কারণ উন্মত্ত ভ্রমর এক-একবার ফুলে বসিতেছে আবার উড়িয়া যাইতেছে, আর তার কচি পাতাগুলি মৃদু বাতাসে নিচুমুখ হইয়া দুলিতেছে। কুরুবকের ফুল ফুটিয়াছে। মঞ্জরির চারিপাশে ফুল ঠিক যেন একখানি সুন্দর মুখ। সে মুখ দেখিয়া কাহার মন না উড়ু উড়ু করে। চারিদিকে পলাশের ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের ভরে গাছ সব নুইয়া পড়িয়াছে ও তাহার উপর বাতাস বহিতেছে। বোধ হইতেছে যেন অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বেড়াইতেছে। চারিদিকে পলাশবনে আচ্ছন্ন হওয়ায়, বোধ হয়, যেন পৃথিবী লাল চেলি পরিয়া আবার বিয়ের কনে সাজিয়াছেন। একে তো চারিদিকে পলাশ ফুটিয়াছে, ফুলগুলা যেন টিয়াপাখির ঠোঁট, তার উপর সোঁদালের ফুল, ইহার উপর আবার কোকিল ডাকিতেছে, এসময় কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? এসময়ের বাতাস বড়ো মিষ্ট, কারণ হিম আর পড়ে না, বাতাস গায়ে লাগিলে মনের একটু স্ফূর্তি হয়। বাতাস আসে, আমের বোল কাঁপিয়ে, বাতাস আসে, দূর হতে কোকিলের স্বর বহে নিয়ে। এ বাতাসে সকলেরই মন মোহিত হইয়া যায়। কুঁদফুলে বাগান আলো করে রয়েছে; দেখিলে বোধ হয় যেন

কোনো রসিকা যুবতী হাসিতেছে। এ সময়ের পাহাড়গুলি দেখিলে বড়োই আনন্দ হয়। পাহাড়ের চারিদিকে ফুলের গাছ ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে; কোকিলের ডাক পর্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যেখানে তক্তার মতো বড়ো বড়ো পাথর পড়িয়া আছে, সেইখানেই শিলাজতু বাহির হইয়া গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে। এই সময়ে বসন্তের সহচর অনঙ্গ তোমাদের মঙ্গল করুন। আম্রের মনোহর মঞ্জরি তাঁহার শর হইয়াছে, পলাশের ফুল তাঁহার ধনু হইয়াছে, ভ্রমরকুল তাঁহার জ্যা হইয়াছে। নহিলে ধনুকের ছিলা টানিলে গুন্ গুন্ শব্দ হয় কেন? চন্দ্র তাঁহার শ্বেতছত্র হইয়াছে, মলয়ানিল তাঁহার মত্ত হস্তী হইয়াছে, কোকিলেরা তাঁহার স্তুতিপাঠক হইয়াছে, এই-সকল অস্ত্রশস্ত্রের বলে তিনি সর্বলোক জয় করিতেছেন।

এই একরকম বর্ণনা; যেমনটি দেখা তেমনটিই লেখা। সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল কালিদাসের কবিত্বমাত্র। সে কবিত্ব এখনো ভালো করিয়া ফুটে নাই, এখনো উপমার বাহার নাই, উৎপ্রেক্ষার চটক নাই, অলংকারের ছড়াছড়ি নাই।

মালবিকাগ্নিমিত্রের বসন্ত-বর্ণনা।

মালবিকাগ্নিমিত্র-র ৩য় অঙ্কে রাজা বিদূষকের সহিত প্রমোদ-কাননে আসিতেছেন। ২য় অঙ্কে তাঁহার মালবিকার সহিত দেখা হইয়াছে, তিনি মালবিকার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। তাহার অত্যন্ত প্রণয়িণী ইরাবতীকে তাঁহার আর মনে ধরিতেছে না। যাহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি দাসীকে রানী করিয়াছিলেন, সেই ইরাবতী তাঁহাকে আজি বসন্তের প্রথম পুষ্প উপহার দিবে বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে। দু-জনে দোলায় চড়িয়া দোল খাইবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রাজা প্রমোদ-বনে যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার পা উঠিতেছে না, মন সরিতেছে না, কারণ ইরাবতী যদি কোনোরূপে টের পায় রাজার মন অন্যের প্রতি আসক্ত, তাহা হইলে সে প্রমাদ করিয়া ফেলিবে। রাজা বরং তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন না, কিন্তু তবুও তাহার কাছে ধরা দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিদূষক বরং রাজাকে বলিলেন, রানীদের সকলের উপরই আপনার সমান ভাব থাকা উচিত। রাজা কহিলেন, "তবে চলো"।

এইখানে প্রমোদবনে বসন্ত-বর্ণনা আরম্ভ হইল। বিদূষক বলিলেন, প্রমোদ-বন যে পল্লব-অঙ্গুলি নাড়িয়া আপনি "শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন" বলিয়া তোমায় ডাকিতেছে। এই সময়ে বসন্তের হাওয়া রাজার গায়ে লাগিল। রাজা বলিলেন, বসন্ত বড়ো উচ্চবংশজাত, বড়ো সহৃদয়। সে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেমন মদন-বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছ তো? নহিলে কোকিলেরা অমন করিয়া ডাকিতেছে কেন? তাহারা উন্মত্ত হইয়া ডাকিতেছে, আমার কান ভরিয়া যাইতেছে। বসন্তই কোকিলের মুখ দিয়া আমার বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আবার দেখ, আমের মুকুলের গন্ধে ভরিয়া মলয়-মারুত আমার গায়ে লাগিতেছে, বোধ হইতেছে যেন বসন্ত আমার বিরহ-জ্বালা নিভাইবার জন্য আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

বিদূষক প্রমোদ-বনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, বয়স্য, দেখ দেখ বসন্তলক্ষ্মী যেন তোমার মন ভুলাইবার জন্যই ফুলের গহনা পরিয়া আছে। যুবতীর বেশ এ বেশের কাছে কোথায় লাগে? রাজা বলিলেন, দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। ঠাকুরানীরা রাঙা ঠোঁটে আলতা পরেন, কিন্তু এক অশোকফুলেই বসন্ত-লক্ষ্মী সে আলতার উপরে উঠিয়াছেন। আর এই যে কুরুবকের ফুল,— কোনোটি কালো— কোনোটি শাদা— কোনোটি রাঙা— ঠাকুরানীরা যে অলকা-তিলকা পরেন সে কি এর কাছে লাগে? তাঁহারা যে তিলক কাটেন সে তিলকে আর বসন্তের তিলক-ফুলে ঢের তফাত; বিশেষ যখন সে ফুলে ভ্রমর গিয়া অঞ্জনের কাজ করে। স্ত্রীলোকেরা মুখের শোভা বৃদ্ধির জন্য যা-কিছু করিয়া থাকেন, বসন্ত-লক্ষ্মী যেন সেগুলাকে অবজ্ঞা করিতেছেন।

যখন মালবিকা তরুরাজি মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার দিকে আসিতেছেন, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, দেখো, ইহার গণ্ডস্থল পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গিয়াছে, গায়ে কয়েকখানি মাত্র গহনা রহিয়াছে, ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ইনি বসন্তকালের কুন্দলতা। কুন্দলতা মাঘ মাসে ফুলে ভরিয়া থাকে; যত বসন্ত আসিতে থাকে, ইহার ফুল আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। আর উহার সবুজ পাতাগুলি পাকিয়া শাদা হইয়া যায়। সুতরাং মালবিকার এখনকার অবস্থার সহিত উহার তুলনা হইয়াছে।

মালবিকাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখিয়া যখন বিদূষক ইঙ্গিত করিলেন, এ তোমারই জন্য উৎকণ্ঠা, তখন রাজা বলিলেন, মলয়-মারুত গায়ে লাগিলে অকারণেও উৎকণ্ঠা হয়। কারণ মলয়-মারুত কুরুবকের ধূলি মাখিয়া সুবাসিত হয়; আর কচি কচি পাতাগুলির জোড় খুলিয়া ভিতর হইতে ঠাণ্ডা জলের কণা চুরি করিয়া ঠাণ্ডা হয়। মলয়-মারুতই মালবিকার উৎকণ্ঠার কারণ।

এই অঙ্কে মালবিকা আসিয়াছেন অশোকের দোহদ করিবার জন্য। যে অশোকগাছের ফুল ফুটে না, অথবা ফুল ফুটিতে দেরি হয়, কবিরা মনে করেন, কোনো নিখুঁত সুন্দরী যদি সাজিয়া গুজিয়া নূপুর পরিয়া সেই অশোককে পদাঘাত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফুল ফুটে। তাই রানী মালবিকা দাসীকে নিজের সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া প্রমোদ-কাননে এইরূপ এক অশোকগাছে পদাঘাত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। মালবিকার সাজসজ্জায় বসন্তের ফুল, বসন্তের পল্লব, বসন্তের মুকুলও আছে। মালবিকার চরণ-স্পর্শ মাত্র অশোকগাছ ফুলে ভরিয়া গেল। তাই দেখিয়া রাজা বলিলেন, অশোকের পল্লব লইয়া উনি কানের গহনা করিয়াছেন, আর তাহারই বদলে নিজের চরণখানি তাহাকে দিতেছেন। বেশ সমান সমান বিনিময় হইতেছে।

এ-সকলই বসন্ত-বর্ণনা। ফুল ফল গাছপালার বর্ণনা তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা অনুরাগ প্রভৃতিও আছে। উৎকণ্ঠা অনুরাগের সঙ্গে ঈর্ষা দ্বেষও আছে। কিন্তু ঈর্ষা দ্বেষ মালবিকার নহে, ইরাবতীর। উভয়েই বসন্তকালে ক্রীড়া করিতে আসিয়াছিলেন। যিনি স্বপ্নেও দুর্লভ পদার্থ পাইলেন, তিনি আনন্দে ভোর হইলেন; আর যিনি পাওয়া ধন হারাইলেন, তিনি ঈর্ষায় কলুষিত হইলেন।

কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনা।

কুমারসম্ভবের বসন্ত অকাল বসন্ত। দারুণ শীতের মধ্যে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বসন্ত আসিল, দেখিয়া হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বসিয়া যাঁহারা যোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যোগের মহাবিঘ্ন উপস্থিত। সূর্য দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে গেলেন। দক্ষিণ দিক যেন প্রিয়-বিরহে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। তাই একটু একটু গরম মলয়বাতাস বহিতে লাগিল। স্বয়ং মূর্তিমান বসন্ত উপস্থিত, তাই অশোকগাছ আগাগোড়া ফুলে ভরিয়া গেল। যুবতীর পাদপ্রহারের জন্য অপেক্ষা করিল না। নূতন আমের মুকুল ফুটিয়া উঠিল, তাহার গোড়া হইতে গুটিকতক লাল কচি কচি পাতা বাহির হইল। তাহাতে ভ্রমর আসিয়া জুটিল, বোধ হইল যেন মদনের চোকা বাণ। পাতাগুলি বাণের পাখা, আর ভ্রমরগুলি ধনুকধারীর নামের অক্ষর। সোঁদালের ফুল ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল রঙে দিক আলো করিয়া রহিল। পলাশ ঘোরালো লাল, এখনো ফুটে নাই— বাঁকা হইয়া রহিয়াছে, যেন সুন্দরী যুবতীর গায়ে নখের দাগ রহিয়াছে। তিলক ফুল ফুটিয়াছে, তাহাতে সারি সারি ভ্রমর বসিয়াছে, যেন বসন্তলক্ষ্মী মুখে অলকা-তিলকা কাটিয়াছেন। আমের কচিপাতা বসন্তলক্ষ্মীর ওষ্ঠ, তাহাতে সূর্যের লাল কিরণ পড়িয়াছে, যেন তিনি লাল ঠোঁটে আলতা দিয়াছেন। পিয়াশাল গাছের মঞ্জরি বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রাশি রাশি ধূলা বাহির হইতেছে, বসন্তের আগমনে হরিণগুলা মদমত্ত হইয়া ঘুরিতেছে, আর তাহাদের চক্ষে সেই ধূলা পড়িতেছে; তাহারা বনের ভিতর দৌড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের পায়ের চাপে তলায় পড়া শুক্‌না পাতাগুলি মড়্‌মড়্ করিয়া শব্দ করিতেছে। কোকিলেরা আমের মুকুল খাইতেছে, কষা জিনিস খাওয়ায় তাহাদের গলা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে, আর তাহারা কুহু কুহু রবে মন মাতাইয়া দিতেছে। যেসব গরবিণী মান করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মান সেই কুহু-স্বর শুনিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কিন্নরীরা শীতকালে মুখে অলকা-তিলকা কাটিয়াছিলেন, তখন একবার কাটিলে অনেক দিন থাকিত, এখন একটু গরম পড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে, আর অলকা-তিলকাগুলি উঠিয়া পড়িতেছে।

পশুপক্ষীরাও বসন্তের প্রভাব অনুভব করিতে লাগিল এবং আপন আপন প্রিয়ার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ভ্রমর ভ্রমরীর সঙ্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর একই ফুলে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কৃষ্ণসার শিং দিয়া মৃগীর গা চুলকাইয়া দিতেছে আর মৃগী চক্ষু বুজিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছে। হস্তিনী পদ্মপুকুরের সুগন্ধি জল শুঁড়ে লইয়া অনুরাগভরে হস্তীকে দিতেছে, আর চক্রবাক একটি মৃণালের অর্ধেক খাইয়া বাকি আধখানি চক্রবাকীকে দিতেছে। কিন্নরী ফুলের মদ খাইয়া গান ধরিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু ঘুরিতেছে, পরিশ্রমে

ঘাম হইতেছে, অলকা-তিলকাগুলি ফুলিয়া উঠিতেছে, কিন্নর সে মুখ দেখিয়া কি আর মনের বেগ সংবরণ করিতে পারে? লতা আসিয়া তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে, বড়ো বড়ো ফুলের থোকা তাহাদের স্তন, লাল লাল কচি কচি পাতাগুলি তাহাদের ওষ্ঠ হইয়াছে, আর তাহাদের শাখাগুলি হাতের মতো নিচের দিকে ঝুলিতেছে। অপ্সরারা গীতি আরম্ভ করিয়াছেন।

এই তো হইল কুমারসম্ভব-এর অকালবসন্ত-বর্ণনা। ইহার পর পার্বতী আসিতেছেন। তিনিও কবির বসন্ত-বর্ণনে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার গায়ে অশোক ফুলের গহনা, পদ্মরাগমণি তাঁহার কাছে কোথায় লাগে। সোঁদালের ফুলের গহনা দেখিয়া কে বলিবে এ সোনার গহনা নয়? নিসিন্ধা [নিসিন্দা] ফুলের হার হইয়াছে যেন সত্যসত্যই মুক্তার হার। তিনি এত ফুলের গহনা পরিয়াছেন যে, ফুলের ভরে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। বোধ হইতেছে যেন ফুলে ও পাতায় ভরা একটি লতা চলিয়া যাইতেছে। বকুলফুলে তাঁহার চন্দ্রহার হইয়াছে, সেটা যত পড়িয়া যাইতেছে তিনি ততই তাহাকে টানিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাসের গন্ধে অন্ধ হইয়া ভ্রমর তাঁহার মুখের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর তিনি হাতের পদ্ম দিয়া তাহাকে তাড়াইতেছেন।

রঘুবংশের বসন্ত-বর্ণনা।

রঘুর নবম সর্গে কালিদাস আর-একবার বসন্তবর্ণনা করিয়াছেন। দশরথরাজা খুব ভালো রাজত্ব করিতেছেন দেখিয়া বসন্ত পুষ্পের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্যদেব কুবেরের দেশে যাইবার জন্যই যেন ঘোড়া ফিরাইয়া মলয়পর্বত ত্যাগ করিলেন। বরফ গলিয়া গেল। প্রভাত নির্মল হইয়া উঠিল। যে বনে বড়ো বড়ো গাছ ছিল তাহাতে প্রথম ফুল ফুটিল, তাহার পর নূতন পাতা গজাইল। তাহার পর ভ্রমর ও কোকিল ডাকিয়া উঠিল। এইরূপে একের পর আর আসিয়া বসন্তকে প্রকাশ করিল। পলাশগাছে কুঁড়ি ধরিল, যেন তাহার গায়ে নখের দাগ পড়িয়াছে। সূর্যদেব শিশির শুখাইয়া দিলেন, কারণ হিমে স্ত্রীলোকদিগের অধরে বড়ো যাতনা হয়, আর উহারা চন্দ্রহার পরিতে পারে না।

আমের শাখায় মঞ্জরি বাঁধিল। আর শাখাটি মলয়-মারুতে দুলিতে লাগিল, বোধ হইল যেন সে ঋষিদিগেরও মন ভুলাইবার জন্য অভিনয় শিক্ষা করিতেছে। যেখানে যত ভ্রমর ছিল, আর জলে পাখি ছিল তাহারা আসিয়া পদ্মবনের চারিদিকে জুটিল, কেন-না পদ্মে এখন খুব মধু। এইরূপেই লোকের যখন খুব সম্পদ হয় তখন নানালোকে তাহার নিকট উপকার পাইবার জন্য উপস্থিত হয়। অশোকতরুর ফুলই যে কেবল লোকের মন উড়ু উড়ু করিয়া দেয় এমন নহে। উহার কচি কচি পাতাগুলিও স্ত্রীলোকের কানে লাগাইয়া রাখিলে লোকের মন কেমন কেমন করিতে থাকে। কুরুবকের ফুল ফুটিল, বোধ হইল যেন বসন্ত উদ্যান-লক্ষ্মীর মুখে অলকা-তিলকা কাটিয়া দিলেন। কুরুবকে যথেষ্ট মধু আছে, মধুকরেরাও চারিদিকে খুব রব তুলিয়া দিল। মধুলুব্ধ মধুকরেরা লম্বা লম্বা সারি বাঁধিয়া বকুলগাছকে আকুল করিয়া তুলিল, কেন-না তাহার ফুল ফুটিয়াছে। সে ফুলের গন্ধ সুগন্ধ মদের ন্যায়। সুন্দরীরা মদের গণ্ডুষ না দিলে তো তাহার ফুল ফুটে না। কুসুমিত বনরাজিতে কোকিলের প্রথম ডাক শোনা গেল। যেন নূতন বৌ দুটি-একটি কথা কহিতেছে। উপবনের লতাগুলিতে নূতন কচি পাতা বাহির হইয়াছে, তাহাতে বাতাস লাগিতেছে, বোধ হইতেছে যেন সে হাত দিয়া ভ্রমরের গানে লয় দিতেছে। ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মদ্য নিজের গন্ধে বকুল ফুলের গন্ধকে পরাজয় করিয়াছে। মদ্যপান করিলে মনের ভাব নানারূপ হইয়া যায়, তাই স্ত্রীলোকে স্বামীর সহিত মদ্যপান করিতেছে। রাজবাড়ির দিঘিগুলিতে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, নানাজাতীয় জলচর পক্ষী আনন্দভরে কলরব করিতে করিতে তাহার উপর সার বাঁধিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে দিঘিগুলি যেন রমণী সাজিয়াছে; পদ্মগুলি তাহাদের হাসি হাসি মুখ, আর পাখির সারগুলি তাহাদের চন্দ্রহার, শব্দ করিতেছে আর ধনুর আকারে বাঁকিয়া পড়িয়াছে। বসন্তের আগমনে রজনী কৃশ হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর আবার চন্দ্রের উদয়ে তাহার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন প্রিয়-বিরহে কোনো বধূ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছেন ও তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। হিমের কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, চন্দ্রের কিরণ পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্র যেন এই-সকল কিরণের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ বৃদ্ধি করিতেছে। আহুতি প্রদান করিলে প্রজ্বলিত অগ্নির যেরূপ রং হয়, সোঁদাল ফুলের রং তেমনি হইয়াছে। উহা এখন সোনার গহনার প্রতিনিধি হইয়াছে। উহার পাপড়ি দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়, উহার কেশর দেখিলেও চক্ষু জুড়ায়। তাই মনের

মানুষ যখন রমণীর ঝাপটায় ঐ ফুল ঝুলাইয়া দিতেছেন, তিনি মনের আনন্দে তাহা ধারণ করিতেছেন। বনস্থলীতে তিলকফুলের গাছ রহিয়াছে। উহাতে সাদা ফুল সারি দিয়া ফুটিয়া আছে, তাহাতে কাজলের ন্যায় কালো ভ্রমরের দল পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন একটি স্ত্রীলোকের মুখে অলকা-তিলকা কাটা হইয়াছে। নবমল্লিকা মধুর গন্ধে মন মাতাইয়া দিতেছে, তাঁহার ফুল ফুটিয়াছে, তিনি যেন বিলাসভরে তরুর উপর উঠিয়া হাসিতেছেন। আর কচি কচি লাল পাতাগুলির উপর ফুলের আভা পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনীর অধরে হাসি খেলিতেছে। এসময়ে নূতন কচি পাতাগুলি লাল হইয়া উঠিতেছে, যবের অঙ্কুরগুলি স্ত্রীলোকেরা কানে পরিতেছে। কোকিলেরা কুহু কুহু করিয়া দেশ মাতাইতেছে, এসময়ে কি বিলাসীরা স্থির থাকিতে পারে? তিলক গাছের মঞ্জরিতে সাদা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। চারিদিকে পরাগ উড়িতেছে, তাহাতে মঞ্জরির দেহ যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। তাহার উপর সারি সারি ভ্রমর আসিয়া বসিতেছে। বোধ হইতেছে যেন কোনো রমণীর কালো ঝাপটায় সারি সারি মুক্তার মালা রহিয়াছে। মুক্তাগুলি খুব উজ্জ্বল, তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোক বাহির হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অলকগুলি ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় দেখা যাইতেছে। উপবনে মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের কেশর হইতে রেণু উড়িয়া দিগন্ত ব্যাপ্ত করিতেছে, সে রেণুরাশি ধনুকধারী মদনের পতাকার ন্যায় দেখা যাইতেছে, এবং সেই রেণুতে বসন্তলক্ষ্মী মুখময় যেন পাউডার মাখিয়া সাজিয়া বসিয়া আছেন। ক্রমে দোল আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক যুবতী দোলায় দুলিতে গেলেন। যুবতী দোলার দড়ি ধরিতে বেশ পটু, তথাপি তিনি ভাণ করিতে লাগিলেন, তাহার হাত যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, তিনি যেন দড়ি ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছা প্রিয়ের কণ্ঠধারণ করিয়া তিনি দোল খান। গরবিণী মান করিয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে কোকিল ডাকিল। সে ডাকে যেন বলিল, মানিনী, মান ত্যাগ করো, মিছে কেন ঝগড়া করো, এ যৌবন বড়ো চঞ্চল, একবার যাইলে আর ফিরিয়া আসিবে না, অতএব মান আর রেখো না। কোকিলার ডাকে এই কথাটা শুনিয়া মানিনী আপনিই মান ত্যাগ করিলেন, আবার উভয়ের মিলন হইয়া গেল।

কালিদাস চারি জায়গায় বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটি জায়গারই ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিলাম। ব্যাখ্যা মানে ব্যাকরণ লাগাইয়া নয়, বাদার্থ লাগাইয়া নয়,

অলংকার লাগাইয়া নয়, ছন্দ লাগাইয়া নয়, অভিধান লাগাইয়াও নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত কালিদাসের কবিত্ব মিলাইবার জন্য ব্যাখ্যা করিলাম। কালিদাস কী চক্ষে স্বভাবের শোভা দেখিতেন, তাই বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যা করিলাম। কালিদাস কত যত্ন করিয়া কত নিপুণ হইয়া প্রকৃতির কার্যকলাপ দেখিতেন, কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছোটো বড়ো সব প্রকারের সৌন্দর্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্যই এই প্রস্তাব।

কালিদাস অল্পবয়সে এমন-কী তাঁহার পড়িবার সময়েই ঋতুসংহার লিখেন। তাঁহার যেদেশে বাড়ি সেদেশের কবিদের ঋতুবর্ণনা একটা রোগ ছিল। লোকে শিলালেখ লিখে, কোনো ধর্ম করিলে তাঁহার স্মরণার্থ শিলালেখ লিখিলেই তাহাতে তারিখ দিতে হয়, প্রথম বৎসর, তাহার পর মাস, তাহার পর মাসের দিন। কালিদাসের দেশের কবিরা তারিখ দিতে গিয়া সেই ফাঁকে একটু ঋতুবর্ণনা করিতেন। আমরা খৃ. ৪০৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া খৃ. ৫৩৩ পর্যন্ত যতগুলি শিলালেখ পাইয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই ঋতুবর্ণনা। কালিদাস সেই দেশেরই লোক, তিনিই বা ছাড়িবেন কেন, সমস্ত ঋতুগুলির বর্ণনা লইয়া তিনিও একখানি বই লিখিলেন। অন্য ঋতুর বর্ণনায় আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই, আমরা বসন্ত ঋতুর কথাই বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঋতুসংহারে যেমনটি দেখা, তেমনই লিখা— দেখাও তাঁহার নিজের বাড়ির কাছেই। এখনো তাঁহার হাত পাকে নাই, তিনি নবিস্ মাত্র। দেশের রোগও তিনি ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। ঋতুসংহার-এর বসন্তবর্ণনায় তিনি অতিমুক্তলতার খুব জাঁকাল বর্ণনা করিয়াছেন। এই লতা মাধবীলতার মতো। বিশেষের মধ্যে এই, রাত্রি ৪টার সময় ফুটিয়া অতিমুক্ত বেলা ৮টার মধ্যেই ঝরিয়া যায়, তাই এর নাম অতিমুক্তলতা। মালবের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইহা দেখা যায়। কালিদাস বসন্তবর্ণনায় ঋতুসংহারেই অতিমুক্তলতার বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার কুমার, রঘু কি মালবিকাগ্নিমিত্র— ইহার কোনোটিতেই অতিমুক্তলতা নাই। মালবিকা পূর্বমালবের জিনিস, কালিদাস সেখানেও অতিমুক্তলতার বর্ণনা করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম কালিদাস নিজের বাড়ি বসিয়াই যেমনটি দেখিয়াছিলেন, তেমনই লিখিয়াছেন।

ঋতুসংহারে হেমন্তবর্ণনায় কালিদাস প্রিয়ঙ্গুর নাম করিয়াছেন, প্রিয়ঙ্গু তাঁহার দেশে জন্মিত। বর্ষায় গাছ হইত, শরতে উহার খুব শ্রীবৃদ্ধি হইত, প্রতিডালে আগাগোড়া ফুল ফুটিত, ডাল উচা হইয়া থাকিত, ঠিক যেন স্ত্রীলোকের একখানি হাত— আগাগোড়া গহনা-পরা। হেমন্তে গাছ শুকাইয়া যাইত, পাতা হলুদবর্ণ হইয়া যাইত, বোধ হইত যেন প্রিয়-বিরহেই শুকাইয়া যাইতেছে। প্রিয়ঙ্গু কালিদাসের দেশে যথেষ্ট হইত, তাই তিনি বসন্তকালেও উহাকে ভুলিতে পারেন নাই। বসন্তবর্ণনায় তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকেরা প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক ও কুঙ্কুম ঘষিয়া স্তনে লেপ দিতেছে।

তাঁহার হাত যে এখনো পাকে নাই, তাহার প্রমাণ এই, তিনি বসন্তে কুন্দফুলের খুব বর্ণনা করিয়াছেন। ঋতুসংহারে তিনি বলিতেছেন, কুন্দফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। কুন্দলতা কিন্তু বসন্তে বাগান আলো করার মতো কখনই ফুটে না, শীতেই এইরূপ হয়। তাই তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রে কথাটি সারিয়া লইয়া বলিলেন—

মাধব-পরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা।।[১]

[মালবিকাগ্নিমিত্র, ৩য় অঙ্ক]

কুমারসম্ভব কি রঘুবংশে উহার নামও করিলেন না।

ঋতুসংহারে বসন্তঋতু যেন বিলাসিনীদের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সুতরাং সেই দিকের বর্ণনাই বেশি। অন্যত্র বিলাসিনীদের এত ছড়াছড়ি নাই। রূপকও ঋতুসংহারেই বেশি। প্রথমেও তিনি বসন্তকে যোদ্ধা সাজাইয়াছেন, শেষেও যোদ্ধৃবেশেই তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন।

ক্রমশঃ বসন্তবর্ণনায় কালিদাসের কেমন হাত পাকিয়া উঠিল, তাহাই তুলনা করিয়া দেখাইব।

গুঞ্জনং দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থং
প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটুম্।।

[ঋতুসংহার, বসন্ত বর্ণন/১৪]

কুঃ সং	মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।[২]

[কুমারসম্ভব, ৩/৩৬]

কুমারসম্ভবে অনুরাগের ভর কত বেশি।

ঋঃ সং	পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ
কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন
পর্য্যাকুলং কুলগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্।।[৩]

[ঋতুসংহার, বসন্ত বর্ণন /২১]

কুঃ সং	চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং
তদেব জাতং বচনং স্মরস্য।।[৪]

[কুমারসম্ভব, ৩/৩২]

রঃ বং	ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈঃ
ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে
স্মরমতে রমতেস্ম বধূজনঃ।।[৫]

[রঘুবংশ, ৯/৪৭]

কোকিল আর ভ্রমর উভয়ে মিলিয়া মধুর স্বরে কুলবতীর মন উচাটন করিয়া দিল এটি নিশ্চয়ই প্রথম বয়সের লেখা। অধিক বয়সে কালিদাস বুঝিলেন মন উচাটন কোকিলের স্বরে যেমনটি হয়, তেমনটি ভ্রমরের স্বরে হয় না। তাই কুমারসম্ভবে কালিদাস ভ্রমরকে ছাঁটিয়া ফেলিলেন। কোকিলের কূজনেই মানিনীর মানভঞ্জন করিয়া দিল। কিন্তু কী কথায় মানভঞ্জন হইল, তাহা

এখানে বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। সেকথাটি রঘুবংশে প্রকাশ পাইল। যখন রঘুবংশ লেখা হয়, তখন কালিদাসের বয়স অনেক গড়াইয়া গিয়াছে। কারণ অল্পবয়সে এমন-কী চল্লিশের পূর্বে "চতুর-বয়স একবার গেলে আর ফিরিবার নয়"— একথা কাহারো মনেই আসে না। অনেকে নাক সিঁটকাইয়া বলিবেন, "ছিঃ মানভঞ্জনের কথায় বৈরাগ্যের কথাটা তুলা ভালো হইয়াছে কি?" তাহার উত্তর এই যে মানভঞ্জনই দরকার, তা "যেন তেন প্রকারেণ"। এইরূপ তুলনায় কিরূপে ক্রমে ক্রমে কালিদাসের হাত পাকিয়াছিল, আমরা তাহার উদাহরণ দিলাম।

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য সম্বন্ধেও কালিদাসের হাত ক্রমে পাকিয়াছে। ঋতুসংহারে তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন নাই। বসন্তে যেমন ফুল ফুটে, কোকিল ডাকে, ভ্রমর ভ্রমরী একসঙ্গে বেড়ায়, যেমনটি স্বভাবে দেখা যায়, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও সেইরূপ স্বভাববর্ণনা মাত্র। তাহারা মোটা কাপড় ছাড়িয়া পাতলা কাপড় পরে। কুসুমফুলের রঙে কাপড় ছোপায়, অঙ্গরাগ করে, চন্দ্রহার পরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মালবিকাগ্নিমিত্রেই প্রথম স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের সহিত স্বভাব-সৌন্দর্যের তুলনা দেখা যায়। এ তুলনায় স্বভাবের সৌন্দর্য বড়ো, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য তাহার কাছে লাগে না। স্বভাবকবি এখনো স্বভাব লইয়াই মত্ত— স্ত্রীলোকের শোভা তাঁহার মনে ধরে না। কুমারসম্ভবে আর-একটি ঘোর পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে স্বভাবের শোভা ও স্ত্রীলোকের শোভায় খুব একটা মিশামিশি ভাব। কোন্‌টি বড়ো কোন্‌টি ছোটো, কবি এখন ধোঁকায় পড়িয়াছেন। তাই খানিক স্বভাব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন—

কাষ্ঠাগত স্নেহরসানুবিদ্ধং
দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ।[৪]

[কুমারসম্ভব, ৩/৩৫]

এই বলিয়া তিনি ভ্রমর-ভ্রমরী, মৃগ-মৃগী, হস্তি-হস্তিনী, চক্রবাক-চক্রবাকী, কিন্নর-কিন্নরী— প্রভৃতির প্রেমময় ভাব বর্ণনা করিলেন। এমন-কী বৃক্ষলতাকেও নায়কনায়িকা সাজাইয়া বর্ণনা করিলেন। এই যে প্রেমের ভাব, ইহাতে স্ত্রী-সৌন্দর্যের উপর কবির যথেষ্ট আস্থা প্রকাশ পাইতেছে।

আবার পটপরিবর্তন করো। রঘুবংশে দেখো সমস্ত স্বভাব স্ত্রীলোকের নিকট

সৌন্দর্য শিক্ষণ করিতেছে— কেহ-বা অভিনয়, কেহ-বা তাল দেওয়া শিখিতেছে। এখানে স্ত্রী-সৌন্দর্যই প্রধান; স্বভাব-সৌন্দর্য তাহার পশ্চাতে। এতদিন স্ত্রী-সৌন্দর্য উপমেয় ছিল, স্বভাব-সৌন্দর্য উপমান ছিল। এখন স্বভাব-সৌন্দর্য হইল উপমেয়, আর স্ত্রী-সৌন্দর্য উপমান।

এই এক বসন্ত-বর্ণনার তুলনা করিয়াই আমাদের বেশ বোধ হয় যে কালিদাস অতি অল্প বয়সেই ঋতুসংহার লিখিয়াছিলেন; তাহার পর স্বভাব-সৌন্দর্যে মাতিয়া মালবিকাগ্নিমিত্র বাহির করেন; ক্রমে হয় তো বিবাহের পর, মেঘদূতে স্ত্রী-লোকের সৌন্দর্য লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন; বয়স পাকিয়া আসিলে কুমারসম্ভবে স্বভাব-সৌন্দর্য ও স্ত্রী-সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করেন; এবং শেষ বয়সে, রঘুবংশে স্বভাব-সৌন্দর্যের উপর স্ত্রী-সৌন্দর্য দাঁড় করাইয়া দেখাইলেন।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২২

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. অনুবাদ : (যেন) বসন্তে পরিপক্ক পাতায়ভরা কুন্দলতায় মাত্র কয়েকটি ফুল। (মালবিকার রূপ সম্পর্কে রাজার উক্তি)।

২. অনুবাদ : প্রিয়াকে অনুসরণ করে ভ্রমর একই পুষ্পপাত্রের মধু পান করল।

৩. অনুবাদ : কোকিলদের হর্ষপুলকিত কলকূজন আর ভ্রমদের গুঞ্জনে নিজেদের আবাসে থেকেও বধূদের বিনয়নম্র সলজ্জ হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

৪. অনুবাদ : আম্রমঞ্জরীর আস্বাদ লাভ করায় কোকিলের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল আরও মধুর। মধুরভাবে তারা যে কুহুধ্বনি করতে লাগল তা অভিমানিনী নায়িকাদের মান বেশ দক্ষতার সঙ্গেই দূর করল। এজন্য সেই পিকস্বরকে মানবতীরা মানত্যাগে কামদেবের আদেশরূপে গ্রহণ করলেন।

৫. অনুবাদ : হে মানিনীগণ! তোমরা মান ত্যাগ করো। কলহ কোরো না। উপভোগক্ষম যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। কোকিলদের কুহুস্বরের দ্বারা মদনদেবের উপদেশ যেন এভাবে

~ ~

জ্ঞাপিত হলে বধূরা (মানত্যাগ করে) তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল।

(রঘুবংশ)।

৬. অনুবাদ : নারী-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায় ক্রিয়ার দ্বারা অতিতীব্র স্নেহরসসিক্ত ভাব প্রকাশ করতে লাগল।

ইরাবতী

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ইরাবতী এক সময়ে পাটরানী ধারিণীর দাসী ছিল। কিন্তু তাহার চেহারাখানি ভালো; সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, বেশ একটু রসিকতা করিতেও জানে। ক্রমে সে রাজার নজরে পড়িয়া গেল। সেকালে বহু-বিবাহ দোষের ছিল না, রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া রানী করিয়া দিলেন। একেবারে দাসী হইতে রানী! ইরাবতীর মাথাটা একটু বিগড়াইয়া গেল, তাহার উপর সে আবার একটু মদ ধরিল এবং সকলের উপর একটু প্রভুত্বও করিতে লাগিল। রাজার আদরের রানী, সকলেই সহিয়া থাকিল।

ইরাবতী তো দাসী। সে রাজা-রাজড়ার চাল কী বুঝিবে? পাটরানী ধারিণী ইরাবতীর সর্বনাশের জন্য একটু চাল চালিলেন। যাহাতে ইরাবতীর উন্নতি, তিনি তাহাতেই ইরাবতীর অধোগতির উপায় করিলেন। তাঁহার এক ভাই ছিলেন রাজার সেনাপতি। তিনি বনের ভিতর ডাকাতের হাত থেকে একটি মেয়ে উদ্ধার করেন। সে মেয়েটি তিনি আপনার ভগিনীকে উপহার দেন। ভগিনী অর্থাৎ রানী দেখিলেন মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, বেশ বুদ্ধিমতী, একটু-আধটু নাচ গানও জানে। তিনি একজন ভালো নাট্যাচার্য আনিয়া মেয়েটিকে ভালো করিয়া নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। কেন শিখাইতে লাগিলেন, কালিদাস কোথাও সেটি খুলিয়া বলিলেন না। কিন্তু প্রথমাঙ্কের প্রথম বিষ্কম্ভকে একজন চেটীর মুখে শুনাইয়া দিলেন, "বেশ্ বেশ্ এ যেন ইরাবতীকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।" সুতরাং রানী যে ইরাবতীকেই অপদস্থ করিবার জন্য মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন একথা চেটীরাও জানিত। কিন্তু ইরাবতী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। পাটরানী ধারিণী ভাবিয়াছিলেন, একটা চাকরানী রানী হইয়া গিয়াছে, আর-একটাকে রানী করিয়া ওটাকে সরাইব। পাটরানী

মালবিকাকে খুব লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা যাহাতে কিছুতেই টের না পান। সে নাচগানে খুব পরিপক্ক হইলে তাহাকে রাজার সামনে যাইতে দিবেন।

কিন্তু দৈব মালবিকার অনুকূল। রাজা একদিন পাটরানীর ঘরে তাহার একখানি ছবি দেখিয়া ফেলিলেন। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মেয়েটি কে? রানী কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, রাজার একটি ছোটো মেয়ে বলিয়া দিল, "ও মালবিকা।" রাজা বিদূষকের সাহায্যে মালবিকাকে দেখিলেন এবং তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। এখন ইরাবতীকে তাঁর আর মনে ধরে না।

বসন্ত আসিয়া উপস্থিত, ইরাবতী প্রমোদ-কাননে বসন্ত-শোভা দেখিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল। বসন্তের প্রথম ফুল লাল কুরুবক বা ঝাঁটি ভেট্ পাঠাইলেন, আর বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজা যদি আসেন দুজনে একবার দোলায় চড়িব।" রাজা শুনিয়াই বিদূষককে বলিলেন, "না— যাওয়া হবে না। আমার মন যখন অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছে তখন ইরাবতী সেটা নিশ্চয়ই টের পাইবে, আর টের পাইলে রক্ষা থাকিবে না।" বিদূষক বলিল, "সেওকি হয়? আপনাকে সব রানীরই মন যোগাইয়া চলিতে হইবে।" রাজা খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে চলো।" যাইতে যাইতে প্রমোদ-কাননের মধ্যেই মালবিকার সহিত রাজার দেখা হইয়া গেল। কবিরা বলেন, সুন্দরী যুবতী যদি আলতা পরিয়া সেই পায়ে অশোক-গাছে লাথি মারে তবে তাতে ফুল ফুটে।[১] প্রমোদ-কাননের এক অশোক গাছে কিছুতেই ফুল ফুটে না। কথাটা ছিল রানী ধারিণী একদিন আসিয়া ঐ গাছে পদাঘাত করিবেন। কিন্তু দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিলেন না। তাই তিনি মালবিকাকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী বকুলাবলী তাঁহার পায়ে আলতা পরাইতেছেন। তিনি একটা গাছের ছায়ায় একখানা পাথরের উপর বসিয়া আছেন। রাজা ও বিদূষক তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া লতার আড়ালে গেলেন। গিয়াই বিদূষক বলিলেন, নিকটে বোধ-হয় ইরাবতীও আছেন। রাজা বলিলেন, হাতি জলে পড়িয়া যদি কমলিনী পায়, তবে কি আর সে হাঙরের ভয় করে?

ইরাবতী এখনো রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। প্রবেশ করিলে রাজা তাঁহার কিরূপ আদর করিবেন, কবি এখন হইতেই তাহার একটু নমুনা দিয়া রাখিলেন।

ক্রমে মালবিকার দু-পায়েই আল্‌তা পরানো হইল। রাজা বলিলেন, এ আলতাপরা পায়ে কাকে কাকে লাথি মারিতে পারে? হয় বাঁঝা অশোক গাছকে অথবা অপরাধী স্বামীকে? বিদূষক বলিলেন, তুমি অপরাধ করিতেছ, তোমাকেই মারিবে। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কখনো মিথ্যা হয় না। রাজা যে ইরাবতীকে একেবারে সম্পূর্ণরূপ মন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, সেইটি আগে দেখাইয়া কবি ইরাবতীকে রঙ্গমঞ্চে আনিতেছেন।

ইরাবতীর তখন বেশ একটু নেশা হইয়াছে, সঙ্গে তাঁহার চেটী নিপুণিকা আছে, সেও বোধ হয় মদ খাইয়াছে। কেন-না মদ্‌টা একা খেলে তত সুবিধা হয় না। ইরাবতী বলিতেছেন, নিপুণিকা লোকে যে বলে, মদটা স্ত্রীলোকের ভূষণ, একথাটা কি সত্য? নিপুণিকা বলিল, প্রথম একটা কথার কথা ছিল, কিন্তু এখন সত্য হইয়াছে। "তুমি একথাটি আমার প্রতি স্নেহ আছে বলেই বলিতেছ; সে যাহোক এখন বলো দেখি, আমার আগে রাজা দোলাঘরে গিয়াছেন কিনা, সেটা কেমন করিয়া জানিব"।

"আপনার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহাতে কি আর বুঝিতে বাকি থাকে?"

"মনযোগানো কথা কোয়ো না, অপক্ষপাতে কথা কও।"

"বিদূষক লাড়ু খাইবার লোভে একথা আগেই বলিয়া গিয়াছে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন।" তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া ইরাবতী টলিতে লাগিল ও বলিল, "আমার হৃদয় তো তাড়াতাড়ি করিতে চায়, কিন্তু আমার চরণ যে চলে না।"

"এইতো দোলাঘরে এসেছি—"

"নিপুণিকা কই আর্যপুত্রকে তো দেখিতেছি না।"

"আপনি ভালো করে দেখুন, হয় তো আপনাকে পরিহাস করিবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছেন; আমরা প্রিয়ঙ্গু-লতার বেড়দেওয়া এই অশোক গাছের তলায় পাথরের উপর বসি।"

ইরাবতীর মনে রাজার প্রতি অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সে এখনো জানে রাজা তাহারই আছে। সে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে, রাজা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন, আগেই আসিবেন। যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন বলিলেন, কোথাও

লুকাইয়া আছেন। খুঁজিতে লাগিলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবী দেখুন আমের বোল খুঁজতে গিয়ে পিঁপড়েয় কামড়াল।"

"সেকী?"

"অশোক গাছের ছায়ায় বকুলাবলী মালবিকার পায়ে আল্‌তা পরাইতেছে।"

ইরাবতীর একটু সন্দেহ হইল, "সে কী? এ তো মালবিকার জায়গা নয়! সে কেমন করে এল!"

"রানীর পায়ে ব্যথা হইয়াছে তাই তিনি বোধ হয় উহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ এইটিই খুব সম্ভব।"

"আর কি স্বামীর অনুসন্ধান করিবেন?"

"আমার পা তো অন্যত্র যেতে চায় না। আমার মদের নেশা এসে পড়েছে। কিন্তু যখন সন্দেহ হয়েছে, এটার শেষ দেখে যেতে হবে।"

বেশ করিয়া মালবিকার মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "আমার হৃদয় যে কাতর হয়েছে তা ঠিক। কারণ রাজা যদি এ চেহারা দেখেন, আমার উপর আর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিবে না।"

ক্রমে ইরাবতী সেইখানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ বড়োই বাড়িয়া গেল। একবার বকুলাবলী বলিল, "মালবিকা, তোমার পা দুখানি যেন লাল শতদলপদ্ম। তুমি যেন স্বামীর সোহাগের পাত্র হও।" শুনিয়া ইরাবতী নিপুণিকার দিকে চাহিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই, এ হলো কী? ক্রমে তিনি শুনিতে লাগিলেন রাজা মালবিকায় আসক্ত, মালবিকাও রাজার প্রতি আসক্ত, আর বকুলাবলী বৃন্দেদূতী সাজিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার আশঙ্কাটা তাহলে ঠিক্। যাহোক এখন তো সব টের পেলাম, এরপর যা করার তা করব।" তখনো ইরাবতীর সন্দেহটা যায় নাই, এক-একবার মনে হইতে লাগিল যেন পাটরানীর হুকুমে অশোক গাছের জন্যই সে এসেছে। ক্রমে মালবিকা আসিয়া অশোক গাছে পদাঘাত করিল। রাজা বলিলেন, "অশোক গাছ ইঁহাকে কানের গহনা দেয়, ইনি তাহাকে চরণ দিলেন। লালে লালে বেশ বিনিময় হইয়া গেল। যা বঞ্চিত আমিই হলাম। আমার তো কিছু দেবার নাই।" ক্রমে রাজা লতার আড়াল হইতে আসিয়া মালবিকার

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবি! রাজা যে আসিলেন।" ইরাবতী বলিল, "আমারও মনে মনে এই সন্দেহটাই হচ্ছিল যে রাজা এর ভিতর আছেন।" ক্রমে মালবিকা নমস্কার করিলে রাজা নিজহাতে তাহাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "কঠিন গাছে তোমার এমন কোমল বাঁ-পাখানি দিয়াছিলে, না জানি তোমার কত কষ্ট হইয়াছে।"

ইরাবতী একথা শুনিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল, বলিল, "আহাহা আর্যপুত্রের হৃদয় তো নয়, যেন ননী।" মালবিকা এখন চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। বকুলাবলী বলিল, "রাজার অনুমতি লও।" রাজা বলিলেন, "যাবেই তো, আমার একবার ভিক্ষাটা শোনো।" বকুলাবলী বলিল, "মন দিয়ে শোনো, মন দিয়ে শোনো, বলুন তো আপনি।" রাজা বলিলেন, "আমার আর কাহাতেও রুচি নাই। অশোকের যেমন ফুল হইতেছে না, আমারও তেমনি আর ধৈর্য হয় না। অশোককে যেমন স্পর্শ করিয়াছ, আমাকেও তেমনি স্পর্শ করো।" রাজা এইকথা যেমন বলা, আর অমনি ইরাবতীর সেইখানে আসা। আসিয়াই বলিল, "স্পর্শ করো, স্পর্শ করো, অশোকের ফুল তো ফুটল না, ইঁহার ফুল ফুটে উঠ্‌বে।" ইরাবতী বকুলাবলীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আর্যপুত্রের অভিলাষ পূরণ করো?" বকুলাবলী ও মালবিকা তো একেবারে চম্পট। রাজা বিদূষককে বলিলেন, "এখন উপায়।" বিদূষক বলিলেন, "জংঘাবল।"

ইরাবতী বলিল, "পুরুষের উপর কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। হরিণী যেমন ব্যাধের গীতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সর্বনাশ করে সেইরূপ ইহার বঞ্চনা-বাক্যে আমি প্রতারিত হইয়াছি।" বিদূষক বলিলেন, "বয়স্য হাতেনাতে ধরা পড়েছ। এখন আর উপায় নাই, যাহা হয় একটা কল্পনা করে বলো।" রাজা বলিলেন, "সুন্দরী মালবিকার সঙ্গে আমার কী? তোমার দেরি হচ্ছে দেখে কোনো রকমে সময় কাটাচ্ছি।"

"আপনি অতি বিশ্বাসের কাজ করেছেন। আপনি যে সময় কাটাবার এখন উপায় পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না। জানিলে, আমি চিরদুঃখিনী, কখনো এমন কর্ম করিতাম না।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন— "দেখুন রানী, রাজা সকল রানীকে সমান দেখেন, তা যদি তিনি সম্মুখে পড়িলে দেবীর পরিজনের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কন্, সেটা

কি অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে? তাহলে আপনার সঙ্গেও তো কথাবার্তা কহা হয় না।"

"কথাবার্তাই হোক, আমি আর কেন আপনাকে কষ্ট দিই" এই বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইরাবতীর চন্দ্রহার খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি সে চলিতে লাগিল। রাজা কহিলেন, "সুন্দরী, আমি তোমার একান্ত প্রণয়ী, আমার প্রতি তোমার নির্দয় হওয়া ভালো দেখায় না।"

"তুমি শঠ, তোমার উপর আর বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"আমায় শঠ বলিয়া তুমি অবহেলা করিতে পারো, কিন্তু তোমার চন্দ্রহার তোমার পায়ে জড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছে, তুমি রাগ করিও না।"

"এ হতভাগাও দেখিতেছি তোমারি পথে যাইতেছে" এই বলিয়া চন্দ্রহার তুলিয়া লইলেন এবং রাজাকে তাহার বাড়ি মারিতে উদ্যত হইলেন।

একে ইরাবতী সুন্দরী, তাহাতে বেশ একটু মদে মুখ লাল হইয়াছে, তাহার উপর সে রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছে, হাতে চন্দ্রহার উচাইয়া মারিতে যাইতেছে— এ অবস্থাতেও রাজা সেই রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন— "এই ইরাবতী, ইহার চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় জল ঝরিতেছে। ইঁহার চন্দ্রহার খসিয়া পড়িয়াছে, এ রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া সেই চন্দ্রহার তুলিয়া আমায় প্রচণ্ড ভাবে মারিতে আসিতেছে— যেন মেঘমালা বিদ্যুতের দড়ি দিয়া বিন্ধ্যপর্বতকে প্রহার করিতে আসিতেছে।"

"কেন তুমি বারবার আমায় অপরাধিনী করিতেছ?" রাজা তাঁহার হাত ধরিলেন ও বলিলেন, "আমি অপরাধ করিয়াছি, আমায় দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া কেন থামিয়া যাইতেছ? তোমার হাবভাব ইহাতে আরো খুলিতেছে, দাসের প্রতি কেন তুমি রাগ করিতেছ। আমি এখন যাহা করিতেছি তাহাতে বোধ হয় তোমার মত আছে" এই বলিয়া তিনি ইরাবতীর চরণে পতিত হইলেন। ইরাবতী বলিয়া উঠিলেন— "এ তো মালবিকার চরণ নয়, যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ও আনন্দের লহর তুলিয়া দিবে?" এই বলিয়া তিনি সখীর সহিত চলিয়া গেলেন।

বিদূষক ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বয়স্য উঠ, তিনি তোমার উপর প্রসন্ন

হয়েছেন।” রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া বলিলেন,— “কী? চলিয়া গিয়াছে?”

“তোমার অভিনয় দেখিয়া অপ্রসন্ন হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন, এস আস্তে আস্তে সরিয়া যাই। কে জানে মঙ্গল গ্রহের মতো আবার ঘুরিয়া সেই রাশিতে উপস্থিত না হয়।”

রাজা বলিতেছেন, “প্রণয় কী বিষম। আমার মন মালবিকায় আকৃষ্ট। আমি পায়ে পড়িলাম তাতেও ইরাবতী প্রসন্ন হইল না, আমার পক্ষে ইহা ভালোই হইয়াছে। সে আমায় বড়ো ভালোবাসিত, সে যখন রাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।”

এইখানে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইল। ইরাবতীরও এইখানে শেষ হইলে ভালো হইত। ইরাবতীর অপরাধ সে রাজাকে বড়োই ভালোবাসিয়াছিল, ভালোবাসিয়া একটু উঁচাইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার পতন হইল। কবি কিন্তু এই পতন দেখাইয়া খুশি হইলেন না। কবিরা বড়ো নিষ্ঠুর, ইরাবতীকে আরো যন্ত্রণা দিবেন, তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। ইরাবতী মনে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতে সে আর যে কখনো রাজার ত্রিসীমানায় যাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সে যায়ও নাই। অত ভালোবাসার এইরূপ পরিণাম হইলে, যাওয়া যায়ও না। তবু তাহার কিছু কিছু সান্ত্বনা তো আছে? কবি সে সান্ত্বনার পথগুলিও বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতী ও নিপুণিকা আবার রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। আবার সেই দুটি। নিপুণিকা খবর দিল বিদূষক সমুদ্রগৃহের বারাণ্ডায় শুইয়া ঘুমাইতেছে, চন্দ্রিকা একথা তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। ইরাবতী বলিল, “একথাটি কি সত্য?” নিপুণিকা বলিল, “সত্য না হইলে কি আপনাকে বলিতে পারি?” “তবে এস আমরা যাই। বেচারা বড়ো বিপদে পড়িয়াছিল, তাহার খবর করি।” বিদূষককে সাপে কামড়াইয়াছিল।

“আর আপনার আরো কিছু বলিবার আছে বোধ হয়?”

“আছে বৈকি? সেখানে রাজার ছবি আছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং প্রসন্ন হইতে বলিব।” “এখনই কেন রাজার কাছে যান না?” “যাহার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে সে আসলের চেয়ে নকল অনেক ভালো। আমার সৌজন্যের একটু অভাব হইয়াছিল, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তা ছবির কাছেই ভালো।”

ইরাবতী এই কথা বলিয়া নিপুণিকাকে বুঝাইল বটে, কিন্তু আসল কথাটা

~ ~

তা নয়। সমুদ্র-ঘরে রাজার একখানি ছবি ছিল। সেখানি ইরাবতীর বিবাহের দিনের ছবি। ইরাবতীর বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। রাজা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, সে আশা নাই। আবার যে ভালোবাসিবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাহার সহিত দোলায় চড়িবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাঁহার সহিত প্রমোদ-কাননে বসন্তের ফুল দেখিয়া বেড়াইবেন, সে আশা নাই। কিন্তু সে তো রাজাকে না ভালো বাসিয়া থাকিতে পারে না? সে যে এখন রানী। রাজা যে একদিন তাহাকে পায়ে রাখিয়াছিলেন, এখন তো সে দাসীপনা করিয়া কাল কাটাইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে ভালোবাসিতেই হইবে, কিন্তু এখনকার রাজাকে সে ভালোবাসিতে পারে না। এ রাজার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে, সুতরাং এ রাজা ইরাবতীর কাছে কাঠ। সে বরং রাজার ছবির কাছে হাতজোড় করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে কিন্তু এ রাজার কাছে যাইবে না। তাই সে সমুদ্র-গৃহে তাহার বিবাহের দিনের রাজার ছবি দেখিতে যাইতেছিল। সে এখন অতীতের স্মৃতি লইয়া থাকিবে। সেই সেকালের রাজাকে ভালোবাসিবে। তাহারই কাছে আপনার মনের কথা বলিবে, তাহারই কাছে মাফ চাহিবে। এই তাহার আশা, এই তাহার ভরসা, এই সুখেই সে যে-কয়দিন বাঁচিবে সুখী হইবে, এই স্মৃতিই তাহার জীবন হইবে। নিষ্ঠুর কবি, কালিদাস, তাহাকে এ সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত করিবেন। যে সরিষা দিয়া ইরাবতী ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, কালিদাস সেই সরিষার মধ্যেই ভূত আনিয়া দিলেন।

নিপুণিকা ও ইরাবতী যাইতেছেন, এমন সময় পাটরানীর এক চেটী আসিয়া ইরাবতীকে বলিল, "রানী আপনাকে খবর দিয়াছেন যে এটা আমাদের সতীপনার সময় নহে। আমি তোমার প্রতি আদর দেখাইবার জন্য মালবিকা ও তাহার সখীকে আটক করিয়াছি। রাজার যদি কোনো প্রিয় করিতে হয়, তুমি যখন বলিবে তখন করিব। এখন তোমার কী ইচ্ছা বলো।" চেটীর মুখে রানীর এই আদরের খবর শুনিয়া ইরাবতী সত্য সত্যই গলিয়া গেল। সে ভাবিত রানী তাহার সতীন, তাহাকে কষ্ট দিতে পারিলেই তিনি খুশি হন।

সে তখন বলিল, "মহারানীকে পরামর্শ দিবার আমরা কে? তিনি আপানার দাসীকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। আরো কথা, কার অনুগ্রহে আমি আছি, আমি বেড়েছি, আমি রানী হয়েছি, সবই তো তাঁরই অনুগ্রহে।"

চেটী চলিয়া গেলে উহারা দুজনে বিদূষকের কাছে গেল। দেখিল যে সে সমুদ্র-গৃহের দুয়ারে বাজারে-বলদের মতো বসে বসেই ঘুমুচ্ছে। তাহাকে ওভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া ইরাবতীর ভয় হইল বুঝি-বা এখনো বিষের শেষ আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহা নহে, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন। এমন সময় বিদূষক স্বপ্নে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ও মালবিকা" শুনিয়াই নিপুণিকা বলিল, "এ হতভাগাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। চিরকাল আপনার স্বস্তিবাচনের মোয়া খেয়ে এখন কিনা মালবিকাকে স্বপ্ন দেখিতেছে।" এমন সময়ে বিদূষক আবার বলিয়া উঠিল, "তুমি ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" এটা আর নিপুণিকা সহ্য করিতে পারিল না। বিদূষকের এক হেঁতালের লাঠি ছিল, সেটা আঁকা বাঁকা ঠিক সাপের মতো। নিপুণিকা থামের আড়ালে থাকিয়া সেই লাঠিগাছটা বিদূষকের গায়ে ফেলিয়া দিল। ইরাবতী ইহাতে বড়ো খুশি হইল, ভাবিল বেইমানের উপর উপদ্রব করাই উচিত।

লাঠি গায়ে পড়িবামাত্র বিদূষক সাপ সাপ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল এবং "বয়স্য বয়স্য" বলিয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিল। রাজা হঠাৎ সমুদ্র-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই ভয় নাই"। সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাও আসিল, বলিল, "সাপ্ সাপ্ বলিতেছে, আপনি বাহির হইবেন না।" ইরাবতী রাজাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বকুলাবলী হঠাৎ বাহির হইয়া বলিল, "আপনি বাহির হইবেন না, সাপের মতোই দেখা যাইতেছে।" ইরাবতী আর সহ্য করিতে পারিল না। থামের আড়াল হইতে রাজার নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনারা দিনের বেলায় যে সঙ্কেত করিয়াছিলেন, সেটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে তো।" বকুলাবলীকে বলিল, "বেশ বেশ তুই খুব দূতীগিরি কল্লি যা-হোক।"

রাজা বলিলেন, "তোমার দেখছি অদ্ভুত সৌজন্য।" শুনিয়াই বিদূষক বলিল, "রাজা আপনাকে দেখিয়াই আপনার পূর্ব ব্যবহার সব ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু আপনি এখনো প্রসন্ন-হন-না কেন?" ইরাবতী বলিলেন, "আমি রাগ করেই বা কী করব।" রাজা বলিলেন, "এযে অস্থানে রাগ, এটা কি তোমার পক্ষে সাজে? বিনা কারণে তোমার মুখে কখনোই তো রাগের চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রমণ্ডলে কি কখনো গ্রহণ উপস্থিত হয়?"

এ কথাগুলি ইরাবতীর মর্মস্থান স্পর্শ করিল। সে বলিল, "আর্যপুত্র" আপনি

অস্থানে রাগের কথা যা বলিয়াছেন তা ঠিক। আমার যে সৌভাগ্য ছিল, সে যখন অন্য জায়গায় চলিয়া গিয়াছে, তখন যদি আমি রাগ করি লোকে যে হাস্‌বে।" রাজা বলিলেন, "তুমি উল্টা মানে করলে, আমি এতে রাগের কোনো কারণই দেখতে পাইনে। আজ আমাদের উৎসব, তাই সব কয়েদি খালাস দিয়াছি, এ দুটি মেয়ে খালাস পেয়ে আমাদের নমস্কার করতে এসেছে।" রাজা একটা বাজে কথা কহিয়া ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিতে গেলেন, কিন্তু ইরাবতী ঠাণ্ডা হইল না। তাহার মনে হইল রানী ধারিণী যে খবর দিয়াছিলেন যে তিনি মালবিকাকে আটক্ করিয়াছেন, সেটা ঠিক নহে। সে নিপুণিকাকে বলিল, তুমি দেবীর কাছে গিয়া বলো, আমি তাঁর পক্ষপাত আজ বেশ বুঝতে পারলাম। নিপুণিকা কিছু দূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় মাধবিকার সহিত আমার দেখা হইল, সে-ই এই কথা বলিয়া গেল।" বলিয়া ইরাবতীর কানে কানে সব কথা বলিল। তখন ইরাবতী বুঝিলেন রানী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক। বিদূষক কৌশল করিয়া আটকানো মেয়ে দুটিকে বাহির করিয়া রাজার কাছে উপস্থিত করিয়াছে। সে বিদূষকের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ইনি এখন রাজার কামতন্ত্রের মন্ত্রী। এ-সকল ইহারই নীতি।" বিদূষক বলিল, "আমি যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে রাজাকে আমি কখনো এমন কার্যে পাঠাতাম না।"

তৃতীয় অঙ্কের শেষে রাজাতে ও ইরাবতীতে একরকম কাটান ছিঁড়ান হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতীর কপাল কেমন ভাঙিয়াছে, সেটি দেখাইবার জন্য আর-একবার রাজার সহিত তাহার দেখা হওয়া দরকার। তাই কালিদাস তাহাকে সমুদ্র-গৃহে আনিয়াছেন। সে আসিয়া দেখিল সেই সমুদ্র-গৃহেই রাজা ও মালবিকা। যে স্মৃতিটুকু জাগাইবার জন্য সে এত ব্যস্ত হইয়াছিল, সে স্মৃতিটুকুও অন্ধকারময় হইয়া গেল। ইরাবতীর আর কিছুই রহিল না। তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই গেল। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, রাজা তো তৃতীয় অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সঙ্গে কাটান ছিঁড়ান করিয়া আসয়াছেন, আবার কেন ইরাবতীর খোশামোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে ইরাবতী ও ধারিণী দু-জনে মিলিয়া মালবিকাকে আবার কষ্ট দিবে। তাই তিনি ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার যে ভয় হইয়াছিল, সেটি বিদূষকের একটি কথায় প্রকাশ হইয়াছে। যখন ইরাবতী নিপুণিকাকে ধারিণীর নিকট পাঠাইল, তখন বিদূষক মনে মনে করিল— হায় হায় বাঁধন খুলে পায়রা বিড়ালের মুখে গিয়ে পড়ল।

কিন্তু ইরাবতী তেমন মেয়ে নয়। সে যে মালবিকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবে, তাহার সে প্রকৃতিই নয়। সে আপনার সুখে আপনি মত্ত ছিল, এখন আপনার দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিল। সমস্ত বইখানায় ইরাবতী মালবিকার সহিত একটিবারও কথা কহে নাই। বরং অশোকতলায় মালবিকার মুখখানি দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, এমুখ দেখিলে রাজা তাহাকে হয়তো ভুলিয়া যাইবেন। ইরাবতী একেবারে ক্রূর, খল বা কপট নহে। চতুর্থ অঙ্কের শেষে যখন জয়সেনা আসিয়া খবর দিল, রাজার মেয়ে বসুলক্ষ্মী বানর দেখিয়া বড়ো ভয় পাইয়াছে এবং ক্রমাগত কাঁপিতেছে। তখন ইরাবতীই সর্বাগ্রে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য দৌড়িল এবং রাজাকেও শীঘ্র যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

চতুর্থ অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সর্বনাশ করিয়া পঞ্চমাঙ্কে কবি আব ইরাবতীকে আনিলেন না। রানী কয়েকবার ইরাবতীর নাম রাজার কানে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু ইরাবতী রঙ্গমঞ্চে আর আসিল না। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহাদি হইয়া গেলে নিপুণিকা আসিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ইরাবতী আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আপনার সম্মান রাখেন নাই, তজ্জন্য তিনি অপরাধিনী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীর অনুকূল কার্যই করা হইয়াছে এবং আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া, তাহার মান রক্ষা করিবেন। রাজা একথার কোনোই উত্তর দিলেন না। ইরাবতীকে আর তাঁহার মনে নাই। তিনি এখন মালবিকাময় হইয়া উঠিযাছেন। এখন অপরাধিনী ইরাবতীরও যে দশা, নিরপরাধিনী সর্বস্বত্যাগিনী মহারানী ধারিণীরও সেই দশা। তাই তিনি নিপুণিকাকে জবাব দিলেন, "আর্যপুত্র তাহার সেবা জানিবেন।" নিপুণিকা, অনুগৃহীত হইলাম বলিয়া প্রস্থান করিল। যে ইরাবতীর সৌভাগ্য দেখিয়া একসময় রাজপরিবারের সকলেই হিংসায় মরিত, সেই ইরাবতী একেবাবে লোপ হইয়া গেল।

নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. নারীর স্পর্শে বা বিশিষ্ট ধরনের পরিচর্যায় ফুল গাছ পুষ্পিত হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ব্যবহৃত। দোহদ (< দৌহৃদ) বা গর্ভিণী নারীকে সাধ খাওয়ানোর অনুষঙ্গ এই আচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সাধ খাওয়ানো আসন্ন প্রসবার প্রসব ত্বরান্বিত করে, তেমনি নারীর স্পর্শে পুষ্পিত হয়ে উঠতে উন্মুখ গাছ ফুলে ভরে ওঠে, ফুল প্রসব করে। নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু, মুখ থেকে কুলকুচি করে ছিটিয়ে দেওয়া মদে বকুল, বাঁ পায়ের মৃদু আঘাতে অশোক, চোখের দৃষ্টিতে তিল ফুল, আলিঙ্গনে কুরুবক ফোটে। তেমনি নারীর কৌতুকবাক্যে মন্দার, হাসিতে চাঁপা, নিশ্বাসে বা মুখের বাতাসে আমের মুকুল, গানে রুদ্রাক্ষ আর নাচে কনকচাঁপা ফুটে ওঠে। এই বইয়ে অগ্নিমিত্রের ভাঁড় প্রবন্ধের ১৩ অনুচ্ছেদ দ্র.।

পার্বতীর প্রণয়

আমরা আজ কালিদাসের একটি প্রণয়ের অদ্ভুত চিত্র দেখাইব। আমাদের কবিরা যে প্রণয়ের বর্ণনায় কত উচ্চে উঠিতে পারিতেন তাহা দেখানো এ প্রস্তাবেব উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা দেখাইবার পূর্বে লোকে যে বলে কালিদাস বড়ো অশ্লীল সেই কথাটার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। সত্য সত্যই কি কালিদাস অশ্লীল? সত্য সত্যই কি তাঁহার কাব্য পড়িলে লোকের মনে কুভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়? সত্য সত্যই কি তিনি স্থানে অস্থানে কেবল বখামিই করিয়া গিয়াছেন। আমার তো বোধ হয় তিনি তাহা করেন নাই। তিনি অতি বড়ো কবি। জগতের এমন সুন্দর পদার্থ কিছুই নাই যাহা তিনি বর্ণনা করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের মিলন জগতের একটা সুন্দর হইতেও সুন্দরতর জিনিস, সুতরাং সে জিনিসটাও তাঁহাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে, বিক্রমোর্বশীতে, শকুন্তলায় এই মিলনই মূলমন্ত্র, তাহার সঙ্গে আরো অনেক ভালো কথা আছে। কুমার ও রঘুতে সারা জগৎটাই আছে, তাহার মধ্যে এ মিলনও আছে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন কালিদাস ঐ কথা বৈ আর অন্য কথা কহেন না, তাঁহারা বড়োই বাড়াবাড়ি করেন বলিয়া মনে হয়। কালিদাস এক জায়গায় বাধ্য হইয়া কামকলার বর্ণনা করিয়াছেন। সে রঘুবংশের ঊনবিংশে— সর্গটির নাম “অগ্নিবর্ণ”—। কিন্তু তাহার বর্ণনাও কত চাপা। একজন বড়ো রাজা, বয়স অল্প, রাজকার্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, মন্ত্রীরা তাঁহার দেখা পায় না, প্রজারা দেখিবার জন্য বড়ো হৈচৈ করিলে জানালা দিয়া পা বাড়াইয়া দেন। তিনি উন্মাদের মতো হইয়া কেবল স্ত্রীলোক লইয়াই আছেন। অথচ সেখানকার লেখা পড়িলে কালিদাস কত সাবধানে এই ভোগবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; অশ্লীলতায় তত নহে।

এইরূপ স্থলে অন্য কবিরা কী করিয়াছেন, যদি দেখা যায়, কালিদাসকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। নৈষধকার[১] শ্রীহর্ষ অষ্টাদশ সর্গে নলদময়ন্তীর মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। সর্গের গোড়াতে তিনি বলিলেন বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রাদিতে যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, আমি এমন সব জিনিস বর্ণনা করিব। বলিয়াই তিনি নলকে দময়ন্তীর মহলে লইয়া গেলেন। মহলের প্রথমেই সব অদ্ভুত ছবি। প্রথমখানিতে ব্রহ্মা কামাতুর হইয়া কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান। তাহার পরই ইন্দ্র কিরূপে অহল্যাহরণ করিতেছেন তাহার নাটক, এইরূপ প্রায় কুড়িটি শ্লোক। তাহার পর নল দময়ন্তীর ঘরে গেলেন। সেখানকার সাজপাট সবই ঐ রকম। তাহার পর বিছানায় উঠিলেন, সখীরা সরিয়া গেল। এইখানেই থামিয়া গেলে আমার পক্ষে ভালো হইত। কিন্তু ঐ সর্গের ১৪০ হইতে ১৫২ শ্লোক এত ভয়ানক যে স্ত্রীপুরুষেও বসিয়া পড়া যায় না। যাঁহারা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের ছোটো ছোটো নবেলগুলি পড়িয়া নাক সিটকান, আর নারায়ণ-এর নিন্দা করেন, তাহারা যদি একটু শ্রমস্বীকার করিয়া নৈষধের ঐ সর্গটি পড়িয়া দেখেন, বড়ো ভালো হয়। তাহার উপর আবার বলি, ঐ সর্গটি সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষায় পাঠ্য। টোলে টোলে উহা পড়াইবার কথা। সংস্কৃত পরীক্ষার বোর্ড উহা পাঠ্য নির্দেশ করিয়াছেন। এই সভায় সভাপতি স্বয়ং আশুতোষ, বড়ো বড়ো মহামহোপাধ্যায়গণ উহাব মেম্বর। টোলের এবং কলেজের অধ্যাপকগণও মেম্বর। শুনিলাম, নাকি যিনি অশ্লীলতার উকিল সরকাব, পাবলিক প্রসিকিউটার, যিনি লোকের অশ্লীলতা লইয়া অনেকবার নালিসবন্দ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রস্তাবে ঐ সর্গ পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এসব বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাস তো বাপের ঠাকুর। সত্য সত্যই ঋষি। তাহার বর্ণনা খুব চাপা— রঘুর উনবিংশ হইতেই একটি শ্লোক তুলিতেছি,

> চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্
> উত্থিতস্য শয়নং বিলসিনস্তস্য বিভ্রমরতান্যপাবৃণোৎ।।[১] [১৯/২৫]

তিনি আরো দুই-চারি জায়গায় বাধ্য হইয়া একটু একটু অশ্লীলতা আনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে অশ্লীল তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বুঝিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছাত্রদের জন্য যে-সকল এডিশন্ করিয়াছেন তাহাতে উহা বাদ দেন নাই। যথা,

পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥[২] [কুমারসম্ভব, ৩/৩৯]

এসকল কবিতার তর্জমা করিয়া দিলেও কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে উহায় রুচিবিরুদ্ধ কোনো জিনিস আছে। না বুঝাইয়া দিলে কেহ সেকথা বুঝিতে পারিবেন না।

না-হয় মানিয়া লইলাম, কালিদাস যে প্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রুচিবিরুদ্ধ কিছু না থাকিলেও, ইহলোকের কথাই প্রবল। কিন্তু আমরা আজি যে কথা বলিতেছি তাহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের প্রণয়, বোধ হয়, ঋষিরাও কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কিনা? অন্য কবিদের তো কথাই নাই।

সে প্রণয় পার্বতীর প্রণয়, শিবের প্রতি প্রণয়। যে প্রণয়ে দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেই প্রণয়। এই প্রণয়ের মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে, ইহার পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহার অলৌকিক ভাব বুঝিতে হইলে, আগে পার্বতী কে ও শিব কে তাহা জানা আবশ্যক; নহিলে এ আকর্ষণের উদারতা বুঝা যাইবে না।

পার্বতী পূর্বজন্মে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মহাদেবকে বিবাহ করিয়াছিলেন, দক্ষ তাহাতে বড়ো চটিয়া যান। তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞে সকল দেবতার নিমন্ত্রণ হয়। মহাদেবের হয় না। দক্ষের কন্যা সতী ইহাতে মর্মাহিত হইয়া স্বামীর অনুমতি লইয়া বাপের বাড়ি যান। সেখানে দক্ষ শিবের অনেক নিন্দা করেন, সেই নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। তিনি দেহত্যাগ করিলে মহাদেব শক্তিশূন্য হইলেন, তিনি সব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তপস্যায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার গণ নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখনো মনছাল গায়ে মাখে, কখনো নমেরুর ফুল দিয়া সাজ-সজ্জা করে, কখনো ভূর্জপত্রের কাপড় পরে, কখনো শুয়ে থাকে, কখনো বসে থাকে, কখনো লাফালাফি করে।

মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়! তিনি ধ্যানেই মগ্ন থাকেন, গঙ্গার ধারে একটা দেবদারুগাছের

তলায় থাকেন, মৃগনাভির গন্ধ শুঁকেন, বাঘছাল পরেন আর কিন্নরদের গান শুনেন। পার্বতী তো মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছিলেন; আবার জন্মিয়াছেন। এবার তাঁহার পিতা হিমালয়, মাতা মেনকা, ভাই মৈনাক। তিনি একমাত্র কন্যা; বড়ো আদরের ধন। তাঁহার আদরের আরো কারণ এই যে, ইন্দ্র পাছে ডানা কাটিয়া দেন, এই ভয়ে তাঁহার ভাই জলেই ডুবিয়া থাকেন, বাড়ি আসিতে পারেন না।

পার্বতী এবার বড়ো— বড়ো ঘরে জন্মিয়াছেন। কালিদাস প্রথমেই তাহার বাপের বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সে বর্ণনায় সতরোটি কবিতা খরচ করিয়াছেন। তিনি হিমালয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়, আমরা এবার সে বর্ণনার কথা বলিব না। তবে তিনি যে প্রকাণ্ড, তিনি যে পূর্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন, সে কথাটা বলিতে হইবে, আর তিনি যে কত উঁচু সে কথাটাও বলিতে হইবে। তিনি মেরুর সখা, অর্থাৎ মেরু যত উঁচু তিনিও তত উঁচু। সূর্য মেরুর যেমন চারিদিকে ঘোরেন, তাঁহারও তেমনি চারিদিকে ঘোরেন। তাঁহার শিখরে যেসব পুকুর আছে, সে পুকুরে তো পদ্ম হয়। কিন্তু সূর্য যদি নিচুর দিকে রহিলেন তবে সেখানে পদ্ম ফোটে কী করিয়া। তাই কালিদাস বলিয়াছেন সূর্য উপরের দিকে কিরণ পাঠাইয়া সেসব ফোটান, তাঁহার মাথা সূর্য মণ্ডলেরও উপর। এ তো তাঁহার স্থূল দেহ, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ একটি দেবতা। প্রজাপতি দেখিলেন, সোমের উৎপত্তি তো হিমালয় ছাড়া হয় না, তাই তিনি হিমালয়কে দেবতা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে যজ্ঞের একটা ভাগ দিলেন, সকল পর্বতের রাজা করিয়া দিলেন। কালিদাস, যজ্ঞের ভাগ দিলেন,— এইটুকু বলিয়াছেন, কী ভাগ দিলেন তাহা বলেন নাই। বেদে আছে যজ্ঞে যে হাতি মারা হয়, সেই হাতিটি হিমালয়ের ভাগ, সুতরাং প্রজাপতির সৃষ্টিতে যাহা কিছু বড়ো সকলই হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত।

এই যে এত বড়ো হিমালয়, ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে? এত বড়ো বরের এত বড়ো কনে নহিলে তো সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে। মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দ্যৌঃ আর পৃথিবী দুটিকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে একজোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কখনো কখনো দ্বিবচনে "মেনে" বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচনে মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর, কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ

দিয়াছেন "আত্মানুরূপাং" অর্থাৎ হিমালয়ও যেমন, মেনকাও তেমনি। বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকায় বিবাহ, এ যে-কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই যে দ্যাবাপৃথিবীর সহিত হিমালয়ের বিবাহ, এ বিবাহে প্রথম সন্তান মৈনাক অর্থাৎ সমুদ্রের পর্বত। সেও বাপের মতো দিগন্ত বিস্তৃত। তবে সে হিমালয়ের মতো অচল নহে। আজ এ-সমুদ্রে, কাল ও-সমুদ্রে তাহার প্রভাব দেখা যায়। তাই কবি বলিয়াছেন, সকল পর্বতের ডানা কাটা গিয়াছে, মৈনাকের ডানা কাটা যায় নাই। সে লুকাইয়া সমুদ্রের মধ্যে আছে, এবং এখনো নড়িয়া বেড়াইতে পারে। পর্বতের ডানা কাটা কথাটি নিতান্ত গাঁজাখুরি নহে। যে কেহ মুসুরির বাজারে দাঁড়াইয়া একবার শিবালয় পর্বতের দিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারই মনে হইয়াছে, যেন একসার ডানাকাটা পায়রা পড়িয়া আছে।

হিমালয় ও মেনকার দ্বিতীয় সন্তান পার্বতী। যেমন মা, যেমন বাপ, যেমন ভাই,— মেয়েও তেমনি। তিনি জগৎ জননী, তিনি আদ্যাশক্তি, সর্বব্যাপিনী। তাঁহার অন্তর্ধানে মহাদেব শক্তিশূন্য, কেবল ধ্যান করিতেছেন— আবার কবে আমার শক্তি আসিবে। কালিদাস বলিয়াছেন, "কেনাপি কামেন তপশ্চচার" [১/৫৭]। যিনি অন্যে তপস্যা করিলে তাহার পুরস্কার প্রদান করেন, তিনি আবার কিসের জন্য তপস্যা করিবেন। তাঁহার কি কামনা থাকিতে পারে? কোনো অনির্বচনীয় কামনা আছেই। সে কামনা আবার শক্তিলাভ। কালিদাস "কিম্" শব্দের "অনির্বচনীয়" অর্থ আরো স্থানে স্থানে করিয়াছেন।

আরো একটা কথা, দেবতাদের একজন নূতন সেনাপতির দরকার। ব্রহ্মা তারকাসুরকে বর দিয়াছিলেন, তুমি দেবগণের অবধ্য হইবে। সুতরাং সে এখন প্রবল হইয়া দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করিয়াছে এবং নানারূপে তাঁহাদের কষ্ট দিতেছে। ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। মহাদেবের ছেলে হইলে সেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে। কিন্তু মহাদেব ধ্যানমগ্ন। তিনি পরজ্যোতিঃ, আমিও তাঁহার ঋদ্ধি ও তাঁহার প্রভাব ইয়ত্তা করিতে পারি না, বিষ্ণুও পারেন না। সুতরাং আমরা যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বিবাহ করাইব, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তিনি উমার রূপে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যাহাতে হন, তোমরা তাহাই

করো। তিনি আকৃষ্ট হইবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার ছেলে হইবে, সেই ছেলে তারকাসুরকে বধ করিবে।

এই পার্বতী ও মহাদেবের প্রণয় আমাদের বর্ণনীয় পদার্থ। নারদ একদিন হিমালয়ের বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকটে পার্বতী রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই মেয়েটি মহাদেবের একমাত্র পত্নী হইবেন এবং একদিন তাঁহার অর্ধেক শরীর লাভ করিবেন। এই কথা শুনিয়া হিমালয় আর অন্য বরের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু বড়ো বিপদে পড়িলেন। তিনি তো আর যাচিয়া কন্যা দিতে পারেন না, তাহাতে আবার মহাদেব কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন, এ সময়ে বিবাহের কথাই হইতে পারে না। তাই তিনি একদিন মহাদেবের অর্চনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন আমার এই মেয়েটি আপনার আরাধনা করিবেন, আপনি অনুমতি করুন। মহাদেব বলিলেন "আচ্ছা"; কেন, মহাদেব বেশ জানেন যে তাঁহার কিছুতেই চিত্তবিকার হইবে না। পার্বতী সেই অবধি অনন্যমনে মহাদেবের সেবাশুশ্রূষা করেন, তাঁহার পূজার ফুল তুলিয়া দেন, তাঁহার পূজার জায়গা করিয়া দেন, তাঁহার জল তুলিয়া দেন, তাঁহার কুশ আনিয়া দেন। এইরূপে নিত্যই তাঁহার সেবা করেন। মহাদেব তাঁহাকে কিরূপভাবে দেখেন সে কথা কবি বলেন নাই; তবে তিনি বলিয়াছেন যে পার্বতী মহাদেবের মাথায় যে চন্দ্রকলা আছে তাহারই কিরণে আপনার ক্লান্তি দূর করেন। তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে ঐটুকুই এত সেবার পুরস্কার। মহাদেব তাঁহাকে তাঁহার কপালের চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিতে দেন, তাহাতেই পার্বতী কৃতার্থ!

এইভাবে দিন কাটিতেছে। কিন্তু দেবতাদের দেরি সয় না। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইন্দ্র সভা করিয়া মদনকে ডাকিলেন। তাঁহাকে দেবতাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। বলিলেন, "তুমি একটা বাণ মারিয়া আমাদের রক্ষা করো"। মদন ভাবিলেন কাজটি খুব সোজা— তিনি বসন্তকে ডাকিলেন, রতিকে সঙ্গে লইলেন ও মহাদেবের আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলেন। বসন্ত অকালে হিমালয়ে আবির্ভূত হইল। স্থাবর জঙ্গম সব আনন্দিত ও মিলনের আশায় উৎফুল্ল। আশ্রমের বাহিরে ফুল ফুটিল, পশু-পক্ষী জোড় বাঁধিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্নর-কিন্নরী গলা মিলাইয়া গান করিতে লাগিল। মহাদেবের গ্রাহ্যও নাই। তিনি যথাসময়ে ধ্যানস্থ হইলেন। নন্দী দেখিলেন, গণেরা বড়োই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একটি আঙুল মুখে তুলিয়া তাহাদের বলিয়া দিলেন "ঠাণ্ডা হও"। অমনি গণেরা চুপ। বসন্তের সব জারিজুরি ভাঙিয়া গেল। মদনও পিছন হইতে বাণ উঁচাইতেছিলেন। কিন্তু

মহাদেবের চেহারা দেখিয়াই তাহার হাত থেকে ধনুক ও বাণ পড়িয়া গেল; তাহা তিনি টেরও পাইলেন না। তাঁহারও জারিজুরি সব ভাঙিয়া গেল। এমন সময়ে পার্বতী আসিলেন। মদন লুকাইয়া নন্দীকে এড়াইয়া আশ্রমের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন। বসন্ত তাহাও পারেন নাই। তিনি এখন পার্বতীকে আশ্রয় করিয়া, তাহাকে ফুলের গহনা পরাইয়া, সেই সঙ্গে কোনোরূপে আশ্রমে আসিলেন। পার্বতীও আসিলেন, মহাদেবেরও ধ্যান ভঙ্গ হইল। মদনেরও আশা হইল, ভরসা হইল। পার্বতী রীতিমতো পূজা করিলেন। তাহার পর একগাছি পদ্মের বিচির মালা লইয়া মহাদেবকে দিতে গেলেন, মহাদেবও হাত বাড়াইয়া লইলেন এবং "অনন্যসাধারণ পতি লাভ করো" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মদন ভাবিল, মাহেন্দ্রক্ষণ; সে বাণ জুড়িল। মহাদেবের মনের ভিতরে যে মন আছে তাহাতে একটু কেমন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন মদন, তাঁহার ক্রোধ হইল, তাঁহার কপালের চক্ষু হইতে আগুন বাহির হইল, আর অমনি মদন ভস্মসাৎ। মহাদেবের রূপজ মোহ নাই, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ নাই, তাই তিনি মোহের যিনি কর্তা তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিলেন ও সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি সর্বময়, কোথায় গেলেন কেহই জানিল না।

মদন যখন বাণ উঁচাইয়াছিলেন, তখন পার্বতী মহাদেবের সম্মুখে, সে বাণে তাঁহারও রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মুখ হেঁট করিয়া নিচের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে তাঁহার বড়ো দুঃখ হইল, যে বাবার এত বড়ো আশা ব্যর্থ হইল। তিনি নিজ রূপের উপর ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং শূন্যমনে বাড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। সব ফুরাইয়া গেল। হিমালয়ের আশালতা নির্মূল, দেবতাদের আশা নির্মূল। মদন পুড়িয়া ছাই; রতি মূর্ছিত। পার্বতী কিন্তু আশা ছাড়িলেন না।

মহাদেব চোখের উপর মদনকে যখন ভস্ম করিয়া ফেলিলেন, তখন আর কি আমার দিকে চাহিবেন, এই ভাবিয়া পার্বতী বড়ো ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। বৃথা আমার রূপ হইয়াছিল, বলিয়া মনে মনে আপনার উপর তাঁহার বড়োই অবজ্ঞা হইল। আর-সকল পথই তো বন্ধ; সুতরাং এখন তপস্যা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং তিনি তপস্যা করিতে সংকল্প করিলেন। মা তো শুনিয়া বারবার বারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন।

জল নিম্নমুখ হইলে তাহার গতি যেমন রোধ করা যায় না, তেমনি যে মনে মনে স্থিরসংকল্প করিয়াছে, তাহারও গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

ক্রমে কথা বাপের কানে পঁহুছিল। তিনি বড়ো খুশি হইলেন। এত কঠোর তপস্যা না করিলে কি অমন স্বামী পাওয়া যায়। তপস্যায় অনুমতি দিলেন। পার্বতীও তপোবন যাত্রা করিলেন। সেখানে, মাথাপোরা চুল ছিল তাহাতে জটা পড়িয়া গেল, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা হইল, ভূমিতে শয্যা হইল। চক্ষের আর সে চঞ্চলভাব রহিল না। নিজেই জল তুলিয়া গাছে দিতে লাগিলেন। হরিণগুলিকে নিজ হাতে খাবার দিয়া বশ করিয়া লইলেন। তিনি যখন স্নান করিয়া, অগ্নিতে আহুতি দিয়া, বাঘছালের উড়ানি পরিয়া, বেদ পড়িতে বসিতেন, ঋষিরাও তাহাকে দেখিতে আসিতেন। ক্রমে তপোবন পবিত্র হইয়া উঠিল, জন্তুরা পরস্পর হিংসা ত্যাগ করিল, অতিথিসেবার জন্য ফলমূল তপোবনেই ফলিতে লাগিল, নূতন খড়ের ঘরে যজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

ইহাতেও যখন মহাদেবের দয়া হইল না, তখন পার্বতী আরো কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, মাথার উপর সূর্য, চারিদিকে চারিটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া পার্বতী পঞ্চতপা করিলেন। তাহার চোখের কোলে কালি পড়িয়া গেল। উপবাসের পর তাঁহার পারণা হইত, আকাশের জল আর চন্দ্রের কিরণ। যখন বর্ষা আসিল, নূতন জল পড়িল, তাঁহার শরীর হইতে গরম বাহির হইতে লাগিল। তিনি ঘরে থাকা বন্ধ করিলেন। আকাশের তলায় পাথরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। পৌষ মাসে জলে ডুবিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার মুখখানি পদ্মের মতো জলের উপর ভাসিত। ঝরাপাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেই লোকে মনে করে তপস্যার চরম হইল। কিন্তু পার্বতী তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। পাতার এক সংস্কৃত নাম পর্ণ। পাতা খাওয়াও ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল অপর্ণা। তপস্বীরাও এত কঠোর [তপস্যা] করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থায় একদিন তাঁহার আশ্রমে একজন জটাধারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার পার্বতীর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। জটিলের চেহারাটি খুব ভালো। তিনি আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন; পার্বতী তো যতদূর সম্ভব তাহার সৎকার করিলেন। জটিলও জমকাইয়া বসিয়া আরম্ভ করিলেন— আপনি কেমন আছেন? আশ্রমের মঙ্গল তো? গাছপালা বেশ জল পায় তো? ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার এমন রূপ, তুমি এমন রাজার মেয়ে, তুমি তপস্যা করো কেন বলো দেখি?

কী কোনো বরের কামনায়? আমি তো এমন কোনো যুবক দেখি না যে তুমি কামনা করিলে, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে না করিবে। দেবতা চাও, তাহারা তো তোমার বাবার রাজ্যে বাস করে। তোমায় হয় তো কেহ কোনো প্রকার আবমাননা করিয়াছে, তাই তুমি তপস্যা করিতেছ। তাহাও তো বোধ হয় না; তুমি হিমালয়ের মেয়ে, তোমায় অপমান করিতে পারে এমন কে আছে? যাহাই হউক, তুমি বড়োই কষ্ট পাইতেছ। আমার একটা কথা আছে, শোনো, আমার অনেক সঞ্চিত তপস্যা আছে, তাহার অর্ধেক তোমায় দিতেছি, তুমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লও।

জটিল যখন পার্বতীর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইমতো কথা সব বলিল, তখন পার্বতী সখীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, সে-সকল কথা বলিল। পার্বতী যে মহাদেবের প্রতি আসক্ত, তাহা সে প্রথম কথায়ই বলিয়া ফেলিল। বলিল মহাদেবের হুঙ্কারে মদনেব যে বাণ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল সে বোধ হয়, ইঁহারই হৃদয়ে বিঁধিয়া আছে। সেই অবধি ইনি বড়ো উন্মনা হইয়াছেন। কিছুতেই ইঁহার শরীর শীতল হয় না। কিন্নরীরা যখন মহাদেবের চরিত গাহিতে থাকে, তখন ইনি ভাবাবেশে গাইতে পারেন না, ইঁহার গলা ধরিয়া যায়, স্বরস্খলিত হয়, কিন্নরীরা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। শেষ রাত্রিতে অনেক বার স্বপ্নে মহাদেবকে পাইয়া "হে নীলকণ্ঠ তুমি কোথায়?" বলিয়া জাগিয়া উঠেন। তখন দেখা যায়, উহার হাত দুটি যেন কাহারো গলা জড়াইয়া আছে। অতি গোপনে নিজের হাতে মহাদেবের ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন "তোমায় পণ্ডিতেরা 'সর্বগত" বলেন; আমি যে তোমার তরে কাতরা, এটা কি তুমি জানিতে পার না? ইনি এতকাল তপস্যা করিতেছেন, যে উহার হস্তার্জিত গাছেও ফল ধরিল। ইঁহার কিন্তু মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, হইবার কোনো লক্ষণও দেখা যায় না। কবে যে দেবাদিদেব সখীর প্রতি দয়া করিবেন জানি না। সখীরা আর উহার মুখের দিকে চাহিতেও পারে না।

জটিল এই সব কথা শুনিয়া পার্বতীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, এসব কথা কি সত্য? না পরিহাস?

পার্বতী এতক্ষণ স্ফটিকের অক্ষমালা জপিতেছিলেন। এখন মালা ছড়াটি হাতের আগায় রাখিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কথা কিন্তু ফুটিতে চাহে না। অনেক যত্নের পর কয়েকটি মাত্র কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। পার্বতী যে, মহাদেবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী একথা আমরা এতক্ষণ, পরে পরেই

শুনিতেছিলাম, আর তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিতেছিলাম। এইবার তাঁহার নিজমুখে তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাইব। সেও অতি অল্প কথা। কথাটা কী? জানিবার জন্য আমরা বড়োই উৎসুক। পার্বতী বলিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন সবই ঠিক। আমার আশা বড়োই উচ্চ; তাহারই জন্য এ তপ। কারণ— 'মনোরথানামগতির্নবিদ্যতে'।[৩] [৫।৬৪]

পার্বতীর মুখে এই যে অনুরাগের কথা শুনিলাম, এরূপ আর কোথাও কেহ শুনিয়াছ কি? ইহাতে চাঞ্চল্য নাই, ইহা স্থির, ধীর, অটল ও অচল প্রণয়। আমি কিছুই নই, আমার আকাঙক্ষা দুরাকাঙক্ষামাত্র। কিন্তু আমার আর উপায় নাই, তাই আমি কঠোর তপস্যা করিতেছি। এই কথায় কত দৈন্য, কত আত্মবিসর্জন, মহাদেবের প্রতি কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা ও কত প্রেম প্রকাশ পাইতেছে।

জটিল বলিল মহেশ্বরকে তো আমরা জানি। আবার তুমি তাঁহাকেই প্রার্থনা করিতেছ। তিনি অমঙ্গলময় ইহা আমি জানি। আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারি না। বড়ো অসদৃশ সম্বন্ধ— তোমার হাতে থাকিবে বিবাহের সূতা আর তাঁর হাতে থাকিবে সাপের বালা। এ দুটা কি খাপ খায়? তুমি খাসা চেলী পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে, আর তাঁর গায়ে হাতির কাঁচা চামড়া হইতে টাট্‌কা রক্ত পড়িবে। তিনি দেখাইয়া দিলেন, মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। বলিয়া তিনি মহাদেবের কতই নিন্দা করিতে লাগিলেন। যিনি বাপের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিতের মুখে এত শিবনিন্দা শুনিয়া সহ্য করিবেন, কখনোই সম্ভব নয়। যিনি "আমি শিবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী" এই কথা কয়টিও কহিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন "আপনি যাহা শুনিয়াছেন সব সত্য", এখন তাঁহার ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল, তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল, চক্ষুর কোণ রাঙা হইয়া উঠিল, কোপে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল। তিনি স্থির স্বরে বলিতে লাগিলেন,— তুমি হরকে ঠিক জান না, জানিলে তুমি এমন কথা কেন বলিবে? নির্বোধ লোকে মহাত্মার চরিত্র বুঝিতে পারে না, কারণ তাঁহার চরিত্র সাধারণ লোকের মতো নয়; তাহার চিন্তা করিয়াও তাঁহার মর্ম বুঝিতে পারে না। এই বলিয়া ক্রমে জটিল মহাদেবের বিরুদ্ধে যত কথা বলিয়াছিল, সমস্তগুলিই খণ্ডন করিয়া দিলেন। তিনি শেষে বলিলেন, তোমার সহিত বিবাদে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁহাকে যত মন্দ বলিয়া জান, তিনি তাই

হোন। কিন্তু আমার মন তাহাতেই পড়িয়াছে, সে আর ফিরিবে না। আমি ইচ্ছায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমি নিন্দার ভয় কবি না।

তাঁহার বাক্য শেষ হইলে তিনি দেখিলেন জটিলের ঠোঁট নড়িতেছে সে আবার কিছু বলিতে চায়। তিনি সখীকে বলিলেন— তুমি উঁহাকে বারণ করো, কারণ যে বড়ো লোকের নিন্দা করে সেই যে কেবল অপরাধী হয় এমন নহে। উহার কথা যে শোনে সেও তাই হয়। অথবা কথায় কাজ নাই, আমি এখান হইতে সরিয়া যাই।

বলিয়া তিনি যেমন সরিয়া যাইবেন, অমনি মহাদেব নিজমূর্তি ধারণ করিয়া তাহার হাত ধরিলেন। পার্বতীর একটি পা উঠিয়াছিল। সেটি সেই ভাবেই রহিল। তিনি ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর ঘামে ভিজিয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। মহাদেব বলিলেন, তুমি তপস্যা করিয়া আমায় কিনিয়াছ, আমি তোমাব দাস। পার্বতী যে এত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহে যেন নূতন স্ফূর্তি আসিয়া পৌঁছিল।

এই যে প্রণয়, ইহাতে কামগন্ধের লেশও নাই। তাই শুরুতেই কামদেব ভস্ম হইয়া গেলেন। কাম বলিতে "স্পর্শ বিশেষ" বুঝায়; কিন্তু এখানে কাম শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় মাত্রেই। আমি আমার বাঞ্ছিতকে দেখিতেও চাই না, স্পর্শ করিতে চাই না, তাঁহার স্বর শুনিতেও চাই না, তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণও করিতে চাই না। চাই শুধু আপনার সব— মনপ্রাণ সব— সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে: তিনি আমায় পায়ে রাখেন, এইটি জানিলেই আমি কৃতার্থ; এই যে অপূর্ব প্রণয়, এ একটা বড়ো তপস্যা। এই নিঃস্বার্থ প্রণয় লাভ করাও অনেক তপস্যার ফল। তাই পার্বতী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধও হইয়াছিল। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন, পার্বতী কাঁচা সোনা। তাই আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নিজে উপযাচক হইয়া, ঘটক খুঁজিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মদনকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দু-জনে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। পার্বতী শিবের অর্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। আর কাহারো ভাগ্যে তাহা হয় নাই। কোনো দেবতারও নয়।

নারায়ণ
আষাঢ়, ১৩২৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. যখন শয্যা ত্যাগ করতেন, তখন কামিনী-কেশ-স্খলিত-কুঙ্কুমচূর্ণের রঙে কোথাও কোথাও পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করত রাজা অগ্নিবর্ণের শয্যা। কোথাও-বা তা মিলন সঙ্গিনীদের ছিন্ন-মথিত মালায় আকীর্ণ হয়ে থাকত। শয্যার কোনো কোনো অংশে শোভা পেত রমণীদের ছিন্নভিন্ন মেখলাখণ্ড। তাদের অলক্তরাগে কোনো কোনো স্থান হয়ে উঠত উজ্জ্বল। এভাবেই সূচিত হত মহারাজের চারপ্রকার (ব্যানত, করিপদ, হরিবিক্রম এবং ধৈনুক) বিহার কৌশল।

২. কাননের বৃক্ষগুলিও শাখাগুলিকে বাহুর মতো অবনত করে সন্নিহিত লতাবধূদের আলিঙ্গনলাভে তৃপ্ত হয়েছিল। কারণ, সেই লতাগুলির পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবক ছিল স্তনের মতোই সুখস্পর্শদায়ক। তাদের প্রস্ফুটিত রক্তকুসুমগুলি ছিল ওষ্ঠের মতো মনোরম (অতএব, চুম্বনপ্রবর্তক)।

৩. মনোরথের অগম্য কিছুই নেই।

উর্বশী-বিদায়

প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। একদিকে গঙ্গার সাদা জল তোড়ে আসিতেছে, আর একদিকে যমুনার কালো জল বেগে আসিতেছে। যেখানে দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানকার অপূর্ব শোভা কালিদাস একদিন মহাকবির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুলনার অতীত, কিন্তু সে বর্ণনায় আমাদের আজ কাজ নাই। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভরা যমুনাও পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে এ দুইয়ের মিলন হইয়াছে, সেইখানে একটি সাততলা প্রকাণ্ড সাদা মারবেলের রাজবাড়ি— এমন পালিশ করা যে, দিনরাত যেন চক্-চক্ করিতেছে— ঝক্-ঝক্ কবিতেছে। সেই সাততলা বাড়িটিই আজ আমাদের বর্ণনার বিষয়। আজ আকাশে মেঘ নাই, পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদ পুব্‌দিক্ হইতে উঠিতেছে আর যেন নির্জলা দুধের মতো সাদা আলোয় পৃথিবীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভরা গঙ্গার সাদা জলের উপর দুধ ঢালা— যমুনার কালো জলের উপর দুধ ঢালা। যমুনার কালো রং ডুবাইয়া দিয়া যেন সাদা রঙের ঢেউ উঠিতেছে। মারবেলের বাড়ির উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে— যেন সব বাড়িটিকে দুধে নাওয়াইয়া রাখিয়াছে। মারবেলের ছায়া গঙ্গার জলে পড়িয়াছে, ছায়া হইলে কী হয়, সেও যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সাদার উপর সাদা, তার উপর সাদা, তার উপর সাদা, এক অপরূপ সাদা রংয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আর সকলের উপর একটা চক্ চকে ঝক্‌ঝকে ভাব সকলেরই মন হরণ করিতেছে।

আজি সন্ধ্যা হইতেই রাজবাড়ির সকলের মুখেই কিন্তু একটা বিষাদের ছায়া

পড়িয়াছে। সকলেই চিন্তিত— একটা যেন কী মহাশোকের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সাততলার ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া আরশির মতো প্রতিফলিত হইতেছে। নক্ষত্রগুলির ছায়ার ছাদে যেন ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এ ছাদে কিন্তু আজ বীণা বেণু মৃদঙ্গ কিছুই বাজিতেছে না। নাচ বা গানের নামও নাই। আছেন কেবল রাজা পুরূরবা, তাঁহার পাটরাণী ঔশীনরী, অপ্সরা উর্বশী আর তাঁহার বিদূষক। উর্বশীর শাপ ছিল— তিনি মানুষ হইয়া পৃথিবীতে থাকিবেন; কিন্তু ছেলের মুখ দেখিলেই তাঁহাকে আবার স্বর্গে যাইতে হইবে। পুরূরবার প্রেমে কিন্তু উর্বশী এতই মগ্ন যে, ছেলেটি হইবামাত্র তাহার মুখ না দেখিয়াই উর্বশী তাহাকে এক ঋষির আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। ঋষি তাহাকে আপনার ছেলে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাইশ বৎসর প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সকালে দৈবের বিপাকে তাহাকে রাজারানীর সম্মুখে আসিতে হইয়াছে। উর্বশী তাহাকে চিনিয়াছেন ও তাহার মুখ দেখিয়াছেন; আর তাঁহার পৃথিবীতে থাকিবার কোনো উপায় নাই। তাঁহাকে স্বর্গে যাইতেই হইবে। ঠিক দুই প্রহর রাত্রিতে তাঁহাকে স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই সন্ধ্যা হইতেই রাজবাড়ির সকলের মুখেই আজ বিষাদের ছায়া। তাই আজ সাততলার ছাদে রাজা, রানী ও উর্বশীর আগমন। সকলেই অপেক্ষা করিতেছেন— কখন্ দুপুর বাজিবে। চাঁদ ক্রমে উদয় পাহাড়ের মাথা হইতে আকাশে উঠিতে লাগিলেন। রাজ-পরিবারেরও শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা পুরূরবা চাঁদের নাতি। বুধের ছেলে। তাঁহার মায়ের নাম ইলা। সুতরাং মানুষ হইলেও দেব-অংশেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি। সে জ্যোতিতে কখনো জোয়ার-ভাটা নাই। তাঁহার এত বয়স হইয়াছে। তিনি এত দেশ জয় করিয়াছেন— একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের সমস্ত ভার তাঁহার মাথার উপর। কতবার তিনি দেবতার হইয়া অসুরদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মুখখানি দেখিলে মনে হয়, তিনি এখন ১৮ ছাড়িয়া ১৯শে পড়েন নাই। তিনি যেদিন কেশী দানবকে নাশ করিয়া সূর্যলোক হইতে উর্বশীকে উদ্ধার করেন, উর্বশী সেই দিন হইতে দেখিতেছেন— রাজার মুখের, রূপের, শরীরের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি যেন কার্তিকের মতো চিরকুমার।

উর্বশী তো স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাগণের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী— সকলের অগ্রগণ্যা। তিনি শাপে অপ্সরা হইতেই মানুষ হইয়াছেন। তাঁহাকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাই। রাজা যখন কেশী দানবের হাত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন, তখন তিনি মূর্ছিত। মূর্ছিত অবস্থাতেই রাজা তাঁহাকে হেমকূট শিখরে সখীদিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত করেন। তখন তাঁহার দেহে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। সখীরা অনেক যত্ন,— অনেক সেবা করিলে ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি চোখ খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কে আমায় উদ্ধার করিল? সুরপতি ইন্দ্র কি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন?" সখীরা কহিল, "সুরপতি আপনার উদ্ধার করেন নাই; কিন্তু তাঁহারই একজন প্রিয় সুহৃদ ও চির-সহায় আপনাকে কেশীর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" দুরাত্মা অসুরের নাম শুনিয়াই উর্বশী আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবার চৈতন্য হইলে তিনি মহারাজ পুরূরবাকে দেখিলেন। দেখিয়াই মজিলেন। তিনি একটু সুস্থ হইলে পুরূরবা যখন নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তিনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি অতি করুণ, যেন হৃদয়ের মর্মস্থান ভেদ করিয়া করুণরস তাঁহার চক্ষু হইতে প্রবাহিত হইয়া রাজাকে আপ্লুত করিতে লাগিল। সেই অবধি মহারাজের নাম তাঁহার জপমালা হইল; তিনি শয়নে স্বপনে কেবল পুরূরাজকেই দেখিতে লাগিলেন এবং কিরূপে মহারাজের সহিত তাঁহার মিলন হয়, কেবল সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। একদিন ভূর্জপত্রে আপনার মনের ভাব লিখিয়া একজন অপ্সরা সখীর হাতে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে অদৃশ্য হইয়া সখীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। পত্র পড়িয়া রাজার মনের যেরূপ ভাব হইল, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া সশরীরে রাজার পাশে আসিয়া বসিলেন। উভয়ে প্রেমালাপ হইতেছে, এমন সময় চেটী আসিয়া খবর দিল, স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসা অবধি রাজার শরীর খারাপ হইয়াছে শুনিয়া পাটরানী তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। শুনিয়াই উর্বশী অদৃশ্য হইয়া গেলেন; তাঁহার অপ্সরা সখী আকাশপথে লীন হইয়া গেলেন। রাজা ভূর্জপত্রখানি আর-একবার পড়িলেন, নিকটেই বিদূষক ছিল, তাহার হাতে সেইখানি দিয়া বলিলেন, "এখানি যত্ন করিয়া রাখিও; দেখিও রানী যেন টের না পান। উর্বশীর বিরহে এই পত্রখানি তাঁহার স্মৃতি আমার মনে জাগরূক

করিয়া রাখিবে ও আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে।" বিদূষক কিন্তু আল্‌গা লোক। তাহার হাত হইতে সে পত্রখানি যে উড়িয়া গেল, সে তাহা টেরও পাইল না। পত্রখানি পড়বি তো পড়্‌ উড়িয়া গিয়া রানীর হাতেই পড়িল। রানী আসিয়া পত্রখানি রাজাকে উপহার দিলেন এবং অনেকক্ষণ কোন্দল করিয়া মানভরে প্রস্থান করিলেন। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিছুতেই তিনি কর্ণপাত করিলেন না।

ওদিকে উর্বশী স্বর্গে ফিরিয়াই শুনিলেন, ভরতমুণি লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন; সেখানি শীঘ্রই ইন্দ্রের সভায় অভিনয় হইবে আর তাহাকে লক্ষ্মী সাজিতে হইবে। এখনই রিহার্সালি; রিহার্সালে লক্ষ্মী সাজিয়া উর্বশী যেখানে নারায়ণের নাম করিতে হইবে, সেখানে পুরূরবার নাম করিয়া বসিলেন। ভরতমুনি বড়ো বদরাগি ও বদমেজাজি। তিনি ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না; একেবারে শাপ দিয়া বসিলেন,— "তুই যখন নারায়ণের নাম করিতে গিয়া মানুষের নাম করিয়াছিস্‌, তুই যা, মনুষ্যলোকে গিয়া থাক্‌। শাপের কথা শুনিয়াই ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যাপারটা সব তলাইয়া বুঝিলেন, ঋষিকে অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে শাপমোচন করিতে বলিলেন। শেষে স্থির হইল, পুত্র-মুখ-দর্শন হইলেই শাপান্ত হইবে। ইন্দ্র তখন মাতলিকে ডাকিয়া উর্বশীকে সঙ্গে দিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, উর্বশী তোমার প্রতি অনুরক্ত, তুমিও উর্বশীকে বড়ো ভালোবাস। তুমি আমার বন্ধু— উপকারী, তাই উর্বশীকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিই। তুমি ইহাকে কাছে রাখো।

মাতলি চলিয়া গেল। রাজা, উর্বশী ও বিদূষক তিনজনে কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে চেটী আসিয়া খবর দিল, রাজার কাছ হইতে গিয়া অবধি রানী উপবাস করিতেছেন। তাঁহার এক ব্রত আছে, সে ব্রত আজ সাঙ্গ হইবে। কিন্তু রাজার নিকট না আসিলে সে ব্রত আজ উদ্‌যাপন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি অনুনয়-বিনয় করিয়া একবার দেখা করিবার জন্য বড়ো ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,— "তিনি আসুন"। রানী

আসিলেন; সঙ্গে অনেক চেটী অনেক পূজার জিনিস লইয়া আসিয়াছে। রানী রাজাকে পূজা করিলেন। ফুল দিলেন, মালা দিলেন, চন্দন দিলেন, ভালো ভালো খাবার জিনিস দিলেন। বিদূষকের বড়ো আহ্লাদ। আরতি করিলেন। পূজার অঙ্গ শেষ হইলে গলায় কাপড় দিয়া বলিলেন,— "আজ অবধি আমার স্বামী যাহাকে ভালোবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভালোবাসিব; সে আমার ভগিনী হইবে। এই আমার ব্রত, এই ব্রতের নাম প্রিয়-প্রসাধন।" রানী সেই অবধি উর্বশীকে আপনার ভগিনীর মতো জ্ঞান করেন, তাই আজ উর্বশীর বিদায়ের দিনে রাজার নিকট উপস্থিত আছেন। তাঁহারও মুখখানি আজ অতিশয় ম্লান— মনে বড়োই কষ্ট হইয়াছে।

রাজা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,— "উর্বশী! তবে তুমি আজ সত্য সত্যই যাইবে?"

উর্বশী বলিলেন, "আমরা দেবরাজের অধীন, আমাদের কোনো বিষয়েই স্বাধীনতা নাই। আমার শাপমোচন হইয়াছে, আমাদের এই শেষ দেখা। এই বিদায়ের দিন যাহাতে শ্রীঘ্র না আইসে, তাই মা হইয়াও ছেলেটিকে এত কাল বনবাসে দিয়াছিলাম; কিন্তু বিধিলিপি তো খণ্ডন হয় না; তাই আজ আমায় তাহার মুখ দেখিতে হইল, আমারও বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বুঝি তো সব; কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না। তুমি তো জানো উর্বশী, তুমি কাছে না থাকিলে আমার কিরূপ অবস্থা হয়। জানো তো কার্তিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়া তুমি যখন লতা হইয়া গিয়াছিলে, আমার কী হাল হইয়াছিল। তখন যে আমি পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। মেঘ তোমায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। ময়ূরের কাছে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করিলে সে যখন কক্ কক্ করিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার সহিত কত ঝগড়া করিয়াছিলাম। আমার আবার বোধ হয় সেই দশা উপস্থিত হইবে।" এই বলিয়া রাজা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রানী ও উর্বশী অনেকক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। রানী ঔশীনরী প্রমাদ গণিলেন। উর্বশী রাজার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "মহারাজ, স্থির হউন— আপনার অবস্থা যে বড়োই

শোচনীয় হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু আমার অবস্থাটা কী হইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। আপনার শৌর্য-বীর্য, রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের যে পরমগুরু মহর্ষি ভরত, তাঁহারও সাক্ষাতে আত্মসংযম করিতে পারি নাই। এই যে যাইতেছি, আবার যে কী হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। অমন ভুল আবার হইলে এবার ঋষি যে কী করিবেন, ভাবিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। হয় তো এবার বলিয়া বসিবেন— "তুই যার জন্য বার বার ভুল করিতেছিস, অনন্ত কালেও তোর সহিত তাহার দেখা হইবে না।" সে বারের শাপে তো আমাদের ভালোই হইয়াছিল, এবার যদি উল্টা শাপ দেন, তাহা হইলে অনন্ত কালের জন্য আমরা চির-দুঃখে ও চির-বিরহে পড়িয়া থাকিব।"

রাজা বলিলেন, "আর না উর্বশী, ও কথা আর মুখেও অনিও না; শুনিলে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমি তোমার সহিত মিলনের আর-এক উপায় করিয়াছি। স্বর্গে যাইলে তো তোমায় দেখিতে পাইব। অতএব আমি এখনি মরিয়া তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

উর্বশী।— মহারাজ, অতি বড়ো শত্রুও যেন অমন কথা মুখে না আনে। কারণ, আত্মহত্যা করিলে স্বর্গে যাইবার কোনো উপায় নাই। কারণ, আত্মঘাতী লোকে অসুর-লোকে যায় এবং সেখানে গাঢ় অন্ধ-তমসায় আচ্ছন্ন থাকে। অতএব ওরূপ কথা যদি আপনি মনেও ভাবিয়া থাকেন— আর ভাবিবেন না। আমার ভগিনী ঔশীনরী আছেন, ইনিই আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। আমি তো জানি, তিনি আপনাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালোবাসেন। স্ত্রীলোকে সব করিতে পারে, কিন্তু আপনার স্বামীটিকে পরের হাতে তুলিয়া দিতে কেহই পারে না। দিদি আমার তাহাও আর-একজনের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মনচোরাকে আর একজনকে চুরি করিতে দিয়াছেন এবং সেই চোরকে ভগিনী বলিয়া ভালোবাসিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, "রানীর আমার গুণের পার নাই। সে কথা তুমি আমায় বুঝাইবে কী। তাঁহাকে আমি তোমা অপেক্ষা অনেক বেশি দিন ধরিয়া জানি—

তাঁহার গুণে আমি চির-ঋণী; কিন্তু তাহা হইলে কী হয়, আমায় তো আর আমি নাই— আমি আর-এক রকম হইয়া গিয়াছি। এখন তোমায় কি করিয়া পাই, তাহারই উপায় বলো। আমি আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না!" বলিয়া রাজা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

উর্বশী বলিলেন,— "মহারাজ, আমি তো একান্ত পরাধীন, তথাপি আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিতেছি। আপনি তো অলৌকিক শক্তিশালী; আপনি স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ত্রিভুবনে যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন। আপনি যখন যেখানে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন, সেইখানে উর্বশী উর্বশী বলিয়া ডাকিবেন— আমি পরাধীন হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার পাশে গিয়া দাঁড়াইব। দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্যের সৌন্দর্য বাড়াইয়া দিব।"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের ঠিক মাঝখানে অসিয়া উপস্থিত হইলেন। উর্বশীও চকিত হইয়া সেই দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের ভার কমিয়া আসিতে লাগিল। শরীর হইতে দিব্য জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার রক্ত, মাংস, হাড়, পাঁজরা সব লোপ হইতে লাগিল; তাঁহার শরীরকান্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। তিনি যে উর্বশী ছিলেন, সেই উর্বশীই রহিলেন; কিন্তু আর সে মাটির উর্বশী নহে, পৃথিবীর যা-কিছু ছিল, পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিব্য-মূর্তিতে আবার অপ্সরা হইয়া আকাশপথে উঠিতে লাগিলেন। রাজা স্তব্ধ, রানী স্তব্ধ, প্রতিষ্ঠানপুরের সমস্ত লোক স্তব্ধ, যেন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া উর্বশীর পার্থিব দেহের এই পরিণাম একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজার দৃষ্টির অতীত হইয়া যান, এমন সময়ে রাজা একবার চন্দ্রালোকময়ী পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের আবেগে ডাকিয়া উঠিলেন,— "উর্বশি! উর্বশি!" অমনি উর্বশী আসিয়া আবার তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং দুই-জনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চন্দ্রালোকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ও প্রতিষ্ঠানপুরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া লইলেন। তখন রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; বুঝিলেন, স্বভাব-সৌন্দর্যের মধ্যে উর্বশীকে ডাকিলেই

পাইবেন। সুতরাং পুনর্বার উর্বশী যাইবার জন্য আকাশে উঠিলে তিনি আর তাহাকে ডাকিলেন না। মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করিয়া অতি কষ্টে রাত্রিটি কাটাইয়া দিলেন।

মহারাজা পুরূরবা অনেকদিন গত হইয়াছেন, তাহার পর কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখন যে স্বভাব-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া "উর্বশী উর্বশী" বলিয়া ডাকে, সে সত্য সত্যই তাহাকে দেখিতে পায়। উর্বশী কল্পনার প্রধান সঙ্গিনী, সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, কবিরা যাহাকে রস বলেন, সেই রসের খর প্রস্রবণ।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২৩

বিরহে পাগল

রাজা উর্বশীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভরতমুনির শাপে উর্বশীরও বর হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। পাটরানী সতীনপনা ভুলিয়া উর্বশীকে ভগিনী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রাজা ও উর্বশী দুইয়ে এখন এক। রাজা যদি মহাদেব হইতেন, হয়তো অর্ধনারীশ্বর মূর্তি হইয়া যাইতেন। এ প্রণয়-মিলনে যে সুখ, রাজার তাহার চরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাজধানী আর ভালো লাগিতেছে না। এখানে লোকজন অনেক, কাজকর্ম অনেক, ব্যাঘাত অনেক; সুতরাং এ জায়গাটা ছাড়িতে হইবে। এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে রাজা দেখিবেন উর্বশী, আর উর্বশী দেখিবেন রাজা। তবেই তো মিলনের চরম হইবে। তবেই তো দ্বৈতভাবে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে। জায়গাটাও মনোরম হওয়া চাই; নেহাত মরুভূমিতে হইবে না, বনে জঙ্গলে হইবে না, পাহাড়-পর্বতেও হইবে না। যেখানে ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ, শ্রম, ক্লান্তি, ইহার একটিও থাকিবে অথবা একটুও থাকিবে, সেখানেও অদ্বৈতভাবের ব্যাঘাত হইবে। তাই উর্বশী স্থির করিলেন, গন্ধমাদন যাইতে হইবে। বরফের পাহাড়ের নিকটে, অথচ তত শীত নহে, তত বরফ পড়ে না, এমন জায়গায় গন্ধমাদন নামে এক পর্বত আছে। পর্বতের গায়ে, পাশে, মাথায় কেবল ফুল ফুটিয়া আছে। ফুলের গন্ধে যে শুধু চারিদিক্ আমোদ করিয়া আছে, এমন নহে; এ গন্ধে লোকেও পাগল হয়। কেহ কেহ বলে, সেখানে গেলে লোকে কেবল হাসিতে থাকে; এত হাসি হাসে যে, হাসিতে হাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফুলের ধূলায় আকাশ ভরিয়া যায়। বদরিকাশ্রমের উত্তরে বরফের পাহাড়ের ঠিক নিচে এইরূপ একটি পাহাড় আছে, উহাকেই গন্ধমাদন বলে। শীতকালে বরফ পড়ে। গরমের সময় বরফ গলিয়া গিয়া নানারূপ সুগন্ধি ফুলের গাছ গজাইয়া উঠে। বর্ষায় যখন ফুল ফুটে, তখন গন্ধমাদন নামটি সার্থক হয়।

উর্বশী রাজাকে বলিলেন, "চলো আমরা দুজনে গন্ধমাদন যাই। সেখানে আমাদের সঙ্গে আর কেহই থাকিবে না। রাজ্যের ভার মন্ত্রীদের উপর দাও; নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা দু-জনে সেখানে থাকি। চাকর-চাকরানি, খানসামা, খিদ্‌মদগার কিছুই দরকার নাই। তোমার সঙ্গে কেবল থাকিবে তোমার অপরূপ রূপ, আর সে রূপ দেখিবার জন্য থাকিবে কেবল আমার দুটি চক্ষু। সে পাহাড়ের উপর দিয়া একটি নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে; ধীরে ধীরে বহিতেছে বলিয়া দেবতারা তাহার নাম রাখিয়াছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর দুই দিকে এখন প্রকাণ্ড চড়া, সে চড়ায় কেবল বালি। চলো, সেই চড়ায় গিয়া আমরা বেড়াই। প্রণয়ের মিলনের সেই তো স্থান।"

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা রাজা ও উর্বশী মন্দাকিনীর তীরে গন্ধমাদন পর্বতে একেবারে জনশূন্য স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ হইতে তফাত হইয়া তথায় তাঁহারা দু-জনেই নূতন জগৎই বলো, আর নূতন স্বর্গই বলো, বা নূতন বৈকুণ্ঠই বলো, নূতন সুখাবতীই বা বলো, গড়িয়া লইলেন।

তাঁহারা কিরূপে সেখানে কালযাপন করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস সেকথা বলেন নাই। কিন্তু সেটা সকলেই মনে মনে আঁচিয়া লইতে পারেন। কিন্তু চিরদিন কখনো সমান যায় না। গ্রীষ্ম যায়— বর্ষা আসে, এমন সময় একটি বিদ্যাধরের মেয়ে দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উর্বশীর এটুকুও সহ্য হইল না। যেখানে ভালোবাসার মাত্রাটা বড়ো বেশি সেখানে রাগের মাত্রাও খুব বেশি। আমি যাহাকে ভালোবাসি, সে আর- একজনের দিকে চাহিবে! উর্বশী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, উর্বশীর রাগ পড়িল না। তিনি রাগে গর-গর হইয়া মন্দাকিনীর বালির উপর দিয়া চলিলেন; রাজাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অনেক দূর গিয়া উর্বশী একটি বাগান দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন বাগানে ঢুকিতে গেলেন, অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাজা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কোথাও উর্বশী নাই। রাজা তখন একা— একেবারে একা। একজন সঙ্গী ছিল, তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ যে ভয়ানক একা! তাহার উপর গন্ধমাদনের গন্ধ। সে গন্ধে অন্য লোক তো একেবারেই পাগল হয়। তাহার উপর এই অদ্ভুত বিরহ! মিলনের আশাও নাই। কালিদাস একবার এইরূপ বিরহে ফেলিয়া একটি বেচারা যক্ষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই সে জড় পদার্থ মেঘকে দূত করিয়া আপন স্ত্রীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা

করিয়াছিল। কিন্তু তাহার তো আশা ছিল, বৎসরের পর আবার মিলন হইবার আশা ছিল। সে সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়াছিল। তবে বর্ষা আসায় তাহার মনটা বড়োই খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তাই সে একটু পাগলামি করিয়াছিল। কিন্তু এবার তো সে আশা নাই। উর্বশী অপ্সরা, সে অদৃশ্য হইয়া গেল, কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই। যদি আসে তো কবে আসিবে, তাহার ঠিকানা নাই, তাহাতে স্থানটা গন্ধমাদন, আবার বর্ষা আসিতেছে। সুতরাং রাজা একেবারে পাগল হইয়া গেলেন— উন্মাদ পাগল হইয়া গেলেন। এ দিকে উর্বশী ও দিকে উর্বশী ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিন-রাত্রি নাই, কেবল ছুটাছুটি। এমন সময়ে মেঘ উঠিল। রাজার বা যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাও লোপ হইল। ভালোবাসার সামগ্রী কাছে থাকিলেও মেঘ উঠিলে মনটা কেমন কেমন করে, কী যেন হারাইয়াছি, হারাইয়া যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়; তাহা পাইব কিনা ভাবিয়া অধীর হইতে হয়। রাজা যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতে তিনি যে পাগল হইবেন— উন্মাদ হইবেন— হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইবেন— সব উল্টাপাল্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কী?

কালিদাস মেঘদূতে যক্ষকে পাগল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাগল সাজাইতে পারেন নাই। এখানে রাজাকে পাগল সাজাইয়াছেন। বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভেই লিখিয়াছেন— "ততঃ প্রবিশতি উন্মত্তবেষো রাজা" রাজা উন্মত্ত অর্থাৎ পাগলের বেশে প্রবেশ করিলেন। কোনো কোনো পুথিতে রাজা যে আসিতেছেন, সেটা জানাইয়া দিবার জন্য একটি প্রাকৃত গান আছে। [Bombay Sanskrit Series. No. XVI, Appendix - 1. 1901]। গান যে কে গাহিল, তাহার নির্ণয় নাই, বোধ হয় যেন নেপথ্য হইতেই কেহ গাহিয়া দিল, কিন্তু নেপথ্যে বলিয়া যেমন অন্য অন্য জায়গায় লেখা থাকে, তেমন লেখা কিছুই নাই। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এ পুথির পাঠ ঠিক নয়। নাই হউক ঠিক: কিন্তু উহাতে রাজার পাগল-বেশের একটা বর্ণনা আছে। গানে বলিতেছে,

"হাতি আপন ভালোবাসার বিরহে উন্মাদ হইয়াছে, নানারূপ উল্টা-পাল্টা পাগলামির লক্ষণ দেখাইতেছে। গাছের পাতা আর ফুল ছিড়িয়া দেহের সম্মুখভাগটা সাজাইয়াছে, আর বনের ভিতর ঢুকিতেছে।" গান গাওয়ার পরই রাজা আসিলেন। তাহার দৃষ্টি আকাশের দিকে, সেটা একটা পাগলেরই লক্ষণ— সাজগোজও পাগলের মতো। আসিয়াই রাগে চিৎকার করিয়া বলিলেন,— "রে দুরাত্মা রাক্ষস, তুই আমার ভালোবাসার জিনিস চুরি করিয়া কোথায় যাইতেছিস?" খানিক এদিক্

ওদিক্ দেখিয়া আবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "পাহাড়ের আগা থেকে আকাশে উঠিয়া আমার উপর তীর ছুড়িতেছিস্?" খানিক পরে ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,— "হায় হায়! এ তো দুরাত্মা রাক্ষস নয়, এ যে নূতন মেঘ। এ তো ধনুক নয়, এ যে রামধনু। এ তো বাণ নয় এ যে বৃষ্টির ধারা। এ তো উর্বশী নয়, এ যে বিদ্যুৎ, যেন কষ্টিপাথরে সোনার দাগ।"

বোধ হয়, বৃষ্টির ধারা পাগলের মাথায় পড়ায় সে একটু সুস্থ হইল। তাহার জ্ঞান কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে তখন টের পাইল, যাহা রাক্ষস ভাবিয়াছিল, তাহা রাক্ষস নয়, যাহাকে উর্বশী ভাবিয়াছিল, সে উর্বশী নয়। যে পুথির কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে এইখানে রাজা মূর্ছিত হইয়া পড়েন লেখা আছে, আপনার ভ্রম বুঝিয়া লজ্জিত হন লেখা আছে, মেঘের কাছে মাপ চাওয়ার কথা লেখা আছে, আরো কত কী কথা আছে; কিন্তু সে সবকথা এখন আর বলিব না। যদি বারান্তরে সে-সকল পুথির কথা বলিতে পারি, বলিব। এখন রাজার পাগলামিটি কালিদাস যেমন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাই বলি। তবে যখন অন্য পুথির কথা পাড়িয়া রসভঙ্গ করিয়াছি, তখন একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমরা ঐ বাড়্তি কথাগুলি কালিদাসের বলিয়া বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই, কালিদাস কখনো কোনো বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেন না। তিনি বেশ জানিতেন, সব অত্যাচার সহ্য যায়— রাজার অত্যাচার সহ্য যায়, ধর্মর অত্যাচার সহ্য যায়, পুলিসের অত্যাচার সহ্য যায়, ভালোবাসার অত্যাচার সহ্য যায়; কিন্তু কবির অত্যাচার সহ্য যায় না। কবি যে কথাটি তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, সেইটি ফেনাইয়া ফুলাইয়া বাড়াইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবেন, এটা কেহই সহিবে না। তাই কালিদাস কখনো কোনো জায়গায় বাড়াবাড়ি করেন নাই। আর বাড়াবাড়ি করেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহার এত আদর। তিনি "জগতের কালিদাস" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজা বলিলেন,— "তাই তো, এ যদি মেঘ, রাক্ষস নয়; ওটা যদি বিদ্যুৎ, উর্বশী নয়; তবে উর্বশী গেল কোথায়? সে তো অপ্সরা; বড়ো রাগ হইয়াছে বলিয়া কি দেবশক্তিতে লুকাইয়া আছে? তা তো হইতে পারে না। সে তো বেশিক্ষণ রাগ করিয়া থাকে না। তবে কি সে স্বর্গে চলিয়া গেল? সেও তো হতে পারে না, আমার উপর তার যে বড়ো টান। তবে কি তাহাকে কেহ হরিয়া লইয়া গিয়াছে? সেও তো হ'তে পারে না, অসুরেও আমার কাছ থেকে তাকে হরিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তবে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এ ব্যাপারটা কী?" রাজা একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার ডাহিনে, একবার বামে দেখিতে লাগিলেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া

বলিলেন,— "যাদের ভাগ্য মন্দ, তাদের দুঃখের পর দুঃখই আসে। এই দেখ না— একে তো উর্বশী কাছে নাই, আমি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছি, তাহার উপর আবার মেঘ দেখা দিতেছে। দিনে আর গরম থাকিবে না, আমায় সমস্ত দিনই বিরহেই কেবল ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। তাই বা কেন হইবে? কেনই বা কষ্ট পাইব? মুনিরা তো বলেন, "রাজা কালস্য কারণম্।" আমিই যদি কালের কারণ হইলাম, আমি কেন বলি না, বর্ষা, তুমি এখন আসিও না। তাহা হইলেই তো সব চুকিয়া যায়। কিন্তু তাও কি হয়? আমি যে রাজা বনে একলা রহিয়াছি, তবুও তো আমি রাজা। আমার তো রাজার চিহ্ন কিছুই নাই; কিন্তু বর্ষাকাল যে আমার সব রাজচিহ্ন আনিয়া দিতেছে। দেখ না, মেঘ আমার চাঁদোয়া হইয়াছে। রাজার চাঁদোয়ায় সোনার কাজ করা থাকে; বিদ্যুৎগুলিই সে সোনালির কাজ। রাজার চামর থাকে; হিজল গাছের বড়ো বড়ো মঞ্জরিগুলি চামরের কাজ করিতেছে। রাজার ভাটচারণ থাকে; মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরেরা ডাকিতেছে, তাহাতেই ভাট-চারণের কাজ হইতেছে। সওদাগরেরা রাজাকে ভেট দেয়; পাহাড়গুলাই সওদাগর হইয়াছে আর পাহাড়ের গা ধুইয়া কত কী আমার নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই আমার ভেট হইতেছে।

দূর হউক ছাই, ওসব কথা আর ভাবিব না। বেশভূষার গরব করে আর কী হবে? যাই, তাহারই সন্ধানে যাই— যার বিহনে সব অন্ধকার দেখিতেছি। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে একটি ভুঁইচাঁপা ফুল রাজার চোখে পড়িয়া গেল, তাঁহার বোধ হইল যেন, তাঁহার "ভালোবাসা"র চোখটি দেখিতে পাইলেন। রাগে যেন উর্বশীর চোখে জল আসিয়াছে, আর চোখের কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ভুঁইচাঁপার পাপড়িগুলি একটু লালচে হয়, আর বর্ষায় তাহার ভিতরে জল থাকে। ভুঁইচাঁপা দেখিয়া রাজা অধীর হইয়া উঠিলেন;— বলিলেন, তিনি যে কোন্ পথে গিয়াছেন, কেমন করিয়া টের পাইব? বনের বালিতে বর্ষার জল পড়িয়াছে, তাহার উপর দিয়া যদি তিনি চলিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তো তাঁহার পায়ের দাগ দেখিয়াই চিনিতে পারি। কারণ, সে দাগটি পিছন দিকে গভীর হইবে, আর সে দাগের পাশে আল্‌তার দাগ থাকিবে।

এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া রাজা বলিলেন, "বাঃ, বাঃ! পেয়েছি— পেয়েছি। এই যে তাঁহার বুকের কাপড়, সবুজ চেলি, ঠিক যেন শুক পাখির পেটের রঙ। রাগে যখন তাঁর চোখের জল পড়িয়াছে, সে জল ঠোঁটের উপর পড়িয়াছে। লাল রঙ করা ঠোঁটে লাল রঙ গলিয়া সে জল লাল হইয়া

গিয়াছে, আর বুকের কাপড়ে পড়িয়াছে। বোধ হয়, রাগে চলিয়া যাইবার সময় কাপড়খানি খসিয়া পড়িয়াছে।" বেশ করিয়া কাপড়খানি রাজা ঠাহরাইয়া দেখিলেন আর বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! এ যে কাপড় নয়, ঘাসের জমির মাঝে মাঝে ইন্দ্রকীট রহিয়াছে।"

ইন্দ্রকীট নামে রাঙা রাঙা ছোট্ট ছোট্ট এক রকম পোকা আছে। বর্ষার প্রথম ভাগে তাহারা মাঠের অনেক জায়গা ছাইয়া থাকে। ঘাসের জমির উপর ইন্দ্রকীটের ঝাঁক পড়ায় সবুজ চেলির উপর রঙ গোলা চোখের জলের মতো বোধ হইতেছিল।

এ নির্জন বনে কাহার কাছে তাহার সন্ধান পাই বলিয়া পাগল চারিদিকে চাহিতে লাগিল; দেখিল, একটা ময়ূর, বর্ষার জলে যে জায়গায় শিলাজতু ভিজিয়া রহিয়াছে, তাহারই একটা পাথরের উপর আনন্দেতে ঘাড় উচা করিয়া কেকা রব করিবার চেষ্টায় আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ময়ূর হে, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? সে এই বনে কোথায় আছে কি বলিতে পার?"

গেল যা! আমার কথার জবাব না দিয়াই নাচিতে লাগিল। নাচে কেন? কিসে ওর এত আনন্দ হয়েছে? বুঝেছি— বুঝেছি, আমার ভালোবাসার ধন নাশ হইয়াছে, ময়ূরের বড়ো আনন্দ। এতদিনে উহার পেখমের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তাই এত আনন্দ। উর্বশীর খোপা যখন খুলিয়া যাইত, আর তাহার ফুলগুলি দেখা যাইত, তখন যে কেহও ময়ূরের পেখমের দিকে চাহিতও না। আজ সে নাই, তাই এত আনন্দ। যাক্ যাক্, পরের দুঃখে যার সুখ, সে পাষণ্ডকে কোনো কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না।

বাঃ! এই যে এদিকে একটি কোকিলা জামগাছের ডালে বসে আছে। আজ ওর ভারি আনন্দ; গ্রীষ্ম শেষ হইয়াছে, বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। পাখির মধ্যে কোকিলই পণ্ডিত, আমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

ওহে কোকিল, তুমি তো মদনের দূত, মান ভাঙাতে তোমার মতো এ দুনিয়ায় আর কে আছে? হয় তাকে আমার কাছে এনে দাও, না-হয় আমায় তার কাছে নিয়ে চলো। কী বল্লে? আমি তাকে এত ভালোবাসি, তবে সে কেন চলে গেল? শোনো তবে, সে চটেছে; কিন্তু কেন, সেকথা আমি বলিতে পারি না। আমি তার কাছে এতটুকুও অপরাধ করি নাই। স্ত্রী তো স্বামীর প্রভু, যা খুশি করিতে পারে, অপরাধের অপেক্ষা তার নাই।

এ কী? কথা কহিতে কহিতে আপনার কাজে মন দিলে? পরের দুঃখ যতই বড়ো হউক, সেটা ঠাণ্ডা। নহিলে আমি এই এত দুঃখ জানাইতেছি, আমার কথায় কান না দিয়া কোকিলটা জামের ডাঁশা ফল চুষিতে লাগিল— মনে করিয়াছে বুঝি ওর প্রিয়ার অধর।

যা হোক, ওর স্বরটি বেশ মিষ্ট— যেন উর্বশীর কণ্ঠস্বর। ওর উপর রাগ করিয়া আর কী করিব? যাই, অন্য দিকে দেখি গে।

ডান দিকে যে নূপুরের শব্দ শুনিতেছি। প্রিয়া কি এই দিকে আসিয়াছেন? যাই, দেখি গিয়া। কিছু দূর গিয়া— ছি ছি! হাঁসের শব্দ, চারিদিক্ মেঘে কালো হইয়া গিয়াছে, হাঁসগুলা মানস-সরোবরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এ তাদেরই শব্দ, নূপুরের শব্দ নয়। যতক্ষণ ইহারা মানসে না চলিয়া যায়, তারি মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁর কোনো খবর পাই কি না।

ওহে পক্ষিরাজ, মানস-সরোবরে এর পর যেয়ো। মুখে পথ খরচের জন্য যে মৃণালখণ্ড লইয়াছ, তাহা একবার রাখো, আমায় উদ্ধার করো, আমায় তাঁর খবর দাও, তার পর যেয়ো। সাধুলোক আপনার কাজের চেয়ে পরের উপকারকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন।

যখন মুখ উচা করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে, তখন বোধ হয় বলিতেছে— আমরা বড়ো ব্যস্ত, দেখিতে পাই নাই।

যদি তুমি পুকুরের পাড়ে তাহাকে নাই দেখিতে পাইয়াছ, তবে তুমি তাহার গতিটা সমস্তই চুরি করিলে কিরূপে? তা হবে না, তুমি আমার কান্তাকে ফিরাইয়া দাও, তুমি তাহার ঠমকটা তো চুরি করিয়াছ, তখন তাহাকেও চুরি করিয়াছ। কোনো অংশ পাওয়া গেলে, চোরকে সমস্ত চোরাইমাল দিতে হয়, তা বুঝি জান না? বাঃ! পাছে আমি রাজা— চোরের শাসন করি, তাই ভয়ে উড়িয়া গেল।

আবার খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা দেখিলেন, চক্রবাক ও চক্রবাকী বেড়াইতেছে। ভাবিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে, ইহার কাছে ঠিক খবর পাইব। ওহে চক্রবাক্, আমার ভালোবাসার যে সামগ্রী ছিল, তাহার নিতম্বও চক্রের মতো। সে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি বড়ো আশা করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কোথায় গেল, বলিতে পার কি?

এমন সময় চক্রবাক কক্ কক্ করিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন, ও বোধ

হয় আমায় চিনে না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে "কঃ কঃ"? সূর্য ও চন্দ্র আমার মাতামহ আর পিতামহ; দুই স্ত্রী আমায় আপনি বরণ করিয়াছিল;— এক পৃথিবী, আর এক উর্বশী।

বাঃ! এ যে চুপ করিয়া রহিল। তুমি তো ভারি মজার লোক হে! যদি চকী পদ্মের পাতার আড়ালে থাকে, তা হলেও তুমি সে কোথায় গেল, ভাবিয়া চিৎকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তোল। গৃহিণীর উপর তোমার এতই টান যে, তুমি কিছুতেই তফাত থাকিতে পার না। আর আমি আমার ভালোবাসার সামগ্রী হারাইয়া কাতর হইয়াছি, তুমি আমায় তাহার খবরটাও দিতে পারিলে না, এতে আর কী বলিব, আমার ভাগ্যই মন্দ।

যাই, এখানে তো হল না, অন্য দিকে যাই। রাজা দু-এক পা গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। এই পদ্মফুলটা দেখিয়া আমি আর যাইতে পারিতেছি না। এটার ভিতর একটা ভ্রমর বন্ধ আছে, আর সেটা গুণ্ গুণ্ করিতেছে। আমি অধর দংশন করিলে সে যখন ফোঁস ফোঁস করিত, তখন তাহার মুখখানি ঠিক এই রকমই দেখাইত। আমি ঐ ভোমরাটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এখান থেকে চলে গেলে, এর পর হয় তো দুঃখ হবে, কেন তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই?

মধুকর! আমার গৃহিণীর চোখ দুটি মত্ত চকোরের মতো, তুমি আমায় তাঁর খবর দাও!

অথবা সে সুন্দরীকে তুমি একেবারেই দেখ নাই। তার মুখের সুন্দর গন্ধ যদি পাইতে, তাহা হইলে কি আর এই পদ্মফুলটার উপর তোমার আস্থা থাকিত?

যা হোক, অন্য জায়গায় যাই। এই যে একটি হাতির সঙ্গে হাতিনি কেলিকদম্ব-গাছের কাঁধে শুঁড় লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি করিব না। হাতিনি শুঁড় দিয়া একটি টাট্‌কা কচি শল্লকীর ডাল ভাঙিয়া উহাকে দিতেছে। আটায় মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। ও ডালটা বেচারা খাইয়া লউক, তাহার পর উহাকে বিরক্ত করিব। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হাতির আহার শেষ হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে হাতি, তুমি আমার স্থির-যৌবনা প্রিয়তমাকে দূর হইতেও দেখিয়াছ কি?" এমন সময় হাতি গর্জন করিয়া উঠিল। রাজা বড়ো খুশি; মনে করিলেন, বুঝি খবর দিবে। না হবে কেন? ও হল হাতির রাজা, আমি হলেম মানুষের রাজা, পরস্পর একটা টান তো আছেই। দেখ ভাই, আমি হলেম রাজাদের রাজা, তুমি হাতির রাজা; তোমার দান অনবরত মোটাধারে ঝরিতেছে, আমার

দানেরও বিরাম নাই; উর্বশী আমার স্ত্রীলোকের মধ্যে রত্ন, তোমার হাতিনিও তোমার যূথের মধ্যে রত্ন। তোমায় আমায় তফাতের মধ্যে এই যে, আমি বিরহে কাতর, আর এ দুঃখটা তোমায় কখনো সহিতে হয় নাই। তা ভাই, তোমরা সুখে থাকো, আমি আমার কাজে যাই।

এই যে সুরভিকন্দর নামক একটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, এটি বড়ো রমনীয় স্থান, অপ্সরারা ইহাকে বড়ো ভালোবাসে। সেও তো অপ্সরা, সে কি ইহার কাছে কোথাও আছে? বলিয়া রাজা চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কী কষ্ট! মেঘে যে সব ছাইয়া আছে, কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে যদি এক-একটা বিদ্যুৎ নলপায়, তবুও কিছু দেখা যায়; তাও তো হয় না। যা হোক, পাহাড়টাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব না। ওহে গিরিরাজ! তোমার নিতম্ব তো বড়ো প্রকাণ্ড; তাহারো তো তাই। তাহার বুকে জায়গা নাই; দেহের যেখানে পাপ, তাহার সেইখানটাই নিচু সে কি তোমার কোনো বনে আশ্রয় লইয়াছে?

বাঃ! চুপ করিয়া রহিলে যে? দূরে আছে বলিয়া বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।

গিরিরাজ, একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী বামা এই বনান্তে কি তোমার চোখে পড়েছে? খানিক কান খাড়া করিয়া রাজা বলিলেন, বাঃ, কী বল্‌ছে! চোখে পড়েছে। বেশ, তবে হয় তো আরো ভালো খবর শুনিতে পাইব। তবে বল তো ভাই, সে কোথায়? কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, সে কোথায়? ও সর্বনাশ! এ তো প্রতিধ্বনিমাত্র, গুহামুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে। রাজা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন;— বলিলেন, বড়ো ক্লান্ত হইয়াছি, এস ঝরনার ধারে বসে একটু তরঙ্গের বাতাস খাই।

এই নদীটি দেখিয়া আমার মন বড়ো প্রসন্ন হইতেছে। উর্বশীই বুঝি আমার অপরাধের কথা মনে করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িবার জন্য নদী হইয়া গিয়াছে, তাঁহার ভ্রূভঙ্গই নদীর তরঙ্গ হইয়াছে। হাঁসগুলা পার হইতে যাইতেছে, আর নদীর টানে তাহাদের সারিগুলি বাঁকিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝুলিতেছে, পাখিগুলা ভয় পাইয়া শব্দ করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝন্‌ঝন্ করিতেছে। ফেনা হইয়াছে আর নদীর বেগে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন শাদাকাপড় রাগের চোটে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পাথরের উপর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাগে চলিয়া যাইতে যাইতে উছট খাইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আমি উহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাই। দেখ, আমি তোমার একান্ত অনুরক্ত। কখনো মিষ্ট ছাড়া কড়া কথা কই না। তুমি যা চাও, কখনো না বলি না, না বলিতে চাইও না; আমার কী অপরাধ দেখিলে যে, আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ? আমি তো তোমার দাস।

হায় হায়! এটা দেখিতেছি সত্য সত্য নদী, নহিলে আমায় ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্রের দিকে যাইবে কেন? সমুদ্রের নিকট অভিসার করিবে কেন? যাই হউক, কষ্ট না করিলে মঙ্গললাভ হয় না। যাই, সেইখানেই যাই— যেখানে উর্বশী অদৃশ্য হইয়াছিলেন। যাইতে যাইতে রাজা বলিলেন, ভালোই হইয়াছে, তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই সেই লাল কদম-ফুলের গাছ, গ্রীষ্মের শেষে যাহার একটি ফুল তিনি আপনার মস্তকের ভূষণ করিয়াছিলেন, তখনো সব কেশর ফুটে নাই, উচু-নিচু হইয়াছিল। বাঃ! এই যে একটা হরিণ বসিয়া আছে, উহাকে একবার খবরের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—

উহার রঙ গাঢ় কালো বনশোভা দেখিবার জন্য কাননশ্রী যেন আপনার কটাক্ষ ফেলিয়া রাখিয়াছেন। (কবিরা কটাক্ষকে কালো বলিয়া বর্ণনা করেন। মৃগের রঙ কালো, যেন কাননশ্রীর কটাক্ষ।)

কী, আমায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল! না না, মৃগী উহার নিকটে আসিতেছিল, মৃগশিশু স্তনপানের ইচ্ছায় উহাকে আসিতে দিতেছে না। তাই একদৃষ্টে গলা বাঁকাইয়া সেই দিকেই চাহিয়া আছে। অহে যূথপতি, আমার তাঁহাকে কি বনে দেখিয়াছ? তাঁহার লক্ষণ বলিয়া দিই, শোন। তোমার প্রিয়ার যেমন বড়ো বড়ো চোখ, তাঁহারো তেমনি। ইহাকেও দেখিতে যেমন সুন্দর, তিনিও তেমনি সুন্দর।

এ কী, আমার কথা শুনিল না, স্ত্রীর দিকেই চাহিয়া রহিল। হবেই তো— অবস্থা খারাপ হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে। আমি এখান থেকে— আগ্রহ সহকারে দেখিয়া— পাথরের ফাটালের মধ্যে এ কী দেখা যাইতেছে? প্রভায় চারিদিক্ লেপিয়া ফেলিয়াছে। অথচ সিংহের মারা হরিণের মাংস তো নয়। আগুনের ফুল্কি হইবে কি? তাহাও তো হইতে পারে না। কারণ, আকাশ হইতে এইমাত্র বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। (ভালো করিয়া দেখিয়া) লাল অশোক-থোলোর মতো একটি মণি। সূর্য যেন ইহাকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছেন।

মণি আমার মন হরণ করিতেছে। তুলিয়া লই। অথবা তুলিয়া লইয়াই বা

কী করিব? কাহার মাথায় এ মণি দিব? মন্দারফুলে সুগন্ধি যাহার মাথায় এই মণি দিব, তাহাকেই পাইতেছি না। কেন শুধু চোখের জলে এই এমন মণিটি মলিন করিব?

রাজা এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় কে নেপথ্য হইতে বলিয়া দিল,— "বৎস, এই মণি তোমাদের মিলন করাইয়া দিবে। পার্বতীর পায়ের আল্‌তায় এই মণির উদ্ভব। কাছে রাখিলে শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছিতকে পাইবে।"

রাজা কান খাড়া করিয়া এই-সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন, "আমায় এ উপদেশ কে দিতেছেন, বোধ হয়, কোনো মুনি এ কথা বলিলেন। ভগবান্, আপনি উপদেশ দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন।" মণিটি তুলিয়া লইয়া রাজা বলিলেন,— "হে মণি, তোমার কল্যাণে যদি আমি তাহাকে পাই, তাহা হইলে, শিব যেমন চন্দ্র-কলাকে আপনার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও তেমনই তোমাকে আমার শিরোভূষণ করিব।"

কিছু দূর গিয়া রাজা একটি লতা দেখিলেন, তাহাতে একটিও ফুল নাই, তথাপি দেখিয়াই তাহার প্রতি তাঁহার বড়োই ভালোবাসা হইল। বলিলেন, "লতাটি যেন উর্বশী। মধুকরের শব্দ নাই, লতাটি নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। আমি পায়ে ধরিলেও আমায় ত্যাগ করিয়া গেছেন বলিয়া যেন উর্বশী পস্তাইতেছেন ও চিন্তায় চুপ করিয়া আছেন। ফুলের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার একটিও ফুল নাই। মানিনী উর্বশী যেন সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া শূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। মেঘের জলে লতার সব কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে। চোখের জলে প্রিয়ার যেন ঠোঁট দুটির লাল রঙ ধুইয়া গিয়াছে। এটি তো ঠিক আমার প্রিয়ারই মতো, আমি উহাকে আলিঙ্গন করিব।" বলিয়া লতাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই লতাটি উর্বশী হইয়া গেল। রাজা তাঁহার স্পর্শসুখ লাভ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বলিলেন, "এ ঠিক যেন উর্বশীরই স্পর্শ। আমার শরীর জুড়াইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বাস নাই। কতবার 'এই উর্বশী' 'এই উর্বশী' বলিয়া মনে করিয়াছি, আবার তখনই তাহা অসম্ভব হইয়া গিয়াছে; অতএব সহসা চক্ষু খুলিব না।" অনেকক্ষণ থাকিয়া চক্ষু খুলিলেন; দেখিলেন, তাঁহার আলিঙ্গনে উর্বশী।

উর্বশী রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "এটি কার্তিকের বাগান। তিনি চিরকুমার। সুতরাং স্ত্রীলোকের এ বাগানে প্রবেশ নিষেধ। যে প্রবেশ করিবে, তখনই সে বেড়ার লতা হইয়া যাইবে। আমি রাগে এসব কথা ভুলিয়া বাগানে ঢুকিতে গিয়া লতা হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ই ঠিক ছিল; আপনি যাহা যাহা

করিয়াছিলেন, সবই দেখিয়াছি। গৌরীর আল্তায় যে মণি হইয়াছে, সেই মণি আপনার সঙ্গে ছিল, তাহারই স্পর্শে আমি আবার যা ছিলাম, তাই হইয়াছি। নিয়ম এই যে, ঐ মণিই লতাকে ফের মানুষ করিতে পারে।" রাজা এই-সকল কথা শুনিয়া মণির যথেষ্ট আদর করিলেন। উর্বশী মণিটি লইয়া মাথায় রাখিলেন। উর্বশীর মুখখানি প্রভাত-সূর্যের আলোয় নূতন ফোটা পদ্মের মতো শোভা পাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও উর্বশী মেঘে চড়িয়া রাজধানী প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কটা বোধ হয় মেঘদূতের উপর টেক্কা। কালিদাস আপনারই উপর আপনি টেক্কা দিয়াছেন। যক্ষদের প্রণয়ই প্রাণ। যক্ষদের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন :— তাহাদের বয়স যৌবনেই শেষ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রৌঢ়-বৃদ্ধাবস্থা নাই; কুসুমায়ুধ ছাড়া তাহাদের অন্তক নাই অর্থাৎ তাহারা যে জীবনে কষ্টটুকু পায়, সেটুকু বিরহেরই কষ্ট; তাহাদের চেতনা যায় কখন— যখন তাহারা স্ত্রীসম্ভোগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মেঘদূতেও কালিদাস বলিয়াছেন :— আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনোও কারণে তাহাদের চক্ষে জল পড়ে না; কুসুমশরের তাপ ভিন্ন তাহাদের আর তাপ নাই— সে তাপও ভালোবাসার জিনিস পেলেই মিটিয়া যায়; তাহাদের বিচ্ছেদও প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোনো কারণেই জন্মায় না; যৌবন ভিন্ন তাহাদের অন্য বয়সও নাই। কালিদাসের মেঘদূতের এই কবিতাটি কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন বলিয়াই কুমারসম্ভবের শ্লোকটিও উদ্ধার করিতে হইল। যক্ষ অপরাধ করিয়াছিল, রাজকাজে অবহেলা করিয়াছিল, তাই রাজা তাহাকে বিরহ-সাজা দিয়াছিলেন। যেহেতু, বিরহ ভিন্ন তাহাদের অন্য সাজাই নাই। বিরহের মেয়াদ এক বৎসর। সেই মেয়াদের মধ্যে মেঘ দেখিয়া যক্ষ পাগলপারা হইয়া যায়; মেঘকে মানুষ বলিয়া মনে করে ও তাহাকে দিয়া আপনার স্ত্রীর কাছে "আমি বাঁচিয়া আছি" এই খবর দিবার চেষ্টা করে। মেঘদূতে এই পর্যন্ত।

বিক্রমোর্বশীতে কালিদাস অতি প্রাচীনকালে গিয়াছেন, সৃষ্টির এক রকম গোড়ায়। ব্রহ্মা প্রথম মন হইতেই সৃষ্টি করিতেন। প্রজাপতিরা তাঁহার মনের সৃষ্টি। দুই-তিন পুরুষ এইরূপ গেলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুরূরবা সেই সময়ের লোক, তাঁহার পিতামহ চন্দ্র ও মাতামহ সূর্য। বলিতে গেলে সৃষ্টির প্রথম মানুষই তিনি। কারণ, তাঁহার পিতা বুধ দেবতা। কালিদাসের বড়ো বুকের পাটা, তাই তিনি প্রথম মানুষের প্রণয় ও বিরহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য কবি হইলে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এ প্রণয়ের পাত্র পৃথিবীতে মিলিল না।

স্বর্গ হইতে অপ্সরা ধরিয়া আনিতে হইল। সেও বোধ হয়, প্রথম অপ্সরা-সৃষ্টির প্রধান অপ্সরা। এই দুই-জনের প্রণয় ও বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস অদ্ভুত গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রণয়ের কথা এবার বলিব না; বিরহের কথাই বলিব। অদ্ভুত উপায়ে বিচ্ছেদ। এই দুটিতে এক হইয়া আছে— হঠাৎ একজন অদৃশ্য হইয়া গেল। যে রহিল, সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। স্বভাবের অনুপম শোভার মধ্যে সে তাহার ভালোবাসার সামগ্রী খুঁজিতে লাগিল। প্রথম মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়া মনে করিল, এই উর্বশী, কাল প্রকাণ্ড রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। মেঘ পাহাড়ের ডগা ছাড়াইয়া উঠিল, সে মনে করিল, রাক্ষস পলাইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে ভাবিল, রাক্ষস শত শত বাণ বর্ষণ করিতেছে। ক্রমে মোহ ভাঙিয়া গেল, দেখিল, মেঘ, বিদ্যুৎ, পাহাড়, আর জলের ধারা।

তাহার পর একটি ভুইচাঁপা ফুল দেখিল। পাঁপড়িগুলি একটু লাল, উপর হইতে জল পড়িয়া ফুলটি ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন উর্বশীর চোখ, রাগে চোখের কোণ একটু লাল হইয়াছে, আর জলে চোখ ভরিয়া গিয়াছে। আবার একটা নদী দেখিল; মনে হইল, তাহার শরীর। ছোটো ছোটো তরঙ্গ উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাগে তাহার ভ্রূ ভাঙিয়া গিয়াছে। হাঁসগুলা সারি বাঁধিয়া নদী পার হইতেছে, নদীর তোড়ে সে সারি বাঁকিয়া যাইতেছে, আর হাঁসগুলা প্যাক্ প্যাক্ করিয়া শব্দ করিতেছে। বোধ হইল যে, তাহার চন্দ্রহার মাঝখানে বাঁকিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাতে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ফেনা উঠিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কাপড় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পাথরে পাথের জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, রাগে চলিতে চলিতে পদস্খলন হইতেছে। কিন্তু শেষ জানা গেল, সেটা স্ত্রী-লোক নহে— নদী।

আবার একটা লতার কাছে গেল। বৃষ্টির জলে তাহার সব কচি কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে; বোধ হইল যেন, ঠোঁটের উপর যে লাল রঙ করা ছিল, চোখের জলে তাহা ধুইয়া গিয়াছে। এ ফুল ফুটিবার সময় নহে, সুতরাং একটি ফুল নাই। রাজা মনে করিলেন, যেন রাগ করিয়া সে গহনা ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল নাই, ভোমরা আর শব্দ করে না; মনে হইল যেন, মানিনী মানভরে চুপ করিয়া আছে; যেন ভাবিতেছে, কেন মান করিলাম, এত সাধিল, কেন তারে ফেলিয়া আসিলাম?

এই তো এক রকম পাগলামি, আর-এক রকম পাগলামি যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করা— "ওগো, আমার তাকে তুমি দেখেছ কি?" একবার ময়ূরকে জিজ্ঞাসা

করিল;— কোনো জবাব নাই। একবার হাঁসকে জিজ্ঞাসা করিল;— জবাব নাই। একবার হাতিকে জিজ্ঞাসা করিল;— জবাব নাই। পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করিল;— জবাব নাই। জবাব না পাইলে রাগ হইতেছে, ক্ষোভ হইতেছে, আপনাকে ধিক্কার দিতেছে, অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছে। একবার কোকিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে মন দিয়া রাঙা রাঙা জাম চুষিয়া খাইতে লাগিল। এবার তাহার উপর রাগ নাই— "আহা, তোমার গলার স্বর আমার তাঁর মতো, তোমার উপর রাগ করিব না।" একবার চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল, সে "কঃ কঃ" করিয়া উঠিল। অমনি পাগল বলিল,— "কী, আমি কে, জানো না তাহা? 'তুমি কে, তুমি কে' জিজ্ঞাসা করিলে? আমার ঠাকুরদাদা চাঁদ, আর সূর্য আমার দাদামহাশয়।" এইরূপে কত জায়গায় কত রকম পাগলামি করিল। হাঁসকে বলিল, "তুমি চোর, তুমি তাহার ঠমক চুরি করিয়াছ। চোরাই মালের কোনো অংশ পাওয়া গেলে সবটাই চুরি করিয়াছ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তুমি আমার তাঁকে আনিয়া দাও।" আবার পাগ্‌লামি— বলিল, "আমি রাজা, আমার হুকুম, বর্ষাকালে তুমি আসিও না।" আবার কী মন গেল, বলিল, "আহা, তুমি এস, এস, আমি রাজা, আমি এই বনে একা, তোমা হ'তে আমার রাজচিহ্ন সব পাওয়া যাইবে— চাঁদোয়া, ছাতা, চামর তুমিই দিতেছ।"

এই সমস্ত পাগ্‌লামিটি— এটা একটা সৌন্দর্যের খনি। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে যে সুন্দর জায়গা, কালিদাস রাজাকে আর উর্বশীকে সেইখানে লইয়া গিয়াছেন। দুটিতে এক হইয়া থাকিলে তো পরস্পরের সৌন্দর্যে দুজনেই ডুবিয়া থাকে, তাই কিছুকালের জন্য একটিকে সরাইয়া আর-একটিকে দিয়া সেই সৌন্দর্যটুকু প্রকাশ করিয়া দিলেন। সমস্ত সৌন্দর্যের পিছনে একটা উৎকট দুঃখের ছায়া।

যক্ষ বিরহে পড়িয়া মেঘকে দূত করিয়াছিল। রাজা বিরহে পড়িয়া মেঘকে রাক্ষস করিলেন। আবার যখন মিলন হইল, তখন দুজনে সেই মেঘে চড়িয়া প্রয়াগে গঙ্গাযুমানা-সঙ্গমে আপনাদের রাজধানীতে গেলেন। কালিদাসের হাতে মেঘবেচারার নানা অবস্থা হইল।

নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

কোমলে কঠোর

কালিদাসের নাটকগুলি সবই খুব চক্‌চকে। খুব উজ্জ্বল। আপাতত দেখিতে গেলে যেন আদিরসেরই বই। নায়ক-নায়িকা তো প্রেমে একেবারে ডগমগ। পাঠক-পাঠিকা, প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকাও প্রায় তাই হইয়াই উঠেন। মালাবিকার প্রতি রাজার টান, মালবিকারও সে টানের "প্রতিটান", উর্বশীর প্রতি পুরূরবার অনুরাগ, উর্বশীরও রাজার প্রতি পুরা অনুরাগ; রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলায় তন্ময় হওয়া, আবার শকুন্তলারও দুষ্যন্তে তন্ময় হওয়া, প্রেম নয় তো কী? এত প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? মালবিকাগ্নিমিত্রে যৌবনের চঞ্চলতা; বিক্রমোর্বশী-তে বীরের গভীরতা; শকুন্তলা-য় একেবারে তন্ময়তা। এক হাতে তিন রকমের প্রেম তিন ধারায় বাহির হইয়াছে। সকল ধারায়ই অমৃত বহিয়া গিয়াছে। সুতরাং কালিদাসকে লোকে আদি-রসের কবি বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য কী? কালিদাসেরও হাত বেশ পাকা, তিনি প্রণয়কেই আগাইয়া দেন। বইখানির যেখানটা খোলো, কেবল প্রেম। নায়ক-নায়িকা কখনো প্রেমের সুখে মগ্ন, কখনো "পাইতেছি না," বলিয়া উৎকণ্ঠায় কাতর, কখনো "পাইবার নহে" বলিয়া হতাশায় ম্রিয়মাণ, কখনো পাইবার আশায় অত্যন্ত চঞ্চল। কখনো বিরহে মৃতপ্রায়। বিরহ আবার কখনো আপনার দোষে, কখনো দৈবের দোষে। প্রেমে কখনো আছেন মান, কখনো আছেন কলহ, কখনো আছেন ভয়, কখনো আছেন চিন্তা; কত অনন্ত উপায়ে যে কালিদাস প্রেম-রস ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অল্পে বলিয়া উঠা ভার।

কিন্তু এই প্রেম-তরঙ্গের ভিতরে একটা উপদেশ, একটা সমাজের শিক্ষা, একটা সাধু উদ্দেশ্য, দেখা যায় না, অথচ বহিতেছে। সেইটিই আসল কথা, প্রেমটা বাহিরের চাক্‌চিক্য-মাত্র। প্রেমে মনকে নরম করে, জমি তৈয়ার করে, কালিদাস সেই জমিতে

উপদেশের বীজ ছড়াইয়া দেন। একজন কবি বলিয়াছেন, আমি অনেক দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আপামর সাধারণের মন আকর্ষণ করিতে পারি নাই, তাই কাব্যচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিলাম। লোকে তো তিক্ত ঔষধ খাইতে চায় না, তাই তাহাতে মধু মিশাইয়া দিলাম।[১] কালিদাসও প্রেমের মধুতে ডুবাইয়া কঠিন উপদেশ লোকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তবে কালিদাস ও অশ্বঘোষে তফাত এই যে, অশ্বঘোষ যে উপদেশ দিয়াছেন, সেটি ও তাঁর মধুটুকু দুই-ই দেখা যাইতেছে। কিন্তু কালিদাস যে উপদেশ দিতেছেন, এটা বিশেষ করিয়া তলাইয়া না দেখিলে, তারাইয়া না পড়িলে কিছুতেই বুঝা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য যেন শুদ্ধ মধু, কেবল প্রেম, কেবল আমোদ, কেবল "রথ-দেখা"। তিনি যে উহার মধ্যে একটু "কলা-বেচা" রাখিয়াছেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। যায় না বলিয়াই কালিদাসের এত আদর। লোকে বলে, "যাই, কালিদাসের শরণ লই। দু-ঘন্টা বিশুদ্ধ আমোদে কাটিবে, এ আমোদে 'বুড়ুটেগিরি' একেবারে নাই, 'কট্‌কটে' কথার ভাঁজ নাই, জ্যাঠামির 'জ্যা'টি পর্যন্ত নাই অর্থাৎ উপদেশ দিবার ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, প্রয়াস নাই। অসুন্দর কিছুই নাই। সবই সুন্দর, সবই মধুর, সবই আশ্চর্য।" কিন্তু তলায় তলায় মন বদলাইয়া যায়, এমন-কী, সমস্ত মানুষটা আর-এক রকম হইয়া যায়। যা ছিল, তা হ'তে অনেক ভালো হইয়া যায়।

দেখ, মালবিকাগ্নিমিত্রে কী হইল। পাটরানী ধারিণী বড়ো বেশ লোক। রাজার মেয়ে। সহবৎ ভালো। সমস্ত ভদ্রয়ানা; অভদ্রতার লেশও নাই। কাহাকেও মন্দ কথা বলিতে জানেন না, সবার উপরই তাঁহার সমান দয়া— সমান অনুগ্রহ। ইরাবতীর যখন সব গিয়াছে, তখন ধারিণীই তাহার ভরসা। কিন্তু ধারিণীর অদৃষ্টদোষে স্বামীটি একটু রূপ-পাগ্‌লা। রূপ দেখিলে আর রক্ষা নাই। ধরিণীর এক চাকরানী ছিল— ছোটোলোকের মেয়ে। নাম ইরাবতী। সুন্দরী বটে। তার উপর নাচতে জানে ভালো, গাইতে জানে ভালো। তাহার উপর আবার একটু একটু নেশাও করে। রাজার ঝোঁক পড়িল তাহার উপর। সে প্রথম রাজার প্রণয়পাত্রী, পরে রানীও হইল। ধারিণীর সহিল না। তিনি গোপনে গোপনে তাহার সর্বনাশের চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর-একটি চাকরানী পাইলেন, সেটি দেখতে আরো ভালো। ধারিণী ভাবিলেন, বেশ হইল— "কন্টকেনৈব কন্টকম্"। [কাঁটার দ্বারাই কাঁটা তুলতে হয়] নূতন দাসীকে ভালো করিয়া নাচগান শিখাইতে

লাগিলেন। মনে করিলেন, এক দিন মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাকে রাজার কাছে পঁহুছিয়া দিয়া ইরাবতীকে রাজার মন থেকে তফাত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসিল না। তাহার উদ্যোগ-পর্ব শেষ হইবার পূর্বেই মালবিকার কথা রাজার কানে উঠিল। আর পায় কে? পাগল খেপিল; মালবিকার সঙ্গে রাজার মিলন হইল। ইরাবতী তফাত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে ধারিণী রানীর কী হইল? তাঁহার যে দেবী শব্দটি ছিল, তাহাও গেল। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। রানী ধারিণীর তাহাই হইল। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহের পর ইরাবতীর দূতী আসিয়া যখন রাজার নিকট ইরাবতীর হইয়া মাপ চাহিল, রাজা কিছু বলিলেন না। যেন সেকথা তাঁহার কানেই গেল না। ধারিণী গিন্নিপনা করিয়া রাজার হইয়া সে মাপ চাওয়ার জবাব দিলেন। তখনো জ্ঞান— তিনি যা ছিলেন, অন্ততঃ তা-ই থাকিবেন। শেষ যখন মালবিকাকে দেবী করার কথা হইল, তখনো রানী গিন্নিপনা করিতেছেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, সব লোক "দেবী দেবী" বলিয়া নূতন রানীকে খুশি করিতেছেন, তখন ধারিণীর দশাটা কী হইল? তিনি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কালিদাস "দেবীপরিজনমবেক্ষতে" [মহিষী পরিজনকে দেখলেন] এই কয়টি কথায় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একখান বই লিখিয়াও শেষ করা যায় না। এ সমস্তের মধ্যে সার কথা— "পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়।"

বিক্রমোর্বশী-তেও এই কথা—রাজা প্রকাণ্ড দুর্দান্ত অসুরের হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করিয়াছেন। তুমি উর্বশী তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইতে পারো। তিনি বীর, রমণী-রত্ন বীরেরই ভোগ্য। সে তো বেশ কথা। তুমি রাজাকে ভালোবাস। কিন্তু তুমি অপ্সরা, স্বর্গের বেশ্যা; নৃত্য করা, নাটক অভিনয় করাই তোমার কাজ। তুমি আপন কাজে অমনোযোগ করিবে, যে তোমার মনিব, সে তাহা সহিবে কেন? লক্ষ্মী স্বয়ংবর নাটকে তুমি লক্ষ্মী সাজিবে, স্বয়ং ভরতমুনি স্টেজ-ম্যানেজার। তোমায় লক্ষ্মীর পার্ট দিয়াছেন আর তুমি কিনা রাজায় তন্ময় হইয়া, পুরুষোত্তম বলিতে পুরূরবা বলিয়া বসিলে। ইহার শাস্তি তো তোমায় পাইতেই হইবে। শাস্তি হইল— মনুষ্যলোকে তোমার বাস। তুমি তো ভাবিলে, আমার শাপে বর হইল; কিন্তু ভাব দেখি, চিরকাল যদি তোমায় মনুষ্যের মধ্যে বাস করিতে হইত, কত

কষ্ট হইত। পুরূরবা তো মানুষ— একদিন মরিবেই। তার পর তুমি তো অমর, এই পৃথিবীতে বসিয়া একেলা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। ভাগ্যে ইন্দ্র তোমার সহায় ছিলেন, তাই তোমার শাপের একটা অবসানের কথা বলিয়া দিলেন। রাজা পুত্রমুখ দেখিলেই তোমার আবার স্বর্গে আসা হইবে।

শকুন্তলায়-ও ঐ কথা। কিন্তু শকুন্তলা কালিদাসের বেশি বয়সের লেখা। ইহাতে সব কোমল। এত কোমলতা অন্য জায়গায় অল্পই দেখা যায়। রাজা কোমল, শকুন্তলা কোমল, দুটি সখী—অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা, কোমলতার প্রতিমূর্তি। বুড়ি গোতমীও কোমলতারাশি। আর কাশ্যপ শকুন্তলার পালক পিতা। আহা! তাঁহার কোমলতায় লোকের হৃদয় গলিয়া যায়। যে কেহ মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়াছে, সেই জানে, বহুকাল লালন-পালন করিয়া আপন মেয়েকে পরের হাতে দেওয়া কত কষ্ট। সুতরাং সে যদি কণ্ব মুনির ব্যাপার দেখে, কাঁদিয়া আকুল হয়। যে নাটকে কোমলতার এত ছড়াছড়ি, তাহার মধ্যে উপদেশ আছে, কঠোরতা আছে, কাহারো মনেই হয় না। পড়িবার সময় সে কঠোরতা একেবারেই দেখা যায় না। সব কোমলতায় ঢাকিয়া যায়। কিন্তু সে কঠোরতা বড়োই কঠোর: অত্যন্ত কঠোর। ভাসা ভাসা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আরো কঠোর। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া লইতে হয় বলিয়া আরো কঠোর।

এত কোমলতার মধ্যে কণ্ব মুনি যে শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারের ভার দিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, সে কথাটা কাহারো মনেই থাকে না; থাকিলেও রাজার প্রতি আতিথ্য দেখিয়াই শকুন্তলার কার্য যে খুব কোমল ও ভালো, এইরূপই মনে হয়। প্রিয়ংবদা রাজার সামনে শকুন্তলাকে বলিলেন, "আজি যদি ঋষি এখানে থাকিতেন?" শকুন্তলা বলিলেন, "তাহা হইলে কী হইত?" উত্তর হইল, আপনার জীবিতসর্বস্ব দিয়াও অতিথির সৎকার করিতেন। তবেই রাজার প্রতি শকুন্তলার যে টান, সেটার ভিতর আতিথ্যও একটু আছে। এমন সুন্দর আতিথ্য!! কিন্তু এক জায়গায় আতিথ্য করিয়া যখন শকুন্তলা আত্মচিন্তায়, অতিথি-চিন্তায়, প্রেম-চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় আর-এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আর কেহ নন, স্বয়ং দুর্বাসা; আর্যসমাজের, ভারত-সমাজের, হিন্দু-সমাজের কঠোরতার প্রতিমূর্তি। তাঁহার কাছে পান হইতে এতটুকু চুন খসিবার জো নাই। তাঁহার ভয়ে সকলেই কম্পবান্। যুধিষ্ঠির কম্পবান্, রাম কম্পবান্, ভারতসুদ্ধ কম্পবান্।

কালিদাস সেই কঠোর দুর্বাসাকে কোমলতাময়ী শকুন্তলার সম্মুখে অতিথি ভাবে উপস্থিত করিয়া দিলেন। তিনি আশ্রমদ্বারে আসিয়া বলিলেন, — "অয়মহং ভোঃ"— "এই আমি গো।" মনু বলেন, এই কয়টি কথা বলিয়া কেহ গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলেই গৃহস্থকে বুঝিতে হইবে, অতিথি আসিয়াছেন। অতিথি আর দুই বার বলিবে না; দুর্বাসা আর দ্বিতীয় বার "অয়মহং ভোঃ" বলিবেন না। একটু অপেক্ষা করিয়াই যখন দেখিলেন, শকুন্তলা কোনো উত্তর দিলেন না— অভ্যর্থনা করিলেন না, তখন একেবারেই কঠোর শাপ দিয়া বসিলেন, আর দাঁড়াইলেন না। কী ভয়ানক শাপ! "তুমি যাহার জন্য ভাবিতে বসিয়া আমার মতো অতিথিকেও দেখিতে পাইলে না, সে বুঝাইয়া মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা স্মরণ করিবে না।" শকুন্তলার সব প্রেম, সব আশা ফুরাইয়া গেল। এই তো গেল কাজে হেলা করার শাস্তি। শাস্তিটা বড়োই গুরুতর হইল। শকুন্তলা যে নিতান্ত বালিকা, সে যে অতিথি-সৎকারে নূতন ব্রতী, দুর্বাসা সেসব কথা মনেই আনিলেন না। তিনি অতিথিসৎকারের ব্যত্যয় দেখিলেন, অমনি শাপ দিলেন। প্রিয়ংবদা আসিয়া দুর্বাসাকে একটু নরম করিয়া, দুর্বাসার পায়ে ধরিয়া, একটা শাপের অবসান করিয়া লইলেন। কী, সে কথায় এখন আমাদের কাজ নাই।

আর কঠোর কণ্ব মুনি নিজে। তিনি আসিয়া যেমন শুনিলেন, শকুন্তলার সঙ্গে রাজার গান্ধর্ব-বিবাহ, অমনি শকুন্তলাকে আশ্রম হইতে তফাত করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় এই কথা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ভোর হইবার পূর্বেই তাঁহার শিষ্য বাহিরে আসিয়া বলিলেন,— "বেলা দেখিবার জন্য ভগবান্ কাশ্যপ আমায় আদেশ করিয়াছেন।" তাহাতে বোধ করিতে হইবে যে, যেন রাত্রে কণ্ব মুনির ঘুম হয় নাই। তিনি ভোর হইবার পূর্বে শিষ্যদিগকে উঠাইয়া দিয়াছেন। যদি বলো, কণ্ব যে এত কঠোর, তুমি জানিলে কিরূপে? তিনি তো নিজে কঠোরতার একটিও কথা বলেই নাই। যখন তিনি শকুন্তলার গান্ধর্ব-বিবাহের কথা শুনিলেন, তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেয়ে বিদায় করিবার সময় তাঁহার গলা ধরিয়া গেল, চক্ষু বাষ্পময় হইয়া উঠিল। তবুও তুমি তাঁহাকে কঠোর বলো কেন? বলি তাঁহার কাজ দেখিয়া। তিনি বিদায় দিবার পূর্বে শকুন্তলার সঙ্গে দেখাই করিলেন না। শুনিবামাত্র শিষ্যদিগকে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এ-সকল কি

বড়ো কোমলতার কথা? বলিবে— না, তা কেন? শকুন্তলা রাজার বিরহে কাতর, তাই শকুন্তলাকে রাজার কাছে যত শীঘ্র পাঠানো যায়, তাহারই চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কঠোরতা না হইয়া কোমলতাই প্রকাশ পায়। একথা সত্য বটে, তবে কিনা, সন্ধ্যায় শুনিলেন, আর সকালেই মেয়ে পাঠানো, একটু তাড়াতাড়ি হয় না? আর-এক কথা, তপোবন-বিরুদ্ধ কাজ করিলে, যে করে, তাহাকে ঋষিরা এক মুহূর্তও আশ্রমে রাখেন না। দেখ না, বিক্রমোর্বশী-তে আয়ু যখনই শকুনটা বাণ মারিয়া মারিয়া ফেলিল, তখনই চ্যবনঋষি বলিলেন, এ তপোবন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে, ইহাকে আর এখানে রাখা যায় না। তাই তৎক্ষণাৎ সত্যবতীর সঙ্গে দিয়া তাহাকে উর্বশীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এও তাই, শকুন্তলাকে পাঠাইতেই হইবে, আর রাখা যায় না। তবে কঠোর কাজ যদি কোমল কথায় করা যায়, দোষ কী? বরং তাহাতে গুণই আছে। কাজটা কঠোর, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই।

শকুন্তলা দুর্বাসার কাছে অপরাধী, তাই তাহার শাপ। তিনি কণ্বের কাছে অপরাধী, তাই আশ্রম হইতে তাঁহার বিতাড়ন। দুটাই বড়ো কঠোর।

কণ্বের এই কঠোরতার আর-এক প্রমাণ এই যে, শকুন্তলার যাওয়ার পর কণ্ব আর তাঁহার কোনোই খোঁজ রাখেন নাই। মারীচের আশ্রমে যখন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন হইয়া গেল, তখন দেখা গেল, কোমলহৃদয়া মাতা মেনকা সেইখানেই উপস্থিত আছেন। কিন্তু কণ্ব! অদিতি বলিলেন, কণ্বকে খবর দেওয়া যাউক। তাহাতে মারীচ বলিলেন, তাঁহাকে আর খবর দিবার দরকার কী? তিনি তপঃপ্রভাবেই সব জানেন। রাজার ভয় ছিল— শকুন্তলাকে ত্যাগ করায় কণ্বমুনি তাঁহার উপর চটিয়া আছেন। তাই তিনি বলিলেন, "তবে বোধ হয়, তিনি আমার উপর বেশি রাগ করেন নাই।" তখন মারীচ বলিলেন, "তথাপি আমাদের তাঁহাকে প্রিয়-সম্ভাষণ করা চাই।" এই বলিয়া তিনি একজন শিষ্যকে ডাকিয়া কণ্বের নিকট খবর পাঠাইলেন।

ঐ যে একটি "তথাপি" শব্দ আছে, উহাতে বেশ জানা যায় যে, কণ্ব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আশ্রম হইতে যাওয়ার পর শকুন্তলার কী হইল, তিনি তাহার কোনোই খোঁজ লয়েন নাই; তাহা লইবার বড়ো ইচ্ছাও নাই; তবে তিনি শকুন্তলাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শকুন্তলার মঙ্গলকালে খবর দেওয়া মারীচের উচিত, তাই মারীচ তাঁহাকে খবর পাঠাইলেন।

কালিদাস এই কঠোরতা কেমন লুকাইয়া রাখিয়াছেন। একেবারেই একটিও কঠোর শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং কঠোরকে কেমন কোমল করিয়াছেন। কাজে কঠোর, কিন্তু মুখে কোমল হইলে সংসারে তাহাকে ভণ্ড বলে— পছন্দ করে না। কিন্তু নাটকে সেটি কেমন সুন্দর হইয়াছে। আর সেইটিকে সাজাইতে কালিদাস কত গুণপনা দেখাইয়াছেন। লোকে এরূপ লোককে ভণ্ড বলে বলুক; কিন্তু যে কাজে ঠিক থাকে, কথায় কাহারো মনে ব্যথা দেয় না, তাহাকেই আমরা প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া মনে করি। কালিদাস প্রকৃত মানুষ কাহাকে বলে জানিতেন এবং তাই হইবার জন্য আমাদের উপদেশ দিয়াছেন।

নারায়ণ
আষাঢ়, ১৩২৪

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. উক্তিটি কবি অশ্বঘোষের। তাঁর 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের উপসংহারে এই কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক তারনাথ বলেন, অশ্বঘোষ সাকেত (অযোধ্যা) নিবাসী সংঘ্যগুহ্য নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের ছেলে, মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী। স্থবির পার্শ্ব মতান্তরে পুণ্যযশা তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কুষাণ রাজা কনিষ্কের (দ্বিতীয় শতাব্দী) সভাকবি অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'বজ্রসূচী', 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র', 'মহাযান-ভূমিগুহাবাচামূলা-সূত্র' প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা মনে করা হয়। এসব "তিক্ত ঔষধ" তুল্য শাস্ত্রগ্রন্থ লেখার পরে তিনি আঠারো সর্গে সম্পূর্ণ 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য লিখে থাকবেন। কবিত্বের উৎকর্ষে তাঁর 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত।

'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের শেষ শ্লোকের আগের শ্লোকে আছে "পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং.....", মধু মিশিয়ে তেতো ওষুধ দেওয়ার মতো।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য *হ-র-সং* তৃতীয় খণ্ডে "বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?" প্রবন্ধের ১৯সংখ্যক প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্র.।

কণ্বের কোমল মূর্তি

কণ্বমুনি কশ্যপের বংশ। তিনি ঋষি, তপস্বী, সংযমী, অতি কঠোর। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ চির-ব্রহ্মচারী। তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশই করেন নাই। ব্রহ্মচর্যই তাঁহার একমাত্র আশ্রম। তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দেন, নিজে ব্রত, উপবাস, হোম, যজ্ঞ করেন, আর বনে বাস করেন। শকুন্তলাকে তিনি কুড়াইয়া পান, তাঁহার দয়া হয়। তিনি তাহাকে পালন করেন। ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার খুব স্নেহ হয়, খুব মায়া হয়। কঠোর মুনির মন একটু গলে। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তাঁহার কঠোরতা ও সংযমের প্রতিমূর্তি, আর অনসূয়া, গোতমী ও প্রিয়ংবদা তাঁহার স্নেহের মায়ার প্রতিমূর্তি।

শকুন্তলা-নাটকে কালিদাস এই পাঁচটি পাত্রের দ্বারাই কণ্বমুনিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের স্বভাব-চরিত্র একটু ভালো করিয়া বুঝা চাই। মহাভারতে-এ পাঁচটির একটিও নাই। একা শকুন্তলা— কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিতা শিক্ষিতা শকুন্তলা একাই সব করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে গান্ধর্ববিবাহেও শকুন্তলা একা। রাজসভায় বারো বছরের ছেলে লইয়াও শকুন্তলা একা। পদ্মপুরাণে আশ্রমে শকুন্তলার একটি সখী ছিল, কিন্তু পদ্মপুরাণ আগে কি কালিদাস আগে, সেকথা লইয়া এখনকার পুরাণকারদের মতামত আছে। সে কচ্‌কচি আমাদের এখানে দরকার নাই।

মহাভারতে একা শকুন্তলা যাহা করিয়াছেন, কালিদাস তাহারই জন্য এই পাঁচটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শকুন্তলার লালন-পালনে শকুন্তলার ভালো-মন্দ করায় এই পাঁচটিই কণ্বের সহায়। তিনি যেন একাই পাঁচ হইয়া তাঁহার জীবিত-সর্বস্ব শকুন্তলার অদৃষ্ট-বিধাতা হইয়াছেন। সুতরাং এই পাঁচটিরই পরিচয় আবশ্যক এবং

শকুন্তলার জন্য কে কী করিল, তাহাও জানা আবশ্যক। কূটস্থ ব্রহ্ম যেমন দূরে থাকিয়া কূটে—পর্বতশিখরে— থাকিয়া জগতের কার্যকলাপ দেখেন, কণ্বমুনিও দূরে থাকিয়া শকুন্তলার ভাগ্যচক্র চালন করেন। তাঁহাকে কালিদাস উপস্থিত করেন না। কেবল একবার উপস্থিত করিয়াছিলেন— সে কেবল করুণার মূর্তি, স্নেহের মূর্তি, পিতার মূর্তি। তিনি অতি কঠিন সময়ে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং একটি বিষম সমস্যা পূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমস্যাটিও বড়োই বিষম। অন্য সময়ে তাঁহার মূর্তিগুলিই কাজ করিয়াছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা সর্বদাই শকুন্তলার সঙ্গে থাকে। একজন কেবল শকুন্তলাকেই লইয়া থাকেন; আর-একজন শকুন্তলার হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। একজন শকুন্তলার জন্য ভাবেন; আর-একজন শকুন্তলার জন্য কাজ করেন। একজন সব্‌জেক্‌টিব সখী; আর-একজন অব্‌জেক্‌টিব সখী। একজন তাঁহার পরিচর্যা করেন; আর-একজন তাঁহার জন্য ওকালতি করেন। একজন ধীর, আর-একজন খরতর। একজন কেবল শকুন্তলাকেই দেখেন; আর-একজন চারিদিক দেখেন কেবল শকুন্তলার ভালোর জন্য। কিন্তু দু-জনেরই স্নেহ সমান, মায়া সমান এবং শকুন্তলার প্রতি সমান টান। কালিদাস সেইজন্য অনেক জায়গায় দু-জনকে দিয়া একই কথা বলাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন, শকুন্তলার উপর সমান টান তো আছেই, তাহার উপর দুই-জনে দুই উপায়ে শকুন্তলার মঙ্গল চিন্তা করেন। এখন দেখা যাক্, দু-জনে কী কী উপায়ে শকুন্তলার হিত করিলেন। প্রথম অনসূয়া। শকুন্তলার এতটুকু কষ্টও তিনি সহিতে পারেন না। শকুন্তলা যে ফুলগাছে জল দেন, অনসূয়ার তাহাতে কষ্ট। বলিলেন, "তোমার চেয়েও গাছগুলিকে কণ্বমুনি অধিক ভালোবাসেন বোধ হয়; নহিলে তুমি নবমালিকাফুলের মতো নরম, তোমায় কেন গাছে জল দিতে বলিবেন?" শকুন্তলাও ঠিক জানেন যে, অনসূয়া তাঁহার অধিক টান টানেন, তাই যখন বাকল পরিয়া তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, তিনি প্রিয়ংবদার কাছে না গিয়া অনসূয়াকে বলিলেন, "বাকল বড়ো আঁট হইয়াছে, তুমি একটু লোল করিয়া দেও।" শকুন্তলা যখন বনজ্যোৎস্না নামে নবমালিকাগাছটিকে জল না দিয়াই সরিয়া যাইতেছেন, তখন অনসূয়াই তাঁহাকে মনে করিয়া দিলেন; কারণ, তিনি জানেন, বনজ্যোৎস্না শকুন্তলার বড়ো আদরের জিনিস। তিনি চালাক নন, রঙ্গরস তাঁহার বড়ো একটা পছন্দ নয়। তাই যখন প্রিয়ংবদা রঙ্গ করিয়া বলিল, "অনসূয়া, জানিস, বনজ্যোৎস্নাকে শকুন্তলা এত ভালোবাসে কেন?" সে সরলা উত্তর করিল, "আমি বলিতে পারি না।" রাজা তাহাদের সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া যখন জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তপস্বিকন্যাদের উপর কে অত্যাচার করিতেছে?" তখন অনসূয়া আসিয়া বলিলেন, "না না, কেহ কিছু করে নাই, কেবল একটি ভোমরা আমাদের সখীকে বড়ো ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।" তার পর রাজা যখন শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গো, তোমাদের তপস্যার কোনো বিঘ্ন হইতেছে না তো?" আর শকুন্তলা ভয়ে সম্ভ্রমে জড়সড় হইয়া পড়িলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তখন অনসূয়াই বলিল, "যখন এমন অতিথি পাইয়াছি, তখন আর কি আমাদের তপস্যার বিঘ্ন হইতে পারে?" শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার, তাই তাঁকে বলিলেন, "যাও শকুন্তলা, অর্ঘ্যের জন্য কুঁড়েতে গিয়া জল আনো, এই জলেই উঁহার পা ধোয়া হইবে।" তিনিই শকুন্তলাকে মনে করাইয়া দিলেন, অতিথির সৎকারই আমাদের কাজ; বলিলেন, "এস আমরা বসি।" রাজার পরিচয় অনসূয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা যখন "হত ইতি গজ" করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, তখন তিনিই বলিলেন, "তপস্বীরা আজ কৃতার্থ হইলেন।" রাজা যখন শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিই সরলভাবে সে পরিচয় দিয়া দিলেন। শেষ কথাগুলা একটু সরমের কথা, তাই তাঁহার একটু বাধ-বাধ করিতেছিল। রাজা যখন বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না, ইহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, আমিই বুঝিয়া লইয়াছি, ইনি অপ্সরার মেয়ে।" তখন হাঁপ ছাড়িয়া অনসূয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়ে লইয়া মুনি কী করিবেন?" তখন কিন্তু অনসূয়া তাহার জবাব দিলেন না। কারণ, এখানে একটু ওকালতির দরকার, সেটা তার অভ্যাস নাই। তাই প্রিয়ংবদা তাহার জবাব দিল। শকুন্তলা যখন প্রিয়ংবদার জবাব শুনিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন, তখন আবার অনসূয়ার দরকার হইল। তিনি বলিলেন, "এমন অতিথি পাইয়াছ, ইঁহার সৎকার না করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিয়া যাওয়া উচিত নহে।" হাতির কথা উঠিলে রাজা যখন উঠিয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন, তখন অনসূয়াই বলিলেন, "আরণ্য হাতির ব্যাপারে আমরাও ভয়ে আকুল হইয়াছি। অনুমতি করেন তো আমরাও ঘরে যাই।"

শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে সখীরা পদ্মের পাতা দিয়া উঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং দু-জনে উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, পদ্মপত্রের বাতাস তোমার ভালো লাগিতেছে তো?" আর শকুন্তলা জবাবে বলিলেন, "তোমরা কি আমায় বাতাস করিতেছ?" তখন দু-জনেই বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু কেন শকুন্তলার এত অসুখ হইল, সেকথা জিজ্ঞাসার ভার অনসূয়াই লইলেন।

সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, ভালোবাসার সুখদুঃখ তো আমরা জানি না; কিন্তু বইয়ে যেমন পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি কাহাকেও ভালোবাসিয়া বড়ো কষ্ট পাইতেছ, তা ভাই, আমাদের কাছে খুলে বলো। কারণ জানিতে না পারিলে কেমন করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিব?" শকুন্তলা যখন সব খুলিয়া বলিলেন, তখন অনসূয়াই বলিলেন, "অতিশীঘ্র এবং অতি গোপনে এখন রাজার সহিত মিলনের উপায় কী?" উপায় করার, ওকালতির ভার অনসূয়ার নহে। কিন্তু যে উপায়টি স্থির হইল, অনসূয়া বলিলেন, সেটি বেশ হইয়াছে। কিন্তু তবুও শকুন্তলার মত না লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। যখন রাজার ও শকুন্তলার মনের ভাব এক, এ কথাটা ঠিক বুঝা গেল, তখন অনসূয়াই রাজাকে প্রথম "বয়স্য" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং শকুন্তলা যে পাথরখানিতে বসিয়াছিলেন, তাহারই একপাশে বসিতে বলিলেন। আবার রাজা যখন বলিলেন, "আমার মনের ভাব অন্যরূপ, এ কথাটা আপনারা একেবারেই মনে করিবেন না"; তখন অনসূয়াই বলিলেন, "বয়স্য", আপনাদের তো অনেক পরিবার আছে। তবে আমাদের যাহাতে সখীর জন্য এর পর দুঃখ করিতে না হয়, তাহা করিবেন।" এই কথাটি বলিয়া তিনি রাজাকে বলাইয়া লইলেন যে, "শকুন্তলাই তাঁহার পাটরানী হইবেন।"

রাজা যেদিন ঋষিদের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ি যাইবেন, সেদিন অনসূয়া ভারি চিন্তিত— সবই তো হল ভালো; শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহ তো হল। বরও ভালো হল। কিন্তু যদি দেশে গিয়া আর পাঁচরানীর পাল্লায় পড়িয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান? তাহাতে প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ওরকম চেহারায় এতটা ভুল সম্ভব হবে না। তবে কর্তা বাড়ি আসিয়া কী বলেন, সেইটাই ভয়।" তাহা শুনিয়া অনসূয়া বলিলেন, "সে ভয় বড়ো নাই। তিনি তো ভালো বরে মেয়ে দেবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। তা যদি দৈবই ভালো বর জুটাইয়া দিয়াছে, তিনি তো কৃতার্থই হইয়াছেন।" দু-জনেই ফুল তুলিতেছিলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ফুল যথেষ্ট হইয়াছে।" অনসূয়া বলিলেন, "না, এখনো হয় নাই। কেন-না, এখন যে শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজা করিতে হইবে।" এইসব কথা হইতেছে, এমন সময়ে কে চিৎকার করিয়া বলিল, "অয়মহং ভোঃ।" কথাটা প্রথমেই অনসূয়ার কানে গেল। তিনি বলিলেন, "অতিথি আসিয়াছে গো।" ইতিমধ্যেই দুর্বাসা আসিয়া শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অমনি প্রিয়ংবদা বলিলেন, "বাপ্ রে, অন্য কোনো অতিথি নয়,

স্বয়ং দুর্বাসা।” অনসূয়া বলিলেন, “তবে তুমি যাও, পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করো। আমি পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া যাইতেছি।” এই সময় অনসূয়া হোঁচট খাইলেন, তাঁহার হাত থেকে ফুলের সাজি পড়িয়া গেল। তিনি জানিলেন, শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতারা প্রসন্ন নন। তিনি ফুলগুলি কুড়াইয়া লইতেছেন, এমন সময় প্রিয়ংবদা আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি দুর্বাসাকে নরম করিতে পারিয়াছেন। অনসূয়ার বড়োই আনন্দ। আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন যে, অভিজ্ঞান দেখাইলেই সব চুকিয়া যাইবে, তখন বলিলেন, “তা এখন আমাদের আশা হইল। রাজা নিজেই একটি আঙটি দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম খোদা আছে, শকুন্তলা সেইটি দেখাইলেই চলিবে।” আবার বলিলেন, “দেখ ভাই প্রিয়ংবদা, এ কথাটা আমাদেরই মনে মনে থাকুক। শকুন্তলাকে এ কথাটা বলার দরকার নাই। সে ভয় পাবে।”

শকুন্তলার বিদায় যেদিন, সেদিন অনসূয়া খুব সকালে উঠিয়া ভাবিতেছেন, “রাজা তো শকুন্তলার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিলেন না। শকুন্তলা নিতান্ত সরল, সে তো সেকথা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু এত দিন কোনো খবর দিলেন না, এইটা কি রাজার উচিত হইয়াছে? আমার যে আর কোনো কাজে আস্থা নাই। আমার যে কোনো কাজে হাত-পা এগোয় না। হয় তো দুর্বাসার শাপই রাজাকে সব-কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। কী করি, অভিজ্ঞান আঙটিটা রাজার কাছে পাঠাইয়া দিব? কে বা যাবে? তপস্বী বেচারারা সমস্ত দিন আপন কাজ লইয়াই থাকে, কাকেই বা বলি? আবার সখীরই দোষ, সুতরাং কর্তার কাছে যে সব কথা খুলিয়া বলিব, তাও তো পারি না। এ দিকে শকুন্তলা যে গর্ভবতী, কী করি, ভাবিয়া কূল পাই না।” তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া খবর দিল, শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে। অনসূয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দৈববাণীতে কণ্ব সব খবর শুনিয়াছেন, জানিতে পারিয়া অনসূয়ার বড়ো আমোদ। তিনি প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “শকুন্তলা যাবে, বড়ো আনন্দের কথা; কিন্তু আমাদের বড়ো উৎকণ্ঠা হইতেছে। দেখো, নারিকেলের ঠুলিতে একছড়া বকুলের মালা রাখিয়াছি, সে ছড়াটা এই সময়ে সঙ্গে লইয়া যাই। গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দূর্বা এ-সকলগুলি আমিই সংগ্রহ করি গিয়া। মঙ্গলকাজে তো এ সবগুলি দিতেই হবে।”

বিদায়ের সময়ে কণ্বমুনির সম্মুখে দুই সখীই একেবারে কথা কহিয়াছেন। কেবল যখন শকুন্তলা চক্রবাকীকে দেখিয়া জনান্তিকে বলিলেন, "এই চকি পদ্মপাতার আড়ালে থাকিলেও চকা চিৎকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তুলে। অতএব আমি যাহা করিতেছি, অন্যে তাহা পারে না। অর্থাৎ আমি যে রাজাকে ছাড়িয়া এত দিন আছি, এমন থাকাটা খুব কঠিন।" তাহাতে অনসূয়া বলিলেন, "এও চকা ছাড়িয়া রাত্রি কাটায়। জাগরণের রাত্রি পোহায় না। কেবল আশা থাকে বলিয়াই বিরহের দুঃখটা কতক সহ্য যায়।"

এই তো গেল অনসূয়ার কথা। তিনি শান্ত, সরল, ধীর, বেশ বিজ্ঞ, অনেক খবর রাখেন আর শকুন্তলাতেও একেবারে তন্ময়।

তাহারপর প্রিয়ংবদা, বড়ো চালাক, চতুর, চঞ্চল, বড়ো রহস্যপ্রিয়; সুবিধা পাইলে কাহাকেও ছাড়েন না। শকুন্তলা যখন "বাকল কসা হইয়াছে, প্রিয়ংবদা কসিয়া দিয়াছে" বলিতেছিলেন, প্রিয়ংবদা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "দোষ বুঝি আমার? নিজের যৌবন আরম্ভ হইয়াছে, ছাতি ফুলিয়া উঠিয়াছে, কাপড় কসা হইতেছে, দোষ বুঝি আমার?" তারপর গাছে জল দিতে দিতে বকুলগাছের কাছে আসিয়া বলিলেন, "শকুন্তলা, তুই ভাই, এই গাছটার তলায় একবার দাঁড়া। গাছে আর লতায় একবার মিল হউক।" আবার যখন বনজ্যোৎস্নার কথা পাড়িল, প্রিয়ংবদা বলিল, "অনসূয়া, জানিস, শকুন্তলা কেন বনজ্যোৎস্নাকে এত ভালোবাসে? ও যেমন মনের মতো গাছের সঙ্গে মিলিয়াছে, আমিও ঐ রকম মনের মতো বর পাব"। শকুন্তলা তো রাগিয়াই অস্থির। অনসূয়া যখন অতিথিসৎকারের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্যের আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত, প্রিয়ংবদা বুঝিলেন, এ অতিথি পাদ্য অর্ঘ্য চায় না, মিষ্ট কথাই চায়, তাই বলিলেন, "আপনি এই ছায়ায় ছাতিমগাছের তলায় বসুন ও বিশ্রাম করুন।" অতিথিটি কে, জানিবার জন্য প্রিয়ংবদাই প্রথম উৎসুক হন এবং কানে কানে অনসূয়াকে বলেন, জানো না ভাই, এ লোকটি কে?" অনসূয়া শকুন্তলার পরিচয় দিলে পর, যখন মেয়ে লইয়া মুনি কী করিবেন কথা উঠিল, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ভালো বর পেলে মুনি কন্যাটি দান করিবেন।" শকুন্তলা এই কথা শুনিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন, কিছুতেই ফিরিবেন না, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "আমার দু-কলসি জল ধারিস্, দিয়া তবে যা।" শকুন্তলার ধার রাজা যখন আঙটি দিয়া শোধ দিলেন, তখন প্রিয়ংবদা আঙটিতে রাজার নাম দেখিয়া অতিথি যে রাজা,

এইটিই অনুমান করিলেন। তখন অতিথি বলিলেন, "আমি রাজপুরুষ, রাজা আমায় এই আঙটিটি দিয়াছেন।" প্রিয়ংবদা পাকা উকিলের মতো, ফাঁক পাইয়া, বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে তো অর্থাৎ রাজার প্রসাদ হলে তো এটি আপনার হাত থেকে তফাত করা কি উচিত?" সুতরাং রাজাকে আঙটিটি ফিরাইয়া লইতে হইল। কালিদাস রাজা যে আঙটি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, সেকথা বলেন নাই। কিন্তু লওয়াটা সত্য; কারণ, অভিজ্ঞান দেওয়ার সময় যদি প্রিয়ংবদার কাছে আর-একটা আঙটি থাকিত, সেটির কথা অবশ্যই উঠিত, তাতো উঠে নাই। যাবার দিন শকুন্তলাকে রাজা যে আঙটি দিয়াছিলেন, তাহারই কথা উঠিয়াছিল। আঙটি ফিরাইয়া দিয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিলেন, "এখন তুমি যাইতে পারো।" এটা মর্মান্তিক ঠাট্টা, শকুন্তলা গেলেন না।

শকুন্তলার অসুখের সময় তিনি খস্‌খসে ও পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার যখন বড়ো অসুখ, পদ্মপাতার বাতাসও তাঁহার গায়ে লাগিতেছে না। অনসূয়া অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর শকুন্তলা ইতস্তত করিতেছেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "এ তো বেশ বলিতেছে, আপনার অসুখ গোপন করিতেছ কেন? তোমার শরীর রোজ রোজ রোগা হইয়া যাইতেছে। কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া তোমায় ত্যাগ করিতেছে না।" শেষ শকুন্তলা যখন সব খুলিয়া বলিলেন, তখন কাজের ভার প্রিয়ংবদা লইলেন। "সখি, বেশ হইয়াছে। তুমি যাকে ভালোবাস, সে পুরুবংশের প্রদীপ। সাগর ছাড়িয়া কি অন্যত্র মহানদী গিয়া পড়ে? মাধবীলতা কি আমগাছ ছাড়া তালগাছে শোভা পায়?

অনসূয়া যখন বলিলেন, গোপনেও শীঘ্র মিলন হওয়া চাই, তখন বুদ্ধিমতী প্রিয়ংবদা বলিলেন, "শীঘ্র হতে বড়ো কষ্ট হবে না, কিন্তু গোপনে হওয়াই দুর্ঘট। কেন-না, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি রাজাও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, রাত্রে তাঁহার ভালো ঘুম হয় না, তাই তিনি শুকিয়ে যাইতেছেন।" এটা অনসূয়া দেখেন নাই; কিন্তু প্রিয়ংবদা দেখিয়াছেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "তবে এখন শকুন্তলা আপনার মনের ভাব খুলিয়া লিখুক, আপনাকে রাজার হাতে সঁপিয়া দিক্। একখানি পত্র লিখুক, আমি নির্মাল্যের ভিতর পুরিয়া রাজার হাতে পঁহুছিয়া দিব। গানের আকারেই লিখুক।" গান লেখা হইলে শকুন্তলা বলিলেন, "গান তো তৈয়ার হল, লেখার উপায়?" উপস্থিতবুদ্ধি প্রিয়ংবদা বলিলেন, "পদ্মপাতার উপর নখের আঁচড় দিয়া লেখো।" রাজা যখন অনসূয়ার কথায়

শকুন্তলার সঙ্গে এক বিছানায় বসিলেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "আপনারা দু-জনেই পরস্পরকে খুব ভালোবাসেন, আমার কোনো কথার দরকার নাই, তবে সখীকে বড়ো ভালোবাসি, তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।" রাজা অনুমতি দিলে, বলিলেন, "রাজার অধিকারে যদি কাহারো দুঃখ হয়, রাজার উচিত নয় কি সে দুঃখমোচন করা?" রাজা বলিলেন, "সেও আবার কথা, তাও আবার বলিতে হয়?" তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "আমার সখী আপনার জন্য বড়ো কাতর, উঁহার কাতরতা যাহাতে যায়, তাহা করিয়া দিউন।"

শকুন্তলাকে রাজা পাটরানী করিবেন স্বীকার করিলে দুই সখীরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু প্রিয়ংবদা বুঝিল, আমাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়। উহারা যাহা জানে করুক; বলিলেন, "অনসূয়া, ঐ দেখ, হরিণ-শিশুটা আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়া রহিয়াছে, আহা, বেচারার মা কাছে নাই, মাকেই খুঁজিতেছে। এসো আমরা উহার মাকে খুঁজিয়া দিই।" বলিয়া অনসূয়াকে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

রাজার বিদায়ের দিনে যখন অতিথি "অয়মহং ভোঃ" বলিলেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ঘরের কাছে শকুন্তলা আছে, তবে কিনা, তাহার মন এখন তাতে নাই।" দুর্বাসার শাপ যখন শোনা গেল, তখন প্রিয়ংবদা প্রথম বলিলেন, এ তো যে সে অতিথি নয়, স্বয়ং দুর্বাসা এবং অনসূয়ার কথায় দৌড়িয়া দুর্বাসাকে ধরিলেন, পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নরম করিলেন এবং শাপের একটা অবসান করিলেন। সমস্ত কথা অনসূয়াকে বলিলেন এবং যাইতে যাইতে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "দেখো দেখো, শকুন্তলা বাঁ হাত গালে দিয়া কেমন ভাবিতেছে। যেন একখানি ছবি। রাজার চিন্তায় ওর এখন আপনার কথাই মনে নাই, তাতে আবার অতিথি।"

শকুন্তলার বিদায়ের দিন প্রিয়ংবদাই অনসূয়াকে খবর দিল। শকুন্তলা আজ শ্বশুরবাড়ি যাবে। অনসূয়া তো শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, আর ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। সে কাশ্যপের আসা হইতে দৈববাণী শোনা ও শকুন্তলার যাওয়ার উদ্যোগ সব অনসূয়ার কাছে গল্প করিল। শকুন্তলাকে সাজাইতে হইবে, প্রিয়ংবদা ফুলের মালা গাঁথিতে লাগিল। এমন সময়ে হস্তিনাপুর যাইবার জন্য শিষ্যদের ডাক পড়িল। প্রিয়ংবদার কথায় তাহারা দুই-জনেই সেই দিকে যাইতে লাগিল। প্রিয়ংবদা বলিল, "ঐ দেখো, শকুন্তলা সকালেই 'শিখাসম্মজ্জন' স্নান করিয়া অর্থাৎ মাথা ধুইয়া, ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আশীর্বাদ শেষ হইয়া গেলে সখীরা

শকুন্তলাকে সাজাইতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "এ রূপ অলংকারেরই উপযুক্ত। ফুলের মালায় ইহার অবমান করা হয়।" বনদেবতাদের দেওয়া অলংকার আনিলে প্রিয়ংবদা বলিলেন, "বনদেবতারা যখন এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, রাজার ওখানে তুমি রাজলক্ষ্মী ভোগ করিবে।" যাইবার সময় যখন শকুন্তলা বলিলেন, "আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতে আমার আর পা উঠিতেছে না;" তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর, এমন নহে। তপোবনেরও কী দশা হইয়াছে, দেখ। হরিণের মুখ থেকে কুশের গ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর নাচিতেছে না, গাছের ডাল থেকে শাদা পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে— বোধ হইতেছে, যেন তাহারা চোখের জল ফেলিতেছে।

কালিদাস এক-একটি সখীদ্বারা এতগুলি কথা বলাইয়াছেন। যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন প্রকৃতি, তাহার মুখে সেই কথাই বলাইয়াছেন। কিন্তু দু-জনেই তো সখী। শকুন্তলার অনেক কাজে দু-জনেরই সমান টান, কিছুই ইতরবিশেষ নাই। সেইজন্য কালিদাস অনেক জায়গায় দু-জনেরই মুখে এক সময়ে একই কথা বাহির করিয়াছেন। স্টেজ ডিরেক্সন দিয়াছেন "সখ্যৌ"— একেবারে দ্বিবচনে। সেইগুলি একবার পড়িলে দুটি সখীর প্রকৃতি বেশ বুঝা যাইবে। প্রথম রাজা যখন আশ্রমে ঢুকিলেন, দূর হইতে তাঁহার কানে গেল— 'ইদোইদো সহীয়ো' "সখীরা এই দিকে এই দিকে"। রাজা প্রথম বুঝিতে পারিলেন না, এটা মানুষের শব্দ কি দূরে ভ্রমরের গুঞ্জন, কি পাখির ডাক, কি দূরস্থ সঙ্গীতের ধ্বনি। তাই বলিলেন, "যেন দূরে কে আলাপ করিতেছে।" কালিদাস এখানে ঐ যে "আলাপ ইব শ্রূয়তে" লিখিয়াছেন এবং "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার অর্থ অনেক। সে কথা যাক।

গোড়ায়ই কালিদাস বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার দুই-সখীর প্রতিই সমান টান। তিনি দু-জনে বড়ো ইতরবিশেষ করেন না। সেটা জেনে রাখা প্রেক্ষকের পক্ষে বড়ো দরকার। তার পর অনেকক্ষণ দু-জনে নানা কথাবার্তা হইলে পর, ভোমরাটা যখন শকুন্তলাকে বড়ো জ্বালাতন করিতেছে, আবার শকুন্তলা দুই সখীকেই পরিত্রাণের জন্য ডাকিলেন, তখন দুই-জনেই বলিয়া উঠিল, "আমরা তোমার পরিত্রাণ করিবার কে? দুষ্মন্তকে ডাকো। তপোবন তো রাজাই রক্ষা করেন।" এ জায়গায় দুই-সখীর মুখ থেকেই এক-কথা বাহির হইল। রাজা যখন সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দু-জনেই সমান আশ্চর্য হইয়া গেল। আবার যখন শকুন্তলা ও রাজার আকাব-প্রকার দেখিয়া দু-জনেই বুঝিলেন, একটা কিছু

হইয়াছে, শকুন্তলা রাজাকে ভালোবাসিয়াছে, রাজাও শকুন্তলার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন; তখন দু-জনেই শকুন্তলাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "শকুন্তলা, আজ যদি বাবা এখানে থাকিতেন।" শকুন্তলা বলিলেন, "তা হলে কী হতো," "আপনার জীবনসর্বস্ব দিয়াও এমন অতিথির সৎকার করিতেন।" এ জায়গায় কেহ মনে করিতে পারেন, এ কথাটা প্রিয়ংবদার মুখে দিলেই ভালো হইত। সেই ঠাট্টা ভালোবাসে, তারই মুখে শোভা পাইত। অনসূয়া গম্ভীরা, তার মুখে ততো শোভা পায় না। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, এমন একটা সুযোগ পেলে যতই ভালোমানুষ হউক, কোনো মেয়েই ছাড়ে না। তাই কালিদাস দুটি মেয়ের মুখেই ঠাট্টাটা তুলিয়া দিয়াছেন।

রাজা আবার যখন বলিলেন, "আমি আপনাদের সখীর সম্বন্ধে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব", তখন দু-জনেই বলিলেন, "এ তো আপনার অনুগ্রহ, এর জন্য আবার প্রার্থনা কেন?" দু-জনেই যেমন রাজার পরিচয় পাইতে ব্যস্ত, তেমনি দু-জনেই শকুন্তলার পরিচয় দিতেও ব্যস্ত। রাজা যখন দু-কলসি জলের বদলে আঙটিটি দিলেন, তখন দু-জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। দু-জনেই আশ্চর্য হইয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন, দু-জনেরই যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথ হইয়াছে। আবার যখন হাতির উপদ্রবে সকলেই আপন আপন জায়গায় যাইতে উদ্যত, তখন দুই-সখী একবাক্যে বলিলেন, "আজ ভালো করিয়া অতিথিসৎকার করিতে পারিলাম না। তাই লজ্জা হয় বলিতে, আবার কি দেখা হবে?"

শকুন্তলা একখানা বড়ো পাথরে শুইয়া আছেন, তার উপর ফুলের চাদর বিছানো, আর সখীরা বাতাস করিতেছে, তখন দুই-সখীই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদ্মপত্রের বাতাস তোমার ভালো লাগিতেছে তো?" শকুন্তলার জবাবে দু-জনেরই মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। দু-জনে দুঃখে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শকুন্তলা যখন গান রচনা করিতেছেন, কিন্তু পাছে রাজা তাচ্ছিল্য করেন, সেই ভয়ে একটু কাতরও হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে একটু উৎসাহিত করা দু-জনেরই দরকার, তাই দু-জনেই বলিলেন, "হাতি আপনার শরীর দেখিতে পায় না, মনে করে, আমি কত ছোটো। তোমারও ভাই হয়েছে তাই! তুমি আপনার গুণ জানো না, চাঁদের কিরণে শরীর জুড়ায়। পৃথিবীতে কে এমন আছে যে, আঁচল দিয়া চাঁদের আলো গায়ে পড়িতে দেয় না?" শকুন্তলার রূপ যে অপরূপ, আর

তাহার গুণও যে অনেক, তাহা দুই সখীরই ধ্রুব-বিশ্বাস। শকুন্তলার গান বাঁধা হইয়া গেলে দু-জনকেই শুনাইতে চাহিলেন। দু-জনেই মন দিয়া শুনিলেন। রাজা যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, শকুন্তলাই তাঁহার পাটরানী হইবেন, তখন দু-জনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! বাঁচ্‌লাম!"

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দু-জনেই লতার ঘর হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। শকুন্তলা যখন বলিলেন, "তোমাদের দু-জনের একজন আমার কাছে থাকো। নহিলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িব।" তাহাতে দু-জনেই বলিলেন, "যিনি সমস্ত পৃথিবীর আশ্রয়, তিনি যখন তোমার নিকটে আছেন, তখন তুমি নিরাশ্রয় কিসে?"

শকুন্তলাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার সময়ে যখন তাপসীরা আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, দুই-সখীই একেবারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্নান হইয়াছে তো?" শকুন্তলা দু-জনকেই আদর করিয়া বসাইলেন। উভয়েই মাঙ্গল্যদ্রব্যের দ্বারা তাঁহাকে সাজাইতে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, "এখন এটা আমার ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে। আর আমার তো সখীদের হাতে এ রকম সাজসজ্জা হইবে না", বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দু-জনেই বলিয়া উঠিলেন, "এটা মঙ্গলের সময়, এখন কাঁদিতে নাই।" আবার যখন ঋষিকুমারেরা রাশি রাশি অলংকার আনিয়া দিল, তখন দু-জনেই বিপদে পড়িলেন, অলংকার কোথায় কী কী পরাইতে হয়, কেহই জানেন না। তখন দু-জনেই একস্বরে বলিলেন, "আমি তো কখনো অলংকার কাহাকে বলে, জানি না। তবে অনেক ছবি আঁকিয়াছি ও দেখিয়াছি, সেইমতো করিয়া সাজাই।" এখানে কালিদাস একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। দু-জনেই আপনার আপনার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু একবচনেই বলিয়াছেন, "আমরা" বলেন নাই। সাজানো হইয়া গেলে দু-জনেই বলিলেন, "সাজানো শেষ হইয়াছে। এখন চেলীখানি পরো।" যখন শকুন্তলা তাঁহার বড়ো আদরের বনজ্যোৎস্নাকে দুই-সখীর হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন; তখন দু-জনেই শোকে ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বলিলেন, "আমাদের ভাই কাহার হাতে সঁপিয়া দিলে?" বিদায়ের সময় অন্য-সকলের কাছে বিদায় লইয়া শকুন্তলা সখীদের কাছে আসিলেন; বলিলেন, "তোমরা দু-জনে আমায় একেবারে আলিঙ্গন করো, কোল দাও।" সখীরাও তাহাই করিল। তখন দু-জনেই বলিলেন, "যদি রাজা অভিজ্ঞান চাহিয়া বসেন, তাঁহাকে এই অঙ্গুরিটি দেখাইও।" শকুন্তলা এ-কথায় অত্যন্ত ভীত হইলেন। অত প্রণয়— অত

ভালোবাসা— আবার অভিজ্ঞান চাহিবে? শকুন্তলা চলিয়া গেলে দু-জনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হায় হায়, মাঝে বন পড়িয়া গেল, আর যে শকুন্তলাকে দেখা যায় না।” তাঁহারা দু-জনেই শকুন্তলার পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, একবারও চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। এখন গাছের আড়াল পড়িয়া গেল, “আর দেখা যায় না” বলিয়া উঠিলেন। দু-জনেরই এখন কণ্বের আশ্রম শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কণ্বের আর-এক করুণামূর্তি তাঁহার ভগিনী গোতমী। কণ্ব বিদেশে গেলে শকুন্তলা আশ্রমের কর্ত্রী হইলেও, গোতমী আছেন, তিনিই ভরসা। প্রিয়ংবদা যখন নানারকম ঠাট্টা-তামাসা করিয়া শকুন্তলাকে একটু জ্বালাতন করিলেন, তখন শকুন্তলা রাগিয়া বলিলেন, “আমি যাই, প্রিয়ংবদা বাজে কথা বলিতেছে, আর্যা গোতমীকে বলিয়া দিই গিয়া।” শিষ্য যখন কুশ আনিতে গিয়া শুনিল, শকুন্তলার বড়ো অসুখ, সে বলিল, “আমি গোতমীর হাতে শান্তিজল পাঠাইয়া দিতেছি।” গোতমী যখন লতাগৃহে যাইতেছেন, সখীরা দু-জনেই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি গিয়াই শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটু ভালো আছ তো?” শকুন্তলা “হাঁ আছি” বলিলে, তিনি তাঁহার মাথায় শান্তিজল দিয়া বলিলেন, “যদি কিছু কসুর থাকে, এই শান্তিজলেই তোমার শরীর স্বচ্ছন্দ হইবে।” তাহার পর বেলা আর নাই দেখিয়া শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় যখন তাপসীরা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, গোতমীও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাপসীরা আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলে গোতমী রহিয়া গেলেন। ঋষিকুমারেরা অলংকার আনিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা এসব কোথায় পাইলে?” উত্তর হইল, “তাত কাশ্যপের প্রভাবে।” গোতমী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মানসী সিদ্ধি?” [কিং মানসী সিদ্ধি?] উত্তর হইল “না। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, শকুন্তলার জন্য বড়ো বড়ো গাছ থেকে ফুল আনো, আমরা ফুল আনিতে গিয়া এইসব পাইয়াছি; কোনো গাছ গরদের শাড়ি দিয়াছে, কোনো গাছ আল্‌তা দিয়াছে, কোনো কোনো গাছে আবার বনদেবতারা হাতের পোঁচাটি বাহির করিয়া এক একখানি করিয়া গহনা দিয়াছেন।” কণ্ব আসিতেছেন দেখিয়া গোতমী শকুন্তলাকে বলিলেন, “এই তোমার বাপ আসিতেছেন। তাঁহার চোখ দিয়া আনন্দের স্রোত ছুটিতেছে, যেন চোখ দিয়াই

~ ~

তোমায় কোলে করিতেছেন। উঁহাকে নমস্কার করো।" কণ্ব আশীর্বাদ করিলে গোতমী বলিলেন, "এ তোমার আশীর্বাদ নয়— 'বর!" আশীর্বাদ ফলিতেও পারে, না ফলিতেও পারে, কিন্তু বর ফলিবেই। তাই ভগিনী গোতমী ভাই-এর আশীর্বাদকে "বর" করিয়া দিলেন। গুরু ভট্টাচার্যদিগের বাড়ি এরূপ দু-একটি পিসিমা প্রায়ই থাকেন— "একথা যখন দাদা বলিয়াছেন, এ কখনো ব্যর্থ হইবার নহে।" গোতমীও আমাদের সেই পিসিমা। যখন কোকিল ডাকিয়া উঠিল, যখন বনদেবতারা কোকিলের মুখে শকুন্তলাকে স্বচ্ছন্দমনে বিদায় দিলেন, তখন পিসিমা বলিলেন, "জাদু, তপোবনদেবতারা তোমায় বড়ো ভালোবাসেন, তাঁরা যেন তোমার জ্ঞাতি, তাঁহারা তোমায় যাইবার অনুমতি দিতেছেন: বিদায় দিতেছেন। তাঁহাদের প্রণাম করো।" শ্বশুরবাড়ি গিয়া কী করিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া কণ্ব যখন "গোতমী কী মনে করেন?" জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "নূতন বৌকে এই উপদেশই দিতে হয়। শকুন্তলা, কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিও।"

গোতমী যখন দেখিলেন, ডুমুরগাছের তলায় বসিয়া কণ্ব ও শকুন্তলায় কথা ও কান্নাকাটি আর থামে না, শার্ঙ্গরব "সূর্য মাথার উপর উঠিল, শকুন্তলা, শীঘ্র শীঘ্র কথাবার্তা সারিয়া লও" বলিয়াও উহাঁদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "যাওয়ার সময় উতরিয়া গেল। বাবাকে ফিরিয়া যাইতে বলো, অথবা শকুন্তলাকে বলিয়াই বা কী হইবে? সে ক্রমেই নানা কথা কহিতে থাকিবে, ক্রমেই কালক্ষেপ করিবে। দাদা, আপনিই ফিরুন, থামুন।" তাহার পর কোলাকুলির পালা পড়িল, ফিরিবার চেষ্টা হইল।

রাজবাড়িতে শিষ্টাচারের পর যখন শার্ঙ্গরব ঋষি-আজ্ঞা শুনাইয়া রাজাকে বলিলেন, "আপনি শকুন্তলাকে 'সহধর্মাচরণের' জন্য গ্রহণ করুন," তখন গোতমী বলিলেন, "আমি কিছু বলিতে চাই: কিন্তু আমার কোনো কথা বলিবার কোনোও পথ তোমরা রাখো নাই। ইনিও গুরুজনের অপেক্ষা করেন নাই। তুমিও বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করো নাই। পরস্পরে এরূপ ব্যবহার করিলে অন্যে এক জনের হইয়া আর-একজনকে কী বলিতে পারে?"

যখন রাজা ও শার্ঙ্গরব বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছেন, কথা কাটাকাটি হইতেছে, গোতমী বলিলেন, "জাদু, লজ্জা করিও না, তোমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিই, তাহলে রাজা তোমায় চিনিতে পারিবেন।" যখন অঙ্গুরি না পাইয়া শকুন্তলা ক্ষোভে দুঃখে গোতমীর দিকে চাহিলেন, তখন গোতমী বলিলেন, 'ইন্দ্রের ঘাটে শচীতীর্থে

জল লইয়া নমস্কার করিবার সময় তোমার আঙটিটি পড়িয়া গিয়াছে।" রাজা একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কী উপস্থিত বুদ্ধি!" রাজা আবার যখন শকুন্তলা মিছা কথা বলিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন, বলিয়া উঠিলেন, তখন গোতমীর আর সহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ রকম কথাটা বলা একেবারেই ভালো নয়। ইনি তপোবনেই পালিত, জুয়াচুরি কাহাকে বলে, তাহার লেশও জানেন না।" তখন রাজা বলিলেন, "বুড়ি, পশুপক্ষীদের মধ্যেও স্ত্রীগুলা বড়োই চালাক হয়, মানুষ তো হবেই। দেখ না, কোকিলগুলা কাকের বাসায় রাখিয়া কেমন ডিম ফুটাইয়া লয়।" রাজা ও শার্ঙ্গরবে যখন ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত, শারদ্বত বলিলেন, "আর কথায় কাজ কী, গুরু বলিয়া দিয়াছিলেন, শকুন্তলাকে পঁহুছিয়া দিতে, আমরা দিলাম। ইনি আপনার ধর্মপত্নী— আপনি ইঁহাকে গ্রহণ করুন-বা-না-করুন, সে আপনার ইচ্ছা ও অধিকার" বলিয়াই গোতমীকে বলিলেন, "তুমি আগে আগে যাও।" তাহাতে শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন গোতমী বলিলেন, "বাবা শার্ঙ্গরব, এ যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। স্বামী যখন ত্যাগই করিল, তখন আর কী করেই-বা বেচারা?" এইখানে গোতমীর কথা শেষ হইল।

আবার বলি, অনসূয়া শকুন্তলার জন্য দিন-রাত ভাবেন, আপনার ভাবনার চেয়ে শকুন্তলার ভাবনা তাঁহার বেশি। প্রিয়ংবদাও নিজের জন্য কিছুই করেন না। যাহা কিছু করেন শকুন্তলারই ভালোর জন্য। আর গোতমী, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার স্নেহ অপার, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অপার। শকুন্তলার জন্য তিনি মান অপমান কিছুই জ্ঞান করেন না। বলিতে কী, তিনিই শকুন্তলার এক রকম মা।

নারায়ণ
শ্রাবণ, ১৩২৪

কণ্বের কঠোর মূর্তি

কণ্বের নিজের মূর্তি কূটস্থ ব্রহ্মের ন্যায়, কোমল ও কঠোর দু-এ এক। কঠোর ভাবটা কোমলতায় মিশাইয়া গিয়াছে। তিনি যে কঠোর, তাহা বুঝাই যায় না। কিন্তু তাঁহার কঠোর মূর্তিও আছে, তাহার মধ্যে একটি শার্ঙ্গরব। কালিদাস বাছিয়া বাছিয়া নামটিও দিয়াছিলেন শার্ঙ্গরব। শার্ঙ্গ বলিতে শিংএর তৈয়ারি ধনুক বুঝায়। সেকালে মহিষের শিং দিয়া ধনুক তৈয়ারি হইত। সে ধনুক টানা খুব কঠিন। এক অর্জুনের শার্ঙ্গ-ধনু ছিল। রামচন্দ্রের শার্ঙ্গ-ধনু ছিল। তাহার শব্দ খুব কঠোর ছিল, টং টং করিয়া বাজিত। আমাদের শার্ঙ্গরবের স্বর বা রবও তেমনি কর্কশ, তাঁহার বোল বেশ কাটা কাটা। তিনি ঝগড়া করিতে কটুকথা বলিতে বড়োই মজবুত। তাঁহার এক সঙ্গী আছেন, নাম শারদ্বত। শরৎ শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় করিয়া শরদ্বৎ শব্দ হয়; শরৎকালের মতো, গম্ভীর, পরিষ্কার। তাঁহারই পুত্র শারদ্বত অথবা শরদ্বান্ ও শারদ্বত একই। স্বার্থে প্রত্যয় হইয়াছে। তিনি গম্ভীর অথচ পরিষ্কার, কথা খুব কম কহেন। কিন্তু যা কহেন, তাহা একেবারে কাটা-ছাঁটা। তাহার উপর আর কাহারো কথা চলে না। তাঁহার স্বরও গম্ভীর, টং টং করে না। তিনি দু-চারিটি কথা কন, তাহাতে অনেক কথার, অনেক ঝগড়ার, নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

যখন প্রিয়ংবদা ফুল তুলিতেছেন, অনসূয়া মাঙ্গল্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছেন, তখন নেপথ্যে শুনা গেল, "গৌতমি, শার্ঙ্গরবকে বলো, শকুন্তলাকে আনুক।" তাহাতেই প্রিয়ংবদা বুঝিলেন যে, এরা এখনই হস্তিনাপুরে যাইবে। সে অমনি অনসূয়াকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়, এদের যাবার সময় হল।" সুতরাং শার্ঙ্গরব আশ্রমের সকলের কাছেই পরিচিত, ডাকা-বুকা লোক, চালাক-চটপটে, বলিতে কহিতে মজবুত, সকল কাজেই মজবুত, সকল কাজেই

অগ্রসর। শকুন্তলার আশীর্বাদ হইয়া গেল, কণ্বমুনিও ঋগ্‌বেদের ছন্দে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর কণ্বমুনি বলিলেন, "শার্ঙ্গরব কোথায়?" সুতরাং শার্ঙ্গরবই যে, যারা হস্তিনা যাইতেছে, তাদের কর্তা হইয়া যাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শার্ঙ্গরব উপস্থিত হইলে, কণ্ব বলিলেন, "তোমার ভগিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও।" শার্ঙ্গরবও বলিলেন, "এই দিকে এস, এই দিকে এস।" সকলে চলিতে লাগিল। কোনো কাজের ভার পাইলে যুবকেরা কাজটা যত শীঘ্র পারে, শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, শার্ঙ্গরবেরও তো তাই। খানিক দূর গিয়া একটি পুকুর দেখিতে পাইয়া শার্ঙ্গরব গুরুকে বলিলেন, "জলের ধার পর্যন্তই আত্মীয়স্বজনেরা যাইয়া থাকেন, এই তো পুকুর, এইখানে যা-কিছু বলার বলিয়া আপনি ফিরিয়া যান।" কণ্ব যাহা বলিয়া দিলেন, সবই খুব মিষ্ট, খুব কোমল। কিন্তু তাহার প্রত্যেক অক্ষরে ছুরি আছে, "মহারাজ মনে মনে জানিবেন, সংযমই আমাদের ধন। মনে জানিবেন, আপনার কুল বড়ো উচ্চ। শকুন্তলার প্রতি আপনার স্নেহের কথাও মনে করিবেন। সে স্নেহে বন্ধু-বান্ধবের কোনোও হাতই ছিল না, এবং এখনো নাই। এই-সকল কথা মনে রাখিয়া অনেক পরিবারমধ্যে একটি বলিয়া আমার এই কন্যাটিকে লইবেন। ইহার পর যাহা কিছু, তাহা শকুন্তলার অদৃষ্ট। আমরা তাহা বলিতে পারি না।" আপনি সংযমী ঋষিদের আশ্রমে আসিয়া অত্যন্ত অসংযমের কাজ করিয়া গিয়াছেন, আপনি বড়ো বংশের লোক বলিয়া সব মানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই কন্যাটি গ্রহণ করিলে আর-কোনো কথাই থাকিবে না। আমরা উহাকে পাটরানী করিতে বলিতেছি না! অনেক রানীর মধ্যে একটি করিয়া লইবেন। তাহার পর উহার ভাগ্য; আপনি লইতেও পারেন, না লইতেও পারেন, লইয়া বড়োরানীও করিতে পারেন। আমরা সেকথা বলিতে চাহি না।

কণ্বমুনির কঠোবমূর্তি শার্ঙ্গরব এই "খবরের" কী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। কিন্তু মূল এই, ইহার উপর অনেক টীকা-টিপ্পনী চড়িবে; অনেক ভাষ্য-বার্তিক হইবে। শার্ঙ্গরব কণ্বের কথা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়া লইলাম।" এই যে "বেশ করিয়া" বলিলেন, তাহার অর্থ পরে প্রকাশ হইবে। কণ্ব তাহার পর বলিলেন, "রাজাকে তো অনেক উপদেশ দিলাম। শকুন্তলাকে এখন দু-চারিটা কথা বলিয়া দেওয়া উচিত। আমরা বনবাসী হইলেও সংসারের ব্যাপার একটু একটু বুঝি।" তাহাতে শার্ঙ্গরব বলিলেন, "যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহাদের কিছু এড়ায় না।" তাহার পর বেলাটা বেশি হইতেছে

দেখিয়া শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে শীঘ্র শীঘ্র কথাটা সারিয়া লইতে বলিলেন; তিনি তো আর কণ্বমুনিকে বলিতে পারেন না—"মহাশয়, আর কেন, ঢের হইয়াছে, এখন ফিরুন।" কারণ, তিনি যে ঋষির শিষ্য, ঋষি যে তাঁহার দেবতা। একালকার শিষ্য তো নয় যে, গুরুমারা বিদ্যা হইবে। গুরুর মুখের উপর যা-তা বলিবে? যাহা শার্ঙ্গরব বলিতে পারিল না, তাহা ভগিনী গৌতমী বলিয়া দিলেন, "শকুন্তলা থামিবে না, তুমিই দাদা থামো।"

রাজবাড়ি উপস্থিত হইযা যখন ঋষিরা সকলে কঞ্চুকীর সঙ্গে রাজার কাছে দেখা করিতে যাইতেছেন, তখন অনেক লোকজন দেখিয়া শার্ঙ্গরবের মনে কী ভাব হইতেছে, দেখা যাউক। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, মহাভারত-এর শকুন্তলোপাখ্যানের ঋষিরা নগরের মধ্যেই আসেন নাই। তাঁহাদের আকার-প্রকার দেখিয়া লোকে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় তাঁহারা নগরের গেটের কাছ হইতেই আশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছিলেন; শকুন্তলা ও তাঁহার ছেলে— বয়স বারো বছর,— দু-জনেই নগরদ্বার হইতে রাজসভা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা রাজবাড়ি যাইবার সময় গর্ভবতী, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী এবং আরও অনেকে ছিলেন। শার্ঙ্গরব বলিলেন, "রাজাটি তো ভালো, ভাগ্যবান্, কখনো অন্যায করেন না। নিতান্ত ছোটোলোকেও অপথে যায় না, কিন্তু আমার নির্জনে থাকা অভ্যাস কিনা, তাই এই জনাকীর্ণ জায়গাটা ঠিক যেন আগুন-লাগা ঘরের মতো বোধ হইতেছে। আশ্রমে তো আগুন না লাগিলে এত লোক কখনো জমা হয় না।" "নিতান্ত ছোটোলোকেও অপথে চলে না", এই কথাটা পড়িলে মহাভারতে ছোটোলোকে ঋষিদের উপর যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সেটা মনে পড়ে।

পুরোহিত যখন রাজার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "দেখো, এত বড়ো রাজা তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য আগেই আসন ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছেন", তখন শার্ঙ্গরব মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিলেন, "এটা প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু আমরা এটা একটা খুব বড়ো কথা বলিয়া মনে করি না। কারণ, গাছগুলা ফল হইলেই নুইয়া পড়ে। নূতন জলের সময় মেঘগুলা অনেক নামিয়া আসে। সৎপুরুষেরা সমৃদ্ধির সময়েই নম্র হয়। পরোপকারকের স্বভাবই এই।" যখন শিষ্টাচারের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের তপস্যায় তো কোনো বিঘ্ন হয় নাই?" রাজা মনে করিয়াছিলেন, তপস্যার বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়াই হয় তো ঋষিরা আসিয়াছেন। তখন

ঋষিরা সকলে একসুরে বলিলেন, "আপনি যখন রক্ষা করিতেছেন, তখন তপস্যার বিঘ্ন কিরূপে হইবে? সূর্য প্রকাশ থাকিতে কি অন্ধকার আসিতে পারে?" রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণ্বমুনির কুশল?" তখন আবার একবাক্যে উত্তর হইল, "যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ, কুশল তো তাঁহাদের আপনাদেরই হাতে। তিনি আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া এই কথাটি বলিয়াছেন।" রাজা— "কী বলিয়াছেন?" তখন শার্ঙ্গরব বলিলেন, "আপনি গান্ধর্ববিধানে পরস্পরে নিয়ম করিয়া আমার এই কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাহাতে আমি খুশি হইয়াছি এবং আপনার এই কাজের পোষকতা করিতেছি। আপনি বড়োলোকের অগ্রগণ্য, শকুন্তলা সৎকার্যের মূর্তি। অনেক দিনের পর সমানে সমানে বর ও কনে মিল করাইয়া দিয়া বিধাতা নিন্দার হাত হইতে এড়াইয়াছেন। ইনি এখন গর্ভবর্তী, ইঁহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করুন, আর ইঁহার সঙ্গে ধর্মকর্ম করুন।" শুনিয়া রাজা বলিলেন, "এ আবার কী কথা?" শার্ঙ্গরব বলিলেন, "এ কী? কখন্ কী করিতে হয়, আপনারাই জানেন। স্ত্রীলোক বিবাহের পর যদি জ্ঞাতিকুলেই থাকে, লোকে নানা রকম আশঙ্কা করে। সেই জন্যই বন্ধুবান্ধবে স্বামী ভালো-না-বাসিলেও, তাহাকে স্বামীর কাছেই পাঠাইয়া দেয়।" রাজা যখন বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া মনেই করিতে পারিলেন না, তখন শার্ঙ্গরব রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কী, যে কাজটা করা হইয়াছে, তাহা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া রাজার কি উচিত, ধর্মে জলাঞ্জলি দেওয়া?" "আমি অসৎ অভিপ্রায়ে এ কথা বলিতেছি, আপনি মনে করিলেন কিসে?" তখন শার্ঙ্গরব অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যারা ঐশ্বর্যে মত্ত, তাদেরই কেবল এই রকম বিকার হয়।" অর্থাৎ একবার করে, পরে বলে "না"। রাজা বলিলেন, "আপনারা আমাকে বড়োই তিরস্কার করিতেছেন।" এই সময়ে গৌতমী ঘোমটা খুলিয়া শকুন্তলার মুখ দেখাইলে অনেকে অনেক রকম ভাবিতে লাগিল। কেহই কথা কহে না। শার্ঙ্গরবের দেরি সহে না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কী মহারাজ, চুপ করিয়া রহিলেন যে।" রাজা তখনো মনে করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আমার তো কিছুই মনে হয় না, তখন এই গর্ভবতীকে কেমন করিয়া 'স্ত্রী' বলিয়া গ্রহণ করি?" তখন শার্ঙ্গরব একেবারে অগ্নিশর্মা। "তুমি তো ঋষির উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছ। তথাপি ঋষি তোমার কার্যে দোষ দেখেন নাই। তুমি দুষ্কার্য করিলেও তিনি তোমার অনুকূলেই মত দিয়াছেন। এখন কিনা তুমিই তাঁহাকে অপমান করিতে বসিলে।

তুমি তাঁহার বাড়িতে ডাকাতি করিয়াছ। তিনি চোরাই মাল তোমার হাতে সঁপিয়া দিতেছেন। তাহার পর তোমার এই ব্যবহার।"

শকুন্তলা যখন নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়াও রাজার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেন না এবং 'হায়, আমি পুরুবংশের রাজা বলিয়া এই কপটাচারীকে বিশ্বাস করিয়া এখন কিনা স্বৈরিণী, স্বেচ্ছাচারিণী, বেশ্যা হইলাম' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন শার্ঙ্গরব আর শকুন্তলার প্রতি কোমল ভাব দেখাইতে পারিলেন না, উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "নিজে দুষ্কার্য করিয়াছ, এখন তাহার ফল পাইলে। এইজন্যই লোকে বলে, গোপনে প্রেম করিতে গেলে বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া করিতে হয়। যাহার মনের ভাব জানি না, তাহার সঙ্গে ভাব করা তো নয়, শত্রুতা ডাকিয়া আনা।" শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তোমরা তো বেশ, তোমরা উহাকেই বিশ্বাস করিতেছ, আর আমার উপরই সব দোষ চাপাইতেছ।" তাহাতে আরো রাগিয়া, আরো চটিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন, "শুনিলেন, আপনারা শুনিলেন, কী জঘন্য উত্তর হইল, শুনিলেন; যে-লোক শঠতা কাহাকে বলে জানে না, তাহার কথায় আমরা বিশ্বাস করিব না, আর যাহারা পরকে ঠকানো-"বিদ্যা" বলিয়া অভ্যাস করে, তারই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইব?"

রাজা যখন বলিলেন, "অহে সত্যবাদি! মানিয়া লইলাম, আমরা ঠকানো বিদ্যাই শিখিয়াছি, কিন্তু বলো দেখি, এই বালিকাটিকে ঠকাইয়া আমার কী লাভ হইবে?"

"লাভ নিপাত।"

"পৌরবে নিপাত যায়, এ কথাটা কেহই শ্রদ্ধা করিবে না।"

ক্রমে যখন শকুন্তলাকে রাজার কাছে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল, তখন শকুন্তলা অসহায়া হইয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন। তখন গৌতমী শার্ঙ্গরবকে বলিলেন, "শকুন্তলা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। রাজা যখন নিলেনই না, তখন বেচারা কী-ই বা করে।"

তখন শার্ঙ্গরব বেগে ফিরিয়া আসিল এবং বড়োই রাগ করিয়া বলিল, "অরে দুশ্চারিণি, তুই আবার আপনার ইচ্ছামতো কাজ করিতেছিস্। রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তুই তো কুলটা, তোকে নিয়ে তোর বাবা কী করিবে? আর তোর মন যদি জানে, তুই খাঁটি, তবে পতিগৃহে তোর দাস্য করাই ঠিক।" এইবার কঠোরতার চরম হইল।

এই তো গেল শার্ঙ্গরবের কথা। তাঁহার আর যে সঙ্গীটি আছেন শারদ্বত,

তিনি তো কথাই কন না। তিনি আপনাকে বড়োই পবিত্র ও শুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। রাজারা বাড়িতে আসিয়া মেলা লোকজন দেখিয়া শার্ঙ্গরব যখন রাজবাড়িটাকে আগুন-লাগা ঘরের মতো মনে করিতেছিলেন, শারদ্বত তখন বলিলেন, "নগরে আসিয়া তুমি তো এইরূপ হইয়া গিয়াছ, কিন্তু আমার আর-এক রকম ধারণা। স্নান করিয়া উঠিলে তেলমাখা লোককে যেমন অপবিত্র মনে হয়; যাহারা শুচি, তাহারা অশুচিকে যেমন অপবিত্র বলিয়া মনে করে; যে জাগিয়াছে, সে ঘুমন্তকে যেমন মনে করে; যে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছে, সে কয়েদিকে যেমন মনে করে; আমি সুখে আসক্ত এই নগরবাসী লোককে তেমনই দেখিতেছি।" তিনি সত্যই আপনাকে এ-সকলের উপরে বলিয়া মনে করেন, আর অনাসক্তভাবে ইহাদের কার্যকলাপ দেখেন। দেখেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার চক্ষে যেন কিছুই নয়। ইহার পর তিনি দুইবার কথা কহিয়াছিলেন। যখন শার্ঙ্গরব রাজাকে চোর ডাকাত প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি করিতেছিলেন, তখন শারদ্বত তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি থামো, শকুন্তলা, আমাদের যাহা বলিবার, বলিলাম। রাজা এইরকম বলিতেছেন, এখন তুমিই উত্তর দাও, উঁহার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা করো।" এই কথাগুলিতে অনেক কথার মীমাংসা হইয়া গেল। মিছা ঝগড়া করিয়া আমরাই বা কী করিব, শার্ঙ্গরবই বা কী বলিবে, এ সময় একজনমাত্র কথা কহিতে পারে, সে শকুন্তলা। তাহাকে তিনি বলিলেন, রাজার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তুমি তাহা করো। এই কথার পর শার্ঙ্গরব অনেকক্ষণ আর কথা কহেন নাই। শকুন্তলা যাহা বলিবার, বলিল; যাহা মনে করিয়া দিবার, দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাজা শকুন্তলাকে যাহা ইচ্ছা তাই বলিলেন, শার্ঙ্গরব আবার মুখ ধরিল; শকুন্তলাকে গালি দিল। রাজাকে নিপাত দিল। তখন শারদ্বত রাজাকে বলিলেন, "আমরা গুরুর আজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছিলাম, পালন করিলাম; এখন আমরা ফিরিয়া যাই। ইনি তোমার পত্নী, তা তুমি ত্যাগই করো, আর ঘরেই লও। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, গৌতমি, চলো।" শকুন্তলার বিবাহে শারদ্বতের সন্দেহই নাই। কারণ, গুরুর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি; গুরু মিথ্যা কখনোই বলিবেন না। শার্ঙ্গরবের সন্দেহ একটু ছিল, তাই তিনি শেষ বলিয়া ফেলিলেন, 'যদি রাজা যাহা বলিলেন, তাহা সত্য হয়, তুমি কুলটা, পিতা তোমায় লইয়া কী করিবেন?" তাঁহার 'যদি' আছে। শারদ্বতের 'যদি' নাই। তিনি রাজাকে বলিলেন, "ইনিই তোমার পত্নী" ইত্যাদি। শাবদ্বত কণ্বের দৃঢ়তার মূর্তি, শার্ঙ্গরব তাঁহার কঠোরতার মূর্তি।

মহাভারতে একা শকুন্তলাই সব করিয়াছিলেন; রাজার পরিচয় লইয়াছিলেন, নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। গান্ধর্ববিধানে পুরুত ডাকাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কারণ, বিবাহ বিধিমত না হইলে সন্তান ভালো হয় না। পিতার কাছে বিবাহের কথা আপনিই বলিয়াছিলেন; পিতার যাহাতে রাজার উপর রাগ না হয়, সেজন্য তাঁহার নিকট বর চাহিয়াছিলেন। নিজেই পুত্রের সঙ্গে রাজবাটি গিয়াছিলেন; রাজার সহিত সদর্পে কথা কহিয়াছিলেন। রাজা কটুকথা কহিলে তাহার উপযুক্ত কটু উত্তর দিয়াছিলেন। পুত্রের হাত ধরিয়া রাজসভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। শেষ যখন দৈববাণী হইল, তখন রাজা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন; বলিলেন, "লোকে বিশ্বাস করিবে কেন বলিয়া আমি জানিয়াও তোমার বিবাহ স্বীকার করিতে পারি নাই। এখন দেবতারা লোকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, আমি স্বীকার করিলাম। তুমি আমায় কটুকথা বলিয়াছ, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। আমার অপরাধও তুমি ক্ষমা করো।" তাহার পর মিলন হইল। পুত্রও যুবরাজ হইলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-য় সেই একজনের জায়গায় শকুন্তলাকে লইয়া ছয়-জন হইল কেন? ছয়-জনের কম হইলে কি হইত না? দু-জন তিন-জনে হইত না? মহাভারতে বারো বছরের ছেলে লইয়া শকুন্তলা রাজবাড়ি গেলেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-য় গর্ভাবস্থায়। মহাভারতে দৈববাণী হইল রাজা ত্যাগ করার পর, আর এখানে দৈববাণী হইল, কণ্বমুনির আসার দিন। মহাভারতে ছেলে হলে দেবতারা বর দিলেন, এই ছেলে শত অশ্বমেধ করিবে, সারা পৃথিবীর রাজা হইবে। এখানে মিলনের সময় মারীচ ঐ বব দিলেন। পুরানো গল্পটি এত বদল করা হইল কেন?

ইহার কারণ এই যে, মহাভারতে শকুন্তলার গল্পটি উপাখ্যান-গল্প মাত্র, সব গল্পই কিছু নাটকে সাজে না, খাপ খায় না। তাই গল্পটিকে নাটকের মতো করিয়া সাজাইয়া লইতে হয়। তাহার উপর আবার মহাভারত রচনার সময় সমাজে একরকম অবস্থা ছিল, কালিদাসের সময় আর-একরকম হইয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রীলোকের অতটা বাচালতা সাজে না। মন্ত্রতন্ত্রের উপর আস্থাও বোধ হয় একটু কমিয়া গিয়াছে; গান্ধর্ববিধানে বিবাহেও পুরুত ডাকিতে হয়, সেকথা বোধ হয় লোকে ততটা পছন্দ করে না। তারপর কাব্যের রীতিপদ্ধতিও অনেক বদলাইয়া গিয়াছে; এখন বাঁধনি-গাঁথনির উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কোন্‌টার পর কোন্‌টা

লিখিলে ভালো শোনায়, ভালো দেখায়, সে বিষয়ে লোকের বেশ নজর আছে, এখন সামাজিক অর্থাৎ সমজদার বলিয়া একদল লোকের জ্বালায় কবিরা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এখন তাহারাই প্রবল; কবিকে তাহাদের খাতির করিয়া চলিতে হয়। নেহাত বৈষ্ণব কবিদের মতোও নয় যে বলিবে, "যে আমার কবিতায় দোষ দিবে, তাহার মাথায় সাত জুতো।" অথবা এখনকার কবিদের মতো তো নয় যে বলিবে, "যে আমার কবিতায় দোষ দিবে, সে মূর্খ" বলিয়া গাল দিয়াই জিতিয়া যাইবেন। সামাজিকের ভয়ে তখন কবি অস্থির, তাই কালিদাস যদিও মহাভারত অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন, মহাভারত-এর সব ঘটনাও রাখিয়াছেন, তবুও সেগুলি নাটকের মতো করিয়া লইয়াছেন, সময়ের মতো করিয়া লইয়াছেন। সামাজিকদের মনঃপূত হইবার মতো করিয়া লইয়াছেন।

মহাভারতে শকুন্তলা আপনিই রাজার পরিচয় লইয়াছেন ও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এটা কালিদাস রুচিবিরুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, তাই অনসূয়ার সৃষ্টি। অনুসূয়া যেন শকুন্তলার ভাট বা চারণ। শকুন্তলা লইয়াই তিনি থাকেন। শকুন্তলা ধ্যান, শকুন্তলা জ্ঞান। ভোরে উঠিয়া শকুন্তলার ভাবনা। শকুন্তলার জন্য বকুলমালা গাঁথিয়া রাখা, শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতাদের পূজা করা ইত্যাদি। তিনি শুদ্ধ শকুন্তলা লইয়াই থাকেন। আবার দেখুন, মহাভারতে আজ্য, হবি, লাজ, সিকতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিবাহের যত কাজ, সবই শকুন্তলা করিয়াছেন। এসব কালিদাসের সময়ে শকুন্তলা যদি করেন, তবে তাঁহার নিন্দা করিবে; সুতরাং ও-সকলের জন্য প্রিয়ংবদার সৃষ্টি হইয়াছে। কেন, অনসূয়াকে দিয়া চলিত নাকি? না, চলিত না। কোনোরূপ চিন্তা আসিয়া পড়িলে অনসূয়া গুটাইয়া যান, মনের মধ্যে মন রাখিয়া কেবল ভাবেন, তাঁহার স্ফূর্তি থাকে না। তাই স্ফূর্তিওয়ালা একটি মেয়ে চাই। সেটি কালিদাসের প্রিয়ংবদা— বেশ চালাক চট্‌পটে। মহাভারতে গান্ধর্ব বিবাহের উদ্যোগ— আজ্য, হবি, লাজ, সিকতা, ব্রাহ্মণ। নাটকে তাহার উদ্যোগ— মদন-লেখ, পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে লেখা, নির্মাল্য যাবে রাজার আশীর্বাদের জন্য, তার সঙ্গে সেই পদ্মপাতাখানি দেওয়া, দু-কলসি জল ধারে বলিয়া শকুন্তলাকে যাইতে না দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উদ্যোগপর্বের জন্য প্রিয়ংবদা চাই। গৌতমীকেও চাই। নহিলে লতাগৃহ হইতে শকুন্তলাকে কে উঠাইয়া আনিবে? অনসূয়া পারে না, প্রিয়ংবদা পারে না, সুতরাং একটা বুড়ি চাই। দাদাকে ডুমুরতলা থেকে বিদায় করা চাই। শার্ঙ্গরব পারিল না, আর কেহ পারিল না, গৌতমী ফিরাইলেন।

রাজবাটিতে রাজা যখন শকুন্তলাকে চিনিতে চাহেন না, তখন শকুন্তলার ঘোমটা খুলিয়া কে মুখ দেখাইবে? শার্ঙ্গরব পারেন না, শারদ্বত পারেন না, তাই গৌতমীর সৃষ্টি। এ তিনটির কোনোটিই উপেক্ষিতা নহে; সকলেরই একটা-না-একটা কাজ আছে। সে কাজ শেষ হইল, অমনি সে সরিয়া গেল। ইহাকে যদি উপেক্ষিতা বলা হয়, তাহা হইলে জগতের সকলেই উপেক্ষিতা নয় কি?[১]

মহাভারতে শকুন্তলা নিজেই রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন। কিন্তু কালিদাস শকুন্তলার মুখে ও-সকল দিতে রাজি নন, তাই সঙ্গে দুটি শিষ্য পাঠাইলেন। একটি ঝগড়া করিবে, আর-একটি মিটাইয়া দিবে। এইরূপে একটির জায়গায় কালিদাসকে পাঁচটি ছয়টি করিতে হইয়াছে। কোনোটি নহিলেই নাটক চলিত না। আর-একটির জায়গায় ছয়টি করিয়া কালিদাস শকুন্তলাখানিকে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক করিয়া তুলিয়াছেন।

নারায়ণ
আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের "কাব্যের উপেক্ষিতা" প্রবন্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭-এর ভারতী পতিরকায় প্রকাশিত, পরে 'প্রাচীন সাহিত্য' বইয়ে সংকলিত "কাব্যের উপেক্ষিতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের লক্ষ্মণ-পত্নী ঊর্মিলা, বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী'-র পত্রলেখা এবং শকুন্তলা নাটকের অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র চারটিকে কাব্যের উপেক্ষিতা চরিত্র বলেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, এ চারটি চরিত্রকে কাহিনীর মধ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করা হয়নি। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, "তাঁহারা ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল; নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।"

"কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি, প্রিয়ংবদা-অনসূয়া শকুন্তলার কতখানি ছিল, তখন সেই কণ্বদুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়বিচারসংগত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর।"

হরপ্রসাদ একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিতে নাট্য-ক্রিয়ার প্রাসঙ্গিতার দিক থেকে চরিত্রদুটির অবস্থা বিচার করেছেন।

শকুন্তলার মা

শুন্তলার মা মেনকা। স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাদের সেরা। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারী। বিশ্বামিত্রের ভয়ানক তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি মেনকাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "উহার তপস্যার বিঘ্ন করো।" মেনকা আপনার অপরূপ রূপ লইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ হইল, মেনকার এক কন্যা হইল। কন্যাটিকে তিনি ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কণ্বমুনি মেয়েটিকে কুড়াইয়া আনিয়া পালন করিলেন। সেই মেয়েটিই শকুন্তলা।

মহাভারতে এই গল্পটি একটু অন্যরূপ। মেনকা যাইতে চাহেন না। কেন-না, ঋষি বড়ো রাগি লোক, পাছে রাগ করিয়া শাপ দিয়া বসেন, সেই ভয়ে তিনি যাইতে চাহেন না। ইন্দ্র পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। মেনকা বলিলেন, "দেখুন, আপনি যাঁহার ভয়ে অস্থির, আমায় তাঁহার কাছে পাঠাইতেছেন কেন? তিনি জোর করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বশিষ্ঠকে নিঃসন্তান করিয়াছেন। আপনার শৌচের জন্য তিনি এক প্রকাণ্ড নদী বহাইয়া দিয়াছেন। যাঁহার দুর্গে মহর্ষি মতঙ্গ ব্যাধ হইয়া আপনার স্ত্রীপুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় যিনি আশ্রমে আসিয়া পারা নামে নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মতঙ্গের জন্য যজ্ঞ করিলে, আপনি ভয়ে তথায় সোমপানের জন্য যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যিনি নক্ষত্র দিয়া অপর একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুকে গুরু শাপ দিলে তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে স্বর্গের রাজ্য পর্যন্ত দিয়াছিলেন। যিনি এমন প্রবলপ্রতাপ, আপনি আমায় কোন্ সাহসে তাঁহার কাছে পাঠাইতেছেন?" ইন্দ্র আরো পীড়াপীড়ি করিলেন; মেনকা রাজি হইলেন; কিন্তু শর্ত রহিল যে, আমার সঙ্গে মদন ও বায়ু

যাইবেন। মেনকা ঋষির নিকটে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বায়ু তাঁহার কাপড় উড়াইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি সেই কাপড় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দু-জনের মিলন হইল ও শকুন্তলার জন্ম হইল। মেয়েটিকে ফেলিয়া মেনকা স্বর্গে গেলেন। ঋষিও সরিয়া পড়িলেন। পাখিরা দেখিল, এমন মেয়েটি হিমালয়ের নিবিড় জঙ্গলে পড়িয়া আছে, এখনই বাঘে খাইয়া ফেলিবে। তাহারা ঘেরিয়া লালন-পালন করিতে লাগিল। তাই তাহার নাম শকুন্তলা। পাখিরা একদিন কণ্বমুনিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া মেয়েটিকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিল। শকুন্তলা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি আমরা মহাভারতেই পাই; অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-য় ইহার নামমাত্রও নাই।

কিন্তু মেনকা কি শকুন্তলাকে ভুলিয়া ছিলেন? তাহা তো বোধ হয় না। শকুন্তলার গল্প পড়িলেই মনে হয়, একটা-না-একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহার অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিতেছে; তাঁহার গতিবিধি দেখিতেছে ও যাহাতে তাঁহার ভালো হয় করিতেছে। মহাভারতে ছেলে হইবামাত্রই দেবতারা আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, আবার রাজা তাড়াইয়া দিলে দৈববাণীতে দেবতারা বলিয়া দিলেন যে, এ ছেলে তোমারই। তুমি শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে গোড়া হইতেই আমরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই। প্রথম অঙ্কে রাজা যেন নিয়তি-প্রেরিত হইয়াই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রানীদের নিমন্ত্রণও যেন সেই নিয়তিরই খেলা। চতুর্থ অঙ্কে দৈববাণীও নিয়তির কাজ। বনদেবতাদের হাত বাহির করিয়া গহনা দেওয়া অলৌকিক শক্তির বিকাশমাত্র। পঞ্চমে তো স্ত্রীরূপধারী একটি জ্যোতিঃ শকুন্তলাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ষষ্ঠে মেনকার এক সখী সর্বদাই উপস্থিত। সপ্তমে মেনকা স্বয়ং মারীচের আশ্রমে উপস্থিত আছেন। অতএব মেনকা মেয়েটিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বর্গ হইতে তাহার মঙ্গলের জন্য সর্বদাই উহার উপর চোখ রাখিতেন। অপ্সরা-মহলের সকলেই জানে, শকুন্তলা মেনকার মেয়ে। সকলেই শকুন্তলার মঙ্গলকামনা করিত।

শার্ঙ্গরব যখন শকুন্তলাকে কুলটা বলিয়া তাহাকে পতিগৃহে দাস্য করার কথা

বলিলেন, তখন রাজা বলিলেন, "আপনারা কেন উহাকে ঠকাইতেছেন? চাঁদ কুমুদিনীকেই চায়, সূর্য কমলিনীকেই চায়; ভদ্রলোকের মন কখনোই পরের স্ত্রীকে চায় না।" অর্থাৎ শকুন্তলা আমার স্ত্রী নহে, আমি উহাকে বাড়িতে দাস্যবৃত্তি করিতেও দিতে রাজি নহি। তখন শার্ঙ্গরব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, যদি আপনারই ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কী হইবে?" তখন রাজা পুরোহিত সোমরাতকে মধ্যস্থ মানিলেন; বলিলেন, "আপনাকেই আমি মধ্যস্থ মানিতেছি, বলুন দেখি, আমিই ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা এ-ই মিথ্যাকথা কহিতেছে;— এইরূপই যখন সন্দেহ— তখন আমি কী করি? স্ত্রী ত্যাগ করিয়া পাপী হইব অথবা পরস্ত্রী গ্রহণ করিয়া পাতকী হইব? এই দুই-এর মধ্যে কোন্‌টা গুরু আর কোন্‌টা লঘু, আপনিই আমায় উপদেশ দিন।" পুরোহিত মহাশয় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, আপনার প্রথম সন্তানে চক্রবর্তী রাজার সব লক্ষণ থাকিবে। যদি কণ্বমুনির দৌহিত্রের—আপনার পুত্র বলিতে যখন আপনি সংকোচ করিতেছেন, তখন কণ্বমুনির দৌহিত্র বলাই ঠিক— সেই-সব লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন; নচেৎ ইনি বাপের বাড়িই যাইবেন; এখন ইনি আমার গৃহেই থাকুন।" রাজা তাহাতে রাজি হইলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দেহ গেল না, তিনি খুশি হইলেন না।

শকুন্তলাকে লইয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীরাও গেলেন। রাজা এই চিন্তায়ই মগ্ন হইয়া খানিক বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে নেপথ্যে শব্দ হইল— "আশ্চর্য" রাজা চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, পুরোহিত মহাশয় আসিয়াছেন; তাঁহার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। ক্রমে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, "কণ্ব-শিষ্যেরা চলিয়া গেলে মেয়েটি আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিল আর হাত তুলিয়া তুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর অমনি অপ্সরাদের যে ঘাট আছে, সেইখান হইতে একটা জ্যোতিঃ নামিয়া আসিল; জ্যোতিটার আকার একটি স্ত্রীলোকের মতো। সে উহাকে লইয়া উপরদিকে উঠিয়া গেল।" রাজা বলিলেন, "ও কথায় আর কাজ কী? আপনি বিশ্রাম করুন্ গে, আমিও বড়ো আকুল হইয়াছি, শুই গিয়া।"

এখন সকল বড়ো বড়ো নগরেই অনেক ঘাট থাকে। হস্তিনায় শচীরঘাট ছিল। সেইখানেই গৌতমী বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার আঙ্‌টি হারাইয়া

গিয়াছে। আর-একটি ঘাট ছিল, তাহার নাম অপ্সরাতীর্থ। সেখানে, আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি, পালা করিয়া অপ্সরারা পাহারা দিত। মেনকার মেয়ের এই দুর্দশা দেখিয়া সেদিনকার অপ্সরা তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল; মেনকার কাছে তাহাকে দিয়া আসিল। বিষম সংকট সময়ে মেনকার দ্বারাই শকুন্তলার উদ্ধার হইল।

শকুন্তলার মা কি এই উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন? তাহা নহে। তাহার জন্য সকল অপ্সরাই ব্যস্ত— কিসে রাজবাড়ির খবর পাইব; কেমন করিয়া রাজা শকুন্তলাকে আবার গ্রহণ করিবেন। একদিন অপ্সরাতীর্থে সানুমতী অপ্সরার পালা ছিল। সে পালা খাটিয়া মনে করিল, "যাই; রাজবাটীর খবর লইয়া যাই। মেনকার সম্পর্কে শকুন্তলা তো আমার মেয়েরই মতো। মেনকা তো আমায় বলিয়াই দিয়োছেন যে, তুমি সর্বদা রাজার বাড়ির খবর লইবে। আচ্ছা, এই তো বসন্তকাল পড়িয়াছে; এই সময় তো উৎসব হয়; আজ তাহার নামও নাই কেন? আমি ধ্যানে জানিতে পারি; কিন্তু তা হলেও এ খবরটা চোখে দেখাই ভালো। কারণ, তা হলে মেনকার উপর আদর দেখানো হইবে। যা হোক, আমি অদৃশ্য থাকিয়া এই মালিনীর ব্যাপারটা দেখি। মালিনীরা উৎসবের জন্য আমের বউল তুলিতেছে আর গল্প করিতেছে ও বউল দিয়া মদনের পূজার আয়োজন করিতেছে। এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোরা বউল ছিঁড়্‌চিস্ যে? জানিস্ না, উৎসব বন্ধ, রাজা নিজে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন?" তাহারা বলিল, "আমরা নূতন আসিয়াছি, জানি না। হাঁ মহাশয়, কেন রাজা এমন হুকুম দিলেন?" সানুমতী মনে মনে বলিল, "কোনো গুরুতর কারণ অবশ্যই থাকিবে।" কঞ্চুকী বলিল, "আপনার একটি আঙ্‌টি পাইয়া রাজার ঠিক মনে হইয়াছে যে, ঋষির যে কন্যাটিকে সেদিন তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে সত্য সত্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মনে বড়ো কষ্ট হইয়াছে। সেই জন্যই উৎসব বন্ধ।" মালিনীরা চলিয়া গেল। সেইখানে রাজা আসিলেন, বিদূষক আসিলেন, আর প্রতিহারী আসিলেন। রাজাকে দেখিয়াই সানুমতী মনে মনে বলিলেন, "তাড়াইয়া দিলেও শকুন্তলা যে আজও রাজার জন্য ঝোরে, তা ঠিক।" রাজা যখন বলিলেন, "আহা, সে বেচারা আমার মনে করাইয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করিল, তখন তো আমি বুঝিলাম না, এখন মনে হওয়াটা কেবল অনুতাপেরই কারণ হইল।" সানুমতী শুনিয়া মনে মনে বলিল,

"বেচারার ভাগ্যই এমনি।" রাজা সেখান হইতে মাধবীলতাকুঞ্জে গেলেন: সানুমতীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা যখন অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন সানুমতী একটু খুশি হইলেন; কিন্তু বলিলেন, "আমরা এমনি স্বার্থপর যে, এ বেচারা কাঁদিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর আমার আমোদ হইতেছে।"

রাজা যখন বলিলেন, "শকুন্তলার মা মেনকা, তাই বোধ হয়, কোনো অপ্সরা তাহাকে লইয়া গিয়াছে", তখন সানুমতী বলিলেন, 'ইহার যে ভুল হইয়াছিল, সেইটাই আশ্চর্য: মনে পড়া তো কিছু আশ্চর্য নয়।" রাজা যখন অঙ্গুরিটিকে তিরস্কার করিলেন, সানুমতী বলিলেন, "এটি যদি আর কাহারো হাতে পড়িত, সত্যই তিরস্কারের যোগ্য হইত।" রাজা যখন বলিলেন, "এই আঙ্‌টিটি হাতে পরাইবার সময় বলিয়াছিলাম, আমার নামের অক্ষরগুলি রোজ একটি একটি করিয়া গুণিতে থাক; যে দিন শেষ হইবে, সেই দিনই আমার লোক তোমায় লইতে আসিবে।" সানুমতী বলিলেন, "এমন সরতও [শর্তও] ভাঙে।"

বিদূষক বলিলেন, "জেলের মাছের মধ্যে গেল কী করিয়া?" রাজা বলিলেন, "শচীতীর্থে স্নান করিতে গিয়া হারাইয়া গিয়াছিল।" সানুমতী বলিলেন, "এই জন্যই রাজার বিবাহে সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে এত ভালোবাসা, সেখানে কেন অভিজ্ঞান চাহিতে হইবে, বুঝি না।" চতুরিকা যখন শকুন্তলার ছবি আনিয়া রাজার হাতে দিল, সানুমতী বলিলেন, "বাঃ. রাজা তো বেশ আঁকিতে পারেন। সখী যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।" রাজা যখন ছবিটির আলোচনা করিতে লাগিলেন, সানুমতী বলিলেন, "রাজার যেমন স্নেহ, যেমন মমতা, তার মতোই আলোচনা হইতেছে।" বিদূষক যখন বলিল, "এ তিনটির মধ্যে কোনটি শকুন্তলা?" তখন সানুমতী মনে মনে বিদূষককে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সে যখন বলিল, "এমন ছবি, ইহাতে আবার কী লিখিবে?" তখন সানুমতী মনে করিলেন, "সখী যে-সকল জায়গা ভালোবাসে ও তাহার যে সাজ বনবাসে সাজে, এসব না লিখিলে তো ছবিখানা পুরা হয় না।" এইরূপে সানুমতী দেখাইতেছেন, তাঁহারা অপ্সরারা, ছবি আঁকায় এক-এক জন দক্ষ বৃহস্পতি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাজাও তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, সানুমতীও তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। রাজা ভোমরাটাকে শাস্তি দিবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় বিদূষক বলিল, "এ যে ছবি, করো কী?" তখন সানুমতী বলিলেন, "আমারই ভ্রম হইয়াছিল; রাজার তো হবেই; ইনি যে নিজে ভেবে

লিখেছেন।” রাজা মনে করিতেছিলেন, সত্য সত্যই শকুন্তলা সামনে রহিয়াছেন। এখন ওটা ছবি শুনিয়া তিনি একেবারে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। সানুমতী বলিলেন, “রাজার এ বিরহটার গতি বুঝা যায় না; এর আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নাই।” রাজা বড়োই বিলাপ আরম্ভ করিলেন, সানুমতী বলিলেন, “সখীকে তাড়াইয়া দিয়া রাজা যে দুঃখ দিয়াছেন, সে দুঃখটা এখন মুছে ফেলা উচিত।” দেবী বসুমতীর উপর রাজার ভাব দেখিয়া সানুমতী মনে করিলেন, “রাজার মন এখন অন্যের উপর হইলেও রাজা আগেকার ভালোবাসা ভুলেন নাই।” রাজা যখন “আমারও ছেলে নাই” বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন সানুমতী কহিলেন, “তোমার বংশ এখন লোপ করে কে?” আবার মূর্ছা গেলেন, তখন সানুমতী বলিলেন, “কী কষ্ট, দীপ রহিয়াছে, পর্দার দোষে অন্ধকার দেখিতেছেন। আমি এখনি ইঁহাকে সুখী করিতে পারি, কিন্তু দাক্ষায়ণী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিবার সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন যে, দেবতারা শীঘ্রই মিলন করাইয়া দিবেন। দিনকতক যাক না। কিন্তু এইসব কথা আমার মুখে শুনিলে তাঁহার নিশ্চয়ই আশা হইবে।” এই বলিয়া সানুমতী অদৃশ্য অবস্থাতেই উপরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই যে সানুমতীকে অদৃশ্য করিয়া আনা, ইহাও কালিদাসের একটা ভারি গুণপণা। ইহাতে রাজার কোনো উপকারই হইল না, তাঁহার উৎকণ্ঠা-নিবৃত্তি হইল না। না হওয়াই ভালো। যিনি অত সাধ্যসাধনার পরও শকুন্তলাকে নিলেন না, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কুলটা বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার যে একটু শাস্তি হয়, এটা সকলেই চায়। সানুমতী বলিয়াছেন, ইঁহার দুঃখে আমার সুখ হইতেছে। যারা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে, তাহাদেরও মনের ভাব তাই। কিন্তু সানুমতীকে এই ভাবে আনিয়া কালিদাস প্রেমিকবর্গের উৎকণ্ঠাটা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। আবার রাজাকে শকুন্তলার খবর না দিয়াও শকুন্তলাকে রাজার খবর দেওয়াইয়া তাহার মনেও আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস এ কৌশল কোথায় পাইলেন, জানা যায় না। ভাস কবির অবিমারক নামক নাটকে কতকটা এইরূপ কৌশল আছে।[১] একটি আঙুটি ডান হাতে পরিলে তাহাকে দেখা যাইত, আবার বাঁ হাতে পরিলে দেখা যাইত না। তাই থেকে যদি কালিদাস এই কৌশল লইয়া থাকেন, তাহা হইলে এটা এক রকম নূতন সৃষ্টিই বলিতে হইবে। কালিদাস কোথায় পাইয়াছেন, না জানিতে পারিলেও ভবভূতি যে কালিদাসের এই সানুমতীর

অদৃশ্য থাকা লইয়া একটি অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভবভূতি একজন সখীর সহিত সীতাকে অদৃশ্য করিয়া আনিয়াছেন এবং রামের অবস্থা দেখাইয়া নিজের দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছেন।[২] কালিদাস যেটা পরম্পরা সম্বন্ধে করিয়াছেন, ভবভূতি সেইটাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিয়াছেন।

আমরা কোথাও মেনকাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার কার্য সর্বত্র দেখিতে পাই। অনেক জিনিস তাঁহার কার্য নাও হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস মেনকাকে বাহির না করিয়া, এমনি কৌশল করিয়াছেন— যাহা তাঁহার কার্য নহে, তাহাও তাঁহার বলিয়া বোধ হয়। মারীচাশ্রমেও মেনকাকে আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু দাক্ষায়ণী বলিয়াছিলেন, তিনি এইখানেই আছেন। কেন আছেন? যেহেতু, আজ রাজার সহিত শকুন্তলার মিলনের দিন— আর মেনকা— শকুন্তলার মা।

নারায়ণ
কার্তিক, ১৩২৪

প্রাসঙ্গিক তথ্য।
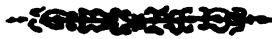
১ নাট্যকার কবি ভাসের জীবনকাল এবং ব্যক্তি পরিচয় খুব নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত একত্রিত করে ভাসের জীবনকাল ২য় থেকে ১১শ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে মনে করা যায়। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের সূচনায় কালিদাস সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত মান্য নাট্যকার ভাসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা এবং নিজের নবীন রচনার আকাঙ্ক্ষিত সমাদরের প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন। নাটকের শুরুতেই সূত্রধর পারিপার্শ্বিককে (নটকে) বলছে, আজ বসন্ত উৎসবে কালিদাসের লেখা 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক অভিনয় করতে আমায় অনুরোধ করা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলে বলে, তা হবে না। ধাবক (ভাস) - সৌমিল্ল কবিপুত্র (পাঠান্তর 'কবিরত্ন') প্রভৃতি প্রথিতযশ কবিদের প্রবন্ধ অতিক্রম করে বর্তমানের কবি কালিদাসের কৃতির এত বহু-মাননার কারণ কী? উত্তরে সূত্রধরকে দিয়ে কালিদাস বলালেন, নিতান্ত, বিবেকশূন্য কথা বললে! কাব্য পুরানো হলেই সব সাধু (সুন্দর বা শোভন) হবে, আর নতুন হলে (সাধু) হবে না— এমন হতে পারে না। সুধিজনেরা দোষগুণ পরীক্ষা করে যা উৎকৃষ্ট তার আদর করেন। আর মুর্খেরা পরের প্রত্যয়ের উপরে নির্ভর করে।

অসংশয়ে বলা চলে যেসব প্রতিষ্ঠিত কবির প্রতিপত্তির মুখে দাঁড়িয়ে কালিদাসকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়েছিল তাঁদের

মধ্যে ভাস অন্যতম মুখ্য ব্যক্তিত্ব। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি কালিদাস, বাণভট্ট, বাক্‌পতি, রাজশেখর প্রভৃতির রচনা থেকে ভাসের নামটি মাত্র জানা ছিল। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দ্রমে প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল ম্যানস্‌ক্রিপ্ট লাইব্রেরির অধ্যক্ষ রূপে পুথি সংগ্রহের সূত্রে ১৯১০ খৃস্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পদ্মনাভপুর নামে একটি জায়গায় এক মঠ থেকে মালয়ালি লিপিতে লেখা এক গুচ্ছ পুথি আবিষ্কার করেন এবং এই পুথিতে লিপিবদ্ধ নাটকগুলি ভাসের রচনা বলে প্রতিপন্ন করেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ১৩খানি নাটকের মধ্যে প্রসিদ্ধতম 'স্বপ্নবাসবদত্তা'।

'অবিমারক' নাটকের কাহিনীর রূপরেখা ভাস সম্ভবত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এর ষোড়শ লম্বকে বর্ণিত রাজা প্রসেনজিৎ ও তার মেয়ে কুরঙ্গীর কথা থেকে নিয়েছিলেন। নাটকের নায়ক অবিমারক মত্ত হাতির আক্রমণ থেকে রাজকন্যা কুরঙ্গীকে রক্ষা করে। পরস্পর রূপমুগ্ধ হলেও মিলনে প্রধান বাধা সমাজে অবিমারকের অন্ত্যজ অবস্থান। চোরের বেশে অবিমারক রাজপ্রাসাদের কন্যাপুরে প্রবেশ করে একবছর কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এ মিলন স্থায়ী হয় না। কন্যাপুর কঠোর ভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা হওয়ায় আর প্রবেশ করতে পারে না। বিরহকাতর অবিমারক আত্মহত্যার উদ্যোগ করে। পাহাড় চূড়া থেকে লাফ দেবার মুহূর্তে দেখা পায় মেঘনাদ নামে বিদ্যাধর এবং তার স্ত্রী সৌদামিনীর। বিদ্যাধর তাকে একটি অলৌকিক আঙটি দেয়। এ আঙটি ডান হাতে পরলে অদৃশ্য হবে, বাঁ-হাতে পরলে আবার দৃশ্যমান হবে। কাউকে ছুঁয়ে থাকলে তারাও অদৃশ্য হবে। আঙটির মায়ায় অদৃশ্য অবিমারক আর বিদূষক কন্যাপুরে প্রবেশ করে। অবিমারকের আঙটি পাবার ঘটনা বর্ণিত আছে নাটকের চতুর্থ অঙ্কে।

ভাস বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্র. DRAMA OF BHASA, *The Dacca Review*, Vol. IV, No. 10, Jan 1915.

২. 'উত্তররামচরিত'-এর তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা বিন্যাসে সীতাকে ভাগীরথীর বরে অদৃশ্য। মানুষতো নয়ই, কোনো বনদেবীও সীতাকে দেখতে পাচ্ছে না। সখী তমসা। তমসা নদীকেই চরিত্র করা হয়েছে।

দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য

সেকালের সব রাজাদের, সব বড়ো মানুষের এক-এক জন ভাঁড় থাকিত। তাহার সংস্কৃত নাম বিদূষক। ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখা-পড়া শিখে নাই, সংস্কৃত পড়ে নাই, সংস্কৃত বলিতে পারে না। অথচ সহবৎ ভালো, আচার ব্যবহার ভালো, কথাবার্তা, চাল-চলন, বসা-দাঁড়ানো, সব ভদ্রলোকের মতো; এমন-কী, ব্রাহ্মণের মতো। ক্ষুধাও ব্রাহ্মণের মতো, আহারেও ব্রাহ্মণের মতোই প্রবৃত্তি, কিন্তু লোক ভালো; স্নেহ আছে, দয়া আছে, মমতা আছে; নিজের কাজ ছাড়ে না, যা মনে করে, সেটা করিয়াই লয়। এমন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে সর্বদাই রাজার সঙ্গে থাকিত। দুঃখের সময় তাঁহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিত। যখন দেখিত নিতান্ত কাতর, তখন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইত, তাঁহার দুঃখ দূর করিতে সহায় হইত। আর পাকা দরবারি লোকের মতো অবসর বুঝিয়া কথা কহিয়া আপনার কাজ লইতে পারিত। তবে কেহ বা খুব চালাক চটপটে হইত, কেহ বা একটু বোকা বোকা হইত।

দুষ্মন্তের ভাঁড়টি একটু—[বি] শেষ ধরনের— একটু বোকা বোকা। মৃগয়ার সময়ে নিবিড় বনে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম দেখা। রাজা তো বনে বনে কেবল "ঐ হরিণ, ঐ শুয়োর, ঐ বাঘ" করিয়া জানোয়ারের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ান, আর দুপুরবেলা, পোড়ামাংস,— শিক-কাবাব খান— সোঁতার জল খান, সে জলে পাতা পচিয়া তিত হইয়া গিয়াছে। আর বিদূষক বেচারাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটি করিতে হয়, হাত পায় ব্যথা হয়। আর এরকম খাওয়া তার সহিবে কেন? রাত্রে ঘুম হয় না, রাত্রি থাকিতেই শিকারিরা মহা কোলাহল করিয়া বন ঘিরিতে যায়। বিদূষকের মনে মনে একটু গোদের উপর বিষফোঁড়া; ধিক্কার হইয়াছে,— এ ভাঁড়গিরি ভালো লাগিতেছে না। তাহার উপর আবার বনে একটা

মেয়ে দেখে রাজার মন তাহারই উপর পড়িয়াছে, তিনি বাড়ি যাইবার নামও করেন না। বিদূষক মনে মনে স্থির করিল, আজ আর কিছুতেই শিকারে যাইবে না। পারে তো কাহাকেও যাইতে দিবে না। সকালে উঠে রাজা আসিতেছেন দেখিয়া যেন হাত পা নাড়িতে পারিবে না, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা আসিলে বলিল, আজ আমি তোমায় মুখেমুখেই "জীব সহস্র" বলি; হাত তোলার আমার ক্ষমতা নাই। সোজা কথা বলিলে তো ভাঁড়ামি হয় না। রাজা গায়ের ব্যথা কিসে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, নিজেই চোখে কাটি দিয়া চোখে জল পড়ে কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ। রাজা বলিলেন, "বুঝিলাম না।" "আচ্ছা বেতগাছ যে কুঁজা হইয়া পড়িয়া থাকে, সে কি নিজের সাধে করে? না, নদীর বেগে করে?" "নদীর বেগেই করে।" "তা হলে আমার হাত পা, আপনার জন্যেই ব্যথা হইয়াছে। আপনি রাজার কাজ সব ত্যাগ করে তো শিকারি হইয়াছেন, কিন্তু আমার যে দেহের গাঁটগুলা কাঁড়া হয়ে যাচ্ছে, দেহ অবশ হয়েছে, আমায় অন্তত এক দিনের জন্য ছুটি দিন।" রাজাও ভাবিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি আমারো মৃগয়ায় বড়ো ঝোঁক নাই, এও এই রকম বলিতেছে, কী করি। রাজাকে ভাবিতে দেখিয়া বিদূষক বলিল, "তোমার মনে কী হইতেছে, জানি না, আমার যেন অরণ্যে রোদন হইল।" রাজা বলিলেন, "না না, আমি কি, সুহৃদের কথা লঙ্ঘন করিতে পারি।" বিদূষক ভারি খুশি হইয়া "চিরজীবী হও" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন, "একটু থাকো, আমি একটা সামান্য কাজে তোমার সাহায্য চাই।" পেটুক বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিল, "কী মোয়া খাওয়ার সাহায্য করিতে হইবে, তা হলে ঠিক লোক পাকড়াইয়াছ।" রাজা "বল্‌ছি" বলেই সেনাপতিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি আসিয়াই রাজার মন যোগাইবার জন্য মৃগয়ার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বন ঘেরা হইয়াছে, আপনি আর বসিয়া আছেন কেন?" রাজা বলিলেন, "মাধব্য মৃগয়ায় আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।" বিদূষকেরও যে দশা, সেনাপতিরও সেই দশা; তিনি বিদূষককে বলিলেন, "ভাই, খুব শক্ত হয়ে থাকো, আমি রাজার মন জোগাই।" রাজাকে বলিলেন, "ওটা মূর্খ, ওর কথা কি শুনিতে আছে। মৃগয়ায় কত লাভ, শরীর ভালো হয়, জানোয়ার চেনা যায়, লোকে চটপটে হয়, এত আমোদ কি আর কিছুতে আছে?" বিদূষক বলিল, "রাজা তো কতকটা পথে এসেছেন। তুমি যাও, বনে বনে ঘুরে ঘুরে ভালুকের মুখে পড়ো আর সে তোমার নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে যাক্।" যাহোক, রাজা

মৃগয়া বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন; বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন সৈনিকেরা তপোবনে অত্যাচার না করে" বিদূষক বলিলেন, "কেমন, বড়ো যে উৎসাহ দিতে এসেছিলে।" সেনাপতি চলিয়া গেলেন। রাজা দরোয়ানকেও বিদায় করিয়া দিলেন।

মাধব্য বলিল, "একেবারে মাছিটি পর্যন্ত যে তাড়াইলেন। এখন এস, এই গাছতলায় বসা যাক, লতায় লতায় এর তলায় বেশ ছায়া হইয়াছে।" বসিলে পর, রাজা বলিলেন, "দেখিবার যে জিনিস, তাহা দেখিলে না, তোমার চক্ষু সার্থক হ'ল না।" মাধব্য বলিল, "কেন, আপনিই তো সম্মুখে আছেন।" বিদূষক বেশ বুঝিয়াছিল, রাজা সেই মেয়েটার কথাই পাড়িবেন, তাই যাতে সেটা না পাড়িতে পারেন, সেই জন্য রাজার চেহারার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ, সে ঠিক জানিত— সে বেশ জানিত যে, নিজের চেহারার প্রশংসা করিলে খুশি হয় না, এমন লোক অতি কম। সে মনে করিয়াছিল, সেই কুৎসিত জামাইটার মতো রাজাও হয় তো বলিয়া বসিবেন, "তেমু কত দিন ত্যাল মাখিনে।" কিন্তু বিদূষকের কোনো চালাকি খাটিল না। রাজা শকুন্তলার কথাই পাড়িলেন। সে ভাবিল, কিছুতেই সে কথাটা পাড়ার সুযোগ দিবে না, বলিল, "ছি! সে যে তপস্বীর মেয়ে, তার কথা কি তোমায় ভাবিতে আছে?" রাজা বলিলেন, "না হে, সে তপস্বীর মেয়ে নয়, সে অপ্সরার মেয়ে। আকন্দ গাছে যেমন নবমল্লিকার ফুল পড়ে, তেমনি সে তপস্বীদের হাতে পড়িয়াছে।" বিদূষক তবুও আপনার গোঁ ছাড়ে না। বলিল, "খেজুর খেয়ে গলা কিটাইলে যেমন লোকে তেঁতুল চায়, আপনার হয়েছে তেমনি। এত রানী থাকিতে আপনি চান কিনা, একটা বুনো মেয়ে।" রাজা বলিলেন, "না হে, তুমি তাকে দেখ নাই, তাই এ কথা বলিতেছ।"

বিদূষক বলিল, "হবে, আপনার যখন পছন্দ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে রূপসী, এমন-কী, রূপসীদেরও সেরা। তাহলে এখন শীঘ্র তাহার পরিত্রাণ করো। নহিলে কোন্ দিন তেলচক্‌চকে একটা নেড়া মাথার হাতে পড়িয়া যাইবে। আপনার উপর তার নজর কেমন?" রাজা বলিলেন, "আমি তাহার দিকে চাহিলে, সে চোখ ফিরাইয়া লইত; হাসিত, কিন্তু সে আমার কথায় নয়। তার মনের কথা লুকায়ও নাই। প্রকাশও করে নাই।" বিদূষক বলিল, "দেখবামাত্রেই কি তোমার কোলে ঝাঁপ পড়িবে না-কি?" রাজা বলিলেন, "আসিবার সময় পায়ে কুশ ফুটিয়াছে বলিয়া সে ফিরিয়া আমায় দেখিতে লাগিল। বাকলখানা লাগে নাই, তবু যেন ডাল

থেকে ছাড়াইতেছে— ভালো করিয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিল।" বিদূষক বলিল, "তবে আর কী? এখন পথ-খরচের জোগাড় করো। তপোবন যে তোমার শ্বশুরবাড়ি হইল দেখিতেছি।"

"কোনো কোনো ঋষি আমায় চিনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কী করিয়া দিনকতক এখানে থাকি, বলো দেখি?"

"তার আর ভাবনা কী? বলুন, আমায় তোমাদের উড়ি ধানের ভাগ দাও।" বিদূষক এইবার বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিল। রাজা তাহাকে যেন তিরস্কার করিয়াই বলিলেন, "না হে না, তাঁরা যে আমাদের তপস্যার ভাগ দেন, সেটা যে হীরা-জহরতের চেয়েও দামি জিনিস।" বিদূষকও চুপ, রাজাও চুপ। রাজা নাকি ভারি ভাগ্যবান্, তাই ঠিক এই সময়েই দুই-জন ঋষিবালক আসিয়া বলিয়া গেল যে, "ঋষিরা যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন আর রাক্ষসেরা আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়ে আবার কণ্বমুনি বাড়ি নাই। তাই আপনি যদি কেবল সারথির সহিত কয়েক রাত্রি এখানে বাস করেন, তাহা হইলে বড়ো ভালো হয়।"

বাঃ, রাজার কী অদৃষ্ট! তিনি কিছুদিন তপোবনে থাকিতে চান, আর ঋষিরা তাঁহাকে কয়েক রাত্রি থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আরো বলিলেন, কণ্বমুনি বাড়ি নাই এবং দু-চার দিন আসিবেনও না। কারণ, তাঁহার শীঘ্র আসার সম্ভাবনা থাকিলে, রাজার দরকার না হইলেও হইতে পারিত। বিদূষক এমন ঠাট্টার সুযোগ ছাড়িতে পারিল না, সে আড়ালে বলিল, "এ যে 'অনুকূল গল-হস্ত'; আমবা বাংলায় বলিতাম, 'বাঃ, এ যে মেঘ না চাহিতে জল'; এই যে মেঘ না চাহিতে জল আসিল, এটা কি, আপনি আপনি হইল। কোনো কোনো সামাজিক বলিবেন, এটাও মেনকার খেলা।

রাজা ঋষিবালকেরা চলিয়া গেলেই হুকুম দিলেন, "রথ আনো, তাতে যেন তীর ও ধনুক থাকে।" ঋষি-বালকেরা আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শকুন্তলাকে দেখিবার ইচ্ছা আছে?" বিদূষক বলিল, "খুব ছিল, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনিয়া একতিলও নাই।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমার কাছে থাকিবে?" "তাহা হইলেই আমার রক্ষা হইল।" বিদূষকের কথাটা ঠাট্টা কিনা বুঝা গেল না। কিন্তু কবি কৌশলে বিদূষককে শকুন্তলা দেখিতে দিলেন না।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আবার এক "অনুকূল গলহস্ত।" রানীরা খবর পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রত করিয়াছিলেন, উপবাস করিয়াছিলেন, চারিদিনের দিন তাঁহাদের পারণা। তাঁহাদের অনুরোধ, রাজা তাঁহাদের পারণার দিন কাছে থাকেন। রাজা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ঋষিদের আজ্ঞা এক দিকে, মায়েদের আজ্ঞা আর দিকে, তবে আমার তো যাওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে যজ্ঞের বিঘ্ন হইতে পারে। তা মাধব্য, তোমায় তো তাঁহারা ছেলে বলিয়াই মনে করেন। পারণার দিন তুমি তাঁহাদের কাছে থাকো।" উত্তম আহারের গন্ধ পাইয়া বিদূষক নাচিয়া উঠিল, বলিল, "আমি রাজার ছোটো ভাই-এর মতো, কুমার বাহাদুরের মতো যাইতে চাই। আমি এখন যুবরাজ।" রাজা বলিলেন, "তা তো ঠিক, সব লোকজন তোমারই সঙ্গে যাউক।" মাধব্য বলিলেন, "আমি রাক্ষসের ভয়ে পলাইতেছি মনে করিও না।"

রাজা মনে করিলেন, এ বামুনটা তো বড়ো পেট-পাত্‌লা। যদি শকুন্তলার কথাটা বাড়িতে বলে দেয়। মিছা একটা অনর্থ হইবে। বলিলেন, "দেখ ভাই! তপস্বীদের যজ্ঞের জন্যেই আমি রহিলাম। তুমি যেন তপস্বি কন্যার কথাটা সত্য বলিয়া মনে করিও না। ওটা আমি তোমায় পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম।" বিদূষকও তাই বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। ভবিষ্যতে রাজার ভুলিয়া যাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। মাধব্য শকুন্তলাকে দেখিল না; দেখিলে সে ভুলিতে পারিত না। একদিন-না-একদিন মনে করাইয়া দিত। রাজাকে ভুলিতে দিত না। তাহার উপর রাজা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, ঋষি-কন্যার কথা সবটাই মিথ্যা। কেবল ঠাট্টা করিয়া আমোদ করিবার জন্য বলিয়াছি মাত্র। বিদূষকও সে কথাটা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, তাহার আহারের ভারি সুযোগ উপস্থিত। অন্য কোনো কথায় তাহার মন দিবার সময় নাই। রাজা বলিলেন, আর সে বুঝিয়া গেল।

যেদিন কণ্বাশ্রম হইতে ঋষিরা আসিবেন, সেদিনও কবি কেমন কৌশল করিয়া বিদূষককে রাজার কাছ হইতে সরাইয়া দিলেন। রাজা ও বিদূষক দু-জনে একটি গান শুনিতে পাইলেন; একজন গানে বলিতেছে— "ভোমর হে, তুমি নূতন মধুর লোভে আমের মুকুলে একটি চুমা দিয়া যেমন পদ্মের কাছে গিয়াছ, অমনি মুকুলের সব কথা ভুলিয়া গেলে।"

রাজা বলিলেন, "মাধব্য, বুঝিয়াছ কী বলিতেছে? আমি হংসপদিকার মহলে

একদিন মাত্র গিয়াছিলাম, তারপর বসুমতীর মহলেই থাকি। তাই সে আমায় বেশ দু-কথা শুনাইয়া দিল। যাও ভাই, তাহাকে গিয়া বলো, তাহার তিরস্কারটা আমায় বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে।"

"যাই বটে, কিন্তু অপ্সরা ধরিলে যেমন তপস্বীদের মোক্ষ আর হয় না; তেমনি হংসপদী একজনের হাত দিয়া আমার টিকিটি ধরাইয়া আর-একজনকে দিয়া আমায় যখন উত্তম-মধ্যম দিবে তখন আমার আর কিছুতেই মোক্ষ হইবে না।" রাজা বলিলেন, "তুমি নাগর সাজিয়া যাও।"

সেকালে নাগর বলিয়া একদল লোক ছিল। নাগরদের পৈতৃক সম্পত্তি থাকিত। তাহাদিগকে রোজগার করিয়া খাইতে হইত না। তাহারা ভালো লেখাপড়া শিখিত। বিশেষ কাব্য, অলংকার চৌষট্টি কলা, কামশাস্ত্রে প্রধান ছিল। তাহারা নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের মজলিস জমাইয়া দিত। কে ভালো নাচওয়ালি, কে কেমন গান করিতে পারে, কোন্ কুশীলবের দল কোথায় বায়না করিলে ভালো হয়; কোন্ নাচওয়ালি কোন্ মজলিসের উপযুক্ত; এসব ঠিক করার ভার তাহারই উপর থাকিত। রাজা বিদূষককে বলিয়াছিলেন, তুমি একজন নাগরিক হইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করো গিয়া। আমি যে তাহার তিরস্কারটা বুঝিয়াছি, সেটাও হংসপদিকাকে জানাইয়া দিও। ইহার ভিতরও কালিদাসের একটু কৌশল আছে। বিদূষক যদি রাজার দূত হইয়া যায়, তবে তাহাকে দূতগিরি করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আর যদি সে উদাসীন নাগরিক হইয়া রানী সাহেব কেমন গান শিখিতেছে বলিয়া যায়, তাহা হইলে রানীর কাছে বেশি আদরও পাইবে। আর তাহাকে অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। শকুন্তলা রাজসভায় যতক্ষণ থাকিবেন, সে ততক্ষণ হংসপদিকার মহলেই কাটাইয়া দিবে।

আঙটি পাওয়ার পর রাজা ও বিদূষক দু-জনে বাগানে গেলেন, সেখান হতে মাধবীলতার কুঞ্জে গেলেন। রাজার মন বড়ো খারাপ, তাই এবার বসন্তকালে উৎসবটাই মাটি। বাগানে আসিয়াই রাজা বলিলেন, "আহা, আমার প্রিয়া তখন আমায় মনে করাইয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করিলেন, তখন আমার মনটা ঘুমাইয়াই রহিল, এখন যে জাগিল, সে কেবল পস্তাইবার জন্য।" তখন বিদূষক আর-এক দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, "এই রে, আবার শকুন্তলা-ব্যাধি উপস্থিত হইল, কেমন করিয়া ইহার চিকিৎসা হইবে জানি না।" রাজা একে একে কঞ্চুকী, প্রতিহারী সকলকেই সরাইয়া দিলেন। বিদূষক বলিলেন, "আপনি তো মাছিটি পর্যন্ত

~ ~

সরাইলেন। এখন আসুন, এই প্রমোদবনে বেড়ানো যাউক, এ জায়গাটি বেশ— না-ঠাণ্ডা না-গরম।" রাজা বলিলেন, "বিপদের পরই বিপদ আসে। দেখ, শকুন্তলার কথাও আমার মনে পড়িল, আর মদনও ধনুতে আমের বউল চড়াইয়া বাণ মারিতে আরম্ভ করিল।" বিদূষক বলিল, "আমি এই বাঁকা লাঠিতে কন্দর্পের বাণ নাশ করি" বলিয়া আমের বউল ভাঙিতে গেল। রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের তেজটা খুব দেখাইলে। এখন থামো।" তাহার পর বলিলেন, "কোথায় বসিয়া বলো দেখি চোখটা জুড়াই; লতাগুলা দেখিতে প্রিয়ার মতো। চলো, লতা দেখি গে।" বিদূষক বলিল, "আপনি তো এই চতুরিকাকে বলিলেন যে, আমরা মাধবীলতার কুঞ্জে গিয়া বসি, সেইখানেই আমি শকুন্তলার যে ছবিখানি আঁকিয়াছি, সেইখানি লইয়া আইস। তবে চলুন সেইখানেই যাই।" সেখানে যাইবার সময় বিদূষক কুঞ্জের শোভা বর্ণন করিয়া রাজার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃথা। রাজা বলিলেন, "শকুন্তলাকে আমি যখন তাড়াইয়া দিই, তখন তো তুমি কাছে ছিলে না। কিন্তু পূর্বেও তো কখনো তুমি আমার কাছে তাঁহার নামও করো নাই, তুমিও কি আমার মতো সব ভুলিয়া গিয়াছিলে?" সে বলিল, "না, ভুলিব কেন? কিন্তু তুমি তো অনেক কথা তার সম্বন্ধে বলিয়া শেষে বলিলে, এ-সকল পরিহাসের কথা, যথার্থ বলিয়া যেন মনে করিও না। আমার বুদ্ধিটা বোকার মতো কিনা, তাই আমি তোমার কথাই ঠিক বলিয়া মনে করিয়া লইলাম। অথবা কী জানো সবই ভবিতব্য! এই সময়ে শকুন্তলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাজার মোহ হইবার উপক্রম হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, আমায় রক্ষা করো!" বিদূষক বলিল, "এ কী হইল, এ রকমটা তো আপনার সাজে না। ভালো, লোক কি শোকের বশ হয়? পাহাড় কি কখনো ঝড়ে নড়ে?" একবার বিদূষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঁহাকে কে লইয়া গেল?" রাজা বলিলেন, "তিনি পতিব্রতা, তাঁহার অঙ্গ কি কেহ স্পর্শ করিতে পারে? মেনকা তাঁর মা, সেই সম্পর্কে কোনো অপ্সরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে।" বিদূষক বলিলেন, "তা যদি হয়, তোমার সঙ্গে তাঁর অবশ্যই মিলন হইবে। কেন-না, মা কি আর কখনো মেয়ের কষ্ট দেখিতে পারে? মেনকা অবশ্যই তাঁহাকে তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন।" রাজা বলিলেন, "সে যে স্বপ্ন, সে যে মায়া, একবার গিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবে না।" বিদূষক বলিলেন, "না, না— এই দেখুন না— এই আঙটিটার ব্যাপারই দেখুন না। ইহা হইতেই মনে

হয়, কোনো অদ্ভুত উপায়ে আশ্চর্য রূপে আবার মিলন হইবে।" আবার খানিক কাঁদাকাটির পর মাধব্য জিজ্ঞসা করিলেন, "আপনার নামের মোহর তাঁহাকে দিয়াছিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "আমি নগরে ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবে আবার খবর পাঠাইবেন?' আমি আমার হাতের আঙটিটি তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবার সময় বলিলাম, এই মোহরে যে কটি অক্ষর আছে, একটি একটি করিয়া এক-এক দিন গণিবে, যেদিন শেষ হইবে, সেইদিন আমার লোক আসিয়া তোমায় আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে।" "আচ্ছা, মাছের পেটে আসিল কিরূপে?" "শচী-তীর্থে স্নান করার সময় হাত থেকে পড়িয়া গিয়াছিল। এ আঙটি সে হাত ছাড়িল কেন? ইহাকে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দিই।" বিদূষক মনে মনে বলিল, "এ তো পাগলামির পথে উঠিল; আমার কিন্তু ক্ষুধায় প্রাণ যায়।" চতুরিকা শকুন্তলার ছবি আনিলে বিদূষক ছবিখানির খুব বাহবা দিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, "এ তিনটির মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলা?" তাহার পর বলিল, "ঐ যে আমগাছের তলায় একটু ক্লান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, উনিই তো শকুন্তলা।" রাজা তুলি ও রঙ চাহিলে বিদূষক জিজ্ঞাসা করিল, "উহার উপর আবার কী লিখিবে?" মনে মনে বলিল, "বোধ হয়, গোটাকত লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা তপস্বী লিখিবে।" সে রাজাকে বলিল, "মুখটি ঢাকিয়া শকুন্তলা কেন চকিতভাবে রহিয়াছে?" তাহার পর প্রকাশ্যে বলিল, "এই যে একটা ভোমরা মধু-চোর ইহার সুন্দর মুখের দিকে তাড়া করিয়া আসিতেছে।" রাজা বলিলেন, "ওকে বারন করো।" "তুমিই রাজা, দুষ্টের দমন তোমারই কাজ, তুমিই করো।" আবার বলিল, "এ বড়ো বাঁকা জাতি, বারন করিলেও শুনে না।" রাজা বলিলেন, "বটে, কথা শুনে না। আচ্ছা, শোনো ভ্রমর, তুমি যদি পাকা তেলাকুঁচার মতো উঁহার ঠোঁট দুটি ছোঁও, তোমায় আমি পদ্মফুলের পেটের ভিতর কয়েদ করিব।" "ও! কী ভীষণ শাস্তি, এতে আর ভয় পাবে না।" মনে মনে বলিল, "এটা তো পাগলই হইয়াছে, আমিও যে সেই সঙ্গে তাই হইতে চলিলাম।" আবার বলিল, "মহারাজ করেন কী? এটা যে ছবি" বলিবামাত্র রাজার ভুল ভাঙিয়া গেল। তিনি এতক্ষণে শকুন্তলাই দেখিতেছিলেন, সেই ভাবেই কথা কহিতেছিলেন। এখন ছবি শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রানী বসুমতী আসিতেছেন শুনিয়া রাজা ছবিখানি বিদূষকের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানি

রক্ষা করো।" বিদূষক মনে মনে বলিল, "ছবি রক্ষা তো নয়, তোমাকেই রক্ষা করিতে হইবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, রানীর হাত থেকে তোমার উদ্ধার হলে আমায় ডাকিও। আমি মেঘচ্ছন্দ নামক বাড়িতে রহিলাম।"

খানিকক্ষণ পরে রাজা যখন সদাগরের জাহাজ ডুবি হইয়া মরার কথায় বড়োই কাতর, হঠাৎ "মেঘচ্ছন্দ" হইতে "ওরে মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া বিদূষক চিৎকার করিয়া উঠিল। রাজা বুঝিলেন, বুঝি কোনো অসুর বিদূষককে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি ধনুক ও বাণ লইয়া সেখানে গেলেন। গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিদূষক কাতর স্বরে বলিল, "আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি, তুমি আমায় দেখিতে পাইতেছ না। আমায় কে একটা আক ভাঙার মতো তিন টুকরা করিয়া ফেলিতেছে। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, তেমনি আমায় ধরেছে। আমার আর রক্ষা নাই।" রাজা বলিলেন, "বটে, তুমি মানুষের চোখের অগোচর থাকিতে পারো বলিয়া তোমার বড়ো জাঁক হইয়াছে; আমার বাণ এমন নয়, তোমায় মারিবে, ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবে। এই আমি বাণ ছুঁড়িলাম।" বলিবামাত্র একটি দিব্যপুরুষ রাজার সম্মুখে উপস্থিত, সঙ্গে বিদূষক কাঁপিতেছে। রাজা বলিলেন, "কে ও মাতলি, দেবরাজের কুশল তো?" বিদূষক বলিল, "বাঃ! আমায় যে প্রাণবধ করিতে উদ্যত, তুমি তাহাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতেছ!" রাজা শিষ্টাচারের পর মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদূষকের উপর আপনি এ ব্যবহার করিলেন কেন?" মাতলি বলিলেন, "আমি দেখিলাম, কোনো কারণে আপনি বড়ো কাতর, তাই আপনাকে একটু রাগাইবার জন্য, একটু উত্তেজিত করিবার জন্য— এ কাজটা করিয়াছি। আমি জানি, কাঠ নাড়িয়া দিলে তবে আগুন জ্বলে, লেজে পা পড়িলে তবে সাপ ফোঁস করে। একটা হ্যাঙ্গামা না পড়িলে মানুষের রোখ হয় না।" রাজা বলিলেন, "মাধব্য, তুমি অমাত্য পিশুনকে বলো, তুমি আপনার বুদ্ধিবলে কিছুদিন রাজ্য চালাও, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত রহিলাম।" বিদূষক চলিয়া গেল।

মাধব্য রাজার যথার্থ হিত চায়। বাড়াবাড়ি দেখিলে সে তাহাকে বেশ এক হাত লয়। শকুন্তলার ব্যাপারে রাজা যখনই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, সে তাহাকে তখনই ঠাট্টা করিয়াছে, কিন্তু যখন জানিতে পারে, রাজা যথার্থই কাতর, তখন সে তাঁহার দুঃখে দুঃখী হয় এবং তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। তপোবনে রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "শকুন্তলার কথাটা সবই মিথ্যা, পরিহাস মাত্র।" সে

সরলভাবে তাহাই বুঝিয়াছিল, তাই সেকথা সে কখনো আর রাজার কাছে পাড়ে নাই। সেজন্য সে দুঃখিত, "বুদ্ধির ঢেঁকি বলিয়া" আপনার নিন্দাও করিয়াছিল। সে এক এক করিয়া সব কথা শুনিয়া লইল। শকুন্তলা কে? কে তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেল? কেন তাকে আঙটি দেওয়া হইয়াছিল? কেমন করিয়া সে আঙটি মাছের পেটে গেল? ছবি আসিলে সে ছবির যে দোষগুণ বলিল, আর কী লিখিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। কিন্তু বুদ্ধির দোষে ছবি লইয়া রাজা যখন তন্ময়, সেই সময় বলিয়া ফেলিল, "করো কী? এ যে ছবি।" রাজার চমক ভাঙিয়া গেল। তিনি অধীর হইলেন, এমন সময়ে রানী বসুমতীর খবর আসিল। সেই ছবি রাখিবার ছলে কবি মাধব্যকে সরাইয়া দিলেন। সে রাজার চমক ভাঙিয়া দিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল, এ তাড়ানটা যেন তাহারই শাস্তি। উহার উপর মাতলির যে অত্যাচার, সেও যেন সেই শাস্তিরই শেষ।

নারায়ণ
অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

দুর্বাশার শাপ

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড়ো ভালো লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ববিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সেকথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে। শকুন্তলা যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সঙ্গে বারো বছরের ছেলে, তখন মনে সব ঠিক আছে, তবু রাজা বিবাহটা একেবারে অস্বীকার করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নয়, শকুন্তলাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর ছেলেটাকে "হোঁৎকা" বলিয়া, "হাতি" বলিয়া গালি দিলেন। শেষ শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল যে, "তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ।" লোকে দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল; তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোকলজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।

কালিদাস দুর্বাসার শাপ আনিয়া এই মহাপুরুষকে রাজার মতোন রাজা, এমন-কী, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। যখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি শকুন্তলাকে লইতে স্বীকার কেমন করিয়া করেন? যাহারা দেখিতেছে, তাহারা রাজার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিহারী বলিলেন, "আহা, আমাদের রাজার কী ধর্মজ্ঞান! এমন রূপ! স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! মুখের কথায় আপনার হইয়া যায়। শুদ্ধ ধর্মবুদ্ধিতে ইহাকে লইতেছেন না।" শকুন্তলা যখন কপট শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন, "তুমি

ঘাসে ঢাকা কূয়া, ধর্মের কাচ করিয়া বসিয়া আছ," তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "দুষ্মন্তের চরিত্র তো আমরা সবাই জানি, তবুও তাঁহার ভিতর যে শঠতা আছে, কখনো দেখি নাই।" যাঁহারা থিয়েটার দেখিতেছেন, তাঁহারা শাপের কথা জানেন। তাঁহারাও রাজার কোনো দোষই দেখিতে পাইতেছেন না, বরং তাঁহার ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে দুষ্মন্তকে "কাপুরুষতার" দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে। অঙ্গুরি পাইয়াই রাজার যেমন সবকথা মনে পড়িল, অমনি তাঁহার ঘোরতর অনুতাপ হইল। প্রত্যক ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, আর তাঁহাকে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই অনুতাপ, এই যন্ত্রণা, এই অধীরতায় রাজার চরিত্র বেশ খুলিতে লাগিল। বোকা বিদূষক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা আরো বাড়াইয়া দিতে লাগিল। যে-সকল কথা এ সময়ে চাপা দেওয়া উচিত, বোকাটা সেই-সব কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজার স্বভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইতে লাগিল কে? সানুমতী আর নাটকের প্রেক্ষককুল! এই সময়ে আবার সদাগরের মরার খবর আসিল। সে আঁটকুড়া ছিল, বিদূষক যে কথাটা মনে করাইয়া দেয় নাই, সেটাও মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, "আমি অপুত্রক" অথচ আমার পুত্র হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। আমি ছেলেটি হেলায় হারাইয়াছি! তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন; এতটা অধীর হইলেন যে, মাতলি তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই ভয় পাইলেন, ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় গেলে কোনো কাজই পাওয়া যাইবে না। তাই বিদূষককে মারিয়া, রাজাকে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কণ্বের আশ্রমে প্রথম দেখার সময় সকলে রাজার ভাব দেখিয়াছেন। লতাকুঞ্জে গান্ধর্ব বিবাহের সময়ও রাজার ভাব দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই ছিল না। বিশেষ নিন্দা করারও কিছু ছিল না। শকুন্তলাকে তাড়াইবার সময়ও তাঁহার আর-এক মূর্তি দেখিয়াছেন; তাহাতে আশ্চর্য হইবার কথা আছে। রাজা চেষ্টা করিতেছেন, মনে পড়িতেছে না। শকুন্তলার কথায়-বার্তায় আকার-প্রকারে শকুন্তলা যে তাঁহাকে ঠকাইতে আসিয়াছে, একথাও

বলিতে পারিতেছেন না; ঠিক তাহার সবকথা বিশ্বাসও করিতে পারিতেছেন না। কারণ, নিজের সে-সকল কথা একেবারেই মনে নাই। সন্দেহ পুরাই হইতেছে অথচ সন্দেহ করিলে চলিতেছে না। এখনই মীমাংসা করিয়া হয় শকুন্তলাকে ও শকুন্তলার ছেলেকে আপনার বলিয়া লও, না-হয় উহাকে যাইতে বলো। ইতস্তত করিবার সময় নাই। রাজা তখন কী করিবেন? যাইতে বলাই ঠিক মনে করিলেন। করিলেনও তাই। ইহাতে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন না। লইলে বরং দোষ দিত, কলঙ্ক হইত।

যে অবস্থায় রাজা পড়িয়াছিলেন, তাহা যে একটা বিষম সমস্যা, কে অস্বীকার করিবে? ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছ।" ঋষিদের রাজাকে ঠকাইবার কী কারণ আছে? কেন তাঁহারা একটা মিছা হ্যাঙ্গাম লইয়া হিমালয় পর্বত হইতে হস্তিনায় আসিবেন? সুতরাং বিশ্বাস করিবার বেশ কারণ রহিল। আর-এক দিকে আবার শকুন্তলার আকার-প্রকার কথাবার্তায় এমন কিছুই ছিল না—যাহাতে বোধ হয়, সে দুষ্ট, শঠ বা কপট বা ঠকাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিজের কথা তাঁহার একেবারে মনে নাই। যদি কাহারো মনে থাকিবার কথা হয়, তবে শকুন্তলার ও তাঁহার নিজের। রাজা মনে মনে বলিলেন, ইহারা মনে করাইয়া দিক, আমি লইতেছি। শকুন্তলা আঙটি খুঁজিলেন, নাই। একটা উপায় ছিল, সেটা নাই। কত কথা মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিছুই হইল না। সেকথা মনে পড়িল না। কেমন করিয়া পড়িবে? শাপ হইয়াছে যে, পাগল যেমন আগের কথা পরে মনে করিতে পারে না, তেমনি বুঝাইয়া দিলেও, মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা রাজার মনে পড়িবে না। সুতরাং পাহাড়ে মাথা কুটিলেও যেমন পাহাড়ের কিছুই হয় না, ব্রহ্মশাপের বিরুদ্ধে শকুন্তলার এত চেষ্টা, এত বলা-কহা, সব বৃথা হইয়া গেল। ব্রহ্মশাপও নড়িল না, রাজারও মনে পড়িল না। রাজা কী করিবেন? শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন।

আঙটি হাতে পড়িবামাত্র শাপের অবসান হইল, সবকথা রাজার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মনে বড়োই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অগ্নিশরণে

শকুন্তলার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ব্যবহার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ও তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। তিনি, যে আঙটি আনিয়াছে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, বসন্তের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। অগ্নিশরণে শকুন্তলার তরফ যত কথা বলা হইয়াছিল, সব সত্য বলিয়া ধারণা হইল। যে মাছ ধরিয়া আনিয়াছে, সে ইন্দ্র-ঘাটের জেলে। আর গোতমী বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্র-ঘাটে শচী-কুণ্ডের জলস্পর্শের সময় আঙটি পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ির কথা তো ঠিকই হইল। আর তিনি কী করিয়া সেই সত্যবাদী বুড়িকে বৃদ্ধ তাপসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই তাহাকে সামান্য স্ত্রীলোক বিবেচনা করিয়া গালি পাড়িয়াছেন! শকুন্তলা হরিণের কথা মনে করাইয়াছিলেন, তাঁহার মনে পড়ে নাই। তিনি শকুন্তলাকে কাকের বাসায় কোকিলের মতো ডিম ফুটাইতে আসিয়াছে বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি এখন বিদূষককে নির্জনে সবকথা খুলিয়া বলিলেন। একথা বলায় রাজার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু রাজা যে তপোবনে শকুন্তলা নামে এক তপস্বীর মেয়েতে আসক্ত হইয়াছিলেন, সেকথা তো বিদূষকও জানিত, সে কেন বলে নাই? তাহার কারণ, রাজা একটি মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তপস্বীর মেয়ের কথাটা পরিহাস মাত্র, সত্যকথা নয়। মিথ্যাকথার ফল ফলিবেই ফলিবে। নহিলে বিদূষক যদি রাজা আসিতেই জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমিও এলে, তোমার সে শকুন্তলার কী করে এলে? তাহা হইলে তো এত বিভ্রাট না-হইলেও না-হইতে পারিত।

রাজা মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। শকুন্তলা অতিথি-সেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। নইলে শুদ্ধ শকুন্তলার দোষে রাজার শাস্তি কেন হইবে?

প্রমোদবনে রাজার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা হইয়াছে, লোক তাঁহার দুঃখে দুঃখীই হইয়াছে। তাঁহার কষ্টে, অনুতাপে, করুণ রোদনে লোকের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যখন শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রয়ে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, তখন সে শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া গেল। শকুন্তলার তাঁহাকে চিনিতে যতটুকু দেরি হইয়াছিল, তাঁহার

ততটুকুও হয় নাই। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর্যপুত্র না? নহিলে রক্ষা-মঙ্গল-শুদ্ধ আমার ছেলেকে কে আর অপবিত্র করিতে পারিবে!" ইহাতে চিনিতে যে একটু দেরি হইয়াছিল, বেশ বুঝা যায়। রাজার কিন্তু কিছুই হয় নাই। দেখিবামাত্র বলিলেন, এই সেই শকুন্তলা। যদিও তখন কঠোর নিয়ম করিয়া শকুন্তলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; একটি চুলের বিননী পিছন দিকে ঝুলিতেছে; আর একখানি আধময়লা বাকল পরিয়া আছেন; তথাপি রাজা দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমায় দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলে, তাহাতে বুঝিলাম, তোমার প্রতি আমি পূর্বে যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভালোই হইয়াছে।" শকুন্তলার তখনো ভয় ভাঙে নাই, তিনি মনে মনে, বলিলেন, "এখন আমার আশার সঞ্চার হইল। রাজার বোধ হয় রাগ গিয়াছে। দৈব বোধ হয় আমার অনুকূল। ইনি সেই আর্যপুত্রই বটেন।" রাজা বলিলেন, "রাহু গ্রাস করিলে চাঁদের কিছুই থাকে না, রাহুর হাত হইতে মুক্ত হইলে চন্দ্র যেমন রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হন, তেমনি কোনো রাহু আমার স্মৃতিশক্তিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন সে রাহুও মরিয়া গিয়াছে, আর তুমিও আমার সম্মুখে উপস্থিত।" এখন শকুন্তলার ভয় পুরা ভাঙিল। "আর্যপুত্রের জয়" বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন, "জয় বলিতে গিয়া তোমার যদিও কথা বাহির হইল না, আমার কিন্তু খুব জয় হইল। কারণ, আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম।" বলিতে বলিতে রাজা শকুন্তলার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সেজন্য আমার উপর আর রাগ করিও না। আমার তখন কী যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে আপনার মঙ্গল আপনি বুঝিতে পারে না। যে কানা, তাহার মাথায় ফুলের মালা দিলেও, সে সাপ মনে করিয়া, মালা দূরে ফেলিয়া দেয়।"

শকুন্তলা বলিলেন, "অমার পূর্বজন্মের পুণ্য শেষে সুফল দিলেও তখন বোধ হয় দুরদৃষ্ট দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নহিলে আপনি আমার প্রতি এত সদয়, তবুও তখন এত বিরূপ হইলেন কেন?" এতক্ষণ রাজা পায়ে পড়িয়া ছিলেন,

এখন উঠিলেন। শকুন্তলা— "আমার কথা আপনার মনে পড়িল কিরূপে?" রাজা— "আমার দুঃখ একেবারে ঘুচিলে সেকথা বলিব। তুমি যখন কাঁদিয়া আমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলে, যখন তোমার চক্ষের জল তোমার অধরের উপর পড়িয়া অধরকে ক্লেশ দিতে লাগিল, তখন আমি তাহার দিকে চাই নাই, উপেক্ষাই করিয়াছিলাম, আজ আবার তোমার চোখের পালকে জল দেখিতেছি। আমি উহা মুছিয়া দিয়া নিজের দুঃখ দূর করি" বলিয়া উঁহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তখন রাজার হাতে সেই আঙটি দেখিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, এই সেই আঙটি।" রাজা বলিলেন, "এই আঙটি পেয়েই আমার সব কথা মনে পড়িল।" সে সময় দুর্লভ হইয়া এই আঙটিটাই অনর্থ বাধাইয়াছিল। "তবে এ আঙটি তোমার আঙুলেই থাকুক।" "না, আমি উহাকে একেবারেই বিশ্বাস করি না" বলিতে বলিতে মাতলি আসিল ও সকলকে কশ্যপের নিকট লইয়া গেল। কশ্যপের নিকট রাজা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শকুন্তলাকে সম্মুখে পাইয়াও মনে হয় নাই, পরে আঙটি দেখিয়া মনে হইল, এ কী রকম? দুর্বাসার শাপের কথা রাজাও জানিতেন না, শকুন্তলাও জানিতেন না। মুনি সে কথা বলিয়া দিলে দু-জনে সব খবর বুঝিতে পারিলেন। আগাগোড়া সব ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল, আবার দু-জনের যেমন ছিল, তেমনি হইল।

এ ব্যাপারে রাজার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে ছাড়া কমে না। রাজার যখন ধারণা ছিল, বিবাহ করি নাই, মনে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বীরের ন্যায় সেই ধারণা মতো কার্য করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে হইল, বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আবার বীরের মতো কার্য করিলেন। পায়ে পড়িয়া শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন, বিবাহ স্বীকার করিলেন। ছেলে ও স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। দুর্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলাও দুর্বাসার শাপে যথেষ্ট বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম, এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই-তিনটি সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

প্রথম প্রথম দুটি সখী ছিলেন, তার পর দুটি ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে স্টেজে আনিতেই পারেন নাই। শকুন্তলা পাপ কাহাকে বলে, জানেন না। আদরের মেয়ে আদরেই আছেন, সংসারের কঠোরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড়ো নিদারুণ, সংসারে যে পান থেকে চুন খসিবার যো নাই, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন। একটি আঙটি— তাও আবার যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। সেই আঙটি না দেখাইতে পারিলে, যাঁহাকে সর্বস্ব দিয়াছেন এবং যিনি সর্বস্ব দিবেন বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন— তিনিও যে এই সামান্য জিনিসটা না থাকায় চিনিতে পারিবেন না, গরিব শকুন্তলার এতটা জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সে আঙটিটাকে যত্ন করিয়া রাখিল না। বড়োই কষ্ট পাইল। শেষ রাজা যখন আবার সেই আঙটি তাহার আঙুলে পরাইতে গেলেন, সে বলিল, "আর না, ও আঙটিটাকে আমি বিশ্বাসই করি না।" দোষটা আঙটির হইল। দুঃখের দায়ে পড়িয়া শকুন্তলা এখন একটু শক্ত হইয়াছেন, এখন আর সে আদরের মেয়ে নাই। সে একাই রাজার সঙ্গে দেখা করিল। রাজা ক্ষমা চাহিলে যথোচিত উত্তর দিল। কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে, তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনো হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন। রাজা চোখের জল মুছাইতে আসিলে, কত কী বলিয়া বাধা দিলেন না, আর সে আঙটিটাকে বিশ্বাস করিলেন না। এইরূপে শাপে দু-জনেরই চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কী? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে, যে-কোনো ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সেকালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সেকালের কর্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ তো ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ হইলে সেটা ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত।

বল্লালসেন মরিলেন, ব্রহ্মশাপে— কত রাজা উৎসন্নে গেলেন, ব্রহ্মশাপে— এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, ব্রহ্মশাপে— এত বড়ো বামনি [বাহ্‌মনি] মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল, ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়ো, কাব্যে পড়ো, আখ্যায়িকায় পড়ো, সর্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত, ব্রহ্মশাপে— কালিদাস সেকালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে; তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।[১]

নারায়ণ
পৌষ, ১৩২৪

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. বিজয়সেন ও বিলাসদেবীর ছেলে রাজা বল্লালসেন (রাজত্বকাল আ. ১১৫৯-৭৯ খৃ.) সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। ব্রহ্মশাপে বল্লালসেনের মৃত্যু সম্পর্কিত কিংবদন্তির উৎস আনন্দ ভট্ট রচিত "বল্লালচরিত" (১৫২০ খৃ.)। এই কাহিনীতে আছে, সেনরাজ-পুরোহিতকে অপমান করায় বল্লালসেন মহাস্থানের শৈব মঠের মহন্ত ধর্মগিড়িকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। এই ধর্মগিড়ি কোনো-এক মুসলমান রাজা রায়দুম্বকে দিয়ে বল্লালসেনের বিরুদ্ধে অভিযান করালেন। বল্লাল যুদ্ধে যাবার সময় মহিষীদের বলেন— যদি পরাজয় হয় তাহলে সঙ্গের কবুতর দুটিকে নিজের মৃত্যুর আগে ছেড়ে দেবেন। যুদ্ধে বল্লাল জিতলেন, কিন্তু অসতর্কতায় কবুতর দুটি ছাড়া পেয়ে রাজধানীতে ফিরে এল। ভুল খবর পেয়ে মহিষীরা রাজার পূর্বনির্দেশ মান্য করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরলেন। যুদ্ধজয় করে ফিরে এসে বল্লাল মহিষীদের দশা জেনে নিজেও আগুনে আত্মবিসর্জন দিলেন। মহন্তর শাপে তাঁর অপমৃত্যু হল। কিন্তু বল্লালের যে সময় ধরা হয় তখন কোনো মুসলমান আক্রমণ হয়নি।

বাহ্‌মনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হাসান সিংহাসনে বসেন ১৩৪৭ খৃস্টাব্দে, তিনি আবুল মজফ্‌ফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ্‌ উপাধি নেন। দাক্ষিণাত্যে এই সুলতানবংশের শাসন দুশো বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। আঠারোজন সুলতান রাজত্ব করেন। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবার কারণ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারীদের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব, বাইরে থেকে আনা অভিজাত মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয়

মুসলমানদের বিরোধ, শাসক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মানুষদের বিলাসময় জীবনযাত্রা, সাধারণ মানুষের চরম দারিদ্র, একালের ঐতিহাসিকেরা বাহ্মনি রাজত্বের পতনের এইসব কারণই উল্লেখ করেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর লেখা পাঠ্য বই *A Short History of India* (London 1907) বইয়ে উল্লেখ করেছেন কাঞ্চী আক্রমণের সময়ে ত্রয়োদশ বাহ্মনি সুলতান মুহম্মদ শাহর (১৪৬৩-৮২ খৃ.) নিজের হাতে প্রধান-পুরোহিতকে হত্যা করেন। "People thought the Bahamani dynasty came to an end as a punishment for this killing of a Brahman." (P. 44)।

রামচন্দ্র সম্পর্কে হরপ্রসাদ যে ইঙ্গিত করেছেন সেটি সম্ভবত রামায়ণের লক্ষ্মণ বর্জনের ঘটনা। উত্তর কাণ্ডের ১০৩-১৩৬ সর্গে বর্ণিত আছে, তাপসরূপী কাল রামচন্দ্রকে বলেন, তাঁর বক্তব্য গোপনে শুনতে হবে। আলোচনা অপর কেউ শুনলে সে রামের বধ্য হবে। লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করে রাম কথা শুনতে বসলেন। দীর্ঘ সময়ের পরে দুর্বাসা এলেন রামচন্দ্রের কাছে। লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে প্রবেশে বাধা দিলে ক্রুদ্ধ দুর্বাসা অভিশাপের ভয় দেখালেন। লক্ষ্মণ তখন রামকে সংবাদ দিতে গেলেন। শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় কাল বিদায় নিলেন। রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষায় লক্ষ্মণকে বধ না করে বর্জন করলেন।

শকুন্তলায় হিঁদুয়ানি

প্রথম বয়সে বঙ্কিমবাবু যে-সকল নভেল লিখিতেন, তাহাতে তিনি দেখিতেন, গল্পটি সাজানো হইল কিরূপে। সে সাজানোর কোনো খুঁত আছে কিনা? তাহার আগাগোড়ায় মিল আছে কিনা? সকলের উপর দেখিতেন, জিনিসটা জমাট হইল কিনা? পাত্রগুলি ঠিক হইল কিনা? তাহাদের ব্যবহারে আগাগোড়া মিল হইল কিনা? ছেলের মুখে বুড়ার কথা বাহির হইল কিনা? বুড়ার মুখে ছেলেমি বাহির হইল কিনা? চোরের মুখে সাধুর মতো কথা বাহির হইল কিনা? সাধুর মুখে চোরের কথা বাহির হইল কিনা? তাহাদের ব্যবহারের সামঞ্জস্য রহিল কিনা? এক কথায় তিনি "কাব্যাংশের" দিকেই দেখিতেন, আর কিছু দেখিতেন না। এইরূপে তিনি অনেকগুলি ভালো ভালো নভেল লেখার পর তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হইল। কাব্যাংশে অপরূপ, তুলনার অতীত। তাহার পর তাঁহার মাথায় ঢুকিল— কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের কথা বলিতে হইবে। ধর্মের দিকে মানুষের মন লওয়াইতে হইবে। এক কথায় 'ধর্মপ্রচার' করিতে হইবে। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম এই সময়ের লেখা। সেইগুলিতে ধর্মই অধিক লক্ষ্য, কাব্য তত নয়। সামাজিক, সমজদার লোক চটিয়া গেল। ধর্মওয়ালারা খুশি হইল।[১]

কালিদাসেরও সেইরূপ, তাঁহার প্রথম-বয়সের লেখায় ধর্মের কথা বড়ো একটা থাকিত না। মালবিকাগ্নিমিত্রে, মেঘদূতে, এমনকি, বিক্রমোর্বশীতে-ও ধর্ম নাই, আছে কেবল কাব্য। আছে কেবল জমাট, আছে কেবল প্রেম। একটু একটু উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা একেবারেই টের পাওয়া যায় না। না তলাইলে টেরই পাওয়া যায় না। তাঁহার শেষ বয়সের লেখাও তো তাই। তবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে,

তাঁহার উপদেশগুলিতে তখন হিন্দু-ধর্মের ভাব বেশি বেশি, কুমারসম্ভব-এর কথা ছাড়িয়া দাও, হর-পার্বতী লইয়া যে কাব্য, সে তো ধর্ম ছাড়া হইতেই পারে না। তাঁহার শকুন্তলা-য় ও তাঁহার রঘুবংশে বেশি হিন্দুয়ানি কথা আছে। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মে ভারত ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। নিপুণ হইয়া পড়িয়াও তাঁহার কাব্যে বৌদ্ধভাব বা বৌদ্ধ-মত বা বৌদ্ধ-দ্বেষের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার হিন্দুয়ানির তিনটি প্রধান অঙ্গ:—একটি ব্রাহ্মণে ভক্তি, একটি গোরুতে ভক্তি, একটি দেবতার প্রতি ভক্তি; বিশেষ হরি ও হরের প্রতি ভক্তি। শকুন্তলায় শুদ্ধ ব্রাহ্মণে ভক্তিই প্রকাশ হইয়াছে, কুমারসম্ভবে হরের প্রতি ভক্তি, রঘুবংশে গো-ব্রাহ্মণ ও নারায়ণে ভক্তি।

ভক্তির অভাব কোথাও নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রে বিদ্যাচার্য ব্রাহ্মণদের মাসিকের ব্যবস্থা, গণদাস ও হরদত্তের ব্যাপার, ব্রাহ্মণভক্তি নয় তো কী? বিক্রমোর্বশী-তে চ্যবনের আশ্রম ও ভরতমুনির শাপও সেই ভক্তি। কিন্তু এ দুয়ে ব্রাহ্মণ-ভক্তির বিকাশ নাই। বিকাশ অন্য জিনিসের। কুমারে হরপার্বতীর প্রতি ভক্তিও তাহারই বিকাশ। রঘুবংশে বিষ্ণুভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি ও গো-ভক্তি তিনেরই বিকাশ; কিন্তু সে যে বিকাশ, সেও কাব্যেরই অঙ্গ। তোমার মনে হইবে, কাব্যই পড়িতেছি; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখিবে, ভক্তিটাই মূল। কাব্য কেবল বাহিরে। বঙ্কিমবাবুর এ চমৎকারিত্বটুকু নাই। তিনি নিজে দাঁড়াইয়া অনেক সময় ধর্মপ্রচার করেন। কাব্যে সেটা কেমন কেমন দেখায়। অশ্বঘোষ[২] যেমন মধু মিশাইয়া তিক্ত ঔষধ দেন, তিত ও মধু দুই দেখা যায়, বঙ্কিমবাবুরও তাই। কিন্তু কালিদাসের তাহা নহে। তাঁহার প্রচারটা না তলাইলে বুঝা যায় না। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব-এর কথা যখন উঠিবে, তখন বলিব। এখন শকুন্তলা-র কথাই বলা যাক্।

শকুন্তলা-র প্রথম চার অঙ্ক কণ্বের আশ্রমে; শেষ অঙ্ক মারীচের আশ্রমে। সুতরাং ঋষির আশ্রম লইয়াই শকুন্তলা। এখানে প্রেক্ষাগৃহ নাই, নাচ নাই, গান নাই, নাট্যাচার্য নাই, নাট্যাচার্যদের টক্কর দেওয়া নাই, সমুদ্রগৃহ নাই, বড়ো বড়ো ছবি নাই, বিবাহের সভা নাই। পঞ্চমে যদিও রাজবাটি আছে, কিন্তু আমরা রাজবাটিতে কী দেখিতেছি, দেখিতেছি শুদ্ধ অগ্নিশরণ; বল, এক রকম যজ্ঞশালা। রোজ সেখানে অগ্নিহোত্র[৩] হয়। প্রমোদবন দেখিতেছি, কিন্তু সেখানে উৎসব বন্ধ অর্থাৎ সেও এক-রকম তপোবন। সমস্তটাই যেন ধর্মের ভাবে মাখানো। অলক্ষিতভাবে আছেন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এবং তাঁহার অপার করুণা আর অলক্ষিতভাবে আছেন মেনকা ও তাঁহার সহচরী অপ্সরারা। এই জন্যই, এই ধর্মভাব

মাখানো থাকার জন্যই হিন্দুরা মালবিকা ছাড়িয়া, উর্বশী ছাড়িয়া, শকুন্তলাকে এত ভালোবাসেন। তাই তাঁহারা বলেন,—

> ‘‘কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
> তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা।।[৪]

বাস্তবিকও শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক, যেখানে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি যাইতেছেন, সেটা এতই পবিত্র, এতই করুণ, এতই সুন্দর যে, উহার উপমা মিলা দুষ্কর।

কালিদাসের আশ্রম ও মহাভারত-এর আশ্রমে একটু বেশ তফাত আছে। কালিদাসের আশ্রম পরম পবিত্র— পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ, এখানে অধর্মের লেশও থাকিতে পারে না। তাই একটি পাখি মারার জন্য আয়ুর তপোবন হইতে বিদায়[৫] তাই শকুন্তলারও বিদায়। কিন্তু মহাভারতের আশ্রম আর-একরূপ, সেখানে সর্বদমন বারো বৎসর ধরিয়া কত পশুই বধ করিয়াছে, তথাপি সে আশ্রমেই ছিল। শকুন্তলাও লুকাইয়া বিবাহ করার পরও বারো বৎসর আশ্রমে ছিলেন। কালিদাসের আশ্রমে বিলাসের লেশমাত্র নাই। তপস্বীরা স্বয়ং সমিধ্ আহরণ করেন। কারণ, শাস্ত্রে লেখা আছে, ‘‘কুশপুষ্প-সমিদ্বারি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।’’[৬] তাঁহারা সোমযজ্ঞ করেন, রোজ তিনবার সবন করেন। তাঁহারা উড়িধান খান ও পশুদিগকে বিতরণ করেন। মহুয়ার ফলের তেল ব্যবহার করেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহাদের অপার করুণা। তাঁহারা পরেন গাছের ছাল। তপোবনে আছে লতা, গাছ, ফল, ফুল, হরিণ ও ময়ূর। আর আছে শান্তি, ধর্ম, তপ, ক্ষমা, করুণা আর নিষ্ঠা।

এমনই তপোবনে কালিদাস হিন্দুয়ানির গোড়াপত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার একশেষ দেখাইয়াছেন। দুষ্মন্ত একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা। তিনি আসিতেছেন— মৃগয়ায় উন্মত্ত। তাঁহার রথ চলিতেছে ভয়ানক বেগে— এই যে জিনিসটা একটি দাগের মতো ছোট্ট দেখাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সেটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। যে দুটা জিনিসের মাঝে অনেকখানি জায়গা, সেটা হঠাৎ জুড়িয়া গেল— যেটা স্বভাবত বাঁকা, সেটা ঠিক সোজা দেখাইতে লাগিল— কোনো জিনিসই একক্ষণের জন্য পাশে দেখা যায় না— দূরেও দেখা যায় না। এই হরিণ যায়— ঐ যায়— এই মার্‌লাম, রাজার মুখে এইমাত্র শব্দ— রাজা আর কিছু দেখিতেছেনও না, শুনিতেছেনও না। এমন সময়ে শব্দ হইল— ‘মৃগটি আশ্রমের, মারিও না, মারিও না।’ রাজা শুনিতে পাইলেন না— কিন্তু সারথি শুনিল।

সে বলিল, "ঐ হরিণটার ও আপনার মাঝখানে তপস্বীরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" রাজার আর কথা নাই; সারথি সত্য বলিতেছে, কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহার বিচার নাই। সারথির ভুল হইল, কি সে সত্যই বলিল, তাহার বিবেচনা নাই। একেবারে বলিয়া বসিলেন, "তবে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাও।" তাহার পর রাজা তপস্বীদের দেখিতে পাইলেন। তাহারাও আবার বলিল, "আশ্রমের মৃগ, মারিও না, মারিও না। আপনার বাণ তুলিয়া রাখো। রাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, "এই লইলাম।" তপস্বীরা বলিলেন, "তোমার পুত্রলাভ হউক্। সে রাজচক্রবর্তী হউক্।" রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শিরোধার্য।" এইসব ঘটনা এত শীঘ্র হইয়া গেল যে, ইহার মধ্যে রাজা ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিবার অবসরও পান নাই। তপস্বীরা বলিলেন, কণ্বের আশ্রম— মালিনী-তীরে ঐ দেখা যায়। যদি কাজের তাড়া না থাকে, আতিথ্য স্বীকার করিয়া যান।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলপতি আছেন্ কি?" উত্তর হইল, "না, তিনি নাই। তবে তাঁর কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া তিনি সোমতীর্থে গিয়াছেন।" "আচ্ছা, তাঁরি সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। তিনিই আমার ভক্তি মহর্ষিকে নিবেদন করিবেন।" ঋষি ঘরে নাই, তবু তাঁহার আশ্রমের পূজা, যেটুকু প্রাপ্য, দিয়া যাইতে হইবে। সারথিকে রথ চালাইতে বলিলেন। যখন তপোবন নিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তখন বলিলেন, "ভিতরে রথ গেলে তপোবনের পীড়া হইতে পারে, রথ এইখানেই রাখো।" তাহাতেও সন্তুষ্ট নন;— বলিলেন, "রাজবেশে তপোবনে যাইতে নাই; আমার ধনুঃ ও পোশাকপরিচ্ছদ এইখানে থাক্" বলিয়া, সব খুলিয়া ফেলিলেন। সামান্য বেশে, তীর্থযাত্রীর বেশে, আশ্রমের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপথ্যে শব্দ হইল— "ইদো ইদো সখীয়ো।"

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়াই তাহাকে ভালোবাসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা, মহর্ষির কন্যা, তাহাকে তো পাওয়া যাইবে না, ভাবিয়া আকুল হইলেন। শেষ কথা-বার্তায় যখন জানিলেন, তিনি অপ্সরার মেয়ে, তখন রাজা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যখন তাহারই দলের লোক আসিয়া তপোবনের চারিদিকে গোলমাল করিতেছে শুনিলেন, আর একটা হাতি খেপিয়া ধর্মারণ্যের দিকে ছুটিতেছে শুনিলেন, তিনি শকুন্তলাকেও ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। কেন-না, গিয়াই তিনি সকলকে বারণ করিয়া দিবেন যে, কেহ যেন তপোবনের কোনোরূপ বিঘ্ন না করে। যখন তিনি বিদূষকের সঙ্গে যুক্তি করিতেছেন, কিরূপে তপোবনে কিছুদিন থাকা যায়, সেই সময়ে খবর আসিল, দুইটি ঋষিবালক তাঁহার কাছে

আসিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বিলম্ব করিতেছে কেন, শীঘ্র আনো।" বালক দুইটি আসিলে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি জানিতেন, গোখুরা সাপটিও যেমন, সলুইটিও তেমনি। তাহারা যখন যজ্ঞরক্ষার ভার তাঁহার উপর দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, "রথ আনো" তখনই যাইতে প্রস্তুত। রাজা গেলে ঋষিদের কাজ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তখন সদস্যেরা অনুমতি করিলে রাজা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যজ্ঞশালা হইতে বাহিরে আসিলেন। আবার সন্ধ্যার সময় যজ্ঞ আরম্ভ হইবার পূর্বেই রাক্ষসেরা যজ্ঞবিঘ্ন করিতে আসিল। আবার রাজার ডাক পড়িল। এইরূপে রাজা যজ্ঞরক্ষার জন্য দিন-রাত খাটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সবকাজ শেষ হইলে পর, তিনি নগরগমনের অনুমতি পাইলেন।

রাজধানীতে পঁহুছিবার কিছুদিন পরে একদিন রাজা বিচারের ও রাজ্যের সব কাজ সারিয়া একটু বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বুড়া কঞ্চুকী আসিয়া খবর দিল, কণ্বের কতকগুলি শিষ্য আসিয়াছেন; খবর দিতে বৃদ্ধের মন সরে না। অনেক খাটুনির পর একটু আরাম করেন, আজ আবার তাও হবে না। বৃদ্ধ একটু চঞ্চল হইল; তবে কাজ না করিলেও নয়। বিশেষ ঋষিদের কাজ, সকলের আগে। কঞ্চুকী খবর দিল। রাজার দ্বিরুক্তি নাই, অমনি বলিলেন, "কণ্বের শিষ্যেরা আসিয়াছেন, আচ্ছা, তাঁহাদের অভ্যর্থনা তো আমাদের দিয়া হইবে না। পুরোহিত ঠাকুরকে বলো, তিনি যেন শ্রৌতসূত্রে যেরূপ বিধি আছে, সেইমতো তাঁহাদের সৎকার করিয়া নিজেই তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আর আমাকেও অগ্নিশরণে লইয়া চলো।" ঋষি-তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করার মতো পবিত্র জায়গা— অগ্নিশরণই। সে জায়গাটি অতি পবিত্র। এইমাত্র ঝাড়ু দেওয়া হইয়াছে, নিকটেই হোমধেনু। রাজা বারান্দায় বসিলেন। পুরোহিত রাজাকে দেখাইয়া ঋষিদের বলিলেন, "এই দেখুন, যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর, বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিপালক, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া আপনাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।" শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী ও শকুন্তলার সঙ্গে রাজার যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শার্ঙ্গরব তো বড়োই কড়া কড়া কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা কিন্তু বিরক্ত হইয়াও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহাকে দস্যু বলা হইল, তাঁহাকে নিপাত দেওয়া হইল; কিন্তু রাজা অটল অচল। তিনি সব-কথারই জবাব দিলেন, কিন্তু স্থিরভাবে— ধীরভাবে। তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না, শকুন্তলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। শকুন্তলা সবকথা মনে করাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু

শাপ হইতেছে, "তুমি বুঝাইয়া দিলেও তিনি মনে করিয়া উঠিতে পারিবেন না," তখন শকুন্তলার সব চেষ্টা বিফল হইল। রাজা শাপের জন্য মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনটা বড়ো খারাপ হইয়া গেল; তাহাতে তিনি শেষ মনে করিলেন, "হবেও বা।"

কণ্বের তপোবন ছাড়িয়া, ভারত ছাড়িয়া স্বর্গের পথে হেমকূট গিরি। তাহার চূড়াগুলি সোনার। পর্বতটি পূর্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্যন্ত গিয়াছে। আমাদের সন্ধ্যার সময় যেমন সোনালি রঙের মেঘ দেখা যায়, পর্বতটি আগাগোড়া তাই। যেন সোনার রস ঢালিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, তাহারও উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ, এটি তাহারই বর্ষ-পর্বত; এখানটি তপস্যার সিদ্ধক্ষেত্র।[৭] এখানে তপস্যা করিলে সিদ্ধি হইবেই হইবে। এখানে মরীচির পুত্র কশ্যপের আশ্রম, মরীচি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, তাঁহার পুত্র কশ্যপ। তিনি সুর, অসুর, গরুড়, নাগ প্রভৃতি প্রাণী সকলেরই পিতা। রাজা শুনিয়াই বলিলেন, "বটে, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে হইবে।" রথ থামিল, চাকার শব্দ হইল না; ধূলা উড়িল না, মাটি স্পর্শ করিল না। রথ নামিলেও নামিল বলিয়া বোধ হইল না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারীচের আশ্রম কোন দিকে?" মাতলি হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ঐ যে গাছের গুঁড়ির মতো অচল মুনি তপস্যা করিতেছেন, ঐ দিকে— দেখ, মুনির দেহ অর্ধেকটি উঁইয়ের ঢিপিতে ডুবিয়া আছে। কত সাপের খলস উহার বুকে জড়াইয়া আছে, কত পুরানো লতা উঁহার গলায় জড়াইয়া আঁটিয়া গিয়াছে। কাঁধের উপর জটা পড়িয়াছে। তাহাতে পাখিরা বাসা করিয়াছে।" রাজা দেখিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কী কঠোর তপস্যা!!! রাজা আবার বলিলেন, "এখানকার তপোবন দেখিতেছি আশ্চর্য! এখানে কত কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, যাহাই চায়, তাহাই পায়, তথাপি লোকে বায়ু ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। সোনার পদ্ম ফুটিয়া আছে, তাহার ফুলের ধূলায় জল হলুদ হইয়া গিয়াছে, সেই জলে ইঁহাদের পূজাপাঠ হয়। রত্ন-শিলাতলে বসিয়া ইঁহারা ধ্যান করিতেছেন। অপ্সরাদের সম্মুখে বসিয়া সংযম করিতেছেন। আমাদের মুনিরা যাহা পাইবার জন্য তপস্যা করেন, সেইসব পাইয়াও ইঁহারা তপস্যা ছাড়িতেছেন না।" মাতলি বলিলেন, "লোকের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে উঁচার দিকেই উঠে। অহে বৃদ্ধ শাকল্য! মারীচমুনি এখন কী করিতেছেন?" "দাক্ষায়ণী তাঁহাকে পতিব্রতা-ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর তিনি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেছেন।" রাজা বলিলেন, "তবে তো তাঁহার অবকাশের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।" আমাদের কর্তাদের মতো

রাজা ব্যস্ত হইলেন না। বলিলেন না, "তবে আজ থাক, আর-এক সময় দেখা পাইব।" মাতলি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি তাঁহার ফুরসত দেখিয়া খবর দিই।"

ইতিমধ্যে রাজার সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আলাপ হইল, শকুন্তলার সঙ্গে আলাপ হইল। রাজা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। ক্ষমা চাহিলেন। শকুন্তলার সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল। তাহার পর মাতলি আসিয়া তাঁহাকে প্রজাপতির কাছে লইয়া গেলেন। রাজাও শকুন্তলা ও সর্বদমনকে সঙ্গে লইলেন।

প্রজাপতি কশ্যপ দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া দাক্ষায়ণীকে বলিলেন, "ঐ দেখো, রাজা দুষ্মন্ত পৃথিবীর রাজা, তোমার পুত্রের প্রধান সহায়, অসুর যুদ্ধে ইনি ইন্দ্রের আগে আগে গিয়া অসুর নাশ করেন। ইন্দ্রের শত্রু বধ ইঁহার হাতেই হয়। তাঁহার বজ্র এখন আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আকার তেজ দেখিয়া সেটি আমি বেশ বুঝিয়াছি।" মাতলি বলিলেন, "মহারাজ! ঐ দেখুন, দেবতাদের পিতা-মাতা আপনাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিতেছেন। উঁহাদের নিকট যান।"

রাজা বলিলেন, "মুনিরা যাঁহাদের দ্বাদশ আদিত্যের জনক-জননী বলেন, যাঁহারা যজ্ঞভাগেশ্বর ইন্দ্রের পিতা ও মাতা; পরম পুরুষ যে দম্পতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইঁহারাই কি তাঁহারা? দক্ষ ও মরীচি ইঁহাদের উৎপত্তি স্থান। ইঁহারা ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে কেবল এক পুরুষ মাত্র অন্তর।" তিনি আগু বাড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রের দাস আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছেন।" দু-জনেই আশীর্বাদ করিলেন। শকুন্তলাও তাঁহাদের পাদবন্দনা করিলেন। মরীচি আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার স্বামী ইন্দ্রের সমান, তোমার পুত্র জয়ন্তের সমান, তোমায় আর কী আশীর্বাদ করিব, তুমি শচীর সমান হও।" দাক্ষায়ণীও শকুন্তলাকে "পতিসোহাগিনী হও" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ছেলেটিকেও "রাজচক্রবর্তী হউক" বলিয়া দু-জনেই আশীর্বাদ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিধানে বিবাহ করি; কিন্তু ইনি যখন আমার কাছে আসিলেন, আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না যে, ইঁহাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম; সুতরাং ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কণ্বমুনির কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধী হইলাম। তাহার পর আঙটি দেখিয়া আমার সবকথা মনে হইল। কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন মরীচি বলিয়া দিলেন, "আমি ধ্যানে জানিয়াছি,

দুর্বাসার শাপই ইহার কারণ।" তখন শকুন্তলা ভারি খুশি যে, রাজা তাঁহাকে অকারণে তাড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু শাপের কথা তিনি তো জানিতেন না, কখনো শুনেনও নাই, তবে সখীরা তাঁহাকে আঙটিটা রাজাকে দেখাইবার জন্য বড়ো জেদ করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি অনুমান করিলেন— শাপ হইয়াছিল। তখন মারীচ বলিলেন, "শোনো মা, তোমার যে অদৃষ্টে দুঃখ হইয়াছে, তাহার কারণ শাপ, সেই শাপে রাজার স্মরণশক্তির লোপ করিয়া দিয়াছিল। এখন শাপের অবসান হইয়াছে। এখন স্বামীর উপর তোমার খুব প্রভুত্ব হইবে। দেখো, আরশিতে যতক্ষণ ময়লা থাকে, তখন ছায়া তাহাতে খেলিতে পারে না। পরিষ্কার আরশিতে খুব খেলে।

শকুন্তলা-য় ব্রাহ্মণের প্রভাব অসীম। এক ব্রাহ্মণ দুর্বাসার শাপে অপ্সরার মেয়ে বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার কত কষ্ট। তপোবন হইতে বিদায়, রাজার নিকট তাড়না, বিজনে অনাথিনীর মতো থাকা। সবই তো সেই দুর্বাসার শাপে। আবার অন্যদিকে দেখো, প্রথমেই রাজা হরিণমারা বন্ধ করিতেই তপস্বীরা আশীর্বাদ করিল, তোমার পুত্র হউক্, সে চক্রবর্তী রাজা হউক্। সেই আশীর্বাদ সর্বত্র— কণ্বমুনিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরও সেই কথাই বলিলেন। মারীচও সেই কথাই বলিলেন। চক্রবর্তী তো যে সে লোক হইতে পারে না। রাজার ছেলেটির সংস্কার করিল কে? স্বয়ং মারীচ— ব্রহ্মার নাতি। সে ছেলে যে চক্রবর্তী হইবে, তাহার আবার কথা! ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে নাটক আরম্ভ, আশীর্বাদ ফলিল নাটকও শেষ হইল।

নারায়ণ
মাঘ, ১৩২৪

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে সাহিত্যকে ধর্মতত্ত্ব প্রচারের বাহন করা হরপ্রসাদের সাহিত্য-রুচিতে অনুমোদন যোগ্য মনে হয়নি। তিনি সরাসরি বঙ্কিমবাবুকে নিজের অবস্থান জানিয়েছিলেন : "যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য, পরম সৌন্দর্য অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম, তাহাই পরম ধর্ম। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতো হিন্দুধর্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে Overrule করিলেন।" (হ-র-সং-২, পৃ. ৩১)। অন্যত্র লেখেন, "তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু ধর্ম-প্রচার, একটু দেশ-ভক্তির প্রচার। এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। এক দল বলেন, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য-সৃষ্টি হইলেই তাহারই নাম ধর্ম-প্রচার, তাহারই নাম দেশ-ভক্তি-প্রচার। কারণ, উৎকৃষ্ট ধর্ম, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য, উৎকৃষ্ট দেশ-ভক্তি, তিনই এক জিনিস। আর-এক দল বলেন, "না, উৎকৃষ্ট ধর্ম, উৎকৃষ্ট দেশ-ভক্তি, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য, এক জিনিস নয়; সুতরাং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যে ধর্ম বা দেশ-ভক্তি না দিলে, শুধু সৌন্দর্যে ধর্ম বা দেশ-ভক্তি প্রচার হয় না। এখানেও দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুই বাদই আছে।

বঙ্কিমবাবু দ্বৈতবাদী হইলেন। তাঁহার চেলাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে মত দিলেন না। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ [১৮৮৪ খৃ.], দেবী চৌধুরানী [১৮৮৪ খৃ.], সীতারাম [১৮৮৭ খৃ.], এই সময়কার দ্বৈতবাদের বই।" (হ-র-সং-২, পৃ. ৩৭-৩৮)। হরপ্রসাদ অবশ্যই অন্যতম 'অদ্বৈতবাদী'। সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টিই চরম লক্ষ্য হওয়া সঙ্গত মনে করেন।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক পরে লেখা The Late Bankim Chandra Chatterjee (The Calcutta University Magazine, Vol. I, No. 5, May 1, 1894) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, "A chronological study of his novels will show the development of his mind and the gradual attainment of excllence in art Extensive study of the Mahomedan period of Indians history, and the friendship extended to him by some distinguished Mahomedan gentlemen created in him a deep sympathy for the professors of Islam. With his non-seetarian education he could not understand why the great nations who inhabit India should hate each other so much. It is to this that we owe the mixing together of Hindu and Mahomedan characters in his early novels *Durgesha Nandini* and *Kapalkundala.* As he advanced in age, he gradually gave up intorducing Mahomedan characters in his novels, some of which are entirely without them."

....

"At an advanced age Babu Bankim Chandra gave up teaching by example, and began teaching by precept. From the concrete he rose to the abstract, from picture-

painting he rose to the theory of art, from a novelist he became a preacher. There again his peculiar idea of beauty influenced him, and he preached a religion which though nominally Hindu was the Religion of Beauty" (হ-র-সং-২, পৃ. ৮০১, ৮০৩)।

২. এই বইয়ের পৃ. ৩১৬ সূত্র ১ দ্র.

৩. অগ্নিশরণ বা অগ্নিশালা, যে গৃহে বা যে স্থানে যজ্ঞের অগ্নি রক্ষা করা হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে অগ্নিরক্ষা বিধি ছিল। অগ্নিশালার বেদি হবে চারকোণা। তার তিন দিকে তিনটি অগ্নি স্থাপিত হবে। পশ্চিমে গার্হপত্য, পুবে আহবনীয়, দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি। আহবনীয় অগ্নি দেবতাদের আহুতির জন্য, দক্ষিণাগ্নি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আহুতির জন্য নির্দিষ্ট। গার্হপত্য বা গৃহের মঙ্গলাগ্নি অনির্বাণ জ্বলবে। আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিনের যজ্ঞানুষ্ঠান অগ্নিহোত্র। শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কের সূচনায় মহর্ষি কণ্বের আদেশ নিয়ে রাজদর্শনে এসেছেন শুনেই দুষ্মন্ত তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত স্থান অগ্নিহোত্র গৃহের বারান্দায় উঠে দাঁড়ান।

৪. অনুবাদ : কালিদাসের (কবি প্রতিভার) সর্বস্ব (শ্রেষ্ঠ নিদর্শন) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। তার মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্ক (শ্রেষ্ঠ) যেখানে শকুন্তলা (পতিগৃহে) যাচ্ছে।

৫. কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা। পুরূরবা ও উর্বশীর ছেলে আয়ু। ইন্দ্রের কাছে উর্বশীকে শপথ করতে হয়েছিল, পুরূরবা সন্তানের মুখ দেখলেই উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। তাই উর্বশী ছেলেকে চ্যবনমুনির আশ্রমে রেখে এসেছিল। পুরূরবা সন্তানের অস্তিত্ব জানত না। আয়ু ধনুর্বিদ্যায় পারঙ্গম। সে গাছের মাথায় প্রচ্ছন্ন একটি শকুনকে তীরবিদ্ধ করে। এই শকুনটিই পুরূরবার একটি রত্ন নিয়ে পালিয়েছিল। পাখি মারা

আশ্রমের নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ, এজন্য চ্যবনমুনি তাকে পুরূরবার কাছে পাঠিয়ে দেন। অধর্ম আচরণের জন্য আয়ুকে তপোবন থেকে নির্বাসিত হতে হল।

৬. অনুবাদ : ব্রাহ্মণ কুশ, ফুল, যজ্ঞের কাঠ, তীর্থজল নিজে সংগ্রহ করবেন।

৭. পৌরাণিক ধারণায় পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত : জম্বু, প্রক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, শাল্মলী। দ্বীপগুলি বর্ষে বিভক্ত। জম্বু দ্বীপের বর্ষ-সংখ্যা নয়টি। ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক, হিরন্ময়, উত্তরকুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল।

এক এক রাজার তিন তিন রানী

কালিদাসের নাটকগুলিতে এক-এক রাজার তিন তিন রানী। মালবিকা-য় তিন রানীই রঙ্গমঞ্চে উঠিয়াছেন। একটির নাম ধারিণী, একটির নাম ইরাবতী ও আর-একটির নাম মালবিকা। বিক্রমোর্বশী-তে এক রানীর নাম ঔশীনরী, আর-এক রানী উর্বশী। রাজার তৃতীয় ভালোবাসার সামগ্রী উদয়বতী নামে বিদ্যাধর-কন্যা। শকুন্তলা-য় রাজার পাটরানী বসুমতী, আর-এক রানী হংসপদিকা, আর-এক রানী শকুন্তলা। তিন জায়গায়ই পুরানো রানীটি পাটরানী। কোনো রাজার মেয়ে, বয়স একটু হইয়াছে, গৃহিণীপনায় খুব মজবুত, দ্বিতীয়টি নাচে, গানে, ছবি আঁকায় খুব পটু, তার উপর খুব রূপসী, খুব চালাক চতুর। আর তৃতীয় নাটকের নায়িকা, তাঁহার সহিত রাজার প্রেম লইয়াই নাটক। শেষ তিনিই আর দুই রানীকে ছাপাইয়া উঠিলেন।

মালবিকা-য় তিনটি রানীকেই রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়। উর্বশী-তে দুইটিকে ও শকুন্তলা-য় মাত্র একটিকে। রঙ্গমঞ্চে দেখিতে না পাইলেও তাঁহারা সকলেই আছেন ও কাজ করিতেছেন। নাটকের কাব্যাংশটাকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। তিনখানি নাটক মন দিয়া পড়িলে বেশ মনে হয়, যেন কালিদাস মালবিকা-য় প্রথম তিনটি রানীকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আবার যদি তিনটাকেই বাহির করেন, তাহা হইলে জিনিসটা কতকটা একঘেয়ে হইয়া যাইবে। তাই একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উর্বশীতে এমনই কৌশলে একটি ত্যাগ করিয়াছেন যে, লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। তিনি ঔশীনরীকে দুইবার আনিয়াছেন; একবার আনিয়াছেন, ইরাবতীর মতো। ভয়ানক মান। রাজা অন্যের প্রতি আসক্ত, হঠাৎ পথে একখানা ভুর্জপত্রে এই কথাটা পড়িয়া একেবারে রাজার কাছে আসিয়া তাহাকে

যার পর নাই তিরস্কার। রাজা পায়ে পড়িয়া মান ভাঙাইতে গেলেন, তাহাতে রানীর মান ভাঙিল না। তিনি রাগে গর্‌গর্‌ করিযা চলিয়া গেলেন। বিদূষক রাজাকে উঠাইল। অগ্নিমিত্র ইরাবতীর উপর রাগ করিয়াছিলেন। এত করে পায়ে পড়িলাম, তাতেও মান ভাঙিল না। যাক্‌, ওর কথা আর ভাবিব না, কারণ সে তো একটা চাকরানী বই নয়। পুরূরবা কিন্তু তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, দেখো, আমার আর রানীর উপর সে রকম টান নাই, সে কথাটা যখন তিনি বুঝিয়াছেন, তখন আমি যতোই ভালো কথা বলি, তাহার কানে উঠিবে কেন? প্রাণে লাগিবে কেন? তবে তিনি পাটরানী বলিয়া উহাকে একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না। অপমানের পর অগ্নিমিত্র আর ইরাবতীর নামও করেন নাই! কিন্তু শেষ মিলনের সময় যখন উর্বশী আয়ুকে বড়োমার কাছে পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন, তখন রাজা পুরূরবা বলিলেন, না না, তা হইবে না, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁর কাছে যাব।

এই তো গেল ঔশীনরীর সহিত ইরাবতীর স্বভাবের মিল। কিন্তু ঔশীনরীর আর-এক মূর্তি—সে মূর্তিতে তিনি ধারিণীকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। আজি হইতে আমার স্বামী যাহাকে ভালোবাসিবেন, অথবা যে আমার স্বামীকে ভালোবাসিবে, আমি তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসার করিব। কালিদাস যেন ধারিণী ও ইরাবতী, দুইটি রানী ভাঙিয়া ঔশীনরীকে গড়িয়াছেন। সুতরাং, ভালো সমজদার এই একটি রানীকে দুইটি করিয়া লইতে পারেন। তথাপি যে অত সমজায় না, তাহার জন্য উদয়বতী সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা পথে পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে তো তাহাকে আনেনেই নাই, অঙ্কেও তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই, প্রবেশকে তাহার নাম করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শকুন্তলায় ইরাবতীও আছেন ধারিণীও আছেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে উঠেন নাই। ঐ যে রানী হংসপদিকা গানে বলিতেছেন, ভৃঙ্গরাজ, তুমি আমের বউলে একটি চুমা দিয়াই পদ্মের কাছে গেলে, আর সেইখানেই রহিয়া গেলে, বউলের কথা তোমার মনেই পড়িল না। এটিতে রাজার উপর বেশ ঠেস আছে, রাজা দূর হইতে গান শুনিয়া সেটি বেশ বুঝিলেন। আর বলিলেন, বসুমতীর কাছে অধিক থাকি বলিয়া হংসপদিকা আমায় বেশ তিরস্কার করিল। হংসপদিকায়ও ইরাবতীর গন্ধ ভর ভর

করিতেছে। আর বসুমতীও যেন ধারিণীর ছাঁচে ঢালা। তিনি রাজার দাসীর হাত হইতে রং ও তুলি কাড়িয়া লইয়া নিজেই সেগুলি রাজাকে দিতে আসিতেছিলেন, পথে শুনিলেন, মন্ত্রীর পত্র লইয়া দ্বারবান যাইতেছে, তাই রাজকার্যে বাধা দিবেন না বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। অথবা বসুমতীকে ঔশীনরীর নকলও বলা যাইতে পারে। তাঁহাতে একাধারে মানিনীর ও প্রবীণার বেশ মিল হইয়াছে।

শুধু যে একঘেয়ে হবার ভয়েই কালিদাস এক-একটি করিয়া রানীকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এমন নহে। ওরূপ করার আরো কারণ ছিল। কালিদাসের যতই বয়স হইতেছিল, তাঁহার হাতও ততই পাকিতেছিল। আগে মনের যে কথাটা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অনেক আড়ম্বর করিতে হইত, পরে সেটা এক কথায় বলার ক্ষমতা তাঁহার জমিয়া আসিতে লাগিল। আগে যেটা ফুটাইবার জন্য তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসিতে হইত, শেষ একবার তুলি বুলাইলেই সেটা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাই অগ্নিমিত্রে যাহা লম্বা চওড়া, শকুন্তলা-য় সেটা খুব সংক্ষেপ। এইরূপে নায়ক-নায়িকাঘটিত ব্যাপারটা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়া কালিদাস নাটককে লোকশিক্ষার দাস করিয়া তুলিতে পারিলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যেমন চিনি ঔষধের দাস, চিনির ভিতর ঔষধের শুধু বীজটি সূক্ষ্মভাবে আছে, কালিদাসেব নাটক তেমনি শিক্ষার দাস, নাটকের মধ্যে ঔষধ বা শিক্ষা সূক্ষ্মভাবে লাগিয়া আছে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধের মতো মধুতে মাড়িয়া ঔষধ খাইলে ঔষধটা আরো তিতো হয়। অশ্বঘোষের কাব্য মধুমাড়া তিতো ঔষধ। কালিদাসের সেরূপ নহে।

কালিদাসের হাতপাকার কথা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। দেখুন, মালবিকাগ্নিমিত্রে রানীরা তিনজনেই রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছেন। একে নূতন কবি, তাহাতে আবার খুব মুখফোঁড় নয়, পাছে রানীদের চরিত্র লোকে না বুঝিতে পারে, তাই কালিদাস প্রত্যেক রানীর সঙ্গে এক-একটি চেটী দিয়াছেন। চেটীটি রানীর দোছোট, রানীও যখন রঙ্গমঞ্চে, চেটীটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে, যেন নূতন কবি রানীকে একেলা সেখানে আনিতে নারাজ। তাহারা কত কথাই কয়, কত কাজই করে, কেবল রানীর মনের ভাবটা প্রেক্ষককে বুঝাইবার জন্য। তবু কবির মন স্পষ্ট হয় না যে, সকলে তাহার কথাটা ঠিক বুঝিতেছে। কিন্তু উর্বশীতে তত

শিখাইতেছেন। কিছুতেই তাহাকে রাজার কাছে যাইতে দেন না এবং যাহাতে রাজা নূতন দাসীর সেবা না পান, সে বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকেন।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একদিন রানী ছবির ঘরে দাঁড়াইয়া নূতন আঁকা একখানি ছবি দেখিতেছিলেন, এমন সময় রাজা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রানী আসিয়া রাজার সঙ্গে এক আসনে বসিলেন। রাজার নজর ঐ নূতন ছবিখানির উপর পড়িল। রাজা দেখিলেন, ছবিখানি রানীর। কিন্তু তাহার সঙ্গে তাহার অনেক দাসী আছেন, আর তাহার মধ্যে রানীর কাছেই যে বালিকা দাসীটি ছিল, তাহাকে দেখিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অপূর্ব দাসীটি কে?" রানী সে কথায় কান দিলেন না। রাজা বারবার জিজ্ঞাসা করায় রানীর ছোট্টো মেয়ে বসুলক্ষ্মী বলিয়া ফেলিল, "বাবা তুমি ওকে জানো না, ও যে মালবিকা।" এই ঘটনার পর রানী আরো সাবধান হইলেন এবং যাহাতে রাজা কিছুতেই মালবিকাকে দেখিতে না পান, তাহার বিধিমতো চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজাকে বিদূষকের শরণ লইতে হইল। সেও খুব মজবুত! মালবিকাকে রাজার কাছে আনাইবার এক অদ্ভুত উপায় বাহির করিল।

রানী যে ওস্তাদকে দিয়া মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন, তাহার নাম গণদাস। বিদূষক গণদাসের কাছে গিয়া বলিল, "দেখো রাজার যে গানের ওস্তাদ আছেন তাহার নাম হরদত্ত। তাহার বড়ো অভিমান যে, নাচগান শিখাইতে তিনি অদ্বিতীয়; তিনি বলেন কী তা জানো, যে গণদাস আমার পায়ের ধূলার সঙ্গে সমান নয়।" গণদাস এইকথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, জানা আছে, আমায় আর তার তুলনাই হয় না। সমুদ্রের সঙ্গে কি ডোবার তুলনা হয়।" বিদূষক এ-কথাটি হরদত্তের কাছে গিয়া শুনাইয়া দিল। এইরূপ দোলাগাগিরি করিয়া দুই-জন ওস্তাদে বেশ ঝগড়া বাধাইয়া দিল। দু-জনেই একদিন রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া রাজার কাছে গিয়া নালিশ-বাদি হইলেন। গণদাস বলিলেন, "হরদত্ত আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছেন।" হরদত্ত বলিল, "উনিই আগে করিয়াছেন, আমি কেবল জবাব দিয়াছি মাত্র।" দু-জনেই বলিলেন, "আপনি আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া, আর আমাদের ওস্তাদি দেখিয়া, একটি বিচার করিয়া দিন।" রাজা বিদূষকের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া কানে কানে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ওস্তাদজিদের বলিলেন, "আমি যদি একা বিচার করি, দেবী বলিতে পারেন পক্ষপাত

হইয়াছে, অতএব তাঁহাকেও এখানে আনান হউক।" এই বলিয়া দেবী ও পণ্ডিত কৌশিকীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। রানী ঝগড়াটা মিটাইয়া দিবার খুব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টা বিফল হইল। বিদূষক এমনি কলকাটি খাটাইয়াছে যে, রানীর কোনো মতলবই খাটিল না। তিনি প্রথম পণ্ডিত কৌশিকীকে বলিলেন, "আপনি এ ঝগড়াটা কেমন বুঝেন?" অর্থাৎ পণ্ডিত কৌশিকী বলুন যে, ঝগড়া কখনোই ভালো নয়, ওটি থামাইয়া দেওয়াই ভালো। কৌশিকী কিন্তু সে দিক দিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার পক্ষ যে অসপত্ন হইবে, সে আশঙ্কা নাই। গণদাস খুব ওস্তাদ। এখানে মুখ না পাইয়া রানী গণদাসকে যত থামাইতে চান, সে তত রাগিয়া উঠে; বলে, "আপনি যদি আমায় পরীক্ষা দিতে না দেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া মনে করিব।" সুতরাং রানী হার মানিলেন। পণ্ডিত কৌশিকী মধ্যস্থ হইলেন। রানী বলিলেন, "বেশ হইয়াছে তোমরা দু-জনেই তোমাদের ছাত্রীদের নাচ কৌশিকী ঠাকুরানীকে দেখাও।" কৌশিকী বলিলেন, "তাও কি হয়, আপনিও দেখিবেন, রাজাও দেখিবেন, একা কি বিচার হয়।" স্থির হইল,— প্রেক্ষাগৃহে ওস্তাদেরা উদ্যোগ করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইবেন, আর ইঁহারা সকলে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইবেন, সেইখানে গণদাসের শিষ্যা মালবিকা প্রথম নাচ দেখাইবেন, কেন-না গণদাস বয়সে বড়ো সুতরাং তাঁহার পরীক্ষাই আগে হওয়া উচিত।

এই যে এতক্ষণ, বিদূষক কি চুপ করিয়া ছিলেন? না, তিনি ব্যঙ্গ করিয়া সকলকেই উস্কাইয়া দিতেছিলেন। রাজা যখন বলিলেন যে, রানী ধারিণী ও পণ্ডিত কৌশিকীর সমক্ষেই বিচার হইবে, তখন গোতম বিদূষক বলিল, "ঠিক বলিয়াছ অর্থাৎ দেবী আসিয়া দেখুন, কেমন কলে তাঁহাকে ফেলিয়াছি, তাঁহার আর লুকাইবার জো টি নাই।" আবার যখন দেবী ও কৌশিকী আসিতেছিলেন, তখন বিদূষক কৌশিকীকে পীঠমর্দ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছিলেন। কামতন্ত্রে যাহারা সহায় হয়, তাহাদের পীঠমর্দ বলে। বিদূষক বোধ হয় মনে করিতেন যে, কৌশিকীর সন্ন্যাসিনীর বেশটা ভণ্ডামি মাত্র। ওটা কেবল তাহার আসল কথাটা ঢাকিবার জন্য। তাই সে তাহাকে এরূপ কড়া ঠাট্টা করিয়া ফেলিল।

রানী যখন বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, ইহাদের বিবাদটাই আমার ভালো লাগিতেছে না— তখন গণদাস একবার বলিয়া উঠিলেন, "আপনি মনেও করিবেন

এমন করিয়া ভুলে থাকা উচিত নয়। মাঝে মাঝে আমায় এক একবার মনে করিও। রাজা করিলেনও তাই, বিদূষককে পাঠাইয়া দিয়া তিনি যে ভুলেন নাই, সেটা জানাইয়া দিলেন। এই মান আর ইরাবতীর মান-এ কত তফাত।

ইরাবতীর প্রতি রাজার আসক্তি ধারিণী সহিতে পারেন নাই। তাহার সর্বনাশের কতই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ঔশীনরী কোনোরূপ ষড়যন্ত্র করিলেন না, নিজে পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইয়া একটা হীন সন্ধি করিয়া গেলেন, হার মানিয়া নিজের মান বজায় রাখিয়া গেলেন। আর বসুমতী জিনিসটাকে বড়ো একটা গ্রাহ্যই করিলেন না। একটু বিরক্ত হইলেন বটে, একটু চঞ্চল হইলেন বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২৪

অগ্নিমিত্রের ভাঁড়

রাজা দুষ্মন্তের ভাঁড়টি একটু বোকা বোকা, এ কথাটি পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু অগ্নিমিত্রের ভাঁড়টি সেরূপ নহে, খুব চালাক, চট্‌পটে; চালবাজ ও হুঁশিয়ার। একটা কথা পড়িলেই তাহা তলাইয়া দেখিতে পারে এবং আপনার কাজ কখনো ছাড়ে না। আপনার কাজ অর্থাৎ রাজার কাজের জন্য সে সব করিতে পারে। একজনকে আজ রানী করলে, কাল আবার তাঁকেই পায় ছান্‌লে। ভাঁড়রা সব সময়েই রসিকতা করিবার অর্থাৎ লোককে হাসাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু এ বিদূষকটির কথা অনেক সময় খরধার বিদ্রূপে পূর্ণ; লোকের মর্ম স্পর্শ করে। ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা ও সেই সঙ্গে বেশ দুকথা শুনাইয়া দেওয়া, তাহার বেশ আসে কখনো বাধে না।

রানী ধারিণীর এক ভাই আছেন। তিনি জাতিতে রানীর চেয়ে অনেক ছোটো, সে কালে তো চারিবর্ণে বিবাহ ছিল। রানীর বাপ চারবর্ণের বিবাহ করিয়াছিলেন। রানীর মার চেয়ে ঐ ভাইটির মা জাতে খাটো ছিল, সুতরাং তাঁর ছেলেও জাতে খাটো হইয়াছে। সে ভাইটির নাম বীরসেন। তিনি ভগিনীপতির একজন সেনাপতি। তিনি একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে উদ্ধার করেন এবং মেয়েটি সুন্দরী ও শিল্পকার্যে দক্ষ দেখিয়া আপন ভগিনীকে উপহার দেন। রানীর এক চাকরানী নাচে ও গানে রাজাকে মুগ্ধ করিয়া রানী হইয়া বসিয়াছে এবং বড়োরানীর উপর চালবাজি করিতেছে, এটা তাঁহার অসহ্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি কিছুই করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না। নূতন মেয়েটি পাইয়া বড়োরানীর আশা হইল যে, সে তো সুন্দরী বটেই, তাহার উপর তাকে যদি নাচ গানে তৈয়ার করিয়া তোলা যায়, রাজা তাহাকে দেখিলেই মেজরানীকে আপনা আপনি ত্যাগ করিবেন, বড়ো রানীর একটি কন্টক দূর হইবে। তাই তিনি একজন ওস্তাদ রাখিয়া নূতন দাসীটিকে নাচ গান

আড়ম্বর নাই, তত সন্দেহ নাই, কবির যেন বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার প্রেক্ষককুল তাঁহার মতলবের যথার্থ সমজদার। তাই তিনি পাটরানীকে একবার বাহির করিলেন, মানিনী তেজস্বিনী, ইরাবতী সাজাইয়া, আর-একবার বাহির করিলেন, গম্ভীর গৃহিণী সাজাইয়া। সঙ্গে সেই একই চেটী, কিন্তু সে কথাবার্তা বড়ো একটা কয় না। শকুন্তলা-য় রানীদের রঙ্গমঞ্চেই আনিলেন না। একজনকে নেপথ্যে একটি গান করাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি মানিনী, ঈর্ষায় ভরপুর হইতেছেন; আর একজনকে পথে পথে বিদায় করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, গম্ভীরা গৃহিণী হইলেও রমণী ও রমণীর যাহা স্বভাব, তাহাতে সেটি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। রাজা যে অন্যের প্রতি আসক্ত, এটা তিনি সহিতে পারেন না। এইরূপে একবারমাত্র তুলি বুলাইয়াই তিনি সব কথাগুলি ফুটাইয়া তুলিলেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে কালিদাসের কেবল হাত পাকিয়াছে, সংক্ষেপ করার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, এমন নহে। তিনি অনেকটা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছেন। সে খর খর ভাব, সে তীব্রতাটা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ রাগে ইরাবতী রাজাকে হার ছুড়িয়া মারিল ও আর রাজার মুখ দেখিল না, বরং রাজার ছবির কাছে গিয়া মাপ চাহিবে, তবু জীয়ন্তে রাজার কাছে যাইবে না। তাহার চক্ষে যে অন্যের প্রতি আসক্ত, আমার পক্ষে সে একখানি ছবিমাত্র; একটি পাথরের প্রতিমা মাত্র। ঠিক সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ রাগ বটে; ঔশীনরী অত দূর করিলেন না। রাজা পায়ে পড়িয়া মান ভাঙাইতে গেলেও তাহার মান ভাঙিল না, কিন্তু আবার সে আসিয়া বলিয়া গেল, আমার স্বামী যাহাকে ভালোবাসেন বা যে আমার স্বামীকে ভালোবাসে, সে আমার ভগিনী, আমি তাহার সহিত ভগিনীভাবে ঘরকন্না করিব। রানী বসুমতীর অবস্থাও তেমনি, রাগও তেমনি। তিনিও একটা হাঙ্গাম করিবার জন্য দাসীর হাত থেকে রং-এর বাক্স ও তুলি কাড়িয়া লইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু রাজা রাজকার্যে ব্যাপৃত জানিয়া ফিরিয়া গেলেন। বসুমতীর এই আচরণে তাঁহার উপর আমাদের বড়োই শ্রদ্ধা হয়। তাঁহার রাগের কারণ আছে সবাই জানে, তাঁহার ব্যথায় সকলই ব্যথী, তিনি একটা হাঙ্গাম করিলেও লোকে তাঁহার নিন্দা করিত না। কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগ অসীম, আমার স্বামী রাজা। রাজকার্য তাঁহার সকলের চেয়ে বড়ো। আমি তাঁহার রানী, বড়ো রানী, গৃহিণী,

সর্বময়ী, সব সত্য। কিন্তু রাজার রাজকার্য গৃহিণী রানী অপেক্ষা ঢের বড়ো। সুতরাং রানী রাজকার্যের জন্য আত্মবিসর্জন দিলেন, অন্তত মনের রাগ মনে মারিয়া সরিয়া গেলেন। কবি যে কত মোলায়েম হইয়াছেন, ইহাতেই তাহা বোধ হইবে।

আর-একটা কথা, তিন রানীকে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া কালিদাস কী দেখাইয়াছিলেন? দেখাইয়াছেন— বিষের বিষ, ঈর্ষার ঝাল্, দ্বেষের চূড়ান্ত। ইরাবতীর বিষ, বড়োই বিষ; কিন্তু তাহাতে পরের অপকারের চেষ্টা নাই। সে বিষের ফল আত্মবিসর্জন, অনুতাপ। কেন মজিয়াছিলাম, কেন ভুলিয়াছিলাম, আমি যে দাসী ছিলাম, সে তো ছিল ভালো। দুদিনের তরে রানী হইয়া আমার সব গেল। পরের অপকার চেষ্টা নাই বটে, কিন্তু পরের উপর বিশেষ অনুরাগও নাই, বরং তফাত থাকার ইচ্ছা অধিক। কিন্তু ধারিণীর বিষের ফল ইরাবতীর সর্বনাশ, তাহাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণও হইল। তিনি ইচ্ছা করিয়া, মতলব করিয়া, তলায় তলায় ষড়যন্ত্র করিয়া ইরাবতীটির লোপ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লোপ হইলেন, তবুও ইরাবতীর উপর যে ঝাল্‌টা ঝাড়িতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ। কবি রানীকে এই আনন্দটুকু উপভোগ করাইয়াই তাঁহার লোপ করিয়া দিলেন। তাঁহার দেবী শব্দটিও গেল, তিনি চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এই যে রিষের বিষ, এটা ছেলেবেলায়ই ভালো লাগে। আর পরের মন্দ করিতে গিয়া নিজের মন্দ করাও সে অবস্থায় বেশ ভালো লাগে: তাই কালিদাস অল্পবয়সে মালবিকাগ্নিমিত্রে তাই বেশি করিয়া লিখিয়াছন, কিন্তু বয়স হইলে ওটা আর ততো ভালো লাগে না, অথচ ওটা প্রকৃতির খেলা, ছাড়িবার জো নাই। তাই ওটাকে একবারে লোপ না করিয়া নরম করিয়া মোলায়েম করিয়া আনিয়াছেন। হংসপদিকার বিষটা কী রকম দেখুন। সেও তো ঝগড়া করিতে পারিত, একটা হাঙ্গাম করিতে পারিত, কিন্তু কিছুই করিল না। আপন মনে বীণাটি ধরিয়া মনের দুঃখে গান করিতে লাগিল। সে গান কত মধুর; তাহাতে ঝালের লেশও নাই। আছে কেবল করুণাভিক্ষা ও সেই সঙ্গে একটু হোমিওপ্যাথিক ডোজে একটু তিরস্কার! তুমি আমের বউলে একটি মাত্র চুমা দিয়া কমলের কাছে গেলে, আর সেইখানেই রহিয়া গেলে। বউলের কথা তোমার মনেই পড়িল না। এ কথায় তিরস্কার একটু আছেই, কিন্তু তার চেয়ে করুণাভিক্ষাই অধিক। ওগো, তোমার

না যে, আমি হরদত্তের কাছে হারিয়া যাইব।" তখন বিদূষক বলিলেন, "দেবি, আমাদের একটু মেড়ার লড়াই দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, এতদিন বৃথা বেতন দেওয়া হইতেছে, একটু মজা দেখিব না?" দেবী বলিলেন, "তুমি বড়ো ঝগড়াটে।" গোতম বলিলেন, "এ কথাই নয়; দুটা মত্তহস্তী লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে, এদের একটা না হারিলে একেবারে রক্ষা নাই।" কৌশিকী যখন বলিলেন, "কোনো ওস্তাদরা নিজে বেশ কর্তোপ দেখাইতে পারেন, আবার কোনো ওস্তাদ সাক্‌রেদ শিখাইতে দক্ষ বৃহস্পতি। যিনি দুই পারেন তিনিই তো বড়ো ওস্তাদ কিনা?" বিদূষকের বড়ো স্ফুর্তি, সে বলিল, "শুনিলে ইহার অর্থ, এই হইল যে, সাক্‌রেদের নাচ দেখিয়া ও গান শুনিয়া মীমাংসা হইবে।" দেবী আবার যখন গণদাসকে ধমক দিয়া বলিলেন, "নিরর্থক কাজ লইয়া কেন গোল কর।" তখন গণদাসকে খেপাইবার জন্য বিদূষক বলিলেন, "আর ভাই গণদাস, চাকরি তো পাইয়াছ সরস্বতীর প্রসাদী মোয়াও খাইতেছ। ঝগড়া করিয়া কেন সুস্থ প্রাণ ব্যস্ত কর।"

দেবীর শেষ চেষ্টা— যখন রাজাই কৌশিকীকে মধ্যস্থ হইবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন কৌশিকী একলাই সাক্‌রেদদের গান শুনুন। তাহাতে কৌশিকী বলিলেন, "তাও কি হয়, সর্বজ্ঞ হলেও একলার কথায় লোকের আস্থা হয় না।" তখন রানী বুঝিলেন, এ সন্ন্যাসিনীও ঐদিকে অর্থাৎ রাজা যাহাতে মালবিকাকে দেখিতে পান, সেইদিকে তাঁহারো চেষ্টা; তাই তিনি বিরক্ত হইয়া মুখ বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইলেন। রাজা কৌশিকীকে রানীর ভাব দেখিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কৌশিকী রানীর রাগের আসল কথা বুঝিতে পারিয়াও বলিলেন, "রাজার উপর আপনি বিরক্ত হইলেন কেন? এ বিরক্তির তো কোনো কারণ নাই।" বিদূষক তখন বলিল, "আছে বৈ কী? আপনার লোকের মান তো রাখিতে হইবে; ওহে গণদাস, তুমি বাঁচিলে; রাগের ছলে রানী তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলেন।" যখন সব ঠিক হইয়া গেল, তখন বিদূষকই বলিয়া দিল, "তোমরা দুই-পক্ষই রঙ্গমঞ্চে গিয়া সব উদ্যোগ করিয়া লও, তারপর আমাদের খবর পাঠাইও, অথবা মৃদঙ্গ-শব্দ শুনিলেই আমরা যাইব।" রাজা যখন মৃদঙ্গ-শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছেন, তখন বিদূষক তাঁহাকে চুপি চুপি সাবধান করিয়া দিল, বলিল, "আস্তে আস্তে যাও, রানী কাছে আছেন, একটা গোল বাধাইয়া ফেলিবেন।"

এইখানে বিদূষকের প্রথম কীর্তি শেষ হইল। রানী অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালবিকাকে

রাজার সম্মুখে বাহির করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কোনো কৌশলই খাটিল না। তিনি যেন ইঁদুর কলে পড়িলেন। এ সবই গোতমের চালাকি?

নাচ দেখাইয়াই তো মালবিকা চলিয়া যান, বিদূষকই তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, "আমার একটা কথা আছে, উত্তর দিয়া যাও।" থামাইয়া রাজাকে মালবিকার স্থির-মূর্তি দেখাইল। আবার যখন "কী তোমার কথা" জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তখন বলিল, "কথাটা আর কিছু নয়, প্রথম নাচটা দেখাইলে তাহার আগে ব্রাহ্মণের পূজাটা করিলে না।" শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, মালবিকাও হাসিল। রাজা মালবিকার হাসিমুখও দেখিলেন। বিদূষক দেখিল, রাজার কাজ হাঁসিল, আর কেন। সে বলিয়া উঠিল, "আহারের কোনো উদ্যোগ হইল না। আমি অবোধ চাতক, শুক্না মেঘের কাছে জল চাহিলাম, পাইলাম না। অথবা আমরা মূর্খ লোক, পণ্ডিতের কথাই বিশ্বাস করিয়া যাইতে হয়। তাই যাই, তবে এ বেচারা তো বেশ গেয়েছে একে তো কিছু বকসিস্ দিতে হয়, এই দিই।" বলিয়া রাজার হাতের বালা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। রানী ভারি চটিয়া গেলেন বলিলেন, "আর-একজন পরীক্ষার্থী আছে, তাহার গুণাগুণ না জানিয়াই যে একজনকে বক্‌সিস দিতে যাইতেছ।" "তা কী জানেন রানী, পরের জিনিস কিনা, তাই দিতে গিয়াছিলাম।" মালবিকা তো নাচঘর থেকে চলে গেলেন। বিদূষক রাজাকে বলিল "আমার বুদ্ধি-বিদ্যার দৌড় এই পর্যন্ত।" "না হে, না, এইখানে শেষ হলে চলিবে কেন? সে যে চলে গেল আমার যে ধৈর্য থাকে না—" "তোমার দেখ্‌ছি দশা খারাপ, যেমন দরিদ্র রোগী বৈদ্যের কাছে ভালো ঔষধ চায় তোমারও তাই।"

রাজা হরদত্তের সাক্‌রেদের গান শুনিতে যাইতেছেন,— এমন সময়ে বৈতালিকেরা গান ধরিয়া উঠিল, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে গান শুনিয়াই বিদূষক বলিয়া উঠিল, "আর কী আমাদের ভোজন বেলা, অবেলায় খাইলে অনেক অসুখ হয়।" সকলে চলিয়া গেলে, রাজা মালবিকার রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, "একে তো সুন্দরী তার পর এত গুণ, এ যে দেখ্‌চি শুধু মদনের বাণ নয়, তাতে বিষ মাখানো। যাহোক ভাই, আমার ভাবনাটা ভেবো।" "তুমিও আমার ভাবনাটা ভেবো। আমার পেটটা, দোকানের তুন্দুলের মতো ভেতরে ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে।"

কঠিন। জলের কলসিতে সর্পমুদ্রা দিতে হইবে, অতএব একটি সর্পমুদ্রা খুঁজিয়া আন।" রানী— "আহা হা! তা হোলেই ব্রাহ্মণ বাঁচে, তা এই নাও সর্পমুদ্রা-ওয়ালা আঙটি। ওটা আমার হাতেই ফিরাইয়া দিও।" এই আঙটি পাবার জন্যই গোতমের এত ফাঁদ পাতা। আঙটি পেয়েই সে মালখানায় পঁহুছিল। মাধবিকাকে আঙটি দেখাইল। মাধবিকা তো আঙটি দেখাইলেই মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। তথাপি সে অনেক জেরা করিল। গোতম বলিল, "রানী তো আর নিজের ইচ্ছায় এদের আটকান নাই, ইরাবতীর মান রাখিবার জন্যই এ কাজ। তা এখন একজন গণক বলিয়াছেন যে, রাজার নক্ষত্র বড়ো খারাপ, এখন সকল বন্দিকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। তা রাজার হুকুম রানী কী করিবেন, তাই আঙটি দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

যেমন ছাড়া পাওয়া, আর গোতম ওদের দু-জনকে সমুদ্রঘরে লইয়া গেল। একটা ছুতা করিয়া রাজাকে রানীর রোগমন্দির হইতে ডাকিয়া আনিয়া সমুদ্রঘরে পঁহুছাইয়া দিল। সমুদ্রঘরে আসিবার সময় দূরে দেখা গেল, রানীর চন্দ্রিকা নামে এক দাসী আসিতেছে। রাজা অমনি পাশ কাটাইলেন। গোতম বলিল, "চোর আর কামুক দু-জনে চন্দ্রিকার [জ্যোৎস্না অর্থে] হাত এড়াইতে চেষ্টা করে।" ইহার পর সে নিজে দরজায় পাহারা রহিল। সেখানে ফটিকের থামে মাথা দিবামাত্র বেচারার ঘুম আসিল, বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে লাগিল।

গোতম ঘুমাইতেছে, এমন সময় ইরাবতী ও নিপুণিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রিকা তাহাদের বলিয়া দিয়াছে যে, গোতম ঐখানে আছে। গোতমকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া নিপুণিকা বলিল, "বাজারের বলদের মতো গোতম বসেই ঘুমুচ্ছে। মুখখানি বেশ প্রসন্ন, বোধ হয় বিষবিকার একেবারেই নাই।" এমন সময়ে গোতম স্বপ্নে বলিয়া উঠিল, "ভবতি মালবিকে ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" শুনিয়া তারা দুজনেই চটিয়া গেল। নিপুণিকা বলিল, "দেখুন চিরদিন আপনার স্বস্তিকরণের মোয়াখোর, এখন কিনা মালবিকাকে স্বপ্নে দেখিতেছে। আচ্ছা, ওকে জব্দ করচি। সাপকে ও বড়ো ভয় করে, তাই বাঁকা লাঠি গাছটা উহার গায়ে ফেলিয়া দিই।" যেমন লাঠি গায়ে ফেলিয়া দেওয়া, আর সে সাপ সাপ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সে যে পাহারা দিতেছিল, সেসব বিগড়িয়া গেল; রাজা বাহির হইয়া পড়িলেন, মালবিকা দেখা দিলেন, বকুলাবলী দেখা দিলেন। ইরাবতীর

সঙ্গে রাজার বেশ একটু টগুাই হইয়া গেল। ইরাবতী আরো জানিতে পারিলেন যে, বড়ো রানীকে ফাঁকি দিয়া গোতমই এসব যোগাযোগ করিয়াছে। গোতম তখন মালবিকার ভাবনায় অস্থির। মনে করিতেছে, কী সর্বনাশ! বাঁধন কাটাইয়া পায়রা কিনা বিড়ালের মুখে পড়িল। এমন সময়ে ইরাবতী বলিল,— "তবে রা বাম্‌না, এসব তোমারই নীতি?" সে বলিল, "আমি যদি নীতির এক বর্ণও পড়িতাম, তাহা হইলে রাজাকে আমি চালাইয়া লইয়া বেড়াইতাম।" এমন সময়ে একজন খবর আনিল যে, একটা পিঙ্গলবাসা রাজকন্যা বসুলক্ষ্মীকে বড়ো ভয় দেখাইয়াছে এবং সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শুনিয়া সকলেই সেইদিকে চলিল, গোতম বলিয়া উঠিল, "বাহবা রে বানর, তুমি আপনার দলের লোকটিকে খুব উদ্ধার করিলে।"

গোতমের লেখাপড়া ভালো থাকুক আর নাই থাকুক, সে ভদ্রবংশের ছেলে; তাহার সামাজিকতা বেশ ছিল, সে স্বভাবের শোভা বেশ বুঝিত। তাহার মতো সমজদার অতি অল্পই পাওয়া যায়। সে রাজাকে বলিয়া দিল, "আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সেই অশোক গাছের তলায়। পাঁচদিন না যাইতেই তাহার কী চমৎকার ফুল ফুটিয়াছে, যেন হঠাৎ তার ভরা যৌবন আসিয়াছে, আর সে যেন যৌবনে ঢলঢল করিতেছে। সেখানে মালবিকাও আসিতেছে। কৌশিকীকে রানী বলিয়াছেন, 'তুমি ভারি গুমর করো যে, তুমি বিয়ের ক'নে খুব সাজাতে পারো, আচ্ছা বিদর্ভ দেশের কনের মতো তাহাকে আজ সাজাও দেখি। এসব দেখে শুনে বোধ হয় আজ বা তোমার কপাল ফেরে।" শেষে যখন সব প্রকাশ পাইল, মালবিকা বিদর্ভের রাজার মেয়ে আর কৌশিকী সেখানকার রাজমন্ত্রীর ভগিনী, তখন রানী বিশেষ আদর করিয়া মালবিকার হাত ধরিয়া রাজার হাতে সঁপিয়া দিতে গেলেন। রাজা একটু লজ্জিত হইলেন। রানী বলিলেন, "এ কী মহারাজ, আমার প্রার্থনা আপনি পূরণ করিবেন না।" তখন বিদূষক বলিলেন, "রানী রাগ করিবেন না, লোক-ব্যবহার এই যে, নব্য বর একটু লজ্জাতুর হয়।" রাজা বিদূষকের দিকে চাহিলেন। বিদূষক বলিলেন, "ইঁহাকে দেবী বলিয়া রাজার হাতে দিলে তিনি লইবেন।" রানী বলিলেন, "উহার যে বংশমর্যাদা তাহাতেই উহাকে দেবী বলিতে হইবে। আমি আবার নূতন করিয়া দেবী বলিব কী?" তাহার পর দেবী যখন ভালো রেশমি কাপড়ের ঘোমটা দিয়া মালবিকাকে রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন, তখন বিদূষক

করিয়া দিল, মালবিকার এক পায়ে আল্‌তা দেওয়া হইল, নূপুর দেওয়া হইল। রাজা গোতমকে বলিলেন, "এ পায়ের লাথি খাইবার যোগ্য ব্যক্তি কে কে? হয় অশোক, না হয় আমি।" গোতম জবাব দিল, "অপরাধ হইলেই তোমায়ও প্রহার খাইতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আহা, ব্রাহ্মণের বাণী কবে সফল হবে?"

আবার যখন বকুলাবলী আল্‌তাপরা পাখানি মালবিকাকে দেখাইয়া বলিল, "এ পা তোমার মনে ধরে?" তখন মালবিকা জিজ্ঞাসা করিল, "এ বিদ্যা তুমি কোথায় শিখিলে?" সে বলিল, "রাজা এতে আমার গুরু।" তখন গোতম বলিল, "আর কী এখন যাও গুরুদক্ষিণাটা আদায় করিয়া লইয়া আইস।"

অশোকগাছে লাথি মারা হইলে পর রাজা ও গোতম হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। গোতম বলিল, "করলে কী, অশোকটি রাজার প্রিয়বয়স্য, উহাকে লাথি মারিলে? বকুলাবলী তুই তো সব জানতিস্, তুই কেন এমন অন্যায় কাজটা বন্ধ করিয়া দিলি না?" বকুলাবলী বলিল, "আমরা কী করিব, দেবী হুকুম দিয়াছেন, আর আমরা করিয়াছি। আমাদের কোনোই দোষ নাই।"

এই মহাসুখের মিলনের সময়েই যখন রাজা মালবিকাকে বলিতেছেন, "তুমি অশোকের দোহদটা তো পূরণ করিলে, আমার আর ধৈর্য নাই, আমার মনোবাঞ্ছাটি পূর্ণ করো।" এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে ইরাবতী তথায় উপস্থিত—মালবিকা ও তাহার সখী তো তখনই চম্পট। রাজা গোতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায়।" গোতম বলিল, "যখন চোরকে হাতে হাতে ধরে তখনো সে বলে, আমি সিঁধকাটা অভ্যাস করিতেছি।" রাজা তখন ইরাবতীকে বলিলেন, "তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। মাঝে মালবিকা এল, ওর সঙ্গে দুটি কথা কহিতেছিলাম।" ইরাবতী মর্মান্তিক দুঃখে কাতর হইয়া বলিল, "এমন দুটি কথা কবেন যদি জানিতাম, আমি এ কাজ করিতাম না।" পাষণ্ড গোতম সে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিল, "তা রাজার তো সকলেই সমান, রানীর দাসীদের সঙ্গে কথা কহাও কি অপরাধ হইল? এই তোমার ব্যাপার লইয়াই বোঝ না কেন?" অর্থাৎ তুমি তো রানীর দাসী ছিলে, তোমার সঙ্গেও এইরূপ কথাবার্তা তখন হইত, সেটা কি দোষের হইত? ইরাবতী বলিলেন, "তা হোক্ না, কথাবার্তাই হোক্। আমি আর কেন ক্লেশ পাই।" এই বলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু

মদের ঝোঁকে পারিল না, কোমরের চন্দ্রহার গাছটা পায়ে জড়াইতে লাগিল। যাহা হউক ইরাবতীর যখন রাজা পায়ে পড়িলেও মান ভাঙিল না ও সে রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেল, তখন গোতম বলিলেন, "আর কী এখন ওঠো। ইরাবতী তোমার উপর খুব খুশি। এত অপরাধের পর সে যে গেছে, এই আমাদের ভাগ্য; এখন এসো আমরা পালাই, নইলে মঙ্গলগ্রহের মতো আবার বেঁকে রানীর মধ্যে ঢুকিবে।"

গোতমের চতুর্থ কীর্তি আরো চমৎকার। ইরাবতী গিয়া বড়োরানীর কাছে সবকথা বলে দিল। রানী মালখানায় মালবিকা ও বকুলাবলীকে আটকাইয়া রাখিলেন। সেখানে তো যথেষ্ট পাহারা। তার উপর রানীর এক দাসী মাধবিকা বেশির ভাগ সেখানে পাহারা দিতে লাগিল। রানী তাহাকে বলিয়া দিলেন, "আমার আঙটি না দেখিয়া তাহাদের কাহাকেও ছাড়িবে না।" এইসব কথা শুনিয়া গোতম এক মায়াজাল বিস্তার করিয়া বলিল, "মহারাজ বড়ো রানীর অসুখ হইয়াছে, চলুন আমরা দেখিতে যাই। আপনি আগেই যান, আমি একটু পরেই যাইতেছি। শুধুহাতে তো রাজারাজড়ার সঙ্গে দেখা করিতে নাই, তাই আমি একটা ফল কি ফুল, বাগান থেকে নিয়ে আসি।" রাজা গিয়া বড়োরানীর সঙ্গে আত্মীয়তা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে গোতম কেয়াপাতার কাঁটা দুটা বুড়া আঙুলে ফুটাইয়া, বুড়া আঙুলটার গোড়ায় পৈতা জড়াইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কী ব্যাপার? "রানীর জন্য একটা ফুল হাতে করে আনিব, তাই এক থোলো অশোকের ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম, আর কোটরের ভিতর থেকে একটা সাপ এসে আমায় কামড়াইয়া দিল। সে সাপ নয়, সে সাক্ষাৎ কাল! আমার আর নিস্তার নাই। ভাই আমি ছেলেবেলা থেকে তোমার বয়স্য। আমার থাক্‌বার মধ্যে এক মা আছেন, তুমি ভাই তাঁকে খেতে পারতে দিও।" বলিয়াই বেচারা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; আশীবিষের বেগে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। রানী বলিলেন, "আহা আমার জন্য বেচারার এই দশা।" রাজা বলিলেন, "ভয় নাই— ভয় নাই, ধ্রুবসিদ্ধি আছেন, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আসিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিবেন।" "ওরে কে আছে, ডাক ধ্রুবসিদ্ধিকে?" সে বলিল, "গিয়াছিলাম, ধ্রুবসিদ্ধি আসিল না; বলিল, গোতমকে এইখানে লইয়া আইস।" সুতরাং দুই-তিনজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ধ্রুবসিদ্ধি বলিলেন,— ব্যাপার কিছু

"তুমি আমার কাজ একটু শীঘ্র করো।"

"সেতো বুঝলুম, কিন্তু জ্যোৎস্না যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে তেমনি রানী তাকে ঢেকে রাখবে। আর তুমি কী? তুমি মাংসের দোকানের গিধিনীর মতো, এ দিকে মাংসের জন্য মরিতেছে, অপরদিকে ভয়ও খাইতেছ। এখন ভরসা করে কাজে লাগো।"

গোতম ঠাকুরের দ্বিতীয় কীর্তিটি অদ্ভুত। তিনি দেখিলেন, বড়োরানী সুস্থ শরীরে থাকিলে ও সকল জায়গায় যাইতে আসিতে পারিলে, রাজার সঙ্গে মালবিকার মিলন দুষ্কর হইয়া পড়িবে। তাই রানীকে শয্যাধরা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুবিধাও হইল। বসন্তকাল দোলায় চড়ার ধুম পড়িয়া গেল। আমরা এখন দেখি যে বসন্তে কেবল রাধা আর কৃষ্ণই দোল খান। তখন কিন্তু বসন্তে সকলেই দোল খেত। বড়োরানীও দোল খেতেন। বিদূষক একদিন চালাকি করে বড়োরানীকে দোলা থেকে ফেলে দিল; পড়িয়া রানীর পায়ে ব্যথা লাগিল। তিনি শয্যাধরা হইয়া রহিলেন, বিদূষকের দূতীগিরিতে অনেক সুবিধা হইল।

এখন রানীর একটি বড়ো পিয়ারের অশোকগাছ ছিল। মালিনী আসিয়া বলিয়া গেল যে, সেটির ফুল ধরিতে দেরি হইতেছে। তাহার 'দোহদ' করা দরকার। যে কার্যের দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ফল ফুল হয় তাহার নাম দোহদ। সার দেওয়া একটা দোহদ। কিন্তু অশোকের দোহদ আর একরূপ। কোনো পরমাসুন্দরী যদি পায়ে আল্‌তা এবং নূপুর দিয়া আর অশোকের কচিপাতা কানে দুলাইয়া দিয়া বাঁ পায়ে অশোককে লাথি মারে, তবে তাহার ফুল হয়। মালিনী অশোকগাছে দোহদের কথা বলিলে, রানী বড়ো বিপদে পড়িলেন। এ-সকল কাজ তো তাঁহারই একচেটিয়া কিন্তু তাঁহার তো পায়ে ব্যথা তিনি তো যাইতে পারিবেন না। কাকে পাঠানো যায়? ওস্তাদজিদের ঝগড়ায় মালবিকার জন্যই রানীর পক্ষই জয়লাভ করিয়াছে, সুতরাং মালবিকাকে কিছু বক্‌সিস দেওয়া চাই। রানী বলিলেন, "আচ্ছা বেশ মালবিকা, আমার পায়ে ব্যথা, আমি পারিব না, তুমি যাও অশোকের দোহদ করিয়া আইস। যদি পাঁচদিনের মধ্যে অশোকের ফুল ফোটে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" মালবিকার কী মনোবাঞ্ছা রানী তাহার কী জানেন-না-জানেন সে কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। আমরা গোতমের কথা কহিতে আসিয়াছি, তাই কহিয়া যাই।

~ ~

রাজা তো অধীর, দেরি সয় না, গোতমকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বিদূষকও রাজার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আর-এক কীর্তি করিয়া বসিল। সে মালবিকার সখী বকুলাবলীকে দূতীগিরিতে লাগাইয়া দিল। তাহাকে খুলিয়া বলিল, "রাজার এই অবস্থা, তুমি মিলাইয়া দাও।" সে বলিল, "দেবী অতি সাবধানে মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিতেছেন, ব্যাপার সহজ নহে তথাপি আমি যেরূপে পারি ঘটাইয়া দিব।"

ইরাবতী রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, প্রমোদবনে রাজার সঙ্গে দোলায় চড়িবেন। রাজার যাইবার ইচ্ছা নাই। বিদূষক বলিলেন, "তাও কি হয়, তোমার মনে যাই থাক সকলের মন রাখিয়া চলিতে হইবে।" রাজা প্রমোদবনে চলিলেন। গোতম মূর্খ হইলেও বেশ সমজদার লোক। বসন্তের শোভায় সে উন্মত্ত হইল ও রাজাকে বসন্তের শোভা দেখাইয়া তাঁহার মনের যাহাতে তৃপ্তি হয় করিতে লাগিল। কালিদাসের প্রথমকার লেখার স্বভাবের শোভাই বড়ো, স্ত্রীলোকের শোভা তাহার কাছে লাগে না, এখানেও তাই। রাজা ও গোতম দু-জনেই বসন্তলক্ষ্মীর সহিত যুবতীগণের তুলনা করিতেছেন এবং তুলনায় বসন্ত-শোভাই বাড়িয়া যাইতেছে।

এমন সময়ে বড়ো রানীর চেলী পরিয়া, নানা অলংকার ভূষিতা হইয়া, মালবিকা আসিয়া সেই অশোকগাছের তলায় একখানা বড়ো পাথরের উপর বসিল। গোতম বলিল, "মাতালের কাছে মিছরির চাট আসিয়া জুটিল।" রাজা বলিলেন "কী? কী?" গোতম বলিল, "আবার কী? মালবিকা একা, বড়ো উৎকণ্ঠিতা।" রাজা "কোথায়, কোথায়" "গাছের আড়াল থেকে এই দিকেই আসিতেছে, উহাকেও বোধ হয় তোমার রোগে ধরিয়াছে, 'উৎকণ্ঠিত উৎকণ্ঠিত' বলিতেছে।" রাজা— "ও কিসের উৎকণ্ঠা কে জানে?" গোতম— "দূরে যেন ইরাবতী আসিতেছে।" রাজা— "আসুক, হাতি যখন পদ্মবনে পশে তখন কি হাঙ্গরের ভয় করে?"

এমন সময়ে বকুলাবলী পায়ের গহনা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বকুলাবলীর সঙ্গে মালবিকার যে কথাবার্তা হইল, রাজা ও গোতম দু-জনেই সেকথা শুনিতে পাইলেন। মালবিকা স্বীকার করিল যে, রাজার জন্য সে তাহার মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। বকুলাবলীও বেশ দূতীগিরি করিয়া উহার মনস্থির

বলিল, "আহা দেবী আমাদের বড়োই অনুকূল।" এই পর্যন্ত বিদূষকের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক। ইহা হইতেই বিদূষকের চরিত্র বেশ বুঝা যায়; সে যে খুব চালাক চট্‌পটে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু সে যে বেইমান। সে যাহার খায় তাহারও খাতির রাখে না। রানী ও ইরাবতী তাহাকে কতই খাওয়াইয়াছেন পরাইয়াছেন, কিন্তু আপনার কাজের সময় সে কাহারো এক পয়সার খাতির রাখে নাই। কটকট করিয়া কটু কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ইরাবতী যখন সব অন্ধকার দেখিতেছে, তখনই সে যে এককালে দাসী ছিল, সে কথাটা মনে করাইয়া দেওয়াটা কি বেইমানের কাজ নয়? শুধু কী তাই, সে স্বপ্নেও মালবিকা দেখিতেছে, আর ইরাবতীর অমঙ্গল চিন্তা করিতেছে। রানী ধারিণীর এত খাইয়াও তাহার দেবী শব্দটি কাড়িয়া লইয়া মালবিকাকে দেওয়া, এসব কি কম বেইমানি! কিন্তু একটা কথা ঠিক। সে রাজার খায় রাজার গায়। ধারিণী, ইরাবতী, রাজা তাহাকে ভালোবাসেন বলিয়াই তাহার খাতির করেন, নইলে করিতেন না। সে তাহা বেশ জানে। সে আলুরও চাকর নয়, বেগুনেরও চাকর নয়, সে রাজার চাকর, রাজার যাতে ভালো হয়, তাই করে। এতে কেহ তাহাকে বেইমান বল নাচার।

নারায়ণ
বৈশাখ, ১৩২৫

কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ

কুমারসম্ভব সাত না সতেরো সর্গ— একথা লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছে— কেহ বলেন সাত, কেহ বলেন আট, কেহ বলেন সতেরো। সাত সর্গই পঠন-পাঠন হয়, টীকা-টিপ্পনী ঐ সাত সর্গেরই অধিক। মল্লিনাথ কিন্তু অষ্টম সর্গেরও টীকা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে, কুমারসম্ভব আট সর্গ। বাকি নয় সর্গের কোনোই টীকা নাই। অন্তত এখনো পর্যন্ত একখানিও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলেন, সাত সর্গই কালিদাসের লেখা, বাকি তাঁহার নয়; পরে কেহ লাগাইয়া দিয়াছেন। কেন যে শেষ দশ সর্গ কালিদাসের নয়, তাহার বিশেষ যুক্তি কোথায়ও পাওয়া যায় না। যাঁহারা কালিদাসের নয় বলেন, তাঁহাদের মোটামুটি কথা যে, উহাতে হরপার্বতীর বিহার-বর্ণনা আছে, সেটা অত্যন্ত খারাপ; পিতামাতার বিহার-বর্ণনা আছে, সেটা অরুচিকর। কালিদাস এরূপ অরুচির জিনিস লিখিলেন কেন? এ ছাড়া আর-কোনো যুক্তি কেহ দেন নাই, অন্তত দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু কথাটা যখন আছে, তখন আগাগোড়া একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

কুমারসম্ভব প্রথম সাত সর্গের লেখা অতি সংক্ষেপ। একে তো কালিদাস লম্বা লম্বা বর্ণনা করতে অত্যন্ত নারাজ, তাহার উপর কুমারসম্ভবে সে নারাজিটা যেন একটু বেশি বেশি। এত বড়ো হিমালয়— হাজার ক্রোশ লম্বা— প্রায় নব্বুই ক্রোশ চওড়া, উঁচুতে আড়াই ক্রোশেরও উপর। ইহার মধ্যে কত নদ-নদী, পর্বত-কন্দর আছে, কত তর-বেতর মানুষ আছে— কত তর-বেতর জন্তু-জানোয়ার আছে, কত কত অদ্ভুত অদ্ভুত গাছ-পালা আছে, কত কত আশ্চর্য আশ্চর্য খনি-মণি আছে,— এই সমস্ত হিমালয়ের বর্ণনা কালিদাস সতেরোটি শ্লোকে সারিয়াছেন; আর সে বর্ণনা এতই জমকাল যে, যে একবার পড়ে, সে আর ভুলিতে পারে না।

তাহার পর দেখুন, পার্বতীর রূপবর্ণনা— পায়ের বুড়া আঙুল হইতে মাথার চুল পর্যন্ত— অদ্ভুত সৃষ্টি। কবি যে অঙ্গটি যখন বর্ণনা করিতেছেন, সেই অঙ্গটি তখন যেন তিনি তুলি দিয়া চোখের সাম্‌নে আঁকিয়া দিতেছেন। শুধু যে রূপবর্ণনা, তা নয়, ইহার মধ্যে গুণবর্ণনাও আছে, কণ্ঠস্বরের বর্ণনা আছে, হাসির বর্ণনা আছে, কটাক্ষের বর্ণনা আছে, বসনভূষণের বর্ণনা আছে— বর্ণনায় যা করা দরকার, সবই আছে। অথচ মোট কবিতা সেই সতেরোটি।

আবার বলি; রতির বিলাপ খুবই সংক্ষেপ। [কুমার, চতুর্থ সর্গ] স্ত্রীলোকের বিলাপ, তাই অজ বিলাপের [রঘু, অষ্টম সর্গ] চেয়ে একটু বড়ো বটে, কিন্তু তবুও খুব সংক্ষেপ। চতুর্থ সর্গে সবে ৪৬টি কবিতা আছে; তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি তো ভূমিকা— আর, শেষ আটটি বিলাপ শুনিয়া দেবতাদের ভবিষ্যদ্বাণী। আবার যখন বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখনো আর দুটি কবিতা, যাহা বিলাপের মধ্যে নয়। সুতরাং ৩২টি কবিতায় রতি-বিলাপ।

মহাদেবের ধ্যান ছয়টি মাত্র কবিতায়। [কুমার, তৃতীয় সর্গ] এমন যে অকাল-বসন্ত—যাহাতে জড়-পদার্থের, ইতর প্রাণীর, মনুষ্যের, ঋষিদের, এমন-কী, দেবতাদেরও মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল— সেও পনেরোটি বৈ কবিতা নয়। [কুমার, তৃতীয় সর্গ] অথচ এমন বসন্ত-বর্ণনা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পার্বতীর তপস্যা পাঁচটি কবিতা— কঠোর তপস্যা দশটি কবিতা। [কুমার, পঞ্চম সর্গ] শিবকে বরের আসন হইতে উঠাইয়া লইয়া বিবাহশেষ পর্যন্ত বিবাহের বর্ণনা মাত্র ১৫টি কবিতায় হইয়াছে। [কুমার, সপ্তম সর্গ]

আর দেখাইবার দরকার নাই। কালিদাসের বর্ণনা যে সংক্ষেপ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখানে দরকার নাই বলিয়া, কালিদাসের অন্য অন্য কাব্যের কথা বলি নাই, কেবল কুমারসম্ভব-এর প্রথম সাত সর্গের কথাই বলিলাম; তাহাতেই দেখা যায় যে, বর্ণনা কত সংক্ষেপ।

কিন্তু অষ্টম সর্গে আসিলেই কাব্য আর একরূপ হইয়া গেল। অষ্টম সর্গে গন্ধমাদনপর্বতে মহাদেব পার্বতীকে সন্ধ্যার বর্ণনা শুনাইতেছেন— ৪৫টি কবিতা। ঐ সর্গে বিবাহের পর পার্বতীর লজ্জা ভাঙিতেও ১১টি কবিতা গেল।

নবমে অগ্নি পায়রা সাজিয়া মহাদেবের রতিমন্দিরে উপস্থিত হইলে, মহাদেব তো রাগ করিয়া তাঁহাকে ভস্মই করিয়া ফেলিতেন। সে বেচারা অনেক স্তবস্তুতি করিয়া কোনো মতে রক্ষা পাইল। পার্বতী "তুমি সর্বভুক্ হও; তোমার কুষ্ঠরোগ হউক" প্রভৃতি নানারূপ শাপ দিলেন। কিন্তু রঙ্গভঙ্গ হওয়ায় মহাদেবের সমস্ত

তেজ পায়রার গায়ে পড়িয়া গেল এবং তাহার জ্বালায় আগুন যে আগুন তিনিও বিরূপ হইয়া গেলেন। আগুন তো এইরূপ লণ্ডভণ্ড হইয়া বিদায় হউন। কিন্তু এইসকল ব্যাপারে পার্বতী আলুথালু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বেশভূষা সামলাইয়া লইতেও ১২টি কবিতা লাগিয়া গেল। কৈলাসের ১টি মাত্র শিখরের বর্ণনায় ৭টি কবিতা লাগিয়াছিল।

এইরূপ বরাবর লম্বা লম্বা বর্ণনায় ৮ম হইতে ১৭শ সর্গ পর্যন্ত কাব্যখানি পরিপূর্ণ। বর্ণনাগুলি কালিদাসের মতো জমাট তো নয়ই, কেমন ফাঁকা ফাঁকা, আর একঘেয়ে। কালিদাস মেঘদূতে ৬টি কবিতায় কৈলাসের বর্ণনা করিয়াছেন। [পূর্বমেঘ, ৫৮-৬৩] তাহার ভিতর একটি বিশেষণ "ত্রিদশবনিতাদর্পণ।" সেই একটি বিশেষণকে ফেনাইয়া কুমারসম্ভব-এর নবম সর্গে ৭টি কবিতা করা হইয়াছে। সকল কবিতাতেই হয় প্রতিবিম্বের কথা, নয় দর্পণের কথা, নয় স্ফটিকের কথা। মেঘদূতে যে আর-একটি বিশেষণ আছে, এত বর্ণনা আছে, এত সৌন্দর্য আছে—এ সাতটিতে তাহার কিছুই নাই।

কালিদাস রঘুবংশ-এর সপ্তমে কয়েকটিমাত্র কবিতায় যে ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, কুমারসম্ভবে শেষ চারি সর্গে সেই যুদ্ধের বর্ণনা। চারি সর্গের শ্লোকসংখ্যা (৫৩ + ৫১ + ৫৬ + ৫১) ২১১।

রঘুবংশ-এর তৃতীয় সর্গে রঘুর জন্ম হইতে যৌবরাজ্যে অভিষেক পর্যন্ত ২৩টি মাত্র কবিতা এবং তাহাতেই বর্ণনাগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কুমারসম্ভবে ৫০ শ্লোকে ১১শ সর্গ কেবল কার্তিকের জন্মোৎসব ও বালক্রীড়া-বর্ণন, আর ৫০ শ্লোকে ১৩শ সর্গ তাঁহার অভিষেক-বর্ণন। অথচ বর্ণনা মোটেই জমে নাই, ফাঁকা হইয়াছে, ফিকা হইয়াছে। এই কুমারসম্ভব-এই গৌরীর বাল্যক্রীড়া একটি মাত্র শ্লোকেই যেমন খুলিয়াছে, সমস্ত একাদশ পড়িলেও জিনিসটি তেমন করিয়া খুলে না। কালিদাস রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে শুভ ও অশুভ নিমিত্তগুলি এক এক কবিতায়ই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দশ সর্গে সেগুলির বর্ণনাও লম্বা লম্বা। যেমন, ১৫শ সর্গে অসুরসৈন্যের যুদ্ধযাত্রার সময় অশুভদর্শন ১৩ হইতে ৩১ পর্যন্ত ১৯টি কবিতা।

এই লম্বা লম্বা বর্ণনাতেই এই দশটি সর্গ যে কালিদাসের নয়, তাহা কতক কতক প্রমাণ হয়। কিন্তু আমরা শুধু এইরূপ প্রমাণের উপরই নির্ভর করিব না।

প্রথম সাত সর্গে ও শেষ দশ সর্গে পূর্বাপর মিল নাই। প্রথম সর্গে ও তৃতীয় সর্গে মহাদেব কেমন স্থির, ধীর, গম্ভীর, 'নিবাত-নিষ্কম্প' প্রদীপের ন্যায়, কিছুতেই তাঁহার মনের বিকার নাই। মদন যেমন তাঁহার মনে বিকার জন্মাইবার চেষ্টা

করিল— অমনি ভস্মসাৎ। আর অষ্টম সর্গে কী? মহাদেব পার্বতীকে ঘাড়ে করিয়া আকাশ-পাতাল পৃথিবী সর্বত্র বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন, মাঝে মাঝে পার্বতীকে মণির পিয়ালায় মদ খাওয়াইয়া দিতেছেন। এক গন্ধমাদন পর্বতেই তাঁহাদের ১০০ বৎসর কাটিয়া গেল। দেবা আর দেবী এক ঘরে থাকেন। সেখানে কেহ যাইতে পারে না, গেলেও দেখা হয় না। এইভাবে তো ১০০ বৎসর কাটিয়া গেল। এই কি সেই আগের মহাদেব? "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি" [১/৫৯]— সেই মহাদেব? আপনারা বুঝুন, আমার তো মনে হয় না যে, এই সেই মহাদেব।

মদন মহাদেবের মনের বিকার জন্মাইয়া দিবার জন্য সম্মোহন বাণ ধনুকে যোজনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব "কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্য" [৩/৬৭] হইয়াছিলেন। সে কতটুকু কিঞ্চিৎ? সমুদ্রের উপরে চন্দ্র উদয় হইলে, প্রথম জোয়ারের প্রথম মুহূর্তে যতটুকু বিকার সমুদ্রের হয়, ততটুকু। সে কিঞ্চিৎ কতটুকু? তাতে মহাদেবের চোকটি পার্বতীর মুখের দিকে একবার ফের-ফের হইল। তখনই তিনি বুঝিলেন, বিকার হইয়াছে। কেন এমন হইল? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, মদন বাণ মারিতে উদ্যত। অমনি তাঁহার রাগ হইল, মদন ভস্ম হইল।

আর নবম সর্গে কী হইয়াছে? মহাদেব আর পার্বতী ঘরে দুয়ার দিয়া আছেন। কী ভাবে আছেন, তাহা আর লিখার দরকার নাই। এইভাবেই একশ বছর আছেন। অগ্নি পায়রা সাজিয়া সেই ঘরে গেল। মহাদেব শুইয়া শুইয়াই দেখিলেন, এ তো পায়রা নয়। তাঁহার রাগ হইল। অগ্নি প্রমাদ গণিলেন, এবং স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। এ আর সে মহাদেব নয়। রাগ হইবামাত্র তাঁহার কপালের উপর চক্ষু দিয়া আর আগুন বাহির হয় না। অগ্নির সহিত কথা কহিলেন। যে ভাবে ছিলেন, সে ভাবে আর কথা কহা যায় না। পার্বতীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল। আর অসময়ে ছাড়াছাড়ি হওয়া মাত্র, মহাদেবের তেজ সব পায়রার গায়ে পড়িল। এ কি কালিদাসের লেখা? বোধ তো হয় না। এ কী রস? আদিরস হইতে পারে না, অদ্ভুতরস হইতে পারে না। আমরা বলি, এটা বীভৎস রস। অন্তত শৃঙ্গাররসের বীভৎস বর্ণনা।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি— যিনি দেবতাদের সেনাপতি হইয়া তারকাসুরকে জয় করিবেন, তিনি তো নিষিক্ত নীললোহিততেজের অংশ। কোথায় নিষিক্ত? উমায় নিষিক্ত। এ কথাগুলি সব দ্বিতীয় সর্গে লেখা আছে। কিন্তু যে প্রকারে একাদশে কার্তিকের জন্ম হইল, তাহাতে নিষেকও নাই, পার্বতীতেও নিষেক নাই। একটা অস্বাভাবিক উপায়ে কার্তিকের জন্ম।[১] তাই বলিতেছিলাম, ঐ দুই অংশের পূর্বাপর সামঞ্জস্য নাই; সুতরাং এক হাতের লেখা নয়।

আবার আর-এক কথা। পুরাণওয়ালারা সত্যযুগের প্রথমেই মদনকে ভস্ম করাইয়া দিলেন। রহিল কেবল রতি। অর্থাৎ ব্যসন রহিল না, কিন্তু বংশরক্ষার—জীবরক্ষার উপায় যে রতি, তাহা রহিল। ঋষিরা বলিয়া দিলেন, এই ভাবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কাটিবে। কলির প্রথমে মদন আবার জন্মিবেন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হইয়া— অর্থাৎ ঋষিরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিনটি যুগকে ব্যসনের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিলেন। সেই জন্যই মহাদেব দশসহস্র বৎসর পার্বতীর সহিত বিহার করিলেও নিষেক হইল না, পার্বতীরও গর্ভাধান হইল না। দেবতাদের কষ্ট ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অনেক স্তবস্তুতি-যজ্ঞ-আরাধনার পর যদি বা নিষেক হইল, পার্বতী তাহা ধারণ করিতে পারিলেন না, অগ্নিতে ফেলিয়া দিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কালিদাস কিন্তু যখন মহাদেবের বিবাহের পরই মদনকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে দিয়াই মহাদেবের সেবা করাইয়া দিলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, ওরূপ দশসহস্র বৎসর বিহারের বীভৎস-ব্যাপার তাঁহার মনঃপূত ছিল না; এবং আমাদের বোধ হয়, মদনের সঙ্গে মহাদেবের মিল হইয়া গেলেই কার্তিকের উৎপত্তি হইয়া গেল, আর তাঁহার জন্ম, বাল্যলীলা, অভিষেক, অসুরবধ, এসব লেখার আর তাঁহার দরকার নাই। অথবা কুমারের সম্ভব অর্থাৎ সম্ভাবনা হইল আর পুস্তকও শেষ হইল। কিন্তু যেন কোনো দামোদরজাতীয় ব্যক্তি[২] ‘‘আহা, কালিদাসের লেখা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে’’ ভাবিয়া আর দশ সর্গ জুড়িয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন। যিনি এরূপ করিয়াছেন, তিনি মহাকবির মর্মকথা না বুঝিয়া পুরাণের গল্পটাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বুঝেন নাই যে, তাঁহার পুস্তকে যে ভাবে কার্তিকের জন্ম হইল, তাহাতে তাঁহাকে কোনোমতেই পার্বতীর পুত্র বলা যায় না। মহাদেবের তেজ নিষিক্ত হইয়া তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি উঁহার অংশ বটেন, কিন্তু পার্বতীতে নিষিক্ত অংশ নন। কিন্তু এইসকল বীভৎস ও স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার এড়াইবার জন্যই কালিদাস বিবাহের পরই মদনকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। মদনও বাঁচিয়া থাকিবে, অথচ বীভৎস ব্যাপার হইবে— এটি বড়োই অসঙ্গত কথা। বলিবে, মদনের বাঁচানো কথাটা প্রক্ষিপ্ত? কিন্তু চতুর্থ সর্গে যে দৈববাণী হইয়াছিল, তাহাতেও বিবাহের পরই মদনকে বাঁচাইবার কথা আছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, কালিদাস ইচ্ছাপূর্বকই মদনকে বাঁচাইয়াছেন। তিনি ঋষিদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. কুমারসম্ভব-এর দ্বিতীয় সর্গের ৫৭—৬০ সংখ্যক শ্লোকে প্রার্থী দেবতাদের উদ্দেশে ব্রহ্মার উক্তিতে তারকাসুর নিধনের উপায় বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা বলেন, তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে একমাত্র নীললোহিতের (মহেশ্বরের) বীর্য নিষেকে পার্বতীর গর্ভজাত সন্তান।

সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যন্তং প্রসহেত কঃ।
অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ ।।৫৭।।

উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শাম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুং অয়স্কান্তেন লৌহবৎ।।৫৯।।

অনুবাদ : যুদ্ধবিদ্যাবিৎ তারকাসুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলে নীললোহিতের (মহেশ্বরের) রেত নিষিক্ত (ঔরসজাত) সন্তান ভিন্ন অন্য আর-কে তার সঙ্গে যুদ্ধে সক্ষম হবে। ।।৫৭।।

অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি উমার রূপলাবণ্য দিয়ে তোমরা নীললোহিতের সমাধি-মগ্ন চিত্তকে আকৃষ্ট করতে যত্নবান হও। ।।৫৯।।

এই ব্যঞ্জনাময় সংহত উল্লেখ পাশ কাটিয়ে অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ সর্গ ব্যাপী হরপার্বতীর যৌন আচরণের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং কুমার কার্তিকেয়র জন্ম নিয়ে অস্বাভাবিক কল্পকথার অবতারণা রয়েছে এই বিবরণে। দেব অগ্নি ইন্দ্রের আদেশে পারাবতের রূপ ধরে মহেশ্বর-পার্বতীর সম্ভোগ-গৃহের ভেতরে গিয়ে দেবতা-সমাজের বিপন্নতার কথা বলেন। দেবসেনাপতির পদ নেবেন,

মহেশ্বরকে এমন একটি সন্তান উৎপাদনের অনুরোধ জানালেন। রতি ভগ্নে বিরক্ত মহেশ্বর বীর্য নিক্ষেপ করলেন অগ্নিতে। অসম্পূর্ণ মিলনে অপরিতৃপ্ত পার্বতী এতে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। তাঁর অভিশাপে এবং মহেশ্বরের বীর্যতেজের প্রজ্বলনে শ্রীহীন অগ্নি ইন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন। ইন্দ্র বললেন, একমাত্র গঙ্গাদেবী মহেশ্বরের তেজ ধারণ করতে সক্ষম। গঙ্গাও অগ্নিবাহিত তেজ গ্রহণ করে সন্তপ্ত হলেন। পরে মাঘমাসের সকাল বেলায় "ষট্‌কৃত্তিকা", ছয়জন কৃত্তিকানাম্নী তারা গঙ্গায় অবগাহন করার সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরের বীর্য তাঁদের দেহে প্রবিষ্ট হল এবং সে দুর্বহ তেজে উদ্বেজিত হয়ে তাঁরা জল থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সদ্য গর্ভবতী কৃত্তিকা ছয়জন সেই গর্ভধারণে অসমর্থ হয়ে এবং নিজেদের স্বামীর ভয়ে ও লজ্জায় তাঁদের গর্ভস্থ ভ্রূণ শরবনে নিক্ষেপ করলেন। ভ্রূণ ছয়টি তৎক্ষণাৎ শত সূর্যের চেয়েও তেজস্বী এক ছয় মুখ বিশিষ্ট বালকে পরিণত হল। ইনিই কার্তিক। এ বিবরণে কার্তিকের জন্মে পার্বতীর কোনো ভূমিকা নেই। অথচ শিবের কথায় ছয়মুখ বিশিষ্ট সদ্যজাত শিশু কার্তিককে পার্বতী নিজের সন্তান বলে কোলে তুলে নিলেন। কালিদাসের রসরুচির মাপে গোটা বর্ণনাটাই বেমানান মনে হয়। কার্তিকের বাল্যলীলা বর্ণনায় বেশ ছেলেমানুষিও আছে। বাবা শিবের কোলে উঠে তাঁর গলার সাপের মুখের ভেতরের দাঁত গুণছে, নরকরোটির মুখবিবরে আঙুল ঢুকিয়ে মুক্তার মতো দাঁতগুলি তুলে আনতে চেষ্টা করছে, শিবের মাথার ঠাণ্ডা গঙ্গা জলে হাত ডোবানোয় অসাড় হয়ে যাওয়া হাত শম্ভুর তৃতীয় নয়নের আঁচে গরম করে নিচ্ছে। ইত্যাদি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, লিঙ্গপুরাণ (পূর্বভাগ, ১০১ অধ্যায়), শ্রীমদ্ভাগবত (১০/৫৫/১-২), বিষ্ণুপুরাণ (৫/২৬/১১-১২, ৫/২৭/২৭-২৯) এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-এ এই কাহিনী আছে।

২. সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দের পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়ার শান্তিপুরে। জন্ম মাতুলালয়ে (কৃষ্ণনগর), ১৮৫৩ খৃ.। মামা প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ লেখক লোহারাম শিবচূড়ারত্ন। বিমলা (১৮৭৭), প্রতাপসিংহ (১৮৮৪) বিষ-বিবাহ (১৮৮৮), শান্তি (১৮৯৩) প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক। স্যর ওয়ালটার স্কট, উইল্‌কি কলিন্স প্রমুখের

উপন্যাসের অনুবাদক। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অনুবাদ করেন। পাঠ্যপুস্তকও লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ও দুর্গেশনন্দিনী-র উপসংহার রূপে তিনি মৃণ্ময়ী (১৮৭৪) ও নবাব-নন্দিনী (১৯০১) উপন্যাস দুটি রচনা করেন। তাঁর এই প্রবণতার ইঙ্গিত করে শাস্ত্রীমশায় "দামোদর জাতীয় ব্যক্তি" ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বড়ো দাদার ছেলে শচীশচন্দ্রের শ্বশুর এবং বঙ্কিমের অন্যতম সাহিত্যসঙ্গী দামোদর প্রবাহ ও অনুসন্ধান নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ১৯০৭ খৃ.।

অনুষঙ্গ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত হরপ্রসাদ-রচনাবলী দ্বিতীয় সম্ভার-এ (১৩৬৬) এই পাদটীকা আছে :

"কুমরসম্ভব কাব্যের শেষ নয় সর্গের একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে এবং শাস্ত্রীমহাশয়ই এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকারের নাম সীতারাম। তিনি ৮ম সর্গ হইতে ১৭শ সর্গ পর্য্যন্ত শেষ দশ সর্গের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকার একখানি পুঁথি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে (৩২৮৯ সংখ্যক পুঁথি)। টীকাকার পুস্তিকাতে "শ্রীপার্ব্বণীকরোপনামকশ্রীলক্ষ্মণভট্টাত্মজলতাগর্ভসম্ভব সীতারামকবি" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য *Notices of Sanskrit Manuscripts*, by Haraprasad Shastri, Vol. X, Calcutta, 1892, pp 38-39)। এই টীকাকার সীতারাম আধুনিক কালের কেহ হইবেন। কুমারসম্ভব কাব্যের শেষ নয় সর্গের কোনও প্রাচীন টীকা পাওয়া যায় নাই। মল্লিনাথ, অরুণগিরি, চরিত্রবর্দ্ধন—ইহারা কেহই শেষ নয় সর্গের টীকা করেন নাই।"

রঘুবংশের গাঁথুনি

কালিদাসের রঘুবংশ লইয়া পণ্ডিতমহলে দুই রকম মত আছে। কেহ কেহ বলেন, উহা কাব্যই নয়; পুরাণ হইতে পারে, ইতিহাস হইতে পারে; কিন্তু কাব্যের কা-টি পর্যন্ত নয়। টোলের পণ্ডিতেরা সেকালেও বলিতেন, এখনো বলেন, "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্"; আবার কেহ কেহ বলেন, "এমন কাব্য হয়নি, হবে না, ঐ এক, উহার তুলনা নাই।" ইংরাজিওয়ালাদের ভিতরেও দুই মত। বঙ্কিমবাবু বলিতেন যে, উহা পুরাণ, কালিদাসের শিক্ষানবিশির সময়ে লেখা; যখন উহা লেখা হয়, তখন তাঁহার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় প্রবল; উহার অনেক পরে কুমারসম্ভব লেখা হয়; কুমারসম্ভব-এর সমস্তটাই স্থির, গভীর, ধীর। তিনি রঘুবংশ-এর অষ্টম সর্গের অজ-বিলাপের,

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্।। [৮/৫৫][1]

এই কবিতাটির সহিত কুমারসম্ভব-এর,

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য
মা মবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্।। [৪/৩০][2]

এই কবিতা তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, অজ-বিলাপের কান্না "যৌবনের কান্না।" রঘুবংশ কাঁচা হাতের লেখা, আর কুমারসম্ভব পাকা হাতের লেখা।[৩] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিদাসের দোষগুণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, কতকগুলি অতি উত্তম উৎকৃষ্ট, ছোটো ছোটো কাব্যের সমষ্টিই রঘুবংশ।[৪] আমিও এককালে এই মতই প্রচার করিয়াছিলাম।[৫] যখন সঞ্জীববাবু বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া দেন ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উহার কর্তা হন, তখন আমি বঙ্গদর্শনে লিখি যে, রঘুবংশ Hale's *Longer English poems*-এর মতো কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি, তবে একটি বংশ ধরিয়াই যখন সব কাব্যগুলি লেখা হইয়াছে, তখন উহা এক সুতায় গাঁথা আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের খানিকটা পর্যন্ত দিলীপ-সুদক্ষিণা-কাব্য; তৃতীয়ের শেষটা চতুর্থ ও পঞ্চমের খানিকটা লইয়া রঘুকাব্য; পঞ্চমের শেষ দিক্‌টা, ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম অজ-ইন্দুমতী-কাব্য; নবম দশরথ; দশম, একাদশ, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ও পঞ্চদশ সর্গে রামায়ণ; ষোড়শ কুশ-কুমুদ্বতী-কাব্য; সপ্তদশ অতিথি; অষ্টাদশে অতিথির উত্তরাধিকারিগণ; ঊনবিংশে অগ্নিবর্ণ-শৃঙ্গার-কাব্য। এতগুলি কাব্য লইয়া রঘুবংশ। তবে এ কাব্যগুলি সবই পাকা হাতের লেখা, ইহাদের অর্থ অতি গভীর, এবং ইহাতে উপদেশ অতি মধুর ও অতি হিতকর। একজন ব্রাহ্মণের এক কথায় সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আপন স্ত্রীকে লইয়া রাখাল সাজিলেন— এ বড়ো সহজ কথা নয়। বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে দুইবার লিখিবার পর একদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন, "বঙ্গদর্শনে রঘুবংশের কথা তোমার লেখা?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এইরূপ বরাবর লিখিবে?" আমি বলিলাম, "ইচ্ছা তো আছে।" তিনি তখন বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" অমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" তিনি তখন গরম হইয়া বলিলেন, "আমি বহুদিন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি যে আমার সব চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না। তুমি কি না বলো, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জান কী?" দেখিলাম, তিনি

বেশ একটু রাগত হইয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, "আপনি যদি রাগ করেন, আমি না-হয় লিখিব না।" কিন্তু তাহাতেও তাঁহার রাগ পড়িল না। তিনি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ঐ কথাই তুলিতে লাগিলেন। আমি যথাসময়ে চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু সেই অবধি আমার মনে খটকা লাগিয়া রহিল যে, রঘুবংশ এত বড়ো একখানা কাব্য, ইহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্তী সমস্ত দেশেরই যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু নূতন, যা-কিছু সুন্দর, সব একত্র করিয়া ধরিয়াছে, আর এমন ভাবে বর্ণন করিয়াছে যে, সেরূপ আর দেখা যায় না। একটা নগরের, একটা রাজবাড়ির, একটা বাগানের বা একটা দেশের বর্ণনায় এক-একখানি মহাকাব্য হয়; আর এত বড়ো এক মহাদেশের এত বড়ো একটা মহাবর্ণনায় রঘুবংশ মহাকাব্য হইবে না? এক রাজা এক রানীকে নায়ক-নায়িকা করিয়া, দু-পাঁচ বছরের ঘটনা লইয়া, এক-একখানি মহাকাব্য হয়; আর আঠারো পুরুষ ধরিয়া কত রাজা কত রানী লইয়াও রঘুবংশখানি মহাকাব্য হইবে না? তাহার পর ভারতবর্ষে যাহা-কিছু বর্ণনার জিনিস আছে— জড়জগতে হউক, অন্তর্জগতে হউক, ধর্মে হউক, কর্মে হউক—সবই তো রঘুবংশে আছে; অথচ রঘুবংশ মহাকাব্য হইবে না? কালিদাস কি সত্য সত্যই একখানি পুরাণ লিখিয়া গিয়াছিলেন? যদি তাই করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহাতে এত কল্পনা, এত বর্ণনা, এত রস, এত ভাব, এত উপদেশ, ভাবের এত গাম্ভীর্য, এসব কেন? ইতিহাসে তো এ-সকলের দরকার হয় না; আর এত বড়ো কাব্যখানিকে ইতিহাস বলিতেও প্রাণ চায় না।

তখন সংস্কৃত মহাকাব্যের কী লক্ষণ, তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, নায়ক-নায়িকা না হইলে কাব্য হয় না, আর যত কাব্য আছে, প্রায় সবগুলিরই এক নায়ক এক নায়িকা। কাব্যাদর্শে[৬] মহাকাব্যের লক্ষণে "চতুরোদাত্তনায়কং" এই কথাটি আছে। সমাস ভাঙিতে গেলে ঐ নায়ক শব্দ হইতে নায়ক-নায়িকা দুই বুঝাইতে পারে ও এক নায়ক— বহু নায়কও বুঝাইতে পারে। টীকাকার প্রেমচাঁদও তাহাই বুঝিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার[৭] খুলিয়া

বলিলেন— "একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা"— অর্থাৎ মহাকাব্যে একবংশের অনেক রাজা ও নায়ক হইতে পারেন। এইরূপে সংস্কৃত অলংকারে রঘুবংশ-কে মহাকাব্যের মধ্যেই টানিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এ লক্ষণে তো তৃপ্তি হয় না। একখানি কাব্য লিখিতে গেলে আগাগোড়া এক সুতায় গাঁথা চাই, নহিলে জমাট হইবে কেন? জমাটই তো কাব্যের প্রাণ। জমাট না হইয়া যদি তার কাটিয়া গেল, তাহা হইলে আর কাব্য কী হইল? সেই যে জমাট তা রঘুবংশে কই? একসুতায় গাঁথা কই? যদি বলো, সব রাজারাই একবংশের— "এক বংশোদ্ভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা"— একটা সুতা বটে, কিন্তু এ কাব্যের সুতা নয়, জমাটের সুতা নয়। কাব্যের যে সুতা হইবে, তাহাতে "সূত্রে মণিগণা ইব"[৮] এক অপূর্ব বাঁধনে সমস্ত কাব্যখানি বাঁধা থাকিবে। একটি কবিতার একটি কথার নড়-চড় হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে। সে সুতা রঘুবংশে কই? অথচ রঘুবংশখানি বেশ জমাট। কোথা হইতেও একটি কবিতা উঠাইবার বা একটি শব্দ বদলাইবার জো নাই। পড়ো— আরম্ভ করিলে ছাড়িতে পারিবে না, কোথাও তার কাটিল বলিয়া মনে হইবে না। আগাগোড়া কাব্যখানি একমনে একধ্যানে পড়ো, মনে এক অপূর্ব আনন্দের উদয় হইবে, তোমার সমস্ত স্বভাব যেন বদলাইয়া যাইবে; তুমি পড়িবার আগে যে মানুষটি ছিলে, পড়া শেষ করিলে তোমার মনে হইবে, যেন তুমি আর-এক মানুষ হইয়া গিয়াছ, অনেক ভালো হইয়া গিয়াছ। অথচ সেই কাব্যের সূত্রটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বুঝিলাম, সেইটুকু পাওয়া যায় নাই বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত বড়ো মহাকাব্যখানিকে পুরাণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন; বলেন্দ্রবাবুও উহা ছোটো ছোটো কাব্যের সমষ্টিমাত্র বলিয়া গিয়াছেন, আমিও *Hale's Longer English poems* বলিয়াছি।

বঙ্কিমবাবুর সহিত কথাবার্তার পর আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যতক্ষণ এই সূত্রটুকু (unity of purpose) খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, ততদিন আমি আর রঘুবংশ সম্বন্ধে কিছুই লিখিব না। কিন্তু যদি সেটি খুঁজিয়া পাই, বঙ্কিমবাবুকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর আবার রঘুবংশের কথা

লিখিব। সে সূত্রটি ধরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না; দেখাইতে পারিলে তিনি কী বলিতেন, তাহাও জানিবার কোনো সুযোগ হইল না।

কতদিন কতভাবে সে সূত্র ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, ধরিতে পারি নাই। একবার মনে হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রচারই বোধ হয় এই সূত্র। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিই তো হিন্দুর ধর্ম। দিলীপ সুদক্ষিণা দুইটিরই সেবা করিলেন। রঘু নন্দিনীর অনুগ্রহে ইন্দ্রকে জয় করিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদেই পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণের শাপেই পুত্রলাভ করিলেও মরিবার সময় কোনো পুত্রই দশরথের কাছে রহিল না। রামায়ণময় ব্রাহ্মণের প্রাদুর্ভাব— পুত্রেষ্টি যজ্ঞে রামচন্দ্রের জন্ম, অশ্বমেধযজ্ঞে তিনি আবার পুত্রলাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কাব্য তত জমিল না। কই, অজ-ইন্দুমতীর কয় সর্গে তো ব্রাহ্মণের কথাই নাই। কুশ, অতিথি ও শেষ রাজাদের কথার মধ্যেও— ব্রাহ্মণের প্রাদুর্ভাব নাই। আর-এক কথা— ওটা তো উপদেশ মাত্র। শুধু উপদেশ লইয়া তো কাব্যের সূত্র হইতে পারে না।

আবার মনে হইল, যেন পুরুষের পর পুরুষ রাজাদের শরীর ও মনে উন্নতি বেশি বেশি দেখা যাইতেছে। দিলীপ হইতে রঘু বড়ো, রঘু হইতে অজ বড়ো, অজ হইতে দশরথ বড়ো, দশরথ হইতে রাম বড়ো, কিন্তু— এতক্ষণ তো কোনো রকমে বড়ো করা যাইতেছিল, কিন্তু রামের পব তো আর-কোনো রকমে বড়ো করা যায় না। সুতরাং ও সুতাটি কিছুই নয়, 'ক্রমোন্নতি'-র সূত্র টিকিল না।

হঠাৎ একদিন মনে হইল, রামায়ণ হইতে রঘুবংশ বড়ো কিসে? বাল্মীকিও বড়ো কবি, কালিদাসও একজন বড়ো কবি। বাল্মীকি সাধারণ লোকের মন ভুলাইবার বেশি চেষ্টা করেন; কিন্তু কালিদাস শিক্ষিত ও সভ্য লোকের মনোরঞ্জনের বেশি চেষ্টা করেন। বাল্মীকির রামায়ণ রাম ও সীতার ছবিতেই উজ্জ্বল— যেন দুখানি দেব-প্রতিমা সামনে ধরিয়া দিয়াছে। কালিদাসের চেষ্টাটা যেন বাল্মীকির উপরেও টেক্কা দেওয়া। তিনি রাম ও সীতার ছবি আঁকিতে

গিয়া দেখিলেন, জমিতেছে না, বাল্মীকির উপর জমিতেছে না। তখন তিনি রাম-সীতার আশেপাশে আরো অনেকগুলি ছবি দিয়া জিনিসটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তুলিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির ছবিখানি বজায় রাখিলেন। যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা খুব উজ্জ্বল, কালিদাস সেখানে খুব সংক্ষেপে সারিলেন। অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড তিনি একসর্গে ১০৪টি কবিতায় সারিয়া দিলেন। কিন্তু যেখানে বাল্মীকির ফাঁক পাইলেন, সেইখানেই আপনার কবিত্ব-কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। এ তো গেল খাস রামায়ণে— যাহা লইয়া রঘুবংশের ১০-১৫ সর্গ। কিন্তু খাস রামায়ণ-এর বাহিরে যেসব ছবি, বাল্মীকিতে তো সেগুলি নাই; সেগুলি কালিদাসের নিজস্ব। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে বাল্মীকি যেন রাম ও সীতার দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া গিয়াছেন; আর কালিদাস তাহাতে background দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছেন।

এ তো গেল বাহিরের কথা— ফটোগ্রাফের কথা— দুর্গা-প্রতিমার কথা— চালচিত্রের কথা। ভিতরের কথা কী? ব্যাকগ্রাউণ্ড দেওয়া তো আর সূত্র হইতে পারে না। তখন মনে হইল— বাল্মীকির উদ্দেশ্য যা, কালিদাসের উদ্দেশ্যও তাই— শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান। বাল্মীকি রামচন্দ্রেরই জয়গান করিয়া গিয়াছেন, কালিদাস সূর্যবংশের সকল রাজারই গুণগান করিয়া, সকলেরই উপর শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান গাইয়া গিয়াছেন। এই-সকল কথা যখন পরিষ্কার হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্ত রঘুবংশটি এক কোমলমনোহর সুতায় গাঁথা। সে সুতাটি যে কী, তাহা দেখাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কালিদাস দেখিলেন, নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহার জয়গানই রঘুবংশের উদ্দেশ্য। কিন্তু নারায়ণ কী বস্তু? যাঁহাকে যোগী ঋষি ধ্যানে পান না, তিনি কী বস্তু? কালিদাস যত বড়ো মহাকবিই হউন, তাঁহার কল্পনা যতই শক্তিশালী হউক, তাঁহার দৃষ্টি যতই প্রখর হউক, তাঁহার প্রতিভা যতই সর্বতোমুখী হউক, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, নারায়ণ যে কী বস্তু— "ঈদৃক্তয়া" বা "ইয়ত্তয়া" [১৩/৫]— ধারণার অতীত। কিন্তু মানুষের এক বিষম দোষ যে, ঠিক পারুক-বা-নাই-পারুক, তাহারা সব জিনিসেরই মনে মনে

একটা ধারণা করিয়া লয়। যাহাকেই জিজ্ঞাসা করো, সেই বলিবে, নারায়ণ কী বস্তু—তাহার একটা-না-একটা ধারণা করিয়া লইয়াছে। সে ধারণার মূল এই—মানুষের যতগুলি সদ্‌গুণ আছে, নারায়ণে সেগুলি সব আছে—কিন্তু তাহার মাত্রা অনেক বেশি। ততদূর মানুষ পৌঁছাইতেই পারে না—তাহাকে সাধুভাষায় পরাকাষ্ঠা বলো, চরম উৎকর্ষ বলো, 'চরম' বলো, অথবা বৌদ্ধ ভাষায় পারমিতাপ্রাপ্তই বলো। তাহা হইলে নারায়ণ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই যে—মানুষের ধারণায় যত রকম সদ্‌গুণ হইতে পারে, সে সবগুলিই নারায়ণে চরম মাত্রায় উঠিয়াছে। বাল্মীকির রামও সেই-সকল চরম সদ্‌গুণের আধার। এখন যদি কালিদাস রঘুবংশের রাজাদের মধ্যে এক-একজনে এক-একটি গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, আর সেইগুলি একত্র করিয়া রামচন্দ্রে পরিষ্কার করিয়া ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে রঘুবংশ—এই প্রকাণ্ড ছবিটি জ্বলিয়া উঠে। তিনি দিলীপে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, রঘুতে শৌর্য-বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, দশরথে সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন,—এই-সকল গুণরাশি ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিল ও রামচন্দ্রে একত্র মিশিয়া প্রকাণ্ড পর্বতচূড়ায় পরিণত হইল। রাজাগুলি যেন পিরামিডের ধাপ, রামচন্দ্র যেন সেই পিরামিডের শিখর। পর্বতে দেখা যায়—এক দিকে ধাপে ধাপে উঠে, অল্পে অল্পে উচা হইতে থাকে, শিখরে উঠিয়া অপর দিকে একেবারে নামিয়া যায়। একদিকে অল্পে অল্পে চড়াই হয়, আর-এক দিকে উতরাই অত্যন্ত খাড়া খাড়া থাকে। রঘুবংশেও তেমনি, দিলীপ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথ, দশরথ হইতে রামচন্দ্র। তাহার পরই একেবারে নামিয়া গেল। রামচন্দ্রের সদ্‌গুণগুলি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র লোপ পাইয়া আসিল। চড়াই হইল ১৫ সর্গে, উতরাই হইল ৪ সর্গে। যখন সব-গুণগুলি লোপ পাইল, তখন অগ্নিবর্ণ স্ত্রীলোকের নেশায়, মদের নেশায় আত্মহারা হইয়া শেষে রাজযক্ষ্মায় প্রাণ হারাইলেন। এত বড়ো রঘুবংশে কী পরিণাম হইল? গর্ভবতী রানীকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রীরা রাজ্য চালাইতে লাগিলেন।

এক-এক রাজায় এক-এক গুণের চরম, আর রামচন্দ্রে সকল গুণের চরম।

এই রঘুবংশ-এর সূত্র। এই রঘুবংশের "unity of action"। এই রঘুবংশের মূল কথা। এই রঘুবংশ-এর বীজ। ইহাই হিন্দুধর্মের—ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাণ। এইটুকু বুঝিবামাত্রেই যেন এক নূতন আলোক আসিয়া শুধু যে রঘুবংশকেই উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল, তাহা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, সমস্ত আর্য সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ধর্মের শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিল, ভারতের মনে নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিল, ভারতভূমিকে ধন্য করিল, পবিত্র করিল—ভারত নারায়ণের নিজস্ব দেশ হইল।

নারায়ণ

শ্রাবণ, ১৩২৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. অনুবাদ : বাতাসের বেগে অলকগুলি সঞ্চালিত অথচ বাক্যহীন তোমার মুখ রাত্রিকালে মুদিত, ভ্রমরগুঞ্জনরহিত, সুপ্ত এক পদ্মের মতো (সে মুখ) আমাকে ব্যথিত করছে।

২. অনুবাদ : (হে বসন্ত!) তোমার সখা (মদন) বাতাসে নিবে যাওয়া দীপের মতো চলে গেছেন, আর ফিরে আসবেন না। দেখ আমি সেই নির্বাপিত দীপের দশায় অসহনীয় কষ্টে প্রধূমিত হচ্ছি।

৩. "আমি নিশ্চিত বলিতে পারি— কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি...." "বুড়া বয়সের কথা", বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮৪; পরে কমলকান্ত গ্রন্থে "কমলাকান্তের পত্র" অংশে সংকলিত।

৪. "সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে [রঘুবংশ] কোনো মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রতিভা লক্ষিত হয় না— কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত।..... অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভালো ভালো ছবি— "কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা", 'সাধনা' পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৯।

৫. নবম বর্ষ সম্পূর্ণ হয়ে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ্ঞায় এবং চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদনার

দায়িত্ব নেন এবং কার্তিক ১২৯০, অক্টোবর ১৮৮৩-তে প্রথম সংখ্যা বেরোয়। এই উদ্যোগ স্থায়ী হয়নি। মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন প্রকাশ স্থগিত হয়ে যায়। কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হরপ্রসাদের "রঘুবংশ" প্রবন্ধ এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। দ্র. পৃ. ১৭৯-৯৬।

৬. দণ্ডী রচিত অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাব্যাদর্শ। দণ্ডী আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। 'কাব্যাদর্শ' তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আলোচিত বিষয় কাব্যলক্ষণ, বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতি এবং শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা ইত্যাদি দশটি গুণ। 'দশকুমারচরিত' গদ্যকাব্য দণ্ডীর রচনারূপে পরিচিত, কিন্তু আলংকারিক দণ্ডীই 'দশকুমারচরিত'-এর লেখক কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে।

৭. সংস্কৃত কাব্যবিচার সংক্রান্ত অলংকার শাস্ত্রের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব সংকলন বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থ আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা।

অনুবাদ : নৃপতিগণ এক বংশজাত, অথবা অনেক নরপতি একাধিককুলজাত।

৮. অনুবাদ : সুতোয় [গাঁথা] মণিগুলির মতো।

রঘুতে নারায়ণ

গতবারে বলিয়াছি, রঘু-র রাম নারায়ণের অবতার। মানুষের যত গুণ আছে, সবগুলিই তাঁহাতে চরমে উঠিয়াছে। তিনি সমস্ত চরমগুণের সমষ্টি। তাঁহার পূর্ব পূর্ব পুরুষে একটি একটি গুণ চরমে উঠিয়াছে; আর সেই সবগুলি তাঁহাতে চরমে উঠিয়াছে। বরং তাঁহার পূর্ব পূর্ব পুরুষের যে এক-একটি গুণ ছিল, তাঁহাতে সেগুলি আরো বাড়িয়া চরম হইতে চরমতমে উঠিয়াছে। দেখুন দিলীপরাজা এক মহাকামনা করিয়া গুরুর কাছে গেলেন, গুরুর অনেক স্তব-স্তুতি করিলেন, গুরুও অনেকক্ষণ প্রণিধান করিয়া তাঁহাকে হুকুম করিলেন, "আমার গোরুর সেবা করো।" গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য। রাজা একটিবার দ্বিধা করিলেন না; সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর একেবারে রাখাল সাজিলেন। রাখাল তো গোরু তাড়াইয়া বেড়ায়; এখানে গোরুই রাজাকে তাড়াইতে লাগিলেন। গোরু দাঁড়াইল তো রাজা দাঁড়ান, গোরু বসিলে রাজা বসেন, গোরু চলিতে লাগিলে রাজাও চলেন; এইরূপে রাজা গোরুর ছায়ার মতো হইয়া গেলেন। তিনি গোরুর নূতন ঘাস যোগান, গলা চুলকাইয়া দেন, ডাঁসমশা তাড়াইয়া দেন, তাহাকে যেমন ইচ্ছা চলিতে দেন— কোনো বাধা দেন না। একবার দরকার হইলে, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া গোরুকে বাঁচাইতে গেলেন। যে সিংহ গোরুটিকে ধরিয়াছিল, তাহাকে তিনি বলিলেন, "এটি ঋষির হোমধেনু, এটি না হইলে তাঁহার চলিবে না, তাঁহার আজ্ঞায় আমি ইহাকে রক্ষা করিতেছি। কিন্তু তুমি মহাদেবের অনুচর, তোমার হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করা আমার সাধ্য নাই। অতএব তুমি আমার একটি কথা রাখো। আমার মাংসে আজ তোমার পারণা হউক; গোরুটিকে ছাড়িয়া দাও। তুমিও তো পরাধীন। মহাদেব দেবদারু গাছটির রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়াছেন! বলো দেখি, সেটি যদি কেহ

নষ্ট করিয়া দেয়, তুমি মহাদেবের কাছে মুখ দেখাইতে পার? অতএব আর বিলম্ব করিও না। এই লও আমার দেহ। ইহাতেই তোমার পারণা হউক। গরুটি ছাড়িয়া দাও।"

এই অগাধ গুরুভক্তি, এই অগাধ গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিই রঘুবংশ-এর উন্নতির মূল। এই গুরুভক্তিই রামচন্দ্রে কিরূপ ফুটিয়াছে, দেখা যাক। গুরুও গুরু, পিতাও গুরু, মাতাও গুরু। দিলীপ কামনা করিয়া গুরুর কাছে গিয়াছিলেন। গুরু হুকুম দিলেন, তিনিও হুকুম মতো কাজ করিলেন। রামচন্দ্র কিন্তু হুকুমও পাইলেন না। বিমাতা পিতাকে সত্যে আবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পিতা প্রাণ থাকিতে রামকে বনে যাইতে বলিতে পারিতেছেন না। তথাপি রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য, অর্থাৎ পিতাকে প্রতিজ্ঞার ভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, পিতার এই সংকট অবস্থাই তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়া অম্লানবদনে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন। প্রজারা আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, অভিষেকের জন্য যখন রাম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া বেড়ান, তখনো যেমন তাঁহার মুখচোকের ভাব, বাকল পরিয়া বনে যাইবার সময়ও সেভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। দিলীপের গুরুভক্তি আমরা যতই প্রশংসা করি, রামের গুরুভক্তি যে তাহা ছাড়াইয়া অনেকদূর উঠিয়াছে— একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আরো দেখুন,— দিলীপের কামনা ছিল, রামের কোনো কামনা নাই। দিলীপ প্রবীণ বয়সে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাও ২১ দিনের জন্য। রামচন্দ্র নবীন বয়সেই চৌদ্দটি দীর্ঘ বৎসরের জন্য বনবাসী হইলেন।

রঘুর প্রধান গুণ বীরত্ব— তিনি যুদ্ধবীর, দানবীর, ধর্মবীর, দয়াবীর। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। তিনি তিব্বত হইতে পাণ্ড্যদেশ, আসাম হইতে পারস্য দেশ, এমন-কী, যবন ও হুনদেশ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে কুবেরকেও জয় করিয়াছিলেন। আর রামচন্দ্র ভারতবর্ষের বাহিরেও সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবন রাবণের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং কুবেরের পুষ্পক-রথ কুবেরকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। রঘু দানবীর ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার জন্য তাঁহার কাছে চৌদ্দ কোটি সোনা চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে তার চেয়েও অনেক বেশি

দিয়াছিলেন। লোকে আশ্চর্য হইয়া দেখিতেছিল— রাজা ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "ঘরে যত সোনা আছে, সব লইয়া যাও," ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "গুরু-দক্ষিণার উপর একটি পয়সাও লইব না।" রামচন্দ্র লঙ্কার রাজত্ব বিভীষণকে দান করিয়াছেন, কিষ্কিন্ধ্যার রাজত্ব সুগ্রীবকে দান করিয়াছেন, কালিদাস আরো বলিয়াছেন, তিনি হনুমানকে উত্তরগিরিতে স্থাপন করিয়াছেন— কিন্তু এ-সকল বাহ্য ও পার্থিব দান। রামচন্দ্রের প্রধান দান— স্বর্গ-মর্ত-পাতালের অভয়দান, সেই দানের জন্যই তাঁহার অবতার, সেই দানই তিনি করিয়া গিয়াছেন। আর যদি মনে করো, ইহার চেয়েও বেশি দান আছে, তবে বলি, তিনি প্রজারঞ্জনের জন্য আত্মবলিদান দিয়াছেন। কেন-না তাঁহার পক্ষে সীতাপরিত্যাগ ও আত্মবলিদান একই কথা।

অজ রাজার প্রধান গুণ তাঁহার প্রেম। স্বয়ংবরে ইন্দুমতী তাঁহাকে বরণ করিল, সপ্তম সর্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তিনি একা ভারতের সমস্ত রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন, ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলেন, পিতার আজ্ঞায় রাজ্যভার লইলেন, পিতার বৃদ্ধবয়সে যথেষ্ট সেবা করিলেন। একদিন হঠাৎ সামান্য কারণে ইন্দুমতীর মৃত্যু হইল। সেই মৃত্যুতে অজ রাজার প্রেম ফুটিয়া উঠিল। তিনি ইন্দুমতীর শোকে যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে পাষাণও গলিয়া যায়, সে বিলাপের তুলনা কোথায়ও নাই। রামচন্দ্র জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গপণ রক্ষা করিয়া সীতাকে পান। বিবাহের পরই তাঁহাকে এমন-এক মহাবীরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার তুলনায় সমস্ত ভারতের রাজন্যবৃন্দ কিছুই নয়। পিতার স্নেহে রাজ্য পাইবার সময়ই, তাঁহার এক ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাঁহাকে বনবাসে যাইতে হইল। বৃদ্ধ বয়সে পিতার সেবা করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিয়া তাঁহার ইহকাল ও পরকাল রক্ষা করিয়া দিলেন। চৌদ্দ বৎসর পরে তিনি আবার রাজা হইলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। যে সীতার সঙ্গে গৃহে, বনে, বাল্যে, যৌবনে তিনি এক হইয়া গিয়াছিলেন; সাগর লঙ্ঘন করিয়া, রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া, যে সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন, সাগর ছেঁচিয়া যে মাণিক আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহারো সীতাপ্রেম ফুটিয়া উঠিল। তিনি অজের মতো বিলাপ করিলেন না, বীরের মতো সব সহ্য করিলেন। লক্ষ্মণ সীতা-বিসর্জনের

সংবাদ আনিয়া দিলে,

> "বভূব রামঃ সহসা সবাষ্প
> সতুষার-বর্ষীব সহস্য-চন্দ্রঃ।" [১৪/৮৪]

পৌষের চাঁদ যেমন হিমে আচ্ছন্ন থাকে, রামের মুখখানিও তেমন একবার বাষ্পে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু যজ্ঞ করিবার সময় যখন সকলে তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি আর বিবাহ করিব না। সোনার একটি সীতার প্রতিমূর্তি গড়াইয়া দাও, সেই আমার সহধর্মিনী হইবে।" এই একটি কাজে যেমন রামের প্রেম ফুটিয়াছে, সহস্র বিলাপেও সেরূপ ফুটিত না। অজ রাজায় যে প্রেম মাত্র ব্যক্তিগত ছিল, রামে তাহা বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সীতার প্রতি প্রেম তো সীতাতেই রহিল, বরং গভীর হইতে গভীরতর, বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া, 'রত্নাকরমেখলা' ধরণীতে ছড়াইয়া পড়িল।

দশরথের প্রধান গুণ যে, তিনি সত্যপ্রিয় ছিলেন। এক সময়ে মৃগয়া করিতে গিয়া তিনি অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সত্যকথা গোপন করিলেন না, সাহসে ভর করিয়া, মরা ছেলে কাঁকে লইয়া, অন্ধমুনির নিকট উপস্থিত হইলেন, সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন,

> "ইত্থং গতে গতঘৃণঃ কিময়ং বিধত্তাং
> বধ্যস্তবেতি—" [৯/৮১]

"আমি তোমার পুত্রকে বধ করিয়াছি, আমি তোমার বধ্য। তুমি আমার প্রাণ লইতে পারো। আমি অতি দারুণ কার্য করিয়াছি। আমার উপর কী আজ্ঞা হয়?" আবার বৃদ্ধবয়সে সত্যপালন করিতে গিয়া প্রাণাধিক রামচন্দ্রকেও বনবাসে দিয়াছিলেন। দশরথ তো আপনার সত্য আপনিই পালন করিলেন, রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনের জন্য রাজ্য ছাড়িয়া চৌদ্দ বৎসর বনবাসে রহিলেন, কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন। আরো একবার তিনি সত্যপালন করিয়াছিলেন— সে তাঁহার অভিষেকের সময় যে সত্য করিয়াছিলেন, "প্রজারঞ্জন করিব," সীতা ত্যাগ করিয়া সেই সত্য রাখিয়াছিলেন। দশরথে যাহা ব্যক্তিগত ছিল, এখানে রামচন্দ্রে তাহা বিশ্বব্যাপ্ত হইল।

এইরূপে আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া মানুষের গুণগুলি ফুটাইয়া, কালিদাস সেগুলি একত্র করিলেন ও একত্র করিয়া তোড়া বাঁধিলেন। সেই তোড়াটি রাম। সুতরাং রামে সব ফুলগুলি— সব গুণগুলি আছে; আর সবগুলি একেবারে ফুটিয়া আলো করিয়া আছে, আর সমস্ত পৃথিবী গন্ধে আমোদ করিয়াছে।

রামচন্দ্র বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সমস্ত অযোধ্যার প্রজারা সঙ্গে সঙ্গে গেল। বানর ও রাক্ষসেরাও পড়িয়া রহিল না। রামচন্দ্র ইহাদের জন্য নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিলেন। নারায়ণের অবতার হওয়ার কার্য শেষ হইল— ত্রিভুবনকে অভয়দান করা হইল, পৃথিবীর লোককে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। কালিদাস যে মহাকাব্য লিখিতেছিলেন, তাহার মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কোন্ কবি এতবড়ো উদ্দেশ্য লইয়া মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন? কোন্ কবি এ মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

১৫শ সর্গে কাব্যখানি শেষ হইলে মন্দ হইত না। কালিদাসের উদ্দেশ্য লোকে চোখের উপর দেখিতে পাইত। কিন্তু কালিদাস মহাকবি ও মহাশিল্পী। তিনি দেখিলেন, যদি এত সহজে লোকে তাঁহার কাজের বীজ ও মূল উদ্দেশ্য জানিতে পারে, তাহা হইলে জিনিসটি পাতলা হইয়া যাইবে। সেইজন্য তিনি রঘুর বংশের শেষপর্যন্ত বর্ণনা করিয়া, সেই উদ্দেশ্যটিকে কতকটা ঢাকিয়া দিলেন। লোকে মনে করিল রঘুর বংশের বর্ণনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই কেহ কেহ উহাকে পুরাণ বলিয়াছেন, কেহ কেহ উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যের সমষ্টি বলিয়াছেন। নারায়ণের অনন্ত মহিমার, অনন্ত বিভূতির বর্ণনাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে সময় লাগিয়াছে। তিনি কেমন করিয়া এই মহান্ উদ্দেশ্য ঢাকিয়া রাখিলেন, এখন তাহাই বলিতে হইবে।

রামচন্দ্র বৈকুণ্ঠে গেলেন, অযোধ্যার লোক সব তাঁহার সঙ্গে চলিল। অযোধ্যা জনশূন্য হইল। রামচন্দ্রেরা চারি ভাই, প্রত্যেকের দুই-দুই ছেলে। এখনকার হিন্দু-আইনে, রাজ্য হইলে, তা আর ভাগ হয় না। কিন্তু তখন সে আইন ছিল না। খুড়তত জেঠতত আট ভাইয়ে রামের বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইল। শত্রুঘ্নের

ছেলেরা লইল, মথুরা ও বিদিশা। ভরতের ছেলেরা লইল, তক্ষ (শীলা) ও পুষ্কল (আবতী)। লক্ষ্মণের ছেলেরা লইল, কারা (আজিকালিকার কোরা) ও পথ (দক্ষিণাপথ)। রামচন্দ্রের বড়ো ছেলে কুশ লইল, কুশাবতী—সেটি নর্মদার দক্ষিণে মহাকোশলে; আর লব লইল, শরাবতী (শ্রাবস্তি)।

কুশাবতীতে কুশ কিছুদিন রাজ্য করিলে পর একদিন মধ্যরাত্রে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কুশের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া অযোধ্যার বর্তমান দুরবস্থার কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন, অনুরোধ করিয়া গেলেন, "তুমি আবার অযোধ্যায় চলো।" কুশ সসৈন্যে নর্মদা পার হইলেন, গঙ্গা পার হইলেন, ও সরযূতীরে অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যার মেরামত হইল, দিন কয়েকের মধ্যে অযোধ্যা আবার যে-কে-সেই হইল।

কুশ কিন্তু এই কাজটি করিয়া একরকম পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে কুশাবতীতে রাজ্য দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিলেন। রঘুবংশের অবনতি আরম্ভ হইল। অযোধ্যার উদ্ধার করিয়া তিনি করিলেন কী? বড়ো গ্রীষ্ম বলিয়া অন্তঃপুরিকাদের সহিত সরযূতে জলকেলি আরম্ভ করিলেন ও তাহাতে এত মত্ত হইলেন ও এত অসাবধান হইলেন যে, তাঁহার "জৈত্রাভরণ" খুলিয়া পড়িয়া গেল, তিনি টেরও পাইলেন না। অগস্ত্যমুনি এই আভরণ রামকে দিয়াছিলেন, রাম তাহা কখনো অঙ্গ-ছাড়া করেন নাই। বৈকুণ্ঠে যাইবার সময় সেটি তিনি কুশকে দিয়া যান। আজ কুশ অসাবধান হইয়া সেটি হারাইলেন। অনেক কষ্টে সেটি ফিরিয়া পাইলেন বটে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাগরাজ কুমুদের ভগিনী কুমুদ্বতীকেও বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রের সাহায্য করিতে গিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। যে জয়লক্ষ্মী রঘুবংশে বাঁধা ছিলেন, কুশের অকীর্তিতে এখন তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

কুশের পর তাঁহার পুত্র অতিথি রাজা হইলেন। কালিদাস অতিথির রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করিয়াছেন ও তাঁহার রাজ্যশাসনের রীতি দেখাইয়াছেন— দেখাইয়াছেন ধর্মে নিষ্ঠা ও গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিই যে রাজ্যের ভিত্তি ছিল, সে রাজ্য এখন শুষ্ক রাজনীতির উপর নির্ভর করিতে লাগিল।

তাহার পর ২০জন রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করিলেন, তাঁহাদের কথা কালিদাস ৩৩টি মাত্র কবিতায় বলিয়াছেন। ইঁহারা শুধু বংশের গৌরবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কুড়িজনের শেষ রাজা ধ্রুবসন্ধি অকালে প্রাণ হারান। তখন তাঁহার ছেলের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। সুতরাং রাজ্য এখন মন্ত্রীদের হাতে পড়িয়া গেল। রঘুবংশের মন্ত্রী— তাঁহারা ধার্মিক ও বিবেচক ছিলেন। শিশু রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারা রাজ্য চালাইতে লাগিলেন; ক্রমে রাজা সাবালক হইলে, তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিয়া দিলেন। ইঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ রাজ্যশাসনের ক্লেশ সহিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "আমার এত রাজ্য-সম্পদ্ আমি ভোগ করি।" তিনি ভোগেই মজিয়া রহিলেন; মদ খান, স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ-প্রমোদ করেন, তাহাদের নাচ দেখেন, গান শোনেন, নিজে বাজনা বাজান। প্রজারা রাজার দেখা পায় না। উৎসবের দিন রাজদর্শনের জন্য তাহারা বড়োই ব্যস্ত হইলে, রাজা কী করেন— গবাক্ষ দিয়া পা বাড়াইয়া দেন, তাহারা তাই দেখিয়া কৃতার্থ হয়। এরূপ ভোগবিলাসের যে ফল, তাই ফলিল— রাজার রাজযক্ষ্মারোগ ধরিল, সেই রোগেই তিনি গেলেন। মন্ত্রীরা সাহস করিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাইতে পারিলেন না, অন্তঃপুরের বাগানেই তাঁহার দাহ হইল। কেহই এ খবর পাইল না। পরে জানা গেল, এক রানী গর্ভবতী আছেন। তখন মন্ত্রীরা তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া সেই গর্ভেরই অভিষেক করিলেন, রানী ভবিষ্যৎ পুত্রের নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ধর্মে ও সংযমে যে রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, অধর্মে ও অসংযমে তাহার ধ্বংস হইল।

এই ধ্বংসের কাহিনী বলিয়া কালিদাস নারায়ণেই যে রঘুকাব্যের সর্বস্ব, সেটি ঢাকিয়া দিলেন, নারায়ণই যে রঘু-র নায়ক, তাহা বুঝিতে দিলেন না— বুঝিতে দিলেন কী? যে, এই মহাকাব্যখানির নায়ক একবংশের অনেক রাজা। আলংকারিকেরাও তাহাই বুঝিলেন এবং লিখিলেন— "একবংশোদ্ভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপিবা" নায়ক হইলেও মহাকাব্য হয়। কালিদাস এই আলংকারিকদিগকে বেশ একটু বিপদগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সকলেই দেখে এক নায়ক ও এক নায়িকা লইয়া মহাকাব্য হয়, কেবল রঘুবংশ তাহা নয়। সুতরাং রঘুবংশকে মিলাইয়া লইয়া মহাকাব্যের লক্ষণ করা কঠিন। তাই তাঁহারা "একবংশোদ্ভবা

ভূপাঃ” বলিয়া কোনোরূপে লক্ষণ-সমন্বয় করিলেন— ‘অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি’ [লক্ষ্যে লক্ষ্মণাগমন রূপা ‘অব্যাপ্তি’ এবং অলক্ষ্যে লক্ষণগমনরূপা ‘অতিব্যাপ্তি’ নামে লক্ষণের দুটি দোষ] হইতে দিলেন না। কিন্তু সহৃদয় লোকে এ লক্ষণে তৃপ্ত হইলেন না। তাঁহাদের মনে হইল, লক্ষণটি ‘টেনে-বোনা’। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণকে নায়ক-নায়িকা বলিয়া ধরিতে পারিলে সব গণ্ডগোল চুকিয়া যায়, কাব্যের আস্বাদ চমৎকার হয়, উহা এক অপূর্ব রসভাবের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়— মনে হয় যেন, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সব এক সুতায় গাঁথা, এক ভাবে ভোর, এক রসে পুষ্ট, এক উদ্দেশ্যে আবদ্ধ।

নারায়ণ

ভাদ্র, ১৩২৫।

রঘু আগে কি কুমার আগে

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, রঘুবংশ কাঁচাহাতের লেখা, অল্পবয়সের লেখা। উহাতে "যৌবনের কান্না"। আর কুমারসম্ভব পাকা হাতের লেখা, অধিকবয়সের লেখা, স্থির-গম্ভীরভাবে লেখা।[১]

প্রথম দেখা যাক— যেখানে একই বিষয়ের বর্ণনা দুই জায়গায় আছে, সেখানে কোন্‌টি পাকা, কোন্‌টি কাঁচা, কোন্‌টি কতটুকু পাকা, কোন্‌টি কতটুকু কাঁচা। দুই কাব্যেরই সপ্তম সর্গে স্ত্রীলোকেরা বর দেখিতে ছুটিতেছে; বর্ণনা প্রায়ই একই ভাষায়, একই কবিতায়— ইতরবিশেষ যৎকিঞ্চিৎই আছে। —

কুমারসম্ভব

স প্রীতিযোগাদ্‌বিকসন্মুখ শ্রীর্জামাতুরগ্রেসরতামুপেত্য।
প্রাবেশয়ন্মন্দিরমৃধ্যমেনমাগুল্‌ফকীর্ণাপণমার্গপুষ্পম্‌ ।।৫৫।।
তস্মিন্‌ মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণামীশানসন্দর্শনলালসানাম্‌।
প্রাসাদমালাসু বভূবুরিত্থং, ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ।।৫৬।।
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়াচিদুদ্‌বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ।।৫৭।।
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদং, আক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরা গবাক্ষাৎ, দললক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ।।৫৮।।
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদ্‌বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ।।৫৯।।
জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরণ্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্‌।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ।।৬০।।[২]

~ ~

রঘুবংশ

অথোপযন্ত্রা সদৃশেন যুক্তাং, স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্।
স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ, পুরপ্রবেশাভিমুখো বভূব ।।১।।

....

তাবৎ প্রকীর্ণাভিনবোপচারম্, ইন্দ্রায়ুধদ্যোতিততোরণাঙ্কম্।
বরঃ স বধ্বা সহ রাজমার্গং, প্রাপ ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণম্ ।।৪।।
ততস্তদালোকনতৎপরাণাং, সৌধেষু চামীকরজালবৎসু।
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং, ত্যক্তান্যকার্য্যানিণ বিচেষ্টিতানি ।।৫।।
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়াচিদুদ্‌বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ।।৬।।
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদং, আক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমিব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরাগবাক্ষাৎ, অলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ।।৭।।
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদ্‌বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ।।৮।।
জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ।।৯।।[৩]

কুমারসম্ভব

অর্দ্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ, পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ।।৬১।।
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ।।৬২।।
তাবৎ পতাকাকুলমিন্দুমৌলিরুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে।
প্রাসাদশৃঙ্গাণি দিবাপি কুর্ব্বন্, জ্যোৎস্নাভিষেকদ্বিগুণদ্যুতীনি ।।৬৩।।
তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ।।৬৪।।[৪]

রঘুবংশ

অৰ্দ্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ, পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ।।১০।।
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ।।১১।।
তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা। ।।১২।।[৫]

দুই কাব্যেই বর আগে নগরে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর রাজপথে আসিয়া পৌঁছিলেন। কুমারে বর নগরে প্রবেশ করিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা ছুটাছুটি করিয়া বর দেখিতে আসিল। তাহার কিছু পরে বর রাজপথে আসিয়া পৌঁছিলেন, আর স্ত্রীলোকেরা একদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। রঘুতে কিন্তু বর নগরে প্রবেশ করিয়া রাজপথে পৌঁছিলে, স্ত্রীলোকেরা ছুটাছুটি করিয়া বর দেখিতে আসিল, এবং একদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল! এখন জিজ্ঞাসা করি, বর নগরে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র শুনিয়া, ছুটাছুটি করিয়া, আলুথালু হইয়া, জানালায় বা বারান্দায় আসা অধিক সম্ভব, না, বর রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া এইরূপ ব্যস্তসমস্ত হওয়া অধিক সম্ভব? নগরে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা কেন এত ব্যস্তসমস্ত হইবে? তাহারা ধীরে ধীরে সব কাজ সারিয়া বর দেখিতে যাইবে তো? কিন্তু যদি তাহারা শোনে, বর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তো তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া যাইবে, এই জন্যই রঘুতে বর রাজপথে পৌঁছিলে পর স্ত্রীলোকেরা এইরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িল। ইহাতে আর-এক লাভ হইয়াছে। কুমারসম্ভবে ৬২ ও ৬৪ শ্লোকের মাঝখানে বরের বড়ো রাস্তায় আসিয়া পড়ায় এই দুই শ্লোকের সম্বন্ধ যেন ভাঙিয়া যাইতেছে। স্ত্রীলোকেরা আসিল তাড়াতাড়ি করিয়া— যে আল্‌তা পরিতেছিল, তাহার এক পায়েই পরা হইল; যে চক্ষুতে আঁজন দিতেছিল, কাজলনামা তাহার হাতেই রহিল, একচক্ষে বৈ আঁজন দেওয়া হইল না; তাড়াতাড়িতে কাহারো বা খোঁপা খুলিয়া গেল, সে খোঁপা হাতেই জড়াইয়া রাখিল। বর তাহার কিছু পরে আসিল। কেন-না, সংস্কৃতে 'তাবৎ' শব্দে কিছু অবসর বুঝায়। স্ত্রীলোকেরা উৎসুক হইয়া বর দেখিতে লাগিল। বর যদি কিছু পরেই আসিল, তবে স্ত্রীলোকদের এত তাড়াতাড়ি কেন? তাড়াতাড়ি যেন অকারণ হইল। তাই কালিদাস রঘুবংশ লিখিবার সময়, আগে বরকে রাজপথে আনিলেন, তাহার পর মেয়েদের

তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। আসিয়াই তাহারা বরের রূপে ডুবিয়া গেল। এগারো শ্লোকের পরই বারোর শ্লোক আসিল, রাজপথের ব্যাপারটা মাঝখানে রহিল না; স্ত্রীলোকদের আসা ও বর দেখা— এই দুইয়ের মধ্যে কোনো আড়াল রহিল না। এই আড়ালটা মারিয়া দেওয়া কি পাকা হাতের কাজ নয়? কালিদাস যেন বুঝিয়াছিলেন, কুমারসম্ভবে ঐ বর-দেখানোতে একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে। তিনি রঘুবংশে সেটি সারিয়া লইলেন— অতি অল্প আয়াসে দোষটি ঘুচিয়া গেল। তিনি করিলেন কী? একটি কবিতা তিনি একটু নড়চড় করিয়া দিলেন— কবিতার স্থান একটু বদ্‌লাইয়া দিলেন। একটি বোড়ের চালে তিনি কিস্তি মাত করিলেন।

বর দেখার কথা তো গেল। এখন বিবাহের কথা দুই কাব্যেই এক। সপ্তম সর্গে বিবাহে বোম্বাইয়ের ছাপা কুমারসম্ভবে ২৪টি কবিতা; রঘুতে ১৩টি কবিতা; বাংলার ছাপা রঘুতে ১৫টি। যদি রসের সার চুট্‌কি হয়, যদি Brevity is the soul of wit হয়, তবে সংক্ষেপ বর্ণনাই বেশি জমাট হয়। রঘুই পাকা হাতের লেখা। কুমারের ঐ ২৪টি কবিতা ফিকা হইয়া পড়ে। বাস্তবিকও কুমারে কালিদাস যেন পুরুতের কার্য করিতেছেন, কবির কার্য নহে। পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন— 'বৎসে গৌরি, এই অগ্নি তোমার বিবাহের সাক্ষী, তুমি শিবের সহিত ধর্মাচরণ করো, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাতে দ্বিধা করিও না।' তাহার পর বর বধূকে ধ্রুব দর্শন করাইলেন। কনে অনেক কষ্টে বলিলেন, 'দেখিয়াছি' বর-বরণের সময় মধুপর্ক, রত্ন, গরদের জোড় দেওয়ার কথা আছে; লাজহোমের পর, অর্থাৎ আগুনে খই দেওয়ার পর অঞ্জলি পুরিয়া পুরিয়া ধূমখাওয়ার কথা আছে; তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবার কথা আছে— এক কথায় কবি এখানে সকল কাজই গৃহ্যসূত্র[৬] ধরিয়া ধরিয়া করিতেছেন, কিছুই ছাড়িতেছেন না, ভয় যেন পাছে কেহ খুঁত ধরে। ইহার পর আবার নমস্কার ও আশীর্বাদের ঘটা আছে, একটু নাচগানও আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর সেবা আছে— লক্ষ্মী আসিয়া বর-কনের মাথায় পদ্মের ছাতা ধরিলেন, সরস্বতী সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দু-জনের স্তব করিলেন। বিয়ের বর্ণনা খুব জাঁকাল হইল বটে, কিন্তু লম্বা ও ফিকা হইল। কাব্যাংশে যত ভালো হউক-আর-না-হউক, পণ্ডিতে খুঁত ধরিতে পারিবে না। বোম্বের ছাপা রঘুবংশে ১৩টি কবিতায় বিবাহের বর্ণনা বেশ ঘোরালো হইয়াছে। কালিদাস বিবাহের ব্যাপারে এখানে কিছু 'তন্ত্রতা' করিয়াছেন বটে— ধ্রুব দর্শনও করান নাই, আশীর্বাদের ধূমও নাই, অগ্নি সাক্ষী করিয়া বধূকে উপদেশ দেওয়াও নাই, কোনো আড়ম্বরই নাই। বম্বের ছাপাতে

আবার বরবরণের সময়ে মধুপর্কগুলার কথাও নাই,— কিন্তু একটি জিনিস আছে— প্রত্যেক কবিতাতেই রস আছে— সেই রসে সংক্ষেপ জিনিসও বড়ো মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই যে সংক্ষেপের উপর খুব জমাট করা, ঘোরালো করা— এটা পাকা হাতের কর্ম— অনেক দেখাশুনার কর্ম। রঘুবংশে কবি কেবল দেখিতেছেন— কিসে জমাট হয়, আর কিছুই মানিতেছেন না।

বর যখন আসিতেছেন ও জানালায় দাঁড়াইয়া মেয়েরা তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছে, তখনো কুমার অপেক্ষা রঘুতে জমাট বেশি।

কুমারসম্ভব

স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্।
যা দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী, সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্ ।।৬৫।।
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং, ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ, পত্যুঃ প্রজানাং বিফলোঽভবিষ্যৎ ।।৬৬।।
ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।
ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে, সন্ন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ ।।৬৭।।
অনেন সম্বন্ধমুপেত্য দিষ্ট্যা, মনোরথপ্রার্থিতমীশ্বরেণ।
মূর্দ্ধানমালি! ক্ষিতিধারণোচ্চমুচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ ।।৬৮।।
ইত্যৌষধিপ্রস্থবিলাসিনীনাং, শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাস্ত্রিনেত্রঃ।
কেয়ূরচূর্ণকৃত লাজমুষ্টিং, হিমালয়স্যালয়মাসসাদ ।।৬৯।।[৭]

রঘুবংশ

স্থানে বৃতা ভূপতিভিঃ পরোক্ষৈঃ স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত ভোজ্যা।
পদ্মেব নারায়ণমন্যথাসৌ, লভেত কান্তং কথমাত্মতুল্যম্ ।।১৩।।
পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং, ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ, পত্যুঃ প্রজানাং বিফলোঽভাবিষ্যৎ ।।১৪।।
রতিস্মরৌ নূনমিমাবভূতাং, রাজ্ঞাং স্বহস্রেষু তথাহি বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব, মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্ ।।১৫।।
ইত্যুদ্গতাঃ পৌরবধূমুখেভ্যঃ, শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাঃ কুমারঃ।
উদ্ভাসিতং মঙ্গলসংবিধাভিঃ, সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ ।।১৬।।[৮]

এখানেও দেখুন, কুমারসম্ভবে চারিটি শ্লোক আছে, তাহাতে বরেরই প্রশংসা। অথচ দ্বিতীয় কবিতাটি বলিতেছে— এমন বরকনে যদি বিধাতা না মিলাইয়া দিতেন, তবে তাঁহার রূপের সৃষ্টি বৃথা হইত। ১ম, ৩য় ও চতুর্থ কবিতার সহিত খাপ খাইল না— অর্থাৎ বেখাপ হইল, বেদাঁড়া হইল। রঘুবংশে তাহা হয় নাই। তিনটি কবিতারই এক মতলব, বরকনে দুজনেরই সমান সুখ্যাতি। সুতরাং মাঝের কবিতাটির সঙ্গে উপর-নিচের কবিতা দুটির বেশ সামঞ্জস্য আছে। অতএব এখানেও সেই কথা— কুমার-এর চেয়ে রঘুতে কবির হাত পাকিয়াছে।

যখন কনের হাত পুরোহিত বরের হাতের উপর দিয়া দিলেন, তখন কুমারে বলে,— "রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ, স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ"— অর্থাৎ উমার রোমাঞ্চ হইল আর শিবের হাত ঘামিতে লাগিল। কিন্তু এই জায়গায় রঘুতে বলে— "আসীদ্বরঃ কণ্টকিতপ্রকোষ্ঠঃ, স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী"— অর্থাৎ বরের হাতের পোচার উপরটা— ঠিক যে জায়গায় বালা পরে, সেইখানে রোমাঞ্চ দেখা দিল; আর কনের আঙুলগুলি ঘামিতে লাগিল। এখানেও কুমারের বর্ণনার চেয়ে রঘুর বর্ণনা কেবল যে অনেক ভালো, তা নয়, উহাতে স্বভাবের সহিত বেশি সামাঞ্জস্য রাখা হইয়াছে। কেন-না— ১. বরের হাতের উপর কনের হাত রাখিলে কনের গাময় কিছু রোমাঞ্চ দেখা দেয় না; ২. কনে তুসুক প্রাণী, তারই ঘাম হইবার কথা, বরের কেন ঘাম হইবে? ৩. আর ঘাম যদি হয়, কনের আঙুলই ঘামিবে, আর কনের হাত বরের হাতের উপর থাকায়, কনের হাতের ঘামই তো দেখা যায়। বরের আঙুলে তো ঘাম হইবারই কথা নয়, আর হলেও কনের হাতের নিচে থাকায়, তা দেখা যায় না। দুই কাব্যেরই সপ্তম সর্গে মেয়েদের বর দেখা, বরের সুখ্যাতি আর বিয়ে— এইসব তুলনা করা হইল; আরো-কয়েকটি জিনিসের তুলনা করিতে হইবে।

কুমারে দ্বিতীয় সর্গে দেবতারা তারকাসুরের ভয়ে অস্থির হইয়া ব্রহ্মার কাছে গিয়াছেন, আর রঘুর দশমে দেবতারা রাবণের ভয়ে অস্থির হইয়া বিষ্ণুর কাছে গিয়াছেন। কুমারসম্ভবের বর্ণনায় দেবতাদের ব্রহ্মলোকযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত ৬২টি শ্লোক আছে। আর রঘুতে তাঁহাদের বিষ্ণুলোকযাত্রা হইতে স্বর্গে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত ৪৫টি শ্লোক আছে। কুমারের ৬২টির মধ্যে দেবতাদের যাত্রা— ১ শ্লোক; ব্রহ্মার আবির্ভাব—১ শ্লোক; দেবতাদের স্তব—১৩ শ্লোক; ব্রহ্মার কথা বর্ণনা—২; ব্রহ্মার প্রশ্ন—১১; বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্রের সঙ্কেত—২; বৃহস্পতির

উত্তর—২২; ব্রহ্মার কথা—৯; দেবতাদের ফিরিয়া যাওয়া—১। আর রঘুতে দেবতাদের বিষ্ণুলোকযাত্রা—১ শ্লোক; বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গ—১; বিষ্ণুর বর্ণনা—৮; দেবতাদের স্তুতি—১৯; বিষ্ণুর কুশলপ্রশ্ন ও দেবতাদের উত্তর—১; বিষ্ণুর স্বরের বর্ণনা—৩; বিষ্ণুর বক্তৃতা—১০; বিষ্ণুর অন্তর্ধান ও দেবতাদের প্রস্থান—২।

কুমারে ব্রহ্মার বর্ণনা নাই, দেবতারাও ব্রহ্মালোকে গেলেন, ব্রহ্মাও আবির্ভাব হইলেন। কোথা হইতে তিনি এলেন, কী করিতেছিলেন— সেসব কথা কিছুই নাই। অমনি দেবতারাও স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন। রঘুবংশে কিন্তু ঠিক এরূপ নয়। দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, তাঁহারা ক্ষীরোদ-সমুদ্রে যাইবামাত্র বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গ হইল। এটা একটি সুলক্ষণ। সে সুলক্ষণের কথা কুমারে নাই। তাহার পর বিষ্ণুর বর্ণনা; কুমারে ব্রহ্মার বর্ণনা নাই। বিষ্ণুর বর্ণনার কেন দরকার হইল? কুমারের তৃতীয়ে শিবের বর্ণনা আছে— খুব জমকাল। শিবের বর্ণনা করিয়া বিষ্ণুর বর্ণনা না করা ভালো দেখায় না। তাই এই সুযোগে কবি বিষ্ণুর বর্ণনা করিয়া দিলেন। শিবের বর্ণনা সাতটি উপজাতি ছন্দের শ্লোকে আর বিষ্ণুর বর্ণনা ৮টি অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকে।

এই দুই বর্ণনার তুলনায় আমাদের এখন দরকার নাই। কিন্তু কুমারের দ্বিতীয়ে ব্রহ্মার একটি জাঁকাল বর্ণনা না থাকায়, দেবতাদের ব্রহ্মার স্তবটি ভালো জমিল না। কিন্তু ক্ষীরোদসাগরের মধ্যস্থলে বাসুকির কুণ্ডলীর উপর নারায়ণের যে বর্ণনা— সেই বর্ণনার পরই দেবতাদের স্তবটি বেশ জমিয়া গিয়াছে। দেখুন, কলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গাস্তব পাঠ করা আর গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিয়াই গঙ্গার স্তব পাঠ করা— এ দুয়ে যে প্রভেদ, কুমারে ও রঘুতে দেবতাদের এই দুই স্তবের মধ্যে ঠিক ততটাই প্রভেদ হইয়াছে। বর্ণনার অভাবে ব্রহ্মার থাকা-না-থাকা কাব্যাংশে প্রায় সমানই দাঁড়াইয়াছে।

এখন স্তবের কথা। কুমারের স্তবটি বোধ হয় যেন মনুসংহিতা-র প্রথম অধ্যায়টি ধরিয়া ধরিয়া লেখা হইয়াছে— পড়িলেই মনুসংহিতা-র কথা মনে পড়ে; মিলাইলে দেখা যায়, মনু ছাড়া বড়ো বেশি কিছু কথা নাই। বিদ্যা-প্রকাশের ইচ্ছাটি কম বয়সেই থাকে, কুমারসম্ভবে সেটি বিলক্ষণ আছে, রঘুতে একেবারে নাই। রঘু স্তবে মুন্সিয়ানা বেশি, অলংকারের ছটা বেশি, উপমা দিয়া মনের কথা পরিষ্কার

করিয়া বলিবার চেষ্টা বেশি, আর শেষে মানুষের শক্তি যে কত কম, তাহার একটি আভাস।—

"মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া।।"[৯]

[১০/৩২]

স্তুতির পর ব্রহ্মার স্বরের বর্ণনা আর বিষ্ণুর স্বরের বর্ণনা। কুমারে শব্দের চারি প্রকার বৃত্তি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, সূক্ষ্মা[১০]— ইহাদের কথা আছে— এটি সংস্কৃত দর্শনের এক নিগূঢ় কথা। কালিদাস এখানে এ বিদ্যাপ্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু রঘুতে এই বর্ণনা আর-এক রকম। নারায়ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শয়ন করিয়া আছেন। ঢেউএর উপর ঢেউ উঠিতেছে, ঢেউ আছড়াইতেছে, সেই শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাইতেছে। নারায়ণ যখন কথা কহিলেন, তখন তাঁহার স্বর সে সমুদ্রগর্জনও ছাড়াইয়া উঠিল, নহিলে দেবতারা শুনিতে পাইবেন কিরূপে? তাঁহার কথাগুলি এতই স্পষ্ট যে, যেন তাহা বর্ণের উচ্চারণ-স্থান হইতে অবাধে বাহির হইয়া সরস্বতীকেও চরিতার্থ করিয়া দিতেছে। তাঁহার মুখ হইতে শ্বেতবর্ণা সরস্বতী বাহির হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দন্তের ধবল জ্যোৎস্না বহিয়া যাইতেছে— মনে হইতেছে, যেমন নিচে তাঁহার পদতল হইতে শ্বেতবর্ণা গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন, মুখমণ্ডল হইতে আর-এক শ্বেতবর্ণা গঙ্গা উপরের দিকেও বহিয়া যাইতেছেন। অতএব এই স্বরের বর্ণনাতেও বেশ দেখা যাইতেছে যে, কুমারসম্ভবের লেখা কাঁচা হাতের লেখা, অল্পবয়সের লেখা, তখন কালিদাসের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা খুব বেশি। রঘুতে ঐরূপ কোনো চেষ্টা নাই; কিন্তু যেটুকু দরকার, সেটুকু ঠিক আছে; যেটুকুতে নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর বস্তু সৃষ্টি হইতে পারে, সেটুকু আছে; যেটুকুতে পাঠকের মন মুগ্ধ হয়, সেটুকু আছে— অর্থাৎ কবিত্ব আছে।

তাহার পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বক্তৃতা। কুমারসম্ভবে ব্রহ্মা বলিলেন, "এ কী? তোমরা সব মুখ শুকাইয়া আসিয়াছ কেন? তোমরা সকলে জোট বাঁধিয়া আসিয়াছ— তোমাদের কাজ কে করিতেছে? ইন্দ্রের বজ্রের ধার ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। বরুণের পাশ-এর এমন দশা হইল কেন? কুবেরের হাতে গদা নাই কেন? যমের দণ্ড মাটিতে আঁচড় পাড়িতেছে! একাদশ আদিত্যের কাহারো সে তেজ নাই!

মরুদ্‌গণ আকুল হইয়া বেড়াইতেছে। রুদ্রগণের জটাগুলি ঝুলিয়া কপালের চাঁদের উপর পড়িয়াছে! তোমরা কি একেবারে আপন আপন অধিকারচ্যুত হইয়াছ? কী হইয়াছে— বলো। কী মনে করিয়া আসিয়াছ— বলো। আমি তো সৃষ্টি করিয়াই খালাস— রক্ষা তো তোমরাই করিয়া থাকো।"

তাহার পর ইন্দ্র বৃহস্পতিকে জবাব দিতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন, "তোমার বরে তারক অসুর ধূমকেতুর মতন উদয় হইয়াছে। তাহার দিঘিগুলিতে সূর্যের কিরণ যাইতে পারে না, তবে পদ্ম ফোটাইবার জন্য তো সূর্যকিরণ চাই, তাই দুই-চারিটা কিরণ সেখানে যায়। চন্দ্র ১৫ কলায় সর্বদাই উদয় হইয়া থাকেন— কেবল মহাদেবের মাথার কলাটি আসে না। পাখার হাওয়ার চেয়ে জোর হাওয়া তাহার দেশে চলিতেই পারে না। ঋতুরা এখন আর পরে পরে উদয় হয় না। ছয় ঋতুই একত্র হইয়া সর্বদা তাহার বাগানে বিরাজ করে। সমুদ্রকে রোজ রত্ন দিতে হয়। কবে মুক্তা পাকিবে, সমুদ্র হা-প্রত্যাশে তাই ভাবিতেছেন। বাসুকি প্রভৃতি নাগেরা ফণা উঁচা করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। উঁহার মাথার মণি তারকের প্রদীপ হয়। ইন্দ্র কল্পবৃক্ষের কাছ হইতে গহনাপাতি সব আনাইতেছেন আর অসুরকে ভেট পাঠাইতেছেন, তবুও তার মন পান না। সে কেবল অপকারই করিতেছে। সে নন্দনকাননের গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিতেছে। সুরবন্দীরা ধীরে ধীরে চামর ঢুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছে। মেরুর শৃঙ্গ উপড়াইয়া আনিয়া সে খেলার পাহাড় করিয়াছে। মন্দাকিনীর জলমাত্র পড়িয়া আছে— সোনার কমলগুলি সব এখন তাহার দিঘিতে। দেবতারা যে ত্রিভুবন দেখিয়া বেড়াইবেন, তাহার জো নাই। সে কখন্ কোন্ পথে আসে, সেই ভয়েই তাঁহারা অস্থির। যজমান আগুনে আহুতি দিলে, সে হব্য সে কাড়িয়া খায়— আমরা জুল্‌জুল্ করিয়া চাহিয়া থাকি। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা সে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রের এতকালের যশ সব লোপ হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে আমার সব চেষ্টাই বিফল। যে বজ্রের উপর আমাদের জয়ের আশা, সেই বজ্র তাহার গলায় মালার মতো লাগিয়া থাকে। পুষ্কর, আবর্ত প্রভৃতি মেঘে, তাহার হাতিগুলা দাঁত মারিয়া খেলা করিতেছে। তারকের বিনাশের জন্য আমরা এক সেনাপতি চাই।"

এই এত যে পরিচয়, এত যে কাঁদুনি— রঘুতে ইহার কিছুই নাই। কালিদাস এখানে এক কথায় বলিয়া দিলেন— "রাক্ষসেরা যে তোমাদের উপর উপদ্রব করিতেছে, আমি তা জানি; সে যে আমার ত্রিভুবনের উপর উপদ্রব করিতেছে,

তাও আমি জানি; ইন্দ্র যে আমাকে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন, সে অপেক্ষা আমি করিতেছি না— কারণ, আমাদের দুজনেরই এক কার্য, বায়ু আপনা হইতেই অগ্নির সারথি হয়।"

ব্রহ্মাঠাকুরটি যেন জেলার হাকিম। পুলিসের রিপোর্ট শুনিতেছেন আর হুকুম দিতেছেন। বিনা রিপোর্টে তাঁহার কোনো কাজই হয় না। কিন্তু নারায়ণ অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্। তাঁহাকে রিপোর্ট শুনিতে হয় না। তিনি নিজে নিজেই সব জানেন এবং তাহার প্রতিবিধান করেন। তিনি ব্রহ্মার মতো বলেন না— "ওহে বাপু, কিছুদিন অপেক্ষা করো, নইলে হবে না।" বিষ্ণু দেবতাদের বলিলেন—"কী করি? বিধাতা বর দিয়াছেন, তাই এত দিন সহিয়াছি। দেবতারা তাহাকে কেহ মারিতে পারিবে না। সুতরাং আমাকে মানুষ হইয়া জন্মাইতে হইবে। তোমাদের আর ভয় নাই। মায়াবীরা তোমাদের যজ্ঞের ভাগ আর কাড়িয়া খাইতে পারিবে না। বিমানে তোমরা অবাধে চারিদিক্ বেড়াইতে পারিবে। রাবণের পুষ্পক রথ আসিতেছে দেখিয়া তোমাদের আর মেঘের আড়ালে লুকাইতে হইবে না। স্বর্গ-বন্দীদের বেণী তোমরা শীঘ্রই খুলিয়া দিতে পারিবে।" কুমারে ও রঘুবংশে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে দেখুন কত তফাত। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যেসব অত্যাচারের জন্য নালিশ করিতেছেন, বিষ্ণু আপনা হইতেই সেই-সকল অত্যাচার-নিবারণের আশা দিয়া দিলেন; নালিশের অপেক্ষা রাখিলেন না। দেবতাদের ব্রহ্মালোকগমন ও বিষ্ণুলোকগমনের উপসংহারও দেখুন।

কুমারসম্ভব

ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে।
মনস্যাহিতকর্তব্যাস্তেঽপি দেবা দিবং যযুঃ।।[১১] [২/৬২]

রঘুবংশ

রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুৎশস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে।।
পুরুহূতপ্রভৃতয়ঃ সুরকার্যোদ্যতং সুরাঃ।
অংশৈরনুযযুর্বিষ্ণুং পুষ্পৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ।। [১০/৪৮-৪৯]

"উপমা কালিদাসস্য" এই যে কথাটি— কালিদাসের সব কাব্যেই খাটিলেও রঘুবংশে যেন বেশি বেশি খাটে। রঘুবংশে যেন উপমাগুলি খুঁজিতে হয় না, আপনি আসিয়া কালিদাসের কলমে বসে। খুঁজিতে তো হয়ই না, বাড়ির কাছ হইতেই আসিয়া পড়ে— যেমন "পুষ্পৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ"— যেমন গাছগুলি ফুল দিয়া বায়ুর অনুগমন করে, তেমনই দেবতারা আপন আপন অংশ দিয়া বিষ্ণুর অনুগমন করিলেন— অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। আরো একটা দেখুন, অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া আসিলে, মেঘ যেমন অমৃতবৃষ্টিতে তাহাদের পুনর্জীবন দিয়া তিরোহিত হয়, তেমনই রাবণের অত্যাচারে পীড়িত দেবতাগণের এই-সকল মধুমাখা কথায় নবজীবন দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তিরোহিত হইলেন। মেঘ, বৃষ্টি, শস্য, গাছ, ফুল— এই-সকল ঘরোয়া জিনিস লইয়া তাঁহার উপমা। আর উপমায় কবির সব কথা, সব ভাব কেমন ফুটিয়া উঠিতেছে।

নারায়ণ
আশ্বিন, ১৩২৫।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. এই বইয়ের পৃ. ৪১৭, সূত্র ৩ দ্র.

২. অনুবাদ : জামাতার (শিবের) আগমনে পর্বতরাজ হিমালয়ের মুখ আনন্দে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। নগরপথে এত পুষ্পবৃষ্টি করা হয়েছিল যে, সেই পুষ্পে পায়ের গোড়ালি (গুল্‌ফ) পর্যন্ত ডুবে যায়। গিরিরাজ জামাতাকে পুরোবর্তী করে সেই পথ দিয়ে সমৃদ্ধিপূর্ণ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।৫৫।।

সেই মুহূর্তে তাঁর দর্শনে সমুৎসুক পুরসুন্দরীদের মধ্যে দেখা গেল দর্শনলালসা। তারা যে যার হাতের কাজ ফেলে রেখে প্রাসাদমালার উপরে আরোহণ করল। ৫৬।।

কোনো রমণী সহসা বাতায়নের দিকে ধাবিত হলে তার বেণীবন্ধন শিথিল হওয়ায় মালা স্খলিত হল। কেশপাশ হাতে ধরে রইল কিন্তু বন্ধন করা সম্ভব হল না। ৫৭।।

প্রসাধিকা আল্‌তা পরানোর জন্য (কোনো রমণীর) চরণাগ্র ধারণ করেছিল। আর্দ্র অবস্থাতেই (সে) পা টেনে নিয়ে বাতায়নের দিকে ধাবিত হওয়ায় বাতায়ন পর্যন্ত আল্‌তা রঞ্জিত পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে গেল। ৫৮।।

ডান-চোখে কাজল লাগিয়ে কোনো সুন্দরী বাঁ-চোখে কাজল লেপন না করেই অতি ত্বরায় কাজলকাঠিটি হাতে নিয়ে বাতায়নে উপস্থিত হল। বাঁ-চোখ কাজল ছাড়া রয়ে গেল। ৫৯।।

কোনো সুন্দরী গবাক্ষের জালপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছুটে চলল। (দ্রুত) চলায় তার বসনের গ্রন্থি খুলে গেল। গ্রন্থিবদ্ধ না

করেই হাতের আভরণের প্রভায় নাভি পূর্ণ করে সে খসে পড়া বসন হাতেই ধরে রইল। ৬০।।

৩. অনুবাদ : তারপর বিদর্ভরাজ (ভোজ) সাক্ষাৎ কার্তিকেয়ের সঙ্গে সম্মিলিত তাঁর পত্নী দেবসেনার মতো অনুরূপ বরের সঙ্গে সম্মিলিত ভগ্নীকে (ইন্দুমতীকে) নিয়ে নগর অভিমুখে গমন করলেন। ১।।

পত্রপুষ্পে সমাকীর্ণ, রামধনুর দ্যুতিতে শোভিত তোরণ শ্রেণীতে সুসজ্জিত রাজপথে (রৌদ্র) তাপ অনেকগুলি পতাকার ছায়ায় নিবারিত হয়েছিল। সেই রাজপথে বর বধূর সঙ্গে ক্রমে এসে উপস্থিত হলেন। ৪।।

তারপর অন্যান্য কাজগুলি ফেলে রেখে সুবর্ণজাল-সমাচ্ছাদিত-বাতায়ন বিশিষ্ট সৌধে তাঁদের (রাজদম্পতিকে) দেখতে উৎসুক পুরসুন্দরীরা প্রবৃত্ত হল। ৫।।

৬—৯ শ্লোক কুমারসম্ভবের ৫৭—৬০ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি। উপরের প্রাসঙ্গিক তথ্য ৩ দ্র.।

৪. অনুবাদ : (কোনো পুররমণী) চন্দ্রহার আধখানা গাঁথা হয়েছে (এমন সময়ে) শোভাযাত্রা আসছে শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। (তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য) গতিস্খলনে আধ গাঁথা মালা থেকে মণিগুলি খুলে ঝরে পড়তে লাগল। কেবল ঐ মালার সুতোটি তার বুড়ো আঙুলের গোড়ায় ধরা রইল। ৬১।।

গৃহের গবাক্ষগুলি সুন্দরীরমণীগণের মদ্য-গন্ধে-মধুর মুখগুলিতে একেবারে ভরে গেল। (বরবধূর শোভাযাত্রা দেখতে উৎসুক) তাদের ভ্রমরতুল্য চোখগুলি ইতস্তত প্রসৃত হতে লাগল। মনে হল, গবাক্ষগুলি শতদলরাশিতে সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। ৬২।।

দিনের বেলাতেই তাঁর (কপালের চাঁদের) জ্যোৎস্নায় প্রাসাদ শিখরগুলি দ্বিগুণ দ্যুতিময় করে চন্দ্রমৌলি (শিব) উন্নততোরণ শোভিত পতাকাকীর্ণ রাজপথে উপনীত হলেন। ৬৩।।

সেই একমাত্র দর্শনীয় শিবকে চোখ দিয়ে সর্বাত্মকভাবে দর্শন করতে করতে নারীরা যেন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অন্যান্য

বিষয়গুলিকে আর বোধের মধ্যেই আনতে পারল না। তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রবৃত্তি যেন চোখেই সমবেত হল। ৬৪।।

৫. ১০ ও ১১ সংখ্যক শ্লোক আগের কুমারসম্ভব থেকে উদ্ধৃত ৬১ ও ৬২ সংখ্যক শ্লোকের পুনরাবৃত্তি।

সেই কামিনীরা রাঘবকে (অজকে) এমন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছিল যে (অজ ভিন্ন) আর অন্য বিষয় প্রতিভাত হচ্ছিল না। (মনে হচ্ছিল) বুঝি এদের অন্য সব ইন্দ্রিয় চোখেই প্রবিষ্ট হয়ে আছে।

৬. 'গৃহ্যসূত্র' হিন্দুর জীবনযাত্রা ও ধর্মকর্মের নিয়ামক বিধিবিধানের সংকলন গ্রন্থ। জাতকর্ম উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি কর্তব্য এবং যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানবিধি 'গৃহ্যসূত্র'-এর বিষয়। বেদবিহিত কর্মকাণ্ডে যাবতীয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ মেলে বেদাঙ্গরূপে মান্য 'কল্পসূত্র'-এ। 'শ্রৌতসূত্র', 'শুল্কসূত্র', 'পিতৃমেধসূত্র', 'গৃহ্যসূত্র', এবং 'ধর্মসূত্র'— এগুলি 'কল্পসূত্র'-র সম্পৃক্ত বিভাগ।

৭. অনুবাদ : এই শিবের জন্য কোমলাঙ্গী অপর্ণা যে দুঃসাধ্য তপস্যা করেছেন, তা সার্থক হয়েছে। যে নারী এই শিবের দাসীত্বও লাভ করবে, তার জীবনও সফল; আর, যে এঁর অঙ্কশয্যাশায়িনী হবে, সে যে কৃতার্থা হবে— এ বিষয়ে বলার কী আছে? ৬৫।।

রমণীয়-সৌন্দর্য বিশিষ্ট এই দম্পতির মিলন যদি প্রজাপতি না ঘটাতেন, তা হলে এদের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রজাপতির যত্ন ব্যর্থ হয়ে যেত। ৬৬।।

মনে হয়, ক্রোধের বশে মহাদেব পুষ্পধন্বা কামদেবের শরীরকে দগ্ধ করেন নি। এঁকে দেখে লজ্জায় কামদেব নিজেই নিজদেহ ত্যাগ করেছিলেন। ৬৭।।

সখি! পর্বতরাজ হিমালয় এই মহেশ্বরের সঙ্গে অভিলষিত সম্বন্ধ স্থাপন করে পৃথিবী ধারণের গৌরবের থেকেও বেশি গৌরাবান্বিত হলেন। ৬৮।।

ওষধিপ্রস্থবাসিনী (হিমালয় নিবাসিনী) বিলাসিনীদের এরূপ শ্রবণসুখকর সংলাপ শুনতে শুনতে ত্রিলোচন শিব হিমালয়ের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে তাঁর মাথার উপরে চারদিকের বাতায়ন হতে বর্ষিত লাজ তাঁর হাতের বাজুতে লেগে চূর্ণ হচ্ছিল। ৬৯।।

৮. অনুবাদ : পরোক্ষে থেকে কত নরপতিই না ভোজরাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে (মনে মনে) বরণ করে নিয়েছিলেন? কিন্তু ভোজতনয়া যে স্বয়ংবরকেই সমীচীন বলে মনে করেছিলেন তা ঠিকই হয়েছে। নতুবা, পদ্মালয়া লক্ষ্মী যেমন নারায়ণ-কে লাভ করেছিলেন, তেমন ইনি কি অনুরূপ পতিলাভে সমর্থ হতেন? ১৩।।

শোভাময় পরস্পর পূজনীয় এই দম্পতিকে প্রজাপতি যদি মিলিত না করতেন তাহলে প্রজাপতির এমন রূপসৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত। ১৪।।

(এই দম্পতি উভয়ে) রতি ও কন্দর্প সন্দেহ নেই; না হলে এই বালা সহস্র রাজাদের মাঝ থেকে (এমন) আত্মপ্রতিরূপ পতি নির্বাচন করলেন? জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ মনের অগোচর থাকে না। ১৫।।

পুরবধূদের মুখে এমন শ্রবণ-সুখকর কথা শুনতে শুনতে কুমার (অজ) নানা মাঙ্গলিকদ্রব্যে উদ্ভাসিত নবীন সম্বন্ধীর (ভোজরাজের) প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ১৬।।

৯. অনুবাদ : তোমার মহিমা কীর্তন করে যে আমাদের বাক্য সংবৃত হচ্ছে তা নয়। গুণ বর্ণনায় সমর্থ না হওয়াকে কিংবা পরিশ্রম হওয়াতেই আমরা ক্ষান্ত হলাম।

১০. স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, সূক্ষ্মা (পরা)—এই চারটি বৃত্তির সংজ্ঞা আছে। জ্ঞান আদ্যাশক্তি, যার নাম কুলকুণ্ডলিনী। দেহকাণ্ডে ছয়টি চক্র বা বায়ুস্থান আছে। নিচ থেকে পরপর চক্রগুলির নাম : মূলাধার (গুহ্যদেশে), অধিষ্ঠানচক্র (তার উপরে), মণিপূরক-চক্র

~ ~

(নাভিদেশে), অনাহত চক্র (হৃদয়ে), বিশুদ্ধচক্র (কণ্ঠে), আজ্ঞাচক্র (ভ্রূ-সন্ধিতে)। চক্রগুলি সুষুম্না নাড়িতে গাঁথা। সুষুম্নার বাম ও ডানে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি। কুলকুণ্ডলিনী (জ্ঞান) সুপ্ত অবস্থায় মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করে। এই কুণ্ডলিনী থেকেই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপন্ন হয়। জাগ্রত ঊর্ধগামী কুণ্ডলিনী অধিষ্ঠানচক্রে পশ্যন্তী, আরও উপরে হৃৎপঙ্কজে অর্থাৎ অনাহতচক্রে তিনি নাদরূপিণী মধ্যমা—এটি বৈখরী অর্থাৎ বর্ণাভিব্যক্তির আগের অবস্থা; এখান থেকেই কুণ্ডলিনী ঊর্ধগামী হয়ে বক্ষ কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণ করে বিভক্ত বর্ণ বা স্বর ও বঞ্জন প্রসব করে। "শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্য ত্রু বৈখরী" (প্রাণতোষিণী-ধৃত পদার্থদর্শ)। শোনা যায় এমন শব্দসমূহ উৎপন্ন হয় কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধচক্র থেকে। এই অবস্থানই বৈখরী, শব্দপ্রপঞ্চ জননী।

১১. অনুবাদ : দেবগণকে এই উপদেশ বচন বলে জগৎকারণ ব্রহ্মা অন্তর্ধান করলেন। মনে কর্তব্য নিশ্চয় করে দেবগণও স্বর্গে গমন করলেন।

অজবিলাপ ও রতিবিলাপ

তারপর কুমারে রতিবিলাপ, রঘুবংশে অজবিলাপ। গোড়ায়, মাঝে, শেষে অন্য কথা সব বাদ দিয়া শুদ্ধ রতিবিলাপ ৩২টি কবিতায়, তেমনই শুদ্ধ অজবিলাপ ২৫টি কবিতায়। কুমারসম্ভবের বিলাপ—"পতিশোকে রতি কাঁদে— বিনাইয়া নানাছাঁদে"; রঘুবংশের বিলাপ— স্ত্রীর শোকে পুরুষের বিলাপ। স্ত্রীলোকের কান্নাকাটি কিছু বেশি বেশি। বিশেষ আত্মীয়স্বজন কাছে আসিলে তাহারা বড়োই কাঁদা-কাটি করে। সেজন্য রতি কাঁদিতেছেন— এমন সময়ে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার কাঁদা-কাটি বাড়িয়া গেল। অলংকারিকেরা বলিলেন, এটা দোষ হইল। দোষের নাম পুনঃপুনর্দীপ্তি— অর্থাৎ বার বার উস্‌কাইয়া দেওয়া। অলংকারিকের এ কথাটা একটু 'টেনেবোনা' হইয়াছে। 'দীপ্তি' তো পুনঃ পুনঃ হয় নাই, একবারেই হইয়াছে। তা স্ত্রীলোকের পক্ষে 'দীপ্তি' যদি একবারও না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেটি স্বভাব-বিরুদ্ধ হইবে। যাহা হোক, উহা এখানকার কথা নয়। রতিবিলাপ স্ত্রীলোকের বিলাপ, এজন্য একটু লম্বা হইলেও দোষের হয় নাই।

রতি কাঁদিতেছেন, স্বামীর গুণগান করিতেছেন, স্বামীর কীর্তিকলাপ স্মরণ করিতেছেন— সে স্বামী আর কেহ নয়, স্বয়ং মদন। রূপের তুলনা দিতে মদনের সঙ্গেই দেয়। সে রূপ এখন কোথায় গেল? সে রূপ ভস্ম হইয়া গেল, তিনি দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না। যে কেহ স্ত্রীলোকের বিলাপ মন দিয়া শুনিয়াছে, সেই জানে, সে বিলাপের মাত্রা "কোথায় গেলে?" আর "কোথায় গেলে তোমাকে পাব?" তাই রতি বলিতেছেন, "বাঁধ-ভাঙা জলের মতো তুমি কোথায় গেলে?" এ অঞ্চলে বাঁধ দিয়া পুকুর করে না। কিন্তু যেখানে জমি উঁচা-নিচু, কাছেই পাহাড়-পর্বত, সেখানে বাঁধ দিয়াই জল রাখে। দু-দিকেই উঁচা

জমি রহিল। উচা জমি দুটা মিলিয়া একটা কোণ হইল। কোণের সাম্‌নে জমি ক্রমেই নিচু হইয়া গিয়াছে। কোণের সামনে কিছুদূর গিয়া একটা বাঁধ দিলেই একটি প্রকাণ্ড পুকুর হইয়া যায়। সে বাঁধ ভাঙিলে কিন্তু পুকুরে একফোঁটাও জল থাকে না। তাই রতি বাঁধভাঙা জলের সঙ্গে মদনের তুলনা দিতেছেন; আর সেই পুকুরের পদ্মের সঙ্গে আপনার তুলনা করিতেছেন। বাঁধও হঠাৎ ভাঙে, মদনের মৃত্যুও হঠাৎ। সে বাঁধভাঙা জল যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তেমনি মদনও কোথায় গেলেন, কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

"কোথায় গেলে", এর পর "কেন গেলে?" "আমিও তোমার কোনো অনিষ্ট করি নাই, তুমিও কোনোদিন আমার অনিষ্ট করো নাই। তবে অকারণ আমাকে কেন দেখা দিতেছ না? অথবা আমি তোমার কাছে অপরাধী আছি বৈ কী? আমি যখন মাঝে মাঝে প্রণয়-কলহের সময় তোমাকে চন্দ্রহার দিয়া বাঁধিয়াছি এবং সময় সময় আমার কানের পদ্মের আঘাত তোমার মুখে বার বার লাগিয়াছে ও পদ্মের পরাগ ঝরিয়া তোমার চোখে ক্লেশ দিয়াছে, তখন আমি তোমার কাছে অপরাধী বৈ কী? সেই অপরাধেই কি তুমি আমায় ছাড়িয়া গেলে? তুমি বলিতে আমি তোমার হৃদয়ে বাস করি। এটি নেহাত আমার মনরাখা কথা। যদি তাই না হবে— এই দারুণ আগুনে তুমি পুড়িয়া গেলে, আর আমার গায়ে আঁচটিও লাগিল না!"

"দেখো, তুমি তো পরলোকেই গিয়াছ। আমিও তোমার পথেই যাইব। কারণ, এ পৃথিবীতে আর সুখ নাই। এ সমস্ত পৃথিবীর সুখের একমাত্র কারণ তুমি। তুমি যখন নাই, তখন পৃথিবীতে কোনো সুখই নাই। এ অসুখের সংসারে আমি আর থাকিব না। দেখো— তুমি নাই, কে আর অন্ধকার রাত্রিতে মেঘগর্জনের মধ্যে অভিসারিকাদের তাদের ভাবের লোকের বাড়ি পাঠাইবে? এখন মদ খাওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিড়ম্বনা হবে। আরো দেখো, তুমি নাই, তোমার প্রিয়বন্ধু চাঁদ ভাবিতেছেন, 'এখন আর আমার উঠাই বিফল।' তাই অমাবস্যা চলে গেলেও তিনি ক্ষীণই রহিয়া যান। আমের বোলগুলি এখন আর কার বাণ হইবে? ভ্রমরশ্রেণী— তুমি নাই— তারা এখন আর কার ধনুকের ছিলা হইবে? তাই তাহারা গুণগুণ করিয়া আমার সঙ্গে কাঁদিতে বসিয়া গিয়াছে। যাহা হোক্, তুমি উঠ। আবার তোমার মনোহর শরীর ধারণ করো। আর কোকিলাকে বলিয়া দাও, সে যেন আবার দূতীগিরিতে লাগে।" মদনের সাঙ্গোপাঙ্গের কথা মনে পড়িয়া রতির প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। অনেক গোপন কথা তাঁহার মনে

পড়িয়া গেল। সেসব কথা 'তিনি'-ই জানেন আর 'ইনি'-ই জানেন। রতি এই-সকল কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে গো আর থাকিতে পারিতেছি না।"

"তুমি আমার গায়ে যে ফুলের গহনাগুলি পরাইয়া দিয়াছিলে, সেগুলি এখনো রহিয়াছে, অথচ তুমি নাই, তোমার সে সুঠাম শরীর কোথায় গেল! আমার বামপায়ের আল্‌তাটি দেওয়া কেবল আরম্ভ হইয়াছিল, এমন সময়ে দেবতারা তোমায় ডাকিয়াছিলেন। এখন এসো, আল্‌তা-পরানো শেষ করো। আমি অগ্নি-প্রবেশ করে আবার তোমার কোলে এখনই গিয়া পৌঁছিব। নহিলে স্বর্গের অপ্সরারা তোমার মন ভুলাইয়া ফেলিবে। আমি যদি এখনো সহমরণে যাই, তবুও একটা কথা রহিয়া যাইবে— 'রতি মদন মরিয়া গেলেও এককক্ষণও তো জীবিত ছিল।' আমি যে তোমার চিতায় আরোহণ করিব, তোমাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া চিতায় শোয়াইব, সে ভাগ্যও তো আমার হইল না। কারণ, তোমার শরীর ও জীবন একেবারেই লয় হইয়া গেল।"

"আহা! তুমি যখন বাণটিকে সোজা করিতেছিলে, তোমার কোলে তোমার ফুলধনুটি পড়িয়া ছিল— সেই সময়ে তুমি যে হেসে হেসে মধুর সহিত কথা কহিতেছিলে, আর আড়নয়নে আমার দিকে চাইছিলে, তা আমার মনে এখনো জাগিতেছে। আহা, তোমার সেই ইষ্টবন্ধু মধুই বা কোথায়? সে যে ফুল দিয়া তোমার ধনুকখানি তৈয়ারি করিয়া দিত। রাগে পড়িয়া মহাদেব কি তাহাকেও ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন?"

রতি এইকথা বলিতে বলিতেই মধু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রতির শোক আবার নূতন হইয়া উঠিল— সে কাঁদিয়া বলিল— "দেখো দেখো, মধু তোমার বন্ধুর কী দশা হইয়াছে, দেখো। ঐ দেখো, তাহার দেহ ভস্ম হইয়া গিয়াছে। ভস্মের রঙ্ ঠিক পায়রার রঙের মতো; কিন্তু এ ভস্মও বুঝি আর থাকে না। বাতাস কণায় কণায় উহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। হে মদন, তোমার বন্ধু বড়ো কাতর হইয়াছেন, বড়ো উৎসুক হইয়াছেন, উঁহাকে একবার দেখা দাও। ভদ্রলোকের মন স্ত্রীর উপরে ততটা না থাকিলেও, বন্ধুর উপরে কখনো বিচলিত হয় না। ইনি আবার তোমার যে-সে বন্ধু নন। তোমার ধনুকের ছিলা তো মৃণালের সুতা দিয়া তৈয়ারি। আর অতি কোমল ফুলগুলি তো তোমার ধনুকের বাণ। তবু যে তুমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিয়াছ— সে কেবল মধু তোমার পাশে থাকিত বলিয়া। অতএব মধুর কাছ হইতে লুকাইও না।"

"মধু হে, বাতাসের ঝাপ্‌টায় যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, তেমনই তোমারও বন্ধু নিবিয়া গিয়াছেন। আর তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। পোড়া সলিতার মতো আমি পড়িয়া আছি। আমা হইতে কেবল দুঃখের ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কামকে মারিয়া ও সেই সঙ্গে আমায় না মারিয়া বিধাতা আমার অর্ধেকটা নষ্ট করিয়াছেন। কেন-না, দেখিতে পাওয়া যায়—হাতিতে বড়ো গাছ ভাঙিলে লতা আপনিই পড়িয়া যায়। তা ভাই, যদি আসিয়াছ, একটা বন্ধুর কার্য করো— আমাকে অগ্নিপ্রবেশ করাইয়া দাও। যে অচেতন জড়, সেও জানে যে স্বামী যে পথে যায়, স্ত্রীরও সেই পথ। তাহার সাক্ষী দেখো— চাঁদনি চাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যায়, মেঘের সঙ্গেই তড়িৎ লয় পায়। আমি স্বামীর এই গায়ের ভস্ম বুকে মাখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করি। মনে করিব, আমার কচিপাতার বিছানা। তুমি না বলিলেও অনেকবার আমাদের ফুলশয্যার সাহায্য করিয়াছ। এখন পায়ে পড়িয়া, হাতজোড় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার চিতাটি তৈয়ার করিয়া দাও। আমার মুখে আগুন দিয়া দক্ষিণ-বাতাসে শীঘ্র শীঘ্র জ্বালাইয়া দাও। তুমি তো জানো যে, আমি ছাড়া মদনের এক মুহূর্তও স্ফূর্তি থাকে না। এইসব করিয়া এক অঞ্জলি জল আমাদের দু-জনকে দিও, আমরা ভাগ না করিয়াই পরলোকে সেইটুকু খাইব। আর টাট্‌কা কচি পাতাওয়ালা আমের বোল শ্রাদ্ধে দিবে, কেন-না, তিনি আমের বোল বড়ো ভালোবাসেন।"

রতি প্রথমেই "ওগো, তুমি কোথায় গেলে গো!" "অকারণে কেন গেলে গো!" আমি যা করিয়াছি সে তো অপরাধ নয়, তুমিই বরং আমাকে ছলনা করিয়া বলিতে— 'আমি তোমার হৃদয়ে বাস করি,' তুমি বিনা সংসারই অসুখের হইয়াছে। এখন অভিসারিকারা আর বাহির হইবে না, মদ বিড়ম্বনা হইয়াছে। চাঁদের শরীর ক্ষীণ হইয়াছে। তোমার শর বলিয়াই তো আমের বোলের মহিমা— সে তো আর তোমার শর হইতে পারিবে না। তোমার দূতী বলিয়াই কোকিলার এত মহিমা— সে তো আর তোমার দূতী হইতে পারিবে না। তোমার ধনুকের ছিলা বলিয়াই তো ভোমরার এত মহিমা— সে তো আর তোমার ধনুকের ছিলা হইবে না। সুতরাং সবই অসুখের হইয়া গেল। তোমার গুণের কথা মনে পড়িলে, আমার মনের শান্তি থাকে না। আমি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া শীঘ্রই তোমার কাছে যাইব। এই যে কিছুক্ষণ তোমা-হারা হইয়া বাঁচিয়া আছি— ইহাতেই কথা উঠিবে যে, 'মদন মরিয়া গেলেও রতি কিছুক্ষণও তো বাঁচিয়া ছিল।' লোকে মৃতদেহ সাজায়, আমি তাহাও পারিলাম না। আমার মনে পড়িতেছে— তুমি আড়নয়নে চাহিতে

চাহিতে মধুর সঙ্গে কথা কহিতেছ। সে মধুই বা কোথায় গেল?” মধু আসিলে রতি বলিলেন— “ও মধু, তোমার বন্ধুর কী দশা হইয়াছে, দেখো।” আবার বলিতেছেন— “হে মদন, তোমার বন্ধু আসিয়াছে, দেখা দাও, আমায় দেখা দাও-আর-না-দাও, তাকে দেখা দাও, সে তোমার যে-সে বন্ধু নয়। হে মধু, মদন ও রতি যেন দীপ ও সলিতা ধোঁয়াইতে লাগিল। দু-জনকে একত্র মারিলে পুরা মারা হইত। বিধাতা মদনকে মারিলেন, আমাকে জীয়ন্ত রাখিলেন। তাঁহার কাজ আধাসারা হইল। এখন আর কী? আমায় আগুন দিয়া স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দাও। সকলেই জানে, স্বামী মরিলে স্ত্রীকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হয়। আমি স্বামীর দেহভস্ম গায়ে মাখিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিব, আমার কোনো কষ্ট হইবে না। তুমি সব কাজেই আমাদের সহায় ছিলে, এ কাজেও হও। আমায় চিতায় তুলিয়া দিয়া আগুনটি মলয়মারুত দিয়া জ্বালাইও। এক অঞ্জলি জল আমাদের উদ্দেশ্যে দিও, আর-একটি আমের বোল দিও, তাতে যেন কচিপাতা থাকে।”

রতিবিলাপের এই সংক্ষিপ্তসার পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, ২/৩ জায়গায় তার কাটিয়া গিয়াছে। “আমি তোমার হৃদয়ে বাস করি, এই মিথ্যাকথাটি বলিয়াছ”— এ কথাটি আগেকার কথার সঙ্গে বা পরের কথার সঙ্গে মিলে না। “উঠ, কোকিলাকে আবার তোমার দূতী করো,” ইহার পর তাঁহার গোপন কথা মনে করিয়া অধীর হইয়া উঠা সংলগ্ন হয় না। আবার এইরূপ অধীর হইয়া উঠিবার পর “তোমার পরানো ফুলের গহনা এখনো আমার গায়েই রহিয়াছে, তুমি কোথায় গেলে গো?”— এ কথারও সামঞ্জস্য হয় না। এইরূপ অনেক কথারই সামঞ্জস্য হয় না। একটা কবিতার পর আর-একটা কবিতা কেন আসিল, অনেক জায়গায়ই বুঝিয়া উঠা যায় না। তবে এক কথা— মেয়েমানুষের শোক— একভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ নূতন কোনো গুণের কথা মনে পড়িল, অমনি মনের বেগ আর-একদিকে চলিয়া গেল। এই তো গেল রতিবিলাপ।

এখন অজবিলাপ। “ফুলের ঘাতে যদি মানুষ মরে, তাহা হইলে বিধাতা কী দিয়া যে মানুষ মারিতে পারেন না— বলা যায় না। বিধাতা মৃদুবস্তুর নাশের জন্য মৃদুবস্তুরই ব্যবহার করেন। তিনি হিম দিয়া পদ্ম মারেন। অথবা আমার ভাগ্য-দোষে বিধাতা এমনই এক বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন— যাহাতে লতাটি মরিল, আর তার আশ্রয়-তরুটি মরিল না। আমি শত অপরাধ করিলেও আমাকে কোনো দিন অবজ্ঞা করো নাই। কিন্তু আজ আমি তো কোনো অপরাধই করি নাই, তবুও আমার

কথার উত্তর দিতেছ না কেন? তুমি কি আমাকে শঠ নায়ক মনে করিতে? তাই পরলোকে যাইবার সময়— আমাকে কোনো কথাই বলিয়া গেলে না? মালা পরিবার সময় দু-জনেই অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেবল আমিই কেন চেতনা পাইলাম? চেতনা পাইয়া কী দেখিতেছি? পরিশ্রমের ঘাম এখনো তোমার মুখে লাগিয়া আছে, অথচ তুমি নাই। আমি ক্ষিতিপতি বলিয়া কি তোমার ঈর্ষা হইয়াছিল— তাই তুমি আমায় ছাড়িয়া গেলে? কিন্তু সে তো কেবল নামে, আমার মন-প্রাণ তো তোমারই উপর ছিল। আমি তো কখনো তোমার কোনো অপ্রিয় কার্য করি নাই। তবে তুমি আমায় ছাড়ো কেন? না—তুমি বুঝি ছাড়ো নাই। বাতাসে তোমার ঝাপটা নড়িতেছে। মনে হইতেছে, তুমি যেন আবার ফিরিয়া আসিবে। তাই হউক। তুমি ফিরিয়া এসো। আমার সব বিষাদ দূর হইয়া যাক। তোমার অলক নড়িতেছে— কিন্তু তোমার মুখে কথা নাই। দেখিয়া আমার বড়োই দুঃখ হইতেছে। রাত্রি আবার চন্দ্রকে পায়, চকি আবার চকাকে পায়— তাই তাহারা বিরহ সহ্য করিতে পারে। আমি সহিতে পারি না— তোমাকে ফিরিয়া পাইবার যে আশাই নাই। কচিপাতার বিছানায় শুইয়াও তুমি কষ্ট অনুভব করিতে; তোমাকে কেমন করিয়া চিতার উপর তুলিয়া দিব? তুমি আর নড় না, তোমার চন্দ্রহার আর ঝুম্‌ঝুম্‌ করে না। সে বুঝি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়াছে। তুমি স্বর্গে যাইবার জন্য বড়ো ব্যস্ত। তবুও আমার তৃপ্তির জন্য তোমার মিষ্টকথাগুলি কোকিলকে দিয়া গিয়াছ, তোমার ভঙ্গিটা হংসীকে দিয়া গিয়াছ, তোমার চঞ্চল চক্ষু দুটি হরিণীকে দিয়া গিয়াছ, আর তোমার হাবভাব বাতাসে চঞ্চল লতাগুলিতে রাখিয়া গিয়াছ। তথাপি কিছুতেই আমর মনের শান্তি হইতেছে না। একটি সহকার আর-একটি প্রিয়ঙ্গুলতা তুমি পুতিয়াছিলে, বলিয়াছিলে, তুমি ইহাদের বিবাহ দিবে। বিবাহ যতদিন না হয়, ততদিন কি তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত? এই অশোকগাছটির ফুল হয় না বলিয়া তুমি একদিন আমার সহিত গিয়া বামপায়ে উহাতে লাথি মারিয়াছিলে। এখন উহার ফুল হইবে। সে ফুল তোমার ঝাপ্‌টার যোগ্য। কেমন করিয়া উহা তোমার শ্রাদ্ধে দিব? ঐ দেখো, অশোকের ফুল হইয়াছে। সে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। সে যেন তোমার জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছে। বকুলের একছড়া মালা তোমায় আমায় গাঁথিতেছিলাম, সে মালা এখনো শেষ হয় নাই। এখন কি তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত? দেখো, তোমার মতো এ সংসারে সুখী কে? তোমার সখীরা তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী। প্রতিপচন্দ্রের মতো তোমার ছেলে। আর আমি— আমি তো একমাত্র তোমাকেই জানি, তোমাকেই চিনি। তোমার কাজটি বড়োই নিষ্ঠুরের কাজ হইতেছে।

~ ~

আর আমার কী হইয়াছে— ধৈর্য অস্তগত হইয়াছে, আনন্দ এই পর্যন্ত, গানবাজনা সব বন্ধ, ঋতুর উৎসব বন্ধ, গহনাপত্রের দরকার নাই, বিছানা শূন্য হইয়াছে। তুমি আমার গৃহিণী ছিলে, তুমি আমার মন্ত্রী ছিলে, তুমি আমার সকল কাজেই সখী ছিলে, ললিতকলায় তুমি আমার শিষ্য ছিলে; নিষ্ঠুর বিধাতা তোমায় হরণ করিয়া আমার সবই হরণ করিয়াছেন। আমার যথেষ্ট বৈভব আছে সত্য, আমার সুখ কিন্তু এই হইতেই শেষ। আর কিছুতেই কখনোই আমাকে ভুলাইতে পারে নাই, পারিবে না। তুমিই আমার যথাসর্বস্ব ছিলে। তুমিই আমার ভোগ, তুমিই আমার রাগ, তুমিই আমার সুখশান্তি।"

এ বিলাপে তার বড়ো একটা কাটে নাই। সমস্তটাই যেন একতারে বাঁধা। যে ভাবটির পর যে ভাবটি আসা উচিত— ঠিক আসিয়াছে। রতিবিলাপে মেয়েমানুষের কান্না বলিয়া যে দোষ সমর্থন করিতে হয়, তাহা অজবিলাপে নাই। অজবিলাপ আর রতিবিলাপ একভাষায় লেখা, একছন্দে লেখা, এক কবির লেখা, একরূপ ঘটনা লইয়াই লেখা— এখানে হঠাৎ মদনের মৃত্যু, ওখানেও হঠাৎ ইন্দুমতীর মৃত্যু। তথাপি পড়িলেই মনে হয়, অজবিলাপের সুর রতিবিলাপের চেয়ে বেশি জমাট, ভাবও বেশি ঘোরাল। অজবিলাপে দুই-চারিটি কথা আছে, যাহা বয়স বেশি না হইলে লেখা যায় না— যেমন—

"সুরতশ্রমসম্ভৃতো মুখে, ধ্রিয়তে স্বেদলবোদ্‌গমোঽপি তে।
অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা, ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাম্।।"

[৮/৫১]

[তোমার মুখে সম্ভোগশ্রমজাত ঘর্মজলকণাও লেগে রয়েছে। অথচ, (এরই মধ্যে) তুমি চলে গেলে। দেহধারিগণের এই ক্ষণভঙ্গুরতাকে ধিক্‌।]

এই যে "ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাং", এইরূপ একটি কথাও রতিবিলাপে নাই।

ইহার পর বিলাপের পরিণাম দুই জায়গায় দুই রকম। রতিবিলাপে রতি যখন নিতান্তই সহগমন করিবেন, তখন দৈববাণী হইল। সে দৈববাণী মদনের মৃত্যুর কারণ বুঝাইয়া দিল— তিনি একদিন ব্রহ্মার উপর বড়োই অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাই ব্রহ্মাঠাকুর রাগিয়া তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহারই এই ফল। সে শাপের শেষ মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর পরিণয়, মহাদেব দাম্পত্যসুখ অনুভব করিয়া মদনকে বাঁচাইয়া দিলেন। তাই দৈববাণী— "রতি, দেহত্যাগ করিও না, অল্পদিনের

মধ্যেই আবার তোমার স্বামীর সহিত মিলন হইবে।'' সে মিলনও হইল, কুমারসম্ভব-ও শেষ হইল।

পুরাণে যদিও মদনের সঙ্গে রতির মিলন হইতে তিন যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর) লাগিয়াছিল, শেষে কলিযুগে কৃষ্ণের নাতি হইয়া মদন জন্মাইলে তাঁহার সহিত রতির মিলন হয়; কালিদাস অল্প বয়েসে কাব্য লিখিতে গিয়া এত দীর্ঘ বিরহ লিখিতে ভরসা করিলেন না। তাই তিনি সকাল সকাল তাঁহাদের মিলনের উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

প্রবীণ কবি কিন্তু অজবিলাপে সেরূপ করিতে পারিলেন না। তিনি রাজার গৌরব বজায় রাখিলেন। রাজা হইয়া স্ত্রীর বিরহে দেহত্যাগ করিলে অপযশ হইবে, এই ভয়েই অজ দেহত্যাগ করিলেন না— ''ন তু জীবিতাশয়া।'' [জীবনের আশায় কিন্তু নয়] আরো, ছেলে যে এখন সাবালক হয় নাই। তাহার সাবলক হইতে আট বৎসর লাগিবে। এই আট বৎসর তাঁহাকে বাঁচিতেই হইবে। সংসারের কঠিন শাসনে— তিনি যতই পীড়িত হউন— তাঁহাকে কাজ করিতেই হইবে। বশিষ্ঠ যজ্ঞকার্যে ব্যস্ত। তাই তিনি নিজে আসিতে না পারিয়া শিষ্যকে পাঠাইলেন। শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল— সে তো প্রবোধ নয়, জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি। সে বলিল, ''তুমি কাঁদিয়া কী করিবে? তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গেই মরিতে, তাহা হইলেও তুমি তাহাকে পাইতে না। কারণ, যে যেমন কার্য করে, পরলোকে তার তেমনই গতি হয়। দু-জনে কখনো একপথে যায় না।'' শিষ্য প্রবোধ দিতে আসিয়া, সান্ত্বনার যে একটু সূক্ষ্ম তন্তু ছিল, তাহাও কাটিয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু কবি নিজে তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে দু-জনকে মিলাইয়া দিলেন। সেখানকার ইন্দুমতী মানুষ ইন্দুমতী অপেক্ষা অনেক সুন্দরী।

এখন এই দুই বিলাপের মধ্যে কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে, আপনারা তাহা বিচার করুন।

নারায়ণ
কার্তিক, ১৩২৫।।

রঘুকাব্য বড়ো কিসে

কাব্য বা মহাকাব্য হয় একটি নায়ক, একটি নায়িকা, একটি দেশ, একটি নগর বা একটি নগরী লইয়া। সমস্তটাই বহির্জগতেরই হউক বা অন্তর্জগতেরই হউক, একটি ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। অন্তর্জগতের গণ্ডিও ছোটো— হয় প্রেম, নয় করুণ, নয় বীররস। রঘুবংশ গণ্ডি মানে না। যদি ইহার কোনো গণ্ডি থাকে, তবে উহা প্রকাণ্ড দিগ্‌দেশকাল ব্যাপিয়া। রসভাব বলো, প্রায় সব- কটিই উহাতে আছে। সুতরাং কী বাহিরে, কী ভিতরে, রঘুবংশ একখানি প্রকাণ্ড কাব্য। দেশ যদি বলো, উহা সমস্ত ভারত জুড়িয়া আছে, এমন-কী, ভারতের বাহিরেও পারস্যদেশ, আরবদেশ, যবনদেশ, হূণদেশ, লঙ্কা, উচাং, বোস্তাং, খোটান প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেরও একবার চারিদিক্ ঘুরিয়া আসিয়া, মধ্যস্থলের দেশগুলিরও বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বর্গ আছে, মর্ত আছে, নাগলোক আছে, সমুদ্র আছে, পর্বত আছে, বন আছে, নদ-নদী আছে। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশে যাহা কিছু আছে, ইহাতে সবই আছে। দেশও যেমন প্রকাণ্ড, কালও তেমন প্রকাণ্ড। —২৯ পুরুষ এই কাব্যের বিষয়। এই ২৯ পুরুষে নানারকমের রাজা আছেন— ভালো আছেন, মন্দ আছেন, ধার্মিক আছেন, অধার্মিক আছেন, দানবীর আছেন, ধর্মবীর আছেন, যোদ্ধা আছেন, বিলাসী আছেন, প্রেমিক আছেন, লম্পট আছেন। এই ২৯জন রাজা কেমন হারের মতো একটি সুতায় গাঁথা আছেন; আর এই হারের মধ্যমণি **শ্রীনারায়ণ**— সকল গুণের সমষ্টি, সকল গুণের চরম উৎকর্ষ। কবিরা যাহা যাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রায় সবই রঘুবংশে আছে— সমুদ্র-বর্ণনা আছে, পর্বত-বর্ণনা আছে, নগরের বর্ণনা আছে, গ্রীষ্ম-বর্ণনা আছে, বসন্ত-বর্ণনা আছে, শরদ্বর্ণনা আছে; মৃগয়ার বর্ণনা আছে, যুদ্ধের বর্ণনা আছে,

স্থলপথে ভ্রমণ-বর্ণনা আছে, আকাশপথে ভ্রমণের বর্ণনা আছে, রাজার বর্ণনা আছে, রাজকন্যার বর্ণনা আছে, মন্ত্রিসভার বর্ণনা আছে, অভিষেকের বর্ণনা আছে, নীতির বর্ণনা আছে, অনীতির বর্ণনা আছে, রাজাদের ক্যাটালগ আছে, বালকের বর্ণনা আছে, যুবার বর্ণনা আছে, বৃদ্ধের বর্ণনা আছে, গানবাজনার বর্ণনা আছে, মদ খাওয়ার বর্ণনা আছে, নির্মল দাম্পত্য প্রেমের বর্ণনা আছে, আবার কলুষিত অন্যবিধ প্রেমেরও বর্ণনা আছে; স্ত্রীবিরহে স্বামীর বিলাপ আছে, স্বামীর বিরহে স্ত্রীর বিলাপ আছে, গো-ব্রাহ্মণের ভক্তির বর্ণনা আছে, পিতৃভক্তির বর্ণনা আছে, ভ্রাতৃস্নেহের বর্ণনা আছে, করুণরসের বর্ণনা আছে, বীররসের বর্ণনা আছে, শৃঙ্গাররসের বর্ণনা আছে, অদ্ভুতরসের বর্ণনা আছে, ভয়ানকরসের বর্ণনা আছে, রৌদ্ররসের বর্ণনা আছে, শান্তরসের বর্ণনা আছে। মোট কথা— সমস্ত পৃথিবীর কবিরা যাহা-কিছু বর্ণনা করেন, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ভালোগুলি রঘুবংশে লইয়াছেন।

তাহার পর ভাষা। রঘুবংশের ভাষাটি একেবারে চাঁচা-ছোলা, প্রাঞ্জল, — একটি শব্দও বেশি নাই, একটি শব্দও নড়চড় করিবার যোটি নাই, দ্বিরুক্তি-পুনরুক্তির লেশও নাই। কবি ও পাঠকের মধ্যে ভাষার একটা আবরণ আছে বলিয়াই মনে হয় না। একথা চলিত ভাষায় যত খাটে, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ততটুকু খাটিবে কি-না, অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু কালিদাসের সময়েও সংস্কৃত অনেক ব্রাহ্মণের মাতৃভাষাই ছিল। কালিদাসের সাত শত বৎসর পূর্বে পতঞ্জলি[১] যখন মহাভাষ্য লিখেন, তখন তিনি বলিয়াছেন— "আমি শিষ্টদের ব্যবহার দেখিয়াই পাণিনির[২] সূত্র ও কাত্যায়নের[৩] বার্তিকের উপর ভাষা করিতেছি।" শিষ্টশব্দের অর্থও তিনি করিয়াছেন— ব্রাহ্মণ, আর্যাবর্তবাসী, ধনী এবং কোনো-না-কোনো শাস্ত্রে পারদর্শী। নানারূপ বিপ্লবে এই-সকল শিষ্টের সংখ্যা যদিও কমিতেছিল, তথাপিও কালিদাসের সময়ে একেবারে লোপ পায় নাই— লোপ পাইয়াছিল ভবভূতিরও[৪] পরে খৃ. ৯ম শতকে। কারণ— কাশিকাবৃত্তিকারও[৫] সংস্কৃতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতের বিচার করিয়াছেন, কিন্তু সংক্ষিপ্তসার[৬] প্রভৃতি নূতন ব্যাকরণওয়ালারা সেকথা তুলেন নাই। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাশিকার পর ও সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদির আগে কোনো সময়ে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতের লোপ হইয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে accent বলে, সংস্কৃতে তাহাকেই

উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত বলে। আর accent চলিত ভাষাতেই থাকে, অন্য ভাষায় থাকে না। কালিদাস কাশিকারও আগে, সুতরাং তাঁহার সময়েও সংস্কৃত অনেকটা চলিত ভাষা ছিল। বাজেলোকের মধ্যে নানাদেশের নানারূপ প্রাকৃতভাষা হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখনো সংস্কৃতভাষায়ই কথাবার্তা চলিত। কালিদাস সেই ভাষায়ই লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাষা অতি সরল ও অতি মধুর হইয়াছে। কালিদাসে অন্য-সকল কাব্যে ও নাটকে ভাষার যে-সকল দোষ দেখা যায়, রঘুবংশে সে-সকল দোষ দেখা যায় না। ঋতুসংহার ও মালবিকাগ্নিমিত্রে অনেক সময় দূরান্বয় দেখা যায়। রঘুবংশে সে দোষ একেবারে নাই। কঠিন বা অপ্রচলিত শব্দ রঘুবংশে নাই বলিলেও হয়। যে ভাষায় কথাবার্তা চলে না, তাহার একটা দোষ— উহাতে লম্বা লম্বা সমাস আসিয়া জুটিয়া যায়। কালিদাসে কিন্তু সে দোষ বড়ো বেশি নাই। বাণভট্টে[৭], ভবভূতিতে ও শঙ্করাচার্যে[৮] যেরূপ দেড়গজি ও দু-গজি সমাস দেখা যায়, কালিদাসে সেরূপ একেবারেই নাই। সংস্কৃতভাষা শিখিতে হইলে আমার বোধ হয়, কালিদাসই মডেল, তাঁহার গ্রন্থবলীর মধ্যে রঘুবংশই মডেল।

এইবার ছন্দের কথা। যে ছন্দেই লেখা হউক, রঘুবংশের ছন্দগুলি অতিমধুর— যেন বীণা ঝংকার করিতেছে। দ্রুতবিলম্বিত ও বিয়োগিনী যেন সেতার-তারে বা বেহালার সুরে গাঁথা। বিয়োগিনী শোকের ছন্দ, আর দ্রুতবিলম্বিত সুখের ছন্দ। এই দুই ছন্দ পড়িবার সময় যে শুধুই কানে সুরের মতো লাগে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে মনেরও তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও রথোদ্ধতার তো কথাই নাই; উহা যে রসেই লাগাও, সেই রসেই লাগিবে; যে ভাবেই বলো, সেই ভাবেই জোর করিয়া দিবে। ছন্দগুলি ১১অক্ষরে লেখা— বৈদিক ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ভেদমাত্র। কালিদাস এইরূপ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার হাতে উহারা যেন ডাকিলে কথা কয়। আদিরসের বর্ণনায় ১৯শ সর্গে রথোদ্ধতা কেমন কোমল, কেমন মনোহর, কেমন মনপ্রাণ মাতোয়ারা করিয়া ফেলে। দেখুন—

"অঙ্কমঙ্কপরিবর্তনোচিতে
তস্য নিন্যতুর শূন্যতামুভে।
বল্লকী স হৃদয়ঙ্গমস্বনা
বল্গুবাগপি চ বামলোচনা।।

স স্বয়ং প্রহতপুষ্করঃ কৃতী
লোলমাল্যবলয়ো হরন্মনঃ।
নর্ত্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ
পার্শ্ববর্ত্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ।।
চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং
স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ।
প্রেমদত্তবদনানিলঃ পিবন্
অত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ।।”[৯]

[১৯/১৩-১৫]

আবার দেখুন, এই রথোদ্ধতা ১১শ সর্গে পরশুরামের ক্রোধ-বর্ণনায় কী ভয়ংকর রূপ-ধারণ করিয়াছিল।

“তেজসঃ সপদি রাশিরুত্থিতঃ
প্রাদুরাস কিল বাহিনীমুখে।
যঃ প্রমৃজ্য নয়নানি সৈনিকৈ
লক্ষণীয়পুরুষাকৃতিশ্চিরাৎ।।
পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং
মাতৃকঞ্চ ধনুরার্জ্জিতং দধৎ।
যঃ সসোম ইব ঘর্মদীধিতিঃ
সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ।।
যেন রোষপরুষাত্মনঃ পিতুঃ
শাসনে স্থিতিভিদোঽপি তস্থুষা
বেপমানজননীশিরশ্ছিদা
প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী।।
অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ
দক্ষিণশ্রবণসংস্থিতেন যঃ
ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতে—
র্ব্যাজপূর্ব্বগণনামিবোদ্বহন্।।”[১০]

[১১/৬৩-৬৬]

আবার বীররসে উপজাতি কেমন লাগিয়াছে, দেখুন —

"স রোষদষ্টাধিকলোহিতৌষ্ঠৈ-
ব্যক্তোর্দ্ধরেখা ভ্রূকুটীর্বহদ্ভিঃ।
তস্তার গাং ভল্লনিকৃত্তকণ্ঠৈ-
র্হুঙ্কারগর্ভৈর্দ্বিষতাং শিরোভিঃ।।
সর্ব্বৈর্বলাঙ্গৈর্দ্বিরদপ্রধানৈঃ
সর্ব্বায়ুধৈঃ কঙ্কটভেদিতিশ্চ।
সর্ব্বপ্রযত্নেন চ ভূমিপালা-
স্তস্মিন্ প্রজহ্রুর্যুধি সর্ব্ব এব।।
সোঽস্ত্রব্রজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং
ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভূব লক্ষ্যঃ।
নীহারমগ্নো দিনপূর্ব্বভাগঃ
কিঞ্চিৎ প্রকাশেন বিবস্বতেব।।"[১১]

[৭/৫৮-৬০]

শোকে আবার সেই উপজাতি কেমন জমাইয়াছে দেখুন। লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিবার সময়, সীতা বলিতেছেন —

"নিশাচরোপপ্লুতভর্ত্তৃকাণাং
তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং
কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে।।
কিংবা তবাত্যন্তবিয়োগমোঘে
কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজ-
স্ত্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ।।
সাহং তপঃসূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টি-
রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।

~ ~

ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।।"[১২]

[১৪/৬৪-৬৬]

এখন লোকে খোসখত্ লেখার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন টাইপ্-রাইটিং-এর এত চলন হয় নাই, যখন ছাপাখানার উৎপাত এত বাড়ে নাই, যখন আপিসের বড়ো কর্তারা হিজিবিজি টানিয়াই যাইতেন, তখন খোসখত্ লেখার বড়ো আদর ছিল। খোসখত্ লেখাটি কেরানি মহলের একচেটিয়া ছিল। কোন্ অক্ষরের কোন্ জায়গায় সরু হইবে, কোন্ জায়গায় মোটা হইবে, কোন্ জায়গায় সরু হইতে হইতে হঠাৎ একেবারে মোটা হইবে, কোন্ জায়গায় ক্রমে ক্রমে মোটা হইবে, এসব কেরানিরা শিল্পকলার মতো অভ্যাস করিত। একপাত খোসখত্ লেখা একখানি ছবির মতো দেখাইত। ভালো কবিরও লেখার ভাষা বা রচনার ভঙ্গি এইরূপ খোসখত্ লেখার মতো। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, রসের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে থাকে, পড়িতে থাকে। যাহার ভাষা একঘেয়ে— একই রীতিতে চলিয়া যায়, সে কেমন করিয়া ভাব ও রস ফুটাইবে। কিন্তু এইরূপ রস ফুটাইতে কালিদাস দক্ষ বৃহস্পতি। তাঁহার ভাব, ভাষা, রীতি এক সুতায় গাঁথা— ভাব উঠিতেছে তো ভাষা উঠিতেছে, রীতিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিতেছে; আবার ভাষা পড়িতেছে তো ভাবও পড়িতেছে, রীতিও পড়িতেছে। এইরূপ ভাবে ভাষা ও রীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া উহাদিগকে একসুতায় বাঁধিয়া একখানি প্রকাণ্ড কাব্য লেখা খুব পাকাহাতের কাজ, অনেক পরিশ্রমের ফল। ইহার উপর আবার কালিদাসে আর-এক অসাধারণ গুণ আছে— তিনি একটি কথা, এমন-কী, একটি অক্ষরও বৃথা ব্যয় করেন না। পাদ-পূরণার্থ "চ-বা-তু-হি" তাঁহার একেবারে নাই। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। গল্পটি এই—কালিদাস একবার ব্যাসকাশীতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ব্যাসের প্রতিমা দেখিতে পান। প্রতিমার পেটটি একটু মোটা। কালিদাস ব্যাসের ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন যে, এই ভুঁড়িটিতে যে কত 'চ-বা-তু-হি' আছে, তাহার ঠিকানা নাই। অমনি কালিদাসের হাতটি ভুঁড়িতে আট্‌কাইয়া যায়। ব্যাসের অনেক স্তবস্তুতি করার পর তাঁহার হাত খুলিয়া যায়।

সুতরাং কালিদাস যে বৃথা শব্দ বা বৃথা অক্ষর ব্যবহার করিতে ঘৃণা করেন

— এ কথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। লোকে বলে, ভারবির লেখা বড়ো গাঢ়। আমার বোধ হয়, কালিদাসের লেখা তার চেয়েও গাঢ়। তাঁহার লেখা হইতে একটি শব্দ বা একটি অক্ষরও বদলাইবার যোটি নাই, বদলাইলেই অর্থ বদলাইয়া যাইবে। তাই আমাদের সংস্কার, কালিদাস অনেকগুলি কাব্য লিখিয়া, হাত পাকাইয়া রঘুবংশ লিখিতে বসেন। রঘুবংশে তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন— অজবিলাপে "ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাং"— বশিষ্ঠশিষ্য আসিয়া অজকে যে প্রবোধ দিয়া গেলেন, তাহাও কেহ অল্পবয়সে লিখিতে পারে না। "পরলোকজুষাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্" "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্।"

> "অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতং
> স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্।।"
> "স্বশরীরশরীরিণাবপি শ্রুতসংযোগাবিপর্য্যয়ৌ যদা।
> বিরহঃ কিমিবানুতাপয়েৎ বদ বাহ্যৈবিষয়ৈর্ব্বিপশ্চিতম্।।"[১৩]

[৮/৮৮-৮৯]

এ-সকল কথা অল্পবয়সের কথা নয়। এ-সকল কথা বুঝিতে গেলে অনেক কাঠ-খড় লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কালিদাস এক জায়গায় ধরাও দিয়াছেন। তিনি নিজের কথা কোথাও বলেন না। কিন্তু এই জায়গায় যেন বলিয়া ফেলিয়াছেন—

> "ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈঃ
> ন পুনরৈতি গতং চতুরং বয়ঃ।
> পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে
> স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ।।"[১৪]

[৯/৪৭]

এ-সকল কথা বয়স না গড়াইলে লোকে বলিতে পারে না। চল্লিশের এপারে এরূপ ভাবের ভাব মনেই উদয় দেয় না। "ন পুনরৈতি গতং চতুরং বয়ঃ"— সে বয়স যার যায় নাই, সে কেমন করিয়া বলিবে? সে সে কথা ধারণা করিতেই

পারে না। কিন্তু সেই বয়স একবার চলিয়া গেলে নিত্য নিত্যই ঐ একই কথা মনে হয়। সুতরাং এই জায়গায় কবি বেশ ধরা দিয়াছেন। শেষবয়সেই তিনি রঘুকাব্য লিখিতে বসেন— তিনি একজন বড়ো কবি, তাঁহার যখন শেষবয়সের কাব্য, তখন রঘুবংশ বাস্তবিকই এক বড়ো কাব্য— দেশেও বড়ো, কালেও বড়ো, ভাবেও বড়ো, ভাষায়ও বড়ো, গাঁথনিতে বড়ো— সব বিষয়েই বড়ো।

নারায়ণ

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল আনুমানিক খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। গোনর্দ বা আধুনিক উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় জন্ম। তিনি গোণিকা-পুত্র, গোণর্দীয় বা চূর্ণিকৃত নামে খ্যাত। অনেকে তাঁকে অনন্তনাগের অবতার বলেন। পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্র ও কাত্যায়নের বার্তিক অতি সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর মহাভাষ্য রচনা করেন। শুধু মহাভাষ্য বললে এই ভাষ্যকেই বোঝায়। বইটির অপর নাম ফণিভাষ্য। যোগদর্শন রচয়িতা পতঞ্জলি ও ইনি এক ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে। আরো তথ্যের জন্য দ্র. হ-র-সং-৩, "কাশীনাথ বিদ্যানিবাস" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য, সূত্র-১৩।

২. প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা অষ্টাধ্যায়ী-র লেখক পাণিনির জীবনকাল অনিশ্চিত। বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত ধরে উর্ধ্বতম এবং নিম্নতম কালসীমা নির্দেশ করা যায় ৭০০ এবং ৩৫০ খৃস্টপূর্বাব্দ। পাণিনির জন্ম বর্তমান পশ্চিম-পাকিস্তানে আটক্-এর কাছে শালাতুর-এ। হিউএন-ৎসাং শালাতুরে পাণিনির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন। পাণিনির মায়ের নাম ছিল দাক্ষী। নানা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় পাণিনি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সময় সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করেন নি। দ্র. Sastri, *Birds' Eye View of Sanskrit Literature,* Calcutta 1917, p. 7; Shastri, *Magadhan Literature,* Lecture II, Patna 1923; *Shastri-Cat.,* vol. VI, Preface, pp. XVI-XX.

৩. একাধিক লেখক-সংকলকের বই কাত্যায়নের নামে প্রচলিত। ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যে কাত্যায়ন নামটির প্রতিষ্ঠা সম্ভবত পাণিনিসূত্রের বার্তিক পাঠের জন্য। বার্তিকের লেখক বররুচি-কাত্যায়ন।

প্রাচীনতম প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রাকৃতপ্রকাশও বররুচির নামে প্রচলিত। প্রকৃতপ্রকাশ-এ ৯টি অধ্যায়ে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত এবং একটি অধ্যায়ে পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনীর বৈশিষ্ট্য আলোচিত। বররুচিকে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের কৃৎ-প্রকরণ অংশের লেখক মনে করা হয়। 'কাশ্মীরি বৃহৎকথা' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এ বররুচিকে পাণিনির প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজা নন্দের একজন মন্ত্রী বলা হয়েছে। আর-একটি ঐতিহ্যে তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন বলা হয়। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ তাঁকে এক রাজা উদয়নের সভা-পুরোহিত বলে উল্লেখ করেছেন, এঁর কাছে উদয়ন ব্যাকরণ পড়েন। আরো তথ্যের জন্য দ্র. হ-র-সং-৩, "কাশীনাথ বিদ্যানিবাস" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতথ্য, সূত্র-১১।

৪. এই বই-এ "বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত", এবং "ভবভূতি" প্রবন্ধ দ্র.

৫. বামন ও জয়াদিত্যের যৌথ রচনা কাশিকা নামে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-র উপরে লেখা বৃত্তি বা সূত্র ব্যাখ্যা সমগ্র ভারতে সমাদৃত। কাশিকার কোন্ অংশ জয়াদিত্যের এবং কোন্ অংশ বামনের লেখা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের বিবরণ অনুযায়ী কাশ্মীরি বৈয়াকরণ জয়াদিত্যের মৃত্যু হয়েছিল ৬৬০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। ইৎ-সিঙ জয়াদিত্যের গ্রন্থের নাম বলেছেন বৃত্তিসূত্র। কাশিকা এবং বৃত্তিসূত্র একই গ্রন্থ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। বর্তমানে মনে করা হয় কাশিকার প্রথম ৫ অধ্যায় জয়াদিত্যের এবং অবশিষ্ট ৩ অধ্যায় বামনের রচনা। প্রখ্যাত আলংকারিক বামন এবং বৈয়াকরণ বামন এক ব্যক্তি নন। এই ধারায় কাশিকাবিবরণ পঞ্জিকা: বা কাশিকা-ন্যাস নামে টীকার লেখক জিনেন্দ্র বুদ্ধির আবির্ভাবকাল ৭৫০ খৃস্টাব্দের আগে। দ্র. S K. Belvalkar, *System of Samskrit Grammar,* Delhi, 1976,

pp. 29-23; Snisa Chandra Chakravarti ed. কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা, vol I-II, Varendra Research Society, Rajsahi, 1914-25।

৬. ক্রমদীশ্বরের ব্যাকরণের নাম 'সংক্ষিপ্তসার'। ইনি বাঙালি ছিলেন কিনা সন্দেহ, তবে বাংলাদেশে সমাদৃত। সংক্ষিপ্তসার-এর অষ্টমপাদে আত্মপরিচয় আছে, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করা হয়। ফলে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় এবং বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কোনো কোনো মতে তিনি দশম শতাব্দীর মানুষ, মতান্তরে দ্বাদশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গল্প আছে যে ছোটোবেলায় বাপ-মার মৃত্যুতে অনাথ বালক কোনো পণ্ডিতের আশ্রয় পান এবং ক্রমে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। ব্যাকরণ লিখলেন, কিন্তু লেখা সরল-সহজ না হওয়ায় ক্ষোভে রাজা জুমরনন্দীর পুকুরে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জুমরনন্দী বইখানি তুলে এনে সংশোধন সংযোজন করেছিলেন। এইজন্য সংক্ষিপ্তসারকে জৌমর ব্যাকরণও বলা হয়। জুমরনন্দী 'রসবতী' নামে এর বৃত্তি লেখেন। এই ব্যাকরণের টীকা লিখেছেন গোয়ীচন্দ্র, নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, বংশীবদন কবিচন্দ্র প্রভৃতি। আরও তথ্যের জন্য হ-র-সং-৩, "কাশীনাথ বিদ্যানিবাস" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক সূত্র-৯ দ্র.।

৭. সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের প্রধান লেখক বাণভট্ট চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর সন্তান। শৈশবে বাবা-মায়ের মৃত্যু হওয়ায় বিড়ম্বিত-জীবন বাণ শেষ অবধি রাজা হর্ষবর্ধনের (৬০৬ — ৪৭খৃ.) সভায় আশ্রয় পান এবং সমুজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'কথা' বর্গের 'কাদম্বরী' এবং 'আখ্যয়িকা' বর্গের 'হর্ষচরিত'। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কথা' কল্পিত কাহিনীর বিন্যাস, 'আখ্যায়িকা' ইতিহাসের তথ্য আশ্রিত রচনা। 'কাদম্বরী কথায়' বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রাপীড়- কাদম্বরীর প্রেমের কথা— সঙ্গে আছে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রসঙ্গ। 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকার বিষয় বাণের পোষ্টা হর্ষবর্ধনের বংশের আখ্যান। ক্রমান্বয়িত সমাসে গাথা দীর্ঘ বাক্য রচনার বিশিষ্ট শৈলীর জন্য বাণ অনেক সময়ে সমালোচিত হন। কিন্তু কিঞ্চিৎ আয়াসে তাঁর এই

শৈলী অনুসরণ অভ্যাস হলে এই গদ্যভাষার ধ্বনি তরঙ্গে, উপমার ঐশ্বর্যে এবং চিত্রময়তায় মুগ্ধ হতে হয়। কাদম্বরী, মহাশ্বেতা, পত্রলেখা— কাদম্বরী কথা-র এসব চরিত্র বিশ্বের সাহিত্যে উজ্জ্বলতম সৃষ্টির দৃষ্টান্ত।

৮. দ্র. "শংকরাচার্য কী ছিলেন" এবং "শংকরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী", হ-র-সং-৩.

৯. অনুবাদ : হয় মনোরমধ্বনি বীণা, অথবা মধুরভাষিনী সুন্দরনয়না নায়িকা— পালা করে তাঁর (অগ্নিমিত্রের) কোল অধিকার করে থাকত; কখনো শূন্য থাকতে দিত না।

কৃতী সেই রাজা নিজেই তালবাদ্যে আঘাত করতে গেলে তাঁর গলার মালা ও হাতের বলয় আন্দোলিত হয়ে উঠত। এভাবে নর্তকীদের মন হরণ করায় তারা নৃত্যাভিনয়ের নিয়মগুলি লঙঘন করে ফেলত। পাশেই নৃত্যাচার্য গুরুগণ বসে থাকায় নর্তকীরা লজ্জিত হতেন।

নৃত্য হয়ে গেলে নর্তকীদের মুখমণ্ডলের তিলকরচনা পরিশ্রমজনিত ঘর্মজলে অস্পষ্ট হয়ে উঠত। রাজা অগ্নিমিত্র তখন অনুরাগের আবেগে মুখপবনে (ফুৎকারে) তাদের সুন্দর মুখের ক্লান্তি দূর করতে করতে অধরসুধা পান করতেন। তখন তাঁর মনে হত, সৌভাগ্যে তিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও ধনপতি কুবেরকেও অতিক্রম করে বেঁচে আছেন।

১০. অনুবাদ : হঠাৎই উত্থিত একটা তেজোরাশি সেনাবাহিনীর সামনে আবির্ভূত হল। যে তেজঃপুঞ্জকে সৈনিকেরা নয়নমার্জন করে অল্প কিছু পরেই একটি পুরুষের আকৃতিরূপে দেখতে পেল।

পিতার অংশস্বরূপ যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে ধারণ করে এবং মাতার অংশস্বরূপ দুর্জয় ধনু হস্তে গ্রহণ করে যিনি (ভার্গব) চন্দ্র-সমন্বিত সূর্যের মতো ও সর্পবেষ্টিত চন্দনতরুর মতো সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ন্যায়পথ উল্লঙ্ঘন করে ক্রোধে নির্দয়চিত্ত হলেও সেই

পিতার আদেশ পালন করে যিনি ভয় কম্পিতা মাতার মস্তক ছেদন করেছিলেন এবং প্রথমে (মাতৃবধজনিত ও ক্ষত্রবিনাশজনিত) ঘৃণাকে জয় করে পরে পৃথিবীকে জয় করেছিলেন, সেই ভার্গব পরশুরাম আত্মপ্রকাশ করলেন।

একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশের গণনা-ছলে ডান কানে (একুশটি রুদ্রাক্ষবীজে গ্রথিত) একটি রুদ্রাক্ষের বলয় ধারণ করে সেই ভৃগুতনয় পরশুরাম সৈনিকদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

১১. অনুবাদ : তিনি (অজ) তীক্ষ্ণ ভল্ল দিয়ে শত্রুদের মস্তকগুলি ছিন্ন করে সেগুলির দ্বারা ধরাতল আকীর্ণ করে দিলেন। তাদের মস্তকগুলিতে ক্রোধহেতু দৃষ্ট হওয়ায় ওষ্ঠ হয়েছিল অত্যন্ত রক্তবর্ণ, উল্লসিত ভ্রূকুটি তাদের সেই মুখমণ্ডলে তখনো দেখা যাচ্ছিল এবং মুখে শোনা যাচ্ছিল ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনি। তখন প্রতিপক্ষের রাজন্যবৃন্দ যুগপৎ গজবহুল চতুরঙ্গসেনা এবং বর্মভেদক্ষম সকল অস্ত্রশাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে তাঁকে সর্বশক্তিতে আঘাত করতে লাগলেন।

শত্রুদের অজস্র শরনিপাতে কুমার অজের রথ এমনই আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে, তিনি দিনের পূর্বভাগে কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন ঈষৎ প্রকাশিত সূর্যের মতন কেবল রথধ্বজের অগ্রভাগের দ্বারা লক্ষিত হতে থাকলেন।

১২. অনুবাদ : রাক্ষসদের দ্বারা স্বামিগণ উপদ্রুত হলে তপস্বিপত্নীগণ আপনার আনুকূল্যে আমার আশ্রয়ে থাকতেন। এখন আপনি দেদীপ্যমান থাকতে আশ্রয়ের জন্য আমি কার শরণ নেব।

অথবা আপনার অত্যন্ত বিরহে ব্যর্থ হয়েছে আমার এই যে হতভাগ্য জীবন, তার প্রতি আমি উপেক্ষা করতাম যদি না রক্ষার যোগ্য আমার গর্ভস্থ আপনার তেজ বাধা হয়ে দাঁড়াত।

সেই (হতভাগিনী) আমি সন্তান প্রসবের পরে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হব; যাতে জন্মান্তরেও আপনি যেন আমার স্বামী হন, কিন্তু এমন বিরহ যাতনা যেন আর সহ্য করতে না হয়।

১৩. অনুবাদ : মোহে আচ্ছন্ন হয়েছে যে ব্যক্তির বুদ্ধি সে প্রিয়নাশকে হৃদয়ে বিদ্ধ তীক্ষ্ণাগ্র শল্যের মতন (বেদনাদায়ক) মনে করে। স্থিরবুদ্ধি কিন্তু কুশলপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ তাকেই সেই (প্রিয়নাশ-বেদনারূপ) শল্যাস্ত্র উৎপাটনের উপায় বলে মনে করেন।

নিজ শরীর ও আত্মা— এই দুটির সংযোগ ও বিয়োগই যখন জীবন ও মরণ হয় বলে শোনা যায় (অনিত্য) শরীর হতে আত্মার বিয়োগ যখন সত্য ও অবশ্যম্ভাবী, তখন বাহ্য বিষয় তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিকে কেন শোকাকুল করে তুলবে, বলুন তো?

১৪. হে মানিনীবৃন্দ! মান ত্যাগ করো। কলহে প্রয়োজন নেই। যৌবন একবার চলে গেলে আর আসে না। —কামদেবের এই উপদেশাবলী যেন কোকিলাদের দ্বারা এইভাবে জ্ঞাপিত হলে বধূজন (মান ত্যাগ করে) নিজ নিজ প্রিয় জনের সঙ্গে মিলনে প্রবৃত্ত হল।

রঘুবংশে বাল্যলীলা

কবিরা যে-সকল বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন, তার মধ্যে প্রধানই ভালোবাসা; কত রঙ্গে কত ভঙ্গিতে তাঁহারা এই ভালোবাসা ফুটাইবার চেষ্টা করেন। কেহ পূর্বরাগ লেখেন, কেহ বিরহ লেখেন, কেহ মান লেখেন, কেহ-বা সম্ভোগ-বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত; ওদিকে যাঁহারা না যান, তাঁহারা বীর-রস লেখেন। লড়াই, ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি, এইসব লিখিয়া আপনাদের কবিত্ব ফলান। নব-রসের বাহিরেও যে একটা প্রকাণ্ড সংসার আছে, তাহাতেও বর্ণনা করিবার অনেক জিনিস আছে সেটা অনেক কবির খেয়ালেই আসে না। ছেলের উপর বাপ-মায়ের যে মায়া, সেটা অন্য কবিকে বড়ো একটা বর্ণনা করিতে দেখি না; ছেলে যে ক্রমে দোলনা হইতে নামিয়া প্রথম হামা-গুড়ি দিতে শিখে, তারপর দুইপায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে, তারপর হাঁটি-হাঁটি পা পা করিয়া হাঁটিতে শিখে, এগুলাও একটা বর্ণনার জিনিস বটে; এ বর্ণনায়ও কবিরা বেশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন এবং অনেক লোকের মনও হরণ করিতে পারেন; কেন-না, ছেলে সবারই হয়, ছেলেকে সবাই ভালোবাসে, এবং ছেলের কথা শুনিতে আনন্দও হয়; সুতরাং ছেলের বর্ণনাটা চমৎকৃতিমৎ যে কাব্য, তাহার বাহিরে ফেলা উচিত নয়। কিন্তু ছেলের বর্ণনাটা কবিরা প্রায় করিতে চাহেন না। বঙ্কিমবাবুর এতগুলা নভেল আছে, তার মধ্যে কমলমণির একটি ছেলে ছিল, আর কোনো নায়ক-নায়িকার ছেলে হয় নাই; কবির বোধহয়, ধারণা ছিল যে, ছেলে হলে নায়ক-নায়িকার প্রেমটা ফোটাবার আর পথ থাকে না। অনেক কবির ধারণা, প্রেমটা স্বর্গ-রাজ্যের আর ছেলেটা মর্তের। ছেলে হইলেই প্রেম স্বর্গ হইতে নামিয়া মর্তে পৌঁছায় আর মাটি হইয়া যায়। যাঁহারা আবার পরকীয়া প্রেমের কবি, তাঁহাদের পক্ষে ছেলেটা একটা মহাবিপদ্।

কালিদাসের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ ছিল। তিনি প্রায়ই ছেলের বর্ণনা করিয়াছেন। এই ধরো মালবিকাগ্নিমিত্র, রানী যখন রাজার পার্শ্বে মালবিকার ছবি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন, আর বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ মেয়েটি কে, কোথা হইতে আসিল, রানী তো তাহার জবাব দিবেনই না, দিলেনও না। আর সকলে রানীর মুখ চেয়ে কিছুই বলিল না। তখন রানীর ছোটো মেয়েটি টুক্ করিয়া বলিয়া দিল, "বাবা, তুমি উহাকে চেনো না, ও যে মালবিকা, আমার মায়ের চাক্‌রানী।" কচি মেয়ে, সে তো আর ঘোরপেঁচ বুঝে না, রানীর মতলবও বুঝে না, সরলভাবে সোজা কথায় সোজা জবাব দিয়া দিল। নাটকটা কেমন জমাইয়া দিল।

আবার দেখুন— বানরের ভয়ে সেই মেয়েটি যখন বার বার মূর্ছা যাইতে লাগিল, তখন সে কেমন রাজাকে এক মহাবিপদ্ থেকে উদ্ধার করিয়া দিল। ইরাবতী রাজাকে হাতেনাতে ধরিয়াছেন— আর বাক্যবাণে তাঁহাকে জর্জর করিয়া তুলিয়াছেন। রাজা জবাব দিতে পারিতেছেন না; কেবল আম্‌তা আম্‌তা করিতেছেন। এত চালাক যে বিদূষক, তারও বুদ্ধি খেলিতেছে না—এমন সময়ে খবর আসিল, বানরের ভয়ে মেয়েটা মূর্ছা যাইতেছে, সকলে সেই দিকে ছুটিল, রাজাও পরিত্রাণ পাইলেন।

শকুন্তলার ছেলে যে সর্বদমন, তার কথা অনেকেরই মনে আছে। ছেলের সবে কথা ফুটিয়াছে, সে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ধরিয়া তাহাকে বলিতেছে— "তুই হাঁ কর, আমি তোর দাঁত গনি।"

রাজা যখন তাহাকে কোলে করিয়া আপনার ছেলে বলিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন, তখন সে বলিল, "দুষ্মন্ত আমার বাবা, তুমি তো নও।" রাজার সব সংশয় দূর হইয়া গেল।

কিন্তু কালিদাস রঘুবংশেই ভালো করিয়া ছেলের বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুর বাল্যলীলা কালিদাসের একটি অক্ষয়কীর্তি। ছেলে হইলে যে প্রেমটা একেবারে মাটি হইয়া যায়, সে ধারণা কালিদাসের নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তৎ তয়োঃ
পরস্পরস্যোপরি পর্যচীয়ত।"

[৩/২৪]

অর্থাৎ রাজা ও রানীর পরস্পরের প্রতি চকাচকির মতো যে প্রেমটুকু ছিল, ছেলেটি আসিয়া দুই-জনেরই সেই প্রেমে ভাগ বসাইল, ভাগ হইলেও সে প্রেম কিন্তু বাড়িয়াই গেল, কমিল না,— বরং যেটা ফাঁকা ফাঁকা ছিল, সেটা ঘন হইয়া দাঁড়াইল। রাজা যখন ছেলেটি লইয়া রানীর কোলে দিতেন অথবা রানী যখন ছেলেটি লইয়া রাজার কোলে দিতেন, তখন দুই-জনেই তো আনন্দে ভোর হইয়া যাইতেন; এরূপ ভোর হওয়াটুকু তো আগে ছিল না, ছেলেটি হওয়ার পর হইতেই হইয়াছে; এ ভোরটুকু তো প্রেমেরই ভোর, সুতরাং প্রেম বাড়িলই বলিতে হইবে।

ছেলেটি হইল। রাজার শক্তি যেমন অক্ষয় ফল প্রসব করে, রানী তেমনই ছেলেটি প্রসব করিলেন। ছেলেটির জন্মলগ্ন অতি শুভ। পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ নিজের ক্ষেত্রে আছে—এবং পূর্ণবলে আছে, চারিদিকে মিত্রগ্রহের দৃষ্টি আছে, শত্রুগ্রহের দৃষ্টি নাই। সূর্য কাহাকেও অস্তমিত করিতে পারেন না; সুতরাং ছেলেটি শুভলগ্নেই জন্মিয়াছে। সে যে বড়ো ভাগ্যবান্ হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ছেলেটি যখন হইল, পৃথিবী শুদ্ধ আনন্দে ভোর হইয়া গেল, চারিদিক্ প্রসন্ন হইল; ধূম, ধূলা ও মেঘ কোথাও রহিল না। মৃদুমন্দ বায়ু বহিতে লাগিল; যাহারই গায়ে লাগিল, সেই আনন্দে ভোর হইয়া গেল। যাঁহারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন যে, অগ্নি ডাইনে হেলিয়া আহুতি গ্রহণ করিলেন। এটা বড়ো মঙ্গলের জিনিস; সে সময় যে দিকে চাও, সকল দিকেই মঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। একজন বড়োলোক যখন জন্মায়, তখন তা হতে সকলেই ভালো হইবার আশা করে, সকলেই খুশি হয়, স্থাবরও যেমন খুশি হয়, জঙ্গমও তেমনি খুশি হয়, বিশেষ খুশি হন— মা আর বাপ। তাঁদের খুশিটিই যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেই খুশি-চক্ষে তাঁহারা যে দিকে দেখেন, সেই দিকে খুশিই দেখিতে পান; তাঁহারা আশাও করেন, তাঁহাদের ছেলে বড়োলোক হইবে।

ছেলে তো হইল— আঁতুড়ের সেজে ছেলেটিকে শোয়ান হইল। আহা, তাহার কী রূপ! শরীরের তেজ যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; রূপের ছটায় ঘর যেন আলো করিয়াছে। প্রদীপগুলা যেন ম্যাড়-ম্যাড় করিতেছে; ছেলের রূপেই ঘর আলো করিয়াছে, প্রদীপগুলার কোনোই দরকার নাই। ছবিতে প্রদীপ যেমন আলো করে না অথচ থাকে, ইহাও তেমনি আলো করে নাই, অথচ আছে।

ছেলে হওয়ার খবর রাজার কাছে গেল। রাজার কানে যেন সুধাধারা ঢালিয়া দিল। একটি একটি অক্ষরে একটি একটি ধারা বহিতে লাগিল। যে খবর আনিয়াছিল, রাজা তাহাকে বকশিস্ দিলেন। কী দিলেন? যাহা ছিল সবই দিলেন, কেবল দিতে পারিলেন না দুইটি চামর, আর একটি ছাতা। কারণ, সেগুলি রাজার চিহ্ন, দিবার জো নাই, দিলে রাজাই থাকে না।

রাজা ছেলে দেখিতে গেলেন। ও কি দেখা! ও যে একেবারে চোখের ভিতর দিয়া মরমে টানিয়া লওয়া। রাজার চোখ দুইটা কেমন বড়ো বড়ো হইয়াছে, দেখো যেন দুইটা পদ্মফুল ফুটিয়াছে; চোখে পলক পড়িতেছে না, চোখ নড়িতেছে না, একদৃষ্টে ছেলের মুখের উপর পড়িয়া আছে। যেন হাওয়া নাই, পদ্ম দুইটি স্থিরভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। চাঁদ দেখিলে সমুদ্রের জল যেমন উপ্‌ছে উঠে, তেমনই রাজার আনন্দও উপ্‌ছে উঠিতে লাগিল।

ছেলে হইলে তখনই জাতকর্ম করিতে হয়। ছেলের এই প্রথম সংস্কার, সংস্কার করিলে সব জিনিসই ভালো হয়; খনি থেকে মণি তুলে তাহার সংস্কার করিলে যেমন জ্বল্-জ্বল্ করিতে থাকে রাজার ছেলেও তেমনি জ্বল-জ্বল করিতে লাগিল, চারিদিকে বাজনা বাজিতে লাগিল, নাচ হইতে লাগিল। এই সময়ে সকল রাজাই কয়েদি খালাস দেন; আমাদের রাজা এমন ভালো যে, তাঁহার রাজ্যে কয়েদি ছিল না। তিনিই পিতৃ-ঋণে কয়েদ ছিলেন; সেই ঋণ হইতে নিজেই খালাস পাইলেন। রাজা ছেলেটির নাম রাখিলেন— রঘু। রঘু শব্দটি লঘ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। লঘ্ ধাতুর মানে যাওয়া। রাজার ইচ্ছা, ছেলেটি শাস্ত্রের পারে যায়, আর যুদ্ধে শত্রুদের পারে যায়; তাই 'যাওয়া' কামনা করিয়া তাহার নাম হইল রঘু।

রাজা ছেলের খুব যত্ন করিতে লাগিলেন, ছেলেও বাড়িতে লাগিল; সব অঙ্গেরই পুষ্টি হইতে লাগিল, সব শরীরটাই বাড়িতে লাগিল;— শুক্লপক্ষে চাঁদের কলা যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়িতে লাগিল। শুক্লপক্ষে চাঁদের কলা বাড়ে কেন? তার ভিতরে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে, তাই সে বাড়ে; এখানেও রাজার যত্ন তার শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরটিকে বাড়াইয়া দিতে লাগিল।

ছেলেটি ক্রমে বাড়িতে লাগিল, ক্রমে আধো-আধো কথা কহিতে লাগিল; ধাই-মা যে কথাটি বলে, সে সেই কথাটিই বলিতে চেষ্টা করে; অর্ধেক বাহির হয়, অর্ধেক বাহির হয় না। ধাই-মার আঙুল ধরে, আর হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে;

ধাই-মা তাহাকে নমস্কার করাইতে শিখায়, 'নম করো' বলিলেই মাটিতে মাথা ঠেকায়। রাজা সময় সময় ছেলেটিকে কোলে করেন, আনন্দে তাঁহার চোখ দুটি বুজিয়া আইসে। তিনি তাহাকে বুকের উপর অনেকক্ষণ ধরিয়া ফেলিয়া রাখেন; তাঁর মনে হয়, তাঁহার সমস্ত শরীরটা যেন অমৃত-হ্রদে ডুবিয়াছে; রাজার ভারি আনন্দ যে, তাঁহার বংশ এত দিনের পর লোপ হইল না। লোপ হইবার আর সম্ভাবনা রহিল না।

ছেলের চূড়া হইল। ইক্ষ্বাকুদের চূড়া হইলে মাথায় পাঁচটা চূড়া হয়, মাঝখানে একটা আর চারিধারে চারিটা— একটি টিকি নড়িলে মাথাটি কত সুন্দর দেখায়। তাহাদের পাঁচটি চূড়া নড়িত। ক্রমে ছেলে পাঠশালায় গেল, আর পাঁচটা বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে মিশিল। ক, খ, গ, ঘ, শিখিতে লাগিল, যেমন নদীর মুখ দিয়া লোক-সকল সমুদ্রে যায়, তেমনই সেই ক, খ, গ, ঘ, দিয়া বাঙ্ময় সমুদ্রে প্রবেশ করিল।

ছেলের উপনয়ন হইল। গুরুরা আসিলেন, নানা বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন; ছেলের উপর তাঁহাদের খুব টান হইল, কেন-না, ছেলেকে যা তাঁহারা শিখান, তাই সে শিখে; ভালো বস্তুতে পড়িলেই শিক্ষার ফল ফলে। ক্রমে রাজপুত্র আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি, এই চারি বিদ্যাতেই পারদর্শী হইয়া উঠিল। তাঁহার বুদ্ধি বেশ পাকিয়া উঠিল এবং চারিদিকে খেলিতে লাগিল। তাহার পর তিনি রুরু-মৃগের চর্ম পরিয়া বাপের কাছেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন, অস্ত্রের মন্ত্রও শিক্ষা করিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁহার বাপের মতো গুরু পাওয়া কঠিন; কারণ, তিনি যে কেবল অদ্বিতীয় রাজাই ছিলেন, এমন নয়; তিনি অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন। এখন বাল্যকাল চলিয়া গেল, রঘু যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরে গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য দেখা দিল। বাছুর যেমন ক্রমে ক্রমে বৃষভ হইয়া উঠে, বাচ্ছা হাতি যেমন ক্রমে পুরা হাতি হইয়া দাঁড়ায়, রঘুও সেইরূপ মানুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। যৌবনের আরম্ভেই তাঁহার গোদান-সংস্কার হইল। তারপর বিবাহ। অনেক রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তারাগণমধ্যে চন্দ্র যেমন বিরাজ করেন, তিনিও তেমনই রাজকন্যাগণের মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার পূর্ণ-যৌবন তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, শরীর বেশ আঁট্‌সাঁট্‌, বুকটি কপাটের মতো, কান খুব চটাল, দেহসৌষ্ঠবে তিনি পিতাকেও পরাজিত করিলেন। কিন্তু বাপের কাছে তিনি সর্বদাই

ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিতেন। রাজাও বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর ভার অতি গুরুভার, সে ভার তিনি বহুকাল বহন করিয়া আসিয়াছেন, আর তিনি পারেন না; এখন সে ভারের কিছু লাঘব হওয়া চাই; তাই তিনি ছেলেটিকে যুবরাজ করিয়া দিয়া তাঁহার উপর রাজ্যের কতক ভার অর্পণ করিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন, এই ছেলেটি স্বভাবের গুণে আপনিই শিক্ষা পাইয়াছে, তার উপর আবার ইহাকে ভালোরূপ শিক্ষাও দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মী চিরকালই গুণের পক্ষপাতী; রাজপুত্রের নানা গুণ দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রধান স্থান যে দিলীপ রাজা, তাঁহার কাছ হইতে গিয়া কিয়দংশে যুবরাজকে আশ্রয় করিলেন। ফোটা পদ্মের শোভা যেন কতকটা পদ্মের কলিতে গিয়া পড়িল।

এই যে রঘুর বাল্যলীলা ইহার বর্ণনায় কালিদাস বেশ গুণপণা দেখাইয়াছেন। আতুড়ে-ছেলে থেকে আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে যুবরাজ পর্যন্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি কেমন ধাপে ধাপে উঠিয়াছেন; কচি ছেলে কোলে-কোলে বেড়াইয়া, আধো-আধো কথা কহিয়া, হাঁটি হাঁটি পা পা করিতেছে, তাহাও দেখাইয়াছেন; পাঁচচূড়া বাঁধিয়া পাঠশালায় যাইতেছে, তাহাও দেখাইয়াছেন; পৈতার পর বেদ-বেদান্ত পড়া দেখাইয়াছেন; শাস্ত্রবিদ্যাশিক্ষা দেখাইয়াছেন; যুবরাজ হওয়াও দেখাইয়াছেন। সব ঠিক ঠিক হইয়াছে, স্বভাবে যেমন হয়, সব দেখাইয়াছেন; শাস্ত্রের সঙ্গে কিছু বিরোধ নাই; আচারের সঙ্গেও কিছু বিরোধ নাই, অথচ কেমন একটি ভাগ্যবান্ পুরুষের বর্ণনা করিয়াছেন।

এ তো গেল, বাপের ছেলে, বাবা ছেলেকে লালন করিলেন, পালন করিলেন, শিক্ষা দিলেন, বিবাহ দিলেন, রাজা করিয়া দিলেন। কিন্তু রঘুবংশে আর-একটি ছেলের বর্ণনা আছে— শিশুকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। শিশুকালেই তিনি রাজা হন শিশুকালেই তাঁহার অভিষেক হয়। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই ক্রমে যুবরাজ ও মহারাজ হইয়া উঠেন।

রাজা ধ্রুবসন্ধি অত্যন্ত শিকারী ছিলেন। একবার শিকার খেলিতে গিয়া সিংহের হাতে তাঁহার প্রাণ যায়। তখন তাঁহার ছেলে সুদর্শন বড়োই শিশু, ঠিক যেন অমাবস্যার পর প্রতিপদের চাঁদ। মন্ত্রিপরিষৎ তখন সুদর্শনকেই অযোধ্যার রাজা করিয়া দিলেন। নচেৎ অরাজক রাজ্যে যে প্রজারা মারা যায়। আকাশে এক কলা চাঁদ উঠিলে যেমন দেখায়, একটা বড়ো বনে একটি বাচ্ছা সিংহ থাকিলে যেমন

হয়, অনেক জলে একটি পদ্মের কুঁড়ি থাকিলে যেমন হয়, রঘুর প্রকাণ্ড কুল এই শিশু রাজাকে লইয়া তেমনি হইয়া উঠিল। তাঁহার মাথায় যখন রাজমুকুট বসাইয়া দিল, তখন প্রজারা ভাবিতে লাগিল যে, ইনি বুড়ো রাজারই মতো হইবেন, কারণ, তাহারা দেখিয়াছে, যদি সামনে বাতাস পায়, তাহা হইলে হাতের পোঁচার মতো ছোটো মেঘখানি ক্রমে ক্রমে সকল দিক্ ভরিয়া যাইতে পারে; ছয় বৎসর বয়সে তিনি হাতি চড়িয়া যাইতেন আর মাহুত তাঁহার কাপড়গুলি তুলিয়া ধরিয়া রাখিত: প্রজারা কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার পিতার মতোই দেখিত। তিনি পিতার সিংহাসনে বসিতেন, কিন্তু সিংহাসন ভরিত না। কিন্তু তাঁহার শরীরে যে তেজ ছিল, তাহাতেই সিংহাসনটা ভরা ভরা দেখাইত, তাঁহার পা-দুখানি সিংহাসন হইতে ঝুলিত, কিন্তু পাদপীঠ স্পর্শ করিত না। আবার তিনি তাহাতে আলতা পরিতেন, কিন্তু রাজারা সেই পা স্পর্শ করিয়াই কৃতার্থ হইয়া যাইত। নীলমণি খুব ছোটো হইলেও তাহাকে যেমন মহানীল বলে, তেমনি আমাদের রাজাটি ছোটো হইলেও তাঁহাকে লোকে মহারাজাই বলিত।

তিনি সিংহাসনে বসিলে যখন দুই-পাশে চামরব্যজন করিত, তখন তাঁহার দু-পাশের চূড়া দুইটি মুখের উপর ঝুলিত; সেই মুখ দিয়া তিনি যে বিচার করিয়া দিতেন আসমুদ্র সকলেই মাথা পাতিয়া লইত। তিনি শিরীষপুষ্পের অপেক্ষাও কোমল ছিলেন; একখানা অলংকার পরিতেও তাঁহার কষ্ট হইত; তথাপি তাঁহার এমন মাহাত্ম্য ছিল যে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর গুরুভার আপনিই বহন করিতেন। দাগা বুলাইয়া সব অক্ষর চিনিবার পূর্বেই প্রবীণ লোকের সংসর্গে থাকিয়া দণ্ডনীতির সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেখিলেন, এ রাজা তাঁহার বুক-জোড়া হয় না: তাহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া শ্বেতচ্ছত্রের ছায়াচ্ছলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। তিনি ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করিতেন, কিন্তু তখনো সে ভুজ আজানুলম্বিত হয় নাই, তখনো তাহাতে ধনুকের ছিলার দাগ পড়ে নাই, তখনো সে ভুজ তলোয়ারের বাঁটও ছোঁয় নাই। যত দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীরই যে কেবল বাড়িতে লাগিল, এমন নহে; তাঁহার বংশের গুণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ধর্ম, অর্থ ও কামের মূল যে ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি, তাহা অনায়াসেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, গুরুদের কিছুই ক্লেশ দিলেন না, যেন পূর্বজন্মে তাঁহার অর্জিত ছিল, তাহারা আপনিই আসিয়া

জুটিল। তাহার পর তিনি ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। বুকটা উঁচা করিয়া, মাথার চূড়াগুলা উঁচা করিয়া বাঁধিয়া, বাঁ-হাটু গুটাইয়া আকর্ণ ধনুক টানিতে লাগিলেন। দিন যাইতে লাগিল; ক্রমে কামতরুর পুষ্পস্বরূপ যৌবন আসিয়া দেখা দিল। তখন অমাত্যেরা ছবি পাঠাইয়া, দূতী পাঠাইয়া, অনেক রাজকন্যা আনাইয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন।

এই বর্ণনায়ও কালিদাস বেশ গুণপনা দেখাইয়াছেন। রঘুর বাল্যবর্ণনা যেমন ধাপে ধাপে উঠিয়াছে, ইহাও সেইরূপ ধাপে ধাপে উঠিয়াছে; কিন্তু সেখানে আছে একটা আনন্দের খেলা, আর এখানে আছে একটা বিষাদের ছায়া। রঘু বাপের ছেলে, সুদর্শন পিতৃহীন: রঘু ছেলেবেলা ছেলেই ছিলেন, সুদর্শন ছেলেবেলা-ই রাজা; তাঁহাকে কে পালন করে, তাহারই ঠিক নাই; তিনি অথচ সকলের পালনকর্তা। কালিদাস রঘুবংশের প্রথমে আনন্দময় বাল্যলীলা ও শেষে বিষাদময় বাল্যলীলা দেখাইয়া বলিয়া দিতেছেন— তোমরা দেখো, উঠতিবেলা ও পড়তিবেলা কত তফাত।

নারায়ণ
পৌষ, ১৩২৫।।

রামের ছেলেবেলা

রঘুর ও সুদর্শনের ছেলেবেলাকার কথা বলা হইয়াছে। একজন হইতে রঘুবংশ আরম্ভ, আর-একজন হইতে প্রায় রঘুবংশের লয়। একজন রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে, আর-একজন রঘুবংশের অষ্টাদশ সর্গে। কালিদাস এইরূপ গোড়ায় ও শেষে দুইটি বালকের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এঁরা দু-জন তো রঘুবংশের প্রধান লক্ষ্য নন। প্রধান লক্ষ্য হইতেছেন রাম। মনে করো, রঘুবংশটি একটি মুক্তার হার, রঘু আর সুদর্শন সে হারের খামি বৈ তো নন। সে হারের মধ্য-মণি হইতেছেন রাম। যে মণির প্রভায় সব মুক্তাগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে মণি হইতেছেন রাম। কালিদাস সে রামের ছেলেবেলার কী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা না দেখিলে রঘুবংশের গড়নটাই বুঝা যাইবে না। রঘুর বাল্যকাল যেটা, সেটা সকল মানুষেরই হয়, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। বাপওয়ালা ছেলের বাল্যকাল এইরূপেই কাটে। আর বাপ না থাকিলে কিরূপে কাটে, তাহাও সুদর্শনে দেখানো হইয়াছে। সেও মানুষের চরিত্র, তাহাতেও বিচিত্র কিছুই নাই। কিন্তু রামের বাল্যকালের যে বর্ণনা, তাহাতে সবই বিচিত্র। বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র যজ্ঞের প্রভাবে বিচিত্র চরু খাইয়া, অগ্নি হইতে উত্থিত বিচিত্র দেবতার বিচিত্র আজ্ঞায় রামের জন্ম। যজ্ঞ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অগ্নি হইতে এক পুরুষ বাহির হইল। পুরুষের হাতে সোনার থাল, তাহাতে একথাল পায়স, পায়স এত ভারি যে, তাঁহারো হাত ভারিয়া যাইতেছে,— ভারি হইবে না কেন? তাহাতে কী আছে? তাহাতে আছেন আদি পুরুষ সূক্ষ্মভাবে। পুরুষ রাজার অনেক গুণ বর্ণনা করিলেন, বলিলেন— "এত গুণ কি আর কোথাও পাওয়া যায়? নানা গুণ আছে বলিয়াই তো স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া তাঁহার পুত্র হইতেছেন।" সেই পায়স রাজা আপনার দুই প্রিয় মহিষীকে বাঁটিয়া দিলেন, আর

বলিয়া দিলেন, "তোমরা পার তো সুমিত্রাকে একটু একটু দিও।" তাঁহারাও স্বামীর মন জানিতেন, প্রত্যেকেই অর্ধেকটা করিয়া সুমিত্রাকে দিলেন।

রঘুরাজার জন্ম হইয়াছিল গুরুর উপদেশে, আর নন্দিনীর বরে। যে গো-ব্রাহ্মণ লইয়া হিন্দুর ধর্ম, সেই গো-ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য রঘুর উৎপত্তি ও রঘুবংশের উৎপত্তি। কারণ, নন্দিনী দিলীপকে বর দিয়াছিলেন, "তোমার পুত্র বংশকর্তা হইবেন।" আর সেই বংশে জন্মাইলেন ব্রহ্মণ্যদেব— যাঁহাকে আমরা নিত্য "গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ" বলিয়া নমস্কার করি। তিনি জন্মাইলেন অনেক ব্রাহ্মণের চেষ্টায়, যজ্ঞের ফলে। যজ্ঞের ফল অপূর্ব— অদৃষ্ট, কিন্তু এ যজ্ঞের ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। আগুন হইতে পুরুষ উঠিল, পুরুষ রাজার গুণকীর্তন করিল, পায়স দিল, বলিল, 'ইহাতে বিষ্ণুর অংশ আছে, রানীরা এই পায়স খাইলে নারায়ণই তাঁহাদের পুত্র হইবেন।" একটি গোরু ও একটি ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে রঘুবংশের উৎপত্তি, আর বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলে, বহু-সংখ্যক গোরুর ঘৃতের বলে, বহু-দেবতার প্রার্থনায়, সেই রঘুবংশে নারায়ণের উৎপত্তি। রঘুবংশ যেন ক্ষীরোদসমুদ্র, আর ইঁহারা যেন সেই ক্ষীরোদ মন্থন করিয়া ননী বাহির করিলেন, সে ননী নারায়ণ। রঘুর উৎপত্তিতে দেবতাদের বড়ো একটা হাত ছিল না; কিন্তু রামের উৎপত্তিতে দেবতারাই সব। তাঁহারাই ক্ষীরোদ-সমুদ্রে গিয়া নারায়ণকে জাগাইলেন, নারায়ণের স্তব করিলেন, নারায়ণকে আপনাদের বিপদ জানাইলেন, বিপত্তে মধুসূদনকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে বলিলেন, তবে তো নারায়ণ অবতার হইতে স্বীকার করিলেন। সুতরাং রামের অবতারে গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা সকলেই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার কারণও আছে। রঘুর উৎপত্তি একটা দেশের একটা রাজ্যের রক্ষার জন্য; কিন্তু রামের উৎপত্তি ত্রিভুবন-রক্ষার জন্য, ব্রহ্মাণ্ড-রক্ষার জন্য; সুতরাং সে উৎপত্তি যে রঘুর উৎপত্তি অপেক্ষা অনেক জাঁকাল হইবে, সে আর বিচিত্র কী? কালিদাস ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই রামের জন্মকথা এত জমকাল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নারায়ণ যখন গর্ভে, তখন রানীরা স্বপ্ন দেখিলেন, কতকগুলি বামন তাঁহাদের রক্ষা করিতেছেন, তাঁদের শরীরে এই সব চিহ্ন;— শঙ্খ, আর নানারূপ অস্ত্র— ধনু, তলোয়ার, গদা, চক্র। তাঁহারা আরো দেখিলেন, যেন গরুড় তাঁহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার সোনার পাখার আভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর মেঘগুলাকে তিনি টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা আরো স্বপ্ন দেখিলেন যে, লক্ষ্মী তাঁহাদের স্তব করিতেছেন, হাতের পদ্ম দিয়া তাঁহাদের বাতাস

করিতেছেন। নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন কিনা, তাই কৌস্তুভটা লক্ষ্মীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছেন। লক্ষ্মীর গলায় সেটি ঝুলিতেছে। তাঁহারা আরো স্বপ্ন দেখিলেন যে, সপ্তর্ষিরা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া, বেদ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতেছেন। এই-সকল কথা শুনিলে রাজার যে কী আনন্দ হইত, তাহা বলা যায় না। তিনি মনে করিলেন যে নারায়ণ সত্য-সত্যই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। যখন 'আমিই জগৎপিতার পিতা'— একথা তাঁহার মনে হইত, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না। বুদ্ধদেব যখন গর্ভে, তখন মায়াদেবী যেসব স্বপ্ন দেখিতেন,[১] কালিদাস এইখানে তাহা অপেক্ষাও জমকাল স্বপ্ন দেখাইয়াছেন।

এখানে রামের অবতারে আর-একটু বিচিত্র জিনিস আছে। নারায়ণ যতবার অবতার হইয়াছেন, এক হইয়াই হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতারে তিনি এক; বামন, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি এ-সকল অবতারেও তিনি এক; কিন্তু রাম অবতারে তিনি একে চার। এ কথাটি কালিদাস বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে নারায়ণ এক হইয়াও চার অংশে তিন গর্ভে বিরাজ করিতেছিলেন। তখন বোধ হইতেছিল যেন, তিনটি পরিষ্কার জলের চৌবাচ্চায় চন্দ্রের চারিটি প্রতিমা রহিয়াছে।

কালিদাস বলিয়াছেন— "রঘু জন্মাইলে আঁতুড়ঘরে যে প্রদীপগুলি ছিল, তাহাদের আলো আর বাহির হইল না। রঘুর শরীরের আলোতে সে আলো ম্যাড়-ম্যাড় করিতে লাগিল, ছবির প্রদীপগুলি যেমন আলো দেয় না, কিন্তু থাকে, সেইরূপ রহিল মাত্র।" রাম জন্মাইলে, কিন্তু প্রদীপের আর দরকারই হইল না— প্রদীপগুলিকে যেন বলিয়া দেওয়া হইল, তোমাদের আর কাজ নাই, তোমরা এস গিয়া। রঘুর জন্ম হইলে খুব বাজনাবাদ্য হইয়াছিল, খুব নাচগান হইয়াছিল; শুধু যে রাজার বাড়িতে হইয়াছিল, তা নয়, সে শব্দ আকাশও ব্যাপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু রামের জন্মের আগে স্বর্গে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, তাহার পর রাজবাড়িতে বাদ্যধ্বনি হইল। রঘুর জন্মে চারিদিক হাসিয়া উঠিল; বাতাস বহিতে লাগিল— সে বাতাসে লোকের শরীর জুড়াইয়া গেল; আগুনে আহুতি দিলে, আগুন ডাইনে হেলিয়া সে আহুতি গ্রহণ করিলেন— আর চারিদিকেই মঙ্গলের সূচনা হইল। কিন্তু রামের জন্মে সমস্ত জগতের যত দোষ, সব নষ্ট হইল, আর যত গুণ, সব প্রকাশ পাইল। পুরুষোত্তম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন, স্বর্গও যেন তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। দশদিক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কারণ এতকাল রাবণের

উৎপাতে দশদিকের দশদিক্‌পাল ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন। এখন চতুর্মূর্তি নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাদের একটু স্ফূর্তি হইল। লোকে টের পাইল কিরূপে? চারিদিকে নির্মল সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল। অগ্নিদেব ও সূর্যদেব রাক্ষসের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের দুঃখ কতক দূর হইল। তাই আগুনে আর ধোঁয়া নাই, সূর্যদেবেও মেঘের আবরণ নাই। রাবণ সভা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার দশমুণ্ডে দশকিরীট— সকলগুলিরই মণি খসিয়া পড়িল; রক্ষঃকুললক্ষ্মী যেন বিষাদে চোখের জল ফেলিলেন। রাজবাড়িতে ফুলের মালা দিবার আগেই, স্বর্গ হইতে দিব্য ফুলের মালা পড়িতে লাগিল; তারপর জাতি, যূথি, মল্লিকা-মালতী ফুলে রাজভবন ছাইয়া ফেলিল।

ক্রমে পুত্রগণের একটি একটি করিয়া সংস্কার হইতে লাগিল। তাহারা ধাই-মার দুধ খাইয়া বাড়িতে লাগিল। তাহাদের বাড়িবার আগে হইতেই রাজার মনে আনন্দ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; তাই কালিদাস বলিয়াছেন, এই আনন্দই যেন রাজপুত্রদের বড়ো ভাই। রাজপুত্রেরা তো স্বভাবতই নম্র, তাহার উপর তাঁহাদিগকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। তাহারা আরো নম্র হইতে লাগিল। আগুন আপনিই উজ্জ্বল, তাহাতে ঘৃত পড়িলে আরো উজ্জ্বল হয়। নন্দন-কানন স্বর্গের অলংকার। তাহাতে আবার ছয় ঋতু একত্রে মিলিয়া সে নন্দনবনের শোভা অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ রঘুবংশ অতি উজ্জ্বল বংশ। চারিটি ভাই একত্র বিরাজ করিয়া সে বংশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিল। চারি ভাইয়ে সমান ভাব, তবুও রামে ও লক্ষ্মণে, ভরতে ও শত্রুঘ্নে 'জোড়ের পায়রা' হইয়া দাঁড়াইল। বায়ুতে অগ্নিতে, চন্দ্রে সমুদ্রে যেমন চিরকাল প্রীতি, কখনো বিচ্ছেদ নাই, ইঁহাদেরো তাই। গ্রীষ্মের শেষে দিনের বেলায় কালোমেঘ উঠিলে, লোকের মনে যেমন আনন্দ হয়, তেমনই রাজপুত্রগণের তেজে ও নম্রতায় লোক-সকল মুগ্ধ হইয়া গেল। রাজার ছেলে চারিটি দেখিলে মনে হইত যেন, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মূর্তিমান্ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রেরা অসীম ভক্তিতে পিতাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিতেন, বোধ হইত যেন, চারিটি মহাসমুদ্র মহামূল্য রত্ন পৃথিবীপতিকে উপহার দিতেছে।

রামচন্দ্রের বাল্যলীলা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই লীলায়ই তিনি তাড়কাবধ করিয়াছিলেন ও হরধনুভঙ্গ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে এইরূপ লীলা মানুষের সম্ভব নহে, ভগবানেই সম্ভব। রাজা সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি আসিয়া বলিলেন— "তোমার রাম-লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে দাও। আমি যজ্ঞ

করিব, রাক্ষসেরা যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে আসিবে, সেই যজ্ঞ-রক্ষার জন্য আমি ইহাদিগকে চাই।" তখন সবে মাত্র রামের চূড়াকরণ হইয়াছে। কিন্তু যে বীর, সে অল্পবয়সেও বীর। তাহার বয়স কত, কে দেখে? ঋষি যেমন চাইলেন, রাজা অমনি দিয়া দিলেন। রঘুবংশের রাজারা চাহিলে প্রাণও দিতে পারেন, ছেলেপুলের তো কথাই নাই। রাজা যেমন "লইয়া যাউন" বলিলেন, অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বোধ হইল, বাতাস যেন ছেলেদের যাইবার পথটা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ফুল ছড়াইয়া দিতেছে। তাঁহারা বাপ-মার চরণে প্রণাম করিলেন এবং পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ ঋষির সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। পুরবাসীরা পথের দুই ধার হইতে তাঁহাদের দেখিতে লাগিল— বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদের দৃষ্টি দুই ধার হইতে আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণের মাথার উপর মিলিয়াছে ও তাঁহাদের মাথার উপর গেট হইয়া রহিয়াছে। পিতা যাইবার সময় কোনো সৈন্য-সামন্ত দিলেন না, দিলেন কেবল আশীর্বাদ। কিন্তু এই আশীর্বাদই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ। তাঁহারা এতই ছেলেমানুষ যে, যাইবার সময় তাঁহাদের হাত দুটি নড়িতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সর্বদাই চঞ্চল, তাঁহাদের হাতও তেমনি চঞ্চল। দুইহাত নড়িতেছে, আর বোধ হইতেছে যেন, নদীর খরবেগ একদিকে কূল ভাঙিতেছে, আর একদিকে জলপ্লাবন হইতেছে।

বাল্যকালেই বিদ্যাশিক্ষার সময়। অন্যান্য বালকের ন্যায় রাম-লক্ষণও বিদ্যা শিখিয়াছেন, কিন্তু সে-সব মানুষের বিদ্যা। নারায়ণের একটা নূতন বিদ্যা শিখা চাই। বিশ্বামিত্র বলা আর অতিবলা নামে দুইটি বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। তাহার প্রভাবে রাম ও লক্ষ্মণ পথের পরিশ্রম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঋষি পুরানো গল্প করিয়া তাঁহাদিগের মন এতই আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে হাঁটিয়া যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা রথে চড়িয়া যাইতেছেন। ক্রমে যাইতে যাইতে যেখানে মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলে, লোকের মনে হইল, আবার বুঝি মদন আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া তাহারা বুঝিল, ইনি মদন নহেন, রাম।

তাহার পর তাড়কাবধ। বিশ্বামিত্র বলিলেন, এই পথে তাড়কা আছে। অগস্ত্যের শাপে তাহার ভয়ংকর রূপ হইয়াছে। শুনিয়াই রাম-লক্ষ্মণ আপনাদের ধনুকে ছিলা লাগাইলেন এবং ধনুকে টঙ্কার দিলেন। ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়াই তাড়কা আসিল— ঠিক যেন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। তাহার কানে শাদা শাদা মড়ার

মাথা কুণ্ডলের মতো দুলিতেছে, ঠিক যেন মিশমিশে কালো মেঘের নিচে হাঁস উড়িতেছে। সে মড়ার কাপড় পরিয়া আছে, সিংহনাদ করিতেছে এবং এত জোরে আসিতেছে যে, রাস্তার দুই ধারে গাছপালা কাঁপিতেছে। মানুষের নাড়ি চন্দ্রহারের মতন তাহার কোমরে জড়ানো। সে একটা হাত উঁচু করিয়া আসিতেছে। তাহার আকৃতি দেখিয়া, স্ত্রীলোক বলিয়া রামচন্দ্রের যে একটু দয়া ছিল, তাহা লোপ পাইয়া গেল। তখন রাম একটিমাত্র বাণ ছুঁড়িলেন। রাক্ষসীর বুকটা পাথরের মতন শক্ত: কিন্তু রামের বাণ সে বুকটাও ভেদ করিয়া গেল। ও তো রাক্ষসীর বুকে বাণ মারা নয়। যমরাজ এতদিন রাক্ষসের দেশে ঢুকিবার পথ পান নাই; ঐ বাণে প্রথম তাহার পথ করিয়া দিল। এক বাণেই তাড়কা পড়িয়া গেল। তাহার পড়ায় বনটাসুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিল। রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। সে দুর্গন্ধ রক্ত মাখিয়া যমালয়ে গমন করিল।

রামের অদ্ভুত কার্য দেখিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রামকে রাক্ষসঘাতী বাণ প্রদান করিলেন এবং সে বাণ কিরূপে ছুড়িতে হয়, তাহার মন্ত্রও বলিয়া দিলেন। সূর্যকান্ত মণিতে সূর্যের কিরণ পড়িয়া আগুন বাহির হয়। সে আগুনে রাশি রাশি কাঠ পুড়িয়া যায়। সেইরূপ বামচন্দ্রও ঋষির নিকট হইতে অস্ত্র পাইয়া রাক্ষসকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। রামের বাল্যকালে এইরূপেই অস্ত্রশিক্ষা হইয়াছিল।

সেখান হইতে যেখানে বামনাবতারে নারায়ণ আশ্রম করিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব-জন্মের কথা কিছুই মনে নাই। তবুও রামের মনটা কেমন কেমন করিয়া উঠিল। বামনের আশ্রম হইতে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের তপোবনে গেলেন। সেখানে ঋষি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন আর রাম-লক্ষ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পৃথিবী যখন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন চন্দ্র-সূর্য যেমন তাহাকে অন্ধকারের হাত হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষসের হাত হইতে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বেদির উপর বাঁধুলি-ফুলের মতন বড়ো বড়ো রক্তের ফোঁটা পড়িতে লাগিল এবং তাহাকে অপবিত্র করিয়া দিল। ঋত্বিকেরা বৈঁচি কাঠের তৈয়ারি স্রুক্ ফেলিয়া দিয়া, যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন। ভয়ে তাঁহাদের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া গেল। রাম মাথা উঁচু করিয়া দেখিলেন, আকাশে রাক্ষস-সৈন্য রহিয়াছে; আর তাহাদের রথের ধ্বজার উপরে শকুনি-গৃধিনী উড়িতেছে; তাহাদের পাখার বাতাসে পতাকাগুলি লট্‌পট্ করিতেছে। রাম তূণ হইতে একটা বাণ তুলিয়া, যে রাক্ষসদের সেনাপতি ছিল, তাহাকেই লক্ষ

করিলেন, ইতর রাক্ষসদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। গরুড় যখন সাপ মারে, তখন অজগর ফণাধরই মারে, ঢোঁড়া সাপ মারিয়া হাত নষ্ট করে না। রামচন্দ্র বায়ুবাণে তাড়কার পুত্র মারীচকে শুক্‌না পাতার ন্যায় কোথায় যে উড়াইয়া দিলেন, তাহার সন্ধানই পাওয়া গেল না; আর সুবাহু নামে রাক্ষসদের আর-একজন যে সেনাপতি ছিল, তাহাকে এমন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তপোবনের বাহিরে ফেলিয়া দিলেন যে, পাখিদের খাইবার কোনো অসুবিধা হইল না। ঋত্বিকেরা রাম-লক্ষ্মণের বিক্রম দেখিয়া শতমুখে তাঁহাদের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন এবং যথাবিধি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞটি সমাপ্ত করিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র নিজে যজমান, সুতরাং তিনি বেদের বিধানমতো যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত চুপ করিয়া ছিলেন। যেমন যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, অমনি তিনি অবভৃথ স্নান[২] করিয়া আসিলেন। রামলক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও তিনি আশীর্বাদ করিলেন এবং তাঁহাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন। সে হাতের অনেক জায়গা কুশে কাটিয়া গিয়াছিল।

রামচন্দ্রের বাল্যলীলার মধ্যে তাড়কাবধ ও যজ্ঞরক্ষা এ দুটি তো বলা হইল: বাকি এখন ধনুর্ভঙ্গ ও পরশুরামের দর্পহরণ।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ঋষি শুনিলেন, জনকরাজা যজ্ঞ করিতেছেন ও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঋষি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তথায় মহাদেবের ধনু আছে শুনিয়া রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। যাইবার পথে গৌতমাশ্রম— সেখানে অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র পদধূলি দিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ করিয়া দিলেন। মিথিলায় উপস্থিত হইয়া ঋষি শাস্ত্রের বিধানমতো জনকের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া দিলেন এবং অবসরক্রমে রাজাকে বলিলেন, "রামচন্দ্র আপনার ধনু দেখিবার জন্য বড়োই উৎসুক হইয়াছেন।" জনক বলিলেন— "সে কী মহর্ষি, বড়ো বড়ো হাতিতে যে কর্ম দুষ্কর মনে করে, এই শিশুটি কেমন করিয়া তাহা করিবে। আমি তো ইহা অনুমতি করিতে পারি না। অনেক বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো ধনুর্ধর ধনু তুলিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন, আর আপনার হাতকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিয়া গিয়াছেন।" ঋষি বলিলেন, "সার-কথা শুনুন। অথবা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কী? যেমন বজ্রের শক্তি পাহাড়ে প্রকাশ পায়, তেমনি রামের শক্তি ধনুতেই প্রকাশ পাইবে।" তখন রাজা বুঝিলেন— যদিও রামের অল্পদিন চূড়াকরণ হইয়াছে, যদিও উঁহার মাথায় কাকপক্ষ এখনো ঝুলিতেছে, তথাপি উঁহার শরীরে বল থাকিতে পারে। আগুন এতটুকু হইলেও

উহার পুড়াইবার শক্তি যথেষ্ট আছে। তখন রাজা হুকুম দিলেন— “ধনু লইয়া আইস।” ইন্দ্র যেমন মেঘগুলিকে হুকুম দেন— “রামধনু লইয়া আইস”, তখন মেঘেরা যেমন রামধনু লইয়া আইসে, তেমনি রাজার অনুচরেরা হরধনু লইয়া আসিল। এ বড়ো যে সে ধনু নয়— একদিন এই ধনু হাতে লইয়া মহাদেব, যজ্ঞ যখন মৃগরূপ ধরিয়া পলাইতেছিল, তাহাকে এক বাণ মারিয়াছিলেন। ধনুটি প্রকাণ্ড, সাপের মতো ভয়ানক। রাম খপ্ করিয়া ধনুটি হাতে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাতে ছিলা পরাইলেন। চারিদিকে লোক হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিলেন— “এ করে কী? এত ভারি ধনুকটা ফুলের ধনুর মতো তুলিয়া লইল, আর তাহাতে ছিলা দিল!” রাম ধনু আকর্ষণ করিলেন, সে ভীষণ টানে ধনুকটা বজ্রধ্বনি করিয়া কড়-কড়-কড়াৎ করিয়া ভাঙিয়া গেল। সে শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল। জামদগ্ন্য জানিলেন, আবার ক্ষত্রিয়েরা প্রবল হইয়াছে।

জনক রাজা মহা খুশি। রামকে দেখিয়া অবধি তিনি হায় হায় করিতেছিলেন, “কেন পণ করিয়াছিলাম? কেন ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলাম? নহিলে তো এই ছেলেকে কন্যাদান করিলে সব দিকে সুবিধা হইত।” রাম যখন ধনু ভাঙিয়া ফেলিলেন, রাজা ভারি খুশি। মেয়ে আনিয়া রামকে নিবেদন করিয়া দিলেন। দীপ্ত অগ্নির মতো যে ঋষি বিশ্বামিত্র, তাঁহাকেই সাক্ষী করিয়া রামের হাতে মেয়েটি সঁপিয়া দিলেন। ক্রমে দশরথ আসিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন, চারি-পুত্রের সহিত নিমিবংশের চারিটি কন্যার বিবাহ হইয়া গেল।

দশরথ বর-কনে লইয়া ফিরিতেছেন। চারিদিকে দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। প্রতিকূল বায়ু বহিতে লাগিল। রথের ধ্বজা ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। নদীতে বন্যা আসিলে যেমন সমস্ত দেশটা ভাসিয়া যায়, তেমনি বাতাসের জোরে সমস্ত সেনা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

দেখা গেল, সূর্যের চারিদিকে এক ভীষণ মণ্ডল— যেন গরুড়-নিহত সাপের মাথা হইতে মণিটি খসিয়া পড়িয়াছে, আর সাপ নিজের দেহ দিয়া সেটি বেড়িয়া আছে। কোনো দিকে চাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় চারিদিকে রাঙা মেঘ উঠিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন, দিগ্‌বধূরা রক্তমাখা কাপড় পরিয়াছে, আর কেবল বাজপক্ষী তাহাদের পাঁশুটে রঙের পাখাগুলি নাড়িয়া নাড়িয়া উড়িতেছে। মনে হইতেছে, যেন দিগ্‌বধূগণের ঝাপ্‌টাগুলি কালো না হইয়া পাঁশুটে হইয়া গিয়াছে। যেদিকে সূর্য রহিয়াছেন, শিয়ালরা সেই দিকে মুখ করিয়া ভীষণ চিৎকার করিতেছে— বোধ হইতেছে, যেন তাহারা পরশুরামকে বলিয়া দিতেছে— “ক্ষত্রিয়-শোণিত দিয়া

তোমার পিতৃ-তর্পণের সময় আবার আসিয়াছে।" হঠাৎ সৈনিকদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড তেজের রাশি উঠিল। তাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাহারা হাত দিয়া চক্ষু মুছিল, আবার চাহিল— নিপুণ হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহারা বুঝিতে পারিল, সেই তেজোরাশির মধ্যে এক পুরুষের মূর্তি রহিয়াছে। তাঁহার গলায় পইতা রহিয়াছে, হাতে ভয়ঙ্কর ধনু— যেন সূর্যের পাশে চাঁদ রহিয়াছে, আর যেন চন্দনগাছে সাপ জড়াইয়া আছে। ইনি এককালে ক্রোধান্ধ পিতার অন্যায় আদেশে কম্পান্বিতকলেবরা জননীর শিরচ্ছেদ করিয়া আগে দয়া বিসর্জন দিয়া পরে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ডাইন কানে এক রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিতেছে,— দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি যে একুশবার ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছেন, তাহাই যেন গণিয়া রাখিয়াছেন। পরশুরামকে এই ভাবে আসিতে দেখিয়া দশরথের তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ। এককালে পরশুরামের ধনু বহিতে বহিতে তাঁহার মাথায় টাক পড়িয়াছিল— আবর সেই পরশুরাম। ইঁহার প্রতিজ্ঞা, পিতৃঘাতী ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিবেন। কে তাঁহাকে বাধা দেয়? সূর্যবংশের ভরসা তো বালক রাম। রাজা দশরথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া— "অর্ঘ্য অর্ঘ্য" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। পরশুরাম তো সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। তখনো ক্ষত্রিয়ের উপর রাগে তাঁহার চক্ষু জ্বলিতেছিল, আর তারা দুটি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল।

তিনি রামের দিকে চাহিয়া, মুষ্টির মধ্যে ধনুক ধরিয়া, ধনুকে বাণ পরাইতে পরাইতে বলিলেন— "ক্ষত্রিয়জাতি আমার সর্বনাশ করিয়াছে। তাহারা আমার শত্রু। আমি অনেকবার ক্ষত্রিয়-নিধন করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি, আমার রাগও কতক ঠাণ্ডা হইয়াছিল। ঘুমন্ত সাপের উপর লাঠি মারিলে, সে যেমন ফোঁস করিয়া উঠে, তোমার বিক্রমে আমার সেই রাগ আবার ফোঁস করিয়া উঠিয়াছে। জনকরাজার ধনুটি অন্য রাজারা কেহই নোয়াইতে পারে নাই, তুমি তাহা ভাঙিয়াছ। সেইকথা শুনিয়া আমি মনে করিয়াছি— তুমি আমার শিঙ্ ভাঙিয়া দিয়াছ। এত দিন 'রাম' বলিলে পৃথিবীতে আমাকেই বুঝাইত। এখন যে সেই শব্দে দুই-জন বুঝাইবে— ইহা আমার অসহ্য। আমার অস্ত্র পর্বতের গায়ে লাগিয়াও ভোঁতা হয় না। আমি এখন দেখিতেছি, আমার দুই-জন প্রধান শত্রু— একজন কার্তবীর্য, তিনি আবার বাবার ধেনু ও বৎস অপহরণ করিয়াছিলেন, আর তুমি আমার যশ অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমার বিক্রমে যদিও ক্ষত্রিয়কুল বার বার নির্মূল হইয়াছে, তথাপি যতক্ষণ তোমাকে না জয় করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ সে বিক্রম বিক্রমই নয়। আগুন যদি তৃণরাশির মতো সমুদ্রকেও জ্বালাইতে পারে,

তবেই তো আগুনের মহিমা। নতুবা আগুন কী? তুমি মহাদেবের ধনুক ভাঙিয়াছ বলিয়া তোমার বড়ো গুমর হইতেছে। কিন্তু সে ধনুর বল তো বিষ্ণু হরণ করিয়াছেন; তাই তুমি বালক হইয়াও তাহা ভাঙিতে পারিয়াছ। নদীর স্রোতে গোড়ার মাটি ধুইয়া গেলে একটু বাতাসেই বড়ো বড়ো গাছও পড়িয়া যায়। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। এই লও আমার ধনু— ছিলা পরাও। যদি পারো, তবে মানিব, তোমার বাহুবল আমার বাহুবল সমান। তাহা হইলেও আমারই হার। তুমি যদি আমার কুঠারের ধার দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকো, তাহা হইলে হাত জোড় করো, অভয় প্রার্থনা করো।"

রাম দেখিলেন, ইঁহার সহিত কথা কাটাকাটি বৃথা। তিনি হাত বাড়াইয়া ধনু লইলেন— ভাবিলেন, 'এই ইঁহার ঠিক উত্তর।' একে ও রাম নব-দূর্বাদলশ্যাম, তার উপর হাতে বিচিত্র ধনু— বোধ হইল, বর্ষার কালোমেঘে রামধনু উঠিয়াছে। তখন তিনি ধনুকের আগা মাটিতে রাখিয়া ছিলা পরাইলেন। অমনি পরশুরামের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। তাঁহার তর্জন-গর্জন বন্ধ হইয়া গেল। আগুন নিবিয়া গিয়াছে, ধোঁয়ামাত্র রহিয়াছে। একজনের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল, আর-একজনের প্রভাব লোপ হইল। লোকে দেখিল— পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সূর্যদেব ডুবিতেছেন, আর এক দিকে চন্দ্র উঠিতেছেন।

তখন দয়াল রাম পরশুরামের অবস্থা দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— "আপনি যদিও আমার আততায়ী, তথাপি আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে আঘাত করা আমার উচিত নয়। কিন্তু আমি ধনুতে বাণ লাগাইয়াছি। এ বাণ তো অব্যর্থ। বলুন, এই বাণে আপনার কোন্ পথ রোধ করিব?"

ঋষি বলিলেন— "তুমি যে পুরাতন পুরুষ, তাহা আমার অবিদিত নয়। তথাপি তোমার বৈষ্ণব তেজ দেখিবার জন্য আমি তোমাকে রাগাইয়াছি। আমি পিতৃ-শত্রুগণকে ভস্মসাৎ করিয়াছি, সসাগরা পৃথিবীকে পাত্রসাৎ করিয়াছি। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তোমার কাছে হারেও আমার শ্লাঘা। এখন তুমি আমার পৃথিবীর গতি রোধ করিও না, তাহা হইলে আমার তীর্থভ্রমণ বন্ধ হইয়া যাইবে। তুমি আমার স্বর্গের পথ রোধ করো। আমি ভোগবিলাসী নহি। স্বর্গে যাইবার আমার কিছু প্রয়োজন নাই।"

ঋষি এইকথা বলিলে রাম পূর্বমুখ হইয়া বাণ ছুড়িলেন। তাঁহার শতপুণ্য থাকিলেও, ঋষির স্বর্গের পথ বন্ধ হইয়া গেল। বাণ ছুড়িয়াই রাম ধনু ফেলিয়া দিলেন— 'ক্ষমা করো' বলিয়া ঋষির পায়ে পড়িলেন।

ঋষি বলিলেন— "আমি মা-এর কাছ হইতে যে রজোগুণ পাইয়াছিলাম, তুমি তাহা লোপ করিয়া দিয়াছ, এবং আমাকে পিতার সত্ত্বগুণের অধিকারী করিয়াছ। আমি ইহা তোমার পরম অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। তুমি দেবতাদের কার্য করিতে আসিয়াছ— করো। আমি চলিলাম"— বলিয়াই ঋষি অন্তর্ধান হইলেন।

রঘু ও সুদর্শনের বাল্যলীলা দেখানো হইয়াছে। তাহাতে কিছুই বিচিত্র বা অদ্ভুত নাই। রামচন্দ্রের সবই অদ্ভুত— তাড়কা-বধও অদ্ভুত, ঋষিদের যজ্ঞে সুবাহু-মারীচের পরাভবও অদ্ভুত, হরধনুর্ভঙ্গও অদ্ভুত, সব চেয়ে অদ্ভুত— পরশুরামের পরাভব। রঘু সারাজীবনে যাহা করিয়াছেন, রামচন্দ্র বাল্যকালেই তাহা সবই করিলেন। রঘু দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন; তিনি দিগ্বিজয়ী বীর পরশুরামকে জয় করিলেন। রঘু বাহুবলে কৈলাসে কুবেরের নিকট হইতে অর্থ আনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন; রামচন্দ্র কৈলাসপতির ধনু ভাঙিলেন। রঘু চৌদ্দ কোটি সোনা ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন; রামচন্দ্র পরশুরামের মতো প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-বীরকে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে অভয় দান করিলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। রঘুর বিবাহ বাবা দিয়াছিলেন, সুদর্শনের বিবাহ দিয়াছিলেন মন্ত্রীরা; আর রামচন্দ্র নিজ বাহুবলে শুধু যে নিজে বিবাহ করিলেন, তা নয়, ভাইদেরও বিবাহ দিলেন, বাবা বরকর্তা মাত্র। শিক্ষা-সম্বন্ধেও রঘু অস্ত্রবিদ্যা শিখেন বাবার কাছে, সুদর্শন মন্ত্রীর কাছে; রামচন্দ্র পিতার কাছে তো সব শিখিয়াই লইলেন, তার উপরও অদ্ভুত মনুষ্য বিশ্বামিত্রের কাছে পাইলেন বলা, পাইলেন অতিবলা, আর পাইলেন রাক্ষসঘাতী অস্ত্র। তাই বলিতেছি, রঘুবংশের নায়ক রঘুও নহেন, রঘুবংশের চব্বিশ জন রাজাও নহেন,—প্রকৃত নায়ক রাম, সাক্ষাৎ **নারায়ণ**।

নারায়ণ
ফাল্গুন, ১৩২৫।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. শাক্য বংশীয় রাজা শুদ্ধোদন-এর মহিষী মায়াদেবী গর্ভবতী হবার আগে স্বপ্ন দেখেন, মেঘের মধ্যে যেমন চাঁদ প্রবেশ করে তেমনি একটি শ্বেতহস্তী তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। হস্তী রাজচক্রবর্তীর প্রতীক। তাৎপর্য— এই জাতক রাজচক্রবর্তী হবে। শ্বেতবর্ণ সর্বদাই পবিত্রতা-দ্যোতক।

২. যজ্ঞ সমাপনান্তর স্নানের নাম অবভৃথ। 'অমরার্থচন্দ্রিকা', 'ব্রহ্মবর্গ', প্রথম স্তবক [৭৩]।

রঘুবংশে প্রেম

অনেকের ধারণা প্রেমই কাব্যের প্রাণ, প্রেম লইয়াই অধিকাংশ কাব্য। পৃথিবীতে যত কাব্য আছে, তাহার পনরোআনাতেই প্রেম। বাকি এক আনায় আর অষ্টরস। সে প্রেম আবার নায়ক-নায়িকার প্রেম। প্রেমে যত চন্‌মনানি বেশি, ততই লোকের বেশি পছন্দ। প্রেমে হাই-হুতাস চাই, কাঁদাকাঁদি চাই, গালে হাত দিয়া ভাবা চাই, চক্ষের জল চাই; সবার উপর লুকোচুরি চাই। আলংকারিকেরা বলিবেন, পূর্বরাগ চাই, সম্ভোগ চাই, বিরহ চাই; শাপ চাই, তাপ চাই। কালিদাসের অন্য-অন্য কাব্যে এসব যথেষ্ট আছে। শাপগ্রস্ত যক্ষ যখন বলিল—

পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু।[১]

[মেঘদূত, উত্তরমেঘ/৪৯]

তখন তাহার ভোগের ইচ্ছা কতই চন্‌চনে। মালবিকার প্রেমে মাতোয়ারা অগ্নিমিত্র যখন বলিলেন—

শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে।[২]

[মালবিকাগ্নিমিত্র, ৩য় অঙ্ক]

তখন বাঞ্ছিতকে পাইবার ইচ্ছা বড়োই প্রবল। দুষ্যন্ত যখন—

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।[৩]

বলিতেছেন, তখন তাঁহার মনের ভাব পিঁজিয়া দেখিলে কী দেখিবে? দেখিবে তিনি শকুন্তলার জন্য এক-রকম পাগল! আর-কিছুই ভালো লাগিতেছে না। আবার শকুন্তলা পত্র লিখিতেছেন—

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ-ময়অনেণ্য দিবা
বি রত্তিম্‌ পি।
নিগ্‌ঘিণ-তবই বলীঅং তুই বুত্ত—মণোরহাই অঙ্গাইব্‌।
(অভিজ্ঞান শকুন্তল, তৃতীয় অঙ্ক)

তখনো দেখি শকুন্তলা তন্ময় হইয়া রাজার ভাবনা ভাবিতেছেন, আর রোগা হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু প্রেমের যে আর-একটা স্থির ধীর গভীর ভাব আছে, কালিদাস তাহাও দেখাইয়াছেন; সে পার্বতীর প্রণয়ে —

যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর ত্বয়া
জনোয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং
মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে।।[৫] [কুমারসম্ভব, ৫/৬৪]

কিন্তু রঘুবংশে সে প্রেম কই? ইহাতে সেপ্রকার নায়ক-নায়িকার প্রেমের গন্ধও যেন নাই, বাতাসও নাই। দিলীপ-সুদক্ষিণা, বুড়োবুড়ি, ছেলে হয় না বলে গুরুর বাড়ি যাইতেছেন। রঘুরাজার দেহে প্রেমের গন্ধও নাই। অজরাজা স্বয়ম্বরে কনে পাইলেন, যুদ্ধ করিয়া কনে রক্ষা করিলেন। বাগানে বেড়াইতে গিয়া কনে মরিয়া গেল। রাজা একটু বিলাপ করিলেন। দশরথের শত শত মহিষী, তাঁহার মনেও ওরূপ চন্‌মনে প্রেমের জায়গা নাই। রামচন্দ্র তো পণে জিতিয়া সীতা পাইলেন; সীতার সঙ্গে বনে গেলেন; রাবণ সীতা চুরি করিল; তিনি তাঁহার উদ্ধার করিলেন; আবার প্রজাদের নিন্দার জন্য তাঁহাকে বিসর্জন দিলেন। এসবও কবির প্রেম নহে। কুশরাজা নাগকন্যা বিবাহ করিলেন, জলকেলি করিলেন। আর আর রাজারাও প্রেমের কথা বড়ো জানেন না। শেষে অগ্নিবর্ণ। তিনি তো বিলাসী, লম্পট, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং কবির প্রেম—ভালো প্রেমই হউক, আর মন্দ প্রেমই হউক, রঘুবংশে নাই। অথচ রঘুবংশ আদিরসের কাব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ; আদিরস নাই অথচ আদিরসের কাব্য—এ বিষয়ের মীমাংসা আছে কি?

আছে বৈ কি? তবে রঘুবংশ ঠিক আদিরসের কাব্য নহে। ইহা নবরস-সংযুক্ত মহাকাব্য, তবে আদিরস ইহার প্রধান রস। কিন্তু সে আদিরস খুব চাপা। যে

~ ~

আদিরসে জোয়ান বয়সে লোকে মাতোয়ারা হয়, সে ভাবের আদিরস নহে। অলংকারশাস্ত্রে আদিরসকে মোটামুটি তিন ভাগ করে। পূর্বরাগ, সম্ভোগ, বিরহ। সম্ভোগ শব্দটা একটু কেমন কেমন ঠেকে, তাই আমিও নামটা বদলাইয়া মিলন বলিব। এ তিনই রঘু-তে আছে, তবে চাপা, আর রঘু-র যা আসল কথা— তাহাও ঠিক আছে। আর পাঁচ রাজার চেয়ে রামের এই তিনটিই গভীর ও চাপা বেশি। একখানি প্রকাণ্ড মহাকাব্য, যাহাতে সব কয়টা রসই পুরা বর্তমান, তাহাতে এই সবই বেশি বিস্তার হইতে পারে না, তাই সবই সংক্ষেপে আছে। সে সংক্ষেপও পাকা হাতের সংক্ষেপ। আসল কথাটি— সকলের চেয়ে ভালো কথাটি— দু-কথায় বলিয়া দেওয়া আছে। বাকিটি তোমরা ভাবিয়া লও। সবিস্তার বর্ণনা না থাকিলেও এমন দুইটি আসল কথা বলা আছে, যাহাতে তোমার মনে অনেক কথা উঠিবে, আর তোমায় আনন্দে ভোরপুর করিয়া তুলিবে।

প্রথম পূর্বরাগ দেখাইব। পূর্বরাগ রঘুবংশে এক-জায়গায় আছে— সে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে। ইন্দুমতী অন্য অন্য রাজার কাছে গেলে, রাজারা নানা ভাবভঙ্গি করিয়া ইন্দুমতীর মন চুরি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতীও, কাহাকে প্রণাম করিয়া, কাহাকেও একটু হাসিয়া আপ্যায়িত করিয়া, চলিয়া গেলেন। কিন্তু অজের নিকটে আসিলে, অজ আকুল হইয়া উঠিলেন "বৃণীত মাং নেতি" "ইন্দুমতী কি আমায় বরণ করিবে?" আর ইন্দুমতী কী করিলেন। তাঁহার মন অজেই বসিয়া গেল, তিনি আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। কবি বলিলেন— ভোমরা কি আমের বউল ফুটিলে আর কোথাও যাইতে চায়। সুনন্দা খুব চতুর, তিনি উভয়ের মনের ভাব বুঝিলেন, অজরাজার ও তাহার পূর্বপুরুষদের খুব সুখ্যাতি করিলেন, নানারূপ লোভ দেখাইলেন। শেষে বলিলেন, "ইঁহার পিতা এখনো বর্তমান। ইনি এখন যুবরাজমাত্র। তুমি ইঁহাকে বরণ করো। সোনার বদলে হীরা আসুক।" ইন্দুমতী কথা কহিলেন না, কিন্তু চোখের ভাবে তাঁহার মনের ভাব বেশ বুঝা গেল। তাহার উপর তাঁহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তখন সুনন্দা বলিলেন— "তবে আর দাঁড়াইয়া কেন? চলো আর-এক জায়গায় যাই।" এই কথা শুনিয়া ইন্দুমতী সুনন্দার উপর কুটিল-কটাক্ষ-পাত করিলেন। এই যে কুটিল কটাক্ষ, ইহাতে অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। শকুন্তলার প্রথম মিলনের সব কথা মনে পড়িয়া গেল। কালিদাস সংক্ষেপে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন।

কবি রামসীতার প্রথম মিলনটা একেবারেই দেখান নাই— মনে করিলেন

সেটা দেখানো ভালো হইবে না। নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রথম সমাগমের কথা লোকে ভাবিয়া লউক, লিখিবার দরকার নাই। শকুন্তলার প্রথম মিলন সংক্ষেপ করিয়া ইন্দুমতীর প্রথম মিলন লিখিলেন, সেটা সংক্ষিপ্তসার হইয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর আর সংক্ষেপ চলে না। তাই রামসীতার প্রথম মিলনের বর্ণনাটা লোপই করিয়া দিলেন। এরূপ লোপ করাতেও কবির বেশ বাহাদুরি আছে। বাল্মীকি এ মিলনটা একটু বর্ণনা করিয়াছেন, পুরাণকারেরাও কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ বর্ণনা সত্ত্বেও লোপ করাটায় কবির যথেষ্ট সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। লোপ করায় যে কাব্যের আস্বাদ বাড়িয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই— এ প্রথম মিলন আমি বর্ণন করিব না, তোমরা মনে মনে ভাবিয়া লও।

পূর্বরাগের কথা এই পর্যন্ত। তাহার পর সম্ভোগ বা মিলনের কথা। মিলন মানে প্রণয়ীদের একত্র সদ্ভাবে থাকা। কালিদাস অনেকবার এরূপ মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সে-সকল ঘরে দোর দিয়ে মিলন, দরজায় পাহারা রাখিয়া মিলন। যেমন মালবিকাগ্নিমিত্রে— রাজা ও মালবিকা সমুদ্রগৃহে; দরজায় বিদূষক। আবার যেমন শকুন্তলা-য়— মাধবীলতাকুঞ্জে রাজা ও শকুন্তলার মিলন; পাহারায় প্রিয়ম্বদা। এ মিলনটা অল্পবয়সে ভালো লাগিলেও সকল অবস্থায় ভালো লাগে না। ইহাতে বিলক্ষণ কামগন্ধ আছে। সেটুকুও সকলে সব সময় পছন্দ করে না। কিন্তু আর একরূপ মিলন আছে। সে অতি পবিত্র, তাহাতে ঘরে দোর দিতে হয় না, পাহারা রাখিতে হয় না। সেটা স্বভাবের শোভার মধ্যে, খোলাজায়গায় সকলের সম্মুখে, দু-জনের মিলন। কবিরা এ মিলন, বড়ো একটা দেখান না। বড়ো কবি ভিন্ন আর কাহারো দেখানো যায় বলিয়াই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কালিদাস এটা রঘুবংশে বার-বার দেখাইয়াছেন। ইহাতে ভোগের ইচ্ছা নাই। পুরূরবা ভোগের জন্য পৃথিবী ছাড়িয়া নির্জনে হিমালয়ের অপূর্ব শোভার মাঝখানে গিয়াছিলেন। এ খোলা জায়গায় কিন্তু নির্জনে মিলন। রঘুবংশে সকলের সম্মুখে স্বভাবের শোভার মধ্যে দু-জনের মিলন। রঘুবংশ খুলিতেই কালিদাস এইরূপ একটি মিলন দেখাইয়াছেন। দিলীপ ও সুদক্ষিণা পুত্র হইল না বলিয়া গুরুর কাছে শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য যাইতেছেন।

দু-জনেরই এক ধ্যান এক জ্ঞান। কোনো অপরাধ করিয়াছি বা কোনো দেবতার কোপে পড়িয়াছি, তাই ছেলে হয় না। দু-জনেরই বিশ্বাস— গুরু আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দেবতাকে প্রসন্ন করাইয়া দিবেন। দু-জনেরই গুরুর

প্রতি অগাধ ভক্তি। এই যে এক ধ্যান, এক জ্ঞান— ইহাও তো প্রণয়ের একটা পবিত্র পরিণাম। দুই-জনেই এক রথে চড়িয়াছেন। কালিদাস বিশেষ করিয়া সেকথা বলিয়া গিয়াছেন— 'একং স্যন্দনমাস্থিতৌ'। দু-জনেই স্বভাবের শোভা দেখিতেছেন ও মুগ্ধ হইতেছেন। দেখাইবার যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু দেখিলে আনন্দ হইবে, রাজা সব রানীকে দেখাইতেছেন। ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে গায়ে লাগিয়া শরীর ও মন জুড়াইয়া দিতেছে। শাল গাছে সব আটা ছাড়িয়াছে, আর ধুনার গন্ধে বন আমোদ করিয়াছে। চারিদিকে ফুল ফুটিয়াছে, আর বাতাসে তাহার রেণু উড়াইয়া আনিতেছে। পুকুরে পদ্ম ফুটিয়াছে, পদ্মের গন্ধইতো একে ঠাণ্ডা, তাতে আবার তরঙ্গে তরঙ্গে উহাদের গায়ে জল লাগিতেছে, সে গন্ধ আরো ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। আকাশে সারসকুল ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িতেছে— ঠিক যেন ফুলের মালা ঝুলিতেছে; মাঝখানটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আর দুই পাশ উঁচা হইয়া রহিয়াছে। তাহারা শব্দ করিতেছে; শব্দ বড়ো মিঠা। তাহার পর আবার সে শব্দ বহুদূর হইতে আসিতেছে, যেন দূরে কাহারা সাধা গলায় গান করিতেছে; বড়ো মিষ্ট লাগিতেছে। দু-জনে ঘাড় উঁচা করিয়া সে সারসের ঝাঁক দেখিতেছেন, আর সে শব্দ শুনিতেছেন— সে গানে তন্ময় হইয়া যাইতেছেন। রথ গড়গড় করিয়া যাইতেছে; মেঘের মতো শব্দ হইতেছে, যেন মেঘ ডাকিতেছে। বনে যত ময়ূর ছিল, তাহারা শব্দ লক্ষ করিয়া রথের কাছে আসিতেছে, ঘাড় উঁচা করিতেছে, আর উচ্চৈঃস্বরে কেকাধ্বনি করিতেছে। হরিণগুলা রথের শব্দ শুনিয়া রাস্তা ছাড়িয়া একটু দূরে চলিয়া যাইতেছে, আর হা করিয়া রথ দেখিতেছে। রাজা বলিতেছেন— রানী, হরিণের চোখ তোমার চোখের চেয়ে বড়ো নয়। রানী বলিতেছেন— রাজা, হরিণের চোখ তোমারই চোখের মতো। যখন গ্রামের মাঝখান দিয়া যাইতেছেন, তখন ব্রাহ্মণেরা, তাঁহাদেরই জন্য খাদ্য আনিয়া অর্ঘ্য দান আর আশীর্বাদ করিতেছেন। বনের প্রজারা কিছু-না-কিছু নজর লইয়া রাজা-রানীর কাছে আসিতেছে, আর তাঁহারা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন— এ গাছটার নাম কী? ও গাছটার নাম কী? গোয়ালারা টাটকা ঘি-টুকু নজর দিতে আনিয়াছে, আর তাহাদের সঙ্গে রাজা-রানী মিষ্ট আলাপ করিতেছেন। এসব দেশে ধূলার উৎপাত বড়ো। রাস্তায় বাহির হইলেই ধূলায় ভূত সাজিতে হয়। কিন্তু রাজা-রানীর ভাগ্য এমনি প্রসন্ন যে, তাঁহারা রথে চড়িয়া যাইতেছেন। কত ধুলাই উড়িতেছে, কিন্তু তাঁহারা যে মুখে যাইতেছেন বাতাসও সেই মুখে যাইতেছে, তাই তাঁহাদের গায়ে ধুলা একেবারেই লাগিতেছে না। স্বভাবের

শোভার মধ্যে দু-জনকে বসাইয়া কালিদাস স্বভাবের শোভাও মনোহর করিয়াছেন, আর দু-জনের প্রীতিরও চরম দেখাইয়াছেন।

কিন্তু ইহাতেও হয় নাই। যে সুখে ও দুঃখে সমান প্রণয়ী, সেই তো যথার্থ প্রণয়ী। রাজা-রানী সুখে বেশ কাটাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখেও যদি সেই ভাবে কাটান, তবেই তো তাঁহাদের প্রণয় গাঢ় বলিয়া মনে করিব। তাই কালিদাস যখন গুরুর আজ্ঞায় সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরকে রাখাল সাজাইলেন, রানীকেও ছাড়িলেন না। তাঁহাকেও রাখালিনী সাজাইলেন। বলিয়া দিলেন— বধূও ভক্তিমতী হইয়া সকালে তপোবনের সীমা পর্যন্ত নন্দিনীর পিছনে পিছনে যাইবেন, আর সন্ধ্যার সময় তাহাকে আগু বাড়াইয়া লইয়া আসিবেন। রাজাকে পাতার কুঁড়েতে শুইতে দিলেন, তাঁহার শয্যা হইল কুশের; রানীরও তাই। তাঁহারা থাকিবেন দু-জনে একত্রে, কিন্তু রানী সংযত হইয়া থাকিবেন। যতদিন না নন্দিনী প্রসন্ন হইয়া পুত্রবর দেন, ততদিন এইভাবে থাকিতে হইবে। এইরূপে দুইটি প্রাণ সুখে দুঃখে এক করিয়া কালিদাস রঘুবংশে প্রেমের প্রথম সূত্রপাত করিলেন।

এই কঠোর অবস্থায় রাজার প্রতি রানীর মনের ভাবটা কিরূপ হইয়াছিল— না দেখাইতে পারিলে তো প্রেমের পরিপাক দেখান হয় না। তাই সেটাও কালিদাস দেখাইয়াছেন। যখন সমস্ত দিন গোরু চরাইয়া রাজা ফিরিয়া আসিতেছেন, গোরুটি আগে আগে আসিতেছে। তখন তপোবনের সীমায় রানী দাঁড়াইয়া আছেন, আর এক দৃষ্টে রাজাকে দেখিতেছেন; চোখের পলক পড়িতেছে না। চক্ষু যেন সমস্ত দিন রাজাকে না দেখিয়া বড়োই তৃষ্ণার্ত হইয়াছিল, তাই সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যেন তাঁহাকে পান করিয়া ফেলিতেছে। রাজা আসিতেছেন পিছনে, রানী আসিতেছেন আগে আগে, মাঝখানে রাঙা গোরুটি ঠিক যেন দিন আর রাত্রের মধ্যে সন্ধ্যা আসিতেছে। গোরুর সেবা করিয়া রাজা সেই গোয়ালঘরেই গোরুর পাশে শুইয়া রাত্রি কাটালেন, রানীও তাহারই পাশে শুইয়া রহিলেন।

এই তো গেল একরূপ মিলন। এ বড়ো পবিত্র মিলন। কিন্তু কালিদাস আর-একরকম মিলন দেখাইয়াছেন। সে বড়ো গৌরবের মিলন, সে বীরের মিলন। অজরাজা যখন স্বয়ংবরে ইন্দুমতীকে লাভ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিতেছিলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা মিলিয়া তাঁহার হাত থেকে ইন্দুমতীকে ছিনাইয়া লইবার জন্য যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে তাহারা হারিল। অজরাজার গন্ধর্ব-অস্ত্রে রাজারা সব ঘুমাইয়া পড়িল, উঠিবার শক্তি রহিল না। যে-কেহ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, এমন-

কী পোশাক-পরিচ্ছদও লুঠ করিতে পারে। তখন অজরাজার মনে পড়িল— ইন্দুমতী তো ভয়ে কাঁটা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে তো আশ্বাস দেওয়া চাই। তাই তিনি সেখানে গেলেন। তখনো কপাল দিয়া দরদর করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। মাথার পাগড়িটা খুলিয়া ফেলায় চুলগুলা আলুথালু হইয়া পড়িয়াছে। ধনুকের একটা আগা মাটিতে রাখিয়া আর-একটা আগায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিতেছেন— "দেখো ইন্দুমতী, এই রাজারা আমার হাত থেকে তোমায় ছিনাইয়া লইতে চায়। তোমার পরপুরুষের মুখাবলোকনের ভয় নাই; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি দেখো। এই রকম লড়াই করিয়া আমার হাত থেকে তোমায় কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল। এখন উহাদের দশা দেখো! এখন ছোটো ছোটো ছেলেরাও উহাদের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারে।" ইন্দুমতী তো, পূর্বেই বলিয়াছি, ভয়ে কাঁটা হইয়া গিয়াছিলেন, এখন তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। যেন আরশির উপর হিম পড়িয়াছিল; সেটা সরিয়া গিয়া আরশি আবার আরশি হইয়া দাঁড়াইল। ইন্দুমতী লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না। সখীদের দিয়া অজরাজার সংবর্ধনা করিলেন।

এও এক অপূর্ব-মিলন। যুদ্ধক্ষেত্র বিজয়ী বীর আসিয়া আপনার প্রিয়তমার সহিত মিলিতেছেন; দেরি সয় নাই; তখনো ঘাম পড়িতেছে, তখনো যুদ্ধের সাজসজ্জা সবই আছে।

দিলীপ-সুদক্ষিণার মিলনে, অজ-ইন্দুমতীর মিলনে, কালিদাস যাহা দেখাইয়াছেন, সেই দুই মিলাইয়া, তাহার চেয়েও রং ফলাইয়া, তিনি রামসীতার মিলন দেখাইয়াছেন। লঙ্কাকাণ্ডর যুদ্ধ শেষ করিয়া বিজয়ী বীর রামচন্দ্র পুষ্পক রথে চড়িয়া সমস্ত ভারতের সৌন্দর্যের মধ্যে আকাশ পথে অযোধ্যা ফিরিতেছেন। সেকথা কতবার কতক্ষেত্রে বলিয়াছি, কিন্তু সে সৌন্দর্য বলিয়া শেষ করা যায় না। শতবার বলিলেও আবার নূতন বলিয়া বোধ হয়। সে অতুলনীয় স্বভাব-সৌন্দর্য, সে অতুলনীয় প্রেম, সে প্রেমে সে সৌন্দর্যে অতুলনীয় সমাবেশ পড়িলে ও ভাবিলে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে, আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, বাহ্যজ্ঞান থাকে না। রাম ও সীতা তেরো বৎসর ধরিয়া বনে বনে নানাকষ্ট সহিয়া প্রায় অদ্বৈত বা অদ্বয় ভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, যেন দুইয়ে প্রভেদমাত্র নাই; এমন সময়ে রাবণ সীতা চুরি করিল। এক ছিঁড়িয়া আবার দুই হইয়া গেল। উভয়ের যন্ত্রণার অবধি রহিল না। রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিলেন, সীতা উদ্ধার করিলেন। আবার দুই জুড়িয়া এক হইল। ঠিক এই সময়ে তাঁহাদের অযোধ্যায় যাইতে হইবে।

পুষ্পক রথ আসিল: সমস্ত বানর ও রাক্ষস চড়িল, আর চড়িলেন রামসীতা ও লক্ষ্মণ। এই সময়ে জগতের সৌন্দর্য দেখায় যে কত আনন্দ তাহা এক কালিদাসই বুঝিয়াছিলেন। আর তিনিই তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ও করিতে পারিয়াছেন। প্রথমেই সমুদ্র— অগাধ জলরাশি— আর সেতুবন্ধ। প্রকাণ্ড জলরাশির মধ্যে একটা সাদা জাঙাল— যেন শরতের নির্মল আকাশে ছায়াপথ, সেটাও শরৎকাল, বোধ হয় সে সময় ছায়াপথও দেখা যাইতেছিল। নিচে নীল সমুদ্র, আর উপরে নীল আকাশ। দুটাই দুভাগ হইয়া গিয়াছে— একটা ছায়া পথে, আর-একটা রামের সেতুতে। মাঝখানে পুষ্পক রথ— তাহাতে বিজয়ী সৈন্য, তাহাদের মাঝখানে রাম ও সীতা। রাম সীতাকে সম্বোধন করিতেছেন— বৈদেহি! সীতার দেহ যেন নাই, তাঁহার দেহেই যেন লীন হইয়া গিয়াছে। এই সম্বোধনে রামের প্রেমের গাম্ভীর্য যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কবির একখানি পুরাকাব্যেও তত প্রকাশ পায় না। এখানে রামের একটু আত্মপ্রসাদও আছে। যখন তিনি বলিলেন "মৎ সেতুনা"— "আমার জাঙালে" সমুদ্র মলয় পর্বত হইতে লঙ্কা পর্যন্ত দু-ফাঁক হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার একটু আত্মগরিমা আছে বৈ কি? কিন্তু সেটা বড়াই নয়। অজরাজা যেমন একটু বড়াই করিয়াছেন,— এরাই আবার আমার হাত থেকে তোমায় কাড়িয়া লইতে চায়— সে বড়াই ইহাতে নাই।

তাহার পর রাম আবার বলিলেন— আমারই পূর্বপুরুষেরা এই সমুদ্র খুঁড়িয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন, কারণ কপিল যখন সগর রাজার অশ্বমেধের অশ্ব চুরি করিয়া রসাতলে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন সেই ঘোড়া খুঁজিতে গিয়াই সমুদ্র খোঁড়া হইয়াছিল। এখানে রামের একটা খুব আত্মপ্রসাদ দেখা যায়। আপনার পূর্বপুরুষদিগের কীর্তির কথা স্মরণ করিলে কোন্ পাথরের মন না গলিয়া যায়। তবে ভুঁইফোঁড়দের কথা স্বতন্ত্র, হামবড়াদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিই নাই, তাহাদের কথাই স্বতন্ত্র।

এই সমুদ্রের মহিমা যে কত—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সমুদ্রের বাষ্পেই মেঘ হয়। ইহাতেই মণিমুক্তাদি পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই বাড়বানল থাকে। আর চন্দ্র— যাঁহাকে দেখিলে সকল লোকেরই চক্ষু জুড়াইয়া যায়— এই সমুদ্র হইতেই উঠিয়াছিলেন। ইহা দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। নিরন্তরই ইহার অবস্থা পরিবর্তন হইতেছে। সমুদ্র যে কত বড়ো বা কিরূপ, তাহা কেহই বলিয়া উঠিতে পারে না; ইহার তুলনা কেবল বিরাট-মূর্তি বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু প্রলয় কালে

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপন দেহে বিলীন করিয়া যখন যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়া শয়ন করেন, আর তাঁহার নাভি হইতে পদ্ম বাহির হয়, সেই পদ্মে বসিয়া ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করেন। তখন এই সমুদ্রই তাঁহার শয্যা হয়। অন্য শয্যায় তাঁহার সংকুলান হয় না।

ইন্দ্র যখন পর্বতগুলার পাখা কাটিয়া দিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের আর দাঁড়াইবার জায়গা রহিল না। তাহারা সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় লইল। যখন বরাহ-অবতারে নারায়ণ পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন এই সমুদ্রের প্রকাণ্ড জলরাশিই মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর মুখের ঘোমটা হইয়াছিল।

নদীর সঙ্গমস্থলে নদীর জল ক্রমে সরু হইয়া সমুদ্রের ভিতর যায়, আর সমুদ্রের তরঙ্গও ক্রমে সরু হইয়া নদীর ভিতরে প্রবেশ করে। নদী ও সমুদ্র স্ত্রী ও পুরুষ। যাহা অন্য স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, সমুদ্র ও নদী সেইটি করিয়া থাকেন। তিনি নিজে নদীর অধর পান করেন, আর সেই সময়েই তাহাদের দিয়াও নিজ অধর পান করান।

ঐ দেখো নদীর মুখে তিমি মাছগুলা প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া নদীর জল গ্রাস করিতেছে, আর সেই সঙ্গে কত মাছ, হাঙ্গর, কুম্ভীর উদরসাৎ করিতেছে, পরে মুখ বুঁজিলেই মাথায় ছেঁদা দিয়া জলগুলা পিচকারির মতো বাহির হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা ঢেউ দেখিতেছ। তাহার ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড জলজন্তু ভুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, ঢেউটা দু-ফাঁক হইয়া গেল, আর ফেনাগুলা জলজন্তুদের কানের উপর দিয়া যাইবার সময় কানের মতো দেখা যাইতেছে।

দেখো ঝাঁকে ঝাঁকে শাঁকগুলা প্রবালরাশির উপর পড়িতেছে। প্রবালের সরু সরু আগায় তাহাদের মুখ বিঁধিয়া যাইতেছে, তাহারা সরিয়া যাইতে পারিতেছে না, অনেক কষ্টে কাঁটা হইতে উদ্ধার হইতেছে। এখানে কালিদাস প্রবালের একটি বিশেষণ দিয়াছেন— "তবাধরস্পর্দ্ধিষু" প্রবালগুলা অর্থাৎ পলাকাটগুলা তোমার অধরের সঙ্গে স্পর্ধা করিতেছে, অর্থাৎ সেইরূপই লাল। এ বিশেষণের কী অর্থ সহৃদয় লোকে তাহা বিবেচনা করুন। সাপগুলা বাতাস খাইবার জন্য তীরে উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছে। লম্বা লম্বা ঢেউগুলার সঙ্গে তাহাদের রঙ মিশিয়া গিয়াছে, কোনো মতেই চেনা যায় না। কিন্তু সূর্যের কিরণ পড়ায় তাহাদের মাথার মণিগুলা চক্চক্ করিতেছে। তাহাতেই চেনা যাইতেছে যে, এইগুলা সাপ আর এইগুলা ঢেউ। আবার দেখো সমুদ্রের ঘূর্ণির উপর মেঘ পড়িয়াছে। ঘূর্ণির সঙ্গে সঙ্গে মেঘও

ঘুরিতেছে, আমরা উপর হইতে দেখিতেছি, বোধ হইতেছে যেন দেবতারা আবার সমুদ্র মন্থন করিতেছেন।

ঐ দেখো দূর হইতে লবণ সমুদ্রের তীর দেখা যাইতেছে। তমাল ও তালবনে ঐ তীরভূমি মিস্‌মিসে কালো হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন একখানা লোহার চাকা, আর তাহার আগায় কলঙ্কের দাগ। আমি তোমার বিম্বাধরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছি দেখিয়া স্থলবায়ু মনে করিতেছে তুমি সাজ করিয়া আসিবে— আমার সে দেরি সহিতেছে না। তাই কেতকের রেণু উড়াইয়া আনিয়া সে তোমার মুখের সাজ করিয়া দিতেছে।

এই দেখো, দেখিতে দেখিতে রথের বেগে আমরা সমুদ্র ছাড়াইয়া তীরে আসিয়া পড়িলাম। এখানে বালির উপর ঝিনুকগুলা খুলিয়া পড়িয়া আছে, আর মুক্তাগুলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আর এখানে সুপারির গাছ সব ফলভরে নুইয়া পড়িয়াছে। একবার এই সময় পিছনের দিকে চাও দেখি— বোধ হইবে যেন সমুদ্র সরিয়া যাইতেছে, আর তাহার মাঝখান থেকে জমি বাহির হইয়া আসিতেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বন।

এই দেখো রথ কেমন চলিতেছে। আমার যেমন অভিপ্রায় তেমনি চলিতেছে, কখনো দেবতাদের পথে যাইতেছে, কখনো মেঘের পথে যাইতেছে, কখনো-বা বায়ুর পথে যাইতেছে। খানিক গরম হাওয়া খাইয়া রামচন্দ্র বলিলেন— এই দেখো দুপুর বেলা গরম হাওয়ায় তোমার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়াছিল— সহসা আকাশে বায়ু বহিল, মন্দাকিনীর তরঙ্গ সঙ্গে সে বায়ু ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, আর মহেন্দ্র পর্বতে যে হাতিগুলা আছে তাহার মদজলে সুগন্ধি হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে তোমার মুখের বিন্দু বিন্দু ঘাম কোথায় চলিয়া গেল। তুমি রথের জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া মেঘের গায়ে হাত দিতেছ; আর মেঘ তোমার হাতে বিদ্যুৎ জড়াইয়া দিতেছে— বোধ হইতেছে যেন আর-একগাছা বালা পরাইয়া দিতেছে।

আবার দেখো ঐ জনস্থান। আর সে ঘরও নাই, দূষণও নাই। মুনিরা আসিয়া আবার ঐখানে কুঁড়ে বাঁধিতেছেন। অনেক দিনের পর আবার তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ঐ যে জায়গাটি দেখিতেছ, ঐখানে আমি তোমার একগাছি নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। রাবণ তোমায় হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় তুমি ঐ গাছা ফেলিয়া দিয়াছিলে। আমি যখন নূপুরগাছা পাইলাম, তখন তাহার শব্দও ছিল না,

সে চঞ্চলভাবও ছিল না। যেন তোমার পায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় সে দুঃখে মরিয়া ছিল। রাক্ষস যখন তোমায় চুরি করিয়া লইয়া যায়, তখন এই লতাগুলি, কথা কহিতে না পারিলেও, আমার উপর দয়া করিয়া ডাল নাড়িয়া নাড়িয়া তুমি কোন্ দিকে গিয়াছ বলিয়া দিতেছিল। মৃগীরাও দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমায় বলিয়া দিতেছিল— সীতাকে এই দিকে লইয়া গিয়াছে গো, এই দিকে লইয়া গিয়াছে। ঐ দেখো মাল্যবান্ পর্বতের শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। আমি বর্ষাকালে ঐখানে ছিলাম। মেঘও যেমন জল ফেলিয়াছে, আমিও তোমার বিরহে তেমনি চোখের জল ফেলিয়াছি। সেখানে নূতন বৃষ্টি পড়িলে, জলা হইতে সোঁদা গন্ধ বাহির হইত, কদম্বের কেশর একটু একটু বাহির হইত, আর ময়ূরে কেকাধ্বনি করিত— আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িতাম। পূর্বে মেঘগর্জন করিলে রাত্রে ভয়ে তুমি আমায় জড়াইয়া ধরিতে। এখানে সেইরূপ মেঘগর্জন হইলে, সে গর্জন গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনি করিত, আর আমি পূর্বকথা স্মরণ করিয়া অধীর হইয়া পড়িতাম। অতি কষ্টেই রাত কাটিত। বর্ষাকালে খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেলে, মাটি হইতে লাল লাল এক রকম ফুল বাহির হয়, তাহার নাম কন্দলী। পৃথিবী হইতে বাষ্প বাহির হইয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলে। আমি সেই ফুল দেখিতাম— আর বিবাহের সময় তোমার মুখ মনে পড়িত, সে সময়ে তোমার চোখ ধোঁয়ায় লাল হইয়া গিয়াছিল। ঐ যে— পম্পাসরোবরের জল দেখা যাইতেছে, চারিদিকে বেতগাছ জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সারসগুলা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ জল দূর হইতে দেখিয়া আমি আর চোখ ফিরাইতে পারিতেছি না। আমি ঐখানে দূরে বসিয়া চকাচকির খেলা দেখিতাম। তাহারা আমার মতো বিরহী নহে, সর্বদাই এক সঙ্গে থাকিত, পদ্মের মৃণাল ভাঙিয়া এ ওকে দিত, অবার ও একে দিত। তাহাদের দেখিলে আমার মন হু হু করিত। ভাবিতাম আমি কেন ওদের মতো হইতে পারিলাম না।

দেখো ঐ যে অশোক লতাটি পম্পাসরোবরের পাশে দেখা যাইতেছে, উহাতে থোলো থোলো লাল লাল ফুল ফুটিয়াছিল। আমি মনে করিলাম তুমি বুঝি আসিয়াছ। ও তো ফুলের থোলো নয়, ও তোমার স্তন। আমি উহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলাম, আর লক্ষ্মণ আসিয়া বলিল— "দাদা করো কী? ওটা যে অশোকের গাছ।"

ঐ দেখো গোদাবরী। ঐ দেখো সারসগুলা আমাদের রথের ঘুমুরের শব্দ

শুনিয়া, তুমি আসিয়াছ মনে করিয়া তোমায় আগু বাড়াইয়া লইতে আসিতেছে। ঐ দেখো পঞ্চবটী! তুমি এত যত্ন করিয়া নিজে জল তুলিয়া যে আমের গাছটা বাড়াইয়াছিলে, ঐ দেখো সেই গাছটি। ঐ দেখো কৃষ্ণসার মৃগ তোমার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পঞ্চবটী দেখিয়া আজ আমার আনন্দ আর ধরিতেছে না। আমার মনে হয় একদিন মৃগয়ায় ক্লান্ত হইয়া বেতবনে তোমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া ছিলাম, আর গোদাবরীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঐ দেখো অগস্ত্যের আশ্রম। ঐখান হইতে যজ্ঞের ধূম উঠিতেছে, হবির গন্ধ উঠিতেছে, আর আমার মন হালকা হইয়া যাইতেছে। ঐ দেখো শাতকর্ণী মুনির তপোবন। ঐ দেখো সেই পঞ্চাপ্সর নামে হ্রদ। উহার চারিদিকে বন। বোধ হইতেছে যেন মেঘের মাঝখানে চাঁদ। মুনি ঐখানে তপস্যা করিতেন, কুশের অঙ্কুর মাত্র খাইতেন, মৃগের সহিত বেড়াইতেন, ইন্দ্র উহার তপস্যায় ভীত হইয়া পাঁচটি অপ্সরা পাঠাইয়াছিলেন। আর তাহাদের মোহিনীমায়ায় মুনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ হ্রদের মধ্যে অট্টালিকা আছে, এখনও অপ্সরাদের তাহাতে নৃত্যগীত হইতেছে, মৃদঙ্গ বাজিতেছে। সেই শব্দ আকাশে উঠিয়া পুষ্পকরথের উপরঘরে পর্যন্ত প্রতিধ্বনি করিতেছে। ঐ দেখো সুতীক্ষ্ণ মুনি তপস্যা করিতেছেন; চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড, আর মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য। ইন্দ্র শত চেষ্টা করিয়াও ইহার মনের বিকার জন্মাইতে পারেন নাই। ঐ দেখো ঊর্ধ্ববাহু মুনি ডাইন হাত তুলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি মাথা নাড়িয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেন। আমার রথে তাঁহার মুখে ছায়া করিয়াছিল, রথ চলিয়া গেলেই আবার তাঁহার চোখ সূর্যে নিবিষ্ট হইল। ঐ দেখ শরভঙ্গ মুনির আশ্রম। তিনি চিরকাল অগ্নির আরাধন করিয়া শেষ নিজের দেহটি অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। তিনি বড়োই অতিথি ভালোবাসিতেন। তিনি মরিয়াছেন, তাঁহার গাছগুলি এখনো তাঁহার অতিথিদের সৎকার করিতেছে। ঐ দেখো চিত্রকূট। উহার গুহামুখ হইতে ঝম্‌ঝম্ শব্দে নিরন্তর জল পড়িতেছে। উহার শিখরে মেঘ লাগিয়াই আছে, দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন এক ষাঁড় খেপিয়াছে। ঐ দেখো চিত্রকূটের ধারে মন্দাকিনী— দূর হইতে অতি সরু বলিয়া বোধ হইতেছে। উহার জল অতি পরিষ্কার, আর উহার গতি অতি ধীর। দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন পৃথিবীর গলায় মুক্তার মালা। এইখানে সেই তমালগাছের কথা মনে পড়ে? উহারই পাতা লইয়া আমি তোমার কানের গহনা করিয়াছিলাম! ঐ দেখো অত্রির তপোবন। এইখানে অনসূয়া ঋষিদের স্নানের জন্য স্বয়ং গঙ্গাকে

আনাইয়াছিলেন। ঐখানে ঋষিরা বীরাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। গাছের তলায় বেদি, তাহার মধ্যে ঋষিরা ধ্যানস্থ। বোধ হইতেছে যেন গাছগুলাও ধ্যানস্থ। যে শ্যামবটের কাছে পূর্বে আমার প্রতিজ্ঞা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলে, ঐ সেই বটগাছ। উহার ঘন-সবুজ পাতার মধ্যে লাল লাল ছোটো ছোটো ফল হইয়াছে— যেন গরুড়মণির মধ্যে পদ্মরাগরাশি রহিয়াছে। এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম, এখানে গঙ্গার শাদা জলে যমুনার কালো জল মিশিয়া কত খেলা খেলিতেছে। এইখানে একবার স্নান করিলে তত্ত্বজ্ঞান না হইলেও মুক্তি নিশ্চয়। যেখানে আমরা পাগড়ি ফেলিয়া জটা ধরিয়াছিলাম, এই সেই গুহক চণ্ডালের রাজধানী। আমাদের বেশ পরিবর্তন দেখিয়া সমুদ্র এইখানে "কৈকেয়ি এতদিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল" বলিয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া ছিলেন।

রথ আরো খানিক উত্তর মুখে গেলে সরযূ দেখা গেল। রামচন্দ্র বলিলেন;— ইহার জন্মস্থান মানস সরোবর। এই সরোবরে সোনার পদ্ম ফুটে, আর যক্ষিণীরা তাহার রেণু দিয়া আপনাদের স্তনের অঙ্গরাগ করে। ইহারই তীরে অযোধ্যা। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা অশ্বমেধের অবভৃথ স্নান[৩] করিয়া ইহার জল অতিপবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। ইনিই উত্তর কোশলের মাতা। রাজা দশরথ ইঁহাকেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার মাকেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি আসিতেছি শুনিয়া আমার মা যেমন আনন্দিত, ইনিও তেমনি। ঐ দেখো তরঙ্গহস্ত তুলিয়া উনি আমায় যেন আলিঙ্গনই করিত আসিতেছেন। ঐ যে ধুলা উঠিতেছে— বোধ হয় হনুমানের কাছে খবর পাইয়া ভরত আমায় লইতে আসিতেছে।

লঙ্কাদ্বীপ হইতে সারা ভারতবর্ষের— দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত সারা দেশের— এমন চমৎকার বর্ণনা আর নাই। যত বড়ো বড়ো জিনিস, সব দেখানো হইল। পুরাণ কথা সব বলা হইল। পুরানো প্রেমের কাহিনী সব মনে করিয়া দেওয়া হইল। রাম দেখাইলেন, সীতা দেখিলেন, মাঝে মাঝে সীতার উপর রামের প্রেম উথলিয়া পড়িল। এই মিলনই মিলন, চরম মিলন ও পরম মিলন।

নারায়ণ
চৈত্র, ১৩২৫।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. অনুবাদ : তখন শরৎকালের শেষভাগের জ্যোৎস্না ধোয়া রাত্রিগুলিতে বিরহসঞ্চিত যা-কিছু আমাদের অভিলাষ, সব পূর্ণল হবে।

২. অনুবাদ : প্রিয়ার আলিঙ্গন সুখ না থাকলে শরীর কৃশ হয়ে পড়ে।

৩. অনুবাদ : স্বীকার করতেই হবে, প্রিয়াকে সহজে পাওয়া যাবে না, আমার মন কিন্তু তাঁর ভাব-ব্যবহারাদির দর্শনে আশ্বস্ত হয়ে আছে।

৪. অনুবাদ : হে নির্দয়! তোমার হৃদয় আমি জানি না। অনুরাগ কী দিন, কী রাত্রি— সমানভাবে তোমার চিন্তায় নিরত আমার অঙ্গগুলিকে মদন সন্তপ্ত করে তুলছে।

৫. অনুবাদ : হে বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য! আপনি যা শুনলেন, তা ঠিক। এই আমি এক উচ্চস্থান লাভ করতে উন্মুখ। এই তুচ্ছ তপশ্চরণ আমার অভীষ্ট লাভের পথে যথেষ্ট নয়, জানি, তবুও মনোরথের অগম্য কিছু নেই।

৬. পৃ. ৪৭০, সূত্র ২ দ্র.।

রঘুবংশে প্রেম-বিরহ

আগেই বলিয়াছি যে, মহাকাব্যে প্রেমের তিন মূর্তি; পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ। তার মধ্যে রঘুবংশে পূর্বরাগ ও মিলনের কথা বলিয়াছি। প্রেমের যে অন্য অসংখ্য মূর্তি আছে,— মান, কলহ, খণ্ডিত, ঈর্ষা, ইত্যাদি, ইত্যাদি— মহাকাব্যে তাহাদের স্থান নাই; বিশেষত রঘুবংশের মতো মহাকাব্যে তাহাদের স্থান হইতে পারে না। কারণ, সেগুলি পাতলা জিনিস; মহাকাব্যে পাতলা জিনিস জমে না। মহাকাব্যে পূর্বরাগও বড়ো জমে না, কারণ, সেটাও একটু পাতলা-পাতলা। মিলন ও বিরহ বেশ গম্ভীর; বেশ গম্ভীর, তাই জমে। কালিদাস রাম-সীতার মিলন কেমন জমাইয়াছেন, তা আগেই দেখাইয়াছি। দিলীপ-সুদক্ষিণার আর অজ-ইন্দুমতীর মিলনে যত-কিছু ভালো জিনিস ছিল, তার উপর আরো রং ফলাইয়া কবি ত্রয়োদশে রাম-সীতার মিলন দেখাইয়াছেন। কিন্তু সে মিলন শুদ্ধ মিলনের সুখ দেখাইবার জন্য— মিলনের আনন্দ দেখাইবার জন্য—মিলনের উল্লাস দেখাইবার জন্য নহে; তাহার ভিতরে আর-একটি গভীর কথা আছে। সে গভীর কথাটি রাম-সীতার দেবত্ব। তাঁহারা যে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কত উঁচু, সেইটি দেখানোই কবির উদ্দেশ্য।

যে মিলনের আনন্দ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহার আনন্দে সকল জীবজন্তু, এমন-কী, বৃক্ষলতাও আনন্দিত, সে মিলন কি মিলনেই শেষ হইয়া যাইবে? তাহা হইলে কী হইল? তাই কবি এ অপূর্ব মিলন অপূর্ব বিরহে শেষ করিয়াছেন।

আমরা সেই অপূর্ব বিরহের কিছু আভাস দিব। রঘুবংশে কালিদাস দুইবার পুরুষের বিরহ দেখাইয়াছেন— একবার ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের, আর একবার সীতার বনবাসে রামের। আগে রতি-বিলাপের সঙ্গে অজ-বিলাপের তুলনা করিয়া, অজ-বিলাপ যে কত মনোহর দেখাইয়াছি। সেকথা আর তুলিব না। কিন্তু অজ-বিলাপের সঙ্গে রাম-বিলাপ তুলনা করিতে হইবে।

অজ-বিলাপ ১৭টি কবিতায়, সুতরাং খুব সংক্ষেপ। কবির কিন্তু এতটা সংক্ষেপও বেশি বলিয়া মনে হইল। তাই তিনি রামের বিলাপ এক কবিতায় সারিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বনবাসে দিয়া আসিয়া রামকে সেই খবর দিলেন, তখন—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্প-
তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা
ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ।।

[১৪/৮৪]

"শুনিবামাত্রই রামের চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। চারিদিকে হিম পড়িতেছে, মাঝখানে পৌষমাসের চাঁদ যেমন দেখায়, রামের [আকৃতি] তেমনি দেখাইতে লাগিল। তিনি লোক-নিন্দার ভয়ে সীতাকে শুধু বাড়ি হইতেই বিদায় করিয়াছিলেন, মন হইতে তো তাঁহাকে বিদায় দেন নাই।"

বলিতে কী, রামের বিরহ-বর্ণনে একটি পুরা কবিতাও লিখেন নাই, আধখানাতেই শেষ করিয়াছেন— শেষ আধখানা তো বিরহের বর্ণনা নয়, কবির নিজের কথা। এই তো বীরের বিরহ! এই তো মহাকাব্যের বিরহ! যিনি মহাকাব্যের নায়ক, বিশেষ যিনি রঘুবংশের মতো বড়ো মহাকাব্যের নায়ক, তাহার বিরহ ইহা অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নয়। কবি সেটি বেশ বুঝিয়াছিলেন, পরের কবিতাটিতে একটু টিপ্পনীও করিয়াছেন —

"নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্
বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।
স ভ্রাতৃসাধারণভোগমৃদ্ধং
রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস।।"

[১৪/৮৫]

"তিনি মনের শোক মনে মিটাইলেন; বর্ণাশ্রম-রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক রহিলেন; তাঁহার মনে রজোগুণের লেশমাত্র রহিল না; এত বড়ো রাজ্য ভাইদের সঙ্গে একত্রে ভোগ করিতে লাগিলেন।"

অজ-রাজা শোকে অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বশিষ্টদেব আপনার প্রধান ছাত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও শাস্ত্রের সার কথাগুলি বুঝাইয়া দিয়া রাজাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অজ-রাজার মন কিন্তু প্রবোধ মানে নাই। অশ্বত্থের শিকড় যেমন বড়ো বড়ো অট্টালিকার ভিতর চলিয়া গিয়া

তাহাকে ভাঙিয়া ফেলে, শোকও তেমনি রাজার মনের ভিতর শিকড় গাড়িল ও আট বৎসরের মধ্যেই তাঁহার জীবন শেষ করিয়া দিল। এই আট বৎসর যে তিনি বাঁচিয়াছিলেন, সে শুধু কর্তব্য বলিয়া, ছেলেটি নাবালক বলিয়া। রামকে কেহই প্রবোধ দিল না, তিনি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিলেন, 'স্বয়মেব' শোক সংবরণ করিলেন, এবং সাবধান হইয়া রাজধর্মপালনে মন দিলেন। কোনো বিষয়েই তাঁহার আর আসক্তি রহিল না। তিনি নির্লিপ্ত-নির্বিকারচিত্তে আপনার কার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অজ-রাজার শোক গাঢ় ও গভীর, রামের শোক গাঢ়তর, গভীরতর, কিন্তু তাহাতে একেবারে উচ্ছ্বাস নাই। ইহাতেই রামের মহত্ত্ব, ইহাতেই রামের দেবত্ব।

রাম ও সীতা দুজনের মিলন কবি ত্রয়োদশে বর্ণনা করিয়াছেন, চতুর্দশে দুজনের বিচ্ছেদ হইল। বিচ্ছেদের পর একজনের অবস্থা দেখাইলাম, কিন্তু সীতার কী হইল? এ তো ইন্দুমতীর মতো মৃত্যুর জন্য বিচ্ছেদ নহে, এ যে লোকনিন্দার জন্য বিচ্ছেদ। সে লোকনিন্দায় লজ্জা কাহার? সীতার। সুতরাং সীতার বিচ্ছেদ শুধু বিচ্ছেদ নয়, এ যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের কাছে সীতাকে লইয়া গিয়া, রাজার আদেশ শুনাইয়া দিলেন, বলিলেন, "রাজা তোমায় চিরকালের জন্য বনবাস দিয়াছেন," তখন সীতা মূর্ছিত হইয়া মায়ের—পৃথিবীর কোলে পড়িলেন। পৃথিবীও যেন লোকলজ্জাভয়ে তাঁহাকে কোলে স্থান দিলেন না। লক্ষ্মণের যত্নে আবার তাঁহার চৈতন্য হইল। রাজা নিরপরাধে তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন জানিয়াও তিনি তাঁহার কোনো দোষ দেখিলেন না, কেবল আপনার অদৃষ্টের দোষ দিলেন।

লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমের পথ দেখাইয়া দিয়া প্রণাম করিলেন ও প্রণামের পর বিদায় চাহিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, শ্বশুরবাড়ির সম্বন্ধ এইখানেই শেষ। তিনি বলিলেন,—

"আমি আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। তুমি তো তোমার দাদার আজ্ঞাকারী মাত্র। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তুমি তাই করিয়াছ। ইহাতে তোমার দোষ কী? তুমি শাশুড়িদের আমার প্রণাম জানাইও, এবং প্রত্যেককে বলিবে, তাঁহারা যেন স্বতঃপরতঃ আমার গর্ভে যে সন্তান আছে, তাহার মঙ্গলকামনা করেন। রাজাকে বলিও, আমি তো তাঁহার সম্মুখেই অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছিলাম, তবুও তিনি যে লোকনিন্দার ভয়ে আমাকে ত্যাগ করিলেন, এটি কি তাঁহার বংশের মতো কার্য হইয়াছে, না বিদ্যার মতো কার্য হইয়াছে?"

"অথবা তুমিও তো কাহারো মন্দ চাহ না। তবে যে তুমি আমার প্রতি এই

ব্যবহার করিলে, ইহা আমারই পূর্ব-জন্মের পাপের ফল। পূর্বে রাজ্যলক্ষ্মী উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, তাই বুঝি এখন লক্ষ্মী, আমি যে তোমার ঘরে থাকি, সেটা সহ্য করিতে পারিলেন না। যখন বনে থাকিতাম, রাক্ষসেরা তপস্বীদের উপর অত্যাচার করিলে, তপস্বিনীরা আসিয়া আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিত। সে তো তোমারই অনুগ্রহ। বলো দেখি, এখন তুমি বর্তমান থাকিতেও আমি কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব? তুমি তো আমায় একেবারে ত্যাগ করিয়াছ। আমার জীবনে আর প্রয়োজন কী? আমি এ পোড়া জীবন উপেক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে যে বিষম বিঘ্ন। তোমার তেজ যে আমার গর্ভস্থ রহিয়াছে, তাহাকে তো আমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমার ছেলে হলে পর, আমি সূর্যের দিকে চাহিয়া তপ করিব, যেন জন্মজন্মান্তরে তুমি আমার স্বামী হও, কিন্তু এমন বিচ্ছেদ যেন আর না হয়। বর্ণাশ্রমপালনই রাজার ধর্ম। আমাকে যদিও বনে দিয়াছ, যদিও আমাকে তপস্বিনী করিয়াছ, তবুও অন্য তপস্বিনীদের যেমন দেখ, আমাকেও তেমনি দেখিও।"

সীতার বিলাপ সবে আটটি কবিতায়, অজ-বিলাপের অর্ধেক মাত্র, কিন্তু এই আটটি কবিতায় যাহা আছে তাহার তুলনা নাই। এই আটটি কবিতায় সীতার অগাধ পতিভক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কাহাকেও ভুলিয়া যান নাই। তিনি লক্ষ্মণকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন, শাশুড়িদের কাছে ছেলের জন্য প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ চাহিয়াছেন। একটি কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, যাহাতে রামের উপর একটু কটাক্ষ ছিল— "আমাকে ত্যাগ করা কি তোমার বংশের মতো হইয়াছে, না তোমার বিদ্যার মতো কার্য হইয়াছে?" বলিয়াই অমনি তিনি সামলাইয়া লইলেন— "তুমি তো কখনো কাহারো মন্দ ভাবো না, মন্দ করো না। তুমি যে ইচ্ছা করিয়া আমার মন্দ করিলে, ইহা আমি মনেও স্থান দিতে পারি না। সকলই আমার অদৃষ্ট!" তিনি তপস্যা করিয়া দিন কাটাইয়া দিবেন, সে তপস্যার উদ্দেশ্য পুনর্জন্মে রামের সহিত মিলন, যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই।

তাঁহার বড়ো আনন্দ যে, রাম তাঁহাকে বনবাসে দিয়াও ভুলিতে পারিবেন না। কেন-না, অন্য তপস্বিনীদের মতো তাঁহাকেও তো রাজা দেখিবেন।

নারায়ণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।।

নাট্যকলা

ভারতচন্দ্রে পড়িয়াছিলাম —

"চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।।"

আমাদের দেশে চৌষট্টিটা কলা ছিল, শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। কলা বলিতে বুঝায় সূক্ষ্মশিল্প— কারিগরি বাহাদুরি দেখানো। লোকে চৌষট্টি উপায়ে আপনার বাহাদুরি দেখাইয়া দেশের লোককে খুশি করিতে পারিত— এ বড়ো সোজা কথা নয়। চৌষট্টি কলা কী, জানিবার জন্য বড়ো আগ্রহ হইল। নানা জায়গায় চৌষট্টি কলা খুঁজিতে লাগিলাম; অনেক জায়গায় চৌষট্টির ফর্দ মিলিল, কিন্তু একটি ফর্দ আর-একটির সঙ্গে মিলে না। শেষে একজন গ্রন্থকার বলিয়া দিলেন, চৌষট্টি তো মূল কলা মাত্র, ঐরূপ আট সেট চৌষট্টি কলা আছে। মনে মনে বুঝিলাম, ৫১২টি কলা সবসুদ্ধ আছে। আরো খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, টীকাকার আরো ছয়টি ফাউ দিয়া কলার নম্বর করিয়াছেন, ৫১৮টি। প্রথম চৌষট্টি শুনিয়াই আশ্চর্য হইয়াছিলাম। যখন পড়িয়া দেখিলাম, ৫১৮ রকম কলা আছে, তখন যে কত আশ্চর্য হইলাম, বলিতে পারি না। আর যে দেশে ৫১৮টি কলা থাকিতে পারে, সে দেশের লোকের যে কতটা স্ফূর্তি ছিল, তাহাও পরিমাণ করা যায় না।

কারণ, কলার চর্চা কখন হয়? মানুষ জন্মিয়া অবধি চারিটি জিনিস শিখে, আপনা আপনি শিখে, গুরুমহাশয়ের তাড়না না খাইয়াই শিখে, স্কুলে না যাইয়াই শিখে। সে চারিটি জিনিসের প্রথম হইতেছে আত্মরক্ষা। কিসে বাহিরের কেহ আমাকে মারিতে ধরিতে বা বধ না করিতে পারে, এটা ছেলেরাও আপনা আপনি

শিখে। তাহার পর উদরের চিন্তা। কেমন করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে— ইহার জন্য স্কুল-মাস্টারের বড়ো একটা দরকার হয় না। তাহার পর দল বাঁধিয়া সমাজ বাঁধিয়া থাকা। মানুষ একা থাকিতে পারে না। পাঁচজনের সঙ্গে বসা দাঁড়ানো তার চাই; নহিলে সে হাঁপাইয়া উঠে। তাহার পর বংশরক্ষা,— ন্যায়রক্ষা, গোত্ররক্ষা, ধর্মরক্ষা। এই সবগুলি হইয়া গেলে তাহার পর তো স্ফূর্তি, তাহার পর তো আনন্দ। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে তফাতে থাকিয়া, কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া, আর-সব ভুলিয়া তবে তো আনন্দ। সেই আনন্দের জন্য কলা। আগে যে চারিটির কথা বলিলাম, সে তো সব প্রাণীই যেমন করে, মানুষও তেমনই করে— অসভ্য জঙলিরাও করে, সভ্য নগরবাসীরাও করে। তবে নগরবাসীদের বিশেষ এই যে, তাহারা কলাবিদ্যায় প্রবীণ হয়, কেহ-বা আপনাদের বাহাদুরি দেখাইয়া আমোদ করে, কেহ-বা পরের বাহাদুরি দেখিয়া আমোদ করে। মানুষের মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহারা কলার সঙ্গে সঙ্গে এক এক ডোজ উপদেশ দিতে আরম্ভ করে। যে কলায় না থাকে, সে যদি উপদেশ দিতে যায়, ধরা পড়িয়া যায়। আর ধরা পড়িলে কলারও আমোদ হয় না, উপদেশেও কোনো কাজ হয় না। কিন্তু কলায় থাকিলে, যখন কাহারো লোককে তন্ময় করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন একটু আধটু মৃদু মন্দ উপদেশ দিলে তাহাতে বড়োই বেশি কাজ হয়। লোকে মনে করে, আমরা আমোদ করিতেছি, আনন্দে ভোর হইয়া আছি, অথচ ভিতরে ভিতরে তাহাদের মন ফিরিয়া যায়; শরীরে যেসব দোষ থাকে, সেসব আস্তে আস্তে সরিয়া যায়। মনটি নরম করিবার ক্ষমতা যাহাদের হাতে থাকে, তাহারা সে মনকে যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপে ফিরাইতে পারে। কুমোর আগে মাটি নরম করিয়া লয়, তাহার পর সে মাটিতে হাঁড়ি গড়ে, কলসি গড়ে, মালসা গড়ে, আবার দরকার হইলে দুর্গা গড়ে, কালীও গড়ে, কৃষ্ণ গড়ে, রাম গড়ে, আরো কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস গড়ে। কিন্তু মাটিটা প্রথম ছানা চাই, নহিলে কিছুই হয় না। মাটি শক্ত থাকিলে বা মাটির ভিতর কাঁকর বা খোলা থাকিলে তাহা দিয়া কিছুই গড়া যায় না।

যাহারা কলাবিৎ বা কলাবৎ, তাহারা মন নরম করে। কিন্তু কী দিয়া নরম করে? মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, ইহার একটি-না-একটি অবলম্বন করিয়া মনের ভিতর প্রবেশ করে। কেহ-বা চক্ষু আশ্রয় করে, কেহ-বা কর্ণ আশ্রয় করে,

কেহ্-বা জিহ্বা আশ্রয় করে, কেহ্-বা নাসিকা আশ্রয় করে, কেহ্-বা ত্বক্ আশ্রয় করে। যাঁহারা ছবি আঁকেন, তাঁহারা চক্ষুকে আশ্রয় করেন, আগে চক্ষুকে তন্ময় করিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করেন, মনকেও তন্ময় করিয়া আত্মাকে পরম সুখে নিমজ্জিত করেন। যাঁহারা গান করেন, তাঁহারা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেন ও প্রাণ আকুল করিয়া দেন। যাঁহারা চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় তৈয়ারি করেন, তাঁহারা জিহ্বাকে আশ্রয় করিয়া, মনকে তন্ময় করিয়া আত্মার তৃপ্তি করেন। যাঁহারা "গন্ধযুক্তি" বা পাঁচ রকম গন্ধ এক করিয়া নাসিকাযোগে মনোহরণ করেন, তাঁহাদের কলাও বড়ো সামান্য নয়। যাঁহারা ফুলশয্যা করেন, "সংবাহন" বা গা-হাত টিপেন, তাঁহারা ত্বককে আশ্রয় করিয়া মনকে অভিভূত করেন, তাঁহাদের বিদ্যাও বড়ো সামান্য বিদ্যা নয়। ঐরূপে চৌষট্টি বলো বা পাঁচশো আঠারোই বলো, কলাগুলি একটি-না-একটি ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া মন কোমল করে ও আত্মার তর্পণ করে।

এই-সকল কলার মধ্যে নাট্যকলাটি একটি প্রধান কলা। ইহা চক্ষু ও কর্ণ এই দুইটি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিতে পারে। সুতরাং ইহা মনকে অধিক পরিমাণে তন্ময় করিতে পারে এবং আত্মাকেও পরমসুখের আস্বাদ দিতে পারে। তাই যেসব দেশে নাটক আছে, থিয়েটার আছে, সেসব দেশেই, সকল কলার মধ্যে নাটকেরই আদর বেশি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন জায়গা অনেক আছে, যাহারা নাটকের মর্ম বুঝিতেই পারে না। তাহারা থিয়েটারের চেয়ে ষাঁড়ের লড়াই, কুঁকুড়ার লড়াই দেখিতে ভালোবাসে। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও।

অনেক সভ্য দেশেই নাটক আছে, আমাদের দেশেও ছিল, বোধ হয়, সকলের আগেই ছিল। কারণ, আমাদের দেশে একটা শাস্ত্র আছে, তাহার নাম নাট্যশাস্ত্র। তাহা আর-কোনো দেশেই নাই। নাট্যশাস্ত্রেরও আগে আর-একটা জিনিস ছিল, তাহার নাম নাট্যসূত্র। আমাদের ভারতের সেকালের দস্তুর এই যে, আগে সূত্র হয়, তারপর শাস্ত্র হয়। পাণিনি দু-খানা নট-সূত্রের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তাহার আগেও নট ছিল, নাটক ছিল এবং নাটকের সূত্র ছিল। অনেক নাটক না হইলে তার জন্য সূত্র লেখা দরকার হয় না। সুতরাং সূত্রগুলা হবার পূর্বেই দেশে অনেক নাটক হইয়াছিল এবং অনেক নটও হইয়াছিল। কত পূর্বে জানি না, কিন্তু অনেক আগে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, নাট্যশাস্ত্রে লেখে, দেবতারা যখন অসুরদের

হারাইয়া দিলেন, তখন একটু স্ফূর্তি করিবার জন্য তাঁহারা ধ্বজা গাড়িলেন। তার নাম ইন্দ্রধ্বজ। আর সেই ধ্বজার তলায় বসিয়া কেমন করিয়া অসুরদের হারাইয়াছিলেন, তাহাই দেখাইলেন। একদল দেবতা সাজিলেন, একদল অসুর সাজিলেন; কেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, অসুররা কেমন হার হারিয়াছিল— সেইসব দেখাইলেন। অসুররা ভারি চটিয়া গেল। তাহারা বলিল, "আমরা হেরেছি, তাই বলে আমাদের ভেঙচানো কেন? মার দেবতাদের।" তারা দেবতাদের নাটক ভেঙে দিতে এল। ইন্দ্রের হাতে ছিল একটা বাঁশ; তাতে ছিল সাতটা পাব। তিনি তাদের এমন ঠেঙালেন যে, উপরের পাবটা থেতলে গেল। অসুররা পলাইল। ইন্দ্র বলিলেন, "এই যে এক পাব থেঁতলান বাঁশ, এইটাই নাটকের দেবতা হল।" তারপর দেবতারা ব্রহ্মাকে ডেকে নাটক দেখালেন, বিষ্ণুকে ডেকে সমুদ্রমন্থন নাটক দেখালেন, আর শিবকে ডেকে ত্রিপুরদাহ নাটক দেখালেন। সব দেবতারা খুশি হয়ে যার যা ভালো জিনিসটি ছিল, সব দেবতাদের দিয়া দিলেন। কেবল মহাদেব বলিলেন— "তোমাদের সব জিনিসই বেশ হয়েছে, তোমাদের একটা জিনিস নাই। সেটা হচ্ছে নাচ। আমি আমার ওস্তাদ তণ্ডুমুনিকে ডেকে দিই, তোমরা তাঁর কাছে নাচ শিখ।" সেই অবধি নাটকে নাচ এল। এই তো আমাদের নাটক উৎপত্তির গল্প।

ইহার মানে বড়ো গভীর। দেব-অসুরের যুদ্ধ মানে বর্ষা ও শরতের যুদ্ধ, শীত ও বসন্তের যুদ্ধ। অনেক দেশে আবার শীত ও বর্ষা একই সময়ে হয়। তাই যখন বর্ষা গিয়ে শরৎ আসে, লোকে তখন খুব আমোদ করে। বন হতে একটা বড়ো গাছ কেটে নিয়ে আসে, সেটা গাঁয়ের মাঝখানে পুতে সেটাকে নানা রকমে সাজায়, এবং তার তলায় বসে ছেলে বুড়ো সব নাচে গায়, খুব আমোদ করে। যেসব দেশে বর্ষা বা শীতের প্রকোপ খুব বেশি, সেসব দেশেই এ উৎসবটা হয়ে থাকে। আগে খুব জমাট রকম হত, এখন সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটা কমে গিয়ে কেবল সাধারণ লোকের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশে ইন্দ্রের ধ্বজা শরৎকালের প্রথমেই সব জায়গায় উঠিত। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ইন্দ্রের পূজা ও ইন্দ্রের ধ্বজা বন্ধ করিয়া দেন। নেপালে এখনো ইন্দ্রযাত্রা হয়, ধ্বজা গড়া হয় না, কিন্তু ইন্দ্র একটা হাত খুব উচ্চ করিয়া রাখেন। মহীশূরে শুনিয়াছি, এখনো ইন্দ্রের ধ্বজা গড়া হয়।

তাই বলিতেছিলাম, যখন ইন্দ্রধ্বজার সঙ্গে নাটকের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তখন নাটক আমাদের দেশে খুবই পুরানো। আমরা অন্য জাতির কাছ থেকে ইহা পাইয়াছি, একথা একেবারেই সত্য নয়। সংসারে যত কিছু জিনিসের দরকার হয়, নাটকে সেসব দরকার হয়। শাস্ত্রকার একথা অনেককাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং আমাদের নাটক যেটা, তা সত্য সত্যই নাটক ছিল— একটা ছোটোখাটো সংসার ছিল। ছোটোখাটো হইলেও সংসারের সব জিনিসই তাহাতে আছে। তাই দেবতারা যার যা ভালো জিনিস ছিল, সব নটেদের দিয়া দিয়াছিলেন। আরো একটা কথা। এসব তো বাহিরের জিনিস— হাঁড়ি, কলসি, কুলা, ধুচুনি, খাটপাট— ভিতরের জিনিসের কথাও বলি। আমাদের বিশ্বাস, এখনকার অলংকারে বলে, ৯টা বৈ রস নাই। ৯টা বৈ স্থায়ী ভাব নাই, ৩৩টা বৈ ব্যভিচারী ভাব নাই, ৮টি বৈ সাত্ত্বিক ভাব নাই। কিন্তু সেকালের শাস্ত্রকাররা বলিতেন— ভাব অনন্ত। কত ভাব যে আছে, তার সংখ্যাও নাই, সীমাও নাই। সেইটাই সত্য কথা। তবে ৫০টা বলে এত আঁটাআঁটি কেন? ছেলেদের বুঝাবার জন্য, স্কুল-বইএর জন্য। আমাদের ইদানীংকার বইগুলি সবই পঠন-পাঠনের জন্য হইয়াছে— কেমন করিয়া ৯টা রস হইল, কেমন করিয়া ৯টা স্থায়ী ভাব হইল, সেকথা তাঁহারা একেবারেই বলিলেন না। কিন্তু পুরানো বই পড়িলে সে ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যায়, এবং পেলে বুঝা যায় যে, দু-তিন হাজার বৎসর পূর্বেও আমাদের মুনিরা নাটককে কত বড়ো করিয়া তুলিয়াছিলেন। মনের যত রকম ভাব আছে, সবই নাটকে থাকিবে। সংসারের যত রকম জিনিস আছে, সবই নাটকে থাকিবে। সুতরাং আমাদের নাটক একরূপ বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, নাটককে বরং ছাঁটিয়া কাটিয়া ছোটো করা হইতে লাগিল, মাজিয়া ঘসিয়া বরং পরিষ্কার করা হইতে লাগিল, কিন্তু উহার বিস্তার কমিতে লাগিল। অলংকারের মতে তো অনেক জিনিস নাটকে তুলিতেই নাই— খাওয়া, ঘুমান, যুদ্ধ, মারামারি, মৃত্যু, এমন-কি, চুমা খাওয়া পর্যন্ত নাটকে দেখাইতে নাই। লোক যত সভ্য হইতে লাগিল, কাটা-ছাঁটা তত বাড়িতে লাগিল। তা বাড়ুক— কিন্তু কাটা-ছাঁটা বাদে নাটক পূর্বেও যেমন বিশ্বব্যাপী ছিল, এখনো সেই প্রকারই আছে।

এই যে বিশ্বব্যাপী নাটক, এ কখনো বন্ধ হয় নাই। থিয়েটার আমাদের দেশে যে কখনো বন্ধ হইয়াছিল, তা বলে তো বোধ হয় না। নট বলে এক জাতি বরাবরই

ছিল, তারা নাটক করিত ও লিখিত। খুব সেকালে নাটক দশ রকম বৈ ছিল না। কিন্তু ভারতের যখন বড়োই দুর্দিন, তখনই আমরা নাটিকা নামে একটা জিনিস পাই; সে আবার আঠারো রকম। সব রকমের বই পাওয়া যায় না। কিন্তু যতই খোঁজ হইতেছে, ততই বেশি বেশি রকমের নাটক পাওয়া যাইতেছে। ভরসা আছে, ভালোরূপ খুঁজিতে পারিলে, আটাইশ রকমের নাটকই পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথম প্রথম ইন্দ্রধ্বজার তলায় তো নাটকই হইত, তার পর খোলা জায়গায় হইত, তার পর দেবতাদের মন্দিরের সামনে নাটমন্দির হইতে লাগিল— নাটমন্দিরের মাপ ১০৮ হাত। কেন ১০৮ হাত হল, এর চেয়ে বড়ো হইল না? এর চেয়ে বড়ো হলে শুনাও যায় না, দেখাও যায় না। এই ১০৮ হাতেই শুনার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হইত। তাই নিয়ম হইয়াছিল, দেবমন্দিরের সামনে নাটমন্দির বিকৃষ্ট হইবে অর্থাৎ ডিম্বাকার হইবে। ডিম্বাকার হইলে শব্দটা গমগম করে না; সব জায়গা থেকেই শুনা যায়। রাজার বাড়ির নাট্যশালা ৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল হইবে। আর সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ির নাট্যাগার ত্রিভুজ হইবে। প্রত্যেক ভুজের মাপ ৩২ হাত।

কিন্তু যখন পরহস্তগত হইয়া ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়া গেল, তখন আর পয়সা খরচ করিয়া এত বড়ো থিয়েটার-ঘর করা সহজ হইল না। সুতরাং খোলা জায়গায় আবার নাটক হইতে লাগিল। নাটক করার প্রবৃত্তি তো ঘুচিল না। চৈতন্যের সময় শ্রীবাসের আঙিনায় নাটক হইত। কিন্তু সে নাটক বিশ্বব্যাপী নয়, সেখানে কেবল নারায়ণের কথা লইয়াই নাটক হইত। শ্রীবাসের আঙিনায় একটা প্রকাণ্ড কুঁদফুলের ঝাড় ছিল। বৈষ্ণবরা সকলে সাজি হাতে সেইখানে ফুল তুলিতে আসিত। নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া ফুল তুলা হইত, সাজিতে ফুল রাখা হইত আর কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইত। চৈতন্যদেব ভগবানের কাচ করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে যাহার যে কাচ ভালো লাগিত, সে সেই কাচ করিত। কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতে করিতে তাঁহারা এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সময়ে সময়ে সপ্তপ্রহরী অষ্টপ্রহরী অভিনয় হইত। চৈতন্যদেব এমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন যে, প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইত, তবুও তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে, তিনি মানুষ, তিনি শচীনন্দন, তিনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তিনি নারায়ণের যে অবতার সাজিতেন, মনে করিতেন, তিনি ঠিক সেই অবতার এবং সেই ভাবেই লীলা করিতেন।[১]

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম, সবই সংস্কৃত নাটকের কথা। চৈতন্যদেব তন্ময় অবস্থায় বাংলা ভাষায় কথা কহিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার দলের যেসব নাটক আছে, সবই সংস্কৃতে লেখা। দক্ষিণদেশে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এখনো ভাসের নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে এখনো গীতগোবিন্দের অভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রমে সংস্কৃত আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ভাষা নাটক আরম্ভ হইল।

বাংলা নাটক যে কবে আরম্ভ হইল, এখনো তাহার খোঁজ হয় নাই। কিন্তু একথা ঠিক, যে, বাংলায় খোলা জায়গায় কতকটা যাত্রার মতন, কতকটা থিয়েটারের মতন একটা কিছু হত। তাহার প্রমাণ এই যে, কতকগুলি বাঙালি পণ্ডিত ২০০ বৎসর আগে নেপালে গিয়া ভূপতি মল্ল ও রাজিত [রণজিৎ] মল্লের দরবারে খুব পসার করিয়াছিলেন।[২] তাঁহারা সেখানে নাটক করিতেন। অনেকে মুনি-ঋষি, সেকালের রাজা-রাজড়া, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সাজিয়া আসিত, পরস্পর কথাবার্তা কহিত এবং রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাইত। তাই মনে হয়, তখন বাংলায়ও এইরূপই নাটক ছিল, বাঙলিরা তাই নেপালে গিয়া চালাইলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও ভাষায় নাটক লেখা হইত। সাহাজানের সময় একজন জৈন 'সময়সার' নামে একখানি নাটক হিন্দিতে লিখিয়াছিলেন। [ক্রমশঃ]

মাসিক বসুমতী
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. শ্রীচৈতন্যের অভিনয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' মধ্যম খণ্ড, নবম অধ্যায়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যে শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর চার অন্তরঙ্গ পার্ষদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসকে নিয়ে পঞ্চতত্ত্ব। এই শ্রীবাসের আঙিনায় কীর্তনের আয়োজন হত চৈতন্যের ভাবান্তরের অনেক আগে থেকে, ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষান্তে, কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর চৈতন্য শ্রীবাসের আঙিনায় কীর্তনে যোগ দিতে শুরু করেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর বিবরণ অনুযায়ী এখানে তিনি একবার বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। বৃন্দাবনদাস লেখেন,

অন্যঅন্য দিন প্রভু নাচে দাস্য ভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুন ভাঁগে।।
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ-দিন নাচিতে
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে।।

বিষ্ণুর ভূমিকা নিয়ে এই অভিনয়ে বিভোর চৈতন্য সময় জ্ঞান হারালেন।

এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল।।

রাত গড়িয়ে চলল। গভীর রাতে ডেকে আনা হল 'খোলা বেচা' শ্রীধরকে। এমনি ভাবে প্রহরের পর প্রহর চৈতন্য বিষ্ণুর ভূমিকায় ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন।

২. নেপালে নাট্যচর্চার তথ্য প্রথম সিসিল বেন্ডল Cecil Bendall (১৮৫৬-১৯০৬) তাঁর *Catalogue of the Buddhist Sanskrit*

Manuscripts in the University Library, Cambridge (1883)-এ উল্লেখ করেন। বেন্ডলের ইঙ্গিত অনুসরণ করে হরপ্রসাদ নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে কাজ করতে যান চারবার ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭ এবং ১৯২২-এ। তাঁর অনুসন্ধানের বিস্তারিত বিবরণ দুটি খণ্ডে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন : ১৯০৫ এবং ১৯১৫-য়। *CATALOGUE/ OF/ PALM-LEAF & SELECTED PAPER MSS/ BELONGING TO THE DURBAR LIBRARY,* Nepal — প্রথম খণ্ড (Notices of Sanskrit Mss, Extra Number, issued in 1905)।

মিথিলার শেষ স্বাধীন রাজা হরিসিংহদেব মুসলমান আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে, ১২৪৫ শকে (১৩২৩-২৪ খৃ.) নেপালে চলে যান এবং সেখানে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রে নেপালের সঙ্গে মিথিলা ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড় হয়। হরিসিংহদেবের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশের মেয়ে রাজল্ল দেবীর সঙ্গে নেপালের প্রাচীন মল্লবংশের জয়স্থিতিমল্লের বিয়ে হয়। জয়স্থিতি নেপালের রাজা হন। তাঁর আমলে (১৩৮০-৯৪ খৃ.) বাংলা-মিথিলার সঙ্গে সম্পর্ক আরো দৃঢ় ভিত্তি পায়। তাঁর উৎসাহে বিশেষ ভাবে নেপালে নাট্যচর্চার সূচনা, এই ধারা চলে রাজা রণজিৎমল্লর সময় অবধি (১৭২২ খৃ.)। শুরুতে নাটক লেখা হত সংস্কৃতে এবং সে নাটক উৎসব অনুষ্ঠানে অভিনয় হত। আদি সংস্কৃত নাটক ধর্মগুপ্তর লেখা রামাঙ্ক (১৩৬০ খৃ.)। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মিথিলা-বাংলার বিদ্যাপতি-জয়দেব প্রভাবিত নতুন রুচির হাওয়া নেপালে পৌঁছয়, নেপালেও সংস্কৃতের বদলে ভাষানাটক চর্চায় উৎসাহ জাগে। নেপালের স্থানীয় ভাষা নেওয়ারিতে নয়, সাহিত্যে ব্যবহার হতে থাকে প্রাচীন মৈথিলি, প্রাচীন বাংলার মতো ভাষা। সমাজের উঁচু স্তরের কর্তৃ-পুরুষেরা সবই মিথিলা থেকে, কেউ-বা বাংলা থেকে গিয়েছিলেন। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাষায় মৈথিলি-বাংলা অধিপত্য বহুদিন চলে। জয়স্থিতির বংশধর যক্ষমল্ল ১৪৯৬ খৃস্টাব্দে নিজের রাজ্য তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেন। তিনটি রাজধানী হয়— কাঠমন্ডু,

ভাতগাঁও আর বনেপা। ভাতগাঁও রাজ্যেই নাটকের চর্চা বেশি হত। এই রাজত্বে ভূপতীমল্ল ১৬৯৫-১৭২২ খৃ. তিরিশ বৎসর রাজা ছিলেন, তাঁর পরে মল্লবংশের শেষ রাজা রণজিৎমল্ল ১৭২২ থেকে দীর্ঘ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রচুর নাটকের পুথি নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে সঞ্চিত আছে। ভূপতীন্দ্রের নামে 'মাধবানল', 'রুক্মিণী পরিণয়', 'বিদ্যাবিলাপ', 'মহাভারত'— এইসব নাটক পাওয়া যায়। রণজিৎমল্লের নামে পাওয়া যায় 'রামচরিত্র', 'মাধবকামকন্দলা', 'উষাহরণ' নাটক, 'রামায়ণ' নাটক প্রভৃতি। এসব নাটক রাজাদের রচনা না হতেও পারে। লেখকেরা পোষ্টা রাজার নামে ভণিতা দিতেন মনে করা হয়। দ্র. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, "নেপালে ভাষানাটক" সা-প-প, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বিদ্যাপতি গোষ্ঠী ও গীতিত্রিংশতিকা, বর্ধমান ১৩৫৪, ৭ ও ৯ পরিচ্ছেদ; ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১৩৫৪ ব, Kumar Gangananda Sinha, "On Some Maithili Dramas of the Seventeenth and Eighteenth Centuries", *Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, Vol.XX, 1924, No.1, 73-78; বিজিতকুমার দত্ত, প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলী নাটক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০; Tarapada Mukherjee, Gopichandra Natak, University of Calcutta 1970.

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ছাপা হইয়াছে। ইংরেজি ১৮৯৪ সালে কাব্যমালায় ছাপা হইয়াছে। [কাব্যমালা গ্রন্থমালার ৪২ সংখ্যক, সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র] আর ১৯২৬ সালে গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে [No. 26] ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহা চার খণ্ডে পুরা হইবে, একখণ্ড মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার সহিত অভিনবগুপ্তের[১] টীকা আছে এবং ১০৮ রকম নাচের মধ্যে ৯৮ রকম নাচের ছবি আছে। চৌখাম্বা হইতেও ইহার আর-এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কাব্যমালার সংস্করণের সম্পাদক ২খানি মাত্র পুথি পাইয়াছেন, তাহাতে অনেক পাঠ ছিল না; অনেক জায়গায় পোকায় খাওয়া ছিল। সে-সকল বাদ দিয়া তাঁহাকে ছাপাইতে হইয়াছে। গাইকোয়াড়ের বই পুথি দেখিয়া ছাপা হইতেছে। তাহার সঙ্গে টীকার পাঠও আছে। চৌখাম্বায় মূল মাত্র, কিন্তু সে মূল কাব্যমালার মূল অপেক্ষা অনেক ভালো।

ভরত-নাট্যশাস্ত্র বাহির হওয়া অবধি অনেকেই এই নাট্যশাস্ত্র পড়িতে ছিলেন এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুরাপুরি বুঝা অসম্ভব ছিল। কারণ, কাব্যমালার নাট্যশাস্ত্রের পাঠই ঠিক হয় নাই, আর যেখানে ১০৮টা লক্ষণ থাকিবার কথা সেখানে হয়তো ৯৫টি বৈ নাই। সে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। নেপালের একখানি হাতের লেখা পুথির সহিত কাব্যমালার পাঠ মিলাইতে গিয়া আমি দেখি প্রায় ১০ অংশের এক অংশ নাই। গাইকোয়াড়ের নাট্যশাস্ত্র বাহির হওয়ায় বুঝিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। পাঠের সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। টীকাও ভালো। কিন্তু টীকা অভিনবগুপ্তের লেখা, বড়ো গাঢ়। [টীকার নাম ভরত-নাট্যবেদ বিবৃতি] কিন্তু সে তো ৭ অধ্যায় বৈ বাহির হয় নাই। বাহির হইবার জন্য লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। তাহার উপর আবার রামচন্দ্র কবি সম্পাদক লিখিয়াছেন, শেষ ভাগ যখন বাহির হইবে তখন

ইংরেজিতে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা লিখিবেন। তাহাতে আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র কবি কী করিবেন না করিবেন, আমরা এখনো জানি না। কিন্তু তিনি ১ম ভাগের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া নাট্যশাস্ত্রে মজিয়া আছেন। তিনি যে একটা খুব চমৎকার জিনিস লিখিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বই বাহির হইতে এখনো বোধ হয় আট বছর লাগিবে। এই আট বছরের জন্য পাঠকদিগের কতকটা তৃপ্তি যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি আজ ভরত-নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলিব।

ম্যাক্সমূলর[২] সাহেব বলিয়া গিয়াছেন বেদের পুথিগুলি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ছান্দস, দ্বিতীয় মন্ত্র, তৃতীয় ব্রাহ্মণ, চতুর্থ সূত্র। এ-চারি শ্রেণীরই লিখিবার ভঙ্গি স্বতন্ত্র, রীতি স্বতন্ত্র, বিষয় স্বতন্ত্র, আরম্ভ স্বতন্ত্র, শেষ স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে শেষ শ্রেণী সূত্র। বেদের সূত্রগুলি গদ্যে লেখা। আমাদের এখনকার সূত্রের মতন অত ঠাস গাঁথুনি নয়। সূত্রকার যদি আধটি অক্ষর কমাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি পুত্র-জন্মের ন্যায় আনন্দ ভোগ করেন। বৈদিক সূত্রকারগণ অত আনন্দ ভোগ করিতেন না। তাঁহাদের লেখা সোজাসুজি, সংস্কৃতে যাহাকে প্রাঞ্জল বলে। তাঁহাদের প্রতি অধ্যায় এবং প্রতি অংশে (section) ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষের বহুবচন থাকেই; যথা, ব্যাখ্যাস্যামঃ, অভিধাস্যামঃ, বক্ষ্যামঃ ইত্যাদি এবং শেষে প্রায়ই একটি বাক্য দুই-বার করিয়া বলা থাকে তাহাতে বুঝিতে হয় ইহা শেষ হইয়া গেল। অনেক সূত্র ভাষ্যসুদ্ধই লেখা থাকে এবং ছাপা হয়। আবার অনেক স্থলে ব্যাখ্যা ও কারিকা থাকে।

ম্যাক্সমূলর বলেন যে, সূত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে পর ব্রাহ্মণেরা শ্লোকচ্ছন্দে লম্বা লম্বা পুথি লিখিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ভাষ্য বেদের ভাষ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র, সহজ এবং পাণিনি-সম্মত। আমি আরো দেখিতে পাই যে, এই-সকল লম্বা লম্বা শ্লোক ছন্দের পুথি প্রায়ই একজন মুনি বলিতেছেন আর অন্য মুনিরা শুনিতেছেন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই জিজ্ঞাসা ও উত্তরের নাম সংবাদ। শেষ দাঁড়াইয়াছিল, ষট্-সংবাদ না হইলে তাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করা যায় না। সেইজন্য পুরাণে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় একজন ঋষি বলিতেছেন, আর-একজন শুনিতেছেন। যিনি বলিতেছেন তিনি আবার আর দুই-জনের কথা

বলিয়া সে-সকল কথা উল্লেখ করিতেছেন। সে দু-জনের মধ্যে আবার যিনি বলিতেছেন তিনি আরো প্রাচীন দু-জনের কথাবার্তার উল্লেখ করিতেছেন। ভরতনাট্যশাস্ত্র কিন্তু এরূপ ষট্‌সংবাদ নয়। ইহাতে একই সংবাদ। ভরতমুনি বলিতেছেন এবং অন্য ঋষিরা শুনিতেছেন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। কাহারো নাম নাই। ইহাতে নাটকের উৎপত্তির কথা আছে। কেমন করিয়া থিয়েটারের বাড়ি তৈয়ার করিতে হয় তাহার কথা আছে। থিয়েটারের বাড়ির কত ভাগ হয় তাহার কথা আছে। ইহাতে দোতলা স্টেজের কথা আছে। ইহার সিন্‌গুলা নাড়াচাড়া করা যাইত না। সিনের চারি পাশে আঁকা থাকিত। পাশ দিয়া পাত্র প্রবেশ হইত না। ভিতর দিক্ হইতে দু-পাশে দুটি দরজা থাকিত তাহাতে পর্দা দেওয়া থাকিত। সেই পর্দা সরাইয়া পাত্র-প্রবেশ হইত। এ বইয়ে [আছে] স্টেজের উপর নাটক আরম্ভ হইবার পূর্বে অনেক জিনিস করিতে হইত। সেগুলিকে পূর্বরঙ্গ বলিত। পূর্বরঙ্গে সূত্রধার আসিয়া প্রথমেই জর্জরের পূজা করিত।

জর্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টি পাব থাকিত, প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রঙ থাকিত। এক-এক পাবের এক-একজন দেবতা থাকিত। এই জর্জর হইলেন থিয়েটারের দেবতা। সূত্রধার জর্জরের পূজা করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তারপর সূত্রধার স্টেজের উপর নানা ভঙ্গিতে পায়চারি করিতেন, তাহার নাম "চারী" আর "মহাচারী"। তারপর নান্দীপাঠ।

সূত্রধার সুস্বরে নান্দীপাঠ করিতনে। নান্দীতে ৮টি-কি-১২টি বাক্য (sentence) থাকিত। অথবা ১২টি শ্লোক থাকিত অথবা শ্লোকের ১২টি চরণ থাকিত। এক-একটি বাক্য পড়া হইলে পাশে দুজন লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা বলিত "এই হউক"। নান্দীতে দেবতাদের স্তুতি থাকিত, ব্রাহ্মণদের স্তুতি থাকিত, রাজারও স্তুতি থাকিত। দেশের লোকের মঙ্গলকামনা [করা] হইত, থিয়েটারের মঙ্গল কামনা করা হইত। নট-নটীদের মঙ্গল-কামনা করা হইত। তাহাতে কেবল মঙ্গলের কথাই থাকিত, অমঙ্গলের কথা কিছু থাকিত না। নান্দীপাঠের পর পাত্র-প্রবেশ। এখন যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইত। কিন্তু সূত্রধার পাত্র-প্রবেশ করাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িত। মধ্যে অর্থাৎ নান্দীর পর এবং পাত্র প্রবেশের মধ্যে সূত্রধার প্রেক্ষকদিগের বেশ একটু তোষামোদ করিতেন। কবির গুণের কথা বলিয়া দিতেন এবং দু-একটা গান গায়িতেন।

থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। নাচের তিন অঙ্গ। প্রথম অঙ্গহার, ২য় করণ, ৩য় নাট্য [নৃত্য]। ললিত অঙ্গভঙ্গির নাম অঙ্গহার। দুই-তিন অঙ্গ ভঙ্গি এক সঙ্গে করিলে তাহার নাম হইত করণ। অনেকগুলি করণ একত্র হইলে নৃত্য হইত।

থিয়েটারের এই বইয়ে কিরূপ পাত্রকে রাজা করিতে হইবে, রানী করিতে হইবে, বিদূষক করিতে হইবে, চাকর করিতে হইবে, তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বিবরণ দেওয়া আছে। তার পর রঙ করার কথা আছে। শক, যবন, পারদদের সাদা রঙ দিতে হইত। দ্রাবিড় অন্ধ্র দেশের লোকদের কালো রঙ দিতে হইত। বাঙালিদের রঙ অত কালো হইত না। কাশ্মিরি ও পঞ্জাবিদের রঙ দুধে-আলতার মতো হইত। নানা দেশের লোকের নানা রকম রঙ করিতে হইত। মূল রঙ তো চারিটা কি পাঁচটা, সেইগুলি মিশাইয়া ২০/২৫ রকম রঙ তৈয়ারি করিত এবং তাই ফলাইত।[৩]

নাটকের প্রকৃতি বলিয়া একটা জিনিস ছিল। কোনো দেশের লোক নাটকের নাচ দেখিতে ভালোবাসিত। কোনো দেশের লোক গান শুনিতে ভালোবাসিত, কোনো দেশের লোক অভিনয় ভালোবাসিত। কোনো দেশের লোক বক্তৃতাকেই ভালো বলিত। বৃত্তি বলিয়া নাটকের আর-একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গি, অভিনয়ের ভঙ্গি, কিরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার ভঙ্গি। কোথায় লম্বা সমাস করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে না, কেহ সোজা কথায় লিখিত, কেহ বাঁকা কথায় লিখিত, কেহ শক্ত কথায় লিখিত, কেহ দুরূহ কথায় লিখিত। ছন্দের উপর ভরতের খুব দৃষ্টি ছিল। তিনি পিঙ্গলের[৪] ছন্দগুলি অনেক ভাঙিয়া লইয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের সব শেষ অধ্যায়ে আছে সিদ্ধির কথা ও ঘাতের কথা। ঘাত মানে যাহাতে রসভঙ্গ হয়। আর সিদ্ধি মানে যাহাতে রস জন্মে। ঘাত—যেমন অভিনয় করিতে আসিয়া রাজার মুকুটটা খসিয়া গেল। কোনো নট যাহা বলা উচিত তাহার উল্টা কথা বলিল। থিয়েটার হইতেছে এমন সময় পিঁপড়ের পাল উড়িল অথবা সব্জে পোকা আসিয়া পড়িল, তাহাও ঘাত; অথবা চোর ডাকাত আসিয়া পড়িল। আর সিদ্ধি যখন রস জমিয়া উঠে, করুণ রসে হা-হুতাশ করে অথবা হাস্যরসে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। দেবতার আশীর্বাদ হইলে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া উঠে। সিদ্ধির পরই নাট্যশাস্ত্র একরকম শেষ হইয়া গেল। এইটিই ভরত-নাট্যশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়। ২৮ হইতে বাজনার কথা আরম্ভ হইল। বাজনা কয় রকম, কোন্ রসে

কোন্ বাজনা ভালো লাগিবে, কোন্ সময়ে কোন্ বাজনা লাগাইতে হইবে,— তার গানের কথা, সুরের কথা, পূরাদস্তুর সঙ্গীত-শাস্ত্রের কথা। ৩৬ ও ৩৭ অধ্যায়ে নাট্য-শাস্ত্রের নট ও নটীদের, উৎপত্তি ও বিবরণ নাট্যশাস্ত্রের একটু ইতিহাস এবং শেষ ফলশ্রুতি।

এইতো নাট্যশাস্ত্রের যত সংক্ষেপে সম্ভব একটু কথা বলিলাম। কিন্তু আজ আমার আসল কথা আর-একটি। এই যে লম্বা শ্লোক ছন্দের বই ইহার ভিতরে আর দুখানি বই আছে। সে দুখানি লম্বাও নয়, শ্লোক-ছন্দে লেখাও নয়। সে দুখানি পূরাদস্তুর সূত্র-শ্রেণীর পুথি বা তাহার কোনো অংশ। প্রথমখানি নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়, ২য় খানি ২৮, ২৯, ৩০ অধ্যায়ে। একখানি রসের ব্যাখ্যা, আর একখানি গানের ব্যাখ্যা। রসের ব্যাখ্যার যে সূত্রগুলি আছে তাহা কিন্তু নটসূত্রের অন্তর্গত। কেন-না, তাহার প্রত্যেক কথাতেই কিরূপ করিয়া সেই রস বা ভাব অভিনয় করিতে হইবে তাহার সূক্ষ্ম উপদেশ দেওয়া আছে। ২য় খানি সঙ্গীত-সূত্র। এখানি নটসূত্রের অন্তর্গত কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। লিখিবার কালের পুথি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুখানি পুথিতেই নূতন কথা ধরিবার সময় 'ব্যাখ্যাস্যামঃ' বলিয়া আরম্ভ করা আছে। তবে রস-সূত্রগুলির ভাষা গাঢ়, তাহার মধ্যে দু-দশটি আর্যা ছন্দে ও শ্লোকছন্দে কারিকা থাকিলেও শ্লোকছন্দে লম্বা জিনিস লেখা নাই। কিন্তু সঙ্গীত-সূত্রে শ্লোকছন্দের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। গদ্য অংশ আছে— বড়ো কম। ভরত-মুনিকে ঋষিরা পাঁচটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ৫টি প্রশ্ন এই— যারা নাট্যশাস্ত্রের সমঝদার তারা রস বলিয়া একটা কথা কয়, রস কাহাকে বলে এবং কী হইলে রস হয়; ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কী ভাবাইয়া দেয়; সংগ্রহ কাহাকে বলে, কারিকা কাহাকে বলে, নিরুক্ত কাহাকে বলে। এই পাঁচটি কথা শুনিয়া ভরতমুনি তাহাদের উত্তর দিলেন। সে উত্তরটি ৫এর শ্লোক হইতে ৩২এর শ্লোক পর্যন্ত; তাহার পরই নটসূত্রের মধ্যে রসসূত্র আরম্ভ।

ভরতমুনি বলিলেন, নাটক এমন প্রকাণ্ড ব্যাপার যে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। কেন-না, ভাব অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত এবং শিল্প অনন্ত। ইহাদের একটারও শেষ পাওয়া যায় না। সুতরাং সমস্ত ভাব সমস্ত জ্ঞান সমস্ত শিল্প সমুদ্রের মতো। তাহার পরে যাওয়া বড়ো কঠিন। সেইজন্য আমি সংক্ষেপ করিয়া সেই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, অতি সংক্ষেপ কিন্তু।

সূত্র এবং ভাষ্যে যে-সকল জিনিস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা আছে সংক্ষেপে সেই-সকল কথা বলার নাম 'সংগ্রহ'। রস, ভাব, অভিনয়, পাত্র, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, সুর, বাজনা, গান— এই হইল রঙের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশাস্ত্রে আছে।

কারিকা কাহাকে বলে? সূত্র এবং ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া লেখা আছে সেই জিনিস ছোটো করিয়া ১টি বা ২টি শ্লোকে বলার নাম কারিকা। এইখানে বলিয়া রাখি রসসূত্রে দুই-রকম কারিকা আছে— কতকগুলি শ্লোকছন্দে, কতকগুলি আর্যছন্দে। কিন্তু এইগুলি একজনের লেখাও নয় এক কালের লেখাও নয়। কারণ, অনেক স্থলে কারিকাগুলিতে আর্যাছন্দের কারিকাও তোলা হইয়াছে এবং শ্লোকছন্দের কারিকাও একত্রে তোলা হইয়াছে।

নিরুক্ত কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ-সাধন হয় তাহার নাম ব্যুৎপত্তি, তাহারই নাম নিরুক্তি। কিন্তু এখানে নিরুক্ত বলিতে আরো একটু বেশি বুঝায়। ইহাতে কতকটা ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকটা সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকটা অন্য অন্য প্রমাণ দেওয়াও বুঝায়।

এইরূপে সংগ্রহ কারিকা ও নিরুক্ত এই সম্বন্ধীয় তিনটি জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া ভরতমুনি সংগ্রহটা আর-একটু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। রস কতগুলি, ভাব কতকগুলি, তাহাদের নাম করিয়াছেন, ভাবের ভিতর স্থায়ী কতগুলি, ব্যভিচারী কতগুলি, সাত্ত্বিক কতগুলি, অভিনয় ক'রকম, পাত্র ক'রকম, বৃত্তি ক'রকম, প্রবৃত্তি ক'রকম, সিদ্ধি ক'রকম, স্বর কত, বাজনা কত রকম, কেমন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে হয়, যাইতে হয়, থাকিতে হয় তাহার কথা কিছু আছে, তাহার পর গান, এই সঙ্গে থিয়েটার ঘর ক'রকম— সংগ্রহের মধ্যে এই-সকল কথা বলিয়া ভরতমুনি বলিতেছেন, "অতঃপরম্ প্রবক্ষ্যামি সূত্রগ্রন্থবিকল্পনম্—" ইহার পর আমি সূত্র ও গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিব। এই গ্রন্থ শব্দের অর্থ অভিনবগুপ্ত ভাষ্যে লিখিয়াছেন। মর্ম এই হইল যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩২টি শ্লোকের পর ভরতমুনি সূত্র ও ভাষ্য মিলাইয়া এবং তাহার সহিত নিরুক্ত ও কারিকা দিয়া একখানি সূত্র-গ্রন্থ এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন।

বৈদিক সূত্রে শুধু সূত্রগুলি থাকিত। বেদের মতো সে সূত্রগুলিও ব্রাহ্মণে মুখস্থ করিয়া লইত। ব্যাখ্যা মুখে মুখেই থাকিত। ব্যাখ্যাটা চলিত-সংস্কৃতে দিত। চলিত-

সংস্কৃতের নাম ছিল ভাষ্য। সেইজন্য সূত্রকে ভাষায় ব্যাখ্যা করার নাম ভাষ্য। কৌটিল্য সূত্রের সঙ্গে ভাষ্য যোগ করিয়া এক রকম নূতন প্রণালীর আবির্ভাব করেন। তিনি যদিও বলেন যে সূত্র ও ভাষ্য এক করিয়া দিতেছি, তথাপি তিনি মাঝে মাঝে নিরুক্তও দেন এবং কারিকাও দেন। সেইরূপ এই যে সূত্রগ্রন্থ ইহাতেও সূত্রভাষ্য ছাড়া অনেক জায়গায় নিরুক্ত এবং সব জায়গায় কারিকা দেওয়া আছে। ৩২ শ্লোকটি বলিয়া ভরতমুনি গদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। গদ্যের প্রথম কথা এই— "রসানেব তাবদ্ আদৌ অভিব্যাখ্যাস্যামঃ নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্তত ইতি—"

তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ

এইরূপ গদ্য অংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এবং সমস্ত ৭ম অধ্যায়। এই যে লেখা আছে "তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ" ইহার মধ্যে 'সংযোগাৎ' ও 'নিষ্পত্তি' এই দুটি শব্দের অর্থ লইয়াই অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রধান বিচার। এই লইয়াই কাব্যপ্রকাশে [মম্মট ভট্ট রচিত] অনেক মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সংযোগ শব্দের অর্থ কেহ বলেন অনুমান, কেহ বলেন ভোগ, কেহ বলেন সাধারণীকরণ এবং সর্বশেষে অভিনব গুপ্ত বলেন যে সমঝদারদের ইহা দ্বারা একটা কিছু নূতন প্রকারের অনুভব-শক্তি হয়, তাহারই ভোগ হয়। সেই সকল কথা আজ আমাদের নয়। এই যে সূত্র-গ্রন্থের এক অংশ ভরত-নাট্যশাস্ত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। আমার বিশ্বাস এটি কোনো নটসূত্রের অংশ। কারণ, ইহার প্রত্যেক স্থলেই প্রত্যেক রসের, প্রত্যেক স্থায়িভাবের, প্রত্যেক ব্যভিচারিভাবের, প্রত্যেক সাত্ত্বিকভাবের, নট কী করিয়া সেই রস ও ভাব প্রকাশ করিবে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া আছে। অনেক জায়গায়ই "অভিনেতব্যঃ" "অভিনয়ঃ কর্ত্তব্যঃ", "অভিনয়েৎ" এইরূপ কথা আছে। সুতরাং এই রস-ভাবের বর্ণনা দার্শনিক ভাবে হয় নাই। থিয়েটারের অনুরূপ করিয়াই করা হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। বড়ো লোকের হাসি কী করিয়া অভিনয় করিবে? একটু মুখ মুচকাইয়া হাসিবে। এমন-কী তাহাদের দাঁতও দেখা যাইবে না। রানী সখী মন্ত্রী ইহাদের হাসি দেখাইতে গেলে দাঁত বাহির হইবে কিন্তু শব্দ বাহির হইবে না। কিন্তু ছোটোলোকের হাসি

দেখাইতে গেলে হাঁ করিয়া উচ্চ শব্দ করিতে হইবে। আমি তো সংক্ষেপে বলিতেছি কিন্তু পুথিতে, ঢের বেশি আছে। এইসব রসে সব ভাবের অভিনয়ের ইঙ্গিত করা সহজ কথা নয়। কিন্তু নটসূত্রের এ অংশে সেটি করা হইয়াছে, যতদূর সাধ্য ভালো করিয়াই করা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে নটসূত্র কাহাকে বলে। পাণিনি আপনার সূত্রে দুইখানি নটসূত্রের নাম করিয়াছেন। দুখানিই ঋষি "প্রোক্ত" অর্থাৎ কাহারো রচিত নয়, "কৃত" নয়। "প্রোক্ত" গ্রন্থের কথা কহিয়া তাহার পর পাণিনি "কৃত" গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোনো ঋষি সেগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "প্রোক্ত", আর নিজের মাথা থেকে রচনা করা হইয়াছে যাহা তাহার নাম "কৃত"। পাণিনি যে দুখানি নটসূত্রের কথা বলিয়াছেন দুখানিই "প্রোক্ত", অর্থাৎ ঐ-সকল কথা অনেকদিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছিল, ঋষিরা সেইগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া আসিয়াছে। আমরা আর-একখানি নটসূত্র ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কারণ, কালিদাস বিক্রমোর্বশী-র দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়াছেন ভরতমুনি একজন নটসূত্রকার। তিনি স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামে এক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং নিজে তাহার অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। উর্বশী সেই নাটক অভিনয় করিতে গিয়া "ঘাত" করিয়া বসেন,— "নারায়ণ" বলিতে গিয়া "পুরূরবা" বলেন। তাই ভরতমুনি শাপ দেন, তুমি পৃথিবীতে গিয়া থাক। সুতরাং ভরতের একখানি নটসূত্র ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। ভরতের আরো একখানি সূত্র ছিল। সেখানির কথা ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়া গিয়াছেন। সেখানির নাম ত্রৌর্য্যত্রিকসূত্র অর্থাৎ বাজনার সূত্র।

ভরতনাট্যশাস্ত্রে যে দুইখানি সূত্র আছে বলিয়া আমরা পূর্বে বলিয়াছি তাহা বোধ হয় এই ভরতের লিখিত নটসূত্র ও তৌর্য্যত্রিকসূত্র। একখানিতে নটেদের শেখান হইতেছে, আর একখানিতে বাজনাদারদের শেখান হইতেছে।

একজন নবীন লেখক বলিয়াছেন পাণিনির ব্যাকরণে দুইটি নটসূত্রের নাম আছে। কিন্তু তাহাতে কী আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আমাদের এমনই মন্দ ভাগ্য যে ঐ যে নটশব্দ আর সূত্রশব্দ আছে উহা হইতেই আমরা ইতিহাস অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। নট বলিতে একটা পেশা বুঝায়। একটা পেশা থাকিলেই নাটক যে তখন অনেক ছিল একথা অনুমান করিয়া লইতে

পারি। তাহা হইলে একথা আমরা বলিতে পারি যে পাণিনির অনেক পূর্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহু-সংখ্যক নাটক লেখা হইয়াছিল। আরো কথা আছে, যখন পাণিনির ঐ সূত্রেই নটসূত্র বলিয়া সমাস করা আছে, তখন একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই পেশাদার লোকদের শিক্ষা দিবার জন্য তখন সূত্রগ্রন্থ লেখা হইয়া গিয়াছিল এবং "প্রোক্ত" হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাঁহার পূর্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল এবং নানারূপ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টা গুলিকে একত্র করিয়া শিলালী ও কৃশাশ্ব সূত্রগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি নাটক আমরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম এ কথার মূল্য কী? পাণিনি তো খৃষ্ট পূ. ৫০০ বৎসরের এধারে আসিতে পারেন না। সূত্রগ্রন্থ তাহার অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্বে "প্রোক্ত" হইয়াছিল। দু-জন "প্রোক্ত" করিয়াছেন। সুতরাং দু-জনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাঁহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরানো কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও নাটক ছিল। কেন-না, নট বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে। তখন আমাদের নাটকের আদি কোথায়?

পঞ্চ পুষ্প
আষাঢ়, ১৩৩৬।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার পত্তন য়ুরোপীয় পাণ্ডিতদের হাতে। অজ্ঞাত এক রহস্যময় দেশ ভারতবর্ষে মানব সংস্কৃতির কোনো শ্রেষ্ঠ কীর্তি আবিষ্কার করে এঁদের অনেকেই বিস্মিত হতেন এবং প্রমাণ করতে চাইতেন য়ুরোপের প্রভাব ভিন্ন এমন বস্তু সৃষ্টি হতে পারে না। ভারতের নাট্যকলার উজ্জ্বল ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণায় ঠিক এই ঝোঁকে জর্মান পণ্ডিত আলব্রেখ্‌ট ভেবর, Albrecht Weber বলেন, আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত অভিযানের পরে ভারতে গ্রীক নাটক অভিনয়ের চল হয়, আর এরই প্রভাবে ভারতীয় নাট্যচর্চার সূত্রপাত। ভারতীয় নাটক ও নাট্যশাস্ত্র নিয়ে হরপ্রসাদের আলোচনা 'শাসকের সংস্কৃতির প্রভাবে শাসিতের উদ্ধার' জাতীয় মনোভাবের প্রতিবাদ। তাই প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে লেখেন, "এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি নাটক আমরা গ্রীকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম এ কথার মূল্য কী?" আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ খৃ.পূ. ৩২৭-এর ঘটনা। পাণিনি অবশ্যই এর অনেক আগে বর্তমান ছিলেন। হরপ্রসাদ ধরছেন— অন্তত ৫০০ খৃ. পূ.। পাণিনি দু-খানি নাট্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন— যা 'প্রোক্ত' অর্থাৎ অনেক দিন ধরে চলে আসা জিনিস, ঋষিরা সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন। এরকম প্রমাণে ভেবর্‌দের জল্পনা এবং সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ভেবর্ বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্ম্মানির অরণ্যবাসী বর্ব্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই।.... পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। কেন-না, পাণিনিও তাঁহার মতে 'কালকের ছেলে'। ('কৃষ্ণচরিত্র', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অনুচ্ছেদ।)

দ্রষ্টব্য : Haraprard Shartri, "The origin of Indian drama", *JASB*, NS-V, 1909, pp. 351-61. এবং *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the collection of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI, 1931, pp. clxxvii-clxxxvii দ্র.

"ভরতের নাট্যশাস্ত্র" প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বয়ান ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের *প্রবাসী* পত্রিকার "কষ্টি পাথর" পর্যায়ে ছাপা হয়েছিল।

১. বংশগত পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী কাশ্মীরে ৯৫০-৬০-এর মধ্যে জাত অভিনবগুপ্ত বাবা নরসিংহগুপ্তর কাছে শিক্ষালাভ করে নানা বিদ্যার পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। বিশেষভাবে 'নাট্যশাস্ত্র' এবং অলংকার শাস্ত্রের চর্চায় তাঁর রচনা অনন্য সহায়। নাট্যশাস্ত্রের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা 'অভিনবভারতী', 'নামান্তর নাট্যবেদ-বিবৃতি' গ্রন্থে ভরতের রচনার শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করে পূর্বগামী ব্যাখ্যাতা উদ্ভট, লোল্লট, শঙ্কুক প্রভৃতির মতবিচার ও গ্রহণ-বর্জনের পথে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই বিশাল কাজ ভারতীয় ঐতিহ্যে নাটকের তত্ত্ব ও প্রয়োগ দু-দিকেই চর্চা কতো ব্যাপক ছিল প্রতিপন্ন করে। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ গ্রন্থমালায় বরোদা থেকে রামকৃষ্ণ কবির সম্পাদনায় চারখণ্ডে 'অভিনব-ভারতী' প্রকাশিত হয়েছে।

অভিনবগুপ্তর আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের টীকা 'লোচন'। ভারতীয় ঐতিহ্যে ধ্বনিবাদ ও রসবাদ সাহিত্য মীমাংসার চূড়ান্ত পর্যায়। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক-এর টীকায় অভিনবগুপ্ত রসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের সুবলয়িত পূর্ণাঙ্গ রূপ

দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর টীকা 'ধ্বন্যালোক-লোচন', 'কাব্যালোক-লোচন', 'সহৃদয়ালোক-লোচন' নামে পরিচিত।

২. ফ্রীড়রিখ্ মাক্স মূল্যর (১৮২৩-১৯০০), Friedrich Max Müller-এর জন্ম জর্মানির দেসাউ শহরে, ৬ ডিসেম্বর ১৮২৩ খৃ.। ৫০ বৎসরেরও বেশি সময় তিনি অক্সফোর্ডে বিদ্যার্চায় নির্বিষ্ট ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ইউজীন বুর্নুফ Eugene Burnouf-এর প্রেরণায় তিনি সায়ণভাষ্য সমেত 'ঋগ্বেদ' সম্পাদনা করেন। ৬ খণ্ডে এই কাজ শেষ হয় ১৮৪৯-৭৩ খৃ.। এ ছাড়া The Secred Books of the East গ্রন্থমালা পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ তাঁর জীবনের আর-একটি উজ্জ্বল কীর্তি। ৫১ খণ্ডে বিভিন্ন ধর্মের মূল গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রকাশের এই পরিকল্পনার ৪৮টি খণ্ড তাঁর জীবনকালে সম্পূর্ণ করেছিলেন। দ্র. *হ-র-সং-৪* পৃ. ২৫; "আমাদের গৌরবের দুই সময়" প্রবন্ধের ৪ সংখ্যক প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৩. "স্বভাবে যত বস্তু দেখি তার একটা-না-একটা রঙ আছে। রঙ ছাড়া কোনো বস্তুর রূপের ধারণা হয় না। যা কিছু রঙ, শুদ্ধ আর মিশ্র এই উভয় শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। হলদে, লাল, নীল—এই তিনটি শুদ্ধ রঙ। শুদ্ধ রঙের বহুবিধ মিশ্রণে বহু মিশ্র রঙ। সাদা আর কালোকে ঠিক রঙ বলব না — ছবির যত কিছু বর্ণ বৈচিত্র্য তার দুটি অন্তিম সীমা; একটি প্রকাশের, আর-একটি অপ্রকাশের বা বিলয়ের।"

(নন্দলাল বসু, 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি', ১৩৯২ ব., পৃ ৬৩)

৪. এই বইয়ে "কালিদাসের অভিধান" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র ৩ দ্র.

কালিদাসের অভিধান

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব নামে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। মেঘদূত নামে খণ্ডকাব্য লিখিয়াছিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এই তিন নামে তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার সকলের চেয়ে বড়ো বই রঘুবংশ। তাহাকে মহাকাব্য বলিব কিনা এ বিষয়ে লোকে বড়োই সন্দেহ করে। কারণ, এক বিশ্বনাথ কবিরাজ[১] ছাড়া আর যত অলংকার লেখক মহাকাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, সে লক্ষণে রঘুবংশ পড়ে না। সে-সকল লক্ষণে এক নায়ক নহিলে মহাকাব্য হয় না; সুতরাং সে মহাকাব্যের লক্ষণে রঘুবংশ-এর জায়গা নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, একই নায়ক বা বহুনায়ক হউক, মহাকাব্য হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছাটা যেন রঘুবংশ-কে মহাকাব্যের ভিতরে ফেলা। শারদাতনয় নামে এক নাট্যশাস্ত্রকার মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্বে মিরাট অঞ্চলে ভাবপ্রকাশ[২] বলে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি কালিদাসের রঘুবংশ-কে সংহিতা বলিয়া গিয়াছেন। একথাটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বলার দরকার, এই জন্য বলিলাম। রঘুবংশ মহাকাব্য হউক আর নাই হউক, আমার বিশ্বাস এত বড়ো কাব্য আর কেহ কখনো জগতে কল্পনা করিতে পারিবে না।

কালিদাস আরো বই লিখিয়াছেন। তাঁহার ঋতুসংহার-খানি তাঁহার নিজের দেশের ছয় ঋতুর বর্ণনা। তিনি গ্রন্থখানি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন। এ ছাড়া অনেক ছোটো ছোটো কাব্য কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। শৃঙ্গারাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক, নলোদয় তাহার মধ্যে প্রধান। অনেক চুটকি কবিতা তাঁহার নামে চলিতেছে। ফুক্‌কুড়িও তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। বাংলার

ফুক্‌কুড়ি যেমন গোপাল ভাঁড়ের নামে চলে, হিন্দির ফুক্‌কুড়ি আকবর ও বীরবলের নামে চলে, সংস্কৃতের অনেক ফুক্‌কুড়িও কালিদাসের নামে চলে।

কালিদাস যে কাব্য আর রসের কথা লিখিয়া শেষ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার নামে একখানি ছন্দের বই [শ্রুতবোধ] চলিতেছে। ছন্দের বই-এর কর্তা হইলেন পিঙ্গল, [পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্র] কালিদাসের অনেক আগে। কিন্তু পিঙ্গলের গণ আছে, মাত্রা আছে, বৃত্ত আছে, জ, গ, ম ইত্যাদি আছে। বীজগণিতের পরিবৃত্তি-অনুবৃত্তি আছে। ব্যাপারটা খুব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সহজ করিবার জন্য কালিদাস একখানি ছন্দের বই করিলেন। কঠিন ছন্দের বইকে মিষ্ট করিবার জন্য ঋতুসংহার-এর মতো প্রায়ই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিলেন। যে ছন্দের লক্ষণ সেই ছন্দেই তিনি লক্ষণ করিলেন। কোনোরকম পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন, শোনবামাত্রই যাহাতে ছন্দের লক্ষণ বোঝা যায় তাহাই তিনি লিখিলেন। ইহাতে ৪৪টি কবিতা আছে, ৪১টি ছন্দের লক্ষণ আছে। পাণিনির সঙ্গে কলাপের যে সম্বন্ধ, পিঙ্গলের সঙ্গে ছন্দোবিষয়ে কালিদাসেরও সেই সম্বন্ধ। একজন লিখিয়াছেন পণ্ডিতের জন্য। আর একজন লিখিয়াছেন অপণ্ডিতের জন্য।[৩]

শ্রুতবোধ ছাড়া তাঁহার আর-একখানি ছন্দের গ্রন্থ চলিতেছে, সেখানির নাম দেবীস্তুতি। উহাতে ৭১টি কবিতা আছে। ছন্দঃশাস্ত্র-ক্রম অনুসারে ৭১টি কবিতা সাজানো। এক-একটি কবিতায় এক-একটি ছন্দ। দেবীর পা হইতে মাথা পর্যন্ত বর্ণনা। কথা আছে কালিদাস বর পাইয়া প্রথমেই সরস্বতীর স্তব করেন, মাথা হইতে পা পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তাহাতে সরস্বতী রাগিয়া বলেন, তুই আমাকে বেশ্যার মতো বর্ণনা করিলি। তোর কাব্য অশ্লীল হইবে। সেই ভয়ে কালিদাস দেবীস্তুতি-তে পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] কুমারসম্ভব-এও তাহাই করিয়াছেন। একখানি জ্যোতিষের বই কালিদাসের নামে চলিতেছে। ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে বইখানি ছাপা হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, আমিই কালিদাস রঘুবংশ ইত্যাদি লিখিয়াছি।[৫] সুতরাং সেকালের এক পণ্ডিত কালিদাসের এক জীবনচরিত পাওয়া গেল বলিয়া খুব গোলমাল করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে জ্যোতির্বিদাভরণের কালগণনার আরম্ভ ১৬শ শতাব্দীতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের বাড়ি উৎকলে ছিল। কালিদাসের সম্বন্ধে এই-সকল কথা বলিয়া আমরা এখন

তাঁহার অভিধানের কথা বলিব। আমাদের আজকার বলিবার বিষয়ই সেই অভিধান।

মাদ্রাজের গভর্মেন্ট ওরিএন্টাল লাইব্রেরিতে কয়েকখানি পুথি আছে। তার মধ্যে একখানি নানার্থশব্দরত্নম্ ও তাহার টীকা তরলা। মূল পুথিখানি কালিদাসের, টীকাটি নিচুল-এর। রাওবাহাদুর রঙ্গাচারীয় প্রথম এই অভিধানখানির নাম প্রকাশ করেন ও বিবরণ লেখেন। ইনি লিখিয়াছেন, অভিধানখানি "A Kalidas"-এর লেখা। অর্থাৎ কালিদাস নামে অনেক লোক ছিল। তাহার মধ্যে কোনো অপ্রসিদ্ধ কালিদাসের লেখা। মহাকবি কালিদাসের লেখা নয়। তাঁহার দেখাদেখি আর যে-কেহ এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহারাও ঐভাবে লিখিয়াছেন। রামঅবতার শর্মা তাঁহার কল্পদ্রুকোষ-এর ভূমিকায় অভিধানশাস্ত্রের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি নানার্থশব্দরত্ন-কে অনেক পরে ফেলিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের পরেই ফেলিয়াছেন।[৬]

কিন্তু এই অভিধানখানি মহাকবি কালিদাসের বলিবারও নানা কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, কালিদাস মেঘদূত-এর ১৪ শ্লোকের শেষ অংশে লিখিয়াছেন—

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং।
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।
[মেঘদূতম্, পূর্বমেঘ/১৪]

অর্থাৎ এই স্থান হইতে উত্তরমুখো হইয়া তুমি আকাশে ওড়ো। এই জায়গাটি বড়ো মনোহর। এখানে বেতগাছগুলি বড়ো সরস। দেখিও যাইবার সময় দিঙ্নাগেরা যেন তাহাদের মোটা শুঁড় তোমার পিঠে বুলায় না। এই স্থানে মল্লিনাথ টীপ্পনী করিয়াছেন যে, নিচুল শব্দে বেতগাছ বুঝায়। কিন্তু নিচুল একজন কবির নাম। তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন এবং কালিদাসের কাব্যের ভালো সমালোচনা করিতেন। আর দিঙ্নাগ নামে একজন বড়ো বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দলভুক্ত লোকে কালিদাসের কাব্যের মন্দ সমালোচনা করিতেন।[৭]

মল্লিনাথের একথা যদি সত্য হয়, আর নিচুল যোগিচন্দ্র যদি কালিদাসের নানার্থরত্ন-এর টীকা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আর "A Kalidasa" বলিলে

চলিতে পারিবে না। অভিধানকার যেন মনে হয় "The great Kalidasa"। অভিধানখানি নানা দিক্‌ থেকে একখানি আশ্চর্য বই বলিয়া মনে হয়। এ যে ইদানীন্তন কেহ লিখিয়াছেন তাহা মনে হয় না। আমরা এ অভিধানখানির ও তাহার টীকার একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

অভিধানের মঙ্গলাচরণটি রঘুবংশ-এর মঙ্গলাচরণটির মতো। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির নমস্কার।

> তমেব শিরসা বন্দে পুণ্যেতরফলাদিকে।
> কীর্ত্ত্যং স্বমোক্ষবন্ধাদৌ সব্যবামসিতাসিতঃ।।[৮]

কালিদাস যে শৈব ছিলেন সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। শেষ বয়সে তিনি অর্ধনারীশ্বর মূর্তিরই উপাসক হইয়াছিলেন। এখানে এবং রঘুবংশে দুইয়েতেই অর্ধনারীশ্বরের কথা আছে। যেমন পিঙ্গলকে সহজ করিবার জন্য তিনি শ্রুতবোধ লিখিয়াছিলেন, এ অভিধানখানিও তেমনি তিনি

> তত্রাপ্যেকাদিধাত্বর্থবাচকত্বে নিগ্রন্থিতে।
> মহাভাষ্যাদিবল্লোকে গ্রহীতুং নহি শক্যতে।।
> অতো যেনৈতদখিলমায়াসাতিশয়ং বিনা।
> জ্ঞায়তে সুষ্ঠু সর্ব্বার্থশব্দরত্নং প্রদর্শ্যতে।।[৯]

অতিশয় আয়াস না করিয়া সহজে যাহাতে বোঝা যায় তাহারই জন্য লিখিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি যে প্রাচীন তাহার আর-একটি প্রমাণ দিতেছি। তিনি শব্দশাস্ত্রের মধ্যে পাণিনি, শক্তি, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র নির্মিত ব্যাকরণ লোকের জানা আছে। বোপদেব যে আটজন আদি শাব্দিকের নাম করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে এ তিন জনের নাম আছে। কিন্তু সূর্য আর শক্তির নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সূর্যের যে একখানি ব্যাকরণ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম, তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্বে। তখন আমি তাহার বিষয় ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। নেপালে আমি পদসূর্য-প্রকাশ নামে একখানি বই পাই। আমি সেখানি কলাপ ব্যাকরণের বই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কালিদাসের অভিধানে সূর্যের নাম পাইয়া আমি আবার পদসূর্য ব্যাকরণ দেখি। তাহাতে লেখা আছে, সর্ববর্মা ও গুহ

প্রভৃতির মতের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদসূর্য ব্যাকরণ লেখা হইতেছে। সুতরাং পদসূর্য ব্যাকরণ কলাপ হইতে স্বতন্ত্র। এবং এখন যে লোকে কলাপ ব্যাকরণকে কার্তিকের লেখা বলে সেটাও ঠিক নয়। কারণ, সর্ববর্মার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র এবং গুহের অর্থাৎ কার্তিকের ব্যাকরণ স্বতন্ত্র। এই দুইখানি ব্যাকরণের পরস্পর কী সম্বন্ধ তাহা ঠিক বলিতে যদিও পারা যায় না, তাহারা যে স্বতন্ত্র তাহা ঠিক বলিতে পারা যায়। গরুড়পুরাণে দু-অধ্যায় ব্যাকরণের কথা আছে। তাহাতে কার্তিক ও কাত্যায়ন দুজনের সংবাদ আছে এবং গরুড়পুরাণের যে ব্যাকরণ তাহা সূত্রে লেখা নয়। সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত উদাহরণের দ্বারা শিখানো হইত কিন্তু গরুড়পুরাণে যে-সকল উদাহরণ আছে তাহা সর্ববর্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণেও আছে। সুতরাং কার্তিক, সর্ববর্মা, সূর্য, ইঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাকরণের কর্তা। এ খবরটি আমরা কালিদাসের অভিধান হইতেই পাইলাম।

তাহার পর টীকাকারের কথা। মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন, টীকাকার নিচুল কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সেই নিচুলই দেখিতেছি কালিদাসের অভিধানের টীকা করিতেছেন। তিনি গোড়ায়ই বলিতেছেন—

স্বমিত্রকালিদাসোক্তশব্দরত্নার্থজৃম্ভিতাম্।
তরল্যাখ্যাংলসদ্ব্যাখ্যামাখ্যাল্য তন্মতানুগাম্।।[১০]

সুতরাং তিনি যে কালিদাসের বন্ধু ছিলেন একথা নিজেই স্বীকার করিতেছেন। কালিদাস পাঁচজন ব্যাকরণকারের নাম লিখিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন যে, ব্যাকরণকার ছয় জন, শম্ভু (শিবসূত্র-পাণিনি), শক্তি, কুমার, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র। এ সংবাদ তিনি রহস্য নামক গ্রন্থ হইতে তুলিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন—

শ্রীশক্তিশম্ভুসূচিতবিভক্ত্যাকলনসিদ্ধপদযোগাৎ।
চক্রে কুমারমূর্ত্তির্ব্যাকরণং সর্বদেশরসার্থম্।।

অর্থাৎ কুমার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহা শক্তি শম্ভু প্রভৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত পদগুলি লইয়া করিয়াছেন।

নিচুল কবি কে ছিলেন? তিনি ভোজমহারাজের প্রবোধিত হইয়া এই টীকা লিখিয়াছেন। ভোজমহারাজ বলিলেই তো একাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ একাদশ শতাব্দীর ভোজ

ধারা নগরাধিষ্ঠিত মহারাজাধিরাজ ভোজ। কিন্তু নিচুলের ভোজ মহারাজ-শিরোমণি ভোজমহারাজ। দুই ভোজ এক নয়। নিচুলের ভোজ খুব প্রাচীন হওয়ারই সম্ভাবনা।

কালিদাস যে অভিধানখানি পণ্ডিতের জন্য লেখেন নাই, সর্বসাধারণের জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজে বলিয়াছেন। ইহার আরো প্রমাণ এই যে, কালিদাসের বর্ণমালা 'অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত'। বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে দুইরূপ বর্ণমালা চলিতেছিল— পণ্ডিতের জন্য অ-কারাদি হ্-কারান্ত, আর সাধারণ লোকদিগের জন্য অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত। পাণিনি আদি বৈয়াকরণেরা 'ক্ষ'-কে সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া বর্ণমালার মধ্যে ধরেন নাই। বৌদ্ধ বৈয়াকরণেরাও ঐ পথেই গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ বই-এ 'ক্ষ' বর্ণমালায় ভুক্ত আছে। তাহার উদাহরণ ললিতবিস্তর। বুদ্ধদেব যে বর্ণমালা শিখিয়াছিলেন তাহার শেষে 'ক্ষ' আছে।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন অভিধানকার কালিদাস "A Kalidasa" কি "The Kalidasa।"

প্রবাসী
মাঘ ১৩৩৬।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

মহাকবি কালিদাস কাব্য ও নাটক ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে বই লিখেছিলেন— প্রচলিত এই ধারণা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই। হরপ্রসাদ বলেছেন 'নানার্থশব্দরত্নম্' অভিধান প্রসিদ্ধ কালিদাসেরই লেখা এবং এর টীকা তরলা প্রস্তুত করেছেন কালিদাসের বন্ধু নিচুল। সকলে এ মত না মানলেও হরপ্রসাদ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'ডেস্ক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ'— ব্যাকরণ খণ্ডের ভূমিকাতেও একই প্রবণতায় লিখেছেন,

"In the Madras Catalogue, Vol. III, page 1170, on grammar, lexicography, and prosody, mention is made of a dictionary by mahā-kavi Kāli-dāsa and the cataloguists put down the name as a Kāli-dāsa The work is entitled *Nānārtha-Śabda-ratnam.* R. Sarma has but slightly noticed this in the para 18th of his introduction. [KALPADRUKOŚA OF KEŚAVA, ed. Rāmāvatāra Śarmā, M.A., Sāhityācāryya, Vol. I, GAEKWAD's ORIENTAL SERIES, No. XLII, 1928, Introduction, p. XLix.] I want to give it a prominent mention for the following among other reasons. Kāli-dāsa, in his *Raghu-vamśa,* makes his salutation to Śiva in the form of half man and half woman. This work also begins with a similar salutation to a deity white in the right and not white in the left. The second reason is that it has been commented upon by Nicula-kavi Yogi-candra. Mallinātha says in his commen-

tary on the 14th verse of the Megha-dūta that Nicula was a friend of Kāli-dāsa and that Diṅ-nāga was his enemy. The commentator Nicula says, that he is writing the commentary because the author Kāli-dāsa is his friend. Another reason is that Kāli-dāsa in this work says that he writes the book that people may easily understand words and their meaning without much trouble, because at present without studing the Mahā-bhāsya and other works none can understand the meaning of words mentioned by Pāṇini, Śakti, Candra, Sūrya, and Indra. The commentator says that these are the five authorities who settled the forms of words. But Kumāra does not do it.

"Aginst these reasons, there is one which will throw doubt on the authorship of Kāli-dāsa. In the colophon of the Tika, named *Taralā,* Nicula says that he has been encouraged to write the commentary by King Bhoja. But he does not speak of Bhoja, as the King of Dhārā, but only the Mahārājā-Śiro-maṇi. There is another reason against the assumption that Kāli-dāsa is the author of this Koṣa. He was certainly a Brahmanist and depended on Pāṇini and others for the correctness of words. But in his colophon in this book he includes Kṣa in Sanskrit alphabet" *Shastri-cat.,* Vol. VI, Preface, pp., cxli-cxlii

কালিদাসের অভিধান প্রবন্ধটি সুনিতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় সম্ভারে (ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি, ১৯৬০) সংকলিত হয়েছিল। পাদটীকায় অনেক মূল্যবান্ তথ্য দেওয়া হয়েছিল। এই সংকলন বাজারে পৌঁছবার আগেই গুদামে আগুন লেগে নষ্ট হয়ে যায়। পাদটীকার তথ্য কিছু আমরা এখানে ব্যবহার করেছি।

১. সদ্বংশ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ / একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোদুঃপি বা ।। —সাহিত্য দর্পণ, ৬/৩১৬, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯০২

২. শারদাতনয়-এর বইয়ের নাম 'ভাবপ্রকাশ' নয়, 'ভাবপ্রকাশন'। বরোদা থেকে 'গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে' ১৯৩০ সালে প্রকাশিত। শারদাতনয়ের জীবনকালের আনুমানিক নিম্নতম সীমা ১২৫০ খৃ.। 'ভাবপ্রকাশন' ১১৭৫ থেকে ১২৫০-এর মধ্যে রচিত হয়ে থাকবে। রঘুবংশ সম্পর্কে শারদাতনয় লেখেন, "বৃত্তান্তা বিপ্রকীর্ণাঃ স্যুঃ সংহিতা যত্র কোবিদৈঃ।/সা সংহিতেত্যাভিহিতা রঘুবংশো যথা কৃতঃ।।" নবম অধিকার, পৃ. ২৮২।

৩. 'ছন্দস্‌সূত্র' প্রণেতা পিঙ্গল আনুমানিক ১৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। হরপ্রসাদ মনে করেন পিঙ্গলের জীবনকাল খৃ. পূ. চতুর্থশতকের দ্বিতীয় অর্ধ। পিঙ্গল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দ্র. *Shastri-cat*, vol. VI, Preface, pp. cliv-clxi তাঁর ব্যক্তি পরিচয় সঠিক জানা যায় না। নানা কিংবদন্তিতে তাঁর পরিচয় আচ্ছন্ন। কখনো তাঁকে এবং পতঞ্জলিকে একই ব্যক্তি বলা হয়েছে, কখনো বলা হয়েছে পাণিনির ছোটো ভাই। পিঙ্গলের 'ছন্দস্‌সূত্রকে' বেদাঙ্গের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু পিঙ্গল বৈদিক ছন্দ বিষয়ে বিশ্লেষণের পাশাপাশি বৈদিক ধারার বাইরের নানাধরনের কবিতার ছন্দোরীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। পাণিনির মতোই পিঙ্গল বীজগণিতের পরিভাষা ও চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। 'শ্রুতবোধ'-এর লেখক কোনো কালিদাস, আবার অনেকে মনে করেন বররুচি। 'শ্রুতবোধ'-এর অনেক টীকা পাওয়া যায়। বইখানি খুব ব্যবহৃত হত। 'ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ' ৬ষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকায় হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন,

"After Piṅgala comes the great poet Kāli-dāsa as a writer of two works on chandah in Sanskrit.The shortar one, Śruta-bodha is well known. Copies of it will

be found everywhere. It has often been printed. It has been written in a very light vein addressing the poet's wife. The definition of each vṛtta or metre is given in the same metre. The rules of chandah are given in a few verses in the beginning." Shastri-cat. Vd VI, Prefece, p. clxi.

৪. কোনো কালিদাসের লেখা 'দেবীস্তুতি' নামে কোনো বই পাওয়া যায় না। হরপ্রসাদের বর্ণনার সঙ্গে 'বৃত্তরত্নাবলী'-র পাঠের মিল আছে। রাও বাহাদুর রঙ্গাচার্য 'বৃত্তরত্নাবলী' সম্পর্কে লেখেন, "A work in 71 stanzas in praise of Sarasvati, the godess of learning. Every stanza is in a special metre and contains the name of the metre in which it is cemposed. The work is attributed to Kalidasa. (A Descriptive Catalogue of Sanaskrit Manuscripts in the Government Oriental Library, Madras, by M. Rangacharya, M. A., Rao Bahadur, Prepared under the orders of the Govt. of Madras, Vol III, Madras 1906, p. 1239। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "কালিদাসের দেবীস্তুতি নামক ছন্দোগ্রন্থ বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় কালিদাস-কৃত সরস্বতীদেবীস্তুতি বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থকেই বুঝাইয়াছেন।" (হ-র-২, পৃ.৬৪, পাদটীকা)।

৫. রাও বাহাদুর রঙ্গাচার্য এই বই সম্পর্কে পূর্বোক্ত ক্যাটালগে লেখেন, "This is a homonymous lexicon by a Kalidasa. It consists of three Prakaranas. This author refers in the introduction to Panini, Sakti, Candra, Surya and Indra as Grammarians." (পৃ.1170)।

৬. KALPADRUKOṢA OF KEŚAVA, ed. RÁMÁVATÁRA ŚARMÁ, M.A., Sahityácáryya, Vol. I, GAEKWAD'S

ORIENTAL SERIES, No. XLII, 1928 Introduction, p. XLix.

৭. খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর মানুষ কাশ্মির-নিবাসী বল্লভদেবের 'পঞ্জিকা টীকা' 'মেঘদূত'-এর সবচেয়ে পুরানো টীকা। (অয়গ্যান্ হ্যল্ট্‌শ্ Engen Julius Theodor Hultzch-এর সম্পাদনায় মূল 'মেঘদূত' এবং বল্লভদেবের টীকা ১৯১১-য় লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়)। এ টীকায় দিঙ্‌নাগ এবং নিচুল শব্দদুটিতে দুই ব্যক্তির নামের ইঙ্গিত করেন নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্যবাসী দক্ষিণাবর্ত্তনাথ 'মেঘদূত'-এর টীকা করেন, এঁর টীকাতেই প্রথম এই শব্দদুটির অর্থান্তরে বৌদ্ধপণ্ডিত দিঙ্‌নাগ এবং কবি নিচুলের উল্লেখ মেলে। (গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মেঘসন্দেশ', ত্রিবান্দ্রম, ১৯১৯, পৃ. ১৩ দ্র.)। মল্লিনাথের জীবনকাল চতুর্দশ শতক, তিনি পূর্ববর্তী টীকাকার দক্ষিণাবর্ত্তনাথের টীকা থেকে দিঙ্‌নাগ ও নিচুল শব্দের অর্থান্তরের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন মনে করা যায়। তাঁর রঘুবংশ-এর টীকার মঙ্গলাচরণে—"তথাপি দক্ষিণাবর্ত্তনাথদ্যৈঃ ক্ষুণ্ণবর্ত্ম সু...." ইত্যাদি উল্লেখ থেকে বোঝা যায় তিনি দক্ষিণাবর্ত্তনাথের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কালিদাস-বিশেষজ্ঞ অনেকেই মনে করেন— এই ব্যাখ্যা টীকাকারদের মনগড়া। এমন-কী হরপ্রসাদও 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' বইয়ের পূর্বমেঘ অংশে ১৮ অনুচ্ছেদে মল্লিনাথের টীকা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। নিচুল অর্থ বেতগাছ। দিঙ্‌নাগ পৌরাণিক বিশ্বাস মতে অষ্টদিক-রক্ষী ঐরাবত, পুণ্ডরীক ইত্যাদি অষ্টহস্তী। "বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিঙ্‌নাগের বাড়ি কাঞ্চি, মেঘ উঠিতেছে রামগিরি হইতে। রামগিরি সরগুজার অন্তর্গত রামগড়, সুতরাং কাঞ্চীর দিঙ্‌নাগ মেঘের গায়ে শুঁড় বুলাইবে কিরূপে?" এই বইয়ের....পৃ. দ্র.

৮. পুণ্যকর্মের ফল নিজ মুক্তি ও পাপকার্যের ফল সাংসারিক বন্ধন। এই দুটিতেই স্বনীয় সেই পরম পদ। সুন্দর বামভাগবিশিষ্ট আমি বলভদ্র তাঁকেই নতমস্তকে বন্দনা করি।

৯. ব্যাকরণ চর্চার ঐতিহ্য প্রসিদ্ধি আছে যে আদি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ইন্দ্র। ঐন্দ্র ব্যাকরণ বিষয়ে তথ্যের জন্য দ্র. A. C. Burnell, The Sanskrit Grammarians, 1875.

১০. আমি তরলা নামে কালিদাস মতের অনুগামিনী এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকেই উপস্থাপিত করব যা নিজ মিত্র কালিদাসের রচিত শব্দরত্নগুলির অর্থপ্রকাশকারী।

ভবভূতি

মহাকবি ভবভূতির[১] তিনখানি পুস্তক চলিত আছে। তাহার মধ্যে উত্তররামচরিত সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট। সংস্কৃত সাহিত্যে উত্তররামচরিত-এর মতো উৎকৃষ্ট নাটক, মনোহর উপদেশপূর্ণ সরস কাব্য আর নাই। তাই মনে করিতেছি, উত্তররামচরিত-এর ব্যাখ্যা করিব। কোনো কবির কাব্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাঁহার সম্বন্ধে দু-চারি কথা বলা দরকার। সংস্কৃত কবিদের সম্বন্ধে দুই-চারি দূরে থাকুক, একটি কথাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ভবভূতি সম্বন্ধে ভাগ্যক্রমে আমরা অনেক কথা জানি। তিনি নিজে আপনার তিন পুরুষের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি বড়ো পণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাগ-যজ্ঞাদি তাঁহাদের বাড়িতে সর্বদাই হইত। তিনি নিজেও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ পড়া ছিল; কামসূত্র তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল। কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার বড়ো একটা অভিমান ছিল না। তিনি কবি বলিয়া আপনার গৌরব করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার খুব দখল ছিল। তিনি ইচ্ছামতো কী পদ্য, কী গদ্য রচনায় হাত ফিরাইয়া লইতে পারিতেন। কখনো লিখিতেন একেবারে বেদ-ভাঙা, কখনো লিখিতেন ব্রাহ্মণ বা উপনিষদের ভাষায়, কখনো-বা ভাষ্য-রচনার প্রণালীতে ভাষা প্রয়োগ করিতেন, কখনো-বা কাদম্বরী-হর্ষ-চরিতের ভাষাও অনুকরণ করিতেন; কিন্তু যখন যে ভাবেই লিখুন, বোধ হইত যেন, এই তাঁহার নিজের ভাষা-প্রণালী। সংস্কৃত কবিদের জন্মভূমির প্রায় ঠিক পাওয়া যায় না। ভবভূতির কিন্তু সেটা ঠিক আছে। দক্ষিণাপথে পদ্মাবতী তাঁহার জন্মভূমি। উহা পারা ও সিন্ধু নামক দুইটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখনো ঐ নগর বর্তমান আছে। উহা বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। গুরুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; তিনি আপন গুরুর নাম

করেন নাই, "জ্ঞাননিধি" এই বিশেষণটি দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, কুমারিল ভট্ট[২] ভবভূতির গুরু ছিলেন। ভবভূতির সময় শংকরাচার্য প্রাদুর্ভূত হন নাই। সুতরাং কুমারিলের পর ও শংকরাচার্যের পূর্বে তাঁহার জন্ম। কনোজপতি হর্ষবর্ধনের রাজ্য ভাঙিয়া যাওয়ার দু-এক পুরুষ পরে কনোজে যশোবন্ত দেব নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা হন। তাঁহার সভায় ভবভূতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার সভায় আরো অনেক কবি ছিলেন। বাক্‌পতিরাজ[৩] ভবভূতির চেলা। ইনি যশোবন্তের গুণাগান করিয়া গৌড়-বধ নামে এক প্রকাণ্ড প্রাকৃত কাব্য ফাঁদিয়াছিলেন; কিন্তু উপক্রমণিকা ভিন্ন আর কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

একবার কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সঙ্গে যশোবন্তের যুদ্ধ হয়। যশোবন্ত যুদ্ধে পরাস্ত হন। কিন্তু ললিতাদিত্য বলেন যে, যদি ভবভূতি একবার অনুগ্রহ করিয়া কাশ্মীরে আসেন, তাহা হইলে তিনি সন্ধি করিবেন। এই উপলক্ষে ভবভূতি কাশ্মীর যান এবং আপনার আশ্রয়দাতার মানসম্ভ্রম বজায় করিয়া আসেন।

একে ব্রাহ্মণ, বড়ো বংশে জন্ম, সর্বদা যাগ-যজ্ঞে ব্যস্ত, সর্বদা লোকহিতকর কার্যে—পুষ্করিণী-খনন, রাস্তা-নির্মাণ প্রভৃতিতে নিযুক্ত, অর্থ-সামর্থ্য যথেষ্ট, তাহাতে আবার প্রগাঢ় পণ্ডিত, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, এবং সু-কবি। ভবভূতি প্রথম হইতেই কাব্য-কলাকে পবিত্র, উদার, মনোহর, উচ্চ উপদেশে পূর্ণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে কোথাও ছ্যাবলামি নাই, কোথাও একটা শব্দশ্লেষ নাই, লোকের সম্মুখে আদর্শ-চরিত্র দেখানোই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য। এই আদর্শ-পুরুষের চরিত্র দেখিয়া লোক পবিত্র হউক, এইটিই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য। তাঁহার জীবনকালে লোকে তাঁহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই তিনি গভীর ক্ষোভে বলিয়াছেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।।[৪]

বাস্তবিকও তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে ভারতবর্ষের যে দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নাম, তাঁহার কাব্য এবং তাঁহার উদ্দেশ্য এক প্রকার লোপই

পাইয়াছিল। আবার ইংরেজ-রাজত্বে চারিদিকে লেখাপড়ার চর্চায় কাব্য অলোচনায়, কলাশিক্ষায়, নানাদেশীয় উচ্চ আদর্শ দর্শনে আমাদের ভবভূতিকে আদর করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে ও সময় আসিয়াছে।

আমাদের কাছে, সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের কাছে ভবভূতির আদর আত্মীয়কুটম্বের আদরের মতো। ভট্ট কুমারিল স্বামী গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে যে পথে চালাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজিও সেই পথে চলিয়াছে। সেই বেদে অচলা ভক্তি, সেই যাগযজ্ঞের ফলে বিশ্বাস, সেই দেবতা-ব্রাহ্মণের সেবায় অনুরাগ অক্ষুণ্ণ আছে। তাই যদি হইল, তাহা হইলে কুমারিলের প্রথম চেলা ভবভূতি আমাদের শীর্ষস্থানীয়, আত্মীয়স্বজন এবং আদর্শ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের আদর্শ হইতে গেলে যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, ভবভূতির সে-সবই প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তাঁহার রচনায় চরিত্রের— হৃদয়ের গাম্ভীর্য; রচনা, চরিত্র ও হৃদয়ের উদারতা— প্রশস্ততা আমাদের পরমপূজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সকল সময়ে, সকল অবস্থায় সকল প্রকার মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দয়ার পার নাই; কিন্তু সে দয়ার মধ্যেও অন্যায়ের প্রতি তাঁহার ভ্রূকুটি ও ক্রটি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতি আমাদের আদর্শ— অনুকরণীয়। তিনি আবার আমাদের জন্য যে যে আদর্শ ও অনুকরণীয় চরিত্র চিত্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আজি আমরা সেই চরিত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কার্যটি গভীর হইতেও গভীর; দুরূহ হইতেও দুরূহ। পারিব কি, ভরসা নাই। কিন্তু আর যখন কেহ করেন নাই, তখন আমার লেখার অধিকার আছে, ভবিষ্যতের সুধীগণ আমা অপেক্ষা ভবভূতির অধিক আদর করিতেছেন, দেখিলেই কৃতার্থ হইব।

ভবভূতি উত্তরচরিতের প্রথমেই পূর্ববর্তী কবিগণের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি এই-সকল কবির নিকট বিশেষ ঋণী। বাল্মীকির নিকট তাঁহার ঋণের কথা বলিয়া দিতে হইবে না। রামায়ণই তাঁহার অবলম্বন, তাঁহার মূল, রামায়ণ পড়িয়াই তাঁহার কবিত্বের উচ্ছ্বাস; কিন্তু কালিদাসের নিকটও তিনি অল্প ঋণী নহেন। প্রতি অঙ্কেই তিনি কালিদাসের সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহার যে-সকল অদ্ভুত সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিয়া সহৃদয় লোক মুগ্ধ হন, সে সৃষ্টির মূল কালিদাসের অপূর্ব কাব্য-সমূহে নিহিত আছে। মূল কালিদাসে থাকিলেও ভবভূতি এই মূল হইতে চারিখানি বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছেন; তাহাদিগকে এমনি পুষ্প-ফলে সুশোভিত করিয়াছেন যে, কালিদাসও

যদি দেখিতে পাইতেন, প্রেমভরে ভবভূতিকে গাঢ় আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একটি উদাহরণ দিব। কালিদাস রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গের ২৫ কবিতায় বলিয়াছেন—

তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থা-
নাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু
সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্।।[৫]

রাম-সীতার ঘরে নানারূপ ছবি ছিল, তাঁহারা নানারূপে সুখভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে যে-সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, এখন সে-সকল কথা স্মরণ করিলে আনন্দ হইত।

ভবভূতি দণ্ডকারণ্যের দুঃখগুলির সঙ্গে ছবিগুলির একটা সম্পর্ক ঘটাইয়া উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কে চিত্র-দর্শন ব্যাপারটি ঘটাইয়া তুলিলেন। নৈষধকার শ্রীহর্ষ 'ইন্দ্রিয়ার্থান্' পদের সহিত 'চিত্রবৎসু' শব্দের একটা সম্পর্ক ঘটাইয়া নৈষধের অষ্টাদশ সর্গে যে-সকল কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও মনে মনে ঘৃণার উদয় হয়।[৬] তিনি নলরাজার বিলাসভবনের দেয়ালে কতকগুলি চিত্র রাখিয়াছেন, একখানিতে ব্রহ্মা তাঁহার কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান। সন্ধ্যা ভয়ে বেগে পলায়ন করিতেছেন, আর একখানিতে ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ করিয়া গৌতমের সর্বনাশ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভাবভূতি 'ইন্দ্রিয়ার্থান্'-এ পদের সহিত না লইয়া 'চিত্রবৎসু' শব্দটি 'প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্' এই পদের সঙ্গে লইয়াছেন। রামচন্দ্রের ঘরে আমরা মনে করিলাম, তাঁহার দণ্ডকারণ্যবাসকালে যে-সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহারই ছবি ছিল। কিন্তু ভবভূতি আরো একটু বাড়াইয়া তুলিলেন। তিনি রামচন্দ্রের বাল্যকাল হইতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত সমস্ত জীবন-চরিতের ঘটনাগুলি চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া আনাইলেন। কেবল দণ্ডকারণ্যের ছবিতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না; তিনি পুরাপুরি ছয় কাণ্ডের ছবি লিখাইয়া আনিলেন।

এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে। ভবভূতি রামায়ণ হইতে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। মহাবীরচরিত প্রথম ছয় কাণ্ড লইয়া, উত্তররামচরিত উত্তর কাণ্ডের

ব্যাপার লইয়া। মহাবীরচরিত উত্তরচরিতের উপক্রমণিকা। কাব্যের মাধুরী, শিল্পের বাহাদুরি, প্রাণের তরঙ্গ প্রভৃতি দেখিয়া বিচার করিতে গেলে দুখানি পুস্তকে আকাশপাতাল তফাত হইলেও রামচন্দ্রের চরিত্রে চমৎকারিতা দুই গ্রন্থেই সমান। তবে কেন ভবভূতি উত্তরচরিতে রামচন্দ্রের দেব-চরিত্রের আবার সমালোচনা করেন? আবার কেন তাহার ব্যাখ্যা লইয়া বিব্রত হন? কারণ, রামের দেবাধিক চরিত্রে জগৎ মুগ্ধ করাই তো চিত্রদর্শন প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য যখন মহাবীরচরিতেই সিদ্ধ হইয়াছে, আবার এককথা দুইবার বলা কেন? ইহার কারণ এই যে, মহাবীরচরিত ভবভূতির প্রথম অবস্থার লেখা। রামায়ণের রামচরিত্রে দোষ আছে, মহাবীরচরিতে সে দোষগুলি লুকাইয়া রামচরিত পূজনীয় দেবচরিত করিয়া ফেলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি ইচ্ছামতো রামায়ণের গল্পটিকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিয়াছেন।

বিবাহের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসেন নাই, জনক-নগরী হইতেই তিনি বনবাস গিয়াছিলেন। পরশুরামের সহিত রামায়ণের গল্পে মিথিলা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে দেখা; আর বীরচরিতে বিবাহের পূর্বে জনকের অন্তঃপুরেই তাঁহার সঙ্গে দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশি বয়সে ভবভূতি দেখিলেন, রামায়ণ হইতে এত তফাত করিয়া ভালো করি নাই। তাই উত্তররামচরিতে বীরচরিতের গল্পটিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া আবার সেই পুরানো রামায়ণের পথে চলিয়াছেন; আবার রামকে অযোধ্যায় আনিয়াছেন, পরশুরামের সঙ্গে পথে দেখা করাইয়াছেন, বহু পরিমাণে বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়াছেন। কালিদাস সেপথ ছাড়েন নাই; ভবভূতি ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বীরচরিত উত্তরচরিতের উপক্রমণিকা নহে। উত্তরচরিত একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাব্য। বীরচরিত আর-একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাব্য। উত্তরচরিত-ব্যাখ্যায় আর মহাবীরচরিতের কথা তুলিব না। ভবভূতিও তুলেন নাই। মহাবীরচরিত ছাঁটিয়া ফেলিলে রামায়ণের পূর্ব পূর্ব ঘটনাগুলি তো দর্শকগণের মনে করিয়া দেওয়া চাই। তাই কবি কৌশল করিয়া সীতার মনের স্ফূর্তি জন্মাইয়া দিবার জন্য চিত্রগুলি আনাইয়াছেন। এক ঢিলে অনেকগুলি পাখি মারিয়াছেন। প্রথম, দর্শকের পূর্বকথা মনে করানো হইয়াছে, দ্বিতীয়, রামচরিতে জগৎ মুগ্ধ করা হইয়াছে, তৃতীয়, সীতার প্রেমের পবিত্র ছবি দেখানো হইয়াছে, চতুর্থ, চিত্রদর্শনকে উত্তরচরিতের উপক্রমণিকা করিয়াছেন। এ শিল্প-কৌশল বড়ো চাপা। বিশেষ প্রণিধান করিয়া না দেখিলে দেখা যায় না। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে কৌশলী

কবির কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। অনেকে বলেন, শিল্পকৌশল কালিদাসের শকুন্তলায় যেমন পরিস্ফুট, উত্তরচরিতে তেমন নাই। উহাতে শিল্প-কৌশলের বড়ো অভাব। আমরা বলি, কৌশলের অভাব নাই, আমাদের দৃষ্টিতে অভাব। সে কৌশল বড়ো চাপা। কিন্তু কৌশল সর্বত্র বর্তমান। এমন একটি উক্তি-প্রত্যুক্তি নাই— যাহাতে উদ্দেশ্য নাই, যাহাতে কৌশল নাই।

আমার এ ব্যাখ্যার প্রধান উদ্দেশ্য, ভবভূতির এই লুকানো কৌশল কতক পরিমাণে দেখাইয়া দেওয়া, প্রকাশ করিয়া দেওয়া, আর ভবভূতি রামচন্দ্রের যে আদর্শ-চরিত রচনা করিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে পরিস্ফুট করা। কবির আরো অনেক ছোটোখাটো উদ্দেশ্য আছে, তাহা ব্যাখ্যার মুখে যথাস্থানে বলিয়া যাইব। উত্তরচরিতের প্রত্যেক উক্তি, প্রত্যেক প্রত্যুক্তি, প্রত্যেক কবিতার ব্যাখ্যা কবির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার এখনো সময় আসে নাই। ভবভূতিকে আগে জাহির করিতে হইবে। তাঁহার যথাযোগ্য আদর যাহাতে হয়, তাহাই প্রথমে করিতে হইবে। তাঁহার মোহিনী মন্ত্রসাধনা করিয়া সহৃদয়বর্গকে মাতাইতে হইবে, তন্ময় করিতে হইবে। তাহার পর সে ব্যাখ্যার দিন আসিবে। উজ্জ্বল মহামণি কখনো খনির মধ্যে চিরদিন থাকিবে না। তাহাকে কেহ-না-কেহ উঠাইবেই উঠাইবে। উঠাইলে পরও তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে। তবে তো তাহার দাম কষার সময় হইবে। ভবভূতি-মহা-মহা-মণি, তুলিয়া তাহাকে পরিষ্কার করো, তবে তো তাহার ব্যাখ্যার সময় আসিবে।

ভবভূতির প্রধান উদ্দেশ্য রামচরিত উজ্জ্বল করা। উজ্জ্বল করিবার জন্য তিনি অভিষেকের পরই রামচন্দ্রের জননীগণকে দূরদেশ জামাই-এর বাড়ি যজ্ঞে পাঠাইলেন। যজ্ঞটি একটি মহাসত্র; বারোবছর ধরিয়া যজ্ঞ হইবে। সুতরাং বৃদ্ধা রানীরা বারোবছর বাড়ি আসিবেন না। যজ্ঞ-ব্যাপার, সুতরাং সম্বন্ধীর বাড়ির গুরু-পুরোহিতকেও বরণ করার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। সে গুরু সে পুরোহিত আর-কেহ নহেন, স্বয়ং বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ ভিন্ন তখন কি যজ্ঞ হইতে পারিত? যজ্ঞেশ্বর না থাকিলে কি যজ্ঞ পূর্ণ হয়? যেখানে বশিষ্ঠ, সেইখানেই অরুন্ধতী। সুতরাং নূতন রাজ্যশাসনকার্যে এ বারোবছরের জন্য রামচন্দ্র একা। একাই তাঁহাকে সংসারধর্ম করিতে হইবে, রাজ্যপালন (এখনকার মতো শুদ্ধ শাসন নহে) করিতে হইবে। তাহার উপর আবার সীতা পূর্ণগর্ভা। তাঁহার যাহাতে মনটি ভালো থাকে, সুসময়ে নির্বিঘ্নে প্রসব হয়, সেটি করিতে হইবে। অল্পবয়সে যে-

সকল কাজে প্রবীণের পরামর্শ লইতে হয়, রামচন্দ্রকে অল্পবয়সে সে কাজগুলি নিজেই করিতে হইবে। তাই না হোক রামচন্দ্র গৃহকার্যে দক্ষ হউন; কিন্তু তাহাও নহে। তিনি এই সবে বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংসারের-রাজ্যের-সন্তানপালনের তিনি এত দিন কোনো ধারই ধারেন নাই, যে কদিন বা বাড়ি আসিয়াছেন, অভিষেকের আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে। সে তো বড়ো সোজা ব্যাপার নয়। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার করতলগত। সব দেশের রাজারাজড়ারা করনেশনে [coronation] আসিয়াছেন। তাঁহাদের আদর করা— অভ্যর্থনা করা— অভিষেক-ব্যাপারে একটা জম-জমাট করা— ইহাতেই তাঁহার সময় কাটিয়াছে। কিছুকাল ধরিয়া অষ্টপ্রহর আনন্দ-উৎসব হইয়াছে। তাহার পর বিদায়ের পালা। সুগ্রীব বিদায় হইয়াছেন, বিভীষণ বিদায় হইয়াছেন, বড়ো বড়ো বানর, সীতা উদ্ধারের সহায়, সকলে বিদায় হইয়াছেন। শেষ ছিলেন রাজা জনক, তিনিও বিদায় হইয়াছেন। সকলে গিয়াও জনক যদি থাকিতেন, সীতার মনটায় স্ফূর্তি থাকিত; কিন্তু তিনি সাগ্নিক, যে কয়দিনের জন্য অগ্নিসেবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহর পর তাঁহার এক মিনিটও থাকিবার জো নাই। সুতরাং তিনিও বিদায় হইলেন।

রামচন্দ্র মহা গোলে পড়িলেন, পূর্ণগর্ভ অবস্থায় মনের স্ফূর্তি না থাকিলে সন্তানের অনিষ্ট হইবে, সীতার শরীরের অসুখ হইবে। এই সন্তানই রঘুবংশের রাজা হইবেন, সন্তানের কোনোরূপ হানি না হয়, সীতা যাহাতে মনমরা না হন, সেটা তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাই তিনি বিচারাসন ত্যাগ করিয়া বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া দিয়া কবি প্রস্তাবনা শেষ করিলেন।

রামচন্দ্র ঘরে আসিয়াই দেখিলেন, সীতা বিরস-বদনে বসিয়া আছেন। দেখিয়াই কাছে বসিয়া বলিলেন, "জানকি, ভাবিয়া ভাবিয়া মন খারাপ করিও না। শ্বশুর মহাশয় কি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু কী করিবেন, তিনি সাগ্নিক, নিত্যই তাঁহার বাড়ি কর্ম আছে। তিনি তো আর যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন না। তাহাতে আবার তিনি গৃহস্থ; অগ্নি-সেবার ত্রুটি হইলেই দেবতারা কুপিত হন। গৃহস্থের পক্ষে সেটা তো ভালো নয়, তাতে সবারই অমঙ্গল আছে।" সীতা উত্তর দিলেন, "জানি, নাথ, জানি; কিন্তু কী করি, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া গেলেই মন খারাপ হয়।"

রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সংসারের ভাবই এমনি। ইহাতে

যেখানটিতে একটু সামান্য ঘা লাগিলেই প্রাণান্ত হয়, হৃদয়ের সেই মর্মস্থান ছিঁড়িয়া যায়। এইজন্যেই সুবোধ লোকে সংসারের নিন্দা করিয়া থাকেন আর সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া বনে বাস করেন।”

এই কয়টি কথায় রামচন্দ্রের হৃদয়ের গাম্ভীর্য যেরূপ বিকাশ হইয়াছে, আর কিছুতে এত হইতে পারে না। রামচন্দ্রের এই গভীর গাম্ভীর্যটুকুই কবি আমাদিগকে সর্বপ্রথমে দেখাইলেন। নিষ্কাম ধর্ম, গৃহ-সন্ন্যাস, অসঙ্গঃ কুকর্ম্মাণি প্রভৃতি যে-সকল হিন্দু-নীতির মূল সূত্র লইয়া আমরা আজিকালি বক্তৃতার ছড়াছড়ি, প্রবন্ধের হুড়াহুড়ি করিয়া থাকি, ভবভূতি সেই মূলমন্ত্র রামচন্দ্রের মুখে এমনই গভীর সময়ে গভীরভাবে উচ্চারণ করিাইলেন যে, রামচন্দ্রের হৃদয়ের গাম্ভীর্য আমাদের চক্ষে একেবারে ফুটিয়া উঠিল। আমরা যেন একটা গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, সে সমুদ্র সংসারের মায়ায় ভরা, জীবের প্রতি করুণায় ভরা; কিন্তু সে মায়ায় নিজের কোনো কামনা নাই, সে মায়ায়— সে করুণায় স্বার্থ নাই, সে হৃদয়ের নিজের টান সেই বনের দিকে— নির্লিপ্ত হইবার দিকে— পবিত্র হইবার দিকে— নির্মল হইবার দিকে। সে হৃদয় জীবের ব্যথায় ব্যথিত— আত্মবলিদানে কৃতসংকল্প।

রামচরিত্রের গাম্ভীর্য দেখাইয়া কবি হাত ফিরাইয়া লইলেন; তাঁহার হৃদয়ের আর-একটি কোমল হইতেও কোমলতর ভাবে আঘাত করিলেন।

কঞ্চুকী আসিল, বলিতে গেল “রামভদ্র” অমনি মনে পড়িল, এখন যে উনিই রাজা। অমনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, “মহারাজ।” রামচন্দ্র তাহাকে আর কথা কহিতে দিলেন না, বাধা দিয়া বলিলেন, “আর্য, আমার পিতার সেবকেরা আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেই শোভা পায়, তাহাতে সমাদরের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। অতএব আপনার যেমন অভ্যাস আছে, তেমনই বলিয়া যাউন।” বুড়া কঞ্চুকী জড়সড় হইয়া আর কোনো সম্বোধনই করিতে পারিল না; আসল কথাটা বলিয়া ফেলিল, “ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে অষ্টাবক্র আসিয়াছেন।” কবি চাকর-বাকরের প্রতি রামচন্দ্রের দয়া ও অনুগ্রহের একটা উদাহরণ দিয়া গেলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ আসিয়াছে শুনিয়া সীতা বড়ো ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শাশুড়িরা কে কেমন আছেন, শুনিবার জন্য বড়ো ব্যাকুল হইলেন। যাহারা কাছে নাই তাহারা ভালো আছে শুনিলেও মনটা ঠাণ্ডা

হয়। কঞ্চুকীকে বলিলেন, "আর্য, তবে কেন দেরি করিতেছেন?" রামচন্দ্রও একটু হাঁফ ছাড়িলেন; সীতাকে খুশি করার একটা উপায় হইল, গুরুজনের কাছ থেকেও একটি খবর আসিল, বলিলেন, "শীঘ্র লইয়া আইস।" সীতার কথা ও রামের কথা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, সীতা স্ত্রীলোক, তিনি বিলম্ব সহিতে পারিতেছেন না, আর রাম গম্ভীরভাবে আদেশ করিতেছেন, শীঘ্র লইয়া আইস।

অষ্টাবক্র আসিলেন, আশীর্বাদ করিলেন। রাম ও সীতা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; কিন্তু কথা কহিলেন সীতা আগে । ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার গুরুজনগণের মঙ্গল তো? আজ্ঞা শান্তা ভালো আছেন তো?" সীতা ঠাকুরজামাই-এর নামটা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। সীতার সহিত তো আর বিদেশবাসী নন্‌দাই-এর তত ঘনিষ্ঠতা নাই। রামচন্দ্র সেটুকু সারিয়া লইলেন, তিনি প্রথমেই ভগিনীপতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; কারণ, তিনি জানেন, ঋষ্যশৃঙ্গের মঙ্গলেই আর-সকলের মঙ্গল, তাই ভগিনী ও ভগিনীপতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যে বড়ো যজ্ঞ করিতেছেন, তাহাতে যে রামচন্দ্র খুশি হইয়াছেন, এবং ভগিনীপতির শ্লাঘা করিতেছেন দেখাইবার জন্য ভগিনীপতির নামের পূর্বে 'সোমপীথি' এই বিশেষণটি দিলেন। সীতার কথা যেন এখনো শেষ হয় নাই, রামচন্দ্র যেন সীতাকে বাধাই দিয়াছেন, তাই সীতা আবার বলিতেছেন— "আমাদের স্মরণ করেন তো?" ভালোবাসার জিনিস আমায় ভুলিয়াছে, একথাটা মনে হইলে বড়ো ব্যথা হয়, তাই সীতা স্ত্রীলোক কিনা, আগে-ভাগে সেই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। রামের গাম্ভীর্য তাঁহাকে সেটুকু বলিতে দিল না।

অষ্টাবক্র দুজনের সমস্ত কথার জবাব দিলেন একটি ছোট্ট "হাঁ" বলিয়া। তাহার পর সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বশিষ্ঠদেব আপনাকে বলিযাছেন, ভগবতী বসুন্ধরা আপনাকে প্রসব করিয়াছেন, দশজন প্রজাপতি-মধ্যে একজনের ন্যায় জনকরাজা আপনার পিতা। আপনি রঘুকুলের বধূ— এ যে-সে কুল নয়, ইহার এক গুরু সূর্যদেব আর-এক গুরু অহং বশিষ্ঠঃ। তা তোমার তো সবই আছে, তোমায় আর কী আশীর্বাদ করিব, তুমি যে সন্তান প্রসব করিবে, সে যেন একজন মহাবীর হয়।" এই অবধিই সীতা চুপ, আর অনেকক্ষণ তাঁহার কথা সরে নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, সীতা স্বামীর সামনে ঐ আশীর্বাদটা শুনিয়া লজ্জায় অনেকক্ষণ মুখ তুলিতে পারেন নাই। আর ভবভূতি ব্রাহ্মণের মতো—

কুমারিলের চেলার মতো কথায় ব্রাহ্মণের আশীর্বাদটা কেমন চালাইয়াছেন দেখিবেন— ষষ্ঠ অঙ্কে চন্দ্রকেতু যখন রামের কাছে তাঁহার অপরিচিত পুত্রকে introduce করিয়া দেন, তখন বলিতেছেন— "অশ্বানুযাত্রিকেভ্যঃ তাতপ্রতাপাবিষ্করণমুপশ্রুত্য বীরায়িতমনেন"[৭] ব্রাহ্মণের আশীর্বাদটা কেমন হাড়ে হাড়ে ফলিয়াছে, সেটা দেখাইয়া দিয়াছেন। সীতা চুপ করিয়া গেলেও রামচন্দ্র বড়ো খুশি হইলেন। তাঁহার যেটা ভয়, পাছে সন্তানের অনিষ্ট হয়, বুঝিলেন, বশিষ্ঠের আশীর্বাদে সেটা হইবে না। বলিলেন, "বশিষ্ঠদেবের বড়ো অনুগ্রহ। সংসারে সাধু ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহারা অর্থ বুঝিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু ঋষিরা— বিশেষ যাঁহারা ঋষির ঋষি, তাঁহারা যা বলেন, অর্থ তাঁহাদের বাক্যমতো ফলিয়া থাকে।" অর্থাৎ ইঁহারা যা বলেন, তাই ফলে, আর অন্য লোকে যা ফলে, তাই বলে। এইজন্যই শকুন্তলায় গৌতমী বলিয়াছেন, "বরো ক্খু এসো ণ আসিসা।" [এ আশীর্বাদ নয়, এ বর-ই]। অষ্টাবক্র আবার বলিলেন, "দেবী অরুন্ধতী, দেবীরা ও আর্যা শান্তা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, এ অবস্থায় সীতা যখন যাহা চাহিবেন, তখনই তাহা করিয়া দিতে হইবে।" রাম বলিলেন, "দিতে তো রাজি আছি, ইনি বলেন কৈ?" আহা, সীতা এমনই সুশীলা, কোনো মনোরথের কথা বলিয়া স্বামীকে কষ্ট দিতে তিনি একেবারে চাহেন না, মনে হইলেও মুখ ফুটিয়া বলেন না। তিনি একটিবারমাত্র একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সর্বনাশ হইল, না বলিলেই যেন ছিল ভালো।

অষ্টাবক্র সীতাকে লজ্জায় অধোমুখ দেখিয়া আর তাঁহাকে সম্বোধন করিতে পারিলেন না। Third person-এ বলিলেন, দেবীকে তাঁহার নন্‌দাই বারম্বার বলিয়াছেন, বৎসে, পূর্ণগর্ভা বলিয়া তোমায় আনিতে পারি নাই। তুমি পাছে মনমরা হও, তাই তোমার স্ফূর্তির জন্য রামকেও তোমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। তা তোমার সঙ্গে যখন দেখা করিতে যাইব, তোমার যেন কোলজোড়া ছেলে দেখিতে পাই।

এইকথা শুনিয়া রামের একটু আনন্দ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিলেন, সম্বন্ধী বড়ো দুষ্ট, সীতার স্ফূর্তির জন্য আমায় এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, ছিঃ! আমার যেন অন্য কাজ নাই। লজ্জা হওয়ায় রাম ও-কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, "তা বশিষ্ঠদেব আমায় কিছু আজ্ঞা করেন নাই?"

"হ্যাঁ, করেছেন বৈ কি! বলেছেন, আমরা জামাই-এর যজ্ঞে আবদ্ধ হয়ে

~ ~

পড়েছি। তুমি বালক, রাজ্য নূতন, তা, সর্বদাই প্রজাপালনে রত থাকিবে, সেই যশই তোমাদের পরম ধন।"

রাম বলিলেন, "তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। প্রজাদের আরাধনায় যদি আমায় স্নেহ, দয়া, সুখ-সমূহ, এমন-কী, সকলের উপর— স্নেহেরও উপর— দয়ারও উপর— আপনার প্রাণের উপর যে জানকী, তাঁহাকেও যদি বিসর্জন দিতে হয়, তাহাতে আমি ব্যথিত হইব না।"

এমন লম্বা কথাগুলা বলা ভালো নয়, শুনতে বেশ, যে বলে, তাহার উপর ভক্তি হয়। যে আবার করিয়া উঠিতে পারে, তাহার উপর আরো ভক্তি হয়। কিন্তু ওরূপ কথাগুলায় ফল বড়ো ভালো হয় না। মদন একবার "কুর্য্যাং হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ" বলিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্রও এইকথা বলিয়া ফাঁপরে পড়িবেন; "নাস্তি মে ব্যথা" এ কথাটার force রাখিতে পারিবেন না, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবেন। পাথর কাঁদিবে, বজ্রের হৃদয় দলিত হইবে।

এইবার সীতার কথা ফুটিল। রামের কথা শুনিয়া সরলা মনের আবেগে রামচরিত্রের নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "এইজন্য, এত পারো বলিয়াই তুমি রঘুকুলের রাজা।" স্বামী আমায় ত্যাগ করিতে পারেন শুনিয়াও যে স্ত্রী স্বামীর চরিত্রে শ্লাঘা করিতে— স্বামীর গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতে পারে, সে দেবী— অথবা সীতাকে দেবী বলিলে সীতার কি গৌরব হয়? আমাদের ভাষারই অভাব দেখাইয়া দেওয়া মাত্র।

রামচন্দ্র কী ভাবিলেন, জানি না। ভাবিলেন বোধ হয়, মনে যাই থাক, কথা না বলিলেই— অত খুলিয়া না বলিলেই যেন ভালো হইত, ভাবিয়া কথাটা ঢাকা দেওয়ার জন্যই বলিলেন, "কে আছ হে, অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাও।" অষ্টাবক্রের দৌত্য শেষ হইল। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এই যে লক্ষ্মণ আসিলেন।"

বলো দেখি, অষ্টাবক্র কেমন দৌত্য করিয়া গেলেন? লোকটার একেবারে humour নাই। ঋষিদের এবং তাঁহাদের শিষ্যদের বড়ো একটা থাকে না। থাকিলেও বোধ হয় রাজা রানী এদের সামনে ফোটে নাই। সটান আসিল পাণিনি-ভাঙা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। যে যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছিল, বলিয়া ফেলিল, "আমার কথাটি ফুরাল" বলিয়া চলিয়া গেল। অষ্টাবক্রের humour না থাকিলেও, থাকিয়া না ফুটিলেও ভবভূতির যেন একটু ফুটিয়াছে। এত সনক, সনাতন, বামদেব, গোতম, শতানন্দ, শাতাতপ, অসিত, দেবল প্রভৃতি নাম থাকিতে শিষ্যটির নাম তিনি অষ্টাবক্র

রাখিলেন কেন? রাখিলেন তো তাঁহার কথাগুলা বাঁকাইয়া দিলেন না কেন? তাঁহার কথা তো সব সোজা। এমন সোজা কথার লোকটিকে একেবারে অষ্টাবক্র বলিবার তাৎপর্য কী? এ পাত্রটি তো আর রামায়ণ হইতে লওয়া নয় যে, রামায়ণে ঐ নাম আছে বাপু, কী করিব? আছে— আছে— কারণ আছে, কথাগুলি সোজা হইলেও ওসব কথার মানে বড়ো বাঁকা দাঁড়াইয়াছিল। বশিষ্ঠের আশীর্বাদটা বাঁকা, "আর কী আশীর্ব্বাদ করিব।" কেন, আশীর্বাদের আর কিছু পাইলেন না? "স্বামিসোহাগিনী ভব", "অক্ষুণ্ণচরিত্রা ভব," "মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ" গোছের একটা আশীর্বাদ করিতে পারিতেন না? এই দৌত্যের সব কথাই শেষ বিষময় ফলে দাঁড়াইয়াছিল, তাই ভবভূতি দূতের নাম দিয়াছেন অষ্টাবক্র। আটবার বাঁকা কী করিয়া হয়, জানি না। তবে একটা কথা, অষ্টাবক্র শব্দটা আটবার আছে। একবার কঞ্চুকীর কথায়, একবার রামের কথায়, আর ছয়বার অষ্টাবক্র কথা কহিয়াছেন। এটা কি কাকতালীয়?

অষ্টাবক্র-সংবাদে রামচন্দ্রের গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, যজ্ঞাদিতে উৎসাহ প্রভৃতি কুমারিল-শিষ্যের প্রিয় গুণগুলি ফুটানো হইয়াছে।

তাহার পর লক্ষ্মণ আসিলেন। তাঁহার হাতে তক্তার উপরে আঁকা কতকগুলি চিত্র। ভবভূতির সময় এরূপ চিত্রের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল।[৮] অজন্তা গুহার চিত্রগুলি এই সময়ই লিখিত হয়। উহার রঙ এখনো টাটকা রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন কালিকার তৈয়ারি। এখনো ১০০০/১২০০ বৎসরের পূর্বে লিখিত পুথির মলাটে অনেক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি যেন এইমাত্র রঙ দেওয়া হইল। আমরা পুথির মলাটে, পুথির তালপাতার উপর এরূপ অনেক চিত্র দেখিয়াছি এবং তখনকার চিত্রবিদ্যার উন্নতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। লক্ষ্মণ যে চিত্র আনিলেন, তাহা তক্তার উপর রঙ দেওয়া ছবি। চিত্রগুলি লক্ষ্মণের ফরমাইস্‌মতো আঁকা হইয়াছে। লক্ষ্মণ ঠাকুর নিজে তাহার শিল্প-নৈপুণ্যে প্রীত হইয়াছেন। তাই অতি হৃষ্টমনে সেগুলি বড়ো-দা ও বড়ো-বৌঠাকুরানীকে দেখাইতে আনিয়াছেন। চিত্রগুলি সব রামচরিতের চিত্র।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়াই রাম বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমিই ধন্য, সীতার মন খারাপ হইলে তাঁহাকে কিরূপে প্রফুল্ল করিতে হয়, তাহা তুমিই জানো।" এই কথাতেও লক্ষ্মণ যত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যত দরদ করিয়া কাজ করিয়াছিলেন, যত যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ পুরস্কার হইল। রাম এক কথায় লক্ষ্মণকে খুশি করিয়া দিলেন।

রাম বলিলেন, "তা ইহাতে কতদূর পর্যন্ত আছে?"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত।" রামচন্দ্র পূর্বে লোকরঞ্জনার্থ সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি বলিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, আবার অগ্নিপরীক্ষার কথা উঠিলে আরো একটু অপ্রতিভ হইলেন। তখন apology করিবার সুবিধা হয় নাই। কারণ, তখন অষ্টাবক্র সম্মুখে, আর ওরূপ দৃঢ়তার পর apology-র সুবিধাও হয় না; তাই এই সময়ে পুরা apology-টা করিয়া লইলেন। বলিলেন, "ছি ছি, ও-কথা তুলিও না। জন্ম হইতেই যিনি পবিত্র, তাঁহাকে আবার আর কী দিয়া পবিত্র করা যায়? তীর্থোদক ও অগ্নি আপনিই পবিত্র, তাঁহাদিগকে আর কী দিয়া পবিত্র করিবে?" রাম দেখিলেন, এরূপ উড়ো কথায় apology-টা জমিবে না। তাই সীতাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন, 'দেবি', বিশেষণ দিলেন দেবযজনসম্ভবে; দেবতাদের যেখানে যজ্ঞ করা হয়, সেই পবিত্র ভূমি খুঁড়িতে তোমায় পাওয়া যায়, পবিত্র ভূমিই তোমার জননী, তোমার জন্মস্থান। পূর্বে যে বলিয়াছিলেন, "উৎপত্তিপরিপূতায়া", এখানে নিজেই তাহার টীকা করিলেন। এইরূপে সম্বোধন করিয়া তিনি সীতার নিকটে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। বলিলেন, "বড়ো ক্ষোভের কথা— তুমি যত দিন বাঁচিবে, এ কথাটা থাকিয়া যাইবে। আজ আমার কী দারুণ মনস্তাপ, লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তোমায় তখন আমায় কী কটু কথাই কহিতে হইয়াছিল। সে-সকল কথা তোমার যোগ্য কিছুতেই নয়, তথাপি আমার এমনি অদৃষ্ট মন্দ, সে-সকল কথা কহিতে হইয়াছিল। সুগন্ধ ফুল মাথায় করিয়াই রাখিতে হয়, আমি সেই ফুল পায়ে দিয়া দলিয়াছি।" Apology-র প্রত্যেক কথা সীতার কোমল হৃদয়ে বিঁধিল। রামের পরিতাপে তিনি বড়ো কাতর হইলেন, তাই কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "নাথ! হোক হোক। এসো লক্ষ্মণ, তুমি যে রামচরিত আঁকাইয়া আনিয়াছ, এসো, তাহাই দেখি।"

এই যে হোক হোক দুবার করিয়া বলা হইল, ইহার অর্থ বড়ো গভীর। ইহাতে সীতা যে রামের apology-তে লজ্জিত, সেটা বড়ো পরিস্ফুট। ছি! আমার উপর একটু কড়া হইয়াছিলেন বলিয়া এত দুঃখ? ছি, তা উনিই বা কী করিবেন, যেরূপ ঘটিয়াছিল, সেরূপ না করিলে তখন চলিত না, লোকে যে নিন্দা করিত। তা কড়াই বা কী বলিয়াছেন? যা ঠিক তাই বলিয়াছেন। তা তখনকার কথা তখন চুকিয়া গিয়াছে, আর সেকথা তোলা কেন, তার জন্য দুঃখ করাই বা কেন? ও কথাটা

চাপা দেওয়াই ভালো। তাই বলিলেন, "ও কথা যাক, এখন তোমার চরিত দেখা যাক। যে তুমি আমায় কড়া কথা বলিয়াছ, আমি সেই তোমারই চরিত দেখিয়া আনন্দলাভ করিব, এসো।" সীতার মনে যে কিছু মালিন্য ছিল না, এই কথায় তাহা প্রকাশ পাইল।

লক্ষ্মণ দেখাইলেন, "এই যে সেই চিত্র।"

সীতা ঠাহরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ কারা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপরে রহিয়াছে, আর যেন আর্যপুত্রকে স্তব করিতেছে?"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "এগুলি জৃম্ভক অস্ত্র। যাহার বিরুদ্ধে ছোড়া যায়, তাহারই হাই উঠে, ঘুম পায়। ইহাদের মন্ত্র আছে। কৃশাশ্বমুনি এই অস্ত্রগুলি কৌশিক বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিলেন। তাড়কাবধ কালে বিশ্বামিত্র অনুগ্রহ করিয়া এগুলি দাদাকে দিয়াছেন।"

রাম বলিলেন, "দেবি, এই স্বর্গীয় অস্ত্রগুলিকে নমস্কার করো। ব্রহ্মাদি দেব ও ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বেদরক্ষার জন্য এইগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এগুলি তো অস্ত্র নয়, তাঁহাদের তপস্যাই যেন তেজোরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

সীতা। —"আমি ইঁহাদিগকে নমস্কার করি।"

রাম বলিলেন, "এগুলি এখন তোমার সন্তানের হইবে।"

সীতা বলিলেন, "আমার প্রতি আপনার বড়ো অনুগ্রহ।"

অগ্নিপরীক্ষার কথা উঠা পর্যন্ত রামচন্দ্র একটু অপ্রতিভ ছিলেন। তাই তাঁহাকে একটু অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য, একটু পুরানো কথা মনে করাইবার জন্য, মনের একটু উৎসাহবৃদ্ধির জন্য এই জৃম্ভক অস্ত্রের কথা তোলা হইয়াছে, একটু রসান্তর যোজনা করা হইয়াছে। জৃম্ভক অস্ত্রের কথায় রামচন্দ্রের তাড়কা-বধের কথা, মারীচ-সুবাহুর কথা, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের কথা মনে পড়িল। তাঁহার একটু বেশ স্ফূর্তি হইল; অপ্রতিভ ভাবটা ঘুচিয়া গেল। এইকথা না পাড়িলে মিথিল-বৃত্তান্ত তুলিলে জমিত না। সীতাত্যাগের কথা সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা, তাহার পরই বিবাহের কথাটা তুলিলে সে বিবাহের কথাটাও একটু বিরস হইত। তাই মাঝে একটা অমনি মোলায়েম গোছের একটু বীররসের আভাস দেওয়া হইল।

এইবার মিথিলার ব্যাপার। সীতা বলিলেন, দেখো দেখো, আর্যপুত্রের ছবি দেখো, তাঁহার কী সুন্দর সুঠাম দেহ, কেমন গোল নিটোল— কেমন উজ্জ্বল চক্‌চকে, কেমন চোখ-জুড়ানো নীল রঙ— যেন নীলপদ্মের পাপড়িগুলি সবে মাত্র খুলিতেছে। পিতা তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন, পিতার চক্ষু বিস্ময়ে ক্রমেই বিস্তারিত হইয়া উঠিতেছে। আর আর্যপুত্র অনায়াসে শিবের ধনুকখানা ভাঙিয়া ফেলিতেছেন। পাঁচ চুড়াবাঁধা সে মুখখানি কী সুন্দরই দেখাইতেছিল।

সীতার সে আনন্দের দিন আবার মনে পড়িল। ধনুক ভাঙার দিন তাঁহার বড়ো উদ্বেগ হইয়াছিল, একে রামচন্দ্রের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, তাহাতে আবার ভয়— পাছে ধনুক তিনি ভাঙিতে না পারেন। তাই সেদিন প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার চিত্ত-ভিত্তিতেই চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। বাবার মুখখানি কেমন হইয়াছিল; রাম ধনুক কেমন করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার মাথার পাঁচটা চূড়া কেমন ভাবে নাড়িয়াছিল ইত্যাদি তিনি যেন চোখের উপর দেখিতেছিলেন। আঁকাও দেখিলেন ঠিক সেইরূপ। তিনি বড়ো সুখি হইলেন।

লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি, এদিকে আবার দেখুন, আপনার পিতা আর তাঁহার পুরোহিত শতানন্দ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বরযাত্রিগণের অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখুন।"

রাম বলিলেন, "এটা সত্যই দেখার জিনিস। জনকগোষ্ঠী আর রঘুগোষ্ঠীর বিবাহ সম্বন্ধে মিলন কাহার না প্রিয়? এখানে স্বয়ং বিশ্বামিত্র বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি।"

বিশ্বামিত্রের কথায় রামচন্দ্রের মুখে সত্য সত্যই লাল পড়ে। যিনি বিবাহের ঘটক, তাঁহার উপর লোকের একটা প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে, তাহার উপর আবার যদি স্ত্রী মনের মতো হয়— সে ঘটকের উপর ভক্তি আরো বাড়ে। দাম্পত্য-সুখে যতই সংসার সোনার সংসার হইতে থাকে, ততই সে ভক্তি আরো বাড়িয়া যায়, যদি লৌকিক ঘটকের উপরই এত ভক্তি হয়, তবে বিশ্বামিত্রের মতো ঋষি ঘটক হইলে সে ভক্তির আর পার থাকে না। ইহার উপর আবার বিশ্বামিত্র অস্ত্রবিদ্যায় রামের প্রধান গুরু, তাঁহাকে জাহির করার পক্ষে প্রধান উপকরণ, তাঁহাকে সুশিক্ষা দেওয়ার প্রধান গুরু। কেমন গল্প করিয়া পথ চলিতে চলিতে তাঁহাকে আস্তে আস্তে মানুষ —মানুষের মানুষ —আদর্শ মনুষ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এমন বিশ্বামিত্র দুই বংশের যে মিলন করিয়া দিয়াছেন, সে মিলন রামের বড়ো প্রিয়, তাই তিনি বলিতেছেন, সে মিলন সবারই প্রিয়। বাস্তবিকও উহা সবারই

প্রিয় হইয়াছিল। ঐ মিলন হইতেই ত্রৈলোক্যের ত্রাণ হয়— জগতে সর্বাঙ্গীন মিলন হয়। জৃম্ভকাস্ত্রের প্রশংসার পর এই ভাবে গভীর অতএব অস্ফুটভাবে বিশ্বামিত্রের প্রশংসা ঠিক সেই মতোই হইয়াছে। রামের মন ফিরিয়া আর-এক দিকে দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে তন্ময়তা আসিতেছে।

সীতা বলিতেছেন—"তোমরা চারিটি ভাই চুল ছাড়িয়া বিবাহের বেশে রহিয়াছ দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন সেই সময়ে সেই কালেই আমরা আবার ফিরিয়া আসিয়াছি— ফিরিয়া আসিয়াছিই বা বলি কেন —রহিয়াছি।"

সীতা রমণী, তাহাতে পূর্ণগর্ভা, এ অবস্থায় কল্পনাশক্তিটা কিছু বলবতী হয়, তাঁহার আর বর্তমানের কথাটা তত মনে পড়িতেছে না। অতীতই বর্তমান হইয়া দাঁড়াইতেছে। সীতার তো হইতেই পারে, রামেরও তাহাই হইতেছে। তিনি বলিতেছেন—

"আমারোও মনে হইতেছে, যেন সেই সময় আবার উপস্থিত— যে সময়ে শতানন্দ তোমার হাতখানি লইয়া আমার হাতে হাতে দিয়াছিলেন— আবার সেই সময় উপস্থিত। সেই হাতে একগাছি কঙ্কণ, —এখনকার মতো বাউটি সুটের গহনা নহে, হাতে করপদ্ম দেওয়া নহে, যে হাতে হাত দিলেই ডায়মণ্ডকাটাগুলা হাতে বিঁধিতে থাকে— সে কঙ্কণও আবার পাছে হাতে লাগে বলিয়া উপর দিকে তুলিয়া পরা। হাতে হাত পাইয়া আমার মনে হইয়াছিল, যেন আকাশের চাঁদ পাইলাম। সে কতই আনন্দ— যেন— যেন একটা মহোৎসব তোমার হস্তরূপ ধরিয়া আমায় আশ্রয় করিল, তোমায় যখনই দেখি— যত বারই দেখি, বোধ হয় যেন একটা মহোৎসব চলিতেছে।" দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কবি মহাকৌশলে চিত্রকরের চিত্রনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। পাঁচ পাতা প্রশংসা করিয়াও চিত্রের মনোহারিত্ব এত বুঝানো যাইত না। সীতার প্রতি রামের ভালোবাসার এমন ছবিও দেখানো যাইত না।

লক্ষ্মণ বলিতেছেন, "এই আর্যা, এই আর্যা মাণ্ডবী, এই বৌমা শ্রুতিকীর্তি।"

লক্ষ্মণ ঠাকুরটি একটু স্ত্রৈণ; কেই-বা নয়? তাই আপনার স্ত্রীর নামটি সীতার মুখে শোনার জন্য তিন জনের নাম করিয়া আপনার গৃহিণীর নামটি করিলেন না। সীতা শুনাইয়া দিলে একবার মুখখানি হেঁট করিয়া একটু হাসিলেন; মনে মনে বলিলেন, দাদা, তোমারই মূর্তিমান মহোৎসব আছে, আমার কি নাই?

সীতা ঊর্মিলার কথা তুলিলে লক্ষ্মণ দেখিলেন, আমার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হইল। দাদার কাছে আর নয়, ছি, লজ্জা করে। তাই বলিলেন, "দেবি, আর-একটা

দেখুন, এটা দেখবার জিনিস। এই দেখুন, ভগবান পরশুরাম।" সীতা অমনি বলিলেন, "আমার ভয় করিতেছে।" সীতার কাছে সব অতীত ঘটনা বর্তমানবৎ হইয়া যাইতেছে।

রাম বলিলেন— "ঋষে, নমস্তে।" রামেরও একটু তন্ময়তা আসিয়াছে; কিন্তু সীতার মতো নয়।

লক্ষ্মণ বলিলেন— "দেখুন দেখুন, আর্য পরশুরামের—"

রাম বলিলেন— "ভাই লক্ষ্মণ, আরো অনেক দেখার জিনিস আছে, তাই সব দেখাও না।"

রামের কথায় সীতা আবার বর্তমানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আর্য, আপনার বিনয়ের পার নাই। এত বিনয় আছে বলিয়াই আপনি এত বড়ো, আপনার এত যশ, আমিও আপনাকে এত ভালোবাসি।"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "এই আমরা অযোধ্যায় আসিয়াছি।" অযোধ্যার তখনকার সব কথা সবারই মনে পড়িল।

রাম বলিলেন— "সেই কথা, সেইসব কথা, সেই সুখের কথা মনে পড়িতেছে। বাবা তখন বেঁচে, আমরা নূতন বৌগুলি লইয়া বাড়ি আসিলাম। মায়েদের কেবল চিন্তা, কিসে আমরা ভালো থাকি— আহা, আমাদের সেই একদিন গিয়াছে। সেদিন আর আসিবে না।"

একথা সবাইকেই একদিন বলিতে হয়, এ আক্ষেপ সবাইকেই একদিন করিতে হয়। রামের মুখে এ আক্ষেপ বড়ো মধুর। সুকবি যখন রামের মতো পাত্রের মুখে এই আক্ষেপবাক্য প্রদান করেন, মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত তখন আলোড়িত হইয়া উঠে।

রাম বলিতেছেন— "সীতা তখন শিশু। উঁহার মুখখানি দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। ফুলের কুঁড়ির মতো ছোটো ছোটো দাঁতগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া তফাতে তফাতে বসানো, মাঝে মাঝে চক্‌চকে কালো চুলের ঝাপড়া দুই প্রান্তে উড়িয়া আসিয়া সে মুখে পড়িতেছে। ছোটো ছোটো হাত-পাগুলি যেন জ্যোৎস্না দিয়া আঁকা; যে দেখে, সেই আকৃষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়, মন্ত্রমুগ্ধ মতো দেখিতে থাকে। উহাতে হাব আছে, ভাব আছে, কিন্তু সেসব স্বাভাবিক। তাহাতে চাতুরি নাই, মায়েরা আমার যত বার সীতাকে দেখিতেন, তাঁহাদের দেখিয়া তৃপ্তি হইত না, আবার দেখিতেন, আবার দেখিতেন, তবু তৃপ্তি হইত না, আবার দেখিতে ইচ্ছা হইত।"

লক্ষ্মণ দেখিলেন, দাদার আবার ভাব লাগে, বলিলেন, "দাদা, এই দেখ মন্থরা।" দাদা আর উত্তর দিলেন না, আর-একদিকে আঙুল দিয়া বলিলেন, "দেবী বৈদেহি,

এই দেখো সেই মহুয়াফুলের গাছ— মনে পড়ে, কোথায়? শৃঙ্গবেরপুরে যেখানে পরম স্নেহাস্পদ নিষাদপতি গুহকের সঙ্গে আমার সমাগম হইয়াছিল।"

লক্ষ্মণ মনে মনে একটু হাসিলেন আর যেন মনে মনে বলিলেন, দাদা কৈকেয়ীর কেলেঙ্কারিটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া গেলেন।

সীতা।—"এই যে এইখানে আমরা আটা দিয়া চুলে জটা পাকাইয়াছিলাম।"

পুরানো কথা তখন বড়ো মিষ্ট লাগিতেছিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা বুড়া হইলে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া যে বানপ্রস্থধর্ম আশ্রয় করিয়া বনে বাস করিতেন, দাদা আমাদের বাল্যকালেই সেই বনবাস করিয়াছিলেন।"

কথাটায় কেহ বড়ো কান দিল না। কিন্তু লক্ষ্মণের দাদার উপর টানটা খুব দেখা গেল।

সীতা বলিলেন— "এই দেখ, ভগবতী ভাগীরথী, ইঁহার জল কেমন পরিষ্কার, স্নান করিলে শরীর ও মন পবিত্র হয়।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "ভগবতি, আপনি রঘুদিগের কুলদেবতা, আপনাকে নমস্কার। আমার পূর্বপুরুষ ভগীরথ শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্ পণ করিয়া তপস্যা করেন। তাহাতেই তোমার মর্তে আগমন, আপনা হইতেই ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ সগরসন্তানের উদ্ধার হয়। অরুন্ধতী যেমন তাঁহার সীতার সর্বদা মঙ্গল কামনা করেন, আপনিও তেমনি করিতে থাকুন।"

লক্ষ্মণ তখন যমুনাতটস্থিত শ্যাম-নামে বটবৃক্ষ দেখাইয়া কহিলেন, "ভরদ্বাজ চিত্রকূট যাইবার পথে এই বটবৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছিলেন।"

সীতা বলিলেন— "আর্যপুত্র, এ জায়গাটা মনে পড়ে?"

রাম বলিলেন— "ও কি ভুলা যায়? এইখানে তুমি তোমার পথশ্রান্ত ক্ষীণ অঙ্গ আমার বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে। মৃণালকে দলাইলে সে যেমন আউসিয়া যায়, তোমার অঙ্গও তেমনি নেতাইয়া পড়িয়াছিল, সে অঙ্গ একান্ত ক্লান্ত অথচ সুন্দর, লতাইয়া পড়িয়াছে, আরো সুন্দর, আর আমি সব গা-টা একেবারে টিপিয়া দিয়া তোমার সেবা করিব বলিয়া বারম্বার নির্দয়ভাবে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছিলাম। ও জায়গা কি আমি ভুলিতে পারি?"

সেদিনের কথা ভুলা যায় না, পথশ্রমে কাতর হইয়া সীতা একরূপ গলিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি রামের সঙ্গ ছাড়িবেন না। অযোধ্যায় থাকিবেন না, ফিরিবেন না, রাম তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ, তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, প্রত্যালিঙ্গনের আশা নাই, সীতা নিদ্রিতা। এ আলিঙ্গনের অর্থ— তুমি রমণীকুলের চূড়া— তুমিই প্রেমের মর্ম বুঝিয়াছ, আমি কি তোমার যোগ্য হইতে পারিব?

লক্ষ্মণ বিরোধের কথা তুলিলে সীতা সে কথাটা কানে তুলিলেন না। সে দুঃখের, সে ক্লেশের, সে ভয়ের স্মৃতি এখন ভালো লাগিবে কেন?

সীতা বলিলেন— "এই দেখো, আমরা দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করিতেছি। আর আর্যপুত্র আমার মুখে পাছে রৌদ্র লাগে, তাই নিজ হস্তের পাখাখানি ছাতি করিয়া আমার মাথায় ধরিয়াছেন। রামগিরি হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে হইলে পশ্চিমমুখ হইয়া যাইতে হয়, পড়ন্ত রৌদ্র মুখে লাগিয়া ননীর পুতলি সীতা পাছে গলিয়া যান, তাই রাম তাঁহার মুখের উপর হাতের পাখাখানি ধরিয়াছেন।"

রামের সেই সেকালের সব কথা মনে পড়িল। পর্বত হইতে ঝম্‌ঝম্‌ রবে ঝরণা ঝরিতেছে। তাহার পাশে বড়ো বড়ো গাছ, তাহার তলায় তলায় বানপ্রস্থগণ বাস করে। অনেকে বাস করায় প্রত্যেক ঝরণার ধারেই তপোবন হইয়া গিয়াছে। এইখানে বানপ্রস্থেরা বনবাসী হইয়াও গৃহস্থ, শান্ত গুণাবলম্বী হইয়াও সঙ্গে ভার্যা। এক মুঠা নীবার-ধানের ভাত খান, আবার তাহার মধ্য হইতেই অতিথিসেবাকেই পরম ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন।

লক্ষ্মণ বলিলেন— "এই জনস্থানমধ্যস্থ প্রস্রবণ নামে পর্বত— মেঘ হইতে ক্রমাগত জল পড়িতেছে আর বৃক্ষাবলির কোমল নীলিমা বিকাশ হইতেছে। সে পর্বতে অনেক গুহা আছে। ভবভূতির সময় এই-সকল গুহায় কত ভাস্করকার্য— কত চিত্রকার্য করা ছিল, এখনো তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া জগৎ বিস্মিত হইতেছে। সেই-সকল প্রসিদ্ধ গুহা রামচন্দ্রের সময়ে গোদাবরী সলিলের কলকল-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। গোদাবরীর তীরে আর্দ্রভূমি নিবিড় বন জন্মাইয়া সে গুহাগুলির মুখ একেবারে ঢাকিয়া ফেলিত। সে বনের লালিমা দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। কোনো জায়গায়ই ফাঁক নাই, যেখানেই দেখ, নয়ন জুড়ায়। গাছগুলি এত ঘন যে, সব যেন গায়ে গায়ে ঠেকিয়া আছে।"

এ বর্ণনাটি রিয়ালিস্টিক্‌; কিন্তু চোখের উপর ছবিখানি আঁকিয়া দিতেছে। আমরা যেন সবুজ বনের মধ্যে লতা-পাতায় ঘেরা গুহার মুখটি দেখিতে পাইতেছি, আর গোদাবরীর জলের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ভবভূতির ভাষা ভাবের সঙ্গে যেমন খেলে, এমন আর কোনো কবির দেখা যায় না।

রাম বলিলেন— "সুন্দরি, মনে পড়ে, আমরা এই পর্বতে সুখে বাস করিতাম— মনে পড়ে? লক্ষ্মণ আমাদের সেবা করিতেন, আমাদের কোনো ভাবনাই ছিল না, মনে পড়ে? গোদাবরীর তীর মনে পড়ে? কেমন ঠাণ্ডা মনে পড়ে? আর আমরা দু-জনে নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়াইতাম, মনে পড়ে? আহা, আমাদের রাত্রি কোথা

দিয়া কাটিয়া যাইত, কখন কটা বাজিল, সে হুঁসও থাকিত না, আমার এক বাহু তোমার গলায় আর তোমার এক বাহু আমার গলায় গাঢ়রূপে লগ্ন থাকিত। কলিজায় কলিজায় ঘেঁষিয়া মিশিয়া থাকিত। আমরা কী মাথামুণ্ড বকিতাম— কথার না-ছিল বাঁধুনি, না-ছিল মানে অথচ মুখেরও বিশ্রাম ছিল না। বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইতাম, কপোলে কপোল ঠেকিয়া থাকিত আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিয়া সারা রাতটা কাটিয়া যাইত। এসব কথা মনে পড়ে?"

কবিরা বড়ো নিষ্ঠুর। এমন সুখের সময়ে, সামনে সীতা, পটে সীতা, হৃদয়ে সীতা, স্মৃতিতে সীতা— সামনে লক্ষ্মণ, পটে লক্ষ্মণ, স্মৃতিতে লক্ষ্মণ— পটে গোদাবরীর বন, স্মৃতিতে গোদাবরীর বন, রাম এখন তন্ময়, অযোধ্যায় তিনি নাই। তিনি সেই পঞ্চবটীতে transferred, এমন সময়ে কিনা লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন— এষা পঞ্চবট্যাং সূর্পণখা। সুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, রাম যেমন তন্ময়, সীতাও তেমনি তন্ময়। উপরন্তু রামের প্রেমে, সুখে, মোহে, মোহিনীতে বিজড়িত কথাগুলি তাঁহাকে সপ্তম স্বর্গের উপর লইয়া যাইতেছিল। সূর্পণখার নাম শুনিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হা আর্যপুত্র, এই পর্যন্তই তোমার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা।"

রাম তখনও তত আত্মবিস্মৃত হয়েন নাই, সুতরাং তিনি সীতাকে বলিলেন, "তুমি বিরহের নামে শিহরিয়া উঠিলে, কিন্তু তোমার কি মনে নাই, এটা যে চিত্র মাত্র।"

সীতা রামের কথায় একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "যাই হোক, দুর্জনের কথা মনে হইলেই অসুখ হয়।" সেই পুরানো কথা রামকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জনস্থানের বৃত্তান্ত ক্রমে বর্তমান বলিয়া বোধ হইতেছে।" রাম আবার ক্রমে তন্ময় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার পূর্বকথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।

লক্ষ্মণ বলিলেন, "দুরাত্মা রাক্ষসরা সোনার মৃগের মায়া পাতিয়া এমনই কাজ করিয়াছিল যে, তাহার সম্পূর্ণ পরিশোধ লওয়া হইলেও মনে উঠিলেই কষ্ট হয় (সীতাহরণের ব্যাপারটা আর খুলিয়া বলিলেন না, আভাস দিয়াই সেটা শেষ করিয়া দিলেন।) আর্য অধীর হইয়া জনশূন্য অরণ্যে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে পর্বত রোদন করিয়াছিল, বজ্রেরও হৃদয় দলিত হইয়াছিল।"

সীতার চক্ষে জল আসিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দেব রঘুকুলানন্দ, আমার জন্য— এ হতভাগিনীর জন্য তোমার এত ক্লেশ! মরি মরি!

রামের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, তাই দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য, এ কী? আপনার চক্ষু দিয়া বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়িতেছে। মুক্তাহার ছিঁড়িয়া

গেলে, যেমন বড়ো বড়ো মুক্তা টপ্ টপ্ করিয়া খসিয়া পড়ে, তেমনই আপনার চক্ষের জল পড়িতেছে, একের পর আর-এক, তাহার পর আর-এক, এইরূপ করিয়া ধারা বহিয়া মাটিতে পড়িতেছে আর ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হৃদয় শোকে ভরিয়া উঠিতেছে। আপনি মনের ভাব যতই গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তত আপনার অধর কাঁপিতেছে, নাক ফুলিতেছে —আপনি ফোঁপাইতেছেন, আপনার ভাব আর গোপন থাকিতেছে না। আপনার এ ভাব কেন হইল; এ তো ছবি মাত্র, আপনি অধীর হইতেছেন কেন?"

রাম বলিলেন, "বৎস, তখন বড়ো কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিকার করার উৎকট ইচ্ছা থাকায় সেটা কোনো রকমে সহিয়া ছিলাম। কিন্তু এখন মনে মনে যতই সেই-সকল কথার আন্দোলন করিতেছি, যতই সেই-সকল কথা পরিপাক পাইতেছে, ততই বেদনা বাড়িয়া যাইতেছে। হৃদয়ের যে অতি কোমল স্থানে স্পর্শ করিলেই লোকের মৃত্যুর আশঙ্কা, আমার সেইখানে দগ্‌দগে ঘা হইয়া উঠিয়াছে।"

রামের আত্মসংযমের ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল, সীতার অবস্থা আরো শোচনীয়। তিনি বলিলেন, "উৎকণ্ঠা বড়োই বাড়িয়া উঠিতেছে, আমার বোধ হইতেছে, আমি আর্যপুত্রশূন্য হইয়াছি।"

লক্ষ্মণ দেখিলেন, এ ভাবটা বদলাইয়া দিতে না পারিলে ভদ্রস্থতা নাই। তাই তিনি চিত্রের আর-এক দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখুন, এদিকে জটায়ুর বিক্রম দেখুন, তাহার বয়স এক মন্বন্তর হইয়াছিল, ৪ কোটি ৩২ লক্ষ বৎসরে এক যুগ, এরূপ ৭১ যুগে এক মন্বন্তর হয়। জটায়ু এত বৃদ্ধ হইলেও কেমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেখুন। জটায়ু রাবণ-হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।"

সীতা বলিয়া উঠিলেন, "সন্তানের উপর তাঁহার মতো স্নেহ আর কে দেখাইতে পারিবে? তিনি আমায় রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

রামচন্দ্র এই সময়ে একবার প্রাণ ভরিয়া জটায়ুর প্রশংসা করিয়া লইলেন। লক্ষ্মণ একে একে নানা স্থানের নানা লোকের নামোল্লেখ করিয়া পম্পা সরোবর দেখাইয়া দিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে বেল্লারি জেলা, তাহাতে হোম্প বলিয়া একটি বিল আছে, সেইটিই পম্পা বলিয়া লোকের ধারণা।

পম্পার নাম শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, "এইখানেই কি আর্যপুত্র গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন? একেবারে অধীর হইয়া রাক্ষসের উপর রাগ ভুলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন? সে কি এই হ্রদ?"

রাম বলিলেন, "এ হ্রদ অতি রমণীয়। পম্পা হ্রদের স্থানে স্থানে নীল পদ্ম

ফুটিয়া জল ছাইয়া আছে। হাঁসগুলা মদভরে মত্ত হইয়া জলের উপর মাতিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহাদের বুকে লাগিয়া পদ্মের নালগুলা নড়িতেছে। এত রমণীয় স্থান, কিন্তু আমার ভালো করিয়া দেখা হয় নাই। জলেই চোখ ভরিয়াছিল, দেখিব কেমন করিয়া? তবে একটা ফোঁটা পড়িয়া গিয়াছে, আর-একটা এখনও জোগায় নাই, ইহারই মধ্যে আবছায়ার মতো যা-কিছু দেখা হইয়াছে মাত্র।"

লক্ষ্মণ দেখিলেন, আবার গোল বাধে। অন্যদিকে লইয়া যাইতে হইবে। বলিলেন, "এই হনুমান।"

সীতা বলিলেন, "এই সেই মারুতি। আহা, ইনি জগতের কী উপকারই করিয়াছিলেন! লোকে কত কষ্টে ছিল, কত কাল কত কষ্ট পাইয়াছে। ইনি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছেন, ইনি ভিন্ন আর কাহারো দ্বারা সে কার্য হইত না।"

রামও এই সময় হনুমানের প্রতি আপনার প্রগাঢ় স্নেহের পরিচয় দিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন, শোক-দুঃখ মুহূর্তের জন্য যেন দূর হইল। মন কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হইল। হনুমানের গুণাবলি মনে জাগিয়া উঠিল।

সীতা চিত্রের এক অংশ দেখাইয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ! কদমগাছ ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, আর তাহার উপর ময়ূরেরা পেখম তুলিয়া নাচিতেছে। কী নৃত্য! — যেন মহাদেব তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছেন! যে পর্বতে ঐ অত সুন্দর কদমগাছ, ও পর্বতের নাম কী? আবার এ কী? তরুতলে আর্যপুত্র মূর্ছা যাইতেছেন আর তুমি কাঁদিতেছ, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, তাঁহাকে ধরিয়া আছ। আহা, আর্যপুত্রের সে শ্রী নাই, শরীর পাণ্ডাস হইয়া গিয়াছে, কেবল রাজশ্রীটুকু আছে বলিয়া তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। এ পর্বতটির নাম কী?"

লক্ষ্মণ বলিলেন, "পর্বতটির নাম মাল্যবান্। চারিদিকে কুরচির ফুল ফুটিয়া উহাকে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে, আর নূতন নীল মেঘ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, উহার শিখরে চড়িয়া বসিয়া আছে।"

রাম আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "লক্ষ্মণ, থামো, আমি আর পারি না, সীতার বিরহ আবার যেন আসিয়া উপস্থিত হইল। থামো থামো, আর আমার সহ্য হয় না।"

লক্ষ্মণ ছবিখানি সংগ্রহ করিতে করিতে বলিলেন, 'ইহার পর আপনার এবং বড়ো বড়ো রাক্ষস ও বানরের অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য— যাহাতে তিনলোক চমকিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল। তা যাই হোক, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব আমি নিবেদন করি, আপনারা বিশ্রাম করুন।"

এত দূরে চিত্রদর্শন শেষ হইল। লক্ষ্মণ চিত্র লইয়া আসিবার পূর্বে রামচরিত্রের মনুষ্যত্ব, গাম্ভীর্য, করুণা, ব্রাহ্মণ-ভক্তি, গুরুভক্তি প্রভৃতি দেখানো হইয়াছিল। চিত্রদর্শনে বাকি যাহা ছিল, দেখানো হইল। পরশুরামের কথাটা চাপা দেওয়ায়, কৈকেয়ীর কাণ্ডটা ছাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব কতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মায়া-মৃগের ব্যাপারটা, রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারটা ছবিতে আঁকাই ছিল, তিনজনেই সেটা নিঃসাড়ে ছাড়িয়া গেলেন। লক্ষ্মণ একটু আভাস দিয়া গেলেন মাত্র, কিন্তু ছবিটা তো সামনেই ছিল, তাহা দেখিয়া মন অতিশয় বিচলিত হইতেছিল। হৃদয়ের সে ক্ষুব্ধ ভাব ক্রমেই বাড়িয়া গেল, ক্রমেই রাম ও সীতা দু-জনেরই মনে আবার বিরহ আসিল আসিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দু-জনেই [মুখ] ফুটিয়া সেকথা বলিয়া ফেলিলেন। রামের আর গাম্ভীর্য রক্ষা হইল না। কবি শ্রোতৃবর্গকে ভাবী বিরহের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। চিত্রদর্শন দৃশ্যের কৌশল ভারি কৌশল, বড়ো চাপা।

এখন লক্ষ্মণ বিদায় হইতেছেন। চিত্রদর্শনের ফল কী হইল, দেখা যাউক। রাম ও সীতা চিত্র দেখিয়া যেরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিজনে কী কথাবার্তা হয়, দেখার জন্য দর্শকেরা উৎসুক হইয়াছেন।

লক্ষ্মণ এখনো যান নাই। সীতা বলিলেন, "চিত্র দেখিয়া আমার একটি মনোরথ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, সেটি আপনাকে শুনাই।"

রাম বলিলেন "—আজ্ঞা করো, তোমার আজ্ঞা, তোমার হুকুম এখনই তামিল হইবে।"

"আমার ইচ্ছা হইতেছে, আবার সেইরূপ বনে বনে ভ্রমণ করিব, যে বনে গেলে চিত্তে উদার ভাবের উদয় হয় আর তাহার গম্ভীরতায় মুগ্ধ হইতে হয়, সেই বনরাজিতে বেড়াইব, আর গঙ্গায় অবগাহন করিব, শরীর জুড়াইবে, ঠাণ্ডা হইবে, পবিত্র হইবে।"

রাম তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে বলিয়া দিলেন যে, গুরুজন এইমাত্র আদেশ করিয়াছেন, সীতার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। অতএব শীঘ্র রথ আনো, দেখিও, যে রথে টক্কর খাওয়ার সম্ভাবনা, সে রথ আনিও না।

সীতা বলিলেন, "আর্যপুত্র, তোমায়ও যাইতে হইবে।"

রাম বলিলেন, "কঠিন হৃদয়ে, সেকথা কি আর স্বতন্ত্র করিয়া বলিতে হইবে, তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।"

সীতা বলিলেন,— "তা— তা— তা হলেই আমার হল।"

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন। চিত্রদর্শনের শেষ হইয়া গেল। রাম ও সীতার স্নেহ, অনুরাগ ও প্রেম যথেষ্ট দেখানো হইয়াছে, অন্য কবি হইলে ইহাতেই যথেষ্ট মনে করিতেন। কিন্তু ভবভূতি এখনো খুশি নহেন। প্রেমের একাত্মতা দেখাইতে হইবে। প্রেমে মানুষ গলিয়া যে দুইটিতে একটি হইয়া যায়— সেটি যদি না দেখাইতে পারিলালম, তবে দেখাইলাম কী? তাই ভবভূতি লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়া রাম ও সীতাকে বিজনে রাখিয়া দুটিকে মিলাইয়া এক করিয়া দিতেছেন।

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে রাম বলিলেন, "সীতে, এসো, আমরা জানালার গোড়ায় গিয়া বসি।" —সেকালে বাড়ির গোল বারান্দা বাহির করিয়া সেই বারান্দা ঘেরিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি বা তিনটি বাতায়ন রাখিত, গোল বারান্দাকে আবর্তক বলিত। "—ঘেরা গোল বারান্দায় জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া সেইখানে বসি।" সীতার মনটা খুশি করাই রামের দরকার, সুতরাং তিনি সীতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। দু-জনে হাওয়ায় বসিলেন। সীতা তখন পরিশ্রমে ভাবনায় বড়ো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার বড়ো ঘুম আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "ঘুমে আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে!"

রাম বলিলেন, "তবে শয়নের জন্য আমাকেই অবলম্বন করো, আমাকেই তোমার শয্যা করো, আমার বুকের উপরই শোও, দেখিও যেন একটুকুও ফাঁক থাকে না, যেন অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া যায়। তুমি ভয় পাইয়াছ, তোমার লজ্জা হইয়াছে, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, তোমার বাহুতে আগা গোড়া বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়াছে— যেন একখানি লম্বা চন্দ্রকান্তমণিতে চাঁদের কিরণ লাগিয়া জল চুয়াইতেছে। সেই হাতখানি আমার গলায় দেও, আমার অঙ্গ জুড়াইয়া যাউক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক, আমার. এ মৃত দেহে জীবনসঞ্চার হউক," বলিয়া সীতাকে টানিয়া তাঁহার হাতটি আপনার গলায় জড়াইয়া দিলেন। আনন্দে শরীর মন হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, এ কী? তোমার স্পর্শে আমার এ কী হইল— এ কী সুখ না দুঃখ, জাগরণ না নিদ্রা, সর্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে, না আমি মাতাল হইয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রিয়ে, আমার এ কী দশা হইল, যতবার স্পর্শ অনুভব করিতেছি, আমার ইন্দ্রিয়-সকল শিথিল হইতেছে। বিষয়গ্রহণে অশক্ত হইতেছে। কী যে বিষম বিকার আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, চৈতন্য যেন এক-একবার ঘুরিয়া যাইতেছে আর এক-একবার জাগিয়া উঠিতেছে।"

এ কী? সীতার পার্থিব দেহ রামের দেহে যতই মিশিতেছে, তিনি যতই নিদ্রাবেশবশে চৈতন্য হারাইতেছেন, দুই দেহ দুই মন যেন এক হইয়া যাইতেছে।

এই একীভাবের সময় রাম আপনার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একটা মোহময়, সুখময়, প্রেমময়, স্বপ্নময় ভাবে মগ্ন। সেভাব বর্ণনায় ভবভূতিরই কলম খোলে নাই, আমি তাহার কী ব্যাখ্যা করিব? তিনি নিজে ভাবুকের মনে বরাদ [বরাত] দিয়া গিয়াছেন, আমিও তাহাই করিলাম।

এখনো একটা ভাব সম্পূর্ণ হয় নাই, এখনো সীতা ঘুমান নাই, এখনো তাঁহার চৈতন্য আছে। তিনি রামের ঐ অমৃতময় মোহময় বচন শুনিয়া ঘুমের ঘোরে আধ আধ স্বরে ভাঙা গলায় বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ অচল অটল। তা ছাড়া আর কী বলিব। মনের ভাব— নহিলে আমার কী এত গুণ আছে যে, আমার স্পর্শে তোমার এমন মোহ হয়, আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ আছে, তাই তুমি মুগ্ধ।"

সীতার কথায় রামের মোহময় ভাব আরো মোহময় হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "জীবকুসুম যখন ম্লান হয়, তখন তোমার এই মধুময় অমৃতময় কথাই তাহাকে আবার ফুটাইয়া তুলে। এই মধুময় কথাতেই সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সকল ইন্দ্রিয় মোহময়ভাবে আচ্ছন্ন হয়। এই কথাই কানে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দেয় আর মনের বলাধান করে—পরিশ্রান্ত—দুর্ভাবনাগ্রস্ত মনের পোস্টাই ঔষুধ।"

রাম তখন সীতার চক্ষের দিকে চাহিয়া ছিলেন, সে চক্ষু ঘুমে ঘোর হইয়া আসিতেছিল, তাই কবি চোখের প্রশংসা করিতে গিয়া সরোরুহাক্ষি সম্বোধন করিয়াছেন।

সরোরুহাক্ষী সীতা রামচন্দ্রের এই-সকল প্রাণ-মাতানো কথা শুনিয়া প্রেমে গলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু নিদ্রার আবলে তাঁহার আর কথা কহার শক্তি ছিল না। তিনি অতি কষ্টে জড়িত জিহ্বায় বলিলেন, "পিয়ম্বদ, সুইস্‌সম্‌" "প্রিয়ম্বদ, আমি শোব" এই এক প্রিয়ম্বদ কথায় রামচন্দ্রের সমস্ত প্রশংসার উত্তর হইল। ঘুমে চক্ষু ঘোর হইয়া আসিতেছে, জিহ্বা কথা কহিতে অক্ষম, সীতা কষ্টে একটি কথা কহিলেন, তাহাতেই তিনি যে রামচন্দ্রের যত বক্তৃতা ছিল, তাহার গৌরব, আদর, স্নেহ ও প্রেম অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। উহার অর্থ এই যে, নাথ, তোমার কথাগুলি বড়ো মিষ্ট, আমি ওগুলি বড়ো ভালোবাসি। কিন্তু আমি বড়ো ক্লান্ত, এখন শুইব, বলিয়া বালিশ হাতড়াইতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন, "আর খুঁজিতে হইবে না। এই যে তোমার বালিশ রহিয়াছে। আমার বাহুই তোমার বালিশ। যেদিন বিবাহ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ঘরে বলো, জঙ্গলে বলো, বাল্যকালে বলো, যুবাবয়সে বলো, আমার হাতই তোমার বালিশ;

নিদ্রায় তোমার একমাত্র অবলম্বন। এ বাহু আর-কেহ কখনো অবলম্বন করে নাই। এই বালিশেই মাথা দিয়া শয়ন করো।" রাবণ-গৃহে যে দশমাস ছিলেন, তদ্ভিন্ন বিবাহের দিন হইতে জানকী রামের কাছ-ছাড়া শোন নাই। বালিশে মাথা দিলে দূরে থাকিতে হয়, তাই বালিশ বিছানায় পড়িয়াই থাকিত, রামের বাহুই বালিশের কার্য করিত।

রামের কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন, "অত্থি এদং অজ্জউত্ত অত্থি এদং" তাই বটে আর্যপুত্র, তাই বটে। আর্যপুত্র শব্দটা অভ্যস্ত, ওটা উচ্চারণ করিতে কষ্ট নাই। স্বপ্নেও সীতা বলিয়াছেন, আর্যপুত্র, ঘুমের ঘোরেও বলিয়াছেন আর্যপুত্র। রামদত্ত বালিশটি গ্রহণ করিয়া সীতা তাই বটে তাই বটে দুবার বলিয়া রামের কথা যে যথার্থ, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন।

ঘুমের ঘোর কিনা? তাই যত সংক্ষেপে পারেন, কথাটা সারিয়া লইয়া একেবারে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ পাশে বসিয়া রামের গলায় হাত দুখানি বাঁধিয়া তাঁহার বুকের উপর মুখ দিয়া শুইয়া ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নিদ্রাবিষ্ট চক্ষু দেখিতে পাইতেছিলেন, এখন রামের বামবাহুর উপর মাথা দিয়া একেবারে চিৎপাত হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। রাম কাত হইয়া বাঁ কাতে রহিলেন, সুতরাং সীতা তাঁহার বুকেই রহিলেন। তিনি সস্নেহে নিদ্রিতা রূপসীর রূপ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার অশেষ গুণের কথা মনে করিতেছিলেন। হয়তো এক একবার গাত্রেও হাত বুলাইতেছিলেন; আর সীতার সদগুণরাশি ও আপনার সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "ইনি আমার গৃহে লক্ষ্মী, ঘর আলো করিয়া থাকেন। ঘর আলো করুন-আর-না-করুন, আমার হৃদয় তো আলো করেন বটেই। আমি দেখি সবই আলো করিতেছেন। ইনি আমার চক্ষের পক্ষে অমৃতের বাতি। বাতি মানে শলা। চক্ষে বড়ো অসুখ হইলে, জ্বালা করিলে, যেমন একটা লোহার শলার উপর সুর্মা লইয়া চোখের পাতার নিচে দিয়া দিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, তেমনই সীতাকে দেখিলে আমার চোখ জুড়াইয়া যায়, বোধ হয়, কেউ শলা দিয়া সুর্মার বদলে খানিকটা অমৃত ঢালিয়া দিল। সীতার দেহখানাই যেন সেই শলাটি।"

মাসিক বসুমতী
মাঘ, ফাল্গুন ১৩৩৮।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. এই বইয়ে "বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য ২ দ্র.

২. ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের একটি পুথিতে তৃতীয় অঙ্কের পুষ্পিকায় এ নাটক কুমারিল শিষ্যের রচনা বলে উল্লেখ আছে। একটি মাত্র পুথির এই উল্লেখ থেকে ভবভূতিকে পূর্বমীমাংসাদর্শন-প্রবক্তা কুমারিলভট্টের শিষ্য বলায় সংশয় রয়ে যায়। তবে সময়ের দিক থেকে ভবভূতির পক্ষে কুমারিলের শিষ্য হওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষত তাঁর নাটকে মীমাংসাদর্শনে অর্জিত বিদ্যার পরিচয় আছে। কুমারিলভট্টের জীবনকাল খৃস্টীয় সপ্তম শতক। জন্ম মধ্যভারতে, মতান্তরে কামরূপে। 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে শংকরের উক্তিতে বলা হয়েছে, সুগত-পন্থীদের, অর্থাৎ বৌদ্ধদের পর্যুদস্ত করার জন্য গুহ (কার্তিকেয়) কুমারিল রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি 'মীমাংসাদর্শন' নামে মূল সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। মীমাংসাদর্শন-এর ভাষ্য রচনা করেন শবরস্বামী। ভারতীয় দর্শন-সূত্রের যাবতীয় ভাষ্যের মধ্যে শবরস্বামীর ভাষ্যই সম্ভবত প্রাচীনতম। শবরস্বামীর ভাষ্য অনুসরণ করে কুমারিল 'শ্লোকবার্তিক', 'তন্ত্রবার্তিক', ও 'টুপটীকা' (বা অনুষ্টুপটীকা) নামে পরিচিত সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যা রচনা করেন। কুমারিলভট্ট বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও অন্যান্য নাস্তিক দর্শনের প্রভাব খর্ব করে বৌদ্ধ-যুগের পরবর্তী বেদাশ্রিত আস্তিকাপন্থী হিন্দুধর্ম-দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কুমারিলের প্রথম প্রতিপাদ্য বেদ ঈশ্বরপ্রণীত নয়, স্বতঃপ্রমাণ। ধর্মাধর্ম বা মুক্তির উপায় একমাত্র বেদ ও উপনিষদ্ থেকেই জানা সম্ভব। কুমারিলভট্টের দর্শন ভাবনায়

~ ~

'আস্তিক্য' অর্থে ঈশ্বরের সর্বময়ত্বে বিশ্বাস বোঝায় না, বেদকেই একমাত্র প্রামাণিক বোঝায়। বেদবিহিত পদ্ধতিতে জীবন যাপনের নীতি সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে পূর্ব-মীমাংসা দর্শন হিন্দুর জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কুমারিলভট্টকে এই নিয়ন্তা-দর্শনের মূল প্রবক্তা মনে করেন।

"পূর্ব-মীমাংসাকে ধর্ম-মীমাংসা বলা হয়। ইহা সার্থক। নৈতিক শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণরূপে শাস্ত্রসমূহ যে বিধান দিয়াছে তাহাই 'ধর্ম'। পূর্ব-মীমাংসায় 'ধর্মে'র এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। নিজের প্রতি, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, সম্প্রদায় ও জাতির প্রতি মানুষের যে নৈতিক কর্তব্য রহিয়াছে পূর্ব-মীমাংসা সেইগুলির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কর্ম যে সর্বশক্তিমান এবং ঈশ্বরও— যদি অবশ্য তিনি থাকেন — কর্মের শক্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, একথা পূর্ব-মীমাংসা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। বেদসমূহ হইল এই ধর্মের একমাত্র প্রমাণ।" ভি. এ. রামস্বামী আয়ার, এম. এ., 'বেদ-মীমাংসা শিরোমণি', 'মীমাংসা-বিশারদ'; সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সম্পাদিত, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা ১৩৬৮ ব. পৃ. ৩২৮।

৩. কনৌজ-রাজ যশোবর্মন-এর সভাকবি বাক্‌পতিরাজের ইতিহাস-আশ্রিত প্রাকৃত মহাকাব্য 'গৌড়বাহ' সম্ভবত রাজার মৃত্যুর পরে ৭৫০ খৃস্টাব্দে লেখা হয়েছিল। বিষয় যশোবর্মন কর্তৃক গৌড়রাজ নিধন। বাক্‌পতির রচনায় সংস্কৃত কাব্যরীতির বাইরে গিয়ে স্বাধীন কল্পনা-নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য। যেমন তিনি গ্রামজীবন এবং গ্রাম্য দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন— যা সংস্কৃত কাব্যে দুর্লভ। তাঁর সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া যায় না। শুধু উপক্রমণিকা অংশ পাওয়া গেছে।

৪. অনুবাদ : এই সংসারে যাঁরা আমাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরা (নিশ্চয়ই) কিছু জানেন। তাঁদের প্রতি আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রবৃত্ত হচ্ছে না। আমারই সমান গুণের অধিকারী কোনো

ব্যক্তি (নিশ্চয়ই) এই সংসারে আছেন, বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন। কেন-না, এই কাল অনন্ত এবং এই পৃথিবী বিশাল।

৫. অনুবাদ : বনবাস থেকে ফিরে এসে তাঁদের ঈপ্সি[illegible] [illegible]ন্দ্রিয়ের বিস[illegible] বস্তু সবই পেতে থাকলেন। দণ্ডকারণ্যে বাসকালেব তাঁ[illegible] [illegible] চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়ে চিত্রশালায় রক্ষিত ছিল, সেখান[illegible] [illegible] [illegible]য় স্মৃতির উদ্বোধক ছবিগুলি দেখে, সেই দুঃখে[illegible] বিষয়[illegible] চিন্তা করেও তারা সুখ অনুভব ক[illegible]ন।

৬. ২২ সর্গে সম্পূর্ণ শ্রীহর্ষের 'নৈষধীয়চরিত' মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রধান রচনা। বিষয় নিষধরাজ নল ও দময়ন্তী উপাখ্যান। মহাভারতের বনপর্বে এই আখ্যান আছে। সে আখ্যানের প্রথম অংশ, নল-দময়ন্তীর বিবাহ অবধি শ্রীহর্ষ নিয়েছেন এবং বিভিন্ন অংশে স্বাধীন কল্পনা বিস্তার করে দৃশ্যপট, নায়ক-নায়িকা ও অন্য-সব চরিত্রের স্বভাব ও রূপ, সামাজিক আচার-আচরণের অনুপুঙ্খ এমন-কী দাম্পত্য মিলনের খোলামেলা বর্ণনা যোগ করেছেন। শ্রীহর্ষকে তাঁর সময়ের পটে দেখে বোঝার চেষ্টা করাই সঙ্গত। একালে যেসব প্রসঙ্গ রুচিতে বাধে, তেমন প্রসঙ্গের অনুপুঙ্খে সমকালের বাতাবরণ অনেকটা ধরা যায়— সেকালের রুচির হাওয়াও বোধগম্য হয়। হরপ্রসাদ এখানে শ্লীলতার প্রশ্ন তুলছেন—যা তিনি 'মেঘদূত-ব্যাখ্যা'-য় তোলেন নি। শ্রীহর্ষ যা-কিছু বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতার যুক্তি বোধহয় কোথাও ভেঙে যায়নি। ভাষার আবরণ সম্পর্কেও শ্রীহর্ষ খুব সতর্ক। নানা বিদ্যায় পারঙ্গম, সংস্কৃত কাব্যের আলংকারিক রচনা-শৈলীতে অশেষ দক্ষ শ্রীহর্ষকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। কবির নানা সীমাবদ্ধতা ও অবাঞ্ছিত ঝোঁক সম্পর্কে সমালোচনা করেও সুশীলকুমার দে লেখেন, "Notwithstanding his limitations, it is clear that Śriharṣa possesses a truly high gift, but it is gift not of a high poetic character. It should be recognised at once that *Naiṣadhacarita* is not only

a learned, but is in many ways a repository of traditional bearing, and should therefore, be approached with the full equipment of such learning. It is also a treasure-house of literary dexterity and involves for its apprecia-tion an aptitude in this direction. The modern reader often perhaps lacks this equipment and aptitude, and therefore finds little interest in a work which, for its cult of style, has always been so popular with scholars of the traditional type." —*H-S-L,* pp-329-30। এই বইয়ে "বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য ৫ দ্র.।

৭. অনুবাদ ঃ সে আপনার অশ্ব অনুসরণকারী বাহিনীর ঘোষণা থেকে আপনার প্রতাপের কথা অবহিত হয়ে বীরের প্রতি বীরের আচরণ করেছে।

লব সম্পর্কে চন্দ্রকেতুর উক্তি।

৮. অজন্তা, অজন্টা বা অজিণ্ঠা গুহার চিত্রাবলি আঁকা শুরু হয়েছিল খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। মাঝে প্রায় চার শতাব্দী কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আবার শুরু হয় খৃস্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকে। অজন্তার শ্রেষ্ঠ কাজগুলি পঞ্চম - ষষ্ঠ শতকের। সপ্তম শতক থেকে এই শিল্প-উদ্যোগ স্তিমিত ও ক্রমে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভবভূতি যদি সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষ হন তাহলে তাঁর সময়ের অব্যবহিত আগে অজন্তা গৌরবের চূড়ায় উঠেছিল বলা যায়। কাঠের তক্তা পাটার উপরে আঁকার রীতিও প্রাচীন। এ ধরনের শিল্পকর্মের সহজলভ্য নিদর্শন পুথির পাটার উপরে আঁকা ছবি। নিচে উপরে কাঠের পাটা দিয়ে পুথি বাঁধা হত। চিত্রিত পুথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেই অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর 'ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগে' কিছু পুথিচিত্রের নমুনা ছাপা আছে।

বাংলা শকুন্তলার জুবিলি

বাংলা শকুন্তলার ৪৯ রাত্রি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আজ ৫০ রাত্রি। আর্ট থিয়েটারের পক্ষে আজ একটা শুভদিন। তাই আমরা সকলে মিলিয়া আজ শকুন্তলা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। এখন সকলেই নূতন চায়। শকুন্তলা বড়ো পুরানো; কত শত বৎসরের পুরানো, তাহা জানি না। কিন্তু শকুন্তলা কালিদাসের: কালিদাস মহাকবি, তাঁহার লেখা পুরানো হয় না —পুরানো হইতে পারে না —পুরানো হইতে জানে না। সে লেখা নিত্যই নূতন; যখনই পড়ো তখনই নূতন; যখনই দেখ, তখনই নূতন। তাই প্রেক্ষকেরা দলে দলে আসিয়া এই নূতন-পুরানো পুরানো-নূতন নাটকের অভিনয় দেখিয়া আনন্দে ভোর হইয়া যাইতেছেন। এ-সকল প্রেক্ষকদিগকে আমরা মনের সহিত ধন্যবাদ দিই। আমরা এখন বুঝিতেছি— বাংলা দেশে সত্য সত্যই সমজদার আছেন; তাঁহারা নূতন বাছেন না, পুরাতন বাছেন না— ভালো হইলেই হইল। এইরূপ সমজদার আছেন বলিয়াই এখনো রঙ্গালয় টিকিয়া আছে; অভিনেতারা উৎসাহ পাইতেছেন, নানারূপে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন হইতেছে। আমরা প্রেক্ষকবর্গকে ধন্যবাদ দিয়া জুবিলির কার্যে প্রবৃত্ত হইব।

কালিদাসকে লোকে মহাকবি বলে। কালিদাসকে মহাকবি বলিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। ভারবি[১] একখানি কাব্য লিখিয়া মহাকবি, শ্রীহর্ষ[২] একখানি কাব্য লিখিয়া মহাকবি, ভবভূতি[৩] কয়েকখানি নাটক লিখিয়াই মহাকবি। ইঁহারা যদি মহাকবি হইলেন, তবে কালিদাস— যিনি দুখানি মহাকাব্য লিখিয়াছেন, দুখানি খণ্ডকাব্য লিখিয়াছেন, তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন, এবং যাঁহার নামে অসংখ্য কাব্য চলিতেছে,— তাঁহাকে কি শুধু মহাকবি বলিলে তৃপ্তি হয়? আমরা তাঁহাকে মহা-মহাকবি বলিব। তাহাতেও তৃপ্তি হইবে না। কারণ, বারুণীতে দুটা-একটা নূতন

যোগ উপস্থিত হইলে, তাহাকে মহা-বারুণী বলে; আরো দুটা-একটা যোগ থাকিলে তাহাকে মহা-মহাবারুণী বলে। কিন্তু কালিদাসের যে এমন কত যোগ আছে তাহার ঠিকানা নাই। ইঁহার রচনায় কত দেশের, কত কালের, কত নায়কের, কত নায়িকার কথা আছে, কত রকম বিভিন্ন আকারের— বিভিন্ন ভাষার কাব্য আছে— তাহা বলা যায় না। সুতরাং আমরা তাঁহাকে মহা-মহা-মহাকবি বলিব।

বিধাতা যে বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি বিচিত্র। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই,— কালেই দেখো —আর দিকেই দেখো— কোনোদিকেই শেষ পাওয়া যায় না; যেখানে দেখো সেখানেই নূতন। এক সমুদ্র দেখো;— যখনই দেখিবে তখনই নূতন। এক পর্বত দেখো; যখনই দেখিবে তখনই নূতন। মানুষের চেহারা দেখো— দুটোয় মেলে না, সবই নূতন। মানুষের প্রকৃতিও সব নূতন, দু-জনার এক রকম নয়। এই যে বিচিত্র জগৎ— বিধাতার আশ্চর্য কীর্তি; ইহাতে কিন্তু সুখও যেমন আছে, দুঃখও তেমনি আছে; আনন্দও যেমন আছে, কষ্টও তেমনি আছে; তৃপ্তিও যেমন আছে, বেদনাও তেমনি আছে;— বরং দুঃখ কষ্ট বেদনাই বেশি, অন্তত আমরা তাই মনে করি। কবির সৃষ্টি এ সৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ তফাত। এ সৃষ্টিরও আদি নাই, অন্ত নাই; দিক, দেশ, কাল, পাত্র— সকলই বিচিত্র। দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ইহাতেও আছে, এবং বেশই আছে। কিন্তু এ-সকল দুঃখ, কষ্ট, বেদনাকে ছাপাইয়া একটা আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে; ইহাতে আনন্দ আরো উজ্জ্বল হয়; দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আনন্দে ডুবিয়া গিয়া আনন্দেরই আস্বাদ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। সে-কালের সমজদারেরা বলিতেন— কাব্য পড়িয়া বা নাটক দেখিয়া যে আনন্দ হয়, সেটা "ব্রহ্মস্বাদসহোদর"। যেমন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে নির্মল নির্বিকার নিরঞ্জন আনন্দে মন পূর্ণ হইয়া উঠে, তাঁহারা বলিতেন কবির সৃষ্টি দেখিলেই সেইরূপ নির্মল নির্বিকার নিরঞ্জন আনন্দে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। ছোটো কবির কাব্যেই যদি এমন নির্মল নির্বিকার নিরঞ্জন আনন্দের উদয় হয়, মহা-মহা-মহাকবির কাব্যে কী হইবে, তাহা ভাবিতেই পারা যায় না, লেখা তো দূরের কথা! সুতরাং আমরা কালিদাসের কবিতা পড়িয়া বা তাঁহার নাটক দেখিয়া কী যে আনন্দ উপভোগ করি, তাহা কলমের মুখে বাহির হয় না; সেটা বোধ হয় ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরেরও বেশি!

এখন যে রূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সার্টিফিকেট ভিন্ন কাজ হয় না। যেখানে যাও, যে কাজে যাও, যে ব্যবসায়ে যাও, — সার্টিফিকেট চাই-ই চাই। কালিদাসের জন্য সার্টিফিকেট খোঁজা কালিদাসের অবমাননা করা— সেটা

আমরা বুঝি। কিন্তু কালের মাহাত্ম্য কাটাইয়া উঠা যায় না। তাই একটু সার্টিফিকেট দিতেছি। পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশের, সভ্যতম সময়ের, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহাকবির একটু সার্টিফিকেট দিব। এই মহাকবির নাম গেটে। ইহার ফাউস্ট[৪] নামে যে কাব্য আছে, সে যেন একটা স্বপ্নরাজ্য। কবি তরুণ বয়সে ইহার প্রথম ভাগ লিখেন ও প্রবীণ বয়সে দ্বিতীয় ভাগ লেখেন; কিন্তু কী আশ্চর্য! এই দুই অবস্থায়ই তিনি যেন স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন! তাঁহার কাব্যে ইউরোপ মোহিত হইয়াছিল, এবং প্রায় দুইশত বৎসর মোহিত হইয়াই আছে। তিনি স্যার উইলিয়াম জোন্সের তর্জমা শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। স্যার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলার ভালো পুথি পান নাই, তাঁহার পুথিতে অনেক আবর্জনা ছিল। তিনি যে তর্জমা করিয়াছেন, মূলের সব সৌন্দর্য তাহাতে ফুটে নাই, ফুটাইবার চেষ্টাও তিনি করেন নাই। কিন্তু সেই ইংরাজি তর্জমা পড়িয়াই গেটের মতো মহাকবি বলিয়াছেন— মানুষের মনের ভিতর এবং তাহার বাহিরে সারা পৃথিবীময় যত সৌন্দর্য আছে, তাহা যদি কেহ একত্র দেখিতে চায়, তবে আমি তাহাকে বলিব —তুমি শকুন্তলা পড়ো।[৫]

আমাদের দেশের একজন প্রাচীন সমজদার বলিয়াছেন— "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্। তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা।" শকুন্তলাখানি কালিদাসের সর্বস্ব। সর্বস্ব বলিতে গেলে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিটিকেই বুঝায়; আর যা-কিছু আছে, সব একদিকে থাক, —আমার সর্বস্বটিকে লইয়াই আমি তৃপ্ত থাকিব। এ সমজদারের মতে শকুন্তলা থাকিলেই সর্বস্ব রহিল;— রঘু, কুমার, মেঘদূত— থাক বা না-ই থাক। সেই সর্বস্বের মধ্যেও আবার সবচেয়ে বড়ো জিনিস চতুর্থ অঙ্ক, — যেখানে শকুন্তলা "যাতি"। শ্বশুর বাড়ি "যাতি" নয়, শুধুই "যাতি";— কোথায় "যাতি" সমজদার তাহা বলিবেন না। কণ্বমুনি বলিয়াছেন— "পরিগৃহীতো ভর্ত্তুঃ"; কিন্তু সমজদার বলিলেন শুধু "যাতি"। যখন মেয়েটিকে দশ, বারো, চৌদ্দ বৎসর প্রতিপালন করিয়া সে বাপ-মার সর্বস্ব হইয়া উঠে, সর্ব কাজে সব সময়ে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সেবা গ্রহণ করিতে পারা যায়, ঠিক সেই সময়েই তাহাকে পরের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। তখন কাহার হাতে তুলিয়া দিতেছি, সেকথা মনে থাকে না; কেবল মনে হয়, আমার সর্বস্বটি "যাতি"। সে সময়ে মানুষের মনে যে কী হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে মেয়েটিকে যত্ন করিবে কি না, তাহার

সহিত সদ্ব্যবহার করিবে কি দুর্ব্যবহার করিবে জানিতে পারা যায় না; তবে এইটি জানিতে পারা যায় যে, মেয়েটি "যাতি"। সব শূন্য বলিয়া মনে হয়। কালিদাস এই জায়গায় সেতারের এমন একটি তারে ঘা দিয়াছেন, যাহার করুণ সুর জগতের প্রত্যেক মানুষের প্রাণেই একটা মর্মবেদনা জাগাইয়া দিয়াছে। তাই সমজদার বলিয়াছেন,— তত্রাপিচ চতুর্থোঽঙ্কঃ।

শকুন্তলাকে কালিদাসের সর্বস্ব বলা হইল কেন? ইহাতে কালিদাসের অন্য কাব্যকে নামাইয়া দেওয়া হইল, এমন মনে হয় না। শকুন্তলা যে মানুষের মনে এক প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করিয়াছে, সেইটাই জানানো হইল। কালিদাস তো তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন। প্রথমখানি— মালবিকাগ্নিমিত্র,— কালিদাসের অল্প বয়সের লেখা। নাটকের স্থান কালিদাসের বাড়ির কাছেই। নায়ক রাজা— পৃথিবীর লোক, নায়িকারা সবকটিই পৃথিবীর লোক,— নাট্যাচার্য দুটি পৃথিবীর লোক, সখীগুলি সব পৃথিবীর লোক, রাজার পাত্র-মিত্র সভাসদ সব পৃথিবীর লোক। অপূর্ব নাটক বটে, কিন্তু সব এই পৃথিবীতে আটকানো। লিখিয়া বোধ হয় কালিদাসের তৃপ্তি হয় নাই। তাই তিনি লিখিলেন— বিক্রমোর্বশী সব স্বর্গের;— চন্দ্রের পুত্র বুধের নাতি পুরূরবা— তিনি স্বর্গের, প্রয়াগে তাঁর রাজধানী; নায়িকা উর্বশী স্বর্গের; কেশী দানব— স্বর্গের; ভরতমুনি— ইন্দ্রের অপরেশ বাবু। স্থান প্রায়ই স্বর্গে, অথবা হিমালয়ে-স্বর্গের দ্বারে। এও একখানি অপূর্ব নাটক। কিন্তু সবই স্বর্গের। কালিদাসের বোধ হইল— নাটকখানি জমিল না। তাই তিনি স্বর্গ মর্ত এক করিয়া শকুন্তলা লিখিলেন। এই স্বর্গ মর্তের মিলনেই শত শত বৎসর ধরিয়া জগৎ মুগ্ধ হইয়া আছে। শকুন্তলার মা মেনকা— স্বর্গের অপ্সরা, তাহার বাপ একজন ভয়ানক ঋষি— পৃথিবীর লোক; কণ্বমুনি— পৃথিবীর লোক,— তাঁহার ভাগিনী, শিষ্যেরা পৃথিবীর লোক। মাতলি ইন্দ্রের সারথি— স্বর্গের লোক; কশ্যপ ঋষি ও তাঁহার স্ত্রী অদিতি স্বর্গের লোক। শকুন্তলার সখীরা মর্তের; রাজার আর-আর মহিষীরা মর্তের; জেলে, মালা, বরকন্দাজ— সব মর্তের। এই স্বর্গমর্তের অপূর্ব মিলনই শকুন্তলাকে কালিদাসের সর্বস্ব করিয়াছে। এইখানেই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। তিনি পুরাদস্তুর আপনার হাত দেখাইতে পারিয়াছেন।

শকুন্তলা কালিদাসের প্রবীণ বয়সের লেখা। প্রবীণ কবিরা প্রায়ই দাঁড়াইয়া রূপবর্ণনা করেন না। কালিদাস যখন অল্প বয়সী ছিলেন, তখন কুমারসম্ভবে ১৭টি শ্লোকে পার্বতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাত যখন পাকিয়া আসিল, তখন

মেঘদূতের যক্ষপত্নীর রূপ তিনি এক কবিতায় বর্ণনা করিলেন। তবুও তিনি দাঁড়াইয়া রূপ বর্ণনা করিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রেও তিনি দাঁড়াইয়া রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুবংশে এইরকম দাঁড়াইয়া রূপ বর্ণনা নাই। যা আছে, তাহার চাতুরি অতি চমৎকার। তিনি ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে ১৯টি বিশেষণ ছড়াইয়া দিয়া ইন্দুমতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পুষ্পকরথে লঙ্কা হইতে ফিরিবার সময় ১১টি বিশেষণ ছড়াইয়া দিয়া সীতার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলায় তিনি কী করিলেন? দাঁড়াইয়া রূপ বর্ণনা তো করিলেনই না। প্রেমের কাব্য— রূপ বর্ণনা তো করিতেই হয়,— কী করিয়া করিবেন? বঙ্কিমবাবু হয়তো বলিতেন— তিনি তুলি ঘষিলেন না, একবার তুলি বুলাইয়াই রূপ বর্ণনা করিলেন। শকুন্তলার সম্বন্ধে কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া বলাইলেন— "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।" বিদ্যুৎ কখনো মাটি হইতে জন্মায় না। শকুন্তলাকে তিনি বিদ্যুতের সহিত তুলনা করিলেন। বিদ্যুতের যেমন একটা চকচকে লাবণ্য থাকে, সৈন্ধবেব চাঁই ভাঙিলে তাহার ভিতর হইতে যেমন একটা চকচকে ভাব বাহির হয়, শকুন্তলার রূপে তেমনি যেন চারিদিক আলো করিয়াছিল—চারিদিকে একটা চকচকে ভাব হইয়াছিল। এরূপ তুলির এক আঁচড়ে রূপ বর্ণনা বড়ো পাকা হাতের জিনিস। অপরেশবাবুর তর্জমাটি উত্তম হইয়াছে— "ক্ষণপ্রভা কবে ধরায় উদয়?"

শকুন্তলার বিদায়টি যে বড়ো করুণ, বড়ো হৃদয়গ্রাহী,— সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর সে বিষয়ে অনেকেই বলিয়াছেন, আমার বিশেষ বলার দরকার নাই। প্রেক্ষকদের চোখের জল— তাহার সকলের চেয়ে বড়ো সার্টিফিকেট। কিন্তু শকুন্তলার মূলমন্ত্রটা কী? কালিদাস শকুন্তলায় শিখাইলেন কী? যুবকেরা বলিলেন— যুবক-যুবতীর প্রেম; বৃদ্ধেরা বলিলেন— কণ্বের কান্না, মারীচের আশীর্বাদ; বিরহীরা বলিলেন— রাজার বিরহ; কিন্তু মোট কথাটা কী? শিক্ষাটা কী? সেটা যিনি খুব লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনিই তো বাহাদুর। কালিদাস কিন্তু সেটি খুব লুকিয়েছেন। মোট কথাটা এই— তুমি যেই হও —রাজাই হও, প্রজাই হও, মানুষই হও, দেবতাই হও,— সমাজ যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার একচুল অন্যথা করার তোমার সাধ্য নাই; যদি কর তাহার দরুন তোমায় শাস্তি পাইতেই হইবে। যতটুকু সে নিয়ম তুমি ভঙ্গ করিবে, ততটুকু শাস্তিও তোমায় পাইতে হইবে।

কণ্বমুনি সোমতীর্থে গেলেন; শকুন্তলাকে বলিয়া গেলেন— অতিথি সৎকারটা তোমার ভার। রাজা এই-কথা শুনিয়া অতিথি হইয়া আসিলেন: কিরূপ

সংকার পাইলেন, তাহা আর আমায় বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু কিছুদিন পরে আর-একটি অতিথি আসিলেন,— রাজার চেয়ে অনেক বড়োলোক এবং বড়ো দুর্দান্ত। শকুন্তলা এমন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, তিনি যখন "অয়মহং ভো"— বলিয়া আপনাকে অতিথি বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন শকুন্তলা তাহা টের পাইলেন না। যদি শকুন্তলার উপর ভার না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার কিছুই দোষ হইত না; কিন্তু সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ছিল, তাই দুর্বাসার শাপটি তাঁহার ঘাড়ে চাপিল। সখীরা হাতে পায়ে ধরিয়া সে শাপ মোচনের উপায় করিয়া লইল; কিন্তু তখনো শকুন্তলার চৈতন্য নাই, তখনো তিনি রাজার বিরহে ভয়ানক অন্যমনস্ক, সুতরাং সখীরা কী করিল না করিল, তিনি বুঝিয়াও লইলেন না। শাপে রাজারও স্মৃতি-লোপ হইয়া গেল। ইহারই ফল শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। রাজা শকুন্তলাকে তাড়াইয়া দিলেন। সমাজবিধি লঙ্ঘনের ফল বেশ ফলিল।

এই যে সমাজবিধি লঙ্ঘন, এইটাকেই আলংকারিকেরা নাটকের বীজ বলেন। এই বীজই ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইয়া নাটকখানিকে ফলপুষ্প শোভিত বৃক্ষের মতন করিয়া তোলে। বীজটি প্রথমেই পুঁতিতে হয়। প্রথম অঙ্কের গোড়াতেই শকুন্তলাকে অতিথি সৎকারের ভার দিয়া কণ্ব বাহিরে গেলেন, অতিথিও অমনি আসিয়া হাজির। কণ্ব বাড়ি নাই শুনিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, অতিথি সৎকারের ভার শকুন্তলার উপর আছে শুনিয়াই তিনি বলিলেন— আমি তাঁহার নিকটই ভক্তি প্রকাশ করিয়া যাই, "সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি।"[৫] রাজা তো এই বলিয়া অতিথি হইলেন। দুর্বাসা যখন শাপ দিলেন তখন তিনি বলিলেন—

আঃ কথমতিমিং মাং পরিভবমি?
বিকিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা,
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপিসন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥[৬]

[চতুর্থ অঙ্ক]

সখীরা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল; কী করিয়া মাপ চাহিবে জানে না। বলিল শকুন্তলা অতি বালিকা, আর এই তার প্রথম অপরাধ; আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।

তিনি শাপ মোচনের মন্ত্র দিয়া গেলেন। দোষটা কার? শকুন্তলার তো বটেই কিন্তু কণ্বমুনিরও কি নয়? তিনি যে একটি নাবালিকার হাতে আশ্রমের শ্রেষ্ঠ ধর্মের রক্ষাভার দিয়া গেলেন, সেই কারণেরই শকুন্তলা অব্যাহতি পাইল; নহিলে কঠোর সমাজ-শাসন তাহাকে পিষিয়া ফেলিত।

শকুন্তলার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সমালোচনার স্থান এ নহে। মোটামুটি দুই-চারি কথায় সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। যেরূপ বায়স্কোপ, টকি, নানারঙের নূতন নাটক, নূতন নূতন আনন্দ উপভোগের উপায় বাহির হইতেছে, তাহাতে শকুন্তলাকে বাংলা নাটকাকারে বাহির করিয়া অপরেশবাবু খুব ভালোই করিয়াছেন। তাঁহার তর্জমা স্থানে স্থানে বড়োই ভালো হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম অঙ্ক অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই। আর যাঁহারা নূতন নূতন আমোদের পথ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের এই নিত্য-নূতন নাটকের উৎসাহ দিতেছেন, তাঁহাদিগকেও অমরা সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহাদের মার্জিত রুচিকে আমরা ধন্যবাদ দিই, তাঁহাদের স্বদেশ প্রেমকে আমরা ধন্যবাদ দিই, ভারতীয় নাট্যকলার গৌরব রক্ষার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই।*

সুবর্ণবণিক সমাচার
৭ম সংখ্যা, ১৭শ বর্ষ।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।।

* স্বর্গীয় শাস্ত্রীমহাশয়ের এই অপ্রকাশিত রচনা তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য এম-এ মহাশয়েব সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষের ধারায় নাটক রচনা, অভিনয় ও পরিচালনায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছিলেন। পেশাদার জীবন শুরু করেন মিনার্ভা থিয়েটারে ১৩১১, পরে দীর্ঘ কর্মজীবন কাটে স্টার থিয়েটারে। তাঁর 'শকুন্তলা'-র অনুবাদ (১৮৩০) অভিনয়ের জুবিলি বা ৫০তম অভিনয় উপলক্ষে লেখা এই প্রবন্ধ — এটি তিনি হলে পাঠ করেছিলেন নিশ্চয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে হরপ্রসাদের বরাবর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

১. এই বইয়ের 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য ৪ দ্র.

২. এই বইয়ের 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য ৫ দ্র.

৩. এই বইয়ের ভবভূতি প্রবন্ধ দ্র.

৪. অনুবাদ : তিনি আমার ভক্তি অবগত হয়ে মহর্ষিকে জানাবেন।

৫. এই বইয়ে 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য ২ দ্র.।

৬. অনুবাদ : (নেপথ্য থেকে) আঃ কী স্পর্ধা! আমি অতিথি, আমাকে অবমাননা করলি? একাগ্র মনে যার চিন্তায় সমাগত এই তাপসের সংবর্ধনা করলি না, প্রমত্ত ব্যক্তি যেমন আগে যে কথা বলেছে তা স্মরণ করতে পারে না তেমনি [প্রিয়ব্যক্তিকে] স্মরণ করিয়ে দিলেও তোকে মনে করতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা

বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা

বাংলা ভাষায় বাংলা অক্ষরে বাংলা টীকা বাংলা অনুবাদের সহিত বেদ-এর প্রকাশ এক নূতন জিনিস। বাংলা তন্ত্রময়, বাংলা পুরাণময়, বাংলা অনার্যজাতিপরিপূর্ণ বাংলা হইতে প্রায় পাঁচ শত বৎসর বেদ-এর চাষ উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই বাংলায় যিনি আর্যজাতির গর্বহেতু বেদের প্রকাশ, বেদ-এর চর্চা, বেদ-এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্যদিগের একজন প্রধান বন্ধু, তাঁহার নিকট আমরা আপনাদিগকে বাস্তবিকই ঋণী বলিয়া বোধ করি। রমানাথ সরস্বতী এই দুরূহ কার্যের ভার লইয়াছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আজি আমরা রমানাথ সরস্বতীর বেদপ্রকাশিকা উপলক্ষ করিয়া বেদ-এর বিষয় কিছু লিখিব বাসনা করিয়াছি। বেদ জিনিসটা কী, বেদ-এর কিরূপে অর্থ করিতে হয়, বেদ-এর উপর কত ব্যাকরণ, কত অভিধান, কত ছন্দোবোধ, কত দর্শন লেখা হইয়াছে, বেদ-এর উপর দেশীয় লোকের ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের কিরূপ আদর, এই-সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড়ো একটা পড়েন না। তাঁহারা যদি বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা-র উপর দুই ফর্মা আর্টিকেল দেখেন, অমনি বঙ্গদর্শন-এর গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া লইবেন; এইজন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব যত অল্পে পারি গোটাকত মোটা কথা বলিয়া বেদপ্রকাশিকা পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিব।

বেদ-এর নাম শুনিলেই আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই মনে

* বেদপ্রকাশিকা, ঋগ্বেদ সংহিতা। ভাষা, সংক্ষিপ্ত টীকা, বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা টীপ্পনীর সহিত শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম.এ. কর্তৃক বিশদীকৃত, ব্যাখ্যাত, ভাষান্তরীকৃত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড। [১৮৭৭ খৃ.]

ভয়ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যে বেদব্যাখ্যা করিল সে শংকর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল সে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম দিল্লিতে আমার শত্রুনিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়। লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোনো প্রমাণ দিতে হইলেই "বেদের বচন" বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার, বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে বেদ কাহারো আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কী জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি. কিন্তু ভরসা করি যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মাপ্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন।

প্যালগ্রেভস গোল্ডেন টেজরি অফ সংস এন্ড লিরিক্স *(Palgrave's Golden Treasury of Songs and Lyrical Poems.)* হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষিপ্রণীত সূক্ত বেদে গ্রন্থিত আছে। যদি গোল্ডেন ট্রেজরির সহিত তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভীয় সাগা সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে।[১] আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরীমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত বহিল; কালি মার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর-এক সাগা হইল, এইরূপ সাগা একত্রে সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ। কিন্তু সাগা সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীতাসংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা ব্যাথা কেন?

প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়-তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে

ভারতবর্ষীয় সময়-তালিকাকারগণকৃত সময় নির্দেশ ভ্রমাত্মক, আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরানো বলি তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদসংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরানো বলিতে চাই, উঁহারা বলেন, যীশু খৃস্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদিই তুরানীয় বা অন্য জাতির অন্য-কোনো প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে তবে তাহা অপেক্ষাও আর্যজাতির বেদ যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর-এক কথা এই যে, যেকালে বেদ রচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্থার ভাব কী ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়োই উৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভালো করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল কেবল গোল্ডেন ট্রেজরি রহিল। তখন গোল্ডেন ট্রেজরিরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহা ভিন্ন ইংরেজজাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়ীগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যমাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুল্য কাব্য জগতে আব নাই। বেদ হোমারের একখানি মাহাকাব্য-মতো নহে কিন্তু বেদের এক-একটি সূক্ত এক-একখানি মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশবকাল, বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি নহে, অগ্নিই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন, শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন— সকলই উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান, যে পরিশ্রম, অন্তর্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীর ভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কী রূপে করিয়াছেন? সে ভাব প্রকাশে চাতুরি নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোনো ভাব ভয়-কি-ভক্তি মনে উদয়মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর

অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল, ও মহীয়ান্; ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান, অলংকারের দোষপরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরি নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সংপ্রসারণ হয়, প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্যালোচনায় কল্পনার আমোদ কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার উৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড, তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পর্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধনভয়ে আমরা মনের অনেক ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না, তাঁহারা সেই ভাব শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময়, কবিহৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন, আধুনিক কবিরা তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এইজন্য বেদ পড়েন যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্মপুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে সে বেদ কী? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে সে গ্রন্থ কী? আমাদের এখন দেখানো চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্ম গ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে "সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল," বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা কোনো স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি আমি অকবি দুই-জনেই একত্র থাকি একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা বলে জগৎ সংসার কত সুন্দর দেখ আমি অকবি মাটিকে মাটিই দেখি আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ আমরা জানি যে আমাদের দুই-জনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন

দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল আমরা যাহা পারি না এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা-সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা ইহাকেই সাহেবেরা inspiration বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এইজন্য মাধবাচার্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন, তিনিই ঋষি। ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন। এইজন্যই কালিদাসের "মন্ত্রকৃতাং" লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন মন্ত্রকৃতাং নহে, মন্ত্রদৃশাং।[২] ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়; এই রূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তকরূপে পরিণত হইল।

বেদ কী জিনিস, কেন উহার এমন সম্মান, এক প্রকার বলা হইল। কিন্তু আমরা এখন বেদ বলিতে ঋক্‌বেদ সামবেদ যজুর্বেদই যে কেবল বুঝি তাহা নহে। প্রথম বুদ্ধি বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে[৩] সম্ভবত আমাদের ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত; প্রকৃতি উপাসনা ও যজ্ঞবাহুল্য। প্রকৃতি উপাসনা ঋগাদি বেদত্রয়ে বর্তমান, যজ্ঞকার্য প্রণালী ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উক্ত। এই দুই সময়ের সাহিত্য সংসারের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা সেই সমস্তকেই বেদ এই সাধারণ আখ্যা দিয়া থাকি। বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষৎ পর্যন্ত বুঝাইয়া যায়।

বেদ হইল, এখন বেদব্যাখ্যার কথা কিছু বলা চাহি। কারণ রমানাথ সরস্বতীর বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত কথা কহাইতেছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। প্রকৃতি উপাসনা যে সময়ে হয় তাহার অনেক পরে ভারতভূমি যজ্ঞপ্রধান হইয়া উঠে। বেদের অনেক পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয়, ভাষাই তাহার প্রধান সূচিকা। পাণিনি ছান্দস প্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি উপাসনা সময়ে যে যজ্ঞ ছিল না তাহা নহে, দেবতার উদ্দেশে খাদ্য পুষ্প চন্দনাদি দান সকল সময়েই ছিল। কিন্তু তখন এত বাড়াবাড়ি ছিল না। যখন যজ্ঞবাহুল্য হইল তখন কী বলিয়া দেবতা-উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে এই লইয়া গোল বাধিল। পূর্বে ঋষিরা আপন আপন মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন,

ইঁহারা এখন কী বলিয়া দিবেন, কাজেই বেদের মন্ত্রই ইঁহাদের অবলম্বন হইল। বাস্তবিকও আমি যখন ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার ভাষা যদি বাহির হয়—কেমন শুনায়, যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্তু যদি একজন মহৎ কবির বচন ধরি "Father of life and light" অথবা "These are Thy glorious work, Father of light" বলিয়া ধরি, কত যেন অধিক ভাব প্রকাশ হয়। যে কবির বচন উদ্ধার করিলাম তাঁহারা পার্থিব কবি, যদি আবার সেই কবি ঈশ্বরে প্রেরিত হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের বচন হয় আরো অধিক ভাব প্রকাশ হইল বোধ হয়। এই অনুমানে ব্রাহ্মণসময়ের লোক যজ্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা চাহি; ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে ভূরিভূরি ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যাই বেদের প্রথম ব্যাখ্যা। বেদ রচনার অল্প পরেই ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অনেক কথার অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বিদ্যাপতির গ্রন্থের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারি না, ইংরেজেরা যেমন এখন চসরের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা অনেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। অনেকস্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন; আজগবি ধাতু প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের সময় হয়। এই সময় বেদের উপর ব্যাকরণাদি লিখিত হয়। স্বরপ্রক্রিয়া, ধাতুপ্রক্রিয়া-আদি, অভিধান, ছন্দোবোধাদি পুস্তক লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রয়োজন মতো মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইঁহারা সেই ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলি স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ যে প্রণালী আরম্ভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার পরিশিষ্ট হইল। নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণই এই ব্যাখ্যা।

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্মোৎপত্তি। পৌরাণিক ধর্ম দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নাশে, পৌরাণিক ধর্ম-নাশের জন্য শংকরাচার্য কর্তৃক অদ্বৈতধর্ম প্রচারে প্রায় ১৫০০ শত বৎসর গত হইল। বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রচার শংকরাচার্যের পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচারকগণ বেদব্যাখ্যার তত চেষ্টা করেন নাই। কেবল যাগযজ্ঞের যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য আধুনিক সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়া ও বেদমন্ত্র কেবল মুখস্থ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবচার্য দেখিলেন লোকে কেবল মুখস্থ করিয়াই কার্য শেষ করে, এইজন্য তিনি বিজয়নগরের রাজার সাহায্যে

সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎকালে যে বহুল প্রচার ছিল তাহার প্রমাণ এই, যে, ঋক্‌বেদ অনুক্রমণিকায় মাধবাচার্য একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে মতটি এই যে "বেদমন্ত্র যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আবশ্যকতাই নাই।" এই মত খণ্ডন করিয়াছেন আর শুদ্ধ মুখস্থ মতাবলম্বীদের বিলক্ষণ গালি দিয়াছেন।[৪]

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।

যে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে সে কেবল গোঁড়া মাত্র; সে কেবল ভার বহন করে। মাধবাচার্যের টীকার এক প্রধান দোষ তাঁহার টীকা তাঁহার নিজের লেখা নহে; তাঁহার ছাত্রদিগের লেখা; তাঁহার কেবল তত্ত্বাবধারণ মাত্র। উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কোথাও বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দি তর্জমা সংস্কৃত, কোথাও দ্রাবিড়ি তর্জমা সংস্কৃত। আর-এক প্রমাণ আরো গুরুতর। বেদের প্রথম ঋক্‌টি তিন চারি পাতা ধরিয়া সব ব্যাকরণের সূত্র দিয়া লেখা হইল। তাহার পর বরাবর খানিক দূর ঐ ঋকের টীকায় বরাত দেওয়া হইল। দুই-তিনটি সূক্তের পর আবার প্রথম ঋকের টীকা। তিন-চারি পাত টীকায় সব ব্যাকরণের সূত্র দেওয়া আছে কিন্তু অনেক কথার বরাত দিলে বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই। এই রূপে একস্থানে যে-কথার যে-অর্থে যে-রূপে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, আর-একস্থানে সেই কথার সেই অর্থে অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি। আবার তামাসা এই, প্রথমটি হয়তো যথার্থ ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়টি ভুল। যাঁহারা বৈদিক ব্যাকরণ উত্তমরূপ পড়িয়াছেন তাঁহাদের উচিত এই-সকল ভুল সংশোধন করিয়া লন। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া লইতে যেন বিশেষ যত্ন করেন।

চতুর্থ ব্যাখ্যা, রোথসাহেবের[৫]। রোথসাহেব ব্যাখ্যা করেন নাই কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই যে ব্রাহ্মণ-কালে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহাতে এমত অনেক বিষয় আছে যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব আমাদের উচিত ঔপমিকভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া সমগ্র বেদ নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল

তাহা তো ভিন্ন আকারে ভাষান্তরে থাকিতে পারে। সেই ভাষা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাখ্যা করিতে হইবে একথায় অনেক সত্য আছে বটে, কিন্তু কোন্‌টি ঠিক অর্থ জানিবার কোনো উপায় নাই। হয়তো বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, গ্রীকে সেইটি অন্য অর্থে আছে। এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাই।

মাক্স মুলার[৬] রোথ-মতাবলম্বী। তাঁহার নূতন মত এই; —তিনি ঋগ্বেদ হইতেই ঋগ্বেদের অর্থ করিতে চান। এবং এই উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদের একখানি নির্ঘন্ট করিয়াছেন। উহাতে এক-একটি শব্দ ঋগ্বেদের কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে সব ধরিয়া দেওয়া আছে। মাধবাচার্য পূর্বোক্ত কারণ বশত এক কথার সতের জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিয়াছেন। এরূপ গোলমাল অনেক এবার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংস্কৃতে এক কথার যে একই অর্থ হইবে তাহার কোনো প্রমাণ নাই। এক কথার নানা অর্থ হয় বলিয়াই সকল অভিধানে নানার্থকোষ বলিয়া এক এক অধ্যায় দেওয়া আছে।

রেভারেন্ড ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়[৭] বলেন সায়ণাচার্য ও প্রাচীন টীকা পরিত্যাগ করা অন্যায় বটে কিন্তু যেখানে যেখানে ভিন্ন দেশীয় বিষয়ের কোনো উল্লেখ আছে সেখানে সেখানে এ টীকা গ্রাহ্য নহে। অনেক কথা সায়ণাচার্য যাহার অর্থে মেঘ জল বা অন্য জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মধ্যে পারস্য রাজা বা সেনাপতির নাম দেখেন। তিনি বলেন শরফলাকৃতি যে-সকল শাসন পারস্যের পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদব্যাখ্যায় বিশেষ উপযোগী। একস্থানে পণি-শব্দে সায়ণ গো লিখিয়াছেন; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইবে আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে-সকল মতামতের কথা কহিতেছিলাম সে তো সামান্য। সায়ণ ও প্রাচীন টীকাই সকলের মূল। কেহ কোথায় সায়ণের সঙ্গে মিলেন, কেহ কোথায় মিলেন না এই পর্যন্ত। কিন্তু বেদের যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা কোনোকালে হইবে না, তাহার এক সম্ভাবনা হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতী[৮] একজন এক্ষণকার লোক, তিনি সমাজসংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ "ভাঙিয়া চুরিয়া গড়িতে চান"। তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য করো, এই এই কর্ম করিও না, কে তাঁহার কথা শুনিবে? এইজন্য তিনি বেদের স্মরণ লইয়াছেন। বেদ

গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা-কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন, বেদ একেশ্বরবাদী। শংকরাচার্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। অগ্রে নিয়তে এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ণ অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন, দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন; অতএব ঈশ্বর ধান্য। তাঁহার মত এই— সায়ণাচার্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্বে যে টীকা লিখিত হয় সেই টীকা, সেই প্রমাণ। নিগম-নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সায়ণ নিজের মত কোথাও দেন নাই। সর্বত্র নিগম-নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনি জিনিস।

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমরা এক বার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভালো বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্যকলাপ রীতিনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ বড়ো সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে; প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল, সেইটি বিশেষ জানা চাহি— শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে যেখানে যেখানে আর্যজাতি সেই সেইখানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি।

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়িয়াছেন, বেদের ব্যাকরণ তাঁহার সুন্দররূপ জানা আছে, ইংরেজি বেশ জানা আছে। আপনাকে সাধ্যমতো বৈদিক আর্য-সমাজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদব্যাখ্যা বিষয়ে তাঁহার মত এই, যে, ব্যাকরণ অভিধান কোনোরূপে বজায় রাখিয়া সহজ অথচ মহান্, সরল অথচ উচ্চ প্রকৃতির মনোগত ভাব বা প্রকৃতি চিত্র দেখাইতে পারিলেই বেদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

রমানাথ সরস্বতী বেদের ব্যাকরণখানি তাঁহার বেদপ্রকাশিকা-য় ক্রমশ অনুবাদ

করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষা অতি কটমট অথচ কথায় কথায় তর্জমা নহে। তাঁহার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমাদের কিছুই তৃপ্তি হইল না। অনুক্রমণিকায় তিনি পুরাণশাস্ত্র হইতে অনেক বচন তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই বচনগুলি পরিপাক করিয়া সুন্দররূপে আপনার মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে কেন রাশি রাশি বচন উদ্ধার হইয়াছে সহজে অনুমান করা যায় না। তিনি প্রথমবারেই আপনার কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ষষ্ঠ সূক্ত ব্যাখ্যাস্থলে ম্যাক্স মূলরের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হওয়ায় "ম্যাক্স মুলর আমাদের দেশের কথা কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দিয়াছেন। ম্যাক্স মুলর মধ্যে মধ্যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন বলিয়া, ঋগ্বেদের প্রথম প্রকাশক, বেদব্যাখ্যা বেদপাঠে ক্ষয়িতজীবন মহাপুরুষকে সরস্বতী মহাশয়ের "কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দেওয়া বড়ো অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার উচিত ছিল ভূমিকায় ম্যাক্স মুলরের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। যদি ম্যাক্স মুলরের ঋগ্বেদ না বাহির হইত তবে সরস্বতী মহাশয়ের বেদপ্রকাশিকা কোথায় থাকিত?[৯]

যখন মহাভারত অনুবাদ তিন-চারিবার মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন বেদ যে এ পর্যন্ত হয় নাই সে কেবল বাংলার কলঙ্ক। সরস্বতী মহাশয় সে কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রতিকুটিরে বেদপ্রকাশিকা থাকা কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণের একান্ত উচিত ইঁহার উৎসাহ দেওয়া। তাঁহাদের নিজের দলের তো কেহ করিল না, শেষ একজন কায়স্থ বেদ প্রকাশ করিল। তাঁহাদিগকে ধিক্! কিন্তু তাঁহাদের উচিত ইঁহার সহায়তা করা। তাঁহাদের কার্য আর-একজন করিল, ইঁহার সহায়তা না করিলে, তাঁহাদের কলঙ্ক ধুইলেও যাইবে না। সন্ধ্যা গায়ত্রী, জপ, হোম, সর্বত্র যে বেদের দরকার, সে বেদ তাঁহাদের গৃহে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন
পৌষ, ১২৮৪।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা' বই-এর সমালোচনা। অন্যান্য বই-সমালোচনা-নিবন্ধ 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ'-এর চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে— কিন্তু এই রচনাটি সেখানে দেওয়া হয়নি। কারণ বই-সমালোচনা হলেও এ প্রবন্ধে বেদ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অত্যন্ত মৌলিক অভিমত এবং সংস্কার-মুক্ত সাহাসি বিচারদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা চর্চায় বিরল আধুনিক মানসিকতার দৃষ্টান্ত হিশাবে প্রবন্ধটি তাই এই পর্যায়ে রাখা হল।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "ঋগ্‌বেদকে কি চক্ষে দেখিব? বহু পূর্বে বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে (ইংরেজী ১৮৭৭ সালে) বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বেদ ও বেদব্যাখ্যা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে যে আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় ৮৬ বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার এই প্রবন্ধের মূল্য বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক এমন কি আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের ও ভক্তিভাবের পুষ্পপত্রস্তূপের ভিতর হইতে মানব শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে যে সার্থক চেষ্টা করেন, ইহা তাহারই পর্যায়ের।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' — বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত, [১৯৬৩ পৃ. ভূমিকা/৯)

এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণের (১৮৮৫ খৃ.) ভূমিকায় রমেশচন্দ্র দত্তরও ঠিক একই মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছিল, "এটি আমাদের পৈতৃক ধন, কেবল

কি আমরাই এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব? ঋগ্বেদ-এর মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকপূর্ণ, জগতের আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব কাব্যরসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব।" ঋগ্বেদের সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকপূর্ণ কবিত্বের টান রমেশচন্দ্রও অনুভব করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের প্রসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদটি সম্পন্ন হতে পেরেছিল তরুণ পণ্ডিত হরপ্রসাদের সহায়তায়। ভূমিকায় রমেশচন্দ্র হরপ্রসাদের কাছে ঋণ স্বীকার করে লিখেছিলেন,

"এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য; — তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রীয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাইপো অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য [১৮৯৩-১৯৮১] আমাদের জানান, রমেশচন্দ্র দত্তর 'ঋগ্বেদসংহিতা'-র অনুবাদ মূলত শাস্ত্রীমশায়েরই হাতের কাজ।

রমানাথ সরস্বতীর অকালমৃত্যুর কারণে তাঁর পরিকল্পিত অনুবাদ শেষ হয়নি, শুধু প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১. স্ক্যান্দিনেভীয় Saga সাগা গদ্য-মহাকাব্য। বিষয় স্ক্যান্দিনেভিয়ার, বিশেষত আইসল্যাণ্ডের ঐতিহ্যবাহিত পুরাবৃত্ত। আদি রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Islendingabók ইস্‌লেণ্ডিঙ্গাবোক্ এবং Landnámábok ল্যাণ্ডনামাবোক্ —আইসল্যাণ্ডে আদিবসতির বিবরণ নিয়ে লেখা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "স্ক্যান্দিনেভীয় সাগাকে ঠিক বেদের সহিত তুলনা করা চলেনা— সাগা-গ্রন্থগুলি গদ্যে নিবদ্ধ

ইতিবৃত্ত বা পুরাণ-কথা মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ স্ক্যান্দিনেভীয় Edda এদ্দা গ্রন্থের কথা ভাবিতেছেন.....।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'-র ভূমিকা, পৃ. ভূমিকা/১০)। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যাণ্ডের স্ক্যান্দিনেভীয় মানুষের মধ্যে আমাদের দেশের ভাট-চারণদের মতো লোককবিরা (Skald- স্ক্যাল্ড) দেবতা এবং বীর ও বীরাঙ্গনাদের নিয়ে গাথা গেয়ে বেড়াত। ১২০০ খৃস্টাব্দ নাগাদ খৃস্টান ধর্মযাজক Saemund স্যামুণ্ড্ এই পদ্যগাথা, Poetic Edda সংগ্রহ করেন। 'এদ্দা' শব্দের অর্থ 'পিতামহী'। এদ্দা "ভারতের আর্যগণের জাতি জরমানিক জাতির মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের সমশ্রেণিক ধর্মের কবিতা ও পদের নাতিবৃহৎ সংগ্রহ।" (পূর্বোক্তসূত্র, পৃ. ভূমিকা/১৩) প্রাচীন নরউইজীয় ভাষায় গ্রথিত এই এদ্দা আকারে অনেক ছোটো হলেও ঋগ্বেদ-এর সঙ্গে তুলনীয়, ঋগ্বেদের আখ্যান-কবিতার সঙ্গে খুব মিল।

২. রঘুবংশ, পঞ্চম সর্গ, চতুর্থ শ্লোকে আছে
অপ্যগ্রণীমন্ত্রকৃতামৃতীনাং......।
উত্তররামচরিত, পঞ্চম অঙ্ক, চন্দ্রকেতুর সংলাপ, অপরেঽপি পরমোপ্রচীয়মানসত্ত্বপ্রকাশাঃ স্বয়ং হি সর্ব্বং মন্ত্রদৃশঃ পশ্যন্তি।

৩. "আমাদের গৌরবের দুই সময়" প্রবন্ধে (হ-র-সং-চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত) হরপ্রসাদ ভারত-ইতিহাসে দুটি বুদ্ধিবিপ্লবের কথা বলেছেন। "সম্ভবত.... একটি যিশু খৃস্টের জন্মের পূর্বে ৯০০ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া ৪০০ বৎসর সমান তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটি খৃস্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের পুনঃসংস্কার করে। প্রথমটিতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয়। দ্বিতীয়টিতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়।" প্রবন্ধটির প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা"-র বিশ্লেষণ আছে।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৬০) পাদটীকা :

"সুপ্রসিদ্ধ বেদভাষ্য 'মাধবীয় বেদার্থপ্রকাশ' সায়ণাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মঙ্গলাচরণে এইরূপ বলা হইয়াছে : ..... 'যৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্কমহীপতিঃ। / আদি শন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে।।৩।।/যে পূর্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।/ কৃপালুর্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ।।৪।।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, (বিজয়নগরের) রাজা বুক্কের আদেশে মাধবাচার্য্য বেদার্থ প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য। তাহা হইলে, সায়ণাচার্য্য ভাষ্যকার বলিয়া প্রচারিত হইলেন কি করিয়া? কোনও কোনও পুথিতে মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকের পরে এই দুইটী অতিরিক্ত শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায় : 'স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ / সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বেন যুজ্যতাম্।।/ ইত্যুক্তো মাধবার্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ।/ অন্বগাৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে।" (দ্রষ্টব 'ঋগ্বেদসংহিতা', প্রথম ভাগ, পৃ. ১, পাদটীকা, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল।) E Roer ও E B. Cowell কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮৬০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত (Bibleotheca Indica) *The Samhita of the Black Yajurveda*-এর ভূমিকায় পাদটীকাতেও এই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা বুক্ক প্রথমে মাধবাচার্য্যকেই বেদভাষ্য রচনা করিতে আদেশ করেন। পরে মাধবাচার্য্যের পরামর্শে তাঁহার অনুজ সায়ণাচার্য্যকে বেদার্থ প্রকাশের ভার দেন এবং সায়ণাচার্য্য বেদের ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যই 'সায়ণাচার্য্যরচিত মাধবীয় বেদার্থপ্রকাশ' নামে পরিচিত ও প্রচারিত হইয়াছে।" (পৃ. ৩৯৪)

৫. রুডল্‌ফ রোট Rudolf Roth-এর জন্ম জর্মানির স্টুটগার্ট শহরে ১৮২১ খৃস্টাব্দে। য়ুরোপে বেদ চর্চার পথিকৃত রোট ১৮৪৬ সালে জর্মন ভাষায় তাঁর *Zur Litterature und Geschichte des Weda* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর ইংরেজি অনুবাদ *On the literature and history of the Veda,* ১৮৮০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত

হয়। রোট-এর অপর বড়ো মাপের কীর্তি ২৫ বছরের পরিশ্রমে সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান (১৮৫২ - ৭৫ খৃ.)। সেন্ট পিটার্সবার্গের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস অ্যাণ্ড আর্টস এই অভিধান প্রকাশ করেন। সংস্কৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অধ্যাপক রোট-এর পাণ্ডিত্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ জীবনকালে রোট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সমাদৃত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে।

৬. জর্মানির Dessau দেসাউ শহরে Friedrich Max Müller ফ্রীড়রিখ মাক্স মূল্ল্যর-এর জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৮২৩ খৃস্টাব্দে। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় পারংগম ফ্রীডরিখ ২০ বৎসর বয়সে লাইফট্সিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ১৮৪৪-এ বিষ্ণু শর্মা রচিত 'হিতোপদেশ' জর্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অধ্যাপনা জীবনের ৫০ বৎসর কাটে অক্সফোর্ডে। তাঁর শিক্ষক Eugene Burnouf ইউজীন বুর্নুফের প্রেরণায় তিনি 'সায়ণভাষ্য' সমেত 'ঋগ্বেদ' সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। এই গ্রন্থ ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তাঁর আর-একটি বিরাট কাজ ৫১ খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদনা— The Sacred Books of the East, যার ৪৮টি খণ্ড ফ্রীড়রিখের জীবনকালেই প্রকাশিত। মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৯০০ খৃ.।

হরপ্রসাদ-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৬০) পাদটীকা

"বিশ্রুতকীর্তি জর্মান মনীষী Friedrich Maximilian Müller-এর (1823 - 1900) সম্পাদনায় সায়ণাচার্য-বিরচিত ভাষ্য সমেত সমগ্র ঋগ্বেদসংহিতা নাগরী হরফে মুদ্রিত হইয়া লণ্ডন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৯০৬ সংবৎ) এবং ষষ্ঠ ও শেষ খণ্ড ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৯৩১ সংবৎ) প্রকাশিত হয়। ইহাই সমগ্র ঋগ্বেদসংহিতা-র সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে (১৯৪৭ সংবৎ)। প্রতি খণ্ডে প্রথমেই থাকে ইংরেজী অক্ষরে মুদ্রিত প্রধান আখ্যাপত্র, তাহার পরে ইংরেজীতে লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা, এবং তাহার পর ও মূলের আগে থাকে নাগরী হরফে মুদ্রিত একটি সংস্কৃত

আখ্যাপত্র। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটীতে লেখা থাকে : 'ঋগ্বেদসংহিতা/সায়ণাচার্যবিরচিতমাধবীয়বেদার্থপ্রকাশনামভাষ্যসহিতা/ শার্ম্মণ্যদেশোৎ-পন্নেনেঙ্গলণ্ডদেশ-নিবাসিনা ভট্টমোক্ষমূলেরণ [২য় সংস্করণে 'মোক্ষমূলরভট্টেন'] সংশোধিতা/ শ্রীমদ্ভারতবর্ষাধিপতীনামনুমত্যা চ/উক্ষতরণাভিধাননগরে [২য় সংস্করণে 'গোতীর্থাভিধাননগরে] / বিদ্যামন্দিরসংস্থানমুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা/ সংবৎ ১৯০৬ বর্ষে [২য় সংস্করণ সংবৎ ১৯৪৭ বর্ষে] / প্রথমাষ্টকঃ'। প্রথম সংস্করণের শেষ খণ্ডের শেষে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থসমাপ্তিসূচক এই শ্লোকটি থাকে : "শার্ম্মণ্যদেশজাতেন শ্রীগোতীর্থনিবাসিনা।/ মোক্ষমূলরভট্টেন ভাষ্যামিদং বিশোধিতম্॥" Max Müller ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদেও হাত দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ এক খণ্ড প্রকাশিতও হইয়াছিল— *Rig-Veda Samhita* / The sacred Hymns of the Brahmanas / Translated/ by/ F Max Muller. Vol. I/ London/ 1869"। (পৃ. ৩৯৫-৯৬)।

৭. উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রদ্ধেয় মনীষী রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮১৩-৮৫]। শিক্ষা পটলডাঙা (হেয়ার) স্কুলে এবং হিন্দু কলেজে। ১৮৩২ সালে তিনি খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। শিক্ষকতা করেন পটলডাঙা স্কুল, মিশনারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুর স্কুল ও বিশপ্স কলেজে। ডিরোজিও-র প্রভাবে চালিত ইয়ং-বেঙ্গল দলের অন্যতম প্রধান সদস্য কৃষ্ণমোহন আধুনিক মননের প্রবক্তা রূপে বাংলার নবজাগরণে প্রেরণা সঞ্চার করেন। মাত্র ১৮/১৯ বৎসর বয়সে তিনি *The Persecuted* নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখে হিন্দু সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার এবং গুরু-পুরোহিতদের ভণ্ডামির কঠোর সমালোচনা করেন। এই সময়েই তিনি 'দি এন্‌কোয়ারার' (১৮৩১) এবং 'হিন্দু ইয়ুথ' নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'গভর্নমেন্ট গেজেট' (১৮৪৩) ও 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০) পত্রিকা দুটি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণমোহনের আর-একটি বড়ো কাজ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিন্‌সিজ) নামে ইংরেজি বাংলা কোষ গ্রন্থ সংকলন। এর ১৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৬-

৫১য়। সংস্কৃতবিদ্যায় ও দর্শনে পারঙ্গম কৃষ্ণমোহনের ষড়্‌দর্শন সংবাদ (১৮৬৭), *Dialogues on the Hindu Philosophy* (১৮৬১) প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। হরপ্রসাদ এখানে কৃষ্ণমোহনের *Rig-Veda-Samhita*-র (১৮৭৫) ভূমিকায় প্রকাশিত অভিমত উল্লেখ করেছেন। এটি 'ঋগ্বেদ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়-এর একটি সংস্করণ।

৮. ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতে হিন্দু সমাজের আমূল সংস্কার আন্দোলনে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দয়ানন্দ সরস্বতী [১৮২৪-৮৩] ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। পশ্চিম ভারতে কাথিয়াওয়াড়-এর মোরভি শহরে এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। মূল নাম ছিল শংকর। সন্ন্যাসী হয়ে দয়ানন্দ সরস্বতী নাম নেন। ইংরেজি শিক্ষা না পেয়েও তাঁর মনে হিন্দু সমাজের অজস্র কুসংস্কার সম্পর্কে ঘৃণা জন্মে, বিশেষত অগণিত দেবদেবীর মূর্তি পূজা তিনি সম্পূর্ণ বর্জনীয় মনে করেন। হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন, বেদই একমাত্র অবলম্বন, সর্ববিধ জ্ঞানের আধার। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী বেদ-এর তাৎপর্যের উপরে সর্বসংস্কারমুক্ত এক নবীন হিন্দুসমাজ গড়ে তোলার আদর্শে দয়ানন্দ ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাইয়ে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭-এ আর্যসমাজের মৌলিক ভাবনামন্ত্র সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়। দশটি মৌলিক নীতির মধ্যে অন্যতম ছিল চতুর্বেদকেই সমস্ত জ্ঞানের আকর মানা। ঈশ্বর সর্ববিধ জ্ঞানের আকর এবং বেদ ঈশ্বর প্রেরিত বাণী। দয়ানন্দের নিজস্ব বেদব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তাঁর 'সত্যার্থপ্রকাশ' (হিন্দি-১৮৭৪ খৃ. বাংলা অনুবাদ. ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে। এই ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ বা একতত্ত্ববাদ গ্রহণ করা হয়নি। ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি— তিনটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব মানা হয়েছে। দয়ানন্দের আন্দোলন বিশেষভাবে উত্তরভারতে ব্যাপক সমাদর পেয়েছিল। জাতিভেদপ্রথা না মানা, শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আবার হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা— ইত্যাদি প্রচেষ্টায় এই আন্দোলনে কিছু উদার অন্তঃসার ছিল মনে করা যায়। দয়ানন্দ বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুই পক্ষে কখনোই মতাদর্শের একতা ছিল না।

৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত হরপ্রসাদ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের (১৩৬৬ ব.) পাদটীকা :

"ঋগ্বেদসংহিতা-র প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম ঋক্‌টি এইরূপ : 'যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ/ রোচন্তে রোচনা দিবি।।' Max Müller ইহার ইংরেজী অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন : Those who stand around him while he moves on, herness the bright red steed; the lights in heaven shine forth (দ্রষ্টব্য *Rig-Veda Samhita....* Translated and Explained by F Max Müller, Vol. 1, p. 3, London, 1869), রমানাথ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার "বেদ প্রকাশিকা"-য় (পৃ. ৪৩) Max Müller-কৃত এই অনুবাদ সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : 'ইউরোপীয় পণ্ডিত ঋগ্বেদের প্রকাশক এবং অনুবাদক মক্ষমূলার এই মন্ত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, যথা 'পার্শ্ববর্ত্তী জনগণ গমনশীল রক্তবর্ণ অশ্বকে রথে যোজনা করিতেছে। আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ পাইতেছে।' মক্ষমূলার কিরূপে যে অরুষ শব্দে একটী অশ্ব করিয়া স্থির রহিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না, কারণ পর শ্লোকেই ইন্দ্রের দুটি অশ্বের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে এবং ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। হরেশ হেমান উইলসন [Horace Hayman Wilson] সাহেব যে বলিতেন 'যে ইউরোপীয়দিগের দর্শনাদি সংস্কৃতশাস্ত্রে কোন অধিকার (ব্যুৎপত্তি) হয় না' তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" (পৃ. ৩৯৮)

দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা

আমাদের দেশের লোকের সংস্কার আছে যে দুর্গোৎসব বসন্তকালেই হইত। রামচন্দ্র রাবণবধের সময় শরৎকালে দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকাল দক্ষিণায়ন— দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি— সে সময় দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। সেইজন্য শরৎকালে দুর্গাপূজার পূর্বে বোধন করিতে হয়। এই বোধন দালানে হয় না। চণ্ডীমণ্ডপে হয় না। একটি বেলগাছের তলায় হয়। বেলগাছের তলায় বেদি করিতে হয়। বেদির উপর ঘটস্থাপন করিতে হয়। তখন ঘটই দেবীর প্রতিমা। বেলতলায় ঘটে দুর্গাদেবীর 'আমন্ত্রণ' ও 'অধিবাস' করিতে হয়। এ 'আমন্ত্রণ' 'আবাহন' নহে। আবাহনের মন্ত্র স্বতন্ত্র, আমন্ত্রণের মন্ত্র স্বতন্ত্র— আবাহনের ক্রিয়া স্বতন্ত্র,— আমন্ত্রণের ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। এই সময়ে অধিবাসে নবপত্রিকার আবশ্যক হয়।—

রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ
অশোকো মানকঞ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।[১]

এই নবপত্রিকারও অধিবাস করিতে হয়। কলাগাছ, গুঁড়ি-কচুর গাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোকের ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের গাছ। দুর্গার যেমন অধিবাস করিতে হয় তেমনি এই নয়টি গাছেরও অধিবাস করিতে হয়। তখন এ গাছগুলি আর গাছ থাকেন না— দেবতা হইয়া যান। কলাগাছ হন ব্রহ্মাণী; কচু হন কালিকা; হরিদ্রা হন দুর্গা; জয়ন্তী হন কার্তিকী; বেল হন শিবা; দাড়িম হন রক্তদন্তিকা; অশোকা হন শোকরহিতা: মানকচু হন চামুণ্ডা; আর ধান হন লক্ষ্মী। দুর্গার পূজা আরম্ভ হয় সপ্তমীর দিন, আর বোধন হয় ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময়। সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে পূজার প্রথম কাজ নবপত্রিকার স্নান। ঐ নয়টি গাছ কলার খোলায় মুড়িয়া নয়গাছা পাটের দড়ি দিয়া বাঁধিতে হয়।

পাট শব্দের অর্থ রেশম। এখন একটু রেশম দেয়, বাকিটা পাটের দড়ি দিয়াই সারে। স্নানের ঘাটে নবপত্রিকা লইয়া যাইবার পূর্বে বোধনতলার বেলগাছের ঈশান কোণে যে শাখায় জোড়া বেল থাকে সেই শাখাটি ছেদন করিতে হয়— ছেদন করিয়া নবপত্রিকার মধ্যে এমন ভাবে বসাইতে হয় যে বেল দুটি উপরে দেখা যায়। অনেকে কলার খোলায় নবপত্রিকা বসাইবার পূর্বে একটি শ্বেত অপরাজিতার লতায় ঐ নয়টি গাছ বাঁধিয়া দেন। অপরাজিতার লতার ডগাটিও উপর হইতে দেখা যায়।

নবপত্রিকার স্নান একটা বৃহৎ ব্যাপার। সাধারণ লোকে উহাকে বলে 'কলাবৌ' নাওয়ানো। নানারূপ বাজনা বাজাইয়া নবপত্রিকা লইয়া ঘাটে যায়। সেখানে প্রত্যেক গাছের দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতে হয়। রাজার অভিষেকে যেমন নানা সমুদ্রে, নানা নদীর জল দিয়া অভিষেক করিতে হয়, নবপত্রিকার স্নানেও সেইরূপ নানা নদীর নানা সমুদ্রের জল লাগে। কিন্তু অত জল তো সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। সেইজন্য যে কয়প্রকারের জল পাওয়া যায়, তাহাতেই কাজ সারিতে হয়। ইহা ছাড়া উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ডাকিনী, শাকিনী, এই-সকল দেবীরও স্নান করাইতে হয়। প্রত্যেক দেবীর স্নানের দ্রব্য স্বতন্ত্র। যথা, উগ্রচণ্ডার চন্দন জল, প্রচণ্ডার সুবর্ণ জল, চামুণ্ডার কর্পূর জল, চণ্ডোগ্রার অগুরুর জল, চণ্ডনায়িকার নদ-জল, চণ্ডিকার মধুর জল, কাত্যায়নীর মধুপর্কের জল, ভগবতীর শিশির জল, ব্রহ্মাণীর হাতির দাঁতের যে মাটি ওঠে সেই মাটিগোলা জল, মাহেশ্বরীর শুয়োরের দাঁতে যে মাটি ওঠে সেই মাটিগোলা জল, বৈষ্ণবীর আদালতের গেটের মাটিগোলা জল, নারসিংহীর বেশ্যার দুয়ারের মাটিগোলা জল, ডাকিনীর চৌমাথার মাটিগোলা জল, আর শাকিনীর নদীর উভয় কূলের মাটিগোলা জল।

ইহার পর আবার আটটি ঘটের জলে নবপত্রিকাকে স্নান করাইতে হয়। প্রথম ঘটে গঙ্গার জল— এই জলে স্নান করাইবার সময় মালব রাগে বাজনা বাজাইতে হয়। দ্বিতীয় ঘটে বৃষ্টির জল— বাজনা ললিত রাগে, তৃতীয় ঘটে সরস্বতীর জল (প্রভাসের জল)— বিভাস রাগে দুন্দুভি বাজনা; চতুর্থে সাগর জল— ভৈরবী রাগ, ভীমবাদ্য; পঞ্চমে পদ্মপরাগমিশ্রিত জল— গৌড় রাগ, মহেন্দ্রাভিষেক বাদ্য; ষষ্ঠে ঝরণার জল— বড়ারি রাগ, শঙ্খবাদ্য; সপ্তমে সর্বতীর্থের জল— বসন্ত রাগ, শঙ্খবাদ্য; অষ্টমে তীর্থের জল— ধানসী রাগ, ভৈরবীবাদ্য।

এইরূপে নবপত্রিকাকে স্নান করাইয়া গা মুছাইয়া দালানের সম্মুখে আলিপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাহাতে দূর্বা, আলোচাল, ফুল, চন্দন ইত্যাদি দিয়া নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়। এই সময়ে 'ভূতাপসরণ' করাইতে হয়; তাহার পর খই, দূর্বা, আলোচাল, চন্দন, সাদা সরিষা ছড়াইতে ছড়াইতে নবপত্রিকাকে পিঁড়ি হইতে উঠাইয়া দালানে দুর্গা-প্রতিমার ডাইন দিকে বসাইতে হয়। এই নবপত্রিকাকেই লোকে 'কলাবৌ' বলে। কিন্তু লোকে গণেশের পাশে বসেন বলিয়া নবপত্রিকাকে গণেশের 'কলাবৌ' বলে কিন্তু ইনি গণেশের বৌ নন। হইলে ইনি গণেশের বামে বসিতেন— ডাহিনে বসিতেন না।

নবপত্রিকার যে নয়টি দেবী আছেন, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিনই ষোড়শোপচারে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়। তবে মানকচুর দেবতা যে চামুণ্ডা তাঁহার একটা বিশেষ পূজা আছে তাহার নাম 'সন্ধিপূজা'। সন্ধিপূজায় অন্য কোনো দেবতার অধিকার নাই, কেবল চামুণ্ডারই অধিকার। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণেই সন্ধিপূজা হয়।

দেবীর বিসর্জন হইয়া গেলে স্বতন্ত্রভাবে নবপত্রিকার বিসর্জন করিতে হয়।

দুর্গার বসন্তকালে পূজা হইত। রামচন্দ্র শরৎকালে সেই পূজা আরম্ভ করেন ইহাই আমাদের দেশের সংস্কার। এ সংস্কারের কী মূল তাহা জানি না। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণবধের পূর্বে দুর্গাপূজার কোনো কথাই নাই। 'কুম্ভকোণমের' ছাপানো রামায়ণ [টি. আর. কৃষ্ণাচার্য সম্পাদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, নির্ণয় সাগর প্রেস বোম্বাই, ১৯০৫] দেখিলাম তাহাতে নাই। তুলসীদাসে নাই, রামরসায়ণে নাই— আছে কেবল কৃত্তিবাসে। চণ্ডীতে এ পূজা শরৎকালের পূজা বলিয়াই বর্ণনা আছে।—

> শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
> তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ।।
> সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
> মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।[২]

এইটি চণ্ডীর শেষ অধ্যায়ে আছে। দেবী নিজেই বলিতেছেন শরৎকালে একটি মহাপূজা হইয়া থাকে। তাহাতেই দুর্গামাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইবে। তিনি আরো বলিতেছেন, বৎসরের মধ্যে একবার নানা পুষ্প ধূপ, দীপ নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিলে আমার প্রীতি হয়— সেই সময় আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়। ইহার একটু পরেই আছে যে সুরথ রাজা ও সমাধি নামে বৈশ্য দুইজনে নদীর চড়ায়

মাটির ঠাকুর গড়িয়া তিন বৎসর পূজা করিয়াছিলেন। মাটির ঠাকুর গড়িয়া পূজার কথা এইখানেই পাওয়া যাইতেছে। নদীর চড়ায় মাটির ঠাকুর তিন বৎসর থাকা অসম্ভব, তাহাতেই বোধ হয় যে সুরথ রাজা শারদীয়া পূজাই করিয়াছিলেন এবং তিন দিন পূজা করিয়াই বিসর্জন দিয়াছিলেন। এইরূপে তিন বৎসর পূজা হইয়াছিল।

এই তো দুর্গোৎসবের ব্যাপার। আসল কথা হইতেছে যে বহু-কাল ধরিয়া শরৎকালে একটা মহাপূজা হইত। যখন দেবীর মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইয়াছে, তখন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু সে পূজাটি যে কী তাহা দেবী বলেন নাই। আমার মনে হয় সেটি 'নবপত্রিকা' পূজা। মেধস ঋষির কথা শুনিয়া সুরথরাজা মাটির মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। সে মূর্তি যে কী তাহা ঋষি বলেন নাই। সে মূর্তি দশভুজা— কিনা— তাহা আমরা জানি না— সে মূর্তির সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ থাকিতেন কিনা— তাহাও আমরা জানি না। তবে শারদীয়া পূজায় মূর্তি-পূজা এই আরম্ভ।

আমাদের এই দুর্গোৎসব কতদিন আরম্ভ হইয়াছে একথার বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই ইহা বেশি দিনের নহে। ডাকিনী শাকিনীর পূজা খৃস্টীয় আট শতকের পূর্বে ছিল বোধ হয় না। কারণ মহাযান ও মন্ত্রযানের পরে বজ্রযান সহজযান ও কালচক্রযানেই ডাক্-ডাকিনী শাক্-শাকিনী প্রভৃতি উপদেবতার পূজার কথা পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের পুঁথি খুঁজিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে আমরা দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে প্রাচীন পুস্তক পাইয়াছি [দুর্গোৎসববিবেক] তাহা মহামহোপাধ্যায় শূলপানির[৩] লেখা। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁহার গ্রন্থে মাধবাচার্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ১৩৫০-এর পূর্বে ফেলা যায় না। তিনি তাঁহার পুস্তকে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মত তুলিয়াছেন। জিকন ও ধনঞ্জয় এগারো শতকের লোক হইতে পারেন, কারণ দ্বাদশ শতকের 'দায়ভাগ'-কার জীমূতবাহন[৪] জিকনের মত উদ্ধার করিয়াছেন। রায়মুকুট[৫] ১৪৩১ খৃ. অব্দে তাঁহার পুস্তকাদি লেখেন, তিনি কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা বলেন নাই। তাঁহার স্মৃতির পুস্তকে বরং জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আছে, কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা নাই। তাহাতে বোধ হয় সে সময় দুর্গোৎসবের এত প্রচার হয় নাই। রঘুনন্দন[৬] ১৬ শতকের প্রথম অর্ধে তাঁহার 'তত্ত্ব' রচনা করেন। তিনি তিথি-তত্ত্বের মধ্যে দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতেও নবপত্রিকা পূজার খুব বাহুল্য আছে।

রঘুনন্দনের সময় হইতে এ পর্যন্ত দুর্গোৎসব খুব চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে অনেকে মনে করিতেন দুর্গোৎসব অবশ্য কর্তব্য। সকল ব্রাহ্মণের বাড়িই দুর্গোৎসব হইত। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন প্রতি বৎসরই দুর্গাপূজা করিতে হইবে।

দুর্গোৎসবের প্রধান কার্য নবপত্রিকা পূজা। মাটির ঠাকুর গড়িয়া তিন দিন পূজা করিয়া পরে বিসর্জন দেওয়া কেবল বাংলাতেই আছে, আর-কোনো দেশে নাই। বাঙালিরাই ঐ পূজা করিয়া থাকে, আর-কোনো দেশের লোকে করে না। কিন্তু নবরাত্র-পালন ও নবপত্রিকা-পূজা অনেক দেশে হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কল্পারম্ভ হয়, অপর পক্ষের নবমীতে নয়, দেবীপক্ষের প্রতিপদে, না-হয়, দেবীপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রতিপদ হইতে নয় দিন পূজা অর্চনা হয়। এইজন্য উহাকে 'নবরাত্র' বলে। উহাতেও নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়। সুতরাং শরৎকালে নবপত্রিকার পূজাটা অনেক দেশেই আছে এবং সেইটাই ঠিক শারদীয়া পূজা।

অতি প্রাচীনকালে ঋতু পরিবর্তনের সময় লোকে একটা-না-একটা উৎসব করিত। মন্দ ঋতু হইতে যখন ভালো ঋতু আসে তখন উৎসবের মাত্রাটা বাড়িয়া যায়। বর্ষা একটা মন্দ ঋতু, কেন-না বর্ষায় লোকে ঘরের বাহির হইতে পারে না, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া দুর্ঘট হয়, অনেক সময় বাড়ির বাহির হওয়া যায় না। যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া যায়। বৌদ্ধরা আপন আপন বিহারে আবদ্ধ থাকিতেন। ব্রাহ্মণদেরও মতে নারায়ণ এই সময় শুইয়া থাকেন। রাজা-রাজড়ারা সৈন্য সামন্ত লইয়া বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের বিজয়যাত্রা বন্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং বর্ষা যে মন্দ ঋতু ও কষ্টকর ঋতু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে আবার বর্ষাকালে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস পাওয়া যায় না। বাংলা দেশে পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালের আহারের মধ্যে সঞ্চিত অড়হরের দাল আর ঝুনো নারিকেল ভাজা, কারণ নারিকেল গাছ বর্ষাকালে ভাদ্র মাসেই ঝাড়াইতে হয়। বর্ষা ঋতু চলিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, লোকে সূর্যদেবের মুখ দেখিতে পাইল, পথের কাদা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। কুমড়া, শশা, লাউ, ঢেঁড়স, বাতাবি নেবু, বরবটি, আক্ ক্রমে কড়াইশুটি নটে শাক প্রভৃতি নানারূপ তরিতরকারি তৈয়ার হইতে লাগিল। বাংলায় একটা অসাধারণ খাদ্য খেজুর গুড় এই সময় হইতে জন্মিতে থাকে। আউশ ধান্য উঠিয়া গিয়াছে, আমন্ ধান ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই তো একটা মস্ত উৎসবের সময়।

কিন্তু কী লইয়া উৎসব করিবে। প্রাচীন কালের লোকেরা তো আর ঠাকুর গড়িতে পারিত না, কুম্ভকার শিল্পের তো তখন তত উন্নতি হয় নাই। তাহারা গাছপালা লতাপাতা লইয়াই উৎসব করিত। সকল দেশেই গাছপালা লতাপাতা লইয়া উৎসব আছে। আর এদেশের প্রাচীন লোকে নয়টি গাছ লইয়া উৎসব করিত, শরৎকালেই এই নয়টি গাছে খুব পাতা বাহির হয়। কলাপাতার এমন শ্রীবৃদ্ধি আর কোনো সময় হয় না। এই সময়েই কলাগাছের চারিদিকে তেউড় বাহির হইতে থাকে; পাতাগুলি সবল সতেজ ও সবুজ হইয়া উঠে। গুঁড়িকচু চাষের এই সময়। এই সময় গুঁড়িকচুর পাতাগুলি কেমন নধর হইয়া উঠে। হলুদের গাছ বর্ষার প্রথমেই পাতা ছাড়িতে আরম্ভ করে এবং শরৎকালের প্রথমে সে পাতায় হলুদের খেত বন হইয়া যায়, পাতাও বেশ লম্বা চওড়া হয়। সেকালে জয়ন্তী ফুলের গাছ সকল ব্রাহ্মণের বাটিতেই থাকিত, তান্ত্রিক পূজায় জয়ন্তী ফুলের বড়োই আদর। জয়ন্তীর ফুল বসন্তকালেই হয়। শরতের প্রথমে জয়ন্তীগাছ পাতায় ভরিয়া যায়। বসন্তে বেলের পাতাগুলি সব পড়িয়া যায়, নূতন পাতা গজাইতে থাকে, বেল পাকিয়া গেলে সেই পাতার বাহার বাড়িতে থাকে। শরতে তাহার খুব বাহার হয়। দাড়িমগাছের পাতাও এই সময়ে খুব বাড়িতে থাকে। অশোকের ফুল ফোটে বসন্তে, নূতন পাতাও হয় বসন্তে, কিন্তু সে পাতার পূর্ণ যৌবন শরৎকালে। এই সময়ে পাতার খুব বাহার হয়, খুব সবুজ হয় এবং খুব পুরু হয় ও খুব বাড়িতে থাকে। শরতে মানপাতার যত বাহার এত বোধ হয় আর কোনো পাতারই নয়। শীতের শেষে মানপাতা পচিয়া যায়। গ্রীষ্মে পাতাই থাকে না, বর্ষায় একটু একটু পাতা বাহির হইতে থাকে, শরতে সেই পাতা ফুলিয়া প্রকাণ্ড হইয়া উঠে। একটা একটা মানপাতা লম্বে ৪/৫ ফুট ও আড়ে ৩/৪ ফুট দেখিতে পাওয়া যায়, আর শরতের আমন্ ধান, এখনো ধান ফুলে নাই কিন্তু চরম বাড় বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ঘোরালো মেঘের মতো রঙ হইয়াছে; সুতরাং এই নয়টি পাতা একত্র করিয়া অপরাজিতা লতায় বাঁকিয়া তাহা লইয়া লোকে যে উৎসব করিবে তাহার আর বিচিত্র কী?

এখন কথা হইতেছে যে যদি নবপত্রিকা পূজাই দুর্গোৎসবের আসল পূজা হয়, তাহা হইলে বাসন্তী পূজাকে শরতে আনিয়া যে দুর্গোৎসব হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, সেটা কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? আর কৃত্তিবাস যে বলিয়া গিয়াছেন, বসন্তকালে দেবীর যে পূজা ছিল তাহাই রামচন্দ্র শরৎকালে করিয়াছেন একথাই কিরূপে সম্ভবপর হয়? নবপত্রিকার অনেক পত্রই তো বাসন্তী পূজার সময় পাওয়া

যায় না। গুঁড়িকচুর গাছ একবারেই মিলে না। হলুদের পাতা একবারেই থাকে না। জয়ন্তী ডাঁটাসার হইয়া যায়, বেলও তাই। মানপাতার অবস্থা আরো শোচনীয়, যদিও পাওয়া যায় সে কুলপাতার মতো। ধানের তো কথাই নাই, না আমন না আউশ না বোরো; সুতরাং নবপত্রিকা এ সময়ে পাওয়াই যায় না। যাহারা বাসন্তী পূজা করেন তাহারাই জানেন নবপত্রিকা সংগ্রহ করিতে কী বেগ পাইতে হয়।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালের লোকে সর্বত্রই দেবতা বা spirit দেখিতে পাইত। তাহারা মনে করিত, জগতের সকল বস্তুতেই অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ দেবতা বাস করেন। এই যে গাছপালা গজায়, উহার ফুল ফুটে, ফল হয়, এ-সবই দেবতার খেলা। প্রথম প্রথম তাহারা গাছপালাকেই দেবতা বলিত, তাহার পর তাহাদের মনে হইল যে, গাছপালা তো দেবতা হইতে পারে না, উহা জড়পদার্থ; কোনো দেবতা উহার মধ্যে আছেন। তাহারা গাছপালার নামেই ঐ দেবতার নাম দিত। আমাদের ও অন্য প্রাচীন গ্রন্থে "বৃক্ষাভিমানিনী দেবতা" "পর্বতাভিমানিনী দেবতা" প্রভৃতি অভিমানিনী দেবতার নাম পাওয়া যায়। ক্রমে যখন আরো মাথা পরিষ্কার হইল, জগতে কার্যকারণভাবের উদ্বোধ হইল, তখন "অভিমানিনী দেবতা" আর পছন্দ হইল না। দেবতা গাছ বলিয়া আপনাকে মনে করেন— এই তো অভিমানিনী দেবতার মানে— ইহা তাঁহাদের অসঙ্গত বোধ হওয়ায় তাঁহারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিলেন। দেবতারা আপনাদের গাছ বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু গাছের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে একজন দেবতা আছেন— তিনিই হইলেন গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অতিপ্রাচীনেরা বর্ষার পর শরৎ আসিলেই, শরতের ভালো ভালো গাছপালা তুলিয়া, তাহাই লইয়া উৎসব করিতেন; মনে করিতেন ইহাতে শরৎ প্রসন্ন হইবেন, আমরা আনন্দে থাকিব, শরতের সহিত আমাদের বেশ একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া যাইবে। কিন্তু ক্রমে যতই তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই দেখিতে লাগিলেন যে গাছপালা পূজা করিয়া আর কী হইবে? পুরোহিত ঠাকুরেরা সর্বত্রই আছেন। তাঁহারা অমনি বলিয়া দিলেন যে উহা তো আর গাছপালার পূজা নয়, উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পূজা। গাছপালা দেবতাগণের বিভূতি। সেই সময়ে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবীর কল্পনা করা হইল।

নবপত্রিকার প্রথম গাছ কলাগাছ, প্রথম দেবতা ব্রহ্মাণী, অর্থাৎ ব্রহ্মার শক্তি;

সুতরাং তিনিই প্রথম, কলাগাছের সহিত কাজেই তাহার সম্পর্ক। ব্রহ্মাণী রাঙা, অনেক কলাগাছ তো রাঙাই আছে, তাহার মোচা তো ঘোরালো রাঙা। সুতরাং কলাগাছই ব্রহ্মাণীর বিভূতি হইতে পারে। ব্রহ্মাণীর চারিটি মুখ, কলাগাছেরও চারি দিকেই পাতা, উহা ঠিক মুখের মতোই দেখায়। ব্রহ্মাণী হংসের উপর বসেন, হংসটি শাদা, কলাগাছও শাদা এঁটেটির উপরে বসেন।

অতি প্রাচীনেরা দেবতার সহিত তাঁহার বিভূতির কিরূপ মিল দেখিতেন আমরা তাহা জানি না। আমাদের সে চক্ষু নাই। তাহার পর আবার তাঁহারা যে বিভূতির যে দেবতা করিয়াছিলেন আজও যে সেই বিভূতির সেই দেবতা ঠিক আছেন তাহা বিবেচনা হয় না। কারণ পুরোহিত মহাশয়েরা অনেকবার পূজার সংস্কার করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয়েরা অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি লিখিয়াছেন। সাত নকলে যে আসল খাস্তা হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দেখুন না, কলাগাছ যে ব্রহ্মাণীর বিভূতি ইহা আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি। বিশেষ অগ্নীশ্বর কলার গাছ সব রাঙা— পাতার ডাঁটাটি পর্যন্ত রাঙা, ছোবড়াটি ছাড়াইয়া ফেলিলে কলার সাঁসটি পর্যন্ত রাঙা। এ কলাগাছকে ব্রহ্মাণীর বিভূতি বলিতে কাহারো বিশেষ আপত্তি হইবে না। কিন্তু গুড়িকচু গাছের অধিষ্ঠাত্রী কালিকা কেমন করিয়া হইলেন বলা একটু কঠিন। কালিকা কালো, গুঁড়িকচুর গাছ তো ঘোরালো সবুজ। ঘোরালো হইলেই কালোর দিকেই টানে। কচুর পাতাগুলি কালীর জিবের মতো, কিন্তু তবুও কালীর সঙ্গে উহার যে বিশেষ তুলনা হইতে পারে, তাহা বোধ হয় না। তাই দুর্গাপূজা-পদ্ধতিকার লিখিয়াছেন যে কালিকাদেবী বক্ররূপ ধারণ করিয়া মহিষাসুর যুদ্ধে অসুর বধ করিয়াছিলেন। এইরূপ চক্ষে দেখিয়াও কিছু তুলনার সামগ্রী পাওয়া যায় না। একটা প্রবাদ লইয়া দেবীও তাঁহার বিভূতির একটা সম্পর্ক বাধাইয়া দিলেন।

হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী— দুর্গা। রঙ দুয়েরই এক। শরতে হলুদগাছের পূর্ণযৌবন। নবযৌবনসম্পন্না দুর্গারই পূজা হইয়া থাকে। যেমন মৃণালের গেঁড় হইতে মৃণালগুলি বাহির হয়, তেমনি দুর্গার শরীর হইতে দুর্গার দশটি হাত বাহির হইয়াছে। হলুদেরও গেঁড় হইতে বহু-সংখ্যক হলুদ বাহির হয়, সুতরাং এখানেও বেশ একটা তুলনা হইতে পারে।

তারপর জয়ন্তীগাছ। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী। কার্তিক হইতেই দেবতাদের জয়; সুতরাং কার্তিকের শক্তিকে অনায়াসে জয়ন্তী বলা যায়। সে জয়ন্তীর বিভূতি

জয়ন্তীগাছ কেন হইবে না। পদ্ধতিকার কার্তিকীর যে নমস্কারের মন্ত্র দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে শুম্ভনিশুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে জয়ন্তীর পূজা হইয়াছিল। জয়ন্তী ফুলের রঙ কালো, নীল আর রাঙা তিনে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এরূপ শোভা ময়ূরের গলায়ই দেখা যায়। ফুলের উপরকার পাতাটি যে ভাবে গুটাইয়া যায় তাহাতে ময়ূর পুচ্ছের সহিত বেশ তুলনা হইতে পারে, তাই বোধ হয় কোনো অতি প্রাচীন কবি ময়ূরের রঙের সহিত জয়ন্তীর রঙের তুলনা দেখিয়া কার্তিকীকে জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়াছেন।

তারপর বেলগাছ। বেলগাছ শিবের বড়ো প্রিয়। সুতরাং বেলের অধিষ্ঠাত্রী যে 'শিবা' হইবেন তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। দাড়িমের অধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা। দাড়িমের ফুল দেখিলেই রক্তদন্তিকার সহিত তাঁহার যে বেশ তুলনা হয়, সেটা বুঝিতে আর বাকি থাকে না। দাড়িম দানার সঙ্গেও লোকে দাঁতের তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে বোধ হয় ফুলের সহিতই তুলনা করিয়াই দাড়িমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকা করিয়াছেন। চণ্ডীতে আছে—

ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তান উগ্রান বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান।
রক্ত দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাং॥[১]

অশোকগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা। দেবী ও তাঁহার বিভূতির সম্বন্ধ নামেই প্রকাশ— ইনিও অশোক; উনিও শোকরহিতা। তারপর মানগাছের অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা। শুম্ভ ও নিশুম্ভর সহিত যুদ্ধকালে শুম্ভ নিশুম্ভ রক্তবীজ নামক এক অসুরকে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই আবার রক্তবীজ জন্মাইত। দেবী তাহাকে যতই আঘাত করিতে লাগিলেন ততই নূতন নূতন রক্তবীজের আবির্ভাব হইতে লাগিল। দেবী মহাবিপদে পড়িয়া কালীকে বলিলেন— তুমি হাঁ করো। কালী হাঁ করিয়া রহিলেন। রক্তবীজের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে পড়িতে লাগিল, আর নূতন রক্তবীজ হইতে পারিল না। পুরানো রক্তবীজ অনায়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। চামুণ্ডা হইলেন— হাঁ-করা দেবতা। সে দেবতার হাঁ-র সহিত মানপাতার বেশ তুলনা হইতে পারে। যদি হাঁ-র সহিত না হয়— তাঁহার জিবের সহিত মানপাতার বেশ তুলনা হইতে পারে। সুতরাং মানপাতার সহিত চামুণ্ডার বেশ একটা সম্বন্ধ পাতানো যাইতে পারে।

ধানের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এখানে দেবী ও বিভূতির সম্বন্ধ বেশি বলিয়া দিতে হইবে না। ধানই লক্ষ্মী—লক্ষ্মীই ধান।

এইরূপে দেখা গেল শরৎকালের নয়টি গাছ হইতে নয়টি দেবীর সৃষ্টি হইল। আমার এক-একবার বোধ হয় যে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধকালে দেবী যে অষ্টনায়িকা ও চামুণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই পরিণামে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেকথা জোর করিয়া বলিবার জো নাই। কারণ অষ্টনায়িকার নাম— ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, দেবী দুর্গা নিজে। চামুণ্ডা তাহার উপর। কিন্তু দুর্গোৎসবের পদ্ধতিতে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবতার নাম ব্রাহ্মী [ব্রহ্মাণী], কালিকা, দুর্গা, জয়ন্তী, কার্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। দুর্গোৎসবের পদ্ধতি যে দেবীমাহাত্ম্যের উপরই নির্ভর করে সে বিষয়ে সন্দেহ অতি কম। সুতরাং দেবী মাহাত্ম্যের সহিত যেখানে পদ্ধতির অমিল সেখানে পদ্ধতির মধ্যেই কিছু গোল আছে বলিয়া মনে হয়। নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মূর্তি গড়া হয় না, কিন্তু বোধ হয় ঐ অধিষ্ঠাত্রীদের সহিত দুর্গার পরিবারের মিল করাইয়া দুর্গোৎসবের মৃণ্ময় মূর্তি-সকল গড়া হয়। এই-সকল মৃণ্ময় মূর্তিতে কখনো বা দেবতা নিজে থাকেন, কখনো বা তাঁহার শক্তি থাকেন, কখনো বা দুই-ই থাকেন। চালচিত্রে শিব থাকেন। তাঁহার শক্তি দুর্গা— দুর্গোৎসবের প্রধান দেবতা। কার্তিকেয়ী শক্তি, তাঁহার দেবতা কার্তিক, তিনি নিজে থাকেন তাঁহার শক্তি থাকে না। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, তিনি দুর্গার ডাহিনে থাকেন। ব্রহ্মাণীর আর-এক নাম সরস্বতী, তিনি দুর্গার বামে থাকেন। পুরাপুরি নয়টি দেবী না থাকিলেও, উহাদের চারিটি যে দুর্গোৎসবের মূর্তিতে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দুর্গোৎসবের মূর্তিগুলিকে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রীগণের মূর্তি বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ যদিও আপাত দৃষ্টিতে বেশ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, যদিও পদ্ধতিকারেরা উহাদিগকে আবরণ দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা দেবী হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ বিসর্জনের সময় সমস্ত আবরণ-দেবতাকে দুর্গাশরীরে লয় করিয়া তাঁহাকে বিসর্জন দিতে হয়। দুর্গামাহাত্ম্যেও আছে যে, যখন অষ্টনায়িকা ও চামুণ্ডা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন শুম্ভ বলিলেন—

অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী।[৮]

তখন দেবী বলিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময়্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।।[৯]

বলিয়া সমস্ত নবনায়িকাকে নিজ শরীরে লয় করিয়া লইলেন। দুর্গা একমাত্র থাকিলেন।

এইরূপে দুর্গোৎসবের সমস্ত ব্যাপার পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখা গেল যে, এই যে শরদীয়া পূজা ইহা অতি প্রাচীন কালের একটি শরৎকালের উৎসব। এই উৎসব শরৎকালের গাছপালা লইয়াই হইত। পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব আছে। 'আন্থ্রাপলজি'-র পুস্তক পড়িলে দেখা যাইবে পৃথিবীর নানাস্থানে শীতের প্রারম্ভে এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব হইয়া থাকে।[১০] ক্রমে সেই গাছপালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হন। ক্রমে সেই দেবতাগণের মূর্তি হইল। এমন সময়ে দুর্গা-মাহাত্ম্য নামক পুস্তকের উৎপত্তি হইল। দুর্গা-মাহাত্ম্যে-র সহিত মিলাইয়া নয় মূর্তি হইতে ছোটোখাটো মূর্তি বাদ দিয়া বড়ো বড়ো মূর্তি দিয়া উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল। ক্রমে সে-সকল মূর্তি এক মূর্তিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; তিনিই প্রধান মূর্তি—তিনিই দুর্গা। তিনিই— দশভুজা। গাছপালার পূজা ক্রমে ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িয়া অদ্বৈতে পরিণত হইল।

নারায়ণ
কার্তিক, ১৩২২।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. রঘুনন্দন ধৃত পাঠ :

কদলী দড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বোঽশোকো জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা।।

২. অনুবাদ : শরৎকালে প্রতিবৎসর আমার যে মহাপূজা হয়ে থাকে, তাতে ভক্তিসম্পন্ন হয়ে আমার এই মাহাত্ম্য শুনলে মানুষেরা আমার কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন থেকে মুক্ত হয়ে ধনধান্যে সন্তানে পরিবৃত থাকে— এতে সংশয় নেই।

৩. প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ বাংলার নব্য-স্মৃতির প্রবর্তক মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির জন্ম যশোহর জেলায় আনুমানিক ১৩৭৫-৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। বিবাহ সূত্রে তিনি নবদ্বীপবাসী হন। তাঁর 'অনুসরণবিবেকঃ', 'একাদশীবিবেক', 'কালবিবেকঃ', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ', 'তিথিবিবেকঃ' প্রভৃতি ২৩ খানি মূল রচনা এবং ৪ খানি টীকার নাম জানা যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি পুথি সংগ্রহে 'দুর্গোৎসববিবেক'-এর পুথি আছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকা "ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীশূলপানিভট্টাচার্য্যবিরচিতো-দুর্গোৎসববিবেকঃ-সমাপ্তঃ। বিষয়ঃ। শরদি বসন্তে চ দেবীপূজা কথং কর্ত্তব্যেত্যা দের্বিচারঃ।" অর্থাৎ শারদীয়া ও বাসন্তী— দুই পুজোর কথাই বলা আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগের' ভূমিকায় লিখেছেন—

"He belongs to Rádhiya class of Brahmanas of Bengal, and belongs to Sáhadi Gáin of Baradvája gotra. His works are extensively studied in Bengal. He has twelve works, with names ending with the word Viveka. His *Durgotsava-vivek* seems to be the earliest work of the subject." *Shastri-cat*, vol. III, pp. xxxiii-iv.

৪. জীমূতবাহনের জন্ম সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলে। জন্মকাল অনিশ্চিত। পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে অনুমান করেন, জীমূতবাহনের গ্রন্থগুলি ১০৯০-১১৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম রচনা বোধ হয় 'কালবিবেক', বিষয়— বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাল নিরূপণ। দ্বিতীয় রচনা 'ব্যবহারমাতৃকা'-র বিষয় মামলার প্রাথমিক আইন-কানুন। জীমূতবাহনের প্রসিদ্ধ রচনা দায়ভাগ উত্তরাধিকারের বিধিবিধান। বাংলা দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে 'দায়ভাগ'-কে প্রমাণিক মেনে আসা হয়েছে।

৫. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডে বৃহস্পতি রায়মুকুট প্রবন্ধ দ্র., পৃ. ৯৩-১১৬।

৬. ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের জন্ম নবদ্বীপে। বাবা হরিহর। হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতিতে শৃঙ্খলা আনার জন্য 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব', 'তীর্থযাত্রাবিধি', 'দায়তত্ত্ব' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ এবং জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। হিন্দু সামাজ রঘুনন্দন প্রবর্তিত 'বিধিবিধানে' দীর্ঘ দিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

৭. অনুবাদ : তখন ঐ ভীষণ বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে ভক্ষণ করায় আমার দাঁত সব ডালিম ফুলের মতো রক্তবর্ণ হবে। তখন স্বর্গধামে দেবগণ এবং মর্ত্যলোকে মানবগণ সতত স্তুতিকালে আমাকে রক্তদন্তিকা বলে কীর্তন করবে।

৮. অনুবাদ : তুমি অতিগর্বিতা হয়েও পরবল আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ।

৯. অনুবাদ : হে দুষ্ট! এই জগতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে! আমিই একমাত্র বিরাজমানা আছি। এই দেখ, আমারই বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করছে।

১০. সমকালীন নৃতত্ত্বের চর্চায় J G. Frazer-এর বিখ্যাত বই *The Golden Bough* খুবই পড়া হত এবং ফ্রেজারের তত্ত্বদৃষ্টির ব্যাপক প্রভাব ছিল। এই প্রবন্ধে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞানের বিবর্তন ও প্রাকৃতিক কে দেবত্বে অভিষেকের তত্ত্বভাবনায় শাস্ত্রীমশায় স্পষ্টতই ফ্রেজারকে অনুকরণ করেছেন।

মহাদেব

রবিবার দিন শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য[১] ব্রহ্মার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, মঙ্গলবার দিন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ[২] বিষ্ণু সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন; আজ বৃহস্পতিবার— আমার পালা। শেষ পালা, মুধরেণ সমাপয়েৎ— শিবের পালা। বিনয় ও অমূল্যর কাজ একটু সোজা— কারণ, বেদে ব্রহ্মাও আছেন, বিষ্ণুও আছেন। আমার পালা কঠিন— কারণ, শিব বেদে নাই, অথচ এখনকার ত্রিমূর্তির মধ্যে তিনি একজন প্রধান। শিব বড়ো, কি বিষ্ণু বড়ো, এ বিষয়ে অনেক ঝগড়া আছে। সে ঝগড়ায় মাথা দিবার আমার দরকার নাই, তবে তারা দু-জনাই যে ব্রহ্মার চাইতেও বড়ো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই— কারণ, ব্রহ্মার পূজা বড়ো একটা নাই।

আমাদের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্রহ্মার লোক আছে, ভুবন আছে; বিষ্ণুরও লোক আছে, ভুবন আছে। ব্রহ্মার ভুবন ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুর ভুবন বিষ্ণুলোক— গোলোক বা বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মার দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা আছে, উদ্যান আছে। বিষ্ণুরও দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা, উদ্যান-সবই আছে। শিবের কিছুই নাই, তিনি থাকেন পরের দেশে, কুবের কৈলাসের অধিপতি— তিনি কৈলাসের বাহিরে একটা বাগানে পড়ে থাকেন। তাঁহার বাড়ি নাই, ঘর নাই— প্রায়ই ঘুরে বেড়ান— প্রায়ই থাকেন শ্মশানে-মশানে। ব্রহ্মার বেশ আছে, ভূষা আছে; বিষ্ণুরও বেশ আছে, ভূষা আছে; শিবের কিছুই নাই— আছে কেবল বাঘের ছাল। কোনো সময়ে তাহাও থাকে না—তিনি দিকগুলি জড়িয়ে কাপড় বলিয়া পরেন, অর্থাৎ দিগম্বর বা নেংটা থাকেন। দেবতা হবার যা-কিছু আনুষঙ্গিক, তা সবই ব্রহ্মারও আছে, বিষ্ণুরও আছে। শিবের নাই, অথচ শিব ত্রিমূর্তির এক মূর্তি। এর মানে কী?

বেদে অনেক দেবতা আছেন। অগ্নি আছেন, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, বরুণ আছেন, সূর্য আছেন, সবিতা আছেন, ভগ আছেন, পূষা আছেন, অর্যমা আছেন, কিন্তু শিব নাই। যজ্ঞে সব দেবতার ভাগ আছে, শিবের নাই। শিব তা হইলে এলেন কোথা থেকে?

এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন, শিব রুদ্র। ঋগ্বেদে কিন্তু রুদ্র শব্দ বহুবচনে ব্যবহার হয়, অর্থাৎ রুদ্রেরা একটা গণ। অমরকোষ বলেন, "রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ"। চিৎকার করিয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া তাঁহাদের নাম হইয়াছে রুদ্র। তাঁরা দল বাঁধিয়া বেড়ান। তাঁহাদের মনিব ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁহাদের বড়ো ভালোবাসেন। আর একটা গণ— সেও ইন্দ্রের। তার নাম মরুৎগণ। তারাও অন্তরিক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলেই মনে করে, রুদ্রগণ ও মরুৎগণ এক। ঝড়-বৃষ্টি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকে। ঝড়-বৃষ্টির দেবতা হলেন রুদ্রগণ। সুতরাং উভয়েই এক।

ঋগ্বেদে একবচনেও রুদ্র আছে। তিনি এই রুদ্রদের পিতা এবং পৃশ্নি বা পৃথিবী তাহাদের মাতা; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় রুদ্রদিগের উৎপত্তি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। রুদ্র ও মরুৎগণ হইতেই বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মরুৎগণ ও রুদ্রগণ গণদেবতা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের তো একজন কর্তা থাকা চাই— সেই কর্তাই রুদ্র। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের ভয়েই অস্থির। তাঁহাদের কেবল কথা— ওগো, আমাদের মেরো না, আমাদের মেরো না; ছেলে মেরো না, গোরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না। তোমাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্রগুলি আমাদিগের দিকে ছুড়ো না— অন্যদিকে ছোড়ো। রুদ্র খুশি হইলে ভালোও করিতে পারেন, অনেক সময় ব্যারাম আরাম করিয়া দিতেও পারেন। ঋগ্বেদে বহুবচনে রুদ্রই বেশি, একবচনে তিনটি মাত্র সূক্ত আছে। যজুর্বেদে সব শাখারই একটি করিয়া রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় আছে। অমঙ্গল নিবারণের জন্য বাংলা ভিন্ন সর্বত্রই রুদ্রাধ্যায় পঠিত হয়। সব ব্রাহ্মণ যজুর্বেদে-র অন্য অংশ মুখস্থ করুন-আর-না-করুন, রুদ্রাধ্যয়টি মুখস্থ করেন। এই রুদ্র আমাদের শিব হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের শিব যদিও সংহারের দেবতা বটেন, তথাপি তিনি নিরন্তর লোকের অমঙ্গল করিয়া বেড়ান না। সুতরাং যজুর্বেদের রুদ্র আমাদের শিব হওয়া বড়োই কঠিন। সামবেদীয় সন্ধ্যায় আমরা এক রুদ্রের কথা পাই, তাহার মন্ত্র এই—

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।"[৩]

আমাদের শিব দেখুন—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"[৪]

প্রথমত রঙেই তফাত। রুদ্র হইলেন কৃষ্ণ-পিঙ্গল; শিব হইলেন— রজতাগিরিনিভ। আমাদের শিবপঞ্চবক্ত্র, রুদ্র পঞ্চবক্ত্র নহেন, রুদ্র ঊর্ধ্বলিঙ্গ— আমাদের শিব তাহা নহেন, সুতরাং রুদ্র শিব হইতে পারিলেন না। আমাদের শিবের পূজা করিতে গেলে অষ্টমূর্তির পূজা করিতে হয়। রুদ্রের পূজায় অষ্টমূর্তি নাই। সুতরাং রুদ্র ও শিব এক হইতে পারেন না। ঋগ্বেদে শিব শব্দ অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্তু সব জায়গায় বিশেষণ— বিশেষ্য নহে। যজুর্বেদে সামবেদেও তাই। ঋগ্বেদে মহাদেব শব্দ একেবারেই নাই। মহাদেব যে দুটি নামে আমাদের নিকট পরিচিত, সে দুটির একটিও নাই। শিবও নাই— শম্ভুও নাই, তবে এ শিবই বা কে, মহাদেবই বা কে, শম্ভুই বা কে? অথর্ববেদে একটি অধ্যায় আছে, সেটির সংখ্যা ১৫; সেটিকে যেই পড়ে, সেই বলে, অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহা একটি কোনো রহস্যময় পদার্থ, চারিদিকে পদ্য, কিন্তু এ অধ্যায়টি গদ্য; চারিদিকে অতি প্রাচীন বৈদিক ভাষা, কিন্তু এটি যেন সংস্কৃত ভাষা। চারিদিকে মন্ত্র, যাদুবিদ্যা, ঝাড়-ফুকের মন্ত্র, মধ্যে বেশ একটু ঘোরালো কবিকল্পনা; চারিদিকে সমস্তই অতিপ্রাচীন পদার্থ, মধ্যে একটু নূতন জিনিস। চারিদিকে যজ্ঞের আয়োজন, মধ্যে বেশ একটু স্ফূর্তির কল্পনা। যেই পড়ে, সেই মুগ্ধ হয়— আশ্চর্য হয়, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে না। সব অধ্যায়টিই ব্রাত্যকে বাড়াইবার জন্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাত্য বলিতে কী বুঝায়? মনু বলিয়াছেন, "সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যাঃ।" আর্যদের মধ্যে যদি কেহ সাবিত্রী হইতে পতিত হন, তিনিই ব্রাত্য। কিন্তু এখানে ব্রাত্য বলিতে তাহা বুঝায় না; যদি তাহাই বুঝাইত, তাহা হইলে, মানেটা আরো জটিল হইয়া যাইত। যে পতিত, তাহাকে আবার বাড়ানো? কোনো যেমন তেমন বাড়ানো নহে— আকাশ পাতাল বাড়ানো। সুতরাং ব্রাত্য শব্দের মানে খুঁজিতে হইল; দেখিলাম, ব্রত-পতিত হইলে ব্রাত্য হয় না। পতিত অর্থে শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। ঋগ্বেদ দেখিলাম, ব্রাত শব্দ আটবার ব্যবহার আছে। ব্রাত বলিতে দল বুঝায়। যে দলের সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। ব্রাতরা ঋষিদের শত্রু ছিলেন। ঋষিদের অনেক সময় ব্রাতদিগের সহিত লড়াই করিতে হইত। এক জায়গায় আছে

যে ঋষিরা দেবতাদের কাছে এমন রথ প্রার্থনা করিতেছেন, যেন, তাঁহারা ব্রাতদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারেন। সুতরাং ব্রাত বলিতে ঋষিদের বিরুদ্ধ কোনো যাযাবর জাতি বুঝাইত। ইহাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; দু-চার দিন কোথাও বাস করিত, তাহার পর উঠিয়া যাইত। দু-চারিদিন যেখানে বাস করিত, তাহার নাম ব্রাত্যা। সামবেদ-এর পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্যা শব্দ আছে। ব্রাত্যেরা ব্রাত্যায় থাকিত। তাহারা ব্রহ্মচর্য করিত না, কৃষি করিত না, বাণিজ্য করিত না। করিত কী?— পশুপালন। ঋষিদের মতন তাহাদের ধনুকও ছিল না, বাণও ছিল না, কিন্তু ইহাদের বাঁক ছিল; ধনুকের 'জ্যা' ছিল না, এমন এক ধনুক ছিল; তীর ছিল না, বাঁকের বাড়ি মারিত। ঋষিদের ভালো ভালো রথ ছিল,— ব্রাত্যদের গোরুর গাড়ি ছিল। ঋষিদের চাবুক ছিল,— ওদের পাচনবাড়ি ছিল। ঋষিদের ঘোড়া খুব শায়েস্তা ছিল,— এদের ঘোড়া একবার এদিকে যাইত, একবার ওদিকে যাইত। ঋষিদের রথের তক্তা আঁটা থাকিত,— ইহাদের গোরুর গাড়িতে তক্তা বিছানো থাকিত। উহারা তেরচা করিয়া টুপি মাথায় দিত, কোমরে দুই-গাছা দড়ি দিয়া কাপড় বাঁধিয়া রাখিত। তাহারা কালাপেড়ে কাপড় পরিত, চামড়া দেওয়া খড়ম পরিত।

এই তো গেল ব্রাত্যদের কথা। ইহাদের বাড়াইবার জন্যই কি অর্থববেদ-এর ১৫শ অধ্যায় লেখা হইয়াছিল? সে কথার বিচারের পূর্বে দেখা যাউক, ব্রাত্যরা কোন্ বংশ? পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলে, ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মতন দৈব প্রজা, অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন, উহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত না; চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইত— পাইত না। মরুৎ-দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে, তাহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম হইত, তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দু-জন যজমানের কথা বড়ো দেখা যায় না, কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদিগের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন, তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদের ঋত্বিক্ হইতে দিতেন; মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। কিন্তু তাহাদের ব্রাত্য অবস্থার কোনো সম্পত্তি আনিতে দিতেন না। তাহারা সেগুলি হয় ব্রাত্যদের দান করিত,

না-হয় মগধদেশের ব্রাহ্মণদের দান করিয়া আসিত। এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, তাহারা আর্যবংশীয় ছিল, যতক্ষণ যাযাবর থাকিত, ততক্ষণ ঋষিরা তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিতেন না; ব্রাত্যস্তোম করিয়া কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিলে তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। তখন তাহারা সামগান রচনা করিত, মন্ত্রদর্শন করিত— এমন-কী, বেদের শাখাও সংগ্রহ করিত। তাহারা ঋষিদের সমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিত; ঋষিরা যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের নাম ছিল অন্তর্দেশ। ব্রাত্যেরা অন্তর্দেশেও থাকিত, বাহিরেও থাকিত। অন্তর্দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান, গঙ্গা-যমুনার অপর পারেও খানিকটা ছিল। ব্রাত্যেরা অন্তর্দেশেও ঘুরিয়া বেড়াইত, আর উহার চারিদিকেও ঘুরিয়া বেড়াইত।

আমরা পূর্বে জানিতাম যে, পতিত না হইলে ব্রাত্য হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ব্রাত্য ও ঋষিরা এক বংশীয়। ব্রাত্যেরা যাযাবর এবং ঋষিরা স্থায়ী। ব্রাত্যেরা স্থায়ী হইলে ঋষিদের সমান হইত। এতদিন ব্রাত্য শব্দের এই অর্থ বুঝা যায় নাই বলিয়া, অথর্ববেদের ১৫ সংখ্যক অধ্যায়টি ভালো বুঝা যায় নাই। অর্থববেদের এই অধ্যায়টি ব্রাত্যদিগের প্রশংসাই বটে। কিন্তু সে যে-সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ভিতরে লক্ষ করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন, একটা আলো,— একটা 'সু'বর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জন্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্মা হইল, সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে "মহাদেব" হইল, সে দেবগণের কর্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে একব্রাত্য হইল। অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইলেন। ব্রাত্যগণ যেন সব এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভাব হইল। ইন্দ্রধনু উহার ধনু হইল; কারণ, ইন্দ্রধনুর ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধনু হইল। সেই ধনুর উদর নীল, পৃষ্ঠ লোহিত। নীল অংশের দ্বারা উহার শত্রুদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের দ্বারা শত্রুদিগকে বিদ্ধ করে।

সুতরাং এই অধ্যায়ে ব্রাত্যকে বাড়ানো হইল না, ব্রাত্যের দেবতাকেই বাড়ানো হইল। সেই দেবতাই আমাদের শিব। তিনি মহাদেব; তিনিই ঈশান। মহাদেব শব্দ ঋগ্বেদে নাই, যজুর্বেদে নাই, সামবেদে আছে— কিন্তু সেখানেও নাম বলিয়া বোধ হয় না; একটা বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি যে শিব, ইহার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি পূর্বদিকে চলিলেন, কতকগুলি সাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে

চলিলেন। শ্রদ্ধা তাঁহার প্রিয়তমা, মাগধ তাঁহার পরামর্শদাতা হইল, বিজ্ঞান তাঁহার কাপড় হইল, দিন উষ্ণীষ হইল; রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে তিনি দক্ষিণদিকে চলিলেন, পশ্চিমদিকে চলিলেন ও উত্তরদিকে চলিলেন— সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, সাম ইত্যাদি চলিলেন। তাহার পর ঊর্ধ্ব দিকে চাহিয়া এক বৎসর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপে দেখা গেল তাঁহার পাঁচ মাথা হইল। তিনি একবৎসর ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে, দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাত্য! তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমায় আসন্দী (চারপাই) দাও। দেবতারা দিলেন। চারিটি সাম উহার দুইটি বাজু ও দুইটি আড়ানি হইল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত চারিটি পায়া হইল। ঋক্‌গুলি লম্বা দড়ি হইল, যজুগুলি ছোটো দড়ি হইল, বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিস হইল, সামবেদ উহার বসিবার স্থান হইল, উদ্‌গীথ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাঁহার অনুচর হইলেন ও তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এক ব্রাত্য মহাদেব "স্তুতমমরগণৈঃ" হইলেন। যে বেদ বিশ্বের আদ্য— বিশ্বের বীজ, তিনি তাহাতেই চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু এখনও ইনিই যে শিব, একথা জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু ঐ অধ্যায়ের পঞ্চমখণ্ডে যাহা আছে, তাহা পড়িলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। তিনি অন্তর্দেশ হইতে পূর্ব দিকে চলিলেন, পূর্ব দিক তাঁহাকে ভব নামে এক অনুচর দিলেন; দক্ষিণ দিক হইতে সর্ব, পশ্চিম দিক হইতে পশুপতি নামে এক অনুচর পাইলেন, উত্তর দিক তাঁহাকে উগ্র নামে এক অনুচর দিল, ধ্রুবা দিক তাঁহাকে রুদ্র নামে এক অনুচর দিল। ঊর্ধ্ব দিক্ তাঁহাকে মহাদেব নামে এক অনুচর দিল, অন্তর্দেশ তাঁহাকে ঈশান নামে এক অনুচর দিল। আমাদের শিবের পূজায় যে অষ্টমূর্তি পূজা করিতে হয়, একব্রাত্য তাহার সাতটি মূর্তি এখানে পাইলেন। ব্রাত্যেরা ঋষি সমাজে আসিলে, ব্রাত্যদের দেবতা শিবও ঋষি সমাজে আসিয়া মিলিলেন। ব্রাত্যেরা যাযাবর ছিল, শিবও যাযাবর; তিনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন— কিছু ঠিক নাই। তিনি শ্মশানে থাকেন— মশানে থাকেন— নদীতীরে থাকেন— বনে থাকেন। যাযাবরেরা আমাদের ন্যায় পাপের ভয় করে না; শিবও করেন না; তিনি ঠিক যাযাবরদিগের দেবতা— গৃহস্থদিগের নহেন। যাযাবরদিগের অনেক স্বভাব-চরিত্র এখনো তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রাত্য যদি কোনো অগ্নিহোত্রীর বাড়ি অতিথি হন এবং সে তখন অগ্নিহোত্র করিতে থাকে, সে তখন অগ্নিহোত্র ছাড়িয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে এবং বলিবে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি অগ্নিহোত্র

সমাধা করি। তিনি অনুমতি দিলে, করিবে— না দিলে, করিবে না; যদি করে, তাহার ফল মন্দ হইবে। সুতরাং শিব যাগযজ্ঞের অতীত। লোকে তাঁহাকে ভাগ দিক, বা না দিক, তাঁহার তাতে আসেও না, যায়ও না। সুতরাং দক্ষযজ্ঞে তাঁহার শ্বশুর যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্বতী উপেক্ষা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে হইয়াছিল। এত বড়ো একটা কাণ্ড হইল, তবে শিবের যজ্ঞে ভাগ হইল। এই কাণ্ডে ত্রিভুবন বিধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষের কাটা মাথায় একটি ছাগমুণ্ড বসিয়াছিল, দেবগণ পলায়ন করিয়াছিলেন— সতী মারা গিয়াছিলেন। এত করিয়া মহাদেবের ভাগ সাব্যস্ত হইয়াছিল।

অথর্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে যে একব্রাত্যকে বাড়ানো হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝানো যায় না। সমস্তটি বারংবার না পড়িলে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। একব্রাত্য কেবল ঘুরিতেছেন, কখনো উত্তর দিকে যাইতেছেন, কখনো দক্ষিণ দিকে যাইতেছেন, কখনো পূর্ব দিকে যাইতেছেন, কখনো পশ্চিম দিকে যাইতেছেন, কখনো ধ্রুবা দিকে যাইতেছেন, কখনো পরমা দিকে যাইতেছেন, কখনো ঊর্ধ্ব দিকে যাইতেছেন, কখনো অন্তর্দেশের মধ্যে ঘুরিতেছেন, কখনো অনাবৃত্ত দিকে যাইতেছেন, কখনো অনাদিষ্টা দিকে যাইতেছেন, কখনো বৃহতি দিকে যাইতেছেন, কখনো পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতেছেন। একব্রাত্য ঠিক একটি বেদে, ঘর নাই, বাড়ি নাই— যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাচ্ছেন। যাযাবরেরা প্রায়ই চোর হয়, সেই জন্যই শিবের ছেলে (কার্তিক) চোর-চক্রবর্তী, তিনি চৌরশাস্ত্রের প্রবর্তক, চোরেদের আদি গুরু। চোরেরা তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া সিঁধকাটি ছোঁয় না। চোরেদের যে বই আছে, তাহার নাম ষন্মুখকল্প।[৫]

শিবকে ধরিবার প্রধান উপায়, তাঁহার অষ্টমূর্তির পূজা। অথর্ববেদে কিন্তু তাঁহার সাত অনুচর আছেন, সর্ব, ভব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশান। আমরা যে অষ্টমূর্তির পূজা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে কেবল ভীম নাই। এই যে সাত অনুচর আসিয়াছেন, তাঁহারা দিক হইতে আসিয়াছেন, ইঁহারা যে কী— তাহার কিছু ঠিক নাই। কিন্তু শপথব্রাহ্মণে যে গল্পটি আছে, তাহাতে অষ্টমূর্তিই আছে। প্রথমে প্রতিষ্ঠা হইল, প্রতিষ্ঠা হইতে ভূমি হইল, ভূমি বিস্তৃত হইতে লাগিল— পৃথিবী হইল। ভূতগণ, ভূতপতি— এই প্রতিষ্ঠায় সম্বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভূতপতি গৃহস্থ ছিলেন। উষা তাঁহার স্ত্রী—ঋতুবাহ ভূতগণ; ভূতপতি সম্বৎসর তাঁহার স্ত্রী উষাই ঔষধি। ভূতগণ ও ভূতপতির পুত্র হইল— কুমার।

সে কাঁদিতে লাগিল। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? অনেক তপস্যা অনেক শ্রম করিয়া তোমায় পাওয়া গিয়াছে, তুমি কাঁদ কেন?" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই; আমার একটা নাম দাও।" ছেলে হইলে তার একটা নাম দিতে হয়, নইলে তার পাপ যায় না। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র।" যেহেতু, অগ্নিই রুদ্র, সেহেতু কুমারও অগ্নি হইলেন। কুমার আবার বলিলেন, "নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম— 'সর্ব'।" সর্ব— জল; কুমার জল হইলেন। কুমার আবার নাম চাহিলেন। এবার হইলেন, "পশুপতি"। পশুপতি হইলেন— ওষধি; কুমার ওষধি হইলেন। আবার নাম চাহিলেন, এবার হইলেন, "উগ্র"। কুমার বায়ু হইলেন। কুমার নাম চাহিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি "অশনি"। বিদ্যুৎই অশনি— কুমার বিদ্যুৎ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। এবার হইলেন "ভব"। ভব মেঘ; কুমার মেঘ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। কুমার "মহাদেব" হইলেন— মহাদেব চন্দ্রমা; কুমার চন্দ্রমা হইলেন। ফের নাম চাহিলেন, এবার হইলেন "ঈশান"। ঈশান হইলেন "আদিত্য"; কুমার আদিত্য হইলেন। কুমার বলিলেন, আর নাম চাহি না। শতপথব্রাহ্মণে বলে— কুমার অগ্নি; এ-সকল অগ্নির নাম। মেয়ার[৬] (Muir) সাহেব বলিয়াছেন, ইহাতে রুদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হইল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাতে কুমারের উৎপত্তির কথা বলা হইল। কুমারের এক মূর্তি রুদ্র, কিন্তু কুমারের আরো সাত মূর্তি আছে। সব কটাই অগ্নির মূর্তি। এই কুমারই শেষে পার্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবসেনাপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে এই অষ্টমূর্তি মহাদেবের বলা হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যা হইতে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, আদিত্য, উষা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরাও তপস্যা করো। তাঁহাদের তপস্যা হইতে এক পদার্থ নির্গত হইল। তাহার সহস্রাক্ষ, সহস্র পদ এবং সহস্র বাণ— সে প্রজাপতির নিকট আসিয়া বলিল, আমার একটি নাম দাও, নহিলে কিছু খাইব না। প্রজাপতি প্রথম নাম দিলেন — ভব অর্থাৎ জল। তাহার পর নাম দিলেন, সর্ব অর্থাৎ অগ্নি; তার পর পশুপতি— অর্থাৎ বায়ু। চতুর্থ নাম দিলেন, উগ্রদেব অর্থাৎ ওষধি এবং বনস্পতি; তার পর নাম দিলেন, মহান্ দেব অর্থাৎ আদিত্য; তার পর নাম দিলেন, রুদ্র অর্থাৎ চন্দ্র। তারপর নাম দিলেন, ঈশান অর্থাৎ অন্ন। তাহার অষ্টম নাম দিলেন, অশনি অর্থাৎ ইন্দ্র। এই আটটি নাম দিয়া কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইনিই মহাদেব— ইহারই আটটি নাম আটটি মূর্তি। রুদ্র তাঁহার এক মূর্তি মাত্র। সুতরাং শিব, শম্ভু, মহাদেব, রুদ্র হইতে পারেন না। অমরকোষে

মহাদেবের ৪৮টি নাম আছে, তাহার শেষাশেষি একটি নাম রুদ্র। কিন্তু অমরকোষে কিছু বিশেষ থাকিলেও, অনেক শব্দ এক অর্থে এক পর্যায়ে ব্যবহার হয়। আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম, শিব, শম্ভু, মহাদেব ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদিতে যখন নাই, তখন উনি আর্য ঋষিদের দেবতা নহেন। যাযাবর ব্রাত্যদিগের দেবতা। ব্রাত্যেরা ঋষি সমাজে স্থান পাইল; উনিও ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিদের মধ্যে স্থান পাইলেন। কিন্তু স্থানটা অনেক দিন ধরিয়া পাকাপাকি হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নির মূর্তি বলিয়াছে, কৌষীতকীব্রাহ্মণে উঁহাকে নূতন দেবতা বলিয়াছে; অথর্ববেদে উঁহাকে একব্রাত্য, অর্থাৎ, সকলের বড়ো ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যদের spirit বা দেবতা বলিয়াছে। তাঁহার যে অষ্টমূর্তি, অথর্ববেদে তাহার একটি নাই— বাকি সাতটির ব্যাখ্যা দিক্ হইতে আসিয়াছে। শতপথ ও কৌষীতকীতে মহাভূত হইতে আসিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন,

১. সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
২. ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৩. রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৪. উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৫. ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৬. পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৭. মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।
৮. ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। মধ্যে নমঃ শিবায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৮।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায় "মহাদেব" প্রবন্ধটি পড়েন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

"শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে-সকল বিষয়ের জন্য আলোচনা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা এখানে বা পশ্চিমদেশে এই-সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও একথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় শিবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা গবেষণার নূতন বীজ বুনিয়া দিয়াছেন। ইঁহার সকল উক্তিই এখনও অবিসংবাদী সত্যতে পরিণত না হইলেও, তাঁহার অপূর্ব গবেষণার ফলে যে শিবতত্ত্ব নিষ্কাষিত হইয়াছে, সকলেই তাহার ফলভাগী হইবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ব্রাত্য শব্দ খুব প্রাচীন। ইহা বেদ ও উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদে প্রাণকে ব্রাত্য বলিয়া সম্বোধন করা আছে।

"শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। 'সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ' এখন প্রাণের এই অর্থই চলিত! কিন্তু তাহার পূর্বে ব্রাত্যের অন্য অর্থ প্রচলিত ছিল।

"অথর্ব্ববেদ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

"রুদ্রের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে চিত্তে একটু সংশয় উঠিল। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, রুদ্র পশুপতি, গিরিশ

ইত্যাদি। তাঁহার 'শিবা তনু' 'দক্ষিণ মুখের' উল্লেখ পাই। অর্থাৎ তখন ঋষি-সমাজে রুদ্র ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

"শাস্ত্রী মহাশয় এই যে ভব প্রভৃতি সপ্ত বা অষ্ট মূর্তির উল্লেখ করিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ঐরূপ আখ্যা দেওয়ার পূর্বে এই অষ্টমূর্তি ঋষি-সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে হইল, এ তথ্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিতে চাই। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপভাবে মহাদেবের আলোচনা করিলেন, এরূপ আলোচনা অন্যত্র কেহ করেন নাই। আজ অনেক নূতন বিষয় শিখিলাম এবং গবেষণার এক নূতন ভবিষ্যৎ আমাদের চক্ষের সাম্‌নে খুলিয়া গেল।" (সা-প-প, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৮ ব.)।

শাস্ত্রীমশায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সভাপতির অভিভাষণে (১৯২০) শিব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। "মহাদেব" প্রবন্ধটি এই অভিভাষণের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। দ্র. Annual Address, 1920, *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* (1921)

১. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (৬ জানুয়ারি ১৮৯৭—২৪ জুন ১৯৬৪) শাস্ত্রীমশায়ের সেজো ছেলে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং ১৯২৫ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা নিবন্ধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি-এইচ. ডি. উপাধি পান। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে তিনি বরোদায় ওরিয়েন্টাল ইন্‌সটিটিউটে ডিরেক্টর পদে যোগ দেন এবং ১৯৫১ খৃস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানে কৃতিত্বময় কর্মজীবন শেষ করে অবসর নেন। তিনি প্রচ্যবিদ্যাচর্চায় অনন্য সহায়, বিখ্যাত গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের রচনাবলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : *The Indian Buddhist Iconography* (1924). *Sadhana Mala* vol. I and II (1925), *An Introduction to Budhist Esoterism* (1932), 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' () দ্র. Shyamalkanti Chakravarti ed. *Select Works of Benoytosh Bhattacharya*, Shastri Villa, Naihati,

~ ~

1997. Shyamalkanti Chakravarti, ed. *VINAYATOSHINI/ Benoytosh Centenery vol.,* Naihati, 1996.

২. অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের (৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৯—২৩ এপ্রিল ১৯৪০) বাবা উদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার, মা যাদুমণি দেবী। আদি নিবাস নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। বারণসীর কাশী-নরেশ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান। বহুভাষাবিদ্ অমূল্যচরণ প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গড়ে তোলায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহযোগী। নানা বিষয় নিয়ে দু-জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলত। উভয়ের চিঠিপত্রগুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে অমূল্যচরণ 'বিষ্ণু' প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়' (তৃতীয় সংখ্যা ১৩২৮) প্রকাশিত হয়।

৩. ঋত, সত্য হল ব্রহ্ম। তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণ পুরুষ। তাঁর চিহ্ন ঊর্ধ্বে। ত্রিনয়ন বিশিষ্ট বিশ্বই তাঁর রূপ। তাঁকে নমস্কার, নমস্কার।

৪. রৌপ্য পর্বতের মতো শুভ্রবর্ণ; কপালে সুন্দর চন্দ্র যাঁর অলংকার, রত্নের মতো উজ্জ্বল যার অঙ্গ, কুঠার-মৃগ-বর এবং অভয় বিশিষ্ট যাঁর হাত, যিনি প্রসন্ন, যিনি পদ্মাসনে বসে আছেন, চারিদিকে সমস্ত দেবগণ যাঁকে স্তব করছেন, যিনি বাঘের ছাল পরে আছেন, যিনি বিশ্বের আদিতে আছেন, যিনি বিশ্বের বীজ অর্থাৎ কারণ, সমস্ত ভয়কে যিনি হরণ করেন, যিনি পঞ্চমুখ, যিনি ত্রিনেত্র বিশিষ্ট সেই মহেশকে নিত্য ধ্যান করবে।

৫. হরপ্রসাদের *Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895 to 1900)*-এ 'ষন্মুখকল্প' গ্রন্থের উল্লেখ আছে—

"The Ms. of a work entitled *Sanmukhakalpa,* acquired for Government, may perhaps be attributed to the same century. The character is a curious admixture of Newari and Bengali. The Ms. is the shortest in length discovered up to date and the writing is bold and legible. The subject matter is curious. It is the art of thieving. Kártikeya the son of Çiva and Durgá, in his name kumára, is the founder of the school of thieves. This we know from the well-known drama entitled *Mṛcchakatika,* and from the well-known novel the *Daçakumára Carita.* The present work begins :- 'Namaḥ Ṣaṇmukha Kumaráya'. The language is also curious. It reads like Sanskrit but the words are Prákṛta of various shades and sometimes Bengali and Hindi. Mantra and Auṣadhi, that is, mystic formulae and drugs, have been freely used in the performance of various acts connected with theft. The chief of a gang of thieves....... should be an expert in protecting himself, his associates, the various quarter, the boundaries, the head, the armour and so on, by means of Mantras. He should prepare a wick with the fat of Vultures and the powder of ARKA wood and light a lamp with it by means of the oil prepared from the *Rattleria linctoria.* The burning wick is to be turned round and round. No body will see the lamp and every one will sleep. The work is full of prescriptions like the above. There are 67 leaves $1\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2}$. It is a

Ms. which a thief may easily carry in his pocket. (P. 8)।

এবং দ্র. *HIL*, vol.II, part III, p. 619.

৭. জন মুইর John Muir (1809-82) সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন এবং পরে বারাণসী সংস্কৃত কলেজে প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ : *Original Sanskrit Tekts on the Origin and History of People of India,* 2nd edn., 5 parts, 1870.

ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধলেখক শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য[১] আমার পুত্র, সুতরাং এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু যখন সভাপতি হইয়া বসিয়াছি, তখন ভালোই হোক, মন্দই হোক, দু-কথা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ লিখিতে বিনয় খুব খাটিয়াছে, ফাঁকি দেয় নাই। সে শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। নিজের চক্ষে অনেক জিনিস দেখিয়াছে— অনেক ঘুরিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছে। নবিশি লেখার মধ্যে ভালোই হইয়াছে। ব্রহ্মার পূজা কখন আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা আছে। বেদে ব্রহ্ম মানে অন্ন, মন্ত্র, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা মানে ঋত্বিজ পুরোহিত। কিন্তু মূর্তি গড়িয়া পূজা কখন আরম্ভ হয়, ঠিক বলা যায় না। বুদ্ধদেবের পূর্বে ব্রহ্মার পূজা আরম্ভ হইয়াছে— একথা ঠিক বলা যায়। কারণ, বুদ্ধদেব যখন বোধি লাভ করেন, তখন তিনি একেবারেই নির্বাণ নগরীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র দুই-জনে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন— না, তাহা হইবে না: মগধের লোক সব খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনি তাহাদের উদ্ধার করিয়া তবে নির্বাণ প্রবেশ করিবেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিলেন, এবং মগধে তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধদের মতে সুমেরুশিখর হইতে নরক পর্যন্ত এক-একটি লোকধাতু। এখন ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতু জগতে আছে। আমাদের যে লোকধাতু— ইহার নাম সহলোক; আর ব্রহ্মা ইহার পতি, সেইজন্য তাঁহার নাম ব্রহ্মসহম্পতি। আমাদের লোকধাতু তিন ভাগে বিভক্ত,— কামলোক, রূপলোক, আর অরূপলোক। রূপলোকে ষোলটি স্বর্গ আছে। তাহার মধ্যে আটটি ব্রহ্মার, কতকগুলি ব্রহ্মপার্ষদ্য

দেবতাদের; আর কতকগুলি ব্রহ্মপুরোহিতগণের। সুতরাং ব্রহ্মার দলই রূপলোকের প্রায় অর্ধেক দখল করিয়া আছেন।

ব্রহ্মার চারি মুখ কেন হইল? ইহার কোনো জবাব বিনয় দেয় নাই। আমার মনে হয়, শব্দের চারিটি বৃত্তি আছে—

"বৈখরী শব্দনিষ্পত্তিমধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।।"[২]

১. সূক্ষ্ম নিত্য শব্দ। ২. বৈখরী, শব্দনিষ্পত্তি মাত্র। ৩. মধ্যমা শ্রুতিগোচরা, লোকের কাণে পঁহুছিলে মধ্যমা। ৪. অর্থ বোধ হইল দ্যোতিতার্থা। ব্রহ্মার চারি মুখ দিয়া এই চারি বৃত্তির উদয় হয়, তাই তাঁহার চারি মুখের দরকার। তাই কালিদাস বলিয়াছেন,

চতুর্ম্মুখসমীরিতা।
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী।।[৩]

নহিলে চারি মুখ দিয়া একেবারে কথা বাহির হইলে যাত্রাদলের জুড়িদের গানের মতো কেবল গোলই হইত; কথা শুনা যাইত না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৩য় সংখ্যা, ১৩২৮।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. এই বইয়ের "মহাদেব" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য ১ দ্র.।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য "ব্রহ্মা" প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র ১৩২৮-এর ৩য় সংখ্যায়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্ন রূপ, ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা ও পূজা লোপ, পৌরাণিক বিবরণ, ব্রহ্মার ধ্যান ও মূর্তি, এ ব্রহ্মা কে, শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্তি, ব্রহ্মা-বিগ্রহ ও তার শ্রেণী বিভাগ, মূর্তির নির্মাণকাল নির্ণয়ের উপায়, ব্রহ্মার মন্দির ও তার পূজারী, ব্রহ্মার চরিত্র।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভিন্ন এই ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনাও পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বিনয়তোষের প্রবন্ধের প্রশংসা করেও কিছু কিছু ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং নতুন তথ্য দেন।

২. অনুবাদ : বৈখারী—শব্দের নিষ্পত্তি। মধ্যমা হল শ্রুতিগোচর। দ্যোতিত অর্থ হল পশ্যন্তী। সূক্ষ্মা বাক্যের কোনো বিনাশ নেই। সিদ্ধ সম্বন্ধ প্রকার প্রসঙ্গে ধ্বনি বা শব্দে কথাটা বলা হয়েছে।

৩. অনুবাদ : চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত। ব্রহ্মা থেকেই সমস্ত শব্দের (অর্থাৎ বৈখারী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চারটির) উৎপত্তি হয়েছে।

ব্রাত্য

ব্রাত্য শব্দ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের ছেলের যোলো বছরেও পৈতা না হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলিত। কিন্তু ১৯০১ সালে বাংলা দেশে যে সেন্সস হয় সেই সেন্সসের কর্তা রিজলি[১] সাহেব এক পরওনা জারি করেন বাংলার মধ্যে কোন্ জাতি বড়ো আর কোন্ জাতি ছোটো তাহার একটা ফর্দ তৈয়ার করিয়া দাও। এইজন্য তিনি জেলায় জেলায় মিটিং করেন, আর কলিকাতায় একটা খুব বড়ো মিটিং হয়, তাহার সব জাতির দুই-দুই-জন করিয়া মাতব্বর নিযুক্ত হন, সে মিটিংয়ে আমারো ডাক ছিল, কিন্তু আমি যাই নাই কেন-না আমি জানিতাম ওরূপে জাতির ফর্দ হইতে পারে না। কোনো জাতিই আপনাকে ছোটো বলিতে রাজি হইবে না এবং যাহাদের হাতে জাতির কর্তৃত্ব ছিল সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ঐ সভায় স্থান পায় নাই। ফলত হইলও তাহাই, মিটিংয়ে কিছুই নির্ধারিত হইল না। রিজলি সাহেব উপরে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার জায়গায় আসিলেন গেট[২] সাহেব। তিনি আসিয়াই স্থির করিলেন আচার অনুসারে জাতি ফর্দ হইবে। কে ছোটো কে বড়ো সেকথা উঠিবে না। গেট সাহেবের পরামর্শে, রিজলি সাহেব যে গোল তুলিয়াছিলেন যেন তাহা মিটিয়া গেল। কিন্তু দেশ ঠাণ্ডা হইল না। চারিদিক হইতে, জাতি সম্বন্ধে বই বাহির হইতে লাগিল। জাতির বইয়ে দেশ ছাইয়া গেল। সকল জাতিই আপনাকে বড়ো করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কৃত বাংলা ইংরাজি বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রের নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। সকলের উদ্দেশ্য— আমরা বড়ো জাতি ব্রাহ্মণেরা আমাদের নামাইয়া দিয়াছে। সেই সময়ে ব্রাত্য শব্দটি খুব চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ বলিলেন আমরা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, কেহ বলিলেন আমরা ব্রাত্য-বৈশ্য।

অনেকে পইতা লইলেন, অনেকে পইতা লইতে উদ্যোগ করিলেন। একটা লাভ হইল, সকল জাতির লোকই সভা করিতে লাগিলেন এবং জাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ব্রাত্য শব্দের ঠিক অর্থ কী? ব্যুৎপত্তি কী? যাহা প্রচলিত অর্থ তাহা ব্যুৎপত্তি হইতে আসে কিনা? আমার কাছে এইটাই একটা ভাবিবার চিন্তিবার ও অন্বেষণ করিবার বিষয় হইল। আমি শব্দকল্পদ্রুম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে পুরাণ, পুরাণ হইতে স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম সকলেরই মত সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী পতিত হইলে ব্রাত্য হয়। ব্রাহ্মণের যদি ষোলো বছরে পইতা না হয়, ক্ষত্রিয়ের যদি বাইশ বছরে পইতা না হয়, বৈশ্যের যদি ঠিক সময়ে পইতা না হয় তবে সে ব্রাত্য। যাহার দশবিধ সংস্কার হয় নাই সে ব্রাত্য। যে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করো, যে অভিধানেই দেখো, যে স্মৃতির পুঁথি খুল ঐ এক মানে। একটা বড়ো ঘটনা মনে পড়িল, মারাঠা বলিয়া যে জাতি আছে তাহারা তো শূদ্র। শিবাজীও মারাঠা, তিনিও শূদ্র। কিন্তু তিনি যখন একটা বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হইলেন তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল রাজা বলিয়া তাঁহার অভিষেক হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অভিষেক দিতে রাজি হন না যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয় নন। ক্রমে ভোঁসলাদের একটা বংশলতা তৈয়ারি হইল যে তাঁহারা উদয়পুরের রানাদের জ্ঞাতি। তাঁহারা দক্ষিণ দেশেতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সকল ধর্ম পলান করিতে পারেন নাই তাই তাঁহারা ব্রাত্য হইয়া গিয়াছেন ও শূদ্র বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্বেশ্বর ভট্ট নামে একজন মহাপণ্ডিত কাশী হইতে সেতারায় উপস্থিত হইলেন। ইনি মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, অনেক পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা কাশীবাস করিতেছেন। পুরুষানুক্রমে ইঁহারা বড়ো বড়ো পণ্ডিত। আকবর ইঁহাদের জগতগুরু উপাধি দিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর ভট্ট শিবাজীকে ব্রাত্যস্তোম করাইয়া ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। ১৫ দিন ধরিয়া শিবাজী নানা কঠোর ব্রত করিলেন। তাহার পর তাঁহার অভিষেক হইল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীমহাশয়ের ছত্রপতি শিবাজী পড়ুন সব দেখিতে পাইবেন।

ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে ব্রাত্য শব্দের অর্থ যে সাবিত্রী-পতিত ইহা শুধু

বাংলায় নয় সমস্ত ভারতের পণ্ডিতদিগের মত। স্মৃতির যে-বই খুলিবে দেখিতে পাইবে, ব্রাত্য শব্দের অর্থ সাবিত্রী-পতিত। [পতিতসাবিত্রীক][৩] এসব তো একালের স্মৃতির কথা। সেকালের স্মৃতির কথাও ঐ।[৪] প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিতা শ্লোকবদ্ধ স্মৃতির মধ্যে সকলের অপেক্ষা প্রামাণিক। মনুসংহিতায়-ও ব্রাত্য শব্দের অর্থ সাবিত্রী-পতিত।[৫] তিনি আবার এই ব্রাত্যদিগকে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র তিন ভাগ করিয়াছেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাত্য, কতকগুলি বৈশ্য ব্রাত্য।[৬] এইখানে বোধ হয় মনুসংহিতা-র কাল নির্ণয় করা একটু দরকার হইয়াছে। নোল্ড্কে [Th. Noldeke] নামক একজন জর্মান পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, সংস্কৃত যে-কোনো পুস্তকে শক যবন পহ্লব এই তিন জাতির একত্রে উল্লেখ আছে সে পুস্তকখানি খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খৃস্টপর দ্বিতীয় শতকের মধ্যে লেখা হইয়াছে। কারণ, এই চারি-শতকেই এই তিনটি জাতি খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং নানাদিকে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হওয়ার পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সেলুকস্ বাবিলনে রাজধানী করিয়া এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু খৃ.পূর্ব ২৪৮ সালে পারদ ও বাহলীকেরা বিদ্রোহী হইয়া দুইটি রাজ্য স্থাপন করে। পারদদিগকে ভারতবর্ষে পহ্লব বলিত। বাহ্লীকের গ্রীকেরা ভারতবর্ষে যবন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পারদেরা খৃ. পূর্ব ২৪৮ হইতে খৃ. পর ২২৬ পর্যন্ত সমভাবে রাজত্ব করে। যবনেরা ৮০/৯০ বৎসর পরে বাহ্লীক হইতে তাড়িত হইলে ভারতবর্ষে ও আফগানিস্থানে প্রবল হইতে থাকে। শকেরা যবনদিগকে তাড়াইয়া বাহ্লীক দখল করে। পরে পারস্য দেশের শকস্তান বা সিস্তান দখল করে। তাহার পর আসিয়া পশ্চিম ভারতে অনেকদিন রাজত্ব করে। তিন জাতি খৃস্টীয় তিন শতকের মধ্যভাগে লোপপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং নোল্ডকে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অমূলক নয়। বুলরও [John Georg Bühler] এই মতেই মত দিয়াছেন। মনুতে এই তিনজাতির একত্রে নাম আছে। সুতরাং মনু এই সময়ের মধ্যে পড়িতেছেন। কিন্তু আমরা বলি যে মনুসংহিতা যখন লেখা হয় তখন ব্রাহ্মণেরা দেশের রাজা ছিলেন, কারণ মনু অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, "সর্ব্বস্যাধিপতির্হিসঃ" [৮/৩৭]। ক্ষত্রিয় বা অন্য জাতি রাজা থাকিতে একথা বলা কাহারো সাধ্য হইত না। আর মৌর্যবংশ ধ্বংস করিয়া যে সুঙ্গেরা ভারতবর্ষের একাধিপত্য করেন, তাঁহারা সুঙ্গ গোত্রের সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন সে

বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ নাই। তাঁহাদের রাজত্বের প্রথম ভাগেই পতঞ্জলি মহাভাষ্য লেখেন।[৭] এই সময়ে রামায়ণ ও মহাভারত বর্তমান আকারে পরিণত হয়। সূত্রাকারে যে সমস্ত স্মৃতির গ্রন্থ ছিল এই সময় হইতে সেগুলি শ্লোকবদ্ধ হইতে থাকে এবং মনুসংহিতা-ই তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। সুতরাং মনু যখন ব্রাত্য শব্দের সাবিত্রী-পতিত অর্থ করিয়াছেন, পরবর্তী পণ্ডিতেরা তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন এবং অন্যথা করিতে সাহস করেন নাই।

শুধু মনু যে একথা বলিয়াছেন তাহা নহে তাঁহার পূর্বেও অনেকে একথা বলিয়া গিয়াছেন। বুলর সাহেব বোধায়নকে খৃ. পঞ্চম শতকের লোক বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি সূত্রাকারে লেখা। সে স্মৃতিতেও ব্রাত্য শব্দের অর্থ সাবিত্রী-পতিত। তিনি আরো একটু কাজ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, সংকর-বর্ণ সকলও ব্রাত্যেরই মধ্যে গণ্য। [বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১/৯/১৫]। বুলর গোতমকে আরো প্রাচীন বলিয়াছেন। গোতমও ব্রাত্যের অর্থ করিয়াছেন সাবিত্রী-পতিত। [গৌতম ধর্মসূত্র ১/১৪]। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য আরম্ভ হইবার সময় হইতেই ব্রাত্য শব্দের এই অর্থ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ব্রত হইতে পতিত এই অর্থে ব্রত শব্দের উত্তর কোনো রূপ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ব্রাত্য শব্দ নিষপন্ন হইতে পারে তাহার সূত্র পাণিনি ব্যাকরণে নাই। সুতরাং ব্রাত্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল তাহা ঘুচিল না। তখন আমায় নিরুপায় হইয়া বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশ করিতে হইল।

ঋগ্বেদে দেখিলাম ব্রাত্য শব্দ একেবারেই নাই। কিন্তু ব্রাত শব্দের অনেক বার ব্যবহার আছে।[৮] ব্রাত শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড দল, যাহার সংখ্যা করা যায় না। মধুকর-ব্রাত শব্দ সংস্কৃতে অনেক জায়গায় ব্যবহার আছে। বাংলায় আমরা বলি মৌমাছির ঝাঁক। প্রকাণ্ড দলও বটে, সংখ্যাও করা যায় না। ঋগ্বেদে ব্রাত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি শব্দের ব্যবহার আছে। গণ অর্থাৎ ছোটো দল— সংখ্যা করা যায়, যেমন, রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ ইত্যাদি। আর-একটি শব্দ শর্দ্ধ— অর্থ বড়ো দল। সকলেই জানেন যে, ঋগ্বেদে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল এক-এক ঋষি বংশের লেখা সুতরাং ঋগ্বেদের ঐ অংশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই প্রাচীন অংশেরই এক স্থানে সূক্তকার ঋষি দেবতাদের কাছে এমন একখানি রথ প্রার্থনা করিতেছেন

যাহাতে ব্রাতদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। শব্দটি "ব্রাতসহ"।[৯] আরো দু-চার জায়গায় মনে হয় স্ত্রী-পুরুষ ও ব্রাত্য শব্দ একত্র ব্যবহার হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ ঋষিদিগের নিজের দলের স্ত্রী ও পুরুষ এবং ব্রাত নিজের দলের বাহিরে। সুতরাং ব্রাত শব্দের অর্থ ঋষিমণ্ডলের বহির্ভূত লোক। ঋগ্বেদে ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু নাই। যজুর্বেদে ব্রাত শব্দ নাই, কিন্তু ব্রাত্য শব্দ আছে।[১০] কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদে একটি অধ্যায় আছে যাহাতে কোন্ দেবতার কাছে কোন্ জীবকে বলি দিতে হইবে তাহারই ফর্দ আছে। সে ফর্দের মধ্যে ব্রাত্য আছে।[১১] ব্রাত্যকে বলি দিতে হইবে যে দেবতার কাছে তাঁহার নাম 'অতিক্রুষ্ট'[১২] অর্থাৎ যিনি খুব চেঁচান। ব্রাত্যেরা চেঁচাইত, তাই তাঁহাদের বলি দিতে হইবে চিৎকারকারী দেবতার কাছে। ব্রাত শব্দ হইতে ব্রাত্য ব্যুৎপত্তি করিলে ব্যাকরণসিদ্ধ হয়। "ব্রাতে সমবেতা ব্রাত্যাঃ।" অতএব যজুর্বেদে ব্রাত্য শব্দের অর্থ হইল, একটা প্রকাণ্ড দলের লোক যাহারা চিৎকার ও গোলমাল করে। তাহারা ঋষিদিগের সমাজভুক্ত নয়, বরং তাঁহাদের বিরোধী। সাম-সংহিতা-র যোনি ঋক-সংহিতা, সুতরাং সাম-সংহিতায় আমরা ইতিহাসের খবর প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু সামবেদ-এর ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের অনেক কথা আছে।

সামবেদ-এর প্রধান ব্রাহ্মণ-এর নাম প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্যস্তোমের কথা আছে। ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা ব্রাত্যদিগকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া ঋষিসমাজভুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই অধ্যায়ে আমরা যে-কিছু খবর পাইয়াছি তাহার সংক্ষিপ্তসার দিতেছি—

দেবতারা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রজারা হতাশ হইয়া পড়িল। তাহারা ব্রাত্যায় বাস করিত। (ব্রাত্যা শব্দের অর্থ, অল্পদিন যেখানে থাকা যায় যেমন আমাদের বেদেদের টোল)। যেখান হইতে দেবতারা স্বর্গে গিয়াছেন তাহারা সেইখানে আসিল। তাহারা দেবতার স্তোম বা সামবেদী স্তব জানিত না। তাহারা ছন্দঃ জানিত না। সুতরাং তাহারা দেবতাদের ডাকিতেও পারিল না, তাহাদের নিকট যাইতেও পারিল না। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে ১৬টি স্তোম শিখাইয়া দিলেন। তখন তাহারা আবার দেবতাদের সহিত মিলিত হইল। যাহারা ব্রাত্যায় বা টোলে

বাস করে তাহারা জঘন্য হইয়া যায়। তাহারা ব্রহ্মচর্য জানে না, কৃষি জানে না, বাণিজ্য জানে না।

প্রৌঢ়ব্রাহ্মণের এই-সকল কথা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ব্রাত্যেরা একটা যাযাবরের দল। ঋষিরা যেখান থেকে আসিয়াছিলেন তারাও সেইখান থেকে আসিয়াছিল। সেই দেবতাকেই উপাসনা করিত। কিন্তু উপাসনার পদ্ধতি জানিত না। তাহারা ঋষিদিগের সহিত শত্রুতা করিত। লুটপাট করিত। ইহার প্রমাণ এই যে, প্রৌঢ়ব্রাহ্মণে এক জায়গায় বলিতেছে যে উহারা 'গরগির' অর্থাৎ বিষের মতো বাক্য ব্যবহার করে। গ্রামে ব্রাহ্মণদের জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হইত তাহারা সেই অন্ন কাড়িয়া খাইত। তাহারা ঋষিদিগের ভাষা উচ্চারণ করিতে পারিত না। যাহারা দণ্ডের উপযুক্ত নয় তাহাদের দণ্ড দিত। তাহারা দীক্ষা লইত না। কিন্তু দীক্ষিতের মতো কথা কহিতে চেষ্টা করিত।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের এই-সকল কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ব্রাত্যেরা যাযাবরের দল। কিন্তু তাহারা আর্য জাতি এবং ঋষি সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী। যাহারা চার চাল বাঁধিয়া গ্রামে বা গোত্রে বাস করে যাযাবরেরা যে ইহাদের বিরোধী হইবে ইহা তো একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। গ্রামবাসী ঋষিদের সঙ্গে ব্রাত্যদের আরো অনেক প্রভেদ আছে। ঋষিদের রথ ছিল, ব্রাত্যদের ছিল না। তাহাদের গাড়ি ছিল। ঋষিদের রথে তক্তা পেরেক দিয়া আঁটা থাকিত। ব্রাত্যদের গাড়িতে তক্তা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিত। ঋষিদের ঘোড়া শায়েস্তা ছিল। ব্রাত্যরা ঘোড়া বা খচ্চর শায়েস্তা করিতে পারিত না। ঋষিরা লাগাম ব্যবহার করিতেন। উহারা পাঁচন বাড়ি ব্যবহার করিত। ঋষিদের ঘোড়া সোজা চলিয়া যাইত। উহাদের ঘোড়া বা খচ্চর কখনো রাস্তার এধারে যাইত, কখনো ওধারে যাইত। ঋষিরা সোনার অলংকার ব্যবহার করিতেন, তাহারা রূপার অলংকার ব্যবহার করিত। ঋষিদের পাগড়ি মাথার চারি দিকে গোল করিয়া বাঁধা থাকিত, উহারা তেরচা করিয়া মাথায় দিত। ঋষিদের ধুতি ও চাদর ছিল, উহাদের একমাত্র ধুতি দুইগাছা দড়ি দিয়া কোমরে বাঁধা থাকিত। ঋষিদের কাপড়ের পাড় ছিল না, উহাদের কাপড়ের আড়ের দিকে কালো পাড় ছিল। ঋষিদের জুতা ছিল, উহার নাম "উপনৎ"। উহাদের খড়ম ছিল, তাহার মাথায় উড়েদের জুতার চূড়ার মতো একরকম চূড়া থাকিত। ঋষিদের

ধনুক ছিল, ছিলা ছিল, তীর ছিল। উহাদের শুধুই ধনুক ছিল, ছিলা ছিল না, তীর ছুঁড়িতে পারিত না।

ব্রাত্যস্তোম অন্যান্য যজ্ঞ হইতে এক বিষয়ে বড়োই পৃথক ছিল। অন্যান্য যজ্ঞে ঋত্বিক্‌রাই প্রধান। একমাত্র যজমান ও তাঁহার পত্নী যজ্ঞশালায় বসিতে পাইতেন আর-কেহ বসিতে পাইত না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে শত শত, সহস্র সহস্র যজমান আসিতে পারিত। উহাদের মধ্যে একজন মাত্র প্রধান হইতেন, তাঁহার নাম "গৃহপতি"। তিনি সকলের চেয়ে বড়ো। তিনিই বেশি দক্ষিণা দিতেন। আর-সকলে তাঁহার অনুসরণ করিত এবং অল্প দক্ষিণা দিয়া নিস্তার পাইত।

এইরূপে বৈদিক যুগের মাঝামাঝি অবস্থায় আর্য ঋষিরা দলকেদল আপনাদের সামিল করিয়া লইত। একবার যজ্ঞ করিলেই একদল ব্রাত্য আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়া যাইত। ব্রাত্যস্তোম অনেক হইত। অনেক ব্রাত্যের দল ঋষি হইয়া যাইত। তাহারা আসিয়া গ্রামে বাস করিত। কিন্তু ঋষিরা খুব সেয়ানা ছিলেন। যে ব্রাত্যদের তাঁহারা আপনাদের সামিল করিয়া লইতেন তাহাদের ব্রাত্য অবস্থার কোনো চিহ্ন গ্রামে আনিতে দিতেন না, সেগুলি তাহারা হয় অন্যান্য ব্রাত্যদের ভাগ করিয়া দিয়া আসিত, অথবা মগধ দেশীয় ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ মগধদেশে এক শ্রেণীর ইতর ব্রাহ্মণ ছিল তাহাদিগকে দান করিয়া আসিত।

কিন্তু যখন ব্রাত্যদিগকে ঋষিরা আপনাদের সামিল করিয়া লইতেন তখন আর তাঁহাদের ভিতর কিছুই ইতর বিশেষ থাকিত না। তাঁহারাও শোধিত ব্রাত্যদের অন্ন গ্রহণ করিতেন, ব্রাত্যেরাও তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিত। তাহারা ঋক, যজু, সাম তিন বেদই পড়িত। তাহারা যজনও করিত। কেবল যে ইতর বিশেষ ছিল না, এমন নহে, তাহারা বড়ো বড়ো ঋষিও হইয়া যাইত। তাহারা বেদমন্ত্র প্রণয়ন বা দর্শন করিতে পারিত। দ্যুতান বলিয়া একজন ব্রাত্য ঋষি হইয়া কয়েকটি সামগান দর্শন করেন। ব্রাত্যস্তোমে সে গানগুলির খুব আদর। কৌষিতকী নামে এক ব্রাত্য অত্যন্ত বুড়া বয়সে স্তোম করিয়া শুদ্ধ হন। তিনি ঋগ্বেদের সমস্ত ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া কৌষিতকী-ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

শুধু যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে এই-সকল ব্রাত্যস্তোমের কথা আছে তাহা নয়, সামবেদের লাট্যায়নসূত্র [৮/৬] ও দ্রাহ্যায়নসূত্রেও ঐ-সকল কথা আছে। শুক্ল যজুর্বেদীয় কাত্যায়নসূত্রেও [২২/৪/১-২৮] ঐ-সকল কথা আছে। এই-সকল পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পূর্বে ব্রাত্যস্তোম ছিল না। কেন-না, দ্যুতান ঋষির গান লইয়া ব্রাত্যস্তোম। তিনি যখন শুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখনো তো ব্রাত্যস্তোম ছিল। নহিলে তাঁহার গান ব্রাত্যস্তোমে স্থান পাইল কী করিয়া? পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধ একটা প্রচলিত ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞের ব্যাপার সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

এইরূপ প্রাচীন ঋষিরা আর্যজাতির যাযাবর দল সমূহকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য এক সময়ে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সে সময় অনেক পূর্বে। পূর্বেই বলিয়াছি সেটা বৈদিক যুগের মধ্যভাগে। তখন সূত্র লেখা আরম্ভ হয় নাই। ব্রাহ্মণগুলি সংগ্রহ হয় নাই। হয়তো অথর্ববেদ তখনো লেখা নাই।[১৩] অন্তত অথর্ববেদকে তখন লোকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিত না। ব্রাত্যদিগকে এক করিয়া ঋষিরা সমাজ গঠন করিলেন। সে সমাজ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ঋষিরা তাঁদের আপনাদের প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে লাগিলেন। ইহাদেরই সুবিধার জন্য বোধহয় বৈদিক ভাষা ক্রমে সংস্কৃতে পরিণত হইল। ঋষিদিগের অনেক বাঁধাবাঁধি নিয়ম একটু একটু আলগা হইতে লাগিল। পুরানো দেবতারা অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন, নূতন নূতন দেবতারা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন।

আমি পূর্বে মহাদেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেও ব্রাত্যদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে! আমার বিশ্বাস শিব রুদ্র নহেন; কেন-না, রুদ্রের অষ্টমূর্তি ছিল না। শিবের অষ্টমূর্তি আছে, এবং শিবের একনাম 'একব্রাত্য'। সুতরাং ঋষিসমাজে শিবের আগমন ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। ঋষিরা ব্রাত্যদিগকে সম্পূর্ণরূপ আপনাদের সমান করিয়া লইয়াছিল। ব্রত্যদের শিবকেও আপনাদের যজ্ঞের ভাগ দিতেও রাজি হইয়াছিল। কিন্তু এক বিষয়ে ঋষি ও ব্রাত্যের মধ্যে বেশ প্রভেদ ছিল। সেটি বিবাহ। ঋষিদের গোত্র ছিল। প্রবরও ছিল। ঋষিদের প্রবর প্রায়ই এক, দুই বা তিন। একটি প্রবরেও যদি বরকন্যার মিল হইত, বিবাহ হইত না।

কিন্তু যাহাদের গোত্র ছিল না, কেবল প্রবরের উপর নির্ভর কবিয়া করিতে হইত, তাহাদের অধিকাংশ প্রবর না মিলিলে বিবাহ বন্ধ হইত না। ইহাদের প্রবরসংখ্যা তিন ও পাঁচ। তিন প্রবরের বরকন্যার যদি দুই প্রবর মিলিত বিবাহ বন্ধ হইত। পঞ্চপ্রবরের বরকন্যার তিনটি প্রবর মিলিলে বিবাহ হইত না। এই যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ইহার অর্থ কী?

দশজন প্রজাপতি হইতে সৃষ্টি। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, নারদ, প্রচেতা, বশিষ্ঠ। আমরা তর্পণের সময় ডানদিকে রাখিয়া ইঁহাদের তর্পণ করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে পুলহ, ও পুলস্ত্যের বংশ রাক্ষস ও পিশাচ। আর নারদের বংশ নাই। সুতরাং সপ্তর্ষি আর্যজাতির পূর্বপুরুষ। কিন্তু ইঁহাদের বংশধরদের মধ্যে জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য এই আট জন ঋষি গোত্র প্রবর্তক, অর্থাৎ ইহাদের বংশধরদের মধ্যে গোত্রকার ঋষিদের উৎপত্তি হইয়াছে। গোত্রের সংখ্যা কত বলিতে পারি না। একজন সূত্রকার বলিয়া গিয়াছেন অনন্ত। গোত্রপ্রবর**প্রবন্ধকদম্বম্** নামে মহীশূর হইতে যে পুস্তক বাহির হইতে তাহাতে প্রায় ৪৫০০ গোত্রের নাম আছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই যে ৪৫০০ গোত্র ইহার মূল ঐ আট জন ঋষি। ইহাতে আরো একটি আশ্চর্যের কথা আছে যে, এই আট জন ঋষিই ঋগ্বেদ-এর প্রধান ঋষি। এই আটজন ঋষি ও তাঁহাদের সন্তানসন্ততি ছাড়া আর-যে আর্যজাতির লোক এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্রাত্য। ব্রাত্যরা শোধিত হইলেও অনেকে গোত্র পান নাই। সুতরাং মনু যে বলিয়া গিয়াছেন— "সমান গোত্র প্রবরং কন্যাং", ইঁহাদের পক্ষে সেটি হওয়া কঠিন। কারণ, উহাদের গোত্র নাই। সুতরাং এক প্রবর মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া উহাদের বিবাহ করিতে হইত। কাজেই বহুদিন ধরিয়া কে প্রাচীন ঋষির বংশ কে নূতন ঋষির বংশ, ইহা জানিবার বেশ উপায় ছিল। এখন আছে কিনা জানি না, কেন-না, এখন অনেক অব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

একটা অব্যবস্থার কথা বলি। প্রবর শব্দের অর্থ কী? পণ্ডিত মহাশয়দের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা রঘুনন্দের মত লইয়া বলিবেন— "গোত্রব্যাবর্ত্তক ঋষিবিশেষঃ"। অর্থাৎ আমিও কাশ্যপ, তুমিও কাশ্যপ। তোমায় আমায় এক বংশ কিনা জানিতে হইলে প্রবর উচ্চারণ করিলে, যদি একটিও প্রবর ভিন্ন হয়, জানিতে

পারিব তোমার গোত্রকার কাশ্যপ আমার গোত্রকার কাশ্যপ ভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক তো তাহা নহে। প্রবর উচ্চারণ না করিলে অগ্নি তোমায় চিনিতে পারিবেন না। ঋষিরা অগ্নির বন্ধু ছিলেন। ঋষিদের নাম করিলে অগ্নি চিনিবেন যে আমি তাঁহার এক বন্ধুর বংশধর। তখন তিনি আমার যজ্ঞে আসিবেন এবং অন্যান্য দেবতাকে লইয়া আসিবেন। সুতরাং গোত্রপ্রবর্তক ঋষিই যে প্রবর তাহা তো ঠিক নয়। প্রবরের উদ্দেশ্য অগ্নির সঙ্গে মিত্রতা।

প্রাচী

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

হরপ্রসাদের ইতিহাস-দৃষ্টি সমাজ-বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করে। বৈদিক যুগের দূর অতীতে ভারতে পর্যায়ে পর্যায়ে আর্য অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন পর্যায়ে আসা আর্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘাত-সমন্বয়ের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভারতের ইতিহাস দাঁড় করানো যায় না। এই উপলব্ধি থেকে তিনি ৪ কার্তিক, ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনে "ব্রাত্য কাহাকে বলে" নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া প্রত্যাশিত, কিন্তু কোনো কারণে প্রকাশিত হয়নি। অনুমান করা যায়, সেই প্রবন্ধটিই "ব্রাত্য" নামে 'প্রাচী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রায় একই সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির বাৎসরিক অভিভাষণে (১৯২০) শাস্ত্রীমশায় 'শিব-রুদ্র' বিষয়ে আলোচনা সূত্রে ব্রাত্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই অভিভাষণ ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যা *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*-এ প্রকাশিত হয়।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে হরপ্রসাদ ডিসেম্বর ১৯২০ থেকে এপ্রিল ১৯২১-এর মধ্যে ৬টি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা ৬টি সংকলিত হয় *Magadhan Literature* (Calcutta, 1923) বইয়ে। প্রথম বক্তৃতা "The Original Inhabitants of Magadha"-য় ব্রাত্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

Dacca University Bulletin No. 6 রূপে প্রকাশিত হয়

~ ~

হরপ্রসাদের দীর্ঘ প্রবন্ধ "Absorption of the Vrátyas", ১৯২৬ খৃস্টাব্দে।

এই রচনাগুলি পরে সংকলিত হয়েছে LOKÁYATA AND VRÁTYA, Haraprasad Shastri Gaveshana kendra, Shastri Villa, Naihati-743165, 1982 বইয়ে।

এছাড়া প্রসঙ্গটি এই সংকলনের অন্তর্গত "মহাদেব" প্রবন্ধে এবং বিমলাচরণ লাহার 'লিচ্ছবি জাতি' (১৩২১ ব.) বইয়ের ভূমিকা পূর্বরঙ্গ-য় ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ' চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত) আলোচিত।

৩. বিষ্ণুসংহিতা ২৭/২৬-২৭
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/৩৭-৩৮
ব্যাসসংহিতা ১/২০
শঙ্খসংহিতা ২/৭-৮ ইত্যাদি।

৪. বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ৩/১৩/৫-৬
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১/১৯/৫-৭
আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ১/১/১/২২-২৩
বাশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১১/৭১-৭৫

৫. আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা-চতুর্বিংশতেবিশঃ।।

অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োদপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ।।

[২ : ৩৮-৩৯]

দ্বিজাতয়ঃ সর্বনাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্ত যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ। [১০ : ২০]

৬. ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটবীনৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ।।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দাবিড় এব চ।।
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধম্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্ত্বত এব চ।
ব্যভিচারেণ বর্ণানাম বেদ্যাবেদ নেন চ।
স্বকর্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।। [১০ : ২১, ২২, ২৩]

৭. এই বই-এর পৃ. ৪৫৯ সূত্র ১ দ্র.

৮. ঋগ্বেদে ব্রাত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় ৮ বার।

প্রথম মণ্ডলে, সূক্ত ১৬৩/৮, অশ্ব দেবতার উদ্দেশে :

হে অশ্ব, রথ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, মানুষ্য তোমার পশ্চাৎ গমন করে, স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্য তোমার পশ্চাৎ গমন করে। ব্রাতগণ অনুসরণ করিয়া তোমার বন্ধুত্বলাভ করিয়াছে; দেবগণ তোমার বীরকর্ম প্রশংসা করিতেছে।

অনুরূপ উল্লেখ আছে—

তৃতীয় মণ্ডলে, সূক্ত ২৬/৬; পঞ্চম মণ্ডলে সূক্ত ৫৩/১১; ষষ্ঠ মণ্ডলে সূক্ত ৭৫/৯; নবম মণ্ডলে সূক্ত ১৪/২; দশম মণ্ডলে সূক্ত ৩৪/৮, ৫০/৫।

৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভারের (১৩৬৩ ব.) পাদটীকা :

মূলে আছে, 'ব্রাতসাহাঃ' পাঠভেদে 'ব্রাতঽসহাঃ'। সায়ন অর্থ করিয়াছেন, সামূহানামভিভবিতারো ভবন্তীতি।— পৃ. ৪২৯।

[ঋগ্বেদ, ৬/৭৫/৯]

১০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভারের (১৩৬৩ ব.) পাদটীকা :

"কিন্তু যজুর্বেদে 'ব্রাত' শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১) শুক্লযজুর্বেদে (বাজসনেয়ি-সংহিতা) একস্থলে আছে, ...নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো' (১৬/২৫)। টীকাকার মহীধর 'ব্রাত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন : 'ব্রাতা নানাজাতীয়ানাং সঙঘাস্তেভ্যো নমঃ'। (২) কৃষ্ণযজুর্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতা) একস্থলে আছে '......সর্বে ব্রাতা বরুণস্যাভূবন্বি মিত্র এবৈররাতিমতারীদসূষুদন্ত......।।'' ১/৮/১০/২)। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এখানে 'ব্রাত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন ঃ 'ব্রাতাঃ কর্ম্মযোগ্য...।'' (পৃ. ৮২৯)

১১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভারের (১৩৬৩ ব.) পাদটীকা :

''.....গন্ধর্বাপ্সরোভ্যো ব্রাত্যং....' (বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩০/৮)। মহীধর এখানে 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সাবিত্রী-পতিতম্।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও ঐ প্রসঙ্গেই আছে গন্ধর্বাপ্সরোভ্যো ব্রাত্যম্ (৩/৪/৫)। সায়ণাচার্য্য সেখানে 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'শাস্ত্রীয়সংস্কারহীনং পুরুষম্'। (পৃ. ৪২৯)

১২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভারের (১৩৬৩ ব.) পদটীকা :

''মূলে কিন্তু আছে : অতিমক্রুষ্টায় মাগধম্' (বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩০/৫; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩/৪/১)। মহীধর ও সায়ণ উভয়েই 'মাগধ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্য পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান।'' (পৃ. ৪২৯)

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভারের (১৩৬৩ ব.) পাদটীকা :

''অথর্ববেদ সংহিতার পঞ্চদশ কাণ্ডে 'ব্রাত্যমহিমা' কীর্ত্তন করা হইয়াছে সেখানে ব্রাত্যকে 'মহানুভাব', 'দেবপ্রিয়', 'দেবাধিদেব' পর্যন্ত বলা হইয়াছে।''

অভিভাষণ

সম্বোধন

পূর্ব পূর্ব বৎসরে আমি আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছি, তাহা সকলই বাংলা সাহিত্যের কথা। আমি দেখাইয়াছি যে, অন্তত ৯০০ খৃ. অ. হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগের বাংলা আক্রমণ পর্যন্ত বাংলা দেশে এক প্রবল বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রচলিত ছিল; সেই সাহিত্যের ৩৩ জন লেখকের নাম করিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের অনেকের সংকীর্তনের পদ, গীতি ও গাথার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই যে বাঙালি, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরো দেখাইয়াছি যে, এই কালের বৌদ্ধ-সংস্কৃত পুস্তকসকল মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে, আরো অনেক পদকর্তা এবং তাঁহাদের পদ, গীতি, গাথা, দোঁহা পাওয়া যাইতে পারে। আরো দেখাইয়াছি যে, শৈব যোগিসম্প্রদায়ও বাংলায় লিখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের লেখা এখনো অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পড়িবারও সুবিধা হয় নাই। কিন্তু একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা যেমন সংস্কৃতের পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনি বাংলায়ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। শৈব যোগীদিগকে সিদ্ধ বলিত। খৃ. ১৩০০ সালে মিথিলায় হরিসিংহ নামে একজন বড়ো রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন রাজত্ব করেন। তিনি একবার নেপাল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু একশত বৎসর চেষ্টা করিয়া হরিসিংহের বংশধরগণ জয়সূত্রে ও বিবাহসূত্রে সমস্ত নেপাল দখল করিয়াছিলেন। রাজা হরিসিংহ মুসলমানদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একবার মুসলমান-যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার রাজ-কবি জ্যোতিরীশ্বর কবিকঙ্কনাচার্য[১] তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য ধূর্ত্তসমাগম নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন ও অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই রাজকবি

বাংলা ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন; পুস্তকখানির নাম বর্ণনরত্নাকর, উহাতে কবি হইতে হইলে কোন বিষয় কী রকম বর্ণন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে। রাজার কী কী গুণ থাকা উচিত, মন্ত্রীর কী কী গুণ থাকা উচিত, রানীর কী কী গুণ থাকা উচিত ও বেশ্যার কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, কুট্টিনীর কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, এইরূপ অনেক কথা আছে। এক জায়গায় কিরূপে সিদ্ধপুরুষের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারো বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষের নাম দিয়াছেন। আমরা বর্ণনরত্নাকর যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহাতে কিন্তু ৮৪ জন সিদ্ধের নাম নাই, ৭৬ জনের নাম আছে। সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে মীননাথের নাম প্রথম; বাকি ৭৫ জনের নাম সম্বোধনের শেষে দেওয়া গেল। আপনারা এই নামগুলি পড়িলে দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বহু-সংখ্যক শৈব-যোগীর নাম আছে, কয়েকজন বৌদ্ধ-যোগীরও নাম আছে। মীননাথের একটি বাংলা পদ পূর্বে তুলিয়াছিলাম;[২] সেটি যে খাঁটি বাংলা, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সিদ্ধপুরুষেরা একসময় বাংলা দেশে খুব প্রবল হইয়াছিলেন। গোবিন্দচাঁদের গীত, মানিকচাঁদের গীত, ময়নামতীর ছড়া ইত্যাদিতে তাহা খুব প্রকাশ। দুঃখের কথা, এই-সকল ছড়ার খুব পুরানো পুথি পাওয়া যাইতেছে না। যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই অল্প দিনের লেখা এবং নূতন রচনা। চেষ্টা করিলে খাস সিদ্ধপুরুষদের সময়ের ছড়া পাওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না, চেষ্টা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। বৌদ্ধ-যোগীদের সিদ্ধাচার্য বলিত—লুই তাঁহাদের প্রথম। লুইয়ের বংশেও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য হন। কৃষ্ণাচার্য বা কানু একজন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তাঁহারো বংশে অনেকে সিদ্ধাচার্য হইয়াছিলেন। লুইয়ের চেলা-চামটির মধ্যেও অনেক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। সিদ্ধাচার্যদের কথা অনেক বলিয়াছি, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে এক কথা বলা যায় যে, শৈব-যোগীরা যখন সিদ্ধ— শুধু সিদ্ধ, আর বৌদ্ধ-যোগীরা সিদ্ধাচার্য, তখন যেন সিদ্ধেরা আগে ও সিদ্ধাচার্যেরা পরে। সিদ্ধাচার্য লুই রাঢ়দেশীয় লোক, দীপংকর শ্রীজ্ঞান[৩] [দীপংকরশ্রী জ্ঞান] বাংলার বিক্রমণীপুরের রাজার ছেলে। তিনি ও লুই দুইজন একখানি তন্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন। তিব্বত দেশে দীপংকরের যে জীবন-চরিত আছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি খৃ. ৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন; ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে তিব্বতযাত্রা করেন; তথায় তিব্বতিদিগকে মহাযান ও সিদ্ধযানে দীক্ষিত করেন এবং ১৪ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে খৃ. ১০৫২ সালে দেহ রক্ষা করেন। সুতরাং

লুই ও দীপংকর যে বইখানি লিখেন, তাহা ১০৩৮ খৃ. সালের অনেক পূর্বে লেখা। এ জীবনচরিতে আরো লেখা আছে যে, দীপংকর নাড়[৪] পণ্ডিতের নিকট যোগ-ধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং নাড় পাণ্ডিত লুই-এর আগে, কি পরে, সেকথা স্থির বলা যায় না। তবে নাড় পণ্ডিত যে খুব একজন বড়ো লোক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ও বাংলায় অনেক বই লেখেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্যদের পূর্বে বাংলায় গান, গীতি বা গাথা ছিল কিনা, বলা যায় না। মহাযান গ্রন্থকার শান্তিদেব ও সিদ্ধাচার্য ভুসুকু যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আগেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছিল। কিন্তু আমি যত দূর প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে এই দুই-জন যেন একব্যক্তি নয়। অন্য কেহ যদি পরিশ্রম করিয়া এই দুই-জন এক কিনা, প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এ কথাটার চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য কত পুরানো, তাহাও স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্যেরা যদি প্রথম বাংলা লেখক হন, তাহা হইলে মুসলমান বিজয়ের ২৫০/৩০০ শত বৎসর পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ বলিতে হইবে।

আপনারা তো বাংলা সাহিত্যের পরিষদ নন— বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিষদ। বাংলা দেশে যত রকম সাহিত্য আছে, সকলেরই পরিষদ। ইহার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যই খুব প্রবল। এই সাহিত্যে বাংলা দেশের লোক শত শত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধেরা যে-সকল পুস্তক লেখেন, বাঙালি তাহার কথা বড়োই কম জানে। মুসলমান-বিজযের পরে যে-সকল পুস্তক লেখা হয়, তাহার বিষয়ে মোটামুটি কতক জানা থাকিলেও ভালো করিয়া জানা নাই। সেইজন্য এবারকার সম্বোধনে আমি এই দুই সময়ের সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। সব কথা যে নিঃশেষ করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বলিতে পারিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না। বাৎসরিক সম্বোধন যে সেরূপ প্রকৃষ্ট অবসর, তাহাও মনে করি না। তবে এমন কথা বলিব, যাহাতে এ বিষয়ে সাহিত্যসেবিগণের দৃষ্টি পড়ে ও তাঁহারা এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে কোথায় যে আরম্ভ করিব, সেইটি খুঁজিতে অনেক সময় যায়, কারণ, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্যের বিরাম নাই। তবে আমাদের পক্ষে, বাঙালির লেখা সংস্কৃত-সাহিত্যের পক্ষে বোধ হয়, পাল-রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিলেই ঠিক হইবে। খৃ. অষ্টম শতকের শেষে ও সমস্ত নবম শতক ধরিয়া গৌড়ের পালেরা একটা প্রকাণ্ড

সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় যে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্য, তাহা আরম্ভ করিব। এই সাহিত্যের দুই ভাগ;— মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে ও মুসলমান-বিজয়ের পরে। মুসলমান বিজয়ের পূর্বের সাহিত্য আবার দুই ভাগ;— হিন্দু ও বৌদ্ধ। সুতরাং আমরা এই তিন ভাগে এই সাহিত্যের আলোচনা করিব।

প্রথম বৌদ্ধ-সাহিত্য ধর্মপাল রাজার সময়। তাঁহারই উৎসাহে ত্রৈকূটক বিহারের প্রধান ভিক্ষু হরিভদ্র অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-র এক টীকা রচনা করেন। টীকাখানির নাম অভিসময়ালঙ্কারাবলোক। এই টীকাখানির মাহাত্ম্য বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝা চাই। প্রথম প্রজ্ঞাপারমিতা কাহাকে বলে? দ্বিতীয় অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা কী? উহার নাম অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা হইল কেন? অষ্টসাহস্রিকা ও অন্য সাহস্রিকার প্রভেদ কী? টীকার নাম অভিসময়ালঙ্কারাবলোক হইল কেন? অভিসময় কাহাকে বলে? অলংকার কাহাকে বলে? অবলোক কাহাকে বলে? এতগুলি কথা বুঝিলে তবে লোকে এই টীকার মর্ম বুঝিতে পারিবে এবং ধর্মপাল কেন এই হরিভদ্রকে এত উৎসাহ দিয়া এই টীকা লেখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম বুঝিতে পারিবে। নাগার্জুন[৫] ইংরেজি দ্বিতীয় শতকের লোক। তিনি ঘোর শূন্যবাদী ছিলেন। তিনি বলিয়া যান, ভাব ও অভাব সবই শূন্য, সুতরাং নির্বাণও শূন্য। যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সবই অনিত্য। তিনি আপনার মত লোকে প্রচার করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করেন— তাহার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। উহার পরিমাণ ৮ হইতে ১০ হাজার শ্লোক, এই পুস্তক গদ্যে লেখা। পুথি নকল করিতে হইলে ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক হয়, এক হাজার শ্লোকে একটা দাম হয়, যত হাজার শ্লোক থাকে, তত গুণ সেই দাম দিতে হয়, শেষে হাজারের পর যদি কিছু বেশি থাকে, তাহাকেও হাজার ধরিয়া লইতে হয়। এইরূপে নাগার্জুনের যে পুথি হয়, তাহার পরিমাণ দশ হাজার হয়। উহার নাম হয় দশসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। উহা বুদ্ধের বচন ও এই ভাবে লেখা যে, বুদ্ধ যেন নিজেই তাঁহার শিষ্যদিগকে নাগার্জুনের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। শিষ্যেরা প্রশ্ন করিতেছে, আর তিনি নিজের অর্থাৎ নাগার্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। নাগার্জুন গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন বলিলে উহা তো আর বুদ্ধের বচনের মতো প্রমাণিক হইবে না। তাই তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, নাগার্জুন পাতাল হইতে পারমিতা উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতি সহজ সংস্কৃতে লেখা, কঠিন জিনিস বুঝাইতে হইলে যেরূপ করিতে হয়, এক এক কথা বার বার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহাতে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয়, সেইরূপ করিয়া লেখা। এইজন্য

রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থখানি Verbose বলিয়া গালি দিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন— কেবল কথার ঝুড়ি মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিষয় অত্যন্ত কঠিন, সেজন্য এককথা অনেকবার বলিতে হইয়াছে। চীনের পণ্ডিতেরা বলে, এই দশসাহস্রিকা কাট-ছাঁট করিয়া অষ্টসাহস্রিকায় দাঁড়ায়। এখন আর দশসাহস্রিকা-র পুথি পাওয়া যায় না। যেখানে যাও, কেবল অষ্টসাহস্রিকা।

নাগার্জুনের কিছু দিন পরে মৈত্রেয়নাথ* বলিয়া একজন বৌদ্ধপণ্ডিত কারিকা আকারে ৮ অধ্যায়ে একখানি ছোটো পুথি লেখেন। সে পুথিখানির নাম অভিসময়ালঙ্কারশাস্ত্র। যে-সকল পুস্তকে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথা থাকে, তাহার সাধারণ নাম হীনযানে অভিধর্ম, মহাযানে অভিসময়। অলংকার শব্দের অর্থ বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ব্যাখ্যা। সুতরাং অভিসময়ালঙ্কার শব্দের মানে বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা। এই অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্রের মৈত্রেয়নাথ একটি নূতন কথা তুলেন; সেই কথাটির নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে নাগার্জুন বলিতেন শূন্য, ইনি সেখানে বলেন বিজ্ঞান। নাগার্জুন বলিতেন— নির্বাণ হইলে সব শূন্যে মিশাইয়া যায়, সেই শূন্যই পরমার্থ, সত্য, আর সকলই অলীক, ব্যবহারিক, অনিত্য, ক্ষণিক ও দুঃখময়। মৈত্রেয়নাথ বলিলেন— শূন্যের মধ্যে কেবল বিজ্ঞান থাকে, সে বিজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম, তাহা ধারণাই করা যায় না, অথচ সেটি আছে। নাগার্জুন বলিয়াছিলেন যে, পরমার্থ সৎ-ও নয়, অসৎও নয়, দুই-এর মেশামিশিও নয়, ছাড়াছাড়িও নয়। নাগার্জুন বলিয়াছিলেন— পরমার্থ অনির্বচনীয় সৎ। উনি বলিলেন —সেকথা তো বটেই, উহার সঙ্গে অনির্বচনীয় চিৎ-ও আছে। মৈত্রেয়নাথের এই যে কারিকাগুলি, এগুলি তো তাঁহারই লেখা; সুতরাং ইহারই প্রমাণস্বরূপ একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা তো চাই, যেটা সাক্ষাৎ বুদ্ধের বচন হইবে এবং যাহাতে মৈত্রেয়নাথের মতকে লোকে বুদ্ধের মত বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাই একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা তৈয়ারি হইল। এখানি ২৫ হাজার শ্লোকে। ইহার নাম পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। অষ্টসাহস্রিকায় অধ্যায় ছিল ৩২টি, মৈত্রেয়নাথের কারিকা অনুসারে ইহার অধ্যায় হইয়াছে ৮টি। এই গ্রন্থ খৃ. ২৬৫ হইতে ৩১৬ মধ্যে ২/৩ বার চীনভাষায় তরজমা হইয়াছে। খৃ. পঞ্চম শতকে অসঙ্গ[১] অযোধ্যায় বসিয়া মৈত্রেয়নাথকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধমৈত্রেয়ের অবতার মনে করিয়া তাঁহারই প্রত্যাদেশে যোগাচার মতের সৃষ্টি করেন। তাহার পর হইতেই বুদ্ধদেব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইবার পথে উঠিয়া দাঁড়ান। অসঙ্গের পর হইতেই লোকে আর নির্বাণের জন্য তত চেষ্টা করিত না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিত। নির্বাণ হইতে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি যেন একটু তফাত জিনিস হইয়াছিল।

ধর্মপাল দেখিলেন, দুই দলে— শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে বড়োই বিরোধ, সেই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য তিনি হরিভদ্রকে দিয়া অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামে এক টীকা লেখাইলেন। অষ্টসাহস্রিকা শূন্যবাদীর বই। অভিসময়ালঙ্কার বিজ্ঞানবাদীর বই। হরিভদ্র বলিলেন —আমি বিজ্ঞানবাদীর বই দেখিয়া শূন্যবাদীর বইয়ের টীকা করিলাম। অর্থাৎ দুই-এর সামঞ্জস্য করিয়া দিলাম। ধর্মপাল এইরূপে মহাযান মতটাকে আবার এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের আর-একটা মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনো জানা যায় না, কিন্তু মতটি মহাসুখবাদ। এই মতে অনেক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়াবৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্বচনীয়, সৎ ও অনির্বচনীয় চিৎ হইবে, তাহা নয়। অনির্বচনীয় সুখও তিনি। সুতরাং তিনি সৎ চিদানন্দ। টঙ্কদাস[৮] নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ ধর্মপালের সময় এই মতে হেবজ্রতন্ত্রের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহাসুখবাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধমতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি; সুতরাং এখানে তাহা দেখাইয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিতে চাহি না।[৯]

ধর্মপালের পূর্ব হইতেই বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রযান নামে আর-এক মত প্রবেশ করিয়াছিল; মণ্ডল আঁকা, মন্ত্র পড়া প্রভৃতি হইতেই লোকে নির্বাণ পাইতে পারে; ধ্যান, ধারণা, যোগ, দর্শনশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদির ফল ঐ দুই কর্মের দ্বারাই সিদ্ধ হয়; তাহাই মন্ত্র যানের মত। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই চারিটির সাধারণ নাম তন্ত্র। তান্ত্রিকদিগের শত শত গ্রন্থ পাল রাজাদিগের সময়ে লেখা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা মহাযানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রকরণ ও টীকা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তন্ত্রেরও পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন, তন্ত্রদ্বারা নিকৃষ্ট অধিকারীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিবেন, আর উৎকৃষ্ট অধিকারীর জন্য মহাযানের গ্রন্থ থাকিবে।

যে-সকল পণ্ডিত এইরূপ দুই-মতেরই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শুভাকর গুপ্ত একজন। তিনি অত্যন্ত বিচারমল্ল ছিলেন। সতীশবাবু বলেন, তিনি বিক্রমশীল বিহারে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।[১০] তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম প্রজ্ঞাকর গুপ্ত। তিনি শুভাকরের মত প্রচার করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাকর শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রথম অংশটা আমরা পাইয়াছি। উহার নাম আদিকর্মরচনা। কাহাকে বৌদ্ধ

বলে, সাধারণ বৌদ্ধের কী কর্তব্য, কোন্ বৌদ্ধকে পঞ্চ শিক্ষা দেওয়া যায়, কোন্ বৌদ্ধকে দেওয়া যায় না, কাহাকে বজ্রব্রত বলে, শিক্ষাপদ লইলে কী কী কার্য করিতে হয়, কী কী কার্য করিতে নাই, বৌদ্ধেরা স্নান করিবার সময় কী কী মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, বৌদ্ধেরা মুখ ধুইবার সময়, আহারের সময় কী কী মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, কাহার কাহার বাড়ি ভিক্ষা করিবে, কাহার বাড়ি যাইবে, কাহার বাড়ি খাইতে নাই, এই-সকল বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা আদিকর্মরচনা-য় আছে।

রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত[১১] একজন প্রকাণ্ড বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি বৌদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অকারাদিক্রমে যে বৌদ্ধ-গ্রন্থকারের সূচি লেখা হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার একখানি গ্রন্থ রামপাল রাজার রাজত্বের ২৫ বৎসরে লেখা হইয়াছিল। উহার নাম বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়িকা / কেমন করিয়া মণ্ডল আঁকিতে হয়, কত রকম মণ্ডল আছে, কোন্ মণ্ডলে কী সিদ্ধি লাভ করা যায়, সে-সকল কথা এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তকে নিজের মত রক্ষার জন্য তিনি অনেক পণ্ডিতের মত ও অনেক পুস্তকের মত উদ্ধার করিয়াছেন। এই-সকল মতের অধিকাংশ সংস্কৃতে লেখা, অনেক বাংলায়ও লেখা। তিনি যে-সকল গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। খৃ. এগারো শতকের শেষ অর্ধে অভয়াকর গুপ্ত বাংলায় মহাপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ শতকের প্রথম অর্ধে দীপংকর শ্রীজ্ঞান [দীপংকরশ্রী জ্ঞান] বিক্রমশীল বিহারের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তখন বিক্রমশীলের মহা জাঁক। শুভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শান্তি[১২], জ্ঞানশ্রী মিত্র প্রভৃতি বড়ো বড়ো লোকে সেখানে বাস করিতেন। দীপংকর তাঁহাদের সকলের উপর। তিনি পূর্ব উপদ্বীপে মহাযান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নাড় পণ্ডিত তাঁহার গুরু। লুই তাঁহার সহিত বসিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উপাধি; পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, মহাচার্য, ভিক্ষু ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি তিব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যেমন বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সেসব তীর্থস্থান; তিব্বতে দীপংকরও সেইরূপ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সেখানে তীর্থস্থান। তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বেশি। তিনি যে যে বিহারে বাস করিয়াছিলেন, লোকে আজিও সে-সকল বিহার দেখাইয়া দেয়। তিনিও সংস্কৃতে অনেক বই লিখিয়াছেন এবং অনেকগুলি বই তিব্বতি ভাষায় তরজমাও

করিয়াছেন। ইঁহার বাড়ি খাস বাংলায়, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি বাঙালির একটি প্রধান গৌরবস্থল।

কুলদত্ত ক্রিয়াসংগ্রহ পঞ্জিকা লিখিয়াছেন। ঐ বইয়ের চলিত নাম কুলতত্ত্বপঞ্জিকা। উহাতে বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম কিরূপে করিতে হয়, তাহা বিস্তার করিয়া লেখা আছে। উহাতে বিহারের জমি কী করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপে শোধন করিতে হয়, কিরূপে সূত্রপাত করিতে হয়, কিরূপে গাঁথিতে হয়, কোথায় কোন্ দিকে কোন্ গাছ পুঁতিতে হয়, কিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সেকথা বলা আছে। এই পুস্তক অনুসারে নেপালের বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম এখনো হইয়া থাকে। পঞ্জিকা বলিয়া কেহ ইহাকে মনে না করেন, ইহা একখানি পাঁজি। পঞ্জিকা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। সেকালে তিন রকম ব্যাখ্যা ছিল, —টীকা, মহাটীকা ও পঞ্জিকা। পঞ্জিকায় সার মর্ম ব্যাখ্যা হয়।

বিভূতিচন্দ্র জগদ্দল বিহারের প্রধান পণ্ডিত, কালচক্রযানের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা। তিনি অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় অনেক বই তরজমাও করিয়াছেন। অনেক দেবদেবীর উপাসনাপদ্ধতি লিখিয়াছেন। জগদ্দল বিহার রামাবতীর কাছে ছিল। রামাবতী রামপালদেবের রাজধানী। উহা কোথায় ছিল, আজও স্থির হয় নাই। কিন্তু উহা সংস্কৃত ও বাংলা বই-এর ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা করিবার প্রধান আড্ডা ছিল। ওখানে অনেক তিব্বতি পণ্ডিত আসিতেন, সংস্কৃত শিখিতেন এবং ভিক্ষুদের সাহায্যে ভুটিয়া ভাষায় বই তরজমা করিতেন। জগদ্দলের ভিক্ষুরাও বই তরজমা করিয়া দিতেন, তাঁহারাও ভুটিয়া ভাষা শিখিতেন। বিভূতিচন্দ্রের জন্য বাংলা অক্ষরে লেখা একখানি শিক্ষাসমুচ্চয়-এর পুথি এখনো কেম্ব্রিজে আছে। বইখানি জগদ্দলে লেখা হয়। বেন্ডেল সাহেব বলেন, বইখানি খৃ. ১৪ শতকে লেখা, কিন্তু আমার তাহা বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, ১২ শতকে লেখা। কারণ, ১৪ শতকে জগদ্দলই বা কোথায়, বিভূতিচন্দ্রই বা কোথায়। বিভূতিচন্দ্রের অনেক বই ভুটিয়া ভাষায় তরজমা হইয়া টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে। টেঙ্গুর খৃ. ১৩ শতকে সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং বিভূতিচন্দ্র ১৩ শতকের পূর্বেই আসিবেন, পরে যাইতে পারেন না।

দানশীলও জগদ্দল বিহারের লোক, ভুটিয়া ভাষায় অনেক পুস্তক তরজমা করিয়াছেন। অনেক বই-এর তরজমায় তিনি যে ভুটিয়া লোচাবার সাহায্য লইয়াছেন, তাহা দেখা যায় না। সুতরাং তিনি যে সুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নয়; তিনি তিব্বতীয় ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন।

~ ~

প্রজ্ঞাকরমতি, শান্তিদেব লিখিত বোধিচর্য্যাবতার নামে যে মহাযানের উৎকৃষ্ট পুথি আছে, তাহার পঞ্জিকা-টীকা লেখেন। বোধিচর্য্যাবতার এই টীকার সঙ্গে পড়িলে মহাযান মতের হাট-হৃর্দ সব টের পাওয়া যায়। বইখানিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে, যথেষ্ট সহৃদয়তা আছে। পুস্তকখানি প্রায় ১১ শতকে লেখা। ১০৭৮ সালে নকল করা একখানি পুথি কলিকাতায় আছে। যিনি নকল করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন— প্রজ্ঞাকরমতিপাদানাম্। তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রজ্ঞাকরমতির শিষ্য ছিলেন, সুতরাং প্রজ্ঞাকরমতি তাঁহার কিছু দিনের পূর্ব্বের লোক।

কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদ। বাংলায় ইঁহার অনেক গান আছে, একখানি দোহাকোষ আছে, সংস্কৃতে ইঁহার বহু-সংখ্যক বই আছে। তাহার মধ্যে প্রধান বই যোগরত্নমালা, হেবজ্রতন্ত্রের টীকা। হেবজ্রতন্ত্র একখানি মূল তন্ত্র, এখানি বজ্রযানের বই। বুদ্ধদেব তখন ভগবান বজ্রসত্ব হইয়াছেন, তিনি হাতে এক বজ্র লইয়া থাকেন এবং অনেক যোগিনী ও ডাকিনী প্রভৃতির সহিত বিহার করেন। তিনি কোনো ডাকিনীর প্রশ্নে যে উত্তর দেন, সে-ই তন্ত্র। হেবজ্রঠাকুর জোড়ামূর্তি অর্থাৎ তাঁহাকে বজ্রযোগিনী পূর্ণমাত্রায় আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই দেবতার পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি সমস্তই কৃষ্ণাচার্যের লেখা। কৃষ্ণাচার্য আরো অনেক পূজাপদ্ধতির কথা লিখিয়াছেন। হেরুকতন্ত্রের টীকাও তাঁহার লেখা। হেরুকও হেবজ্রের মতো জোড়ামূর্তি, শক্তির আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ। তবে হেরুক ও হেবজ্রে প্রভেদ কী, জানি না।[১৩] হেরুক কিন্তু পুরানো দেবতা। তাহার নাম তৃতীয় শতকে আর্যদেবের চিত্তবিশুদ্ধির প্রকরণে পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয়, মহাযানের দেবতা, আর হেবজ্র বজ্রযানের দেবতা। কৃষ্ণাচার্যের বংশে আরো অনেক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে। সরোরুহবজ্র বা শরহ একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁহার বাংলা দোঁহাকোষের কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কিন্তু তাঁহার দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্র একজন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কিরূপে সরোরুহবজ্রের ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্বে একবার বলিয়াছি। তাঁহার লেখা কয়েকখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি, আর কয়েকখানির নাম টেঙ্গুরে লেখা আছে।

বাঙালি না হইলেও উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির নাম আমরা এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহার গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া অত্যন্ত মান্য করেন। তিনি বজ্রযোগিনীর পূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বজ্রযোগিনী দেবী কে, কী বৃত্তান্ত, কাহার শক্তি, কেন তাঁহার পূজা করিতে হইবে, তাঁহার পূজায়

কী ফল, তাঁহার পূজায় কী কী করিতে হইবে, তাঁহার মূর্তি কিরূপ, এ-সকল ব্যাপারের মূল প্রমাণ রাজা ইন্দ্রভূতি। ইঁহার ৮/৯ খানি পুস্তক ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে আছে।

বজ্রযোগিনীর আর-এক উপাসিকা লক্ষ্মীঙ্করা। তিনি রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি বিচারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বজ্রযোগিনীর পূজা সম্বন্ধে পিতা যাহা বাকি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী লক্ষ্মীঙ্করা সেকালের লোকের আদর্শ ধার্মিকা রমণী।[১৪]

অজপালিপাদ

অজপালিপাদের উপাধি— কখনো সিদ্ধ, কখনো আচার্য, কখনো মহাচার্য, কখনো সিদ্ধাচার্য, কখনো ভট্টারক। তিনি নীলাম্বরধরবজ্রপাণি নামে মহাযক্ষ সেনাপতির পূজা প্রচার করেন। তিনি ঐ বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেন।

অদ্বয়গুপ্ত

অদ্বয়গুপ্ত আর্য মঞ্জুশ্রীর পূজা প্রচার করেন, নামসংগীতির টীকা করেন, কিরূপে মঞ্জুশ্রীর মণ্ডল করিতে হয়, মঞ্জুশ্রীর সাধন করিতে হয় এবং আর্য মঞ্জুশ্রী কাহাকে বলে, তাঁহার পূজা করিলে কী ফল হয়, এই-সকল বিষয়েও পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

অদ্বয়বজ্র

ইঁহার আর-এক নাম আচার্য অবধূতপাদ। ইনি হেবজ্র, বারাহী, যোগিনী, মহামায়া, একজটা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচার করেন, মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধেও অনেক বই লিখেন। ইঁহার একখানি পুস্তকের নাম মহাসুখপ্রকাশ।

কুমারশ্রী

কুমারশ্রী রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য। রাজকুমারী প্রদীপোদ্দ্যোতন নামে হেবজ্রতন্ত্রের টীকা লিখেন, ইনি তাহার উপরে আবার টিপ্পনী করেন। সেকালে সকল উপাধির শ্রেষ্ঠ উপাধি যে মহোপাধ্যায়, তাহাই তিনি পাইয়াছিলেন।

কুমারচন্দ্র ও কুমারবজ্র

কুমারচন্দ্র আচার্যও অবধূত ছিলেন। ইনি বাঙালি, মগধের পূর্ববর্তী বাংলাদেশে বিক্রমপুর বিহারে বসিয়া কৃষ্ণযমারিতন্ত্রের ও বজ্রভৈরবতন্ত্রের টীকা লিখিয়া যান।

আরো একজন বাঙালি পণ্ডিত কুমারবজ্র চক্রসম্বরের উপর পুস্তক লিখেন ও চক্রসম্বরের উপর আরো কয়েকখানি পুস্তক তর্জমা করেন এবং একখানি পুস্তকের ভুটিয়া তর্জমা শোধন করিয়া দেন।

চন্দ্রগোমিন্

চন্দ্রগোমীর নিবাস পূর্বভারতে বরেন্দ্রদেশে, ইহার উপাধি আচার্য, মহাপণ্ডিত। ইনি নামসংগীতির টীকা করেন, অনেক স্তবস্তোত্র লিখেন। তারাভট্টারিকা, সিংহনাদলোকেশ্বর, হয়গ্রীব, সিতাতপত্রা অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচার করেন। ইনি অকালমরণনিবারণ, বিঘ্ননিবারণ, পরসৈন্যধ্বংসন, ভয়ত্রাণ, কুষ্ঠ চিকিৎসা, জ্বররক্ষা, পশুমারিরক্ষা প্রভৃতি শান্তি, পুষ্টি ও অভিচারকর্মের পুস্তক লিখেন।

চন্দ্রশ্রী

পূর্বভারতনিবাসী ভিক্ষু চন্দ্রশ্রী আর্য অবলোকিতেশ্বরের স্তব ও তাহার ভুটিয়া তর্জমা লিখেন।

ডোম্বী হেরুক

ইনি একজন মগধের রাজা, সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে আচার্য, পরে মহাচার্য, পরে সিদ্ধমহাচার্য উপাধি দেন। ইনি নামসংগীতির বৃত্তি লিখেন, গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজ-এর বৃত্তি লিখেন, এক বীর, নৈরাত্ম্যযোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন এবং যোগযোগিনীর সাধারণ অর্থের উপদেশ দেন।

তথাগত রক্ষিত

উড়িষ্যা দেশে ভজ্জমা নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় কায়স্থবংশে এক পরিবার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই বংশে তথাগতরক্ষিত সিততারা, নীলতারা, পীততারা, রক্ততারা ও হারীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বই ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা করেন।

তৈলিকপাদ বা তেলিপ

ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী সিদ্ধ মহাচার্য, একখানি দোহাকোষ লিখেন, তত্ত্বচতুরোপদেশের প্রসন্নদীপ নামে টীকা লিখেন।

দিবাকরচন্দ্র

দিবাকরচন্দ্র নামে একজন বাঙালি পণ্ডিত সহস্রভুজনেত্রসাধন নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তকের ভুটিয়া তর্জমা করেন।

ধর্মশ্রীমিত্র

উড়িয়ানিবাসী মহোপাধ্যায় ধর্মশ্রীমিত্র অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে বজ্রভৈরবসাধন, কালযমারিসাধন, আর্য্যাচলসাধন ও জ্ঞানসত্ত্বসাধনপূজাবিধি পুস্তক।

নাড়পাদ

ইনি দীপংকর শ্রীজ্ঞানের [দীপংকরশ্রী জ্ঞান] গুরু। তিব্বত দেশে ইঁহার নাম নাড়ো। ইঁহার স্ত্রীর নাম জ্ঞানডাকিনী নিগু। ইঁহারা স্ত্রীপুরুষেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন এবং হেবজ্রসাধনের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্রীপট্টিকেরক গ্রামের কনকস্তূপ মহাবিহারের ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্রের অনুরোধে বজ্রপাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তকের এক নকল বাংলা দেশের রাজা হরিবর্মদেবের আমলে তৈয়ারি হয়। নাড়পাদের উপাধি আর্য, শ্রী, আচার্য, মহাচার্য, মহাপণ্ডিত, মহাযোগিন। বজ্রগীতি নামে তাঁহার দুইখানি গানের বই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাড়পণ্ডিত লুই-এর সিদ্ধাচার্য-সম্প্রদায়ের আগেকার লোক। তিনি ছিলেন মহাযোগী, লুই-এর দল ছিল সিদ্ধাচার্য যোগী। নাড়পণ্ডিতের এক উপাধি আছে আর্য। এ উপাধির অর্থ কী? বৌদ্ধভিক্ষু হইয়া যাঁহারা বিবাহ করিতেন, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে আর্য বলিত। একথা ততকরগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, অনার্য্যৈরার্য্যা ন নম্যন্তে। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষু যতই বড়ো হউন, অন্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে কিছুতেই নমস্কার করিতে পারিবে না। নাড় পণ্ডিতের গৃহিণী ছিলেন নিগু, তাঁহার উপাধি ছিল জ্ঞানডাকিনী, তাঁহার আর-এক উপাধি ছিল কর্মকরী, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে উভয়েই পণ্ডিতা ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া নাড় পণ্ডিতের উপাধি ছিল আর্যা।

নীলকণ্ঠ

ইঁহার উপাধি আচার্য। ইনি কৃষ্ণের বংশধর। ইনি অদ্বয়নাড়িকাভাবনাক্রম নামে একখানি বই লিখেন; ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুহ্যদ্বার হইতে দুই দিকে

দুই নাড়ি উপরে গিয়াছে, একটির নাম রবি, একটির নাম শশী, একটি আলি অর্থাৎ স্বরবর্ণ, আর-একটি কালি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ; তিনি এই দুইটি নাড়িই যে এক, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই যে এককরা দুই নাড়ি, ইহাই বজ্রসত্ত্বের আসন; কারণ, শাস্ত্রে বলে, আলিকালি-সমাযোগো বজ্রসত্ত্বস্য বিষ্টরং''।

পঙ্কজ

ইঁহার এক উপাধি আচার্য, আর-এক উপাধি বঙ্গজসিদ্ধ। তাঁহার একখানি পুস্তকের নাম অনুত্তরসর্বশুদ্ধিক্রম অর্থাৎ কিরূপে সকল বিষয়ে শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়, তিনি তাহার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রজ্ঞাবর্মন্

ইনি বাংলা দেশের লোক; বিশেষস্তব নামে যে বুদ্ধের স্তব আছে, ইনি তাহার এক টীকা লিখেন।

ভৈরবদেব

ইনি সুম্ভ বা সুহ্মপুরীর রাজার পুত্র। ইনি শম্বরের পূজা প্রণালী সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। শম্বর জোড়ামূর্তি। ইঁহার পুস্তকে শম্বরের সেবাবিধি, স্থাপনবিধি মণ্ডলবিধি ও অভিষেকবিধি আছে। তিনি পুস্তকখানি নিজে সংস্কৃতে রচনা করেন ও একজন ভুটিয়া লোচোবার সাহায্যে ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা করিয়া দেন। সুম্ভপুরী বা সুহ্মপুরী রাঢ়দেশের প্রাচীন নাম, তাম্রলিপ্তি সুহ্ম দেশের রাজধানী ছিল।

রত্নাকরশান্তি

ইনি বিক্রমশীল বিহারের একজন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা লইয়া ইনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তন্ত্র সম্বন্ধেও ইঁহার অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি কৃষ্ণযমারি, বজ্রভৈরব, বজ্রতারা, মহামায়া প্রভৃতি দেবতার পূজাবিধি লিখিয়াছেন; সহজিয়াদিগের ৩/৪ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন; গুহ্যসমাজ, হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতির টীকা লিখিয়াছেন, পঞ্চরক্ষা-র উপরও ইঁহার পুস্তক আছে। ইঁহার একটি উপাধি কলিকালসর্বজ্ঞ।

~ ~

স্থগন

ইনি উড়িষ্যাদেশবাসী ব্রাহ্মণ, মহাচার্য। রত্নকরশান্তি লিখিত সহজসম্ভোগবৃত্তির টীকা লিখেন।

পুণ্ডরীক

ইঁহার অপর নাম জ্ঞানবজ্র। লোকে ইঁহাকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিত। ইনি কালচক্রতন্ত্র-এর লঘুটীকা লিখেন। 'কালচক্রতন্ত্র' বজ্রযানের পুথি, কিন্তু ক্রমে কালচক্র একটি স্বতন্ত্র যান হইয়া উঠে এবং বজ্রযানের মতো বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কালচক্রতন্ত্র-খানি সংগীতি আকারে লেখা নয় অর্থাৎ উহার গোড়ায় এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন সময়ে এবং এভাবে কিছু লেখা নাই, সমস্তটাই বড়ো বড়ো ছন্দে লেখা। যখন এই পুস্তক উদ্ধার হয়, তখন বুদ্ধগণের উপর একজন আদিবুদ্ধ আছেন, এই মত অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহার নাম পরমাদিবুদ্ধ। তিনি গুহ্যাধিপের নিকট কালচক্রতন্ত্র প্রকাশ করেন, দশবলবুদ্ধ তাহার ব্যাখ্যা করেন, মঞ্জুশ্রী মুনিগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দেন; সুচন্দ্র ষাট হাজার শ্লোকে উহার টীকা লিখেন; তাহাতে সকল যানেরই অর্থ সূচনা করা থাকে; পুণ্ডরীক মূলতন্ত্র অনুসারে সেই বড়ো টীকার সার বারো হাজার শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। মূল তন্ত্রখানির এক নকল কেম্ব্রিজে আছে। সেখানি বাংলা অক্ষরে খৃ.অ. ১৪৪৬ বৎসরে লেখা; লেখকের নাম জয়রাম দত্ত, তিনি জাতিতে করণকায়স্থ, নিবাস মগধের ঝাড়গ্রাম শাসন।

ইঁহার— পুণ্ডরীকের টীকা বিমলপ্রভা কলিকাতায় আছে। উহা বঙ্গ দেশের রাজা হরিবর্মদেবের সময়ের লেখা। হরিবর্মদেব খৃ. ৯৫০-১০০০-এর মধ্যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ৩৯ বৎসরে এই পুথি লেখা হয়। পুথি লেখার পর ৭ বৎসরের মধ্যে এই পুথি অনেক বার পাঠ করা হয়। পুণ্ডরীক বলিতেছেন, তাঁহার পিতার নাম যশঃ। তাঁহাদের দেশের রাজা কল্কী ও তাঁহার পিতা যশ— এই দুই জনের বিশেষ আগ্রহে তিনি এই টীকা রচনা করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেছেন, মগধভাষায় ত্রিপিটক প্রচারিত হয়, সিন্ধুভাষায় সূত্রান্ত, সংস্কৃতভাষায় পারমিতা প্রচারিত হয়। মন্ত্রযান ও তন্ত্র সংস্কৃত ভাষায়, প্রাকৃতভাষায়, অপভ্রংশভাষায় ও অসংস্কৃত শবরাদি ম্লেচ্ছভাষায় প্রচারিত হয়। তিন যানের পুথি ভোট দেশে ভোট ভাষায়

লেখা হয়, চীন দেশে চীনভাষায় লেখা হয়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্য দেশে পারস্যভাষায়, সীতা নদীর উত্তরে চম্পকভাষায়, বানরভাষায়, সুবর্ণাক্ষ-ভাষায়, নীলা নদীর উত্তরে রুক্ষ দেশে রুক্ষভাষায়, হিমবন্তের উত্তরে সুরথভাষায় এবং আরো ৯৮টি দেশে ৯৬টি ভাষায় লেখা হয়। এইরূপ দ্বাদশ খণ্ডে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে, সর্প ও অন্যান্য জন্তুর স্বরে তিন যানেরই পুথি লেখা হয়। শ্রাবকেরা শ্রাবকযান ব্যবহার করিতেন, প্রত্যেকবুদ্ধেরা প্রত্যেকযান ব্যবহার করিতেন, বোধিসত্ত্বেরা পারমিতাযান ও সঙ্গীতিকারেরা সর্বসত্ত্বের শিক্ষার জন্য হেতুকলাত্মক মন্ত্রমহাযান ব্যবহার করিতেন। এইরূপে সংগীতিকারেরা যখন নানা ভাষায় লিখিত বুদ্ধের মত বিচার করিতেন, তখন দেখা যাইত যে, ভগবান সর্বজ্ঞ ভাষায়ই তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন, এ কার্য হরি, হর প্রভৃতি কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি আর-এক জায়গায় বলিতেছেন যে, ত্রিরত্নশরণ করার পরই লৌকিক ও লোকত্রয়সিদ্ধির জন্য কালচক্রের সাধনমার্গে অভিষেক করিতে হয়। তাহাতে বুঝা যায়, হীনযানে যে পঞ্চশিক্ষা, অষ্টশিক্ষা ও দশশিক্ষা আছে, কালচক্রবাদীরা তাহার কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। দিন কতক 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙঘং শরণং গচ্ছামি' বলিয়াই একেবারে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেন এবং পুণ্ডরীক বলিতেছেন, এই জন্মেই তাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিতেন।

পুণ্ডরীক বলেন যে, বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদিগের মতো সুশব্দবাদী নহেন। অর্থই তাঁহাদের প্রয়োজন, কোনোরূপ অর্থবোধ হইলেই হইল। ছন্দ লিখিতে তাঁহারা অপশব্দ ব্যবহার করেন, যতিভঙ্গ হইলে তাঁহাদের দোষ হয় না। তাঁহারা বিভক্তিশূন্য পদ ব্যবহার করেন, বর্ণ ও স্বরের লোপ করেন, ছন্দে হ্রস্বকে দীর্ঘ, দীর্ঘকে হ্রস্ব করেন, কোথায় পঞ্চমীর অর্থে সপ্তমী করেন, চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী করেন, পরস্মৈপদীকে আত্মনেপদী ও আত্মনেপদীকে পরস্মৈপদী করেন, একবচনে বহুবচন ও বহুবচনে একবচন করেন, পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেন, স-কার ন-কারের ভেদ মানেন না। তাঁহার পুস্তক পড়িলে জানা যায়, তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের অনেক দুর্দশা হইয়াছিল।

এই পুস্তকে যেরূপ সাধনপ্রণালী আছে, তাহা আমাদের সাধনপ্রণালী হইতে অনেক ভিন্ন, অন্যান্য বৌদ্ধতন্ত্র হইতেও ভিন্ন। গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত,— লোকধাতুপটল, অধ্যাত্মধাতুপটল, সেকপটল, সাধনপটল ও জ্ঞানপটল।

এইরূপে দেখা যায়, মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বে বাংলা দেশে বৌদ্ধদিগের যে কেবল এক প্রবল বাংলা-সাহিত্য ছিল, তাহা নয়, উঁহাদের এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত-

সাহিত্যও ছিল। সে সাহিত্যে যেমন এক দিকে অতিসূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রের মত-সকল ব্যাখ্যা হইত, তেমনই আর-এক দিকে ভৈরব-ভৈরবী, ডাক-ডাকিনী প্রভৃতির পূজারও ব্যবস্থা ছিল, নানারূপ ভেল্কি ও বুজরুকির ব্যবস্থা ছিল। তখন বাংলার বৌদ্ধেরা নানা দেশে গমনাগমন করিতেন, নানা দেশের ভাষা শিখিতেন, নানা দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতেন এবং নানা ভাষায় পুস্তক রচনা ও তর্জমা করিতেন। ভুটিয়া ভাষা জানার দরুণ আমরা এখন শরচ্চন্দ্র [দাস] ও সতীশচন্দ্রকে [বিদ্যাভূষণ] কত বাহবা দিই, কত খাতির করি; কিন্তু সেকালে বিহারে বিহারে অনেক ভুটিয়া-জানা লোক থাকিতেন এবং তাঁহাদের অনেকে ভুটিয়া ভাষায় বই লিখিতে ও তর্জমা করিতে পারিতেন। গোড়ায় ত্রিবিধ সাহিত্যের আলোচনা করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সম্বোধন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া আসিল, আপনাদের ধৈর্য না থাকে, তাই আমি মাত্র বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিয়াই অদ্য বিরত হইলাম।

সিদ্ধপুরুষগণের নাম—

১. গোরক্ষনাথ। ২. চৌরঙ্গীনাথ। ৩. চামরীনাথ। ৪. তন্তিপা। ৫. হালিপা। ৬. কেদারিপা। ৭. ধোঙ্গপা। ৮. দারিপা। ৯. বিরূপা। ১০. কপালী। ১১. কমারী। ১২. কাহ্নু। ১৩. কনখন। ১৪. মেখল। ১৫. উন্মন। ১৬. কাণ্ডলি। ১৭. ধোবী। ১৮. জালন্ধর। ১৯. টোঙ্গী। ২০. মবহ। ২১. নাগার্জুন। ২২. দৌলী। ২৩. ভিলাষ। ২৪. অচিতি। ২৫. চম্পক। ২৬. ঢেন্টস। ২৭. ভূম্বরী। ২৮. বাকলি। ২৯. তুজী। ৩০. চর্পটী। ৩১. ভাদে। ৩২. চান্দন। ৩৩. কামরী। ৩৪. করবৎ। ৩৫. ধর্মপাপতঙ্গ। ৩৬. ভদ্র। ৩৭. পাতলিভদ্র। ৩৮. পলিহিহ। ৩৯. ভানু। ৪০. মীন। ৪১. নির্দয়। ৪২. সবর। ৪৩. সান্তি। ৪৪. ভর্তৃহরি। ৪৫. ভীষণ। ৪৬. ভটী। ৪৭. গগনপা। ৪৮. গমার। ৪৯. মেণুরা। ৫০. কুমারী। ৫১. জীবন। ৫২. অঘোসাধব। ৫৩. গিরিবর। ৫৪. সিয়ারী। ৫৫. নাগবালি। ৫৬. বিভৎস। ৫৭. সারঙ্গ। ৫৮. বিবিকিধ্বজ। ৫৯. মগরধ্বজ। ৬০. অচিত। ৬১. বিচিত। ৬২. নেচক। ৬৩. চাটল। ৬৪. নাচন। ৬৫. ভীলো। ৬৬. পালিহ। ৬৭. পাসল। ৬৮. কমলকঙ্গারি। ৬৯. চিপিল। ৭০. গোবিন্দ। ৭১. ভীম। ৭২. ভৈরব। ৭৩. ভদ্র। ৭৪. ভমরী। ৭৫. ভুরুকুটী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
২য় সংখ্যা, ১৩২৩।।

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

এই 'অভিভাষণ' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২তম বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন। তিনি তখন পরিষদের সভাপতি। ১৩২০ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত দুটি 'অভিভাষণ' 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। ১৯২২-এর এই অভিভাষণের সঙ্গে পূর্ববর্তী অভিভাষণ দুটির বিষয়গত যোগ আছে। অভিভাষণ তিনটিতে মুসলমান বিজয়ের আগের বাংলা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির, বিদ্যাচর্চার যথাসম্ভব বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। ১৩২০ ও ১৩২১-এর অভিভাষণে বাংলাভাষায় লেখা সেকালের সাহিত্যের কথা ছিল— যা পরিবর্তিত ভাবে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৩২৩ ব.) বইয়ের "মুখবন্ধ" ও "পদকর্ত্তাদের পরিচয়" রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ১৩২২-এর এই অভিভাষণে মুসলমান বিজয়ের আগের বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত-মনীষীদের লেখা সংস্কৃত-বাঙ্ময়ের পরিচয় দিয়েছেন। শাস্ত্রীমশায়ের বিবেচনায়, "বঙ্গদেশবাসী বলিতে গেলে বঙ্গদেশবাসী খৃস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি, জৈন সব বুঝাইবে।" ('অভিভাষণ' ১৩২১, হ-র-সং-২, অনুচ্ছেদ-৫) । এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ "বাংলা দেশে যত রকম সাহিত্য আছে, সকলেরই পরিষদ।"। সুতরাং বাঙালি বৌদ্ধদের লেখা সংস্কৃত সাহিত্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চর্চার বিষয় হতে বাধা নেই। তাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচনার এই সমীক্ষা করেছিলেন।

১. কর্ণাট বংশীয় রাজা নান্যদেবের উত্তরাধিকারী মিথিলার শেষ স্বাধীন

রাজা হরিসিংহদেব বাংলা দেশ মুসলমান অধিকারে চলে যাবার একশো বছর পরেও পূর্বভারতে হিন্দু রাজত্ব অটুট রাখতে পেরেছিলেন। নেপাল-রাজ জয়রুদ্রমল্লকে পরাস্ত করে সমগ্র উপত্যকায় ইনি নিজ অধিকার বিস্তৃত করেন। ১৩২৪ খৃস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘ্‌লুগের কাছে পরাজয়ে তাঁর রাজত্বের শেষ হয়। *(AHI, pp. 316, 389)*।

হরিসিংহদেবের সভাসদ ছিলেন জ্যোতিরীশ্বর। এঁর রচনা বর্ণনরত্নাকর মৈথিল গদ্যে লেখা কবি-কথকদের ব্যবহার্য কোষগ্রন্থ। পূর্বভারতে আঞ্চলিক ভাষায় গদ্য রচনার পুরানো দৃষ্টান্ত। বাবুআ মিশ্র ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৪০ খৃস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত।

২. কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট।।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।।
"নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা" ভুসুকুপাদের লেখা ২১ সংখ্যক চর্যাপদের টীকায় মুনিদত্ত মীননাথের নামে এই বাংলা পদটি উদ্ধৃত করেছেন। অষ্টম শতাব্দী বা তারও আগে থেকে বাংলা দেশে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্মমত পাশাপাশি চলে এসেছে। একটি বৌদ্ধ সহজমত, অন্যটি শৈব নাথ মত। নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা নিজেদের যোগী বা কাপালিক বলতেন। দুই ঐতিহ্যেই মৎস্যেন্দ্রনাথ, নামান্তর মীননাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিব্বতে ইনি লুই নামে অভিহিত। দ্র. Sukumar Sen, "The Náth Cult," *CHI*, Vol. IV, pp. 280-90; কল্যাণী মল্লিক, 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩ খৃ.।

৩. বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান অতিশ-এর জন্ম ৯৮২ খৃস্টাব্দে, বিক্রমণিপুর বা বিক্রমপুরের, মতান্তরে বজ্রাসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা

কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতীর মেজো ছেলে। ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে তিনি আচার্য জেতারির সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সময়ে ভারতে বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখার প্রতিপত্তি অম্লান ছিল, অন্যদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল। চন্দ্রগর্ভ কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুল গুপ্তর কাছে তান্ত্রিক তত্ত্ব শেখেন, তাঁর নাম হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। কিন্তু তান্ত্রিক আচারে আবদ্ধ না থেকে তিনি হীনযান ও মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য তাঁর নাম দেন দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান। বাবা কল্যাণশ্রীর নামের সাদৃশ্যে দীপঙ্করশ্রী নামই স্বাভাবিক, জ্ঞান সেকালের পণ্ডিতদের প্রচলিত উপাধি। মহিলা পণ্ডিতদের উপাধি হত জ্ঞান-ডাকিনী। দীপঙ্করশ্রীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রে তাঁর প্রধান তিব্বতি শিষ্য ঽব্রোম-স্তোন-পা (Ḥbrom-ston-pa) তাঁকে দীপঙ্করশ্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. *AT*, pp. 371-76)। তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়ায় তাঁর অতিশ বা অতীশ নাম প্রচলিত। তিব্বতে বলা হয় জো-বো-র্জে (Jo-bo-rje)— অতিশ, মহাপ্রভু অতিশ। অতিশ সংস্কৃতমূলক শব্দ, সম্ভবত অতিশয় অর্থে প্রযুক্ত। তিব্বতি প্রতিশব্দ ফুল ঽবুঙ (phul - ḥbyuń), তুরীয় দশাপ্রাপ্ত। নগ্-ছো লো-চা-বা (Nog-tshoco-lo-tsá-ba) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিখারি বালকদের "ভালা হো ও নাথ অতিশ" সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। (দ্র. *IPLS*, p. 65.)। অতিশ ১২ বৎসর বিক্রমশীল মহাবিহারে দ্বার-পণ্ডিত নারো-পা-র (বা নাড়ো-পা) এবং ২ বৎসর বজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের ছাত্র ছিলেন। তারপরে সুবর্ণদ্বীপে (আধুনিক সুমাত্রা) যান সমকালীন বৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি বা ধর্মপালের কাছে পাঠ নিতে। মহাযান বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন শাখায় গভীরতর জ্ঞান উপার্জন করে ১২ বৎসর পরে দেশে ফেরেন। বয়স তখন ৪৪ বৎসর। এর কিছুদিনের মধ্যে রাজা মহীপালের আহ্বানে ১০২৫/২৬ খৃস্টাব্দে বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য পদে যোগ দেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্ ঽওদ্ (Ye-Ses ḥod)-এর প্রতিনিধি অতিশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার চেষ্টায়

ব্যর্থ হন। য়ে-শেস্-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপো বাঙ-ছুব্ হ্ওদ (Byań-Chub ḥod) রাজা হয়ে নগ্-ছো লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় অতিশ তিব্বতে যেতে রাজি হলেন। অতিশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে মহাবিহারের স্থবির রত্নাকরশান্তি বলেছিলেন, "ভারতীয়দের পক্ষে অতিশ চোখের মতো। সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব!" ১০৪০ খৃস্টাব্দে অতিশ নেপালের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, তখন নয়পালের রাজত্বকাল। এক বৎসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিব্বতে পৌঁছলেন। জীবনের শেষ ১৩ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন। তিব্বতে তাঁর মূল কাজ বুদ্ধ-শিক্ষা বা ব্কহ্-গ্দমন্-পা (Bkaḥ-gdams-pa) নামে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ 'বোধিপথ-প্রদীপ' রচনা। এই গ্রন্থে তিনি হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক দর্শন এবং সাধন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। "By systematizing the vital principles of all Buddhist Scriptures into a whole, by combining the ways of cultivation of the two main schools, the one known for its profoundity (the School of the Noumenal) and the other for its extensiveness (the School of the Phenomenal), and by Synthesizing the teachings of Nágárjuna, Asanga and Śántideva, this Śástra provides a unique broad path for obtaining good births and emancipation; and it is the key to the essentials of all sútras and Sastras" (*EB,* vol. III, P. 216)। অতিশ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যমণ্ডলীর প্রভাবে সমগ্র তিব্বতে ক্রমে শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তিনি পূজ্য দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

তেঙ্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধিক দীপঙ্করের নাম মিশে আছে। যেমন দীপঙ্কর-ভদ্র, ইনি একজন তান্ত্রিক লেখক। দীপঙ্কর-রাজ বা দীপঙ্কর-চন্দ্রও ভিন্ন লেখকের নাম। অতিশের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪ খানি বই। এর মধ্যে ৩৮ খানিতে তাঁর নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তিনি লিখেছেন

এবং অনুবাদও করেছেন ৭৯খানি বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন ৭৭খানি। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি তিব্বতে আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে এই সমন্বয়পন্থী মনীষীর মূল রচনা, অনুবাদ ও টীকা বিশিষ্ট সম্পদ।

১০৫৪ খৃস্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে স্ঞে-থঙ-এ (Sñe-thaṅ) তাঁর প্রয়াণ হয়। অতিশের উদ্দেশ্য নিবেদিত একটি তিব্বতি প্রশস্তি-শ্লোক—

মান্যবর আসেন নি যত দিন
তিব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো;
যে-ক্ষণে এলেন তিনি, সেই প্রজ্ঞাবান্ মহাজ্ঞানী,
জ্ঞানসূর্যের উদয় হল এদেশে।

৪. নাড় শব্দটি জ্ঞাতক থেকে উৎপন্ন। জ্ঞাতক> জ্ঞাট> ণ্নাট> নাড়। অর্থ-জ্ঞানী। নাড় বা নাড়-পাদ চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। বরেন্দ্রভূমিতে জন্ম এবং রাজা নয়পালের (আ. ১০৩৮-৫৫ খৃ.) সমসাময়িক। বিক্রমশীল মহাবিহারে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন, দীপঙ্করশ্রীর শিক্ষাগুরু। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর রচিত বইয়ের নাম 'বজ্রগীতি', 'নাড়পণ্ডিতগীতিকা', 'গুহ্যসমাজউপদেশ-পঞ্চকর্ম' ইত্যাদি।

৫. মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্তক নাগার্জুন খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। বিদর্ভের (বেরার) কোনো ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। বৌদ্ধ মতবাদ আশ্রয় করার আগে তিনি চতুর্বেদ ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। চীনা ভাষায় কুমারজীব অনূদিত নাগার্জুনের জীবনচরিতে বলা হয়েছে, মাত্র ৯০ দিনে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর মূল রচনা পাওয়া যায় না, চীনা ও তিব্বতি অনুবাদ অবলম্বন। নাগার্জুনের মূল রচনা, মাধ্যমিক দর্শনের মূল গ্রন্থ 'মাধ্যমিক কারিকা' ৪০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

বৌদ্ধ-দর্শনের বিকাশে নাগার্জুনের আগের দুটি প্রধান মতবাদ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। বৈভাষিক মতে ধর্ম অর্থাৎ স্বলক্ষণযুক্ত

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব নেই। সৌত্রান্তিক মতে ধর্ম শূন্য-স্বভাব, অলীক। নাগার্জুন মনে করেন অস্তি ও নাস্তির চরম অবস্থান থেকে পরমার্থ সত্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের মধ্যমপথ অবলম্বনের উপদেশ আশ্রয় করে নাগার্জুন প্রতিপন্ন করেন, ধর্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ প্রমাণ করা যায় না, তেমনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী কাল প্রবাহও নেই। হীনযান মতে বলা হয় পুদ্‌গল বা ব্যক্তিত্ব না থাকলেও ধর্ম আছে। বেদান্ত মতে আত্মা আছে, কিন্তু কর্মজগৎ নেই। নাগার্জুন বলেন, কর্তা বা কর্ম, পুদ্‌গল বা ধর্ম কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু তার আভাস। আভাসের উৎপত্তির হেতু প্রতীত্যসমুৎপাদ বা অবিদ্যা। আভাস সর্বদাই অন্যসাপেক্ষ। সাপেক্ষ পদার্থ মাত্রই মিথ্যা। শূন্যতা একমাত্র সত্য। বুদ্ধ-বচনেই নাগার্জুন ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের ইঙ্গিত পান। ব্যবহারিক দিক থেকে জন্ম - জরা - মৃত্যু, দুঃখ, সংসার, কর্ম কর্মফল সবই আছে। আবার পারমার্থিক দিক থেকে এর কিছুই নেই। স্বভাব-শূন্যতা একমাত্র সত্য। নাগার্জুনের বিচার-পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক। অস্তি নাস্তি দুই চরম অবস্থানের সঙ্গে তিনি আরো দুটি বিকল্প অবস্থান যোগ করেন— আছে এবং নেই, আছে এমনও নয় আবার নেই এমনও নয়। এ চারটি বিকল্পকে বলেন চতুষ্কোটি। যে-কোনো বিবেচ্য সমস্যার যাবতীয় দৃষ্টিকোণ এই চতুষ্কোটির মধ্যে আসবেই। পারমার্থিক সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য বিকল্পগুলির সমন্বয়ের চেষ্টা করেন নি। দেখিয়েছেন, পারমার্থিক সত্য স্বভাব-শূন্যতা চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত, সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে। দ্র. *'হ-র-সং-৩'*, "মহাযান কোথা হইতে আসিল" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য - ১।

৬. যোগাচার মতের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথের জীবনকাল আনুমানিক ২৭০-৩৫০ খৃ. মনে করা হয়। মৈত্রেয়নাথ কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা— এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যোগাচার দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিজ্ঞানবাদ বস্তুত অসঙ্গই প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্র. Haraprasad Sastri, "Literary History of the Pala Period", *JBORS;* Vol. V, part II, 1919; Giuseppe Tucci, *On some aspects of the*

Doctrines of Maitreya (natha) and Asanga, Calcutta, 1930.

৭. যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ মহাযানের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়। এই মতবাদের প্রবক্তা অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু দুই ভাই। জন্ম গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর, আধুনিক পেশোয়ারে (পাকিস্তানের অন্তর্গত)। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে এঁরা অযোধ্যায় নতুন মত প্রবর্তক শাস্ত্র রচনা করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গকে যোগাচার এবং দর্শনকে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। অসঙ্গ প্রধানত সাধনমার্গের কথা আলোচনা করেছেন। দার্শনিক প্রস্থান সংগঠন করেছেন সুবন্ধু। অসঙ্গের প্রসিদ্ধ রচনা 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এবং 'মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র'। বসুবন্ধুর প্রধান রচনা 'বিংশক-কারিকা-প্রকরণ', 'ত্রিংশিকা-প্রকরণ' এবং 'মধ্যান্ত-বিভঙ্গ-শাস্ত্র'। যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দিঙ্‌নাগ স্থিরমতি এবং নালন্দার অধ্যপক, শীলভদ্রের গুরু ধর্মপাল। হিউএন-ৎসাঙ নালন্দায় শীলভদ্রের কাছে যোগাচার দর্শন চর্চা করেন। চীন ভাষায় লেখা তাঁর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা-সিদ্ধি' গ্রন্থে ভারতীয় যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্যদের মতামত ধারাবাহিকাভাবে আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনেরই পরিণতি। মাধ্যমিকদের মতো বিজ্ঞানবাদীরাও মানেন, পারমার্থিক সত্য অদ্বয়। পরমার্থের সৎ, অসৎ বা অন্যকোনো অভিধা নেই। তার উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। কিন্তু শূন্যতাই পরমার্থ— মাধ্যমিকদের এই তত্ত্বের পরিবর্তে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, বস্তুর অস্তিত্ব নেই এ জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরা চিত্তমাত্রে বা বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। চিত্ত ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নেই— এই জ্ঞান হলে জানা যায় চিত্তেরও অস্তিত্ব নেই। বিকল্প জ্ঞান নষ্ট হলে ধীমান্ ধর্মধাতুতে স্থিত হন। শূন্যতার পরিবর্তে এঁরা ধর্মধাতুর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মধাতু প্রত্যক্ষ হলে অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়। বসুবন্ধুর দার্শনিক-প্রস্থানে বিজ্ঞানমাত্রতা পারমার্থিক সত্য এবং বিজ্ঞানের পরিণতি ত্রিবিধ, ১. আলয় বিজ্ঞান, ২. আলম্বন, ৩. বিষয় বিজ্ঞপ্তি। যেসব ধর্ম থেকে জগতের উৎপত্তি, তার বীজস্থান

আলয় বিজ্ঞান। স্পর্শ, মনস্কার বা চিত্তের বিষয়মুখী ক্রিয়া, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা— আলয় বিজ্ঞানের পরিণতি। এরই ফলে জলের ধারার মতো অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণ প্রবাহ বয়ে চলেছে। সংসারের সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আলয়-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মননাত্মক আলম্বনের উদ্ভব হয়। আলম্বনের পরিণতি— আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান, আত্মস্নেহ— এই চার রকমের ক্লেশ। বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। বিষয় ছয়টি— রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শনীয় ও ধর্মাত্মক। চরাচরে যা-কিছু প্রতিভাত সবই বিষয়-বিজ্ঞপ্তিমাত্র। "সর্ব্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্।" বিজ্ঞানবাদের সার কথা— জ্ঞেয় নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব। জ্ঞান বিকার প্রাপ্ত হলে বিষয় সম্পর্কে ধারণার উৎপত্তি হয়। দ্বৈততা এসে পড়ে। বিজ্ঞানের পরিণাম স্বরূপ জগৎ চরাচর সত্য নয়। এই আরোপিত দ্বৈততা থেকে মুক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ সৎ বস্তু। বিজ্ঞানমাত্র তাই পারমার্থিক সত্য।

৮. পাণ্ডুভূমি বিহারে রচিত 'সুবিশদ-সম্পুট' নামে হেবজ্রতন্ত্র-এর টীকার লেখক টঙ্কদাস বা ডঙ্কদাস। ইনি রাজা ধর্মপালের (৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.) সমসাময়িক। তেঙ্গুরের তালিকায় এর লেখা 'হেবজ্রতন্ত্ররাজটীকা', 'সুবিশদ সম্পুট' গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৯. বৌদ্ধধর্মের উদয় - বিকাশ - বিলয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডে বৌদ্ধবিদ্যা পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

১০. শুভাকরগুপ্ত বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য অভয়াকরগুপ্তের ছাত্র ছিলেন। রামপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭২/৭৭-১১২০/২৭ খৃ.) ইনি পাণ্ডিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। রামপালের রানীর তৈরি এটপুরী বিহারে শুভকর কিছুদিন বাস করেন। জৈন নৈয়ায়িক হরিভদ্র সূরি শুভাকরের মতামত উদ্ধৃত করে সমালোচনা করেছেন।

১১. বিক্রমশীলা বিহারের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা— এই পাঁচ বিষয়ে পারঙ্গম, অভয়াকরগুপ্তর জন্ম গৌড়ে, শিক্ষা মগধে। শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতি সূত্র নির্ভর করে বলেন, তিনি খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ বসু মনে করেন অভয়াকরের জন্ম একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশের গোড়ায়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় একনিষ্ঠ কঠোর পরিশ্রমে সমকালীন বিদ্বৎসমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর সম্মান অর্জন করেন। রাজা রামপাল প্রাসাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনায় তাঁকেই আহ্বান করতেন। দীপংকরশ্রী জ্ঞানের মতোই তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং অনুবাদক। তিব্বতি ভাষা তাঁর ভালো জানা ছিল। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর গ্রন্থের পরিচয়ে নামের সঙ্গে মহাপণ্ডিত, আচার্য, সিদ্ধ, স্থবির প্রভৃতি মাননাময় বিশেষণ যুক্ত দেখা যায়। অভয়াকরগুপ্তর 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থের সম্পাদক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ভূমিকায় লিখেছেন, "Our author Mahápandita Abhayākaragupta was one of those great mystics whose name will remain indelibly written in the pages of the history of mysticism in India. He wrote many books on Sádhanas and Maṇḍalas, practised meditation, visualised deties and transmitted his knowledge to posterity through excellently written monographs and disciples. Unfortunately, however, much is not known about him uptil now, and it is doubtful whether any of his other books are ever published or known.... Even if Abhayākaragupta is not well known in the land of his birth, he is no less a celebrity in Tibet where all his works are preserved in Tibetan translations. He is worshippeed as a saint in Tibet, the land of mystry and snow. No apology is needed for giving this valuable work *Nispannayogávali.*" (*G-O-S,* Vd CIX, 1949). দ্র Haraprasad Shastri,

"Literary History of the Pala Period, *J-B-O-R-S*, Vol. V, part II, 1919.

১২. 'হ-র-সং-৩'-এ রত্নাকর শান্তি প্রবন্ধ দ্র.

১৩. ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষোভ্য-কুলের অন্যতম প্রধান দেবতা হেরুক। হেরুকের জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হয়েছিল। দ্বিভুজ মূর্তি, কিন্তু চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ মূর্তিও গড়া হত। ভীষণ-দর্শন, নীলবর্ণ একক মূর্তি। শবের উপরে বাম পায়ে নৃত্যরত। হেরুকের সঙ্গে তার শক্তি থাকে তখন তার নাম হয় হেবজ্র। দ্র. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, 'বৌদ্ধদের দেবদেবী', বিশ্বভারতী ১৩৬২ ব. পৃ. ৫৩-৫৪।

১৪. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উদ্ভবস্থান 'মহাযোগ পীঠ' উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে, মতান্তরে, বোন লক্ষ্মীঙ্করা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে উড্ডীয়ান ওড়িশার কোনো জায়গা। ওয়াডেল বলেন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মাঝে স্বাত-উপত্যকায়। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বাংলা দেশে হওয়াও সম্ভব মনে করেন। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা সম্ভবত অষ্টম (বিনয়তোষ) মতান্তরে নবম (Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এঁরা বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন বা প্রচার করেন। বজ্রযান-সাধনার ধারায় অসংকোচে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তনের দিক থেকে লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি' গুরুত্বপূর্ণ বই।

পূর্ণতর তথ্যের জন্য "হ-র-সং-২" এ 'সম্বোধন' : সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৩ দ্র.

পরিশিষ্ট

SANSKRIT CULTURE IN MODERN INDIA

PRESIDENTIAL ADDRESS

FIFTH INDIAN ORIENTAL CONFERENCE

LAHORE : 1928

১৯২৮ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বয়স ৭৫ বৎসর। ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানের মাস তিনেক আগে কোলকাতার রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায়। গুরুতর আঘাতে সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যান। এই অসুস্থতার মধ্যেই প্রস্তুত করেন দীর্ঘ অভিভাষণ। শাস্ত্রীমশায়ের ভাইপো, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য অভিভাষণটি ডিক্‌টেশন নিয়েছিলেন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত, একটানা ৮ ঘন্টা। মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য বলতেন, কোনো বই-পত্রের সাহায্য না নিয়ে রোগশয্যায় একটানা বলে যাওয়া এই অভিভাষণ লিখে উঠতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেও জেঠাবাবু আদৌ অবসন্ন বোধ করেননি।

দীর্ঘ অভিভাষণটি তথ্যে-তত্ত্বে ভরাট। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ঔপনিবেশিক শাসন-প্রকল্পে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের চেহারা উন্মোচন করেছেন। ভারতের আবহমান সংস্কৃত-আরবি-ফারসি সংস্কৃতির উৎসাদন, সাহেবদের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ফাঁকি আর ভারতীয় পণ্ডিতদের আধুনিক বিদ্যাচর্চার পদ্ধতি না শেখানোয় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন শ্লেষের ভাষায়, মর্মবেদনায়। এডওয়ার্ড সঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম'-এর (১৯৭৮) কত আগে শাসক-শাসিতের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের বাস্তব শাস্ত্রীমশায় অব্যর্থভাবে নির্দেশ করেছিলেন।

YOUR EXCELLENCY, LADIES AND GENTLEMEN,

I need not say that you have done me a great honour by asking me to preside on this historic occassion ; for tender feelings of gratitude are better felt than expressed. You called me and I considered it a call of duty ; and I am here in spite of the fact that between the call and the coming I had a fall which broke a bone and which confined me to bed for one hundred days and that in excruciating pain. The writing of this address had to be postponed for one hundred days. Under these circumstances, I am afraid, you will not be pleased with my performance, to which I could not give as much attention and time as the great occasion required. You have heard the songs of many young cuckoos;—this time, perhaps you will have to hear the cawing of an old crow,—shivering from the effects of storm and rain. But I could not resist the temptation of coming,—as these conferences are the only occassions, in which people who are not politically minded, can come and join their comrades of the same trade. In these days of strife and party-feeling, of communal and sectarian opposition, of bickerings and recriminations these literary conferences are places where peace and good feeling reign,—where people make smiling faces and open hearts and learn much by the association of really learned men in the land. One should not miss such a conference even at the risk of his life, and so here am I before you in this august Assembly.

Introductory

I am a Sanskritist by heredity training and profession, and I feel an instinctive love for everything connected with Sanskrit, including Indology. I am now at the fag end of my life, and it has been my privilege to see oriental studies decay in our country

during the period of over 70 years that I have been studying Sanskrit. I have seen the old style of deep and intensive learning flourish and decay, and I have seen the new school of study come into being and take the field ; I have seen the old order giving place to the new. The old tradition is just passing away, and a new one is coming in. Great changes have altered the face of India—and also its heart—during one life-time. I think it is now time for us to take stock of the change, to cast a retrospective glance; and we might even question ourselves, which way is our ancient classical learning to go, and how far the path that oriental studies arc taking now has been suitable for the preservation of the old learning of the land ; and in what way a combination of the two can be effected. I shall place some of my readings of this history and some of my views before you, for what they are worth.

Sanskrit, the medium of education

The 18th century of the Christian era was the palmy day of Sanskrit literature in India. Mahārāṣṭra Brahmins, whose ancestral profession was teaching Sanskrit, were the dominant power in India throughout the century. They not only encouraged Sanskrit learning themselves, but their example was inspiring light to others to encourage the study of Sanskrit. This was the age when great Indian jurists flourished. The earliest of them was Anantadeva, a Mahārāṣṭra Brahmin who wrote in his own native district by the Godavari his learned works called the various Kaustubhas under the patronage of Baz Bahadur Chandra, a Raja of distant Kumayun in the Himalayas. The next was Vaidyanātha Pāyaguṇḍe— another Mahārāṣṭra Brahmin settled at Benares, whose erudite commentary is still the admiration of lawyers in India. The third was—Jagannatha Tarka-pancānana of Bengal who was brought at the Government House in Calcutta by the first Governor-General, Warren Hastings, with military band sounding, for the purpose of writing an exhaustive code of Hindu Law to be administered by the courts in British India. There were lesser lights all over India,

The age of the great Indian jurists.

eleven of whom in Bengal compiled the original Sanskrit work on Hindu Law of which Halhead's *Gentoo Law* : was the English Translation. [The name of the work is *Vivādārṇava-Setu*. It was published from Bombay years ago as the Code prepared under orders of Maharaja Ranjit Simha, the Lion of the Punjab].

Not only was Law the only subject which flourished in Sanskrit, but other branches of knowledge in the same language flourished in exuberance. Nāgoji Bhaṭṭa the great Mahārāṣṭra Pandit wrote

Nagoji Bhatta

his exhaustive commentary on the *Māhā-bhāṣya* in Grammar and other commentaries too, on almost all branches of Sanskrit literature. His learning was phenomenal. His character was exemplary and his presence inspiring. His was perhaps one of the last examples of the height to which human mind can be raised by a liberal education through Sanskrit only. Princes and Potentates vied with one another in doing him honour.

Ahobala, the great Pandit of Southern India

Southern India produced great Pandits like Ahobala, who fleeing from the converting zeal of Tipu Sultan, came as a fugitive to Benares almost in tattered rags, and was received with open arms by the Pandits of the holy city. His learning, too, was equally phenomenal and he allowed Benares to utilise it fully.

On the top of these came Rama Sastri, the Nyāyā-dhīśa or Chief-Justice of the Poona Durbar, famous for his learning, famous

Rama-Sastri.

for his boldness and intrepidity and famous as an administrator of justice and a patron of education. For half a century, he was the earthly Providence of the Pandits of India, and no one with real learning came back disappointed from him.

But a change of spirit came with the advent of the 19th century. The English were the dominant race throughout the century, and they were anxious to bring their own language and its literature, their own sciences and their culture for the benefit of India. But they were very cautious in the begining. They wanted to impart

education through the classics of India whether Sanskrit or Arabic and Persian. But audacious ignorance at this period created an impression both in England and among the Court-going people of India that Sanskrit and Arabic could afford no culture. It was thought that Sanskrit specially had no literature worth naming except disputations in Grammar and Logic. It had, no science, no poetry, no art, and no culture. This, in fact, was the opinion of Thomas Babington Macaulay.

Western influence spread through the classicis of India

Relying on this opinion, Macaulay wrote his terrible minute against education through the medium of Indian Classics and threw the entire weight of his the name, of his learning and of his position for imparting education through the medium of English; and the English Government acted, to his advice. There came a revolutionary change in the educatioaal system of India. Old style Sanskrit Colleges—Tols as we call them in Bengal—and Pāṭhaśālās came to be deserted, and English schools on the other hand began to be filled. A little knowledge of English gave comfortable livelihood to clerks and lower grade officers not only in the administration of British India, but also in the offices of merchants and industrials, who for the first time began to start firms in India. I have seen with my own eyes in the sixties and seventies of the last century, how the Sanskrit Tols became empty and English schools flourished. There is a bit of personal history here ; but I hope you will tolerate it as it is a commentary on what I have just said. My father died in 1861 and the charge of distributing honoraria to learned Pandits assembled on religious, festive and social occasioas in our neighbourhood devolved upon me though I was then very young. I remember, in 1861, there was a tolerably big assembly in my neighbourhood; and I distributed honoraria on behalf of the master of the house, to one hundred Pandits, all engaged in teaching Sanskrit in their own residences from Navadvipa to Calcutta, on

Macaulay and his terrible minute and its influence on the educational system of India

both .sides of the Ganges. Fourteen years later in 1878 [1881], on the occassion of the Śrādh ceremony of the father of our great novelist the famous Bankim Chandra Chatterji, I was requested to ascertain how many Pandits were engaged in teaching in their residences within this area, and I found only 26 ! A fall of 74% in 14 [20] years !

After the quelling of the Mutiny, a feeling of despair took possession of the Indian mind that the old Indian literature, old Indian culture, old Indian sciences and arts whether Hindu or Mohammedan would perish ; and that, at no distant future. The situation was really desperate. Manuscripts were perishing in heaps in the houses of Pandits who were the leading educationists of past generations, or were being carried to all parts of Europe as the last remnants of *Indian culture.*

Loot of MSS

I will give you some account of how Manuscripts migrated and were destroyed. In the wars of the English in the 19th century, Mss. were an object of loot. In the year 1886 within a month after the proclamation was issued for the annexation of Upper Burmah, Prof. Minayeff who was residing at Milan in Italy received a telegram from St. Petersburg to proceed to Mandalay at once. The Professor went there and found that the common soldiers were using the pages of the Mss. in the splendid Royal Library of Burmah as cigarette-papers. He complained to General Pendergast who at once put a stop to that abuse, and allowed Prof. Minayeff to take as many of the Mss. as he liked. The Professor came to Calcutta and brought to me an introduction from my revered Professor, Mr. C. H. Tawney. I believe he took this precaution simply to save me from the attentions of the Police for having anything to do with Russians. He was in Calcutta for several days, but he spent several hours with me. One day I went to his place and he showed me 7 big packing cases containing the Mss.-spoils from Mandalay. I could not see the Mss. because the boxes were then all nailed, but the Professor gave me a glowing description of their contents. Some

of the Mss. looted in the First Burmese War in 1826 are to be found in the Bishop's College library.

The *Bhāgavad-Gītā* which Peshwā Bājī Rāo II used to read is to be found in the India Office Library.

The Arabic Mss. looted from Tipu Sultan's library at Scrangapatam are to be found in the Asiatic Society's rooms.

But there is one satisfaction, and that great one, in the fact that the Mss.-loot have been carefully preserved; much better preserved than probably it would have been their lot in India, at least for some time.

Destruction of Mss material

The way Mss. have been dissipated and destroyed in the house of Pandits is simply a dismal story. A Pandit who in the early years of 19th century was a great educationist and considered his Mss. to be his best treasures and housed them in the best room of his house, carefully dried them in the sun after every rainy season, kept them tightly packed in thick cloth, died. His son, who had learned A, B, C, read Murray's spelling-book and the Azimgarh English Reader, had secured a small berth in the local Collectorate where his pay and perquisites, fair or unfair, amounted to at least ten times what his father could have ever earned. He saw no good in the Mss. and removed them from the best room in the house, first, to the store-room and then to the kitchen where a thick coat of soot enveloped the whole collection. The house-wife who was greatly troubled for dry fuel for preparing her husband's early meal, discovered that the Mss. were kept between two wooden-boards. These she exploited for the purpose of fuel but could not use the paper or palm-leaves for the same purpose, because there is a superstition that the paper or palm-leaf on which there is any writing is the very self of Sarasvatī and should not be consigned to fire. These papers got mixed up when the boards and the strings fastening them were removed and became a heap which in the course of a year or so were thrown in the kitchen-garden, there to rot.

Some old Pandit apprehensive of the fate of his old valuable Mss. in the hand of children who he could see would not care for Sanskrit threw them in the Ganges, thus giving the river goddess the most valuable offering he could make. At Navadvipa I have seen heaps of old Mss. rotting on tlic road-side. They are often used as waste-paper to cover holes in thatched roofs, or in tlie mud-wall, and often are sold to buyers of waste-papers, so much to the maund.

I will give one instance which happened at Udaipur. An old woman used to bring Mss. to a Bania and take whatever price he offered. But one day she brought a goodly Ms. and demanded -/4/- annas because she was in sore need, but the Bania would not give her more than two annas, so they were higgling over the price when a Chāran or Rajput hard came and asked the old woman what the matter was. On examining the Ms. he thought it must be something very important, and he asked her to accompany him as he would be able to give her a better price. He took the woman to the Maharaj-Kumar, and the enlightened Prince, got the Ms. examined there and then by his Court-Pandits. They all declared it to be *Śāli-Hotra,* a treatise on the horse and its diseases. Now the *Śāli-hotra* so long was lost in Sanskrit—it was known only from a Persian translation, and some people are said to have re-translated it from the Persian. The Maharaj-Kumar was delighted at this discovery and gave the old woman Rs. 50. Mahāmahopādhyāya Morardan, while at Udaipur, heard the story and got a copy made tor himself. I got. a copy from Morardan's son, and it is now deposited in the Asiatic Society's rooms.

Discovery of Sālihotra

The history of the .Ms. collection in the Durbar Library, Nepal is very very interesting. In the 18th century there were three big and many small principalities in the Nepal Valley the utmost extent of which is 15 by 15 miles. All the princes for generations were collectors of Mss. charts, maps, pictures on religious subjects.

But at the Gorkhali conquest of 1768 their collections were all looted, so much so, that the existence of a State Library was unknown. In 1868 the Resident, Mr. Lawrence published the list of Mss. which were considered at his time to be rare by the Pandits of Nepal. Maharaja Sir Bir Shamsher Jang Bahadur Rana made a resolution to have a State Library. He collected together all Mss. in the Palaces of Nepal and housed them in the College building, where I saw them in 1897. It was a most interesting collection containing palm-leaf Mss. more than 1000 years old. Sir Bir Shamsher assured me that he will collect all the important Mss. in the Nepal Valley and put them in a Darbar library and that he was constructing a library building with a clock tower in a most prominent place in the city. In 1907 I found the building complete and the library housed there. There were 16,000 Sanskrit Mss. on palm-leaf and paper, the whole of Buddhist literature in Tibetan and the whole of Buddhist literature in Chinese. It was a splendid place for research students. The idea was mooted by Sir Bir and executed by his brother Maharaja Sir Chandra Shamser Jang Bahadur Rana. Sir Bir made immense efforts to collect Mss. A Bengali Pandit family resident at Nepal had two villages in the Nepal dominions. These villages were sequestered at the time of financial stringency owing to the English war of 1814. For three generations the Brahmin struggled hard to get back tlicir possessionis. But Sir Bir restored the villages to them and they surrendered their Mss. to him. A Brahmin involved in a rather serious criminal case obtained his pardon by presenting to the library some of the finest Mss. to be found there.

Story of Nepal

Of the 16,000 Sanskrit Mss. the palm-leaf Mss., are generally copied in pre-Mahammedan times. The oldest of the dated Mss. in the library was copied in 908 [A.D.]. But there are dozens which palaeographically belong to an earlier age. I believe, I have given descriptions of all palm-leaf Mss. I found there.

The desperate situation, however, was saved to a certain extent

by the exertions of a distinguished Pandit of Lahore and Sanskrit literature owes a debt to this city which it will never be able to discharge. Rādhākiṣan, the son of Pandit Madhusūdan, the high priest of the Lion of the Punjab, wrote a letter to Lord Lawrence, the Governor-General of India, in 1868, for the collection and conservation of Sanskrit manuscripts which under the circumstances existing at the time were sure to perish within a short time. The Governor-General as Sir John Lawrence was agent of the British Government at the court of Lahore, and he and Rādhākiṣan, who had great influence there, were both friends. Lord Lawrence, at the suggestion of Pandit Rādhākiṣan took up the work of the search of Sanskrit manuscripts and made permanent provision for the distribution of Rs. 24,000 annually to the different Provincial Governments to start operations in this search. The search languished in many provinces and dropped off in others. Bombay and Bengal were the only two provinces where the money was entrusted to the local Asiatic Socities, which are still continuing the search with good results. In 1898, in Madras, a proposal was actulaly made to utilise part of the grant for Archaeological purposes. But since, they have done good work in Madras and the peripatetic party has brought to light immense quantity of Sanskrit works, peculiar to South India.

The letter of Pandit Rādhā Kisan to Lord Lawrence to make provision for the search of Sanskrit MSS.

Sixty years have passed, and it is time to take stock of what has been done and what remains to be done in this direction. Already in the early years of the 19th century inspite of what audacious ignorance might have said to the contrary, Horace Hayman Wilson declared, and the historian Elphinstone echoed the same idea, that Sanskrit had more works than Latin and Greek put together. After the institution of the search, the German scholar Hofrath Bühler made his celebrated tour through Rajputana and Kashmir and brought to light new branches of literature, new schools of Philosophy, new schools of rhetoric and produced a report which

The result of the action taken by Lord Lawrence.

will be read with admiration by all who are interested in Sanskrit. Following in his wake. Sir R. G. Bhandarkar and Prof. Peterson of Bombay brought to light many important works in all the branches of Sanskrit. The vast field of Jaina literature, both in Sanskrit and Prākrit, was brought to public notice by the exertion and scholarship of these two eminent Orientalists. The peripatetic party in Madras has recently brought to light the works of the Prābhākara School of Mīmāṁsā of which only a small work of 150 pages was all that was known upto that time. We, in Bengal have also done our mite. By including Nepal within the field of our operations, and working on the wake of Brian Hodgson, we have given publicity to the Buddhist literature in Sanskrit and the śaiva, and Tāntric literature of the last 500 years of the first millennium of the Christian era.

Catalogues of Mss taken to Europe stimulated the spirit of cataloguing in India

All the Mss. that were carried away from India to Europe, have been catalogued; and this stimulated the spirit of cataloguing in India and the European catalogues of Sanskrit Mss. are an object lesson to all of us in India who are interested in Sanskrit. It would be curious to know that the French with whom intellectual culture is instinctivc inistituted a search for Sanskrit Mss. in the early part of the 18th century when Dupleix was the Governor of Chandernagore, and he sent about 400 Mss. to Paris. where they will be found in the Bibliothéque Nationale. Some of the Smṛti works of this collection were written by one of the eleven Pandits who helped Halhead in the production of his "Gentoo Law" in 1772. But all this is by the way; let me proceed with my main theme.

The last sixty years a preliminary period

All that has been done during the last sixty years is only a preliminary survey. Mss. were very shy of coming out. The Pandits were to a very great extent professional men who earn their livelihood by the study of these manuscripts; and as no one can be blamed for not revealing the sources of his income, the Pandits cannot be blamed for concealing their manuscripts and for not even giving information

about them to strangers. During the preliminary period, however; we have trained the Pandits to show their Mss. and even to part with them. The spirit is also changing with tlie time. Pandits and their scions now want to make their ancestral inheritance the common property of man as it is no longer a bread-earning business. I will give some examples. I went to Dacca in search of Mss. in the year 1891 with one of my veteran assistants trained by Raja RaJendralal Mitra and was further assisted by a number of patriotic Pandits of the Eastern Capital of Bengal. The result in the direction of cataloguing or acquiring was not at all encouraging at the time. But after more than 30 years, the same area which we had surveyed, has given the Dacca University, nearly 5000 manuscripts. The search in Mithila by RaJa Rajendralal and myself was not very encouraging either, but it has enabled the Bihar and Orissa Research Society, within the last 10 years, to produce a big volume of catalogue for the Smṛti literature alone. The recent search in the District of Puri is likely to be still more successful ; for I am sure there are more than two lac of Mss. in the 32 Śāsana villages inhabited by Brahmins alone.

The work of the last 60 years was carried on by scholars who had other avocations of life, and that. arduous ones, too, at their leisure hours, assisted by ill-paid Pandits and often interfered with by unscholarly administrators of funds.

The work done in the last sixty years.

On the death or retirement of one scholar devoted to the search it was very difficult to find a successor for the work was honorary. There were other drawbacks, too. Still, in sixty years it has produced marvellous results. The Mss. are not so shy of coming to public notice as they had been before. Besides, Indian Princes have helped and are helping the work of search in British India. Many of them have instituted search, within their own dominions, with excellent results. The ultimate end of the search is to find good works, and to publish them. The Sanskrit series instituted for publication by the enlightened Governments of Mysore, Travancore, Baroda and

Kashmir are doing excellent service. They are everyday bringing out marvellously 'New' works of ancient fame. The Mysore Government should be proud of the achievements of Shama Śastrī in finding, editing and translating Kauṭilya's *Artha-Śāstra* in the Mysore series. The Travancore Government should be equally proud of the late T. Ganapati Sastri's achievements in finding, in editing and in commenting upon the works of Bhāsa, besides a whole host of other works. The Kashmir Darbar should be proud of Pandit Madhusūdan Kaul's achievments in finding, editing and commenting upon numerous works on Kashmir Śaivaism. The Gaekwad's Government should be proud of the achivements of Dr. Benoytosh Bhattacharyya for publishing and commenting upon the *Tattva-Saṁgraha* of Śāntarakṣita and its commentary by Kamala-Śīla, *Sādhanamālā* and other works of Later Buddhism.

The works, which these series published are worthy of the Governments partronising them and of the scholars engaged in editing them. They are all of such a nature that private publishers could not venture to undertake them. So it is the patriotism of the Princes that must come forward to bring our ancient literature to public notice. They are the richest inheritance we have received, from our ancestors, and they should not be allowed to lie idle in boxes of monastic Bhāṇḍārs, on bamboo scaffoldings in private houses, and on the shelves in the public libraries, with the imminent risk of being destroyed and lost to the world for ever any day.

The works published arc deserving of the patronage of the Govermnet and Princes

The preliminary period being over, the Princes and people of India should take intense interest in finding Mss. and when worthy publishing them. Every collection of manuscripts wherever found, can be expected to contain something strikingly new. Sanskrit ceased to be the medium of liberal education since the political destiny of the country passed into the hands of others. It remained as a professional study of Brahmins for the purpose of

Utility of bidden Mss. for historical and archaeological purposes.

earning a livelihood, as priests and religious advisers as well as for preserving the Hindu society in tact, a duty which they took upon themselves in the absence of Hindu political powers. So, in every collection you would find, as a rule, current works and standard works,—works mostly of recent date. But every Pandit family had some hidden source of professional income and influence, unknown to others, in the shape of some unique manuscript. This they would not part with or show to others. But, now, after 150 years of British Government, when their profession is well-nigh gone, there would be no objection to these unique manuscripts being used by others —for historical and archaeological purposes.

The calculation of Horace Hayman Wilson and others that Sanskrit contains more works than Greek and Latin put together, has been left far behind by the preliminary work of these sixty years. The number of works in Sanskrit now is nearly double of what was known 100 years ago. Add to these the immense number of Buddhist works known through translations in the languages of Buddhist countries. In Tibetan there are *Bstan-Hgyur* and *Bkah Hgyur* collections which are said to contain the translation of about 8000 Buddhist Sanskrit works of which only 200 are known in the original Sanskrit. How many Sanskrit works were translated into Chinese, we do not know. Nanjio's catalogue of the Chinese Ţripitaka alone contains about 1300 names of Sanskrit works ; a few only of which are extant so far in the original. A full stock taking of Chinese literature translated from the Sanskrit we shall be enabled to make when Dr. Probodh Chandra Bagchi of the University of Calcutta completes the publication of his monumental work on Buddhist literature. in China of which the first volume bringing the history upto the Tang period (begining of the 7th century) has so far appeared. The original Sanskrit works of these translations are to be sought and discovered before they are irrecoverably lost. They will certainly add much to the huge mass imperfectly guessed by Wilson.

The works in Sanskrit now nearly double of what was known one hundred years ago.

In every Sanskrit work of any authority, either in. Smṛti, or in Alaṁkāra, or in Grammar, or in Philosophy or in Artha-Śāstra, or, even, in Kāma-Śāstra, we get quotations by hundreds from preceding works; those ancient authorities are not always forth coming. A search is to be instituted for them without any loss of time. Sometimes the book quoted is available, but the quotaion is not there. That may mean that the work quoted had many recensions These would be a deserving object of search.

The books referred to in later works should be deserving objects of search

The work of search is nowhere needed so badly as in the case of the Purāṇas, the Tantras, the *Rāmāyaṇa* and the *Mahā-bhārata.* I have shown elsewhere, how these works have been revised often and often during the long centuries after the time of their original composition. Some of the Purāṇas have apparently undergone, three, four or five revisions. Some have been so revised as to go almost out of recognition. Others have been so revised as to go out of existence. In many of the Purāṇas we find two or three recensions, differing from one another in toto; e.g., the *Skanda-Purāṇa* : one recension of it is divided into seven Khaṇḍas, all dealing with religion, rituals and the holy places of Northern and Western India, and another is divided into 6 Saṁhitās and 51 Khaṇḍas dealing with all sorts of Paurāṇic subjects ; a third, more ancient than the other two, is a work by itself without any division,—now lying in Ms. in the Darbar Library, Nepal, written in the Gupta character of the 6th or 7th century A.D.

The work of search badly needed in the case of the Purāṇas the Tantras the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata which have apparently undergone three four or five revisions.

Some of the Puranas like the *Brahma-Vaivarta,* have an 'ādi' recension which has nothing to do with the current ones.

The *Mahā-bhārata* which was an epic poem in the original was so revised as to form a history of the Kaurava race, and as the idea of history expanded from that of mere chronicle and annals

to that of a history of society in all its aspects,—it was revised again and again and many episodes were thrown into it, till it assumed the magnitude of a lakh of verses or more.

Mahābhārata an epic poem in the original turned into a history of the Kaurava race.

The *Rāmāyaṇa,* too, though in the form of an epic poem was converted into the history of the Solar race with one hundred episodes thrown into it.

Rāmāyaṇa converted into the history of the Solar race.

It is a curious fact, that in the matter of the *Rāmāyaṇa,* the *Mahā-bhārata* and the Purāṇas no two manuscripts agree; and I believe, every district has its peculiar recension. As regards the *Rāmāyaṇa,* the Bombay recension differs materially from the Bengal recension and the different recensions of Bengal differ from one another. If this be so with a comparatively short work, from the Sanskrit point of view, as the *Rāimāyaṇa* with 24000 verses is one can imagine how the number of recensions of the *Mahā-bhārata,* which is four times as large, must have increased and multiplied.

Every district has its peculiar recensions in the matter of Rāmāyaṇa. Mahābhārata and the Purāṇas.

To account for these differences one should remember that the *Rāmāyaṇa* and the *Mahā-bhārata* were composed at a time when writing was unknown; and they were memorised by bards who sang them before an appreciative audience. The Rhapsodists often used their own talents in adding and subtracting interesting episodes according to the tastes and propensities of the hearers. Their successors took the cue from them and improved upon it. So, there would be many schools, and schools within schools. It is expected that when writing was introduced, these differences would cease, but they did not. So there are an infinite number of recensions.

The differences accounted for.

The number of the *Purāṇas* is nearly a hundred. Their average extent is 20,000 slokas. Of these 18 are called *Mahā-purāṇas,* 18 are called *Upa-purāṇas,* 18 more are unsuccessful candidates for

a place in the Maha and Upa-purāṇa lists; the rest are miscellaneous works. But, as I have already told you, the same *Purāṇa* has two or three distinct forms. Sometimes, a Purāṇa of the same name is in both tlie lists ; but they are distinct works.

The Purāṇas and their variety

The characteristics of a Purāṇa are differently estimated ; some say, they have five characteristics : they must describe, e.g. (1) Creation, (2) Details of creation, (3) Genealogies, (4) Manu-ages and (5) Biographies of distinguished kings. Others, e.g., the *Bhāgavata-purāṇa* says that they have ten characteristics. But the definition given by the *Matsya-purāṇa* is the most comprehensive. It practically says, "Anything old is Purāṇa."

The characteristic of a Purāṇa.

In the matter of the *Purāṇas* every manuscript has a peculiar feature, and so, all manuscripts are important from the point of view of a collector and a scholar.

Every single Mss of the Purāṇas has it's peculiar features

The *Tantra* is a vast literature but very little is known of it and very little indeed has been studied. I obtained two very old manuscripts: one *Kubjikāmatam* or *Kulālikāmnāya* written in the 8th or 9th century, and the other *Nihśvāsa-Tattva-Saṃhitā*, in the 9th or 10th century characters. The first work, now in the library of the Asiatic Society of Bengal, gives us the information that the Tantras came from beyond India, and spread all over India at a time when the Vedic and the Paurāṇic cults were rather weak. The other manuscripts now in the Darbar Library, Nepal, treats of two different principles; — the *Mūla* and the *Guhya*, i.e., the original and the mystic, or in other words, the Vedic and the Tantric ideas and practices.

The Tantras

There are two characteristics of the Tantras:—(1) That it evolves the images of gods and goddesses from the letters of the alphabet (Bījākṣaras) and (2) that they prescribe the worship of deities in union with their consorts (Sa-śkti, or Yuganaddha). The latter when

put forth in codices produces theYāmalas or couples and there are so many of them, like the Viṣnu-Yāmala, Rudra-Yāmala, Śakti-Yāmala, etc. The Tantra literature was very fruitful in the 7th 8th and 9th centuries. In these centuries the literature produced a vast number of works. The Vaiṣṇava-tantra works were named '*Pāñca-rātras*, and their number is nearly 200. Only a few have been discovered and one has been published by the German scholar Schroeder from Adyar, the *Ahirbudhnya-Saṁhitā*. The rest are to be sought for and studied. The Kashmir Śaiva School of Philosophy, founded in the last half of the 9th century, was based on a large number of Śaiva Tantras written in previous centuries. Only a few of these original Tantras. have as yet been recovered, and I believe, only two or three have been published in the Kashmir Sanskrit series. Here also is a wide scope for research which may lead to very very important results. The Matta-mayūra sect which flourished in the 9th century near Gwalior, was a great builder of Śaiva temples, and their works, regarded as original Tantras, are vast in extent. Some of these works were found in the Darbar Library of Nepal, and one at Trivandrum in the extreme South of India. This has been edited by that' indefatigable scholar the late T. Gaṇapati Śastrī. The work is by Iśāna Śiva. The rest are to be searched, studied and published.

Two characteristics of Tantras

There are so many schools of original Tantras that it would be tedious to enumerate them. The period of original Tantras was over, I believe, in the 10th century A.D. Then came the period of compilations and commentaries. Some of them are admirable works. Of the commentaries the most comprehensive is that of Rāghava Bhaṭṭa of Central India, 15th century, (entitled Padā rthā-darśa) on the *Saradā-Tilaka* by Lakṣmaṇa Gupta one of the very famous Śaiva philosophers of Kashmir (10th century). Of the compilations the best is by the revered Tāntric scholar of Bengal, Kṛṣṇānanda Āgama Vāgīśa (16th and 17th centuries) entitled *Tantra-*

Schools of original Tantras followed by those of compilors and commentators

sara. How the Buddhist Tāntric ideas were absorbed into Brahmanism is exemplified in the works,—numerous and voluminous as they are—of Tripurānanda, Brahmānanda, and Pūrṇananda, three successive gurus who flourished in Eastern Bengal during the whole of the 16th century A.D. These compilations are as common as black berries to quote the rather irreverent proverb and they afford ample scope for research, study and publication.

Study of the Vedas by the Orientalists

European scholars have done a great deal for the study of the *Vedas*. The *Vedas* being the oldest literature in India, the attention of the Orientalists was very much attracted to them. The Saṁhitās of one or two Śakhās of each *Veda* have been published. But the Śakhas themselves are very extensive. Patañjali, the writer of the *Mahā-bhāsya* on Pāṇini speaks of 21 Śakhās of the *Ṛg-veda,* 101 of the *Yajur-veda,* 1000 of the *Sāma-veda* and 6 of the *Atharva-veda*. Our Pandits are under the impression that the *Yajur-veda* is of two divisions;—the Black and the White. The White contained 16 Śākhās and the Black, 85. But recent research has shown that the Black Yajus has only 5 Śākhās current in Southern India ; the other 80 are neither White nor Black. Of these 80 only two have been found out and published ;—viz., the *Maitrāyaṇīya* and the *Kāṭhaka*. Where are the rest ? The Śākhās appear at present to be geographical. If these Śākhās are discovered, it is likely to add to our information both historical and geographical, about ancient India. The Black and. the White divisions of the *Yajur-vcda* have been so deeply rooted in the Indian mind that in the early 11th century, while founding a University for Sanskrit culture in his dominions, Rājendra Cola, as we know from his inscriptions, made provisions for two Professors only,—one for the White and the other for tlic Black *Yajur-veda,* and attached 25 students to each chair. Regardless of the 1000 recensions of the *Sāma-veda,* he made provisions for two chairs only in the *Sāma-veda,* viz., Jaiminīya Śākhā and the Kauthuma Śākhā ; and the popular belief

is that the *Sāma-veda* has two divisions. 1. *Kauthuma* and 2. *Rāṇāyaṇīyā*. An old Vedic scholar of the old school, who kept the sacrificial fire burning all through his life, told me that in Northern India, the *Vedas* have been made easy by Yajña-valkya and his followers. The White recensions attributed to Yajna-valkya and his followers are much easier than the Black ones current in Southern India, the *Kauthuma* of Northern India is much easier than the *Rāṇāyaṇiya* of Southern India, and the *Śākala* of the *Ṛg-Veda* is much easier than the *Vāṣkala* and others current in Southern India.

From a study of the *Purāṇas* it appears to me that Kṛṣṇa-dvaipāyana analysed the heaps of mantras into three parts; 1. *Ṛk*, 2. *Sāman* and 3. *Yajus*, and he assigned each to one of his pupils. The differentiation into *Śākhās* began with their pupils and pupil's pupils for some generations. Each *Śākhā* has its *Brāhmaṇas* and its six *Aṅgas*. *Āraṇyakas* and *Upaniṣads* were regarded as parts of the *Brāhmaṇas*. The *Brāhmaṇas*, *Āraṇyakas* and *Upaniṣads* are not books in the modern sense of the word by one author, but a compilation of dicta of the Ṛṣis in sacrificial assemblages. The compilation of these dicta under certain principles, either by a great Ṛṣis or by a committee of Ṛṣis is a *Brāhmaṇa*. The *Brā hmaṇas* of so many Śākhas of the .Vedas may not be extant upto the present day after so many revolutions. But it is believed that many more Śākhās may be discovered over and above those already known. These afford much scope for research, study and publication.

Divisions and Sub-divisions of the Vedas

A search for the *Aṅgas* of the different *Śākhās* may also be very fruitful. We have already a very large number of *Śikṣās* published, and many yet may be found. Pāṇini's influence has killed almost all the *Śākhā Grammars;* but still some may yet be found, for he mentions at least 10 of his predecessors in his *Sūtras*. We ought to be certain

The Angas.

which of these is a *Śākhā grammar* and which is a comprehensive one. The only *Nirukta* is that of Yāska, but he mentions several of his predecessors. Are the works all lost ? Only one small work on Vedic astronomy is extant. The *Śakhā* astronomies have been all killed by the later *Saṁhitās* and *Siddhāntas*. Only a scrap of a *Śākhā* astronomy would be of immense value to us. Every *Śākhā* had its own *Chandas*, but Piṅgala has killed them all, and Piṅgala has a large following. Any scrap of information about a *Śākhā Chandas* in any *Purāṇa, Tantra* or commentary would be a valuable discovery.

The Śākhā-kalpas and their division

Many of the *Śākhā Kalpas* are still extant. Many have been irretrievably lost but many may yet be recovered. These *Kalpas* are divided into three parts viz., 1. *Śrauta*, 2. *Gṛhya* and 3. *Dharma*.

The Srauta works

Each *Śrauta* work produced many schools, represented by different commentaries. From commentaries came treatises on sacrifices; from these treatises on sacrifices came *Prayogas* or rules, and *Paddhatis* or *rituals* of the sacrifices. This branch of literature is still living, though not a vigorous life. From great sacrifices they have come down to merely lighting the sacred fire, and pouring a little clarified butter into it. There are but few Vedic rites prevalent at the present day, but even these few have many *Prayogas* and many *Paddhatis*.

The Gṛhya and Dharma concern life in general and give rise to material Smṛtis.

The other two branches of the *Śākhā Kalpa.* viz., *Gṛhya* and *Dharma*, bloomed forth, during the Brāhmaṇa domination in India from 200 B. C. to 200 A.D., into metrical *Smṛitis*. They are not like the *Śrauta-Sūtras,* only concerned with sacrifices and high religious life; but they concern life in general. They regulate domestic and social life in all its aspects and, therefore, they have even now a vigorous existence. The metrical *Smṛti* treatises began to develop their commentaries; and with the new development of life and ideas in India, the

commentaries expanded their bulk and became more and more comprehensive. The *Śāstra* broke into sections like *Āçāra, Vyāvahāra, Prāyaśçitta* and so forth. But since the 11th century, when the Mahommedans set their foot in India, kings and Brahmins became alarmed for the very existence of the Varṇāśrama community and began to write many local compilations, called *Nibandhas*. Fifty of such compilations are extant in full and are still guiding the lives of millions of Hindus; and, 200 more are known in scraps only. The recovery of these *Nibandhas* in full would be a great service to Hindu society, as well as to Sanskrit scholarship.

What the Brahmins did to save th Hindu Society from the onsloughts of foreigners invading iNdia

The Brahmins are much maligned for their selfishness, bigotry, short-sightedness and what not. But there is no doubt that they saved the Hindu ideals in India on two great occasions; once in the 3rd century B.C.. when Aśoka wanted to level down distinctions of caste and creed and take away all privileges which the Brahmins enjoyed in matter of punishments and law-suits they had no other alternative but to put their house in order and really deserve the respect of the people by writing the metrical Smṛtis, by making the *Rāmāyaṇa*, the *Mahābhārata* and the *Purāṇas* available to the people who were being lured away by Buddhism with its gorgeous ritualism and its democracy. Once again in the 11th century they saved Hindu society by writing these *Nibandhas* from the onslaughts of Mahommedan preachers. They were equally clever in absorbing all conquering races into the bosom of the Hindu society in some of the most crucial turns of its history. Where are the Huns ? Where are the Jaṭṭas ? Where are the Śakas ? Where are the Yueh-chis ? They form an integral part of the Hindu society. May they yet do the same and absorb Western and Mid-eastern culture into their own !!!

Audacious ignorance was certain in the eariy 19th century that

Sanskrit literature and for the matter of that even Arabic and Persian literature could afford no education. But I have shown before that Northern, Eastern and Southern Asia were saturated with Indian culture; and I am in a position to assert that at one time even Persia and the Eastern Roman Empire came greatly within the influence of Indian culture. Apart from other evidences found in those regions, we find also in a palm-leaf manuscript copied in Bengal, in the early 11th century (the *Vimalaprabha,* commentary on the Buddhist *Kālaçakra Tantra,* now in Bengal Asiatic Society) it is asserted that the Buddhist scriptures were translated in Persia and in Nīlā-nadyuttare—Ruhma-dese i.e. in the Ruhma or eastern Roman country in the North of the Nile.

The influence of Indian culture.

Education through the medium of the English language was started with the idea that Sanskrit and Arabic can afford no culture. Hundred years after that mistake, as I consider it, it now appears that the whole of Asia and the Eastern portion of Europe was saturated with Indian culture. The value of Arabic in the preservation and dissemination of culture in the mediaeval and early modern world, whether in Western Asia or in Europe need not be dilated upon by myself. The mischief in relegating Sanskrit (and Arabic) culture to a secondary place, and in not, modernising it (like what has been done in the mediaeval universities of Europe with the Latin culture) has been great. Reparation is not yet impossible, and as a student of Sanskrit of the old type which is apparently going out of fashion, I hope that the forces against Sanskrit are not strong enough to kill it outright but that it will appear and reappear thoughout in its pristine vigour but in a modified form to greatly influence the forces that may get the upper hand. In the 3rd century B. C. Vedic ritualism was not revised but modified into Paurāṇic religion. In the 11th century A.D. Sanskrit became strong by absorbing much that was not Hindu. In the 21st century it may do the same and absorb most of the

The mischief done by making English the medium of education.

western ideas but what shape it will take it is now too early to predict.

The progress made in the 20th century and a partial realisation of the dream of Rādhā Kisan.

With the advent of the 20th century, a change came over the spirit of the dream. The long vision of Rādhākiṣaṇ had perhaps seen something of it. All of a sudden, the Princes and potentates of India were seized with a patriotic fervour and started the publication of Sanskrit works. At the end of the 19th century, there were some attempts made by the Maharaja of Darbhanga and the Raja of Vizianagram to issue series of Sanskrit works but they were not very successful. But, nevertheless, they showed the way. The first decade of the 20th century saw the Mysore and the Trivandrum series start their useful career with magnificent contributions from ancient Indian authorship. The next decade found the Gaekwad and the Kashmir Darbars engaged in the same intellectual work and I anticipate, the whole body of Princes and potentates of India will be busy with publishing ancient Sanskrit works of great value found within their territories. His Exalted Highness the Nizam of Hyderabad has started a scries of Arabic and Islamic works. But he occupies the very heart of the ancient Hindu civilisation in the Deccan. Many of the capitals of ancient and mediaeval Hindu rule are situated within his dominions. For the sake of his Hindu subjects and for the sake of the wider culture of modern India—he, the premier Indian Prince and true patron of arts and letters and founder of the first Vernacular University in India would only be acting according to the traditions of his great house, if he ordered not only a thorough search of Sanskrit manuscripts and manuscripts in Sanskritic Languages within his dominions, but also the publication of a Sanskrit series, the value of which would be simply enormous. Already his archaeological department has made many important discoveries, the most important of which is the *Maski edict* establishing the identity of Asoka with Priyadarśī; his Government has undertaken as a most

enlightened measure the conservation, preservation and maintenance of the famous Buddhist and Brahmanical cave temples of Ajanta and Ellora. Starting a Sanskrit series will, I suppose, be of equal value with all these. Numerous Vaiṣṇava, Śaiva, Jaina and Buddhist sects had their origin within his dominions, and some of these great seats of ancient learning are situated there like Paithan and Warangal. The exploration of this vast but virgin field at his instance will bring the present ruler—already distinguished by the above enlightened measures, honour and glory as a patron of learning irrespective of caste or creed equally with that of an Akbar.

We often hear of retrenchments made in this department of work on economical grounds. Such retrenchments are surely a bad economy. It is a spirit of parsimony wholly unbecoming of the great Indian states. The return from the outlay on Sanskrit series—even in pound, shilling and pence,—is not discouraging. I will give one example. The *Bibliotheca Indica series* was started by the Asiatic Society of Bengal in 1849, and within these 80 years it has published 1729 fasciculi of nearly a hundred pages each, 289 of distinct, separate and independent works ;—sold books worth Rs. 400,000 and has a stock of double that value, none of which, I believe, will prove to be a dead stock. Under proper advertisement and even supervision the sale is increasing. The Government which financed, does not even want to take back its original capital. So the capital and profit all go to the fund. But that is a small matter. Look at the enormous knowledge that has disseminated throughout the world which would otherwise have been locked in illegible manuscripts, written on perishable material. One would be inclined to think that the entire Indology has been pushed forward by the publication of this ancient series, the name of which should be written in letters of gold—the BIBLIOTHECA INDICA.

The Bibliotheca Indica and its value with regard to the spread of knowledge in Sanskrit.

One charge generally levelled against the *Bibliotheca Indica*

scries is that some of the works are not properly edited, to which the short answer of Dr. Hoernlie was that they at least multiplied bad manuscripts and that the very multiplication is a service. But in that series for one such badly edited work there are scores which are really excellent.

They are valuable inspite of their defects

The Bombay Sanskrit series is another well edited series, but this seems to have aimed more at educational needs of Colleges and Universities than those of scholars who want to push forward research.

The Bombay series.

But the various series started by the Princes of India have a very different character. They do not get their inspiration from Europe. The editors are Indian scholars trained in India, belong to ancient Sanskritic families which are celebrated for learning and piety and are or have been de-devoted to the study of Sanskrit as a part and parcel of their very lives. These scholars work with a single minded devotion and their selection of works is more [of] choice than in many other series; for instance, Madhusūdan Kaul of Kashmir selects only those works on Śaiva Philosophy which in the 9th, 10th and 11th centuries made Kashmir famous. He also chooses those Tāntrika works on which that system of Philosophy was based viz., *Sacchanda Tantra, Mālinīvijaya Tantra, Tantrāloka* and others. It is a pity however that the great work of Kashmir, Abhinava-Gupta's commentary on Bharata's *Nāṭya-Śāstra* should-be forestalled by the *Gaekwad Series* at Baroda which has taken the entire credit in publishing the chapters on dance with illustrations for each dance pose from ancient Southern Indian sculpture. The first volume only is published, and the others are awaited with the highest of expectations. The *Gaekwad series* opened with a wonderful work, entitled the *Kāvya-Mīmāmsā*,—a work on literary criticism of the highest value which has been edited by that excel-

Different characters of the various series started under the patrionage of Indian Princes.

lent scholar the late Mr. C. D. Dalal. But it is very unfortunate that only a small fraction of a big series of books has been discovered and published; for it is said that the work consisted of 18 such parts;— the other 17 parts are irretrievably lost.

We were hearing of quinquennial assemblies in ancient India in Aśoka's inscriptions, in Hiuen Thsang's accounts but the *Kāvya-Mīmāṁsā* gives us an inside view of these royal assemblages for rewarding merit in science and art. The book is replete with literary legends and traditions of ancient India and was written in the beginning of the 10th century A. D. The publication of the *Sādhana-mālā* in this series completes the Buddhist iconographic literature of India. These Sadhanas were composed by professors of later Buddhism,—of Mantra-Yāna, of Vajra-Yāna, of Sahaja-Yāna and of Kālacakra-Yāna,—schools of Mahāyāna Buddhism during the 8th, 9th, 10th and 11th centuries of the Christian era; and they were collected together in the form of Saṁgrahas in the 12th century. They are entirely Indian in character. We know from Tibetan sources that about this time an opinion gained ground in the Buddhist world that in the art of painting and sculpture, India as known intimately to the Tibetans, i.e., Magadha and Bengal, excelled; next came the Newars of Nepal, the Tibetans came next, and the Chinese last of all. This statement has been fully justified so far as Magadha and Bengal are concerned by the iconographic sculpture that we have been getting during the last 20 years in all parts of Eastern India. The latest great work of tlie *Gackwad Series*, is the *Tattva-saṁgraha* of Śānta-rakṣita who was the first great Lama of Tibet. It is a wonderful book. It refutes twenty other systems of Philosophy in India and establishes the Mahāyāna system. It gives us materials in plenty for settling the chronology of a great deal of the Philosophical literature of India. The eighth was a wonderful century in which all the religious and Pililosophical sects of India put forth their best endeavours to establish their supremacy over others. Early in

The value of Kāvya-Mīmāṁsā Sādhana and Tattva Saṁgraha in the field of research.

the century Kumārila, with his *Śloka-vārtika, Tantra-vārtika* and *Ṭup-Ṭīkā* on the *Śabara-bhāṣya,* endeavoured to establish the supremacy of the Vedic culture. Then came the voluminous writer Haribhadra reputed author of 1400 treatises to do the same thing for Jaina culture, Jaina religion and Jaina philosophy. The third was Śānta-rakṣhita, from the Dacca District. He was closely related to the family of Indra-bhūti, a Rājā of Orissa who advocated the Vajrayāna system of the Mahāyāna School. He was also closely associated with his brother-in-law Padma-sambhava who converted the Tibetans to Buddhism and is regarded by them as a second Buddha. His work the *Tattva-saṁgraha* with a commentary by his pupil *Kamala-śīla* is a very brilliant achievement and H. H. the Gaekwad's Oriental Institute gets all the credit in publishing it. At the end of the century came Śaṅkarācarya with his vast learning, refuting all sectarian opinions and establishing a monism which holds its ground all over India, Śānta-rakṣita and Kamala-śīla are very brilliant men of the 8th century.

The Mysore series.

In the 20th century the first series that came out under the patronage of a big state was the *Mysore series.* It began to publish choice works and choice commentaries on Vedic and Philosophical works. It at once attracted public attention, and people became anxious to see new issues. Two works appeared which are of immense importance for the elucidation of ancient Indian society. One is the *Goṭra-Pravara-Prabandha-Kadamba* i.e., a collection of treatises on Gotras and Pravaras by which the Brahmins or rather the members of the twice-born castes distinguished themselves from one another. The great attraction of the book was an index of Goṭras with about 4000 names, and a chart showing the relation amongst the Pravara Ṛṣis. The word *Pravara* was very little understood even by the great jurists of India, but this Mysore treatise gave its real meaning; and the real sense of the term is that it means those Ṛṣis in whose names the sacrificial fire is to be invoked. The theory was that in a sacrifice if a man invoked the Fire-God in his own name, he, the

Fire-God would not respond. If the Fire-God was invoked in the name of all the human ancestors of the sacrificer he was not likely to respond either. But if the God was invoked in the name of that Ṛṣi ancestor of the Yayamāna or sacrificer who was a friend of the God, then the deity would know him and would come to his descendant's sacrifice. The publication of this collection of authoritative works on the genealogies of the ancient Brahmins has been a very great service to the orthodox in the Hindu community who have always believed in the Goṭras and Pravaras and regulated their lines according to that belief.

The second boon which the *Mysore series* had the honour to confer is the *Artha-Śāstra* of Kauṭilya. Kauṭilya's name was well known. He was the same person as our great Cāṇakya who destroyed the Nanda empire, and installed Candra-Gupta as Emperor of India. But his .Artha-Śāsṭra was not known. Our friend Pandit Dr. Shamaśhastri discovered the work, edited and re-edited it with fresh materials, translated it into English, and gave an all-word-index to it and made many interesting researches about it. Eighty years ago the discovery of Hiuen Thsang's itinerary gave us an insight into ancient Indian life both Brahminical and Buddhist of the 7th century A.D. That was by a foreigner. He noted down only those facts which appeared to be important and interesting to the Chinese Buddhists but Kautilya's *Artha-Śāstra* twenty years ago laid bare the whole world of Indian life at tlic time of India's greatest prosperity. Hiucn Thsang, a devout Buddhist monk that he was, looked at the rich and varied life of India of his time with the eye of a religious recluse, but Cāṇakya looked upon Indian life from the point of view of a great administrator, a great organiser and a great politician. Here we find Indian life in all its aspects—the principle being the organisation of Varṇāśrama or the castes and stages of life on which Hindu Society is based. It is a curious fact that the account we get in Kautilya's *Artha-Śāsṭra* agrees mainly and generally with that given by Megasthenes in the same century and at the same court.

Artha-Sastra

Political economy is a modern science in Europe. It started with Adam Smith's *Wealth of Nations* published in the year 1776 A. D., and within a century and a half it has branched off into so many sciences, but *Artha-Śāstra* is twenty-three hundred years old. Kautilya, however, was not the first writer on *Artha-Śāstra* but very nearly the last. He quoted 15 or 16 different authorities and names of four different schools advocating from the primitive coercion to the regulation of the entire life of a nation. Adam Smith speaks of four different stages of development of political ideas in Europe from the Dark Ages onwards. The first is the protection of life and property alone in the Merovingian and Carlovingian times, 800 to 1200 A. D. Kings during this period thought that if they protected the lives of their subjects, they did all their duties. Commerce and trade they would not protect. That was left to the traders themselves. These began to combine to protect their trade. Nearly 150 cities of Northern Europe thus combined to protect their commercial interests. But the united traders often defied their kings. That led kings to come forward and protect trade, a fact which finally brought about the dissolution of the Hanseatic league about the 15th century. We have here the second stage. Then came the third stage. After the fall of the Eastern Roman Empire, 1453 A. D. and the Reformation of Luther, later, it became apparent to many states in Europe, that the leadership of the Church, i.e., the control of religion should no longer remain in the hands of the Pope, but should be vested in the state. The king of England became the protector of religion, and England's example was followed in other Protestant countries. As ideas advanced Government thought it fit to control the liberal education of the entire nation and we have the fourth or the last stage in the development of national polity.

This is the history of the advance of political life in Europe. Kauṭilya gives the history of political advance of India in a few sentences. He says Śukrācārya thought that kings should learn Daṇḍanīti only i.e., merely coercion for the protection of life and

property. Vṛhaspati thought that kings should learn not only Daṇḍanīti but also Vārtā, which includes agriculture, trade and pasture. Manu thought that they should impart to them higher culture also, but Cāṇakya and his Ācāryas thought that they should include the Trayī or the Vedas also. A comparison between the progress of political ideas in Europe and India will show that Cāṇakya's political ideas were those of modern Europe. Cāṇakya was not like Adam Smith a promulgator of a new science but the heir to a long series of development of political ideas.

Kautilya and Adam Smith

The importance of the publication of the *Artha Śatra* cannot be over-rated. It has already made Doctors by the score, in the Universities of India and Europe ; but the inner meaning is very little understood owing to the want of intimate and extensive aquaintance with Indian literature which a mastery of such a work as the *Artha-Śāstra* requires. In this connection one cannot help admiring Prof. Samasastri who is doing every thing to help students in this direction. I may repeat : he has twice edited the work; once translated it into English; given an all-word index to it and edited the Sūtras of Cāṇakya in the hope that they may throw light on his *Artha Śāstra.* He has not onlv done much himself, but also inspired others. The late lamented Mahāmahopādhyāya Ganapati Sastri had edited the work with a commentary of his own, and Prof. Jolly has given a fourth edition ot it with the help of a new manuscript at Tübingen. Messrs Motilal Banarsi Das the well-known Sanskrit publishers of this city have given Prof. Jolly the hospitality of their scries.

I mention the *Trivendrum Sanskrit series* at the end simply because I wish to say something about the late lamented Ganapati Sastri who without any knowledge of English had edited a wonderful series of works—with prefatory notices in Sanskrit which will be admired all over the world for their boldness and insight into the spirit of Sanskrit literature. He began with very select

works, which can not be found anywhere but: which were very valuable to students of Sanskrit and gave valuable information about ancient India. He surprised the learned world by the publication of the 13 works of Bhāṣa ;—worderful dramas giving a thorough insight into the life of India some centuries before Christ. He was criticised and the criticism was adverse to his Chronology. Some said the Sanskrit of these dramas was not so old, others said the Prākṛt was not so old. Some found in the epilogue the name of a Kāṇva king. But, I believe, that Mahāmahopādhyāya Ganapati Sastri was right in putting Bhāsa in the 4th century B. C. ; for there are many things in the Pratijñā-*Yaugandharāyaṇa* in the *Svapna-Vāsavadattā* and in the *Pratimā-nāṭaka* which show that, they can not be written later. The enumeration of the royal families of Northern India to which Mahā-sena, the king of Ujjayini could marry his daughter can not be written in later centuries, when all memory of Mahā-sena was lost. The worship of the stone images of ancestors as given in the *Pratimā-nāṭaka* has raised a huge controversy; one party saying that the custom was in vogue at the time of the Śiśunāgas; others say that they were much later. But it is a curious fact that in the Jāṇgala country i.e., Bikaner, all royal personages from Bika downwards have their stone-images and to these stone images offerings of food in the shape of Puris are made to the extent of nearly a maund. In many old capitals, now in ruins, are found images of royal personages on horse-back when they died in battle, and in other positions when they died a natural death. Cremation is an old custom; to mark cremation grounds with Stūpas was also an ancient custom. But the custom of erecting stone images there *is* not yet known from ancient works. But Gaṇapati Sāstrī, wrote to me to say that, in the *Pratimā-Nāṭaka* a custom is recorded of throwing sand in the encolsure, and this is found in Āpastamba's work only, and Āpastamba belongs to the 5th century B. C.

Trivandrum Sanskrit series.

Bhāsa

But the publication of Bhāsa's works is not the only thing on which Ganapatı Sastn's fame rests. He has published in three volumes of the *Mañju-śrī-mūla- Kalpa,* a Buddhist work belonging to a very early period on which the Manṭra-Yāna and other sub-sequent Yānas of the Buddhists are based. How he got the Buddhist work ın the extreme South of India is one wonder, and how he unravelled the mysteries of a complicated Buddhıst ritual is another. The publıcatıon of thıs ancient Buddhist work is likely to lead to further discoveries of the Guhya-samāja school of Buddhism which branched off from Mahā-yāna, leaving Philosophy behind, and proceeded straıght to mysticısm : "The Bıja or seed proceeds from Bodhi which ıs nothıng else but Śūnyatā. From Bija proceeds the image and in the image there are internal and external representation," and this ıs deep mysticism indeed. This is the same as making the letters of the alphabet represent deıties only expressed ın mystic and Buddhistic language.

Manju-srimula-kalpa

The thırd great work which M.M. Ganapati Sastri produced ıs the *Śaiva-paddhati* by Iśāna-śiva-guru-deva. In the 10th century an association of Sıvaite learned men was formed in Central Indıa,—known as the Matta-mayūra-vaṁśa. The Gurus of thıs association ended their names with the word Śıva, vız., Īśāna Śiva, Vimala Sıva, etc. They were great builders of temples and converted many chıefs to their faith. Some of theır works are to be found in the Darbar Lıbrary, Nepal. Ganapati Sastri got hold of one of their works and publıshed it,—giving a key to the whole literature. The versatılıty of M. M. Pandit Ganapati Sastn is very stnking. He has handled works on all Śāstras with equal facılity; Śilpa, Nīti, Pāñca-rātra, Philosophy, Archıtecture, Philosophy of Grammar, Rhetoric, Lexicons, Jyotiṣa, Sphoṭa, Music,—all are welcome to him. To lose him has been a great loss to Sanskrit scholarship ın India. He enjoyed all the blessings of a liberal education, without knowıng any English. Government made him a

Isāna-Śiva-guru paddhati

Mahāmahopādhyāya and the Royal.Asiatic Society of Great, Britain and Ireland made him an Honorary Member. All this was high appreciation indeed but not high enough for a man of so much industry and so great intellectual powers.

I have already said that it is a sign of the 20th century that the Indian Princes came spontaneously and patriotically, without any impetus from outside to start the various Sanskrit series. The four series already started I have mentioned before. But other series may also be started. Appeal should be made to the enlightened Ruler of Bikaner to utilise nearly 7000 Mss. lying idle in the fort of that city. These Mss. are very well preserved in strong worm- proof almirahs with an exhaustive nominal catalogue from which any Ms. may be immediately got. It is a storehouse of codes of Smṛti written during the Mahommedan period. It has all the books of the Law codes written by Hemadri, by Todarmalla, by Madana-Siṁha, by Anantadeva the son of Kamalākara, by Dinakara and his son Kamalākara combined, by Mitra Misra of Bundelkhand, and so on. You get only one or two books of these valuable codes and digests in other libraries, but in Bikaner, the codes are nearly complete. Where any book is wanting the Librarian has invariably put in some Sanskrit word to mean 'missing'. The Philosophical section of the library is extensive. It has works written at all times,—modern, mediaeval, ancient,—and in all parts of India,—especially Bengal. It has many works of unique importance, not to be found elsewhere. The library has indeed long ago published a descriptive Catalogue, edited by Raja Rajendralala Mitra. But it contains very summary descriptions of only 1619 Mss.

Bikaner State Library

The Alwar Darbar obtained the services of Mr. Peterson to prepare a catalogue of the state collection of Mss. and it is a very useful one. There is enough material in his library to start a series.

Alwar State library

Jodhpur has a collection of about 2000 Sanskrit Mss—well-

kept in a room in the fort where worms will not be able to ruin these works. But there is no catalogue and nothing has come out of it.

Jodhpur State library

Bundi has a collection of about 2000 Mss. well kept in a cave-like room on a broad road leading to the palace. But there is also no catalogue.

Bundi State library

Jaipur and Rewa very carefully guarded their treasures of Mss. and never allowed strangers to use these—though very recently I hear, they have been opened up to the vulgar gaze.

All the states of Rajputana have their own collections of ancient Mss. but they have not caught the enthusiasm of Mysore, Travancore, Baroda and Kashmir to issue series of rare Sanskrit works and thereby spread the old light in the modern world.

We are all along speaking of the Raj Libraries of Rajputana. But in Rajputana, every learned Brahmin has his collection of Mss. Every Jaina monastery has also its collection of Mss.—called Bhāṇḍars. Many Cāraṇas have rich collections of Mss. In one of the Jain Upāśrayas or monasteries in Jodhpur I found the medical work by Vopadeva still used.

Private libraries of Rajputana

Private enterprise has also done much. Since the establishment of the Printing Press in India, many many religious-minded people have undertaken the task of printing or multiplying copies of religious books, such as the *Rāmāyaṇa*, the *Mahābhārața*, the *Smṛtis*, the *Purāṇas*, etc., and distribute them among learned Brahmins. Private religious bodies also did the same thing. Pandits with business habits often undertook the publication of Sanskrit works as a matter of speculation. Traders, book-sellers often undertook the printing and publication of Sanskrit Mss. for profit. In some cases, valuable series of Sanskrit Texts were started, such as the *Anandasrama series* and the

Private enterprises

Anandasrama and Kavyamala

Kavyamala series. Some confined themselves within one or two branches of Sanskrit literature according to their own choice. One published the works of the Mā dhva School only; another, of Śaṅkara School only. Individuals often published books of their choice either for money or out of love for these works. But these enterprises often failed, because Sanskrit works cannot bring handsome profit within a sliort time. The "Pandit" of Benares after a glorious career of 40 years has now disappeared. Then it reappeared under the name of the *Benares Sanskrit Series* ; but that also, I believe, is now moribund, if it has not disappeared. The *Vizianagram Series* after publishing 10 or 12 works ; died out. The *Chowkhamba Series* of Benares after publishing 400 fasciculi now appeal to the public for fresh patronage, which it fully deserves. The Arya Samaj is also doing a great lot,—not only by the dissemination of the Vedic Texts among the people but by also publishing other books in other branches of Sanskrit literature. Other religious communities and organisations like the Jaina, the Vaisnava of North and South India have done meritorious work in publishing their sectarian literature.

Benares Sanskrit series

Chowkhamba

Arya-samaja.

Other Religious organisations and Skt. literatue.

But in this department of activity among the most enterprising are (1) the proprietors of the Nirnaya Sagara Press of Bombay, (2) the Sanskrit publications by the late Jivananda Vidyasagar of Calcutta and (3) Messrs. Motilal Banarsi Das & Co. of this city. The name of the Nirnaya Sagara Press is a household word wherever Sanskrit is seriously studied whether in India or outside India; and their accurate and cheap editions of the Sanskrit classics have been a great helper in the proper study of the Śastras as well as Sāhitya. They are an old firm; and I need not dwell much on the good work they have done and for which they have deservedly won the gratitude of. scholars. Jivananda's Sanskrit

The publishers Motilal Banarasi Das.

series is also well-known and deserving of praise. The firm of Motilal Banarasi Das have absorbed nearly the whole of Indian and much of European book-trade on Indology. They have enlisted the co-operation of some of the best men in Europe and in India in giving to the world choice books on Indian subjects ; they obtained the help of men like Dr. Thomas to publish the *Vārhaspatya Sūtra,* a work on economics evidently more ancient than even Kauṭilya. They entrusted men like Jolly to publish the *Mānavadharma-Sūtra* and like Caland to publish the *Śatapatha Brāhmaṇa* of tlic *Kāṇva Sākhā.* The *Śatapatha* has two recensions,—*Mādhyandina* in 14 and *Kāṇva* in 17 Kaṇḍas. The *Mādhyandina* was published long ago by Weber and others, but the Kāṇva was not published before this; yet the *Bṛhadāranyaka Upanisad* which Śaṅkara commented upon belongs to the *Kāṇva* and not the *Madhyandina Śākha.* Therefore the publication of the Kāṇva Śākhā will be of great importance not only to the Vedic scholars, but also to the scholars of Advaita Philosophy. Another noteworthy publication of this firm is Dr. R. C. Mazumdar's work on Campa—the first publication of the Greater India Society, a body which has taken upon itself the laudable enterprise of making known to the intelligentsia of India, the story of what India achieved abroad. Time and space will not permit me to give details of the work done in the field of Sanskrit by many publishers in the various provinces who have used provincial characters and not Devanāgari which has within recent years become a sort of national character for Sanskrit: and the same apology I make. for many European editions in Roman.

Jivananda Vidyasagara.

Greater India Society

The great epic *Mahābhārata* is a towering wonder in the world's literature. Its bulk *is* extensive and it includes within its panorama practically the whole of ancient Indian life. But when the original *Mahā bhārata* was composed, perhaps the art of writing was not yet

Mahabharata Committee— Poona.

invented or writing materials were very scarce. So it passed from mouth to mouth, village to village, city to city, changing everywhere to the taste of the people hearing or reciting it. Even when writing came in vogue, different districts produced different recensions of the *Mahābhārata*. Then there were revisions. Originally, it was an epic poem, then it became a history in the form of interlocutions. Then, as the idea of history expanded, there was expansion of the *Mahābhārata* too. In this way a poem of 24000 verses gradually developed into a bulky work of a lakh of verses. When the *Mahā bhārata* first went to Europe, scholars there thought of collating it. With that view they collated all Mss. of the *Mahabharata* found in Europe, and then sent it down to India for further collation. The Bhandarkar Research Institute undertook the work and called upon the Visva-Bharati to assist them. The work is proceeding slowly. The Mahābhārata Committee, consisting of five young scholars trained in Europe and America, is proceeding with the work slowly. I have seen only one part of it containing two chapters, and I see that the Committee has done its best to go to the bottom of the thing. They have mercilessly rejected verses not found in authentic manuscripts. They have appended a critical apparatus which is admirable. I think, the bulk of the Mahābhārata will be considerably reduced. My idea is that the work has undergone five revisions. Originally it seems that it was a short work with a table of contents in two verses only—the well-known Ślokas—Duryodhano manyumayo mahādrumah, etc. The next revision was in the form of an epic poem with a table of contents running up to 150 verses—half of which are in the Triṣṭubh metre from 'Pāṇḍur jitvā bahūn deśān', etc., to the end of the Anukramaṇikā chapter. The third revision was in the form of a history in interlocution,—the table of contents being the first half of the Anukramanikā chapter. Then it was divided into 100 parvans—it was set by Vyāsa himself. The table of contents of this was given in the first-half of the Parva-saṁgraha chapter. Then came the full-fledged *Mahābhārata* with 18 major parvans and

The Puranas.

84836 verses, which when reduced to a unit of 32 syllables has become 100,000 verses. I offer this suggestion of mine to the Mahābhārata Committee for consideration for whatever it is worth. It is a great undertaking and I wish them every success. After the success of this edition of the *Mahābhārata,* the 18 *Mahāpurāṇas* should be subjected to the same critical method of examination. I think, that they too, have undergone several revisions ;—some are revised out of existence; some are revised out of recognition; some encyclopaedias have been transformed into the shape of *Purāṇas.*

The prevalent idea that all the 18 *Maha-Puraṇas* are from the pen of Vyāsa cannot be proved. The *Viṣṇu-Puraṇa* is by Vyasa's father Parāsara. The Bhāgavata is by Vyasa's son Śuka. The *Mārkaṇḍeya* does not speak of Vyāsa, and the *Bhaviṣya* does not mention him. The three encyclopædias, *Garuḍa, Nārada* and *Agni* have him as one of the latest interlocutors,—i.e., only in the first and in the last chapters. So the idea that Vyāsa is the author of all the Purāṇas is to be given up.

Śrīvidyapīṭha of Etwa

The Śrī Vidyapīṭha of Etwa founded by Sri Swami Brahmanath Siddhāṣrama, has the noble aim of making an index of all important branches of knowledge in Sanskrit, of all manuscripts in that language and in its derivatives, and all proper names and technical terms to be found in them. The Swami is no more but his disciples and admirers are sticking to the movement. It is a spontaneous Indian movement and the Indian public should look upon it with a favourable eye and, if possible, encourage it.

Archeaological Department

Another department of Oriental studies is Archæology. I have in my address as President of the Asiatic Society of Bengal in 1919, spoken of the advancement of Arehæology under the guidance of Sir John Marshall. Eight years have passed since then, they were years of intense activity and wonderful results. During these years in the

East we have the example of mixed Buddhists and Hindu culture of the 5th, 6th and 7th centuries at Paharpur. Nālādā has been excavated down to the ground level revealing sculptures of the best period of Indian Art. Sarnath has yielded further treasures of inestimable value ; Sanchi has been thoroughly explored, and a guide-book prepared for the benefit of excursionists. Excavations'at Taxilā have gone to the Persian strata of the place, below the Indo-Greek and the Parthian, the Mauryan and the Macedonian. On the top of all these come the ancient treasures of Harappa and Mahenjo-daro, revealing remains of something like a new Culture. Who the originators of this culture were, has not yet been settled or could not properly be investigated. But we get in our ancient works like the *Mahābhārata* and the *Rāmāyaṇa,* and some of the old *Purāṇas* that the border land of India on both sides of the Indus was inhabited by a race very different from the heroes of these epics. They would eat (the text says ' they smell of ') garlic and onions, would drink camel's milk and their sexual morality was very loose. They sold their daughters in marriage. They were people without religion. The names of these peoples were : *Madra, Kekaya, Vāhlika, Sindhu* and *Sauvīra.* So from very ancient times Aryans knew that Sindhus and Sauviras did not belong to their stock, though they often had to contract political and matrimonial alliances with them.

Thanks to Sir John Marshall, Indian Archæology has made great progress during his incumbency in the department, but much wonderful discoveries have been made during the same period outside India in Gobi and Taklamakan deserts, in Java and Anam by archæologists of various nationalities. The discovery of a large number of MSS; objects of Buddhist worship, Buddhist flags and so on, from the cave of the thousand Buddhas in the Gobi desert, read like a romance. The sands of these deserts have preserved fresh many palm-leaves and Chinese papers within two feet of their surface. Japan is busy with Sanskrit Mss. and their translation

in the Chinese. Takakusu has projected an edition of the whole of the Chinese *Tripiṭaka* with notes and commentaries. The French in the Eastern peninsula are bringing to the public notice relics of forgotten Hindu empires even on the borders of the Pacific. The Dutch are doing a lot of things in their possessions in the Indian Ocean to bring the remnants of ancient Hindu empires superseded centuries ago by Mahommedan conquests. All these vindicate the ubiquity of Indian culture all over Asia and discredit the audacious ignorance which pronounced that Sanskrit can afford no culture.

Conclusion.

In this long address, I have not been able to say many things; and one hundred days of compulsory rest may justify my putting up a plea of want of time. But the activity of the twentieth century in these departments has raised my hopes, that Sanskrit literature will not die, and I again thank the memory of Pandit Rādhākiṣaṇ of Lahore for raising the alarm in time and giving India the signal of the danger that was ahead, and for being instrumental in enabling India to preserve and give out to the world her noblest heritage—her ancient Sanskrit literature and in this way vindicating her position among civilised nations of history.

Warnings

But at the end of my address I think it to be my duty to give you a warning. At the present moment there is a large body of men who go as Sanskrit scholars without knowing a letter of Sanskrit. There are others again who tax the brains of poor Śastriis and make big name as Oriental scholar. At the conference of Orientalists held under the Presidency of Sir Harcourt Butler in 1911 a very great man told the august assembly that without two Śastris at their elbows they can not be Oriental scholars. Such Oriental scholarship should be discouraged. The Śastris should be trained

for Oriental scholarship. A historical sense should be awakened in their minds.

I often see big works on Sanskrit literature and special branches of it, compiled mainly, if not, wholly from translations of Sanskrit works in English, French, German and other European languages. They have a value. They advertise Sanskrit literature and bring profit to the authors, but translations are never reliable. Thibaut's translation of the *Śaṅkara Bhāṣya* was tinged with Rāmānuja's ideas, because the Śastri at his elbow belonged to the Rāmānuja school. Dr. Deussen's translation, is a little better because he told me at the age of 48 that he had carefully read through the Bhāṣya twenty- two times and then translated it. But he wanted one thing—the Indian tradition of the interpretation of the Bhāṣya. In a similar way all translations should be regarded as unreliable and all books based on these translations should be taken at their worth.

Do not believe in translations.

The Chinese translation of Buddhist Sanskrit works are free translations, therefore not reliable. The Tibetan translations are too pedantically literal and therefore often unintelligible. The original Sanskrit should be always sought for and consulted, if procurable, to cure the defects of these translations.

The Oriental scholars of Europe have done Sanskrit literature a great service by infusing a historical sense in those who are interested in it in India. But in the present day there is a tendency amongst the younger generation of India, to make the Oriental scholars of Europe their Gurus or Spiritual guides in all matters relating to India. Not being in touch with the

Do not make Orientalists of Europe your spiritual guides.

soil of India and its traditions the interpretation of Indian life by Europeans should. always be received with caution, criticism and.discrimination. They should not be slavishly followed by Indians in matters relating to India. One instance will suffice. The Indian literary chronology set up by Oriental scholars of Europe, I do not think,will stand. It will be not only greatly modified, but I think should also be thoroughly revised.

Conclusion.

With this warning I again say that my hopes have been greatly raised by the spontaneous action of the patriotic Indian States for the publication of valuable treasures of Sanskrit works and I hope that Sanskrit will not die. It may or may not prove strong enough to resist the influence of the almighty European culture, but it will certainly modify that influence to such an extent as to have a new character.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড থেকে চতুর্থ খণ্ডের

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়সূচি

চিত্রসূচি

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়সূচি

চিত্রসূচি

পা ণ্ডু লি পি চি ত্র

তৃতীয় খণ্ড

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

অ ভি ভা ষ ণ

প রি শি ষ্ট

চিত্রসূচি

আ লো ক চি ত্র

চতুর্থ খণ্ড

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠাঙ্ক

ই তি হা স

পৃষ্ঠাঙ্ক

চিত্রসূচি

আ লো ক চি ত্র

বসে : প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
দাঁড়িয়ে : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নিত্যধন ভট্টাচার্য, গণপতি সরকার, নরেন্দ্রনাথ লাহা, যতীন্দ্রনাথ বসু, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

১৩৩৮ সালের ১৪ ভাদ্র তারিখে সকাল বেলায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ শাস্ত্রীমশায়ের পটলডাঙার বাড়িতে সমবেত হয়ে 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা'-র মুদ্রিত প্রথম খণ্ড ও অমুদ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলীর অনুলিপি তাঁকে উপহার দেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোকচিত্রটি তোলা হয়েছিল।

অনুক্রমণী